হেমেন্দ্রকুমার রায়

কিশোর ভৌতিক সমগ্র

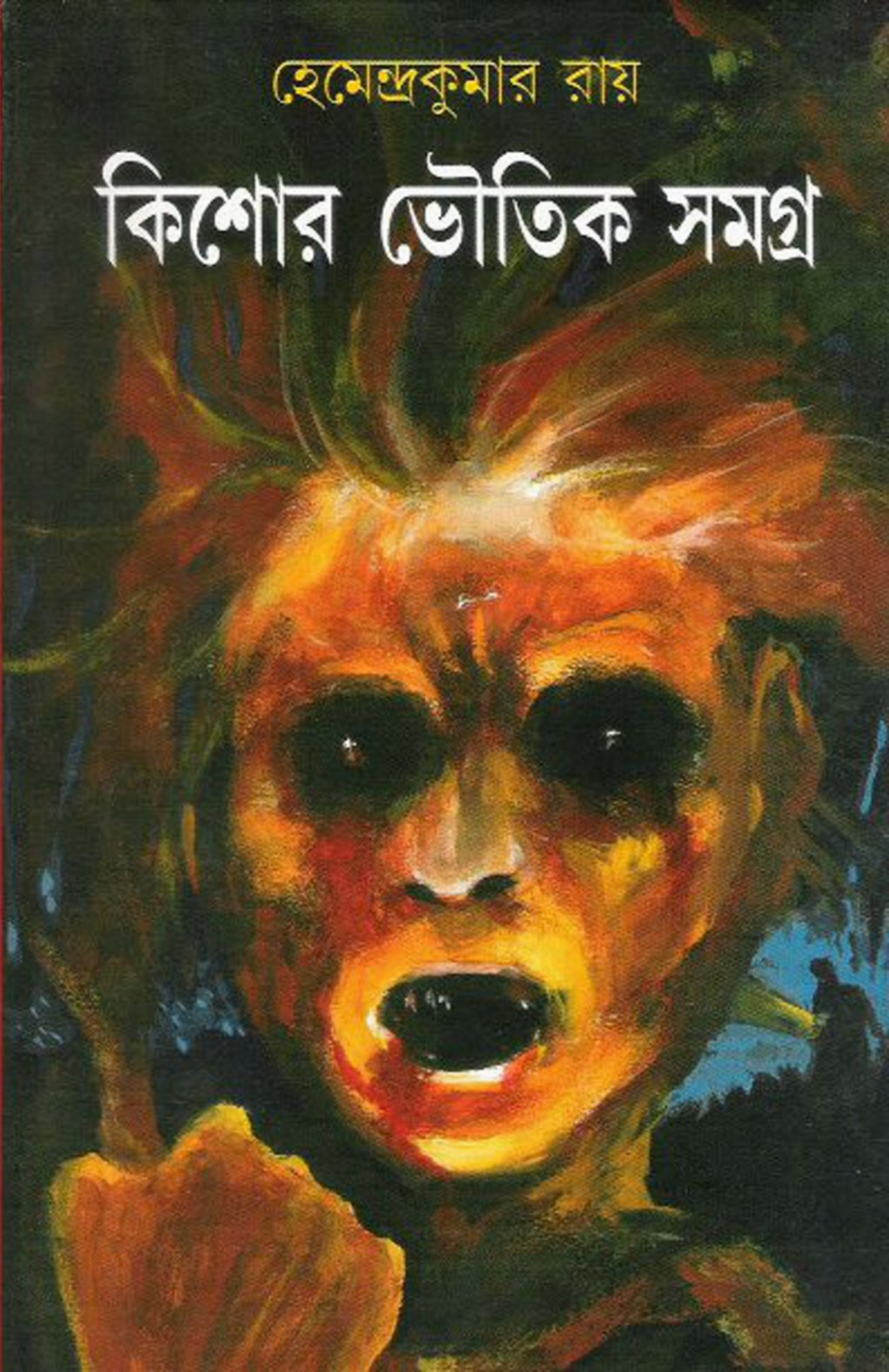

উপন্যাস

গল্প

নাটক

উপন্যাস

সূচিপত্র

অদৃশ্য মানুষ
অমানুষিক মানুষ
ইন্দ্রজালের মায়া
বিশাল গড়ের দুঃশাসন
বিভীষণের জাগরণ
মানব দানব
মানুষের গড়া দৈত্য
মোহনপুরের শ্মশান
মড়ার মৃত্যু
প্রেতাত্মার প্রতিশোধ
সর্বনাশা নীলা

অদৃশ্য মানুষ

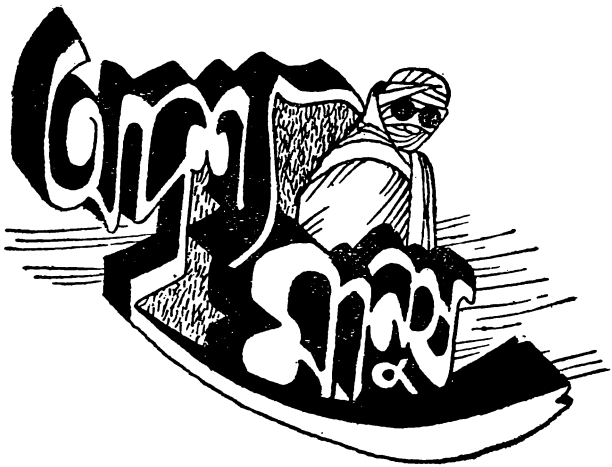

অপরিচিত আগন্তুকের আগমন

একটি ছোটখাটো শহর। তার আসল নামটি বলবো না। ধরে নাও তার নাম হচ্ছে শ্রীপুর। ছুটির সময়ে নানান্ দেশ থেকে সেখানে অনেক লোক বেড়াতে আসে। কারণ জায়গাটির জল-হাওয়া নাকি ভালো।

পাহাড়ে-শহর। পথে-ঘাটে বেরুলেই আশেপাশে ছোটো বড়ো পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ে-শহরে তখন পাহাড়ে-শীত। মাঝে মাঝে বরফও পড়ে।

বৈকাল। শ্রীপুর শহরে যখন রেলগাড়ি এসে থামলো, চারিদিকে তখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সে হাওয়া গায়ে যেন ছুরির ফলার মতোন বিঁধে যায়। বোধহয় বরফ পড়তে আর দেরি নেই।

একজন যাত্রী ইস্টিশানে এসে নামলো। যাত্রীটি জাতে বাঙালী, সেটা তার পরনের কাপড় দেখলেই বোঝা যায়। তার পায়ে ঘোড়্‌তোলা জুতো ও ফুলমোজা। গায়ের জামা দেখবার জো নেই, কারণ একখানি আলোয়ানে সে গা ঢাকা দিয়ে ছিলো। কেবল তার ডান হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছিলো, সেই হাতে ঝুলছিলো একটা পোর্টম্যান্টো। তার হাতও ছিলো দস্তানা-পরা। আলোয়ানের উপর জেগে আছে তার অদ্ভুত মুখখানা—সে-মুখের সবটাই ব্যান্ডেজে একেবারে ঢাকা। সাদা ব্যান্ডেজের ভিতর থেকে জেগে আছে কেবল তার গোঁফদাঁড়ি আর নাকের ডগাটা। ঠুলি-চশমা, অর্থাৎ 'গগ্‌ল্‌স' দিয়ে সে তার চোখ দুটো পর্যন্ত সকলকার চোখের আড়াল করে রেখেছে। এই রহস্যময় লোকটি যে কে তা আমরা জানি না। এবং যতদিন না তার নাম জানতে পারি ততদিন পর্যন্ত তাকে আমরা যাত্রী বলেই ডাকবো।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে ইস্টিশানের বাইরে এসে যাত্রী একটা পথ ধরে এগিয়ে চললো। খানিক দূর অগ্রসর হয়েই একখানা দোতলা বাড়ির সামনে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বাড়িখানার দোতলার বারান্দায় একখানা সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"শ্রীপুর স্বাস্থ্যনিবাস"। অল্পক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রী বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

এই স্বাস্থ্যনিবাসটির একটুখানি পরিচয় দরকার। শ্রীপুরে যারা বেড়াতে আসে তাদের অনেকেই এই স্বাস্থ্যনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর মালিক হচ্ছেন মিস্টার দাস ও মিসেস্ দাস।

তাঁরা বাঙালী খ্রীস্টান। স্বাস্থ্যের খোঁজে যাঁরা এখানে এসে ওঠেন তাঁরা দু-জনেই তাঁদের যত্ন, সেবা ও আদর-আপ্যায়নের ভার নেন—অবশ্য কয়েকটি রুপোর টাকার বিনিময়ে। তাঁরাও এই বাড়ির অন্য এক মহলে বাস করেন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকেই একটি বড় হল-ঘর। সেটি হচ্ছে এখানকার সাধারণ বৈঠকখানা। মিস্টার ও মিসেস্ দাস প্রত্যহ এইখানে বসেই তাঁদের অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজব ও আলাপ-পরিচয় করেন।

আমাদের যাত্রীটি এই ঘরে ঢুকেই গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমার একখানা ভালো ঘর চাই!'

মিসেস্ দাস তখন তাঁর কয়েকজন অতিথির সঙ্গে একমনে গল্প করছিলেন। যাত্রীর আকস্মিক প্রবেশে ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ঘরের সকলেই চমকে উঠলো। যাত্রী তার দস্তানা-পরা হাত দিয়ে একখানা একশো টাকার নোট বার করে আবার গম্ভীর স্বরে বললে, 'এই নিন্ আগাম টাকা! আমার একখানা ভালো ঘর চাই।'

না-চাইতেই আগাম একশো টাকা! বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মিসেস্ দাসের প্রাণটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো! কপাল না খুললে এমন অতিথি মেলে না!

মিসেস্ দাস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন আমার সঙ্গে! আপনাকে বাড়ির সেরা ঘরই ছেড়ে দেবো!'

মিসেস্ দাস যাত্রীকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাড়ির দোতলায় রাস্তার ধারের বড়ো ঘরখানিই যাত্রীর জন্যে ছেড়ে দেওয়া হলো। যাত্রী সেই ঘরের ভিতরে ঢুকে পোর্টম্যান্টোটি একটি টেবিলের উপরে রেখে দিলে।

মিসেস্ দাস তাঁর নূতন অতিথিটির সঙ্গে ভালো করে আলাপ জমাবার চেষ্টায় বললেন, 'আপনি বুঝি বৈকালের ট্রেনে এখানে এসেছেন?'

যাত্রী জবাব না দিয়ে মিসেস্ দাসের দিকে পিছন ফিরে রাস্তার দিকে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়ালো। তারপর মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'আমার ক্ষিধে পেয়েছে। এখুনি কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন।'

আলাপটি ভালো করে জমলো না বলে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে মিসেস্ দাস অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পনেরো পরে চাকরের সঙ্গে মিসেস্ দাস আবার ভিতরে এসে ঢুকলেন। যাত্রীকে শুনিয়ে চাকরকে ডেকে বললেন, 'ভিখু, টেবিলের ওপরে খাবারের থালা রাখ্!'

যাত্রী ঠিক আগেকার মতোই পাথরের মূর্তির মতোন জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিলো। এবং এবারেও মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন!'

মিসেস্ দাস নিজের মনে মনেই বললে, 'লোকটার টাকা আছে, কিন্তু ভদ্রতা-জ্ঞান মোটেই নেই!' প্রকাশ্যে বললেন, 'আপনি চা খান কি?'

যাত্রী বললে, 'মিনিট পনেরো পরে পাঠিয়ে দেবেন।'

মিসেস্ দাস ঘরের ভিতরে আর দাঁড়ালেন না।

মিনিট পনেরো পরে ভিখুর সঙ্গে মিসেস্ দাস আবার ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলেন, যাত্রী জানলাগুলো বন্ধ করে আধা-অন্ধকারে কোণের দিকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসে আছে। টেবিলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার জলখাবার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। বললেন, 'আপনার চা নিয়ে এসেছি।'

যাত্রী বললে, 'চা রেখে যান্।'

ভিখু চায়ের সরঞ্জাম রেখে টেবিল থেকে জলখাবারের থালাগুলো সরাতে লাগল ; মিসেস্ দাস সেই ফাঁকে যাত্রীকে আর-একটু ভালো করে দেখে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভালো করে কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না। যাত্রী তখনো তার মুখের ব্যান্ডেজ তো খোলেই নি, উপরন্তু গায়ের আলোয়ান, হাতের দস্তানা ও পায়ের জুতোমোজা পর্যন্ত ঠিক

সেইভাবেই পরে আছে। কেবল নিচের ঠোঁটের কাছ থেকে ব্যান্ডেজটি একটুখানি টেনে নামিয়ে রেখেছে—বোধহয় খাবার সুবিধার জন্যে। কিন্তু তার নাকের তলার দিকে চেয়ে মিসেস্ দাস ঠোঁটের কোন চিহ্নই দেখতে পেলেন না! তিনি ভাবলেন, আধা-অন্ধকারে বোধহয় তাঁর চোখের ভ্রম হচ্ছে। তবু তাঁর মনটা কেমন এক অস্বাভাবিক ভয়ে ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগলো। এ কি রকম রহস্যময় লোক! এ যেন মানুষের চোখের সামনে আসতে চায় না—সর্বদাই নিজেকে সাবধানে লুকিয়ে রাখতে চায়!—পৃথিবীর আলো-হাওয়াকে এ যেন পরম শত্রু বলে মনে করে! কে এ! ওর সারা মুখখানায় ও কিসের ব্যান্ডেজ? কোন দৈব-দুর্ঘটনায় ওর মুখখানা কি ভীষণভাবে জখম হয়েছে? না, কোন সাংঘাতিক অস্ত্র-চিকিৎসায় ওর মুখের অবস্থা অমন-ধারা হয়েছে?

মিসেস্ দাস মনে মনে এমনি-সব কথা নিয়ে তোলপাড় করছেন এমন সময় যাত্রী হঠাৎ বললে, 'ইস্টিশানে আমার কতকগুলো লগেজ পড়ে আছে। সেগুলো আনবার কি উপায় করা যায় বলুন দেখি?'

যাত্রীর গলার আওয়াজ আর তেমন কর্কশ নয়। মিসেস্ দাস ভাবলেন, তাঁর স্বাস্থ্যনিবাসের সুখাদ্য খেয়ে তার মেজাজ নরম হয়ে গিয়েছে! যাহোক্, কথা কইতে নারাজ যাত্রীর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেয়ে মিসেস্ দাস খুব খুশি হয়ে বললেন, 'সেজন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো অখন।'

যাত্রী বললে, 'আজকেই সে ব্যবস্থা হতে পারে কি?'

মিসেস্ দাস মাথা নেড়ে বললেন, 'আজ আর হয় না। মিস্টার দাস তাঁর এক বন্ধুকে দেখতে গেছেন, কখন ফিরবেন বলা যায় না। বুঝলেন মশাই? তাঁর বন্ধুটি ট্রেন থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়ে বসে আছেন!'—এই বলে যাত্রীর ব্যান্ডেজ-করা মুখের দিকে একবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার শুরু করলে, 'আজকাল পথে-ঘাটে দৈব-দুর্ঘটনা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে, না মশাই?'

মিসেস্ দাসের ইচ্ছা যে, যাত্রী নিজের মুখেই প্রকাশ করে তার মুখে ও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা কেন? কিন্তু যাত্রী সে ধারও মাড়ালে না, হঠাৎ গলার আওয়াজ বদলে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আমার লগেজ কাল এলেই চলবে! এখন আমি একটু একলা থাকতে চাই।'

—'আমার সঙ্গে গল্প করতে রাজী নয়, এ কি রকম অসভ্য লোক?'

সবিস্ময়ে এই কথা ভাবতে ভাবতে অত্যন্ত অভিমানভরে মিসেস্ দাস সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস্ দাস একেবারে নিচের বৈঠকখানায় গিয়ে ধপাস্ করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন। ঠিক বৈঠকখানার উপরেই ছিল যাত্রীর ঘর। সে যে নিজের মনে ঘরের ভিতরে পায়চারি করছে, তারই আওয়াজ মিসেস্ দাসের কানের ভিতর এসে ঢুকলো।

খানিক পরে মিস্টার দাসের এক বন্ধু সেই বৈঠকখানায় এসে হাজির হলেন। তাঁর নাম রামরতন—কিন্তু সবাই তাঁকে ডাকে রতনবাবু বলে। তিনি মাঝে মাঝে এখানে তাঁর বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে গল্প করতে আসেন এবং সেই সময়ে দু-একখানা 'টোস্ট' ও এক পেয়ালা চা পেলেই খুব খুশি হয়ে সদ্ব্যবহার করে যান। স্বামীর বন্ধুদের জন্যে এরকম বাজে-খরচ হওয়া মিসেস্ দাস মোটেই পছন্দ করেন না। বলেন, 'আমাদের স্বাস্থ্যনিবাস ব্যবসার জায়গা—দাতব্য ভোজনালয় নয়, তুমি তোমার বন্ধুদের সাবধান করে দিও।' মিস্টার দাস তাঁর স্ত্রীর এই হুকুম পালন করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু রতনবাবুর স্বাস্থ্যনিবাসে আনাগোনা বন্ধ হয়নি এবং এখানকার 'টোস্ট' ও চায়ের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র অরুচিও দেখা যায়নি।

রতনবাবুর একটি ঘড়ির দোকান ছিলো। আজ তাঁকে দেখেই মিসেস্ দাসের সেই কথা মনে পড়ে গেলো। যাত্রী যে-ঘরে আছে সেই ঘরের একটা বড়ো-ঘড়ি আজ দু-দিন বন্ধ হয়ে গেছে, কিছুতেই চলছে না। মিসেস্ দাস স্থির করলেন, রতনবাবুকে অনেক চা ও 'টোস্ট' যোগানো হয়েছে, তার বিনিময়ে তাঁকে দিয়ে বিনামূল্যে ঘড়িটাকে আজ আবার সচল করে নিতে পারলে বোকামি করা হবে না।

অতএব মিসেস্ দাস সহাস্যমুখে রতনবাবুকে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'আসুন, আসুন! আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম!'

মিসেস দাস তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবেন ও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন, রতন-বাবুর এমন সৌভাগ্য আর কখনো হয় নি। কাজেই তিনি একবারে আহ্লাদে-আটখানা হয়ে বললেন, 'বলেন কি মিসেস দাস! আমায় কি করতে হবে আজ্ঞে করুন।'

মিসেস্ দাস কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই বললেন, 'ওপরের ঘরের একটা ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে, আপনি সেটা সারিয়ে দিতে পারবেন?'

রতনবাবু মিসেস্ দাসের সাদর অভ্যর্থনা ও মিষ্ট হাসির অর্থ বুঝতে পারলেন। কিন্তু মুখের ভাবে কিছু প্রকাশ না করেই বললেন, 'বেশ তো, এ-আর এমন শক্ত কি? ঘড়িটা কোথায় আছে?'

—'ওপরের ঘরে। আসুন আমার সঙ্গে।' এই বলে মিসেস্ দাস চেয়ার ছেড়ে উঠে রতন-বাবুকে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস্ দাস উপরে উঠে দেখলেন, যাত্রীর ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘরের ঘড়িটা মেরামত করতে হবে। একবার ভেতরে যেতে পারি কি?'

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো—'আসুন'।

রতনবাবুকে নিয়ে মিসেস্ দাস ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

ঘরের কোণের চেয়ারে দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে যাত্রী হেঁটমুখে বসেছিল। সন্ধ্যা তখন আসন্ন। মিসেস্ দাস আলো জ্বালাবার চেষ্টা করতেই যাত্রী বলে উঠলো, 'থাক্। এখনি আলো জ্বালতে হবে না...হ্যাঁ, ভালো কথা! আমার লগেজগুলো কাল সকালে পাবো কি?'

মিসেস্ দাস বললেন, 'হ্যাঁ, তা বোধহয় পাবেন। আপনার লগেজগুলো কিসের?'

—'তার ভেতরে রাসায়নিক যন্ত্র আর অনেক রকম ওষুধের শিশি-বোতল আছে। শ্রীপুর নির্জন বলেই আমি এখানে এসেছি। নির্জনে আমি রাসায়নিক পরীক্ষা করতে চাই। কোনরকম গোলমালই আমি সহ্য করবো না।'

মিসেস্ দাসের কৌতূহল আবার জেগে উঠলো। তিনি তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, 'আপনি কি ডাক্তারী করেন?'

যাত্রী সে-কথার জবাব না দিয়ে আপন মনেই বললে, 'আমি নির্জনে থাকতে ভালোবাসি। আমার চোখ এতো খারাপ যে মোটেই আলো সইতে পারি না। সময়ে সময়ে আমাকে ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে রাখতে হয়। অনেক সময় আমি আবার অন্ধকারেই থাকি। এ-কথা-গুলি দয়া করে মনে রাখবেন!'

মিসেস্ দাস বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দেবেন কি—'

যাত্রী বাধা দিয়ে বললে, 'এখন আপনারা এ-ঘরে যা করতে এসেছেন, করুন'—বলেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

মিসেস্ দাস আর সেখানে দাঁড়ালেন না—রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রতনবাবু একখানা টুলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালঘড়ির ডালা খুলে তার ভিতরটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ একবার মুখ তুলে দেখলেন, যাত্রী তার নীল-রঙা ঠুলি-চশমার ভিতর দিয়ে একদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দু-টো দেখা যাচ্ছিলো না বটে, কিন্তু রতনবাবুর মনে হলো যেন দু-দুটো অন্ধকারের গর্ত কট্‌মট্ করে তাঁকে নিরীক্ষণ করছে! তাঁর বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো! সে ভাবটা সামলে নেবার জন্যে রতনবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'দেখছেন মশাই, আজকে আকাশের অবস্থাটা মোটেই ভালো নয়!'

যাত্রীর মূর্তি একটুও নড়লো না কিন্তু সে কর্কশ স্বরে বলে উঠলো, 'একটা ঘড়ি ঠিক করতে কতক্ষণ লাগে? তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সরে পড়ুন না!'

রতনবাবু অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ! এই, আর এক মিনিটেই হয়ে যাবে!' তারপর মুখ বুজে চট্‌পট্ মেরামতি কাজ সেরে তিনি সে-ঘর থেকে অপরাধীর মতো সুড়্‌সুড়্ করে বেরিয়ে গেলেন।

স্বাস্থ্যনিবাস থেকে বাইরে বেরিয়ে রতনবাবু নিজের বাসার দিকে অগ্রসর হলেন। খানিক পরেই মিস্টার দাসের সঙ্গে দেখা।

তাঁকে দেখেই মিস্টার দাস বলে উঠলেন, 'আরে, আরে, রতন যে! খবর কি?'

রতনবাবু মুখ ভার করে বললেন, 'দাস, খবর বড়ো ভালো নয়!'

—'কেন?'

—'তোমার বাড়িতে একটা খুনে কি ডাকাত এসে আড্ডা জমিয়েছে!'

মিস্টার দাস চমকে উঠে বললেন, 'কি বলচো হে?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফেরার আসামী! দেখছি স্বাস্থ্যনিবাস এবার পুলিশের জিম্মায় যাবে!'

মিস্টার দাস বলিলেন, 'বটে বটে, তাই নাকি? আচ্ছা, এখনি গিয়ে আমি ব্যবস্থা করছি।' এই বলে দ্রুতপদে বাড়িমুখো হলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরে তিনি একটি টুঁ শব্দ করবার আগেই মিসেস্ দাসই তাঁকে সচিৎকারে আক্রমণ করলেন! বললেন, 'তোমার মতো মানুষের হাতে পড়ে হাড় আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেলো! আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর উনি বেড়াচ্ছেন ফূর্তি করে! বাড়ি থেকে কখন্ বেরিয়েছিলে বলো দিকি?'

মিস্টার দাস আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, 'একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে আমাকে আর ভয় দেখিও না গো! আমি তো তোমার কাজেই বাইরে গিয়েছিলুম।'

মিসেস্ দাস একটু নরম হয়ে বললেন, 'এখানে একজন নতুন লোক এসেছে, আর তুমি রইলে বাইরে! ফরমাস কে খাটে বলো দিকি?'

মিস্টার দাস বললেন, 'নতুন লোক? কে নতুন লোক? শুনলুম তাকে নাকি চোর-ডাকাত-খুনের মতো দেখতে?'

মিসেস্ দাস তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'সে তো আমাদের জামাই নয়! সে ভালো কি মন্দ দেখতে—তা নিয়ে আমাদের কি?'

মিস্টার দাস বললেন, 'না তা নিয়ে আমাদের দরকার নেই বটে, কিন্তু তাকে পুলিশের দরকার হতে পারে।'

মিসেস্ দাস রাশভারি চালে বললেন, 'থামো, থামো! তোমাকে আর বেশি বাজে বকতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও!'

মিস্টার দাসের আর কিছু বলবার সাহস হলো না। তিনি মনে মনে এই ভাবতে ভাবতে অন্য-দিকে চলে গেলেন, 'মেয়েরা চিরকালই এমনি বোকা হয়! বিপদে না পড়লে তারা বিপদকে বিপদ বলে বুঝতেই পারে না।'

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা জীব

পরের দিন সকাল বেলায় যাত্রীর লগেজগুলো এসে হাজির হলো।

গাড়ি থেকে লগেজগুলো যখন নিচে নামানো হচ্ছিল, যাত্রীও তখন সেখানে এসে ব্যস্ত হয়ে তদ্বির করতে লাগলো। লগেজের মধ্যে ছিলো গোটা-দুয়েক বড়ো বড়ো পোর্টম্যান্টো, দু-বাক্স ভর্তি মোটা মোটা বই, আর অনেকগুলো শিশি-বোতল—তাদের ভিতরে টস্ টস্ করছে নানান রঙের ওষুধের মতো তরল জিনিস।

মিস্টার দাসের একটা কুকুর ছিলো, তার নাম হচ্ছে ডগি। যাত্রী তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু সে যাত্রীকে দেখতে পেল। দেখে সে আর বেশি কিছু করলে না, দৌড়ে এসে কেবল যাত্রীর পায়ের উপরে দিলে দাঁত খিঁচিয়ে এক কামড়। মিস্টার দাস তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ডগিকে এক লাথি মেরে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিলেন। ডগি কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে সরে পড়লো। যাত্রীর কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গিয়েছিল, সেও তাড়াতাড়ি বাড়ির উপরে উঠে গেলো।

মিসেস্ দাস বললেন, 'যেমন মনিব তার তেমনি কুকুর! তোমার কুকুর যদি অতিথিদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে তাহলে শীগগিরই আমাদের স্বাস্থ্যনিবাস তুলে দিতে হবে!'

মিস্টার দাস বললেন, 'সত্যি, ডগির অপরাধ আমি স্বীকার করছি! ভদ্রলোকের কি হলো আমি এখুনি গিয়ে দেখে আসছি।'

তিনি সিধে উপরে গিয়ে উঠলেন। যাত্রীর ঘরের দরজা খোলাই ছিলো, চৌকাঠ পার হয়ে তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের জানলাগুলো আগেকার মতোই বন্ধ ছিল। ভিতরের আধা-অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু মিস্টার দাস যেন কি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলেন। যেন ছায়া-ছায়া কি একটা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে, যেন একখানা বাহুহীন হস্ত শূন্যে ভাসতে ভাসতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে! তারপর কী যে হলো স্পষ্ট বোঝা গেল না, কিন্তু কে যেন এক ধাক্কা মেরে তাঁকে ঘরের বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে! সঙ্গে সঙ্গে দুম্ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো ও খিল দেওয়ার শব্দ হলো! ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটলো যে মিস্টার দাস কিছুই

আন্দাজ করতে পারলেন না। ছায়াময় ঘর, অস্পষ্ট একটা আকারের আভাস ও বিষম এক ধাক্কা! অত্যন্ত অবাক হয়ে মিস্টার দাস ভাবতে লাগলেন, তিনি স্বচক্ষে যা দেখলেন সেটা হচ্ছে কী?

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, মিস্টার দাস চিন্তিতমুখে নিচে নেমে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে তখন স্বাস্থ্যনিবাসের ভাড়াটে বাসিন্দাদের জটলা শুরু হয়ে গেছে। এবং মিসেস্ দাস সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন—'পৃথিবীতে যতো রকমের জীব আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা জীব হচ্ছে কুকুর। আর পৃথিবীতে যত রকমের কুকুর আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা কুকুর হচ্ছে ডগি। স্বাস্থ্যনিবাসের অতিথিদের ওপরে ডগির কোনই দরদ নেই। ভদ্রলোককে সে আজ কামড়ে দিয়েছে! না জানি এখন তাঁর কতই কষ্ট হচ্ছে!'

মিস্টার দাস বললেন, 'তোমার অতিথির জন্যে তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না! বোধহয় তাঁর বিশেষ কিছুই হয়নি। তার চেয়ে লগেজগুলো ঘরের ভেতরে আনাবার ব্যবস্থা করো।'

পিছন থেকে গলার আওয়াজ এলো, 'না, না—আমার কিছুই হয়নি! লগেজগুলো তাড়াতাড়ি আমার ঘরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন।'

সকলে ফিরে দেখলে জামা-কাপড় বদলে যাত্রী আবার নিচে নেমে এসেছে। লগেজগুলো যেই ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো অমনি যাত্রীর আর তর্ সইলো না। তখনি ব্যস্তভাবে সে পোর্টম্যান্টো ও বাক্সগুলো খুলে ফেললে। তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো মোটা বোতল, বেঁটে বোতল, ঢ্যাঙা বোতল, কোনটার রং নীল, কোনটার লাল, কোনটার বা সবুজ, অনেকগুলোর গায়ে বড়ো বড়ো হরফে 'বিষ' বলে লেখা রয়েছে। পাতলা পুরু লম্বা ছোট কতো রকমের বই! টেবিলের উপরে ঐ-সব শিশি-বোতল সাজিয়ে নিয়ে, সামনের চেয়ারে বসে যাত্রী এক মনে কি কাজ করতে লাগলো।

দুপুর বেলায় মিসেস্ দাস যখন উপরে এলেন, তখন ঘরের চেহারা দেখেই তাঁর চক্ষুস্থির! প্যাকিংয়ের চটে, খড়ের টুকরোয় ও দড়িদড়ায় তাঁর ঘরের মেঝে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনি তখনি সেই জঞ্জালগুলোকে নিজের হাতে ঘরের ভিতর থেকে বিদায় করে দিতে লাগলেন। যাত্রী তখন এমন এক মনে কাজ করছিলো যে মিসেস্ দাসের অস্তিত্ব টেরই পেলে না।

মিসেস্ দাস ঘর পরিষ্কার করে বললেন, 'আপনি চারদিক এমন নোংরা করে রাখবেন না। তাহলে স্বাস্থ্যনিবাসের বদনাম হবে।'

যাত্রী চমকে ফিরে তাকালে। তখন সে চোখ থেকে চশমা খুলে রেখেছিলো। মিসেস্ দাসের মনে হলো তার চোখের কোটরে যেন চোখ দুটো নেই, খালি দু-টো গর্ত। মিসেস্ দাস ভাবলেন তাঁরই দেখবার ভুল। যাত্রী তখনি চশমাখানা আবার পরে নিলে।

তারপর বললে, 'আপনি সাড়া না দিয়ে ঘরের ভিতরে এলেন কেন?'

মিসেস্ দাস বললেন, 'আমি সাড়া দিয়েছিলুম, আপনি শুনতে পান্নি—'

যাত্রী বাধা দিয়ে বললে, 'হতে পারে, কিন্তু সামান্য একটু শব্দেই আমার কাজের বড়ো ক্ষতি হয়।'

মিসেস্ দাস বললেন, 'তাহলে আপনি তো এক কাজ করতে পারেন! এবার থেকে আপনি যখন কাজ করবেন, ঘরের দরজায় ভেতর থেকে খিল দিয়ে রাখবেন।'

—'এ খুব সঙ্গত কথা।'

—'কিন্তু মশাই, এই খড়গুলো—'

যাত্রী আবার বাধা দিয়ে বললে, 'ঘরের ভেতরে খড়কুটো পড়লে তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। যদি কিছু লোকসান হয়, আপনি আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবেন।'

মিসেস্ দাস কেবল বুদ্ধিমান স্ত্রীলোক নন, তাঁকে নাছোড়বান্দাও বলা যেতে পারে। তিনি বললেন, 'কিন্তু আজ এই যে আপনি আমার ঘরদোর নোংরা করেছেন—'

যাত্রী বললে, 'তার জন্যে আমার পাঁচ টাকা জরিমানা হলো। ব্যস্, এখন আর কোনো কথা নয়।'

মিসেস্ দাস খুব খুশিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাত্রীর কর্কশ কথা ও ব্যবহারের জন্যে এখন আর তাঁর মনের উপরে কোন দাগই পড়লো না, কারণ এমন পাঁচ টাকা জরিমানা পেলে মনের সব ময়লাই ধুয়ে যায়।

এরই খানিকক্ষণ পরে মিসেস্ দাস যখন আবার যাত্রীর ঘরের সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বন্ধ-দ্বারের ওপার থেকে হঠাৎ একটা ঝন্‌ঝনানির আওয়াজ তাঁর কানে গিয়ে ঢুকল। কে যেন শিশি বোতল-সাজানো টেবিলের উপরে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে! তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তারপরেই যাত্রীর গলার আওয়াজ শুনলেন—'আমি আর পারছি না, আমি আর পারছি না।—এর জন্যে আমার সারা জীবনই কেটে যাবে! অস্থির হবো না? অস্থির না হয়ে আর উপায় কি? হা-রে নির্বোধ!'

হাত নেই—হাতা

শ্রীপুরের স্বাস্থ্যনিবাসে যাত্রীর দিন একইভাবে কাটতে লাগলো।

শ্রীপুরের ঘরে ঘরে কিন্তু গুজবের অন্ত নেই। যাত্রীর সেই আপাদমস্তক ঢাকা ব্যান্ডেজ-করা কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি দেখলেই শ্রীপুরের পথ থেকে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা "ভূত! ভূত!" বলে চীৎকার করে ছুটে পালিয়ে যায়! পথের উপরে রাত্রিকালে যাত্রীর মূর্তি দেখলে ছেলেমেয়েদের বাপেদেরও গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে। যাত্রী কারুর সঙ্গে মেশে না, তার পরিচয়ও কেউ জানে না, এত ঠাঁই থাকতে কেন যে সে শ্রীপুরে এসে আবির্ভূত হয়েছে, সে রহস্যও কেউ বুঝতে পারে না। শ্রীপুরের পাড়ায় পাড়ায় যাত্রীর কথা নিয়ে উত্তেজনার অন্ত নেই!

রতনবাবুর আগেকার মত তো আমরা আগেই জানতে পেরেছি। আগে তিনি যাত্রীকে খুনি ও ডাকাত বলেই প্রচার করতেন। এখন তাঁর মতে, যাত্রী হচ্ছে 'সর্বনেশে স্বদেশী বোমাওয়ালা!'

যাত্রী সারাদিন বন্ধ-দরজার আড়ালে বসে তার শিশি-বোতল আর বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই নিজের সঙ্গে কথা-

বার্তা কয় এবং যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসে, তখন আগাপাশতলা জামা-কাপড়ে মুড়ে শ্রীপুরের নির্জন পথে একলাটি বেড়াতে বেরোয়।

কেউ কেউ মিসেস্ দাসকে জিজ্ঞাসা করে, 'যাত্রীর নাম কি?'

মিসেস্ দাস জবাব দেন, 'তিনি আমাকে বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি!'—কিন্তু কথাটা সত্য নয়। নিজের মুখ ও যাত্রীর সুনাম রক্ষা করবার জন্যেই মিসেস্ দাস ও-রকম বাজে কথা বলতে বাধ্য হন। যাত্রীর ব্যবহার খুব ভদ্র ও গলার আওয়াজ খুব মিষ্ট না হলেও "স্বাস্থ্যনিবাস"-এর বিলের টাকা কোনোদিনই সে বাকি রাখেনি এবং মিসেস্ দাসকে মাঝে মাঝে জরিমানার টাকা দিতেও কোনোদিন সে আপত্তি করেনি। মিসেস্ দাসের মতে এমন প্রথমশ্রেণীর অতিথি জীবনে একবার মাত্রই পাওয়া যায়।

মিস্টার দাস এ-কথা মানতেন না। যাত্রীকে তাঁর মনে ধরেনি। রতনবাবুর মতো তিনিও যাত্রীকে মনে মনে সন্দেহ করতেন।

কিন্তু মিসেস্ দাসের সামনে এ-সন্দেহ প্রকাশ করলেই ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠতো। তিনি ঘন-ঘন হাত-মুখ নেড়ে বলতেন, 'আহা, কোন্ দৈব-দুর্ঘটনায় বেচারীর মুখে চোট লেগেছে

তাই সে ব্যান্ডেজ বেঁধে থাকে! স্বাস্থ্যনিবাসে সে সারতে এসেছে! চোর-ডাকাত হলে সে কখনো বিলের টাকা এমন করে শোধ করতো?'

শান্তিভঙ্গের ভয়ে মিস্টার দাস আর কিছুই বলতেন না।

শ্রীপুরে এক সরকারী ডাক্তার ছিলেন, তাঁর নাম মানিকবাবু। নানান্ লোকের মুখে নানান্ কথা শুনে একটা বাজে ওজর নিয়ে মানিকবাবু একদিন যাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

মানিকবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, ইজিচেয়ারের উপরে একখানা বই নিয়ে ব্যাণ্ডেজ-করা মুখে এক ব্যক্তি শুয়ে আছে।

তাঁকে দেখেই লোকটা উঠে বসে গম্ভীর স্বরে বললে, 'এখানে আপনার কি দরকার?'

মানিকবাবু বললেন, 'মশাই, আমি সরকারী হাসপাতালের জন্যে চাঁদা আদায় করতে এসেছি।'

যাত্রী ফ্যাঁচ্ করে হেঁচে ফেলে বললে, 'বটে!'

মানিকবাবু শুধোলেন, 'কিছু দেবেন কি?'

যাত্রী আবার হেঁচে বললে, 'সে কথা পরে ভাবা যাবে।' তারপর আবার হাঁচলে।

মানিকবাবু বললেন, 'অতো হাঁচছেন কেন? সর্দি হয়েছে নাকি?'

যাত্রী বললে, 'হ্যাঁ।'

মানিকবাবু বললেন, 'আমি ডাক্তার। সর্দির একটা ওষুধ লিখে দেবো?'

যাত্রী আবার নিজের কেতাবের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেটা আপনার ইচ্ছে!'

মানিকবাবু নিজের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল বার করে কি একটা ওষুধের নাম লিখলেন। তারপর সেই কাগজের টুকরোটা যাত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন।'

আলোয়ানের ভিতর থেকে জামার একটা হাতা বেরুলো! কেবল জামার হাতা—মানুষের হাতের কোনোই চিহ্ন নেই! অথচ সেই হস্তহীন জামার হাতা ঠিক স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে এসে মানিকবাবুর হাত থেকে কাগজের টুকরোটা গ্রহণ করলে! ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে তাঁর দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠলো! এবং মানিকবাবুর মুখ-চোখের ভাব দেখেই যাত্রী জামার হাতাটা সাঁৎ করে আবার আলোয়ানের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললে!

সেই কন্‌কনে শীতেও মানিকবাবুর কপালে ঘামের ফোঁটা ফুটে উঠলো। অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'আপনার কি হাত কাটা গেছে? কিন্তু কাটা হাতে আপনি আমার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিলেন কেমন করে?'

—'তাই নাকি?' বলেই যাত্রী সিধে হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মানিকবাবু দু পা পিছিয়ে এসে বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার হাত নেই, খালি জামার হাতা আছে!'

যাত্রী দু-পা এগিয়ে এসে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'আমার হাত নেই—খালি জামার হাতা আছে! বটে?'—আলোয়ানের ভিতর থেকে আবার হস্তহীন জামার হাতা বেরুলো—হাতটা একেবারে মানিকবাবুর মুখের সামনে এসে হাজির হলো—তারপর কে যেন দুটো অদৃশ্য আঙ্গুল দিয়ে তাঁর নাকটা খুব জোরে মলে দিলে!

এর পরেও কোনো ভদ্রলোকেরই সে-ঘরে থাকা উচিত নয়! মানিকবাবু তিন লাফে দরজা পেরিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়লেন। তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলেন, ঘরের ভিতর থেকে যাত্রী অট্টহাস্য করে উঠলো।

স্বাস্থ্যনিবাসের বৈঠকখানায় বসে মিস্টার দাস তখন মিসেস্ দাসের সঙ্গে তর্ক করছিলেন। হঠাৎ মড়ার মতো সাদা মুখ নিয়ে মানিকবাবুকে সেখানে আসতে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি হয়েছে মানিকবাবু, অতো ছুটে আসছেন কেন? ডগি তাড়া করেছে বুঝি?'

মানিকবাবু ছুটে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে ধপাস্ করে বসে পড়ে বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মিস্টার দাস! ওঃ, হাত নেই—খালি জামার হাতা!'

মিস্টার দাস সবিস্ময়ে বললেন, 'কি বলছেন, ডাক্তারবাবু? হাত-নেই—জামার হাতা?'

মানিকবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! হাত নেই—জামার হাতা! ওপরের ঘরের সেই ভুতুড়ে লোকটার হাত নেই—খালি জামার হাতা আছে! জামার হাতা দিয়ে সে আমার নাক মলে দিলে!' বলেই তিনি দুই চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ডাক্তারের বাড়িতে চুরি

সরকারী হাসপাতালের এক অংশে সরকারী ডাক্তার মানিকবাবু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতেন।

হস্তহীন জামার হাতা দেখে মানিকবাবুর শরীরটা আজ বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছিলো। মিস্টার ও মিসেস্ দাস ও নিজের স্ত্রী বিমলার কাছে বারবার তিনি এই গল্প বলেছেন কিন্তু তাঁর কথায় ওঁরা কেউই বিশ্বাস করতে রাজী হননি। তাঁদের সকলেরই মত হচ্ছে, জামার হাতাটা হয়তো বেশি লম্বা ছিলো বলেই হাতখানা তিনি দেখতে পাননি। শেষটা মানিকবাবু নিজেও মনে করলেন, হয়তো সেই কথাই ঠিক হবে, তাঁরই চোখের ভুল।

অনেক রাতে মানিকবাবুর ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেলো। ঘুম ভাঙতেই তিনি শুনলেন তাঁর স্ত্রী বিমলা তাঁকে ধাক্কা মারতে মারতে বলছেন, 'ওগো ওঠো!—শীগগির ওঠো!'

মানিকবাবু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, 'কি গো, কি হয়েছে?'

—'চোর, চোর! বাড়িতে চোর এসেছে!'

চোর নামে কি যাদু আছে! এক পলকে মানিকবাবুর সব জড়তা কেটে গেলো, এক লাফে ঘরের কোণে গিয়ে একগাছা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে, মাথার উপরে বনাম্ করে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি বললেন, 'কোথায় সেই বদ্‌মাইস? দেখিয়ে দাও আমাকে!'

স্বামীর বীরত্ব দেখে বিমলা আশ্বস্ত হলেন না, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আপাতত তোমার লাঠি ঘোরানো থামাও। চোর এ-ঘরে নেই।'

মানিকবাবু স্ত্রীর কথামতো কাজ করে বললেন, 'তবে সে হতভাগা কোথায়?'

বিমলা বললেন, 'পাশের ঘরে। চুপিচুপি আমার সঙ্গে এসো, নইলে তাকে ধরতে পারবে না।'

দু-জনে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েই শুনলেন, অন্ধকারে ফ্যাঁচ করে কে হেঁচে ফেললে। তারপরেই সুইচ টিপে কে আলো জ্বাললে। তারপরেই শোনা গেলো কে যেন দেরাজের দরজাটা টেনে খুলে ফেললো।

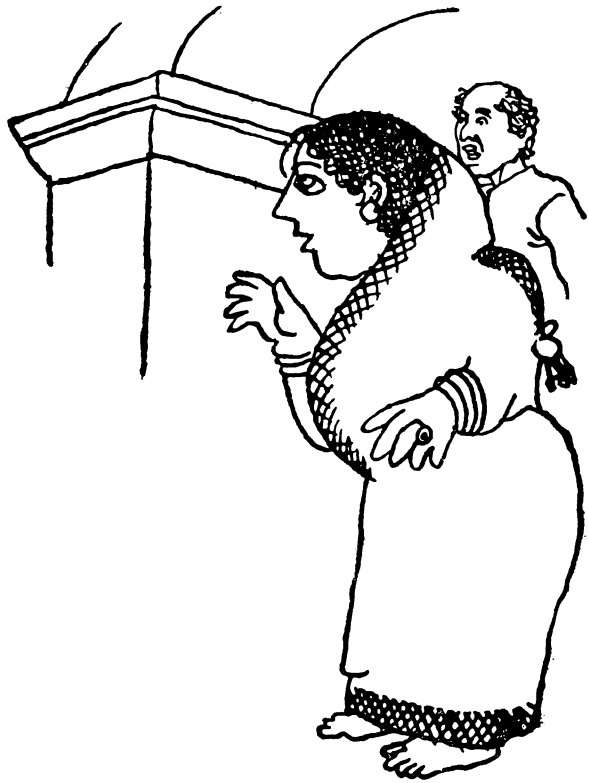

মানিকবাবু একেই তো চোর-টোর পছন্দ করতেন না, তার উপরে যখন তাঁর মনে পড়লো দেরাজের ভিতরে আজ সকালেই তিনি পঁয়ত্রিশখানা দশ টাকার নোট রেখে দিয়েছেন, তখন আর কিছুতেই তিনি শান্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। 'কে রে, কে রে' বলে বিকট স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এবং লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে মহাবেগে তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন!

বিমলাও ঘরে ঢুকে বললেন, 'ওগো থামো—থামো!'

কিন্তু মানিকবাবু থামলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহেই লাঠি ঘোরাতে লাগলেন।

বিমলা আবার বললেন, 'ওগো মহাবীর, আর লাঠি ঘুরিয়ে কাজ নেই! চোর পালিয়েছে!'

লাঠি ঘোরানো থামিয়ে মানিকবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'পালিয়েছে! কোন্ দিক দিয়ে পালালো?'

বিমলা বললেন, 'জানি না।'

মানিকবাবু অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, সত্যই ঘরের মধ্যে কেউ নেই! এ ঘরের দরজা তো মোটে একটি, আর তার সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা দু'জনে। তবে চোর পালালো কোন্ দিক দিয়ে?

মানিকবাব বললেন, 'কিন্তু তখন ঘরের ভেতরে হাঁচলে কে?'

বিমলা বললে, 'আর ঘরের ভেতরে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে কে?'

মানিকবাবু বললেন, 'আর দেরাজটাই বা খুললো কে?'

বিমলা দেরাজের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন, 'আর তোমার দেরাজের ভেতর থেকে সাড়ে তিনশো টাকাই বা গেলো কোথায়?'

এ-সব কথার উত্তর কেউ দিলো না বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরেই কে আবার ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে।

মানিকবাবু ও বিমলা ভয়ানক চমকে উঠলেন।

তারপরেই তাঁরা হতভম্ব হয়ে দেখলেন, ঘরের দরজাটা আপনা-আপনি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেলো—ও সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো বাহির থেকে দরজায় কে শিকল তুলে দিলে।

বিমলা দৌড়ে গিয়ে দরজাটা টেনে বললেন, 'দরজা কে বন্ধ করে দিয়ে গেছে!'

মানিকবাবুর হাত থেকে প্রথমে লাঠি খসে পড়লো তারপর তিনি নিজেও কাঁপতে কাঁপতে মাটির উপরে বসে পড়লেন এবং তারপর কপালে দুই চোখ তুলে তিনি বললেন, 'গিন্নী! হাত নেই—খালি জামার হাতা! মানুষ নেই—তবু হাঁচি! চোর নেই—তবু টাকা লোপাট্! গিন্নী, আমাকে তুমি ধরো—আমার ঘাড়ে আজ ভূতে ভর করেছে!' বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

বিমলা স্বামীর কাছে গিয়ে বসে পড়তে পড়তে শুনতে পেলেন ঘরের বাইরে কে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো।

টেবিল-চেয়ারের নাচ

যে-সময়ে মানিকবাবু চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, ঠিক সেই সময়ে স্বাস্থ্যনিবাসে আর এক দৃশ্যের অবতারণা হলো।

মিসেস দাসের শরীর অনেক রাত্রে হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়াতে মিস্টার দাস একটা ওষুধের খোঁজে বৈঠকখানার দিকে গেলেন।

যাত্রীর ঘরের সুমুখ দিয়ে যাবার সময় মিস্টার দাস অবাক হয়ে দেখলেন, সে-ঘরের দরজা খোলা রয়েছে।

তাঁর কেমন সন্দেহ হলো। দরজার পাশেই আলোর সুইচটা ছিলো, আলো জ্বেলে দেখলেন ঘরের ভিতরে যাত্রী নেই। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত তখন তিনটে। এতো রাত্রে যাত্রী কোথায় গেলো? ভাবতে ভাবতে তিনি নেমে গিয়ে বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকলেন। তারপর

ওষুধের শিশিটা নিয়ে ফিরে আসবার সময়ে তাঁর চোখ পড়লো সদর দরজার উপরে। স
দরজার ভিতর দিকের খিল খোলা! মিস্টার দাসের বেশ মনে পড়লো, তিনি নিজের হাতে
লাগিয়ে দিয়ে গেছেন।

কিছুই আর বুঝতে বাকি রইলো না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মিসেস্ দাস
ডেকে তিনি বললেন, 'ওগো, শুনচো? ব্যাপার গুরুতর।'

মিসেস্ দাস তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললেন, 'তার মানে।'

—'রতনবাবুর কথাই ঠিক। আমাদের এই নূতন ভাড়াটেটা হয় খুনী, নয় ডাকাত, নয় স্বদে
বোমাওয়ালা।'

মিসেস্ দাস এবারে দাঁড়িয়ে উঠে আবার বললেন, 'তার মানে!'

—'সে লোকটা ঘরে নেই। সদর দরজা খোলা। এই নিশুত রাতে বাড়ির বাইরে সে
করতে গেছে?'

মিসেস্ দাস হাত-মুখ নেড়ে বললেন, 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

—'তাহলে নিজের চোখে দেখবে এসো।'

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুনলেন, সদর দরজা খোলার ও বন্ধ ক
শব্দ। দুজনেই বিস্মিত হয়ে দুজনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন—কেউ
বললেন না।

দুজনে যখন সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ ফ্যাঁচ্ করে হাঁচির শব্দ হলো।

মিস্টার দাস ভাবলেন, তাঁর স্ত্রী বোধহয় হেঁচে ফেললেন। মিসেস্ দাসের ধারণা হলো ঠিক উল্টো—এ হাঁচি নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীর!

মিসেস্ দাস যখন যাত্রীর ঘরের কাছে এসেছেন, তখন ঠিক তাঁর কাঁধের উপরে আবার কে হেঁচে দিলে। এবারে চমকে মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখলেন, মিস্টার দাস তাঁর কাছ থেকে প্রায় দশ-বারো হাত তফাতে আছেন। অথচ হাঁচির শব্দ হলো ঠিক তাঁর কানের কাছেই। মিসেস্ দাস অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না!

দুজনে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। যাত্রীর জুতো, জামা, কাপড়, আলোয়ান ও সেই বিশ্রী ব্যান্ডেজগুলো ঘরের মেঝেয়, টেবিলের ও বিছানার উপরে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে!

আচম্বিতে তাঁরা স্তম্ভিতচক্ষে দেখলেন, জুতোজোড়া প্রথমে সজীব হয়ে নড়ে উঠলো, তারপর গট্‌গট্ করে বিছানার কাছে গিয়ে থেমে পড়লো!

মিসেস্ দাস হতভম্বের মতো দুই চোখ দু-হাতে রগ্‌ড়ে আবার ভালো করে চাইতেই দেখলেন, যাত্রীর ঠুলি-চশমাখানা শূন্যে স্থির হয়ে তাঁর দিকেই যেন কট্‌মট্ করে চেয়ে আছে!

তারপরেই ঘরের টেবিলটা হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে হড়াৎ করে এগিয়ে এসে মিস্টার দাসকে মারলে এক বিষম ধাক্কা।

তারপরেই চেয়ারখানা হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠলো এবং বেগে মিসেস্ দাসের দিকে তেড়ে এলো।—কিন্তু মিসেস্ দাস চেয়ারের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন না, তীরের মতো ছুটে ঘরের ভিতর থেকে পালিয়ে গেলেন! তাঁর স্ত্রী যে এমন বেগে ছুটতে পারেন, মিস্টার দাস এতোদিনেও তা জানতে পারেননি। বলা বাহুল্য তিনিও আর সে-ঘরে রইলেন না।

মিসেস্ দাস নিজের ঘরের সুমুখে গিয়ে মাটির উপরে ধড়াস্ করে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং সে-অবস্থায় যেমন করে চ্যাঁচানো উচিত, ঠিক তেমনি করেই চ্যাঁচাতে কিছুমাত্র কসুর করলেন না।

সে-রাত্রে সমস্ত স্বাস্থ্যনিবাসের ঘুম ভেঙে গেলো। সকলেই ঘটনাস্থলে ছুটে এলো। জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—কি হয়েছে? আগুন লেগেছে? ডাকাত পড়েছে নাকি? প্রভৃতি।

মিসেস্ দাস হাপুস চোখে কাঁদতে কাঁদতে হাত নেড়ে নেড়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বললেন, 'হায়, হায়, হায়! ও চেয়ার যে আমার বাবার দেওয়া গো! অমন পুরনো আর বিশ্বাসী চেয়ার কিনা আজ আমাকেই তেড়ে এলো? ওগো, আমাদের ঐ ব্যান্ডেজ-বাঁধা নতুন ভাড়াটেটা ভূতের সর্দার! তার মন্ত্রে আমার পুরনো টেবিল-চেয়ারের ঘাড়ে ভূত চেপেছে! সারা ঘর জুড়ে টেবিল আর চেয়ার নাচ আরম্ভ করেছে! আমি কেতাবে পড়েছি, ভূতে পেলেই টেবিল-চেয়ার জ্যান্ত হয়ে নাচতে থাকে।'

মিস্টার দাস বললেন, 'হ্যাঁ, কেতাবে আমিও টেবিল-চেয়ার জ্যান্ত হওয়ার কথা পড়েছি বটে! কিন্তু খালি জুতো যে জ্যান্ত হয়ে নিজেই হাঁটাহাঁটি শুরু করে, কেতাবে এমন কথা তো কখনো পড়িনি!'

মিসেস্ দাস বললেন, 'আর সেই চশমাখানা? সেখানাও তো ঘরময় পাখির মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল! মাগো মা, এমন অনাসৃষ্টি কেউ কখনো দেখেছে না শুনেছে?'

সকলে মিলে দাঁড়িয়ে গোলমাল করছে, এমন সময় যাত্রী উপর থেকে নেমে সেইখানে এসে দাঁড়ালো। কর্কশ স্বরে বললে, 'এতো গোলযোগ কিসের শুনি? রাতটা সৃষ্টি হয়েছে ঘুমোবার জন্যে, চিৎকার করবার জন্যে নয়। এ-সব আমি সহ্য করবো না।' এই বলে সে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো।

সকলে সভয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো—এমন কি মিসেস্ দাস পর্যন্ত আর উচ্চৈঃস্বরে নিজের মতামত প্রকাশ করতে সাহস করলেন না।

যাত্রীর ছদ্মবেশ ত্যাগ

পরদিন শ্রীপুর শহরে ছিলো চড়কের উৎসব। রাজপথে আশেপাশে খোলা জমির উপরে মেলা বসেছে—নানা জায়গা থেকে নানা দোকানীপসারী নানান রকম রঙচঙে লোভনীয় জিনিস এনে সাজিয়ে রেখেছে। নাগরদোলায় চড়ে কোথাও ছেলেমেয়ের দল হাসিখুশির গোলমাল করছে, কোথাও বায়স্কোপের তাঁবু খাটানো হয়েছে এবং কোথাও বা ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য।

এদিকে স্বাস্থ্যনিবাসের বৈঠকখানায় তখনো সবাই মিলে ঘোঁট পাকিয়ে তুলছে। মিস্টার দাস এ-সব আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট না করে থানায় খবর দিতে বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরে উপরতলা থেকে কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ এলো—'মিসেস্ দাস, মিসেস্ দাস!'

সে-ডাক বৈঠকখানায় মিসেস্ দাসের কানে গেলো বটে, কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো না যে, তিনি কিছু শুনতে পেয়েছেন।

খানিক পরে যাত্রী আবার ক্রুদ্ধস্বরে হাঁকলে—'মিসেস্ দাস! শীগগির আমার খাবার পাঠিয়ে দিন!'

মিসেস্ দাস তবু কোন রকম ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন না,—এক মনে তাঁর ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে চেয়ার-টেবিলের অদ্ভুত নৃত্য-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

খানিক পরে যাত্রী নিজেই নিচে নেমে এলো। মিসেস্ দাসের সামনে এসে একটা গোল-টেবিলের উপরে সজোরে করাঘাত করে বললে, 'মিসেস্ দাস! আপনি কি মনে করেন, আমি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে স্বাস্থ্যনিবাসে এসেছি?'

এইবার মিসেস্ দাসের মুখ ফুটলো। তিনিও টেবিলের উপরে সমান জোরে চড় মেরে বলে উঠলেন, 'আপনি কি মনে করেন, ভূত নাচাবার জন্য আপনাকে আমি ঘর ছেড়ে দিয়েছি?'

যাত্রী বললে, 'আপনার কথার অর্থ কি?'

মিসেস্ দাস বললেন, 'আপনার জন্যে আমার বিশ্বাসী টেবিল-চেয়ার পর্যন্ত আমাকে আর গিন্নী বলে মানে না! নাচাবার জন্যে টেবিল-চেয়ার তৈরি করা হয়নি! কে ওদের এমন নাচতে শেখালে? কে—আপনি? আপনার নাম কি? আমার ঘরে বসে আপনি কি করেন? কাল অতো রাত্রে বাইরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আর ফিরে এলেনই বা কেমন করে?'

বিষম রাগে যাত্রীর দেহ থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ ভীষণ চিৎকার করে সে বলে উঠলো, 'চুপ করো! কে আমি? তোমরা জানতে চাও? তোমরা দেখতে চাও? দেখো তবে!'—

বলেই সে তার মুখের ব্যান্ডেজে মারলে এক টান। ব্যান্ডেজ, ঠুলিচশমা, নকল গোঁপ-দাড়ি আর তার নকল নাক সকলের চোখের সামনে খসে পড়লো। সবাই দারুণ আতঙ্কে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে—একটা জামা-কাপড়-পরা মূর্তি পায়ে পায়ে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, কিন্তু সে মূর্তির স্কন্ধের উপরে মুখমণ্ডলের কোন চিহ্নই নেই!

বৈঠকখানায় মহা হুড়োহুড়ি লেগে গেলো—চিৎকার, কান্না, আর্তনাদ! মিসেস্ দাস 'আঁ' বলে চেঁচিয়ে উঠে প্রচণ্ড গতর নিয়ে পালাতে গিয়ে দড়াম করে এক আছাড় খেলেন—কিন্তু সেই অবস্থাতেই আশ্চর্য কৌশলে ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে চোখের নিমেষে তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাকি লোকেরাও কে যে কেমন করে কোন্ দিকে সরে পড়লো, কিছুই বোঝা গেলো না। আধ মিনিটেই ঘর একেবারে খালি।

কন্ধকাটা মূর্তিটা মিনিট-খানেক সেখানে পায়চারি করে আবার বাড়ির ভিতরে চলে গেলো ধীরে ধীরে।

এ-খবর শ্রীপুরের পাড়ায় পাড়ায় রটে যেতে বেশি দেরি লাগলো না। চড়কের মেলার কথা সবাই ভুলে গেলো—আধঘন্টার ভিতরে শহরের সমস্ত জনতা স্বাস্থ্যনিবাসের সামনে এসে হাজির। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে কেবল একই কথা—জুজু! জুজু! জুজু! স্বাস্থ্যনিবাসে জুজু-বুড়ো এসেছে!

এমন সময়ে দু-জন চৌকিদার ও দারোগাকে সঙ্গে করে মিস্টার দাস, রতনবাবু আর মানিকবাবু বিজয়ী বীরের মতোন সদর্পে স্বাস্থ্যনিবাসে এসে ঢুকলেন।

দারোগা শুধোলেন, 'কোথায় সে লোক?'

—'এই যে, এই দিকে আসুন।'—বলে মিস্টার দাস সবাইকে নিয়ে যাত্রীর ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

সেই কন্ধকাটা মূর্তি ঘরের মাঝখানে, একখানা চেয়ারের উপরে স্থির হয়ে বসে ছিলো।

বলা বাহুল্য, প্রথমে সকলেই ভড়কে গেলো—মিস্টার দাস, রতনবাবু ও মানিকবাবু তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে, দরকার হলেই পালাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

দারোগা বললেন, 'ও-সব ম্যাজিক আমি ঢের দেখেছি! আমার হাতে যখন ওয়ারেন্ট আছে, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব সবাইকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি!'—এই বলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

কন্ধকাটা যাত্রী বললে, 'কে তোমরা? কি চাও?'

দারোগা বললেন, 'তোমাকে গ্রেপ্তার করবো!'

যাত্রী উঠে দাঁড়ালো। দারোগা এক লাফে যাত্রীর কাছে গিয়ে তার দস্তানা-পরা একখানা হাত চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দস্তানাটা দারোগার হাতে খুলে এলো এবং যাত্রীর হাতখানা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু তখন আর কারুর এ-সব দেখে আশ্চর্য হবার অবকাশ ছিলো না—দারোগা ও চৌকিদারেরা সেই হস্তহীন কন্ধকাটা মূর্তিটাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে।

মুখহীন মুখ থেকে আওয়াজ—'ওঃ বড়ো লাগছে! তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আত্মসমর্পণ করছি।'

দারোগা ও চৌকিদারেরা যাত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তাকে আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইলো!

দারোগা বললে, 'নাও, এখন হাতকড়ি পরো।'

যাত্রী বললে, 'কেন, আমি কি দোষ করেছি? আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ। অদৃশ্য হওয়া কি অপরাধ?'

দারোগা টিট্‌কিরি দিয়ে বললেন, 'কি বললে? অদৃশ্য মানুষ? ম্যাজিকে আমি অমন ঢের ঢের অদৃশ্য মানুষ দেখেছি। আমার সঙ্গে ও-সব চালাকি চলবে না!'

যাত্রী বললে, 'আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? এই দেখুন!—বলেই সে নিজের গায়ের আলোয়ান চট্‌পট্‌ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের উপর-দিকটা অদৃশ্য হয়ে গেলো! তারপরেই সে পরনের কাপড়খানা খুলতে লাগলো!

দারোগা এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অবাক হয়ে এইসব দেখছিলেন। এখন যাত্রীকে কাপড় খোলবার চেষ্টা করতে দেখেই তিনি তার আসল মতলবখানা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'এই চৌকিদার! ওকে ভালো করে চেপে ধরে থাক্—নইলে কাপড় খুললেই ও একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে!'

কিন্তু তার আগেই যাত্রী কাপড়খানা খুলে ফেলে এক লাফে তাদের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়লো! তখন দেখা গেলো, কেবল জুতো-মোজা-পরা দু-খানা হাঁটু পর্যন্ত পা ঘরময় লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য মানুষ তার-জুতো-মোজাও খুলে ফেললে এবং জুতোর একপাটি মিস্টার দাসের দিকে ও আর-এক পাটি দারোগার দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে।

তারপর সে-এক অপূর্ব দৃশ্য! ঘরের ভিতরে মহা সোরগোল পড়ে গেলো!—'ঐ—ঐদিকে সে গিয়েছে!'—'বাপ্‌রে বাপ্, আমায় লাথি মারলে!'—'ব্যাটা আমাকে ঘুষি মেরেছে!'—'এইবারে তাকে ধরেছি!'—'ঐ যাঃ! আবার পালিয়ে গেলো!'—'ওরে বাপ্‌রে, গেছি রে!'

অদৃশ্য মানুষ কখন যে কোন্ দিকে যাচ্ছে, কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না, মাঝখানে থেকে কিল-চড়-ঘুষি-লাথি খেয়ে প্রত্যেকেরই প্রাণ যায়-যায় হয়ে উঠলো! বেদম প্রহার খেয়ে দারোগা-বাবু তো মেঝের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন, রতনবাবুর গোঁফের একপাশ একদম উড়ে গেলো এবং মিস্টার দাসের উপর-পাটির তিন তিনটে দাঁতের আর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না!

তারপরেই প্রথমে ঘরের দরজার কাছে এবং তারপরেই সিঁড়ির উপরে দুম্-দুম্ শব্দ শুনে সকলেই বুঝতে পারলে অদৃশ্য মানুষ সে ঘর থেকে সকলের অগোচরে চলে গেলো।

তখন স্বাস্থ্যনিবাসের সামনে যে জনতা এসে জমা হয়েছিলো, তার ভিতরে এক বিষম বিভীষিকার সাড়া উঠলো।—'অদৃশ্য মানুষ রাস্তায় এসেছে! অদৃশ্য মানুষ রাস্তায় এসেছে'—প্রত্যেকেই এই কথা বলতে বলতে মহা ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো।

শহরের বাইরেই ছোট একটি নদী পাহাড়ের কোল দিয়ে ঝির-ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর ধারে আতাগাছের ছায়ায় একখানা পাথর-আসনে বসে শ্রীপুরের মহাকবি অবলাকান্ত এক মনে কবিতা রচনা করছিলেন।

অবলাকান্ত হঠাৎ চমকে উঠলেন—ঠিক তাঁর পাশেই ফ্যাঁচ্ করে কে হেঁচে ফেললে! অবলাকান্ত একবার সামনে, একবার পিছনে, একবার ডাইনে ও একবার বামে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখলেন—কিন্তু হাঁচির মালিকের একগাছা টিকিও দেখা গেলো না।

অবলাকান্ত ক্যাবলাকান্তের মতো তাকিয়ে আছেন, এমন সময়ে ঠিক তাঁর কাছ থেকে হাত-চারেক তফাতেই আবার কে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে তিন-তিনবার হেঁচে উঠলো।

অবলাকান্তের মুখ সাদা হয়ে গেলো। বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'এ কে হাঁচে? আকাশ, না বাতাস, না পাহাড়? না যক্ষ রক্ষ দেবতা দানব? এ-রকম হাঁচি তো ভালো নয়?' এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি কবিতার খাতা মুড়ে ফেলে শ্রীপুরের দিকে দ্রুত পদ-চালনা করলেন।

বাবু বংশীবদন বসু

কেউ তাঁকে নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, 'আমার নাম বাবু বংশীবদন বসু।' পাছে তিনি আমাদের উপরে রাগ করেন, সেইজন্যে আমরাও তাঁকে বংশীবাবু বলেই ডাকব।

বংশীবাবুর ভোজন হয় যত্র-তত্র, আর শয়ন হয় হট্টমন্দিরে, তারপরে যে-সময়টুকু হাতে থাকে হাটে-ঘাটে-মাঠে টো-টো করে ঘুরে, বংশীবাবু সে-সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারেন অনায়াসেই।

মস্ত মাঠ। একটা বটগাছের ছায়ায় নরম ঘাসের উপরে বংশীবাবু দু-পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। তাঁর সামনে সাজানো ছিল সারি সারি চার জোড়া ছেঁড়া জুতোর পাটি। বংশীবাবুর সম্প্রতি পায়ের জুতোর অভাব হয়েছে। কিন্তু সে-অভাব পূরণ করতে তাঁর বেশিক্ষণ লাগে নি। শহরের বাড়ি

বাড়ি ঘুরে এই চার জোড়া ছেঁড়া জুতো তিনি আজ সংগ্রহ করে এনেছেন। তারপর এখন বসে বসে পরীক্ষা করছেন, এই চার জোড়া জুতোর মধ্যে কোন্ জোড়া সবচেয়ে ছেঁড়া!

হঠাৎ কে পিছন থেকে বললে, 'ওগুলো, জুতো বুঝি!' বংশীবাবু পিছনে না তাকিয়েই বললেন, 'হ্যাঁ, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এ-গুলি হচ্ছে দাতব্য জুতো। এরচেয়ে খারাপ চার জোড়া জুতো দুনিয়াতে কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না।' পিছনের লোকটি বললে, 'হুঁ।'

বংশীবাবু বললেন, 'অবশ্য এর চেয়েও খারাপ জুতো যে আমি পরিনি তা নয়, কিন্তু তবু, সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এ-শহরে যারা জুতো দান করে তারা খুব দয়ালু লোক নয়।'

পিছনের লোকটি বললে, 'দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে পাজী লোক, এ-শহরে বাস করে তারাই।'

কে এতটা স্পষ্ট কথা কইছে দেখবার জন্যে বংশীবাবু ডান-কাঁধের উপরে মুখ ফিরিয়ে পিছন-পানে তাকালেন। সেদিকে কেউ নেই। তারপর তিনি বাঁ-কাঁধের উপরে মুখ ফিরিয়ে পিছন-পানে তাকালেন। সেদিকেও কেউ নেই। তারপর তিনি একেবারে ঘুরে বসলেন। কোথাও কেউ নেই। বংশীবাবু নিজের মনে বললেন, 'আমি কি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছি?'

সেই কণ্ঠস্বর বললে, 'ভয় পেয়ো না।' বংশীবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, 'কে তুমি বাবা? কোথায় তুমি? কেউ কি তোমাকে মাটির ভেতরে পুঁতে রেখে গিয়েছে?' কণ্ঠস্বর আবার বললে, 'ভয় পেয়ো না।'

হতভম্ব বংশীবাবু বললেন, 'বলো কি বাবা, ভয় পাবো না কি রকম? উত্তর-দক্ষিণ, পুর্ব-পশ্চিম সব খাঁ-খাঁ করছে। এই তেপান্তরে আমি আছি একলা। অথচ এখানে এসে তুমি কথা কইছো কোন্‌খান থেকে?.....না, তুমি বোধহয় নেই! কাল রাতে সিদ্ধি খেয়েছিলুম, এখনো নেশা কাটেনি। ভুল শুনছি।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'না, এ নেশা নয়!'

'বাপ্ রে!'—বলেই এক লাফে বংশীবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন। একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে পিছু হট্‌তে হট্‌তে বললেন, 'না, নিশ্চয়ই আমার নেশা কাটেনি! দিব্যি গেলে বলতে পারি, আমি এখুনি কার গলা শুনলুম!'

কণ্ঠস্বর বললে, 'হ্যাঁ, তুমি আমারই গলার আওয়াজ শুনেছ।'

ভয়ে দুই চোখ মুদে ফেলে বংশীবাবু বললেন, 'আর কখনো আমি সিদ্ধি খাবো না!'

হঠাৎ কে তাঁর দুই কাঁধ ধরে খুব খানিকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'তুমি একটা মস্ত গাধা।'

বংশীবাবু চোখ না খুলেই বললেন, 'আমি গাধা হতেও রাজী আছি বাবা, তুমি যদি দয়া করে চুপ করো। এখন যদি রাত হোত তাহলে এ-সব ভূতেরই খেলা বলে মনে করতুম।' কণ্ঠস্বর বললে, 'ওহে বোকারাম, আমি ভূত-টুত কিছুই নই—আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ।'

বংশীবাবু চোখ খুলে বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ? না নেশার খেয়াল?'

কণ্ঠস্বর বললে, 'নেশার খেয়াল নয়, আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ!'

—'তুমি যে অদৃশ্য সেটা আমি বুঝতেই পারছি বাবা! কিন্তু তুমি কোন্ মন্ত্রে অদৃশ্য হয়েছে সেটা আমাকে শিখিয়ে দিতে পারো?'

—'পারি। যদি তুমি আমার কথা শোনো।'

—'ও-মন্ত্র পেলে তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।'

—'দেখ, আমিও তোমার মতোন ভবঘুরে। আমি অসহায়। আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। সারাদিন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলছে। মানুষ পেলেই এখুনি আমি খুন করতে পারি!'

—'বাবা!' বলেই বংশীবাবু পালিয়ে যাবার উপক্রম করলেন!

খপ্ করে বংশীবাবুর একখানা হাত ধরে অদৃশ্য মানুষ বললে, 'তোমার কোন অনিষ্টই আমি করব না! আমি জামা-কাপড় চাই, আশ্রয় চাই, খোরাক চাই। এইসব বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করবে!'

বংশীবাবু ভাবতে লাগলেন, যার নিজের পরনের কাপড়, পেটের অন্ন আর মাথা গোঁজবার ঠাঁই জোটে না, এইসব বিষয়ে সে কিনা সাহায্য করবে অপরকে! কিন্তু ভয়ে মনের কথা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারলেন না!

কণ্ঠস্বর বললে, 'আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ—সমস্ত পৃথিবীকে আমি শাসন করতে পারি! আমাকে সাহায্য করলে তোমার কোন অভাবই থাকবে না! কিন্তু সাবধান, আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে পৃথিবীতে কেউ তোমাকে রক্ষে করতে পারবে না!' বলতে বলতে সে তার অদৃশ্য দুই হাত দিয়ে বংশীবাবুর দু-খানা হাত সজোরে চেপে-ধরলে।

বংশীবাবু যাতনায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'ছেড়ে দাও বাবা! আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব!'

নোট-প্রজাপতি

শ্রীপুরের স্বাস্থ্যনিবাসে সকালে-বিকালে চা, টোস্ট, কেক্, বিস্কুট ও ডিম প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। শ্রীপুরের যে কোন ভদ্রলোকই কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করলে সেখানে গিয়ে চায়ের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারতেন।এবং প্রতিদিন সকালে-বিকালেই সেখানে চায়ের তেষ্টা মেটাবার জন্যে অনেক তৃষিত লোকের আবির্ভাব হোত।

যাত্রীর অন্তর্ধানের পরের দিন সকালেও স্বাস্থ্যনিবাসের চা-বিভাগে চা-ভক্তদের অভাব হলো না।

একটা মস্ত গোল টেবিলের চারিধারে বসে খরিদ্দাররা মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে গতকল্যকার ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছেন। বলা বাহুল্য চা-সভার সভাপতি ছিলেন স্বাস্থ্যনিবাসের মালিক মিস্টার দাস স্বয়ং এবং তাঁর ডাইনে ও বাঁয়ে বিরাজ করছিলেন রতনবাবু ও মানিকবাবু। আসল বক্তা হচ্ছেন তাঁরা তিনজনই, বাকি সবাই শ্রোতা ও উৎসাহদাতা।

বক্তৃতা যখন রীতিমত জমে উঠেছে, তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন একটি নূতন লোক। তাঁর জামা-কাপড় যে হপ্তাকয়েকের মধ্যে রজকের দেখা পায় নি, এ-সত্য খুব সহজেই বোঝা যায়। তাঁর ধুলোয় ধূসর তালিমারা জুতো দু-খানির অবস্থাও সন্দেহজনক ; কারণ তাদের ভিতরে ভদ্রলোকের পা দু-খানি ঢুকেও আরো খানিকটা বেওয়ারিস জায়গা খালি পড়ে আছে। ভদ্রলোক

আসতে আসতে ক্রমাগত পিছন পানে চেয়ে চমকে উঠছেন—যেন তাঁর পিছনে পিছনে আসছে কোন অদৃশ্য বিপদ!

স্বাস্থ্যনিবাসের খরিদ্দারের এমনধারা হতচ্ছাড়া চেহারা মিস্টার দাস পছন্দ করলেন না। একটু বিরক্তভাবে বললেন, 'এখানে আপনার কি দরকার?'

আগন্তুক বললেন, 'এক পেয়ালা চা আর দু-টুকরো রুটি চাই। গোটা দুয়েক ডিম হলে আরো ভালো হয়।'

আগন্তুকের ছেঁড়া পকেটের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে মিস্টার দাস বললেন, 'দাম চার আনা। আপনাকে, খাবার আগে দাম দিতে হবে!'

মিস্টার দাসের ভয়ের কারণ বুঝে আগন্তুক হেসে বললেন, 'আমার পকেট ছেঁড়া বটে, কিন্তু আমার টাকা থাকে ট্যাঁকে। এই নিন।'—বলে তিনি ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার করে ঠং করে টেবিলের উপরে ফেলে দিলেন।

মিস্টার দাস অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন, ঐ টেবিলের ধারে বসুন। আপনার খাবার এখুনি আসবে।'—বলেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন ডাক্তারবাবু, এইবারে সেই ভুতুড়ে লোকটার ঘরে যাওয়া যাক্।'

মিস্টার দাসের সঙ্গে মানিকবাবু স্বাস্থ্যনিবাসের ভিতর দিকে চলে গেলেন।

আগন্তুক টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। কারুকে বোধহয় বলে দিতে হবে না যে এই আগন্তুকই হচ্ছেন, আমাদের সেই বংশীবাবু।

মিস্টার দাস ও মানিকবাবু যাত্রীর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, কালকের সেই তুমুল কাণ্ডের পর ঘরের সমস্ত আসবাব ঠিক সেই ভাবেই এলোমেলো হয়ে ছড়ানো রয়েছে। ওল্টানো চেয়ার-টেবিল, ভাঙাচোরা শিশি-বোতলও লণ্ডভণ্ড বিছানা! কেবল যাত্রীর জামাকাপড়, ব্যান্ডেজ, চশমা, ও নকল নাকটা দারোগাবাবু যাবার সময় নিজের সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ঘরের কোণে একখানা পকেটবুক পড়েছিল, সেইখানা তুলে নিয়ে মিস্টার দাস বললেন, 'এই পকেট বইখানার পাতা ওল্টালে লোকটার অনেক কথাই হয়তো জানা যাবে।'

মানিকবাবু কি জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেলো।

মিস্টার দাস চমকে উটে বললেন, 'ওকি, দরজা খুললে কে?'

মানিকবাবু দরজার দিকে চেয়ে খুব সহজ ভাবেই বললেন, 'বোধহয় হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেলো। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই।'

মিস্টার দাস বললেন, 'কালকের ব্যাপারের পর থেকে অমনভাবে দরজা খুলে গেলেই আমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে!'

ঘরের ভিতরে একটা চাপা হাঁচির শব্দ শোনা গেল।

মিস্টার দাস বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি কি এখনি হাঁচলেন?'

ঘরের মধ্যে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—'না, আমি হেঁচেছি। আমাকে আপনারা চেনেন।'

মিস্টার দাস ও মানিকবাবু হতাশভাবে ও মড়ার মতন সাদা মুখে দু-দিকে সরে গিয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালেন।

কণ্ঠস্বর বললে, 'মিস্টার দাস, আমার পকেটবুক আপনার হাতে কেন? দিন, ফিরিয়ে দিন।'

মিস্টার দাস কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে পকেটবুকখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

পকেটবুকখানা মিস্টার দাসের হাত থেকে বেরিয়ে শূন্যে উড়ে একখানা চেয়ারের উপর গিয়ে পড়লো।

কণ্ঠস্বর বললে, 'মিস্টার দাস, আমার জামা-কাপড়গুলো কোথায় গেল?'

মিস্টার দাস বললেন, 'পুলিশ নিয়ে গেছে।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'আমার আর জামা-কাপড় নেই। তবে, আপাতত আপনার জামা-কাপড় পেলেই আমার চলে যাবে। আপনার গায়ের আলোয়ানখানা খুলে মেঝের ওপরে রাখুন। তারপর আপনার জামা-কাপড় আর জুতো সব খুলে ঐ আলোয়ানের ভেতরে রেখে দিন। তারপর একটা পোঁটলা বেঁধে জিনিসগুলো আমার হাতে দিন।'

মিস্টার দাস আঁৎকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, সে কি কথা!'

কণ্ঠস্বর খুব কর্কশভাবে বললে, 'যা বলছি তাই করুন। দেখতে পাচ্ছেন, আমি অদৃশ্য? আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহলে এখনি আপনাদের দুজনকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি!'

মিস্টার দাস বাধো-বাধো গলায় অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বললেন, 'কিন্তু এ-ঘরে ডাক্তারবাবুর সামনে আমি জামা-কাপড় খুলব কেমন করে?'

কণ্ঠস্বর বললে, 'আমি অদৃশ্য বটে, কিন্তু আপনাদের চেয়ে বোকা নই। একবার চোখের আড়ালে যেতে পারলেই আপনি যে এখুনি পুলিশে খবর দিতে ছুটবেন, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ও চালাকি চলবে না! যা বলছি তাই করুন।...আর মানিকবাবু, ঐ বইগুলো গুছিয়ে তুলে আপনিও এই পোঁটলার ভেতরে রেখে দেবার চেষ্টা করুন।'

বাইরে তখন বংশীবাবুর চা, রুটি ও ডবল ডিম শেষ হয়ে গেছে।

এমন সময় রতনবাবু শুনতে পেলেন, যাত্রীর ঘর থেকে যেন একটা গোলমালের আভাস আসছে। দিন-কাল ভালো নয় বলে তিনিও তাড়াতাড়ি উঠে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন।

সিঁড়ির সামনে এসেই তিনি শুনলেন, তাঁর খুব কাছেই একটা হাঁচির শব্দ হলো। এ হাঁচি তিনি ভোলেননি। শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে দাঁড়ালেন! তারপরেই দেখলেন, সিঁড়ির উপর থেকে একটা পোঁটলা শূন্যে দুলতে দুলতে নেমে আসছে!

পোঁটলাটা ঠিক যেন হাওয়ায় সাঁতার কাটতে কাটতে বৈঠকখানা ঘরের দিকে চলে গেলো!

ঠিক সেই সময় মিসেস্ দাস কি একটা কাজের জন্যে বৈঠকখানা ঘরের দিকে আসছিলেন। কিন্তু দূর থেকেই উড্ডীয়মান পোঁটলা দেখে তাঁর চক্ষুস্থির ও পা-দুটো অচল হয়ে গেলো। তারপরেই বাইরের ঘরে একটা অত্যন্ত গোলযোগ উঠলো!

সঙ্গে সঙ্গে মানিকবাবু যাত্রীর ঘর থেকে বেগে বেরিয়ে এসে বলে উঠলেন, 'অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ! ধরো—যতক্ষণ ওর হাতে পোঁটলা থাকবে সবাই মিলে অনায়াসেই ওকে ধরতে পারবে!'

রতনবাবু বেগে বৈঠকখানায় প্রবেশ করে দেখলেন, বংশীবাবু পোঁটলাটা কাঁধে করে দ্রুত-পদে স্বাস্থ্যনিবাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন! অদৃশ্য মানুষ নির্বোধ নয়, নিজে পোঁটলা নিয়ে যেতে

গেলে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা সে বিলক্ষণই জানে! তাই বংশীবাবুকেই সে পোঁটলার বাহন করেছে!

রতনবাবুও বংশীবাবুর পিছনে ছুটতে ছুটতে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'চোর! চোর! পোঁটলা নিয়ে পালায়! পাকড়াও, পাকড়াও!'

বেচারী বংশীবাবু! খানিক পরেই তিনি দেখলেন, সারা শ্রীপুর শহরটাই যেন তাঁর পিছনে ভেঙে পড়েছে। সকলেরই মুখে এক কথা—'চোর! চোর! পোঁটলা-চোর! ধরো ওকে—মার ওকে!' এ-সব আপত্তিকর কথা শুনে বংশীবাবু আরো জোরে পা চালিয়ে দিলেন। ছোটবার অসুবিধা হবে বলে তাঁর দাতব্য জুতোজোড়াকেও তিনি পা থেকে খুলে নির্দয়ভাবে বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন।

সকলের আগে আসছিলেন রতনবাবু ও মানিকবাবু। হঠাৎ রতনবাবুর মনে হলো, কে যেন তাঁকে বিশ্রী একটা ল্যাং মারলে—সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে দু-হাতে মাটি জড়িয়ে ধরলেন।

তারপরেই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো মানিকবাবুর টিকলো নাকের উপরে প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়লো। মানিকবাবু দুই চক্ষে অনেকগুলো সর্ষের ফুল দেখলেন—এবং তারপর কি যে হলো তা আর তিনি বলতে পারেন না।

আর যারা ছুটে আসছিল, তাদেরও কেউ খেলে কিল, কেউ খেলে চড় এবং কেউ বা খেলে লাথি বা গলাধাক্কা। বেগে ছুটতে ছুটতে আছাড় খেয়ে অনেকেরই হাত পা মাথা ভেঙে গেলো! বাকি লোকেরা তখন বুদ্ধিমানের মতো যে যেদিকে পারলো পলায়ন করলো—এই কথা বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে—'অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ আবার ফিরে এসেছে! সকলে সাবধান হও!' এই ভয়ানক খবর শুনেই অনেকে নিজের নিজের বাড়ির সদর দরজায় ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে দিলে।

শ্রীপুরের সবাই যখন রাজপথে, মিস্টার দাস তখন যাত্রীর ঘরের ভিতরে বন্দী হয়ে আছেন। রাজপথের ও স্বাস্থ্যনিবাসের সমস্ত হট্টগোল ও আর্তনাদ তাঁর কানে এসে ঢুকছে, কিন্তু মিস্টার দাসের ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই—কারণ তখন তিনি সদ্যপ্রসূত শিশুর মতোই বস্ত্রহীন! অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি যখন খানকয়েক খবরের কাগজ তুলে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিজের বস্ত্রের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন, তখন রতনবাবু আবার হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকেই রতনবাবু বলে উঠলেন, 'অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য ঘুষি! অদৃশ্য লাথি! সমস্ত শ্রীপুরের গতর চূর্ণ হয়ে গেছে!'

মিস্টার দাস ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে এখন কোথায়?'

—'এতক্ষণ আমরা তার পিছনে পিছনে ছুটছিলুম, কিন্তু এখন আমাদেরই পিছনে পিছনে সে ছুটে আসছে! হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে মেরে তার হাড় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে—সবাই এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে—অদৃশ্য মানুষ বোধহয় পাগল হয়ে গেছে!'

ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে মিস্টার দাস বললেন, 'সে আর এখানে ফিরে আসবে না তো?'

—'আসবে না কি, ঔ এলো বুঝি!'—এই বলেই সাঁতারুরা গঙ্গায় যেমন করে ঝাঁপ খায়, রতনবাবু তেমনি করেই মাটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে খাটের তলায় ঢুকে অদৃশ্য মানুষের চেয়েও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মিস্টার দাসও কোমরের খবরের কাগজগুলোকে দুই হাতে প্রাণপণে চেপে ধরে দরজার বাইরের দিকে সুদীর্ঘ একটি লম্ফত্যাগ করলেন,—এবং লাফিয়ে তিনি যে কোথায় গিয়ে পড়লেন তা আমরা জানি না, তবে তাঁকেও আর দেখা গেলো না।

সারাদিন ধরে শ্রীপুর শহরে যে-সব অঘটন ঘটলো, চতুর্মুখ ব্রহ্মা চারমুখেও তা বলে শেষ করতে পারবেন না।

রাজপথে কেউ হাঁচলেই চারিদিকে অমনি সাড়া ওঠে—'ঐ অদৃশ্য মানুষ, এসেছে!' সঙ্গে সঙ্গে সেখানটা মরুভূমির মতো জনশূন্য হয়ে যায়! বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে থেকেও শান্তি নেই! হাওয়ার দাপটে ঘরের দরজা-জানলা যদি হঠাৎ খুলে বা বন্ধ হয়ে যায়, অমনি সবাই হাঁউ-মাঁউ করে চেঁচিয়ে ওঠে!

শ্রীপুর ব্যাঙ্কের 'কাউন্টারে'র উপরে হাজার কয়েক টাকার নোট নিয়ে একজন কেরানী হিসাব করছিলো। আশপাশে আরো অনেক লোক আপন আপন কাজে নিযুক্ত ছিলো। এমন সময় দেখা গেলো, সকলের চোখের সুমুখ দিয়েই নোটের তাড়া শূন্যপথে উড়ে গেলো—ঠিক প্রজাপতির মতো। সবাই রাজপথে ছুটে এলো কিন্তু সেই নোট-প্রজাপতিদের আর কোন সন্ধান পেলো না,—কেবল দেখা গেলো, একজন ময়লা জামা-কাপড়-পরা লোক খালি পায়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে!

স্বাস্থ্যনিবাসের উপরে অদৃশ্য মানুষের আক্রোশ অত্যন্ত বেশি। কারণ, সারাদিনে সে বার-চারেক স্বাস্থ্যনিবাসকে আক্রমণ করেছে, সেখানকার একখানা সার্সির কাঁচও অটুট নেই, এবং কাঁচের সমস্ত বাসনও চুরমার হয়ে গেছে! স্বাস্থ্যনিবাসের ভাড়াটিয়ারা প্রত্যেকেই পলায়ন করেছে।

খবরের কাগজে এইসব ঘটনার উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠ করে শ্রীপুরের বাসিন্দাদের উত্তেজনা, দুর্ভাবনা ও বিভীষিকার আর সীমা রইলো না।

কখন কোথায় এই ভীষণ অদৃশ্য মানুষের অদৃশ্য আবির্ভাব ঘটবে, সেই দুশ্চিন্তায় সকলেই তটস্থ হয়ে রইলো।

যে মাঠে বংশীবাবুর সঙ্গে প্রথমে আমাদের চেনাশুনো হয় সেই ধু ধু মাঠেরই এক নির্জন কোণে একটা ঝোপের ভিতরে তিনি এখন আবার হতাশ ভাবে দু-পা ছড়িয়ে বসে ঘন ঘন হাঁপ ছাড়ছেন। এবং মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে কেন যে তিনি শিউরে উঠছেন অন্য কেউ তার রহস্য বুঝতে পারবে না।

হঠাৎ শূন্যপথে দৈববাণীর মতো এক কণ্ঠস্বর জেগে উঠলো,—'বংশীবদন, তোমার হাঁপ্ ছাড়া শেষ হলো কি? সন্ধে হতে যে আর দেরি নেই।'

বংশীবাবুর বদনে কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেলো না। অত্যন্ত কাহিলভাবে তিনি বললেন, 'আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন—আপনার দুটি পায়ে পড়ি!'

কণ্ঠস্বর বললে, 'সে কি হে বংশীবদন! ব্যাঙ্কের 'কাউন্টার' থেকে, রাস্তার লোকের পকেট থেকে আজ কত নোট আর টাকা তোমার পকেটে এসে জুটেছে সেটা হিসেব করে দেখেছ কি? আমার সঙ্গে থাকলে রোজই এমনি আশ্চর্য রোজগার হবে। অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার।'

বংশীবাবু দুই হাত জোড় করে কাঁচু-মাচু মুখে বললেন, 'আমার আশ্চর্য রোজগারে আর কাজ নেই বাবা! এত রোজগার আমার ধাতে সইবে না। এরচেয়ে গড়ের মাঠের মতো ট্যাঁক্ নিয়ে নিশ্চিন্ত প্রাণে ঘুরে বেড়ানো ঢের ভালো! রোজগার করে করবো কি,—সারা শহর যে আমাকে চিনে ফেলেছে! পথে-পথে পাহারাওয়ালা ঘুরছে আমার গলা টিপে ধরবার জন্যে। আপনি তো অদৃশ্য হয়ে দিব্যি মজায় আছেন—কিন্তু আমার কি হবে? হায়, হায়, হায়, এতদিন পরে শ্রীপুর বুঝি ছাড়তে হলো!'

কণ্ঠস্বর বললে, 'তাহলে চলো বংশীবদন, আমরা অন্য শহরে চলে যাই!'

বংশীবাবু চমকে উঠে বললেন, 'বলেন কি মশাই? এই একদিনেই সারা শহরে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটোছুটি করে আমার জিভ বেরিয়ে পড়েছে। এর ওপরেও আবার আপনার অন্য শহরে যাবার ইচ্ছে আছে নাকি? কিন্তু অন্য শহরে গিয়ে কি হবে? আপনি যদি দয়া করে আমার ঘাড় থেকে-না নামেন, তাহলে সেখানেও তো আমি একদিনেই বিখ্যাত হয়ে পড়বো! শেষটা ধরা পড়ব আমি, আর আপনি তো হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে যাবেন!'

কণ্ঠস্বর বললে, 'আরে ছ্যাঃ, তুমি দেখছি একটি বার্জে মার্কা বন্ধু!'

বংশীবাবু সায় দিয়ে দুঃখিতভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তার চেয়েও খারাপ মশাই, তার চেয়েও খারাপ! আমি হচ্ছি একেবারে রাবিশ মার্কা বন্ধু! এতক্ষণে এইটুকু যদি বুঝে থাকেন, তাহলে আর কেন? আমাকে রেহাই দিন না!'

আচম্বিতে বংশীবাবুর দেহটা ঝাঁকানি খেয়ে উপরে উঠে শূন্যে দুলতে লাগলো—যেন কোন অদেখা হাত গলা ধরে তাকে টেনে তুলেছে! বংশীবাবু কেঁদে ফেলে বললেন, 'হুজুর, আমি আপনার গোলাম! যা বলবেন তাই করবো!'

সেইদিনই রাতদুপুরে শ্রীপুরের এক পুলিশ-ফাঁড়িতে বেজায় হৈ-চৈ লেগে গেছে।

ফাঁড়ির পাহারাওয়ালা ফটকের সামনে বসে বসে ঢুলছে, হঠাৎ কোত্থেকে একটা লোক এসে দড়াম করে তার পায়ের তলায় আছড়ে পড়লো এবং চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে বলে উঠলো—'বাঁচাও, বাঁচাও! অদৃশ্য মানুষ!'

সে চিৎকারে কবরের মড়া পর্যন্ত জেগে ওঠে—ঘুমন্ত পাহারাওয়ালা তো সামান্য ব্যক্তি! তার উপরে আবার অদৃশ্য মানুষের নাম!

পাহারাওয়ালা মস্ত এক লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কে, কোথায়?'

লোকটা বললে, 'কেমন করে তাকে দেখিয়ে দেবো? সে যে অদৃশ্য মানুষ! সে আমার পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে! আমাকে বাঁচাও।'

হঠাৎ পাহারাওয়ালার দাড়ি-ভরা গালে চটাং করে এক নিরেট চড় এসে পড়লো। গালে হাত বুলোতে বুলোতে হতভম্ব পাহারাওয়ালা দু-পা পিছিয়ে এলো। তারপরেই সবিস্ময়ে দেখলে,

তার সামনের লোকটাকে কে যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু কে যে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখবার জো নেই।

পাহারাওয়ালা এক লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে দু-হাতে লোকটার দুই পা খুব জোরে চেপে ধরলে, তারপর একদিকে পাহারাওয়ালা ও আর একদিকে অদৃশ্য মানুষ,—এই দুয়ে মিলে 'টাগ্-অফ্-ওয়ার' লেগে গেলো সেই হতভাগ্য লোকটার দেহ নিয়ে।

গোলমাল শুনে ফাঁড়ির দারোগা বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এ-সব কি কাণ্ড!'

পাহারাওয়ালা টানাটানি করতে করতে প্রায় অবরুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'অদৃশ্য মানুষ!'

যার দেহ নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে সেই লোকটি অর্থাৎ আমাদের বংশীবাবু যাতনায় বিকৃত স্বরে বলে উঠলেন, 'আমাকে বাঁচাও! আমার দেহ এইবারে ছিঁড়ে দু-খানা হয়ে যাবে!'

দারোগা রিভলভার বার করে কয়েকবার গুলিবৃষ্টি করলেন। গুলি অদৃশ্য মানুষের গায়ে লাগলো কিনা বোঝা গেলো না, কিন্তু বংশীবাবুর দুই হাত থেকে অদৃশ্য মানুষের হাতের বাঁধন ফস্ করে খুলে গেলো!

পূর্ণ-বিধু সংবাদ

রসায়নশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীপুর শহরে বাস করতেন। আজ সারাদিন তাঁর অশান্তির অবধি নেই।

আজ সারাদিন শ্রীপুরের পথে হট্টগোল ও হুড়োহুড়ি চলেছে, তার জন্যে পূর্ণবাবুর সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। সারাদিনই তাঁর কানের ভিতরে এই চিৎকারই বারবার ছুটে এসেছে—'অদৃশ্য মানুষ! ঐ আসছে! ঐ ধরলে!'

পূর্ণবাবুও বারবার বিরক্তিভরে নিজের মনেই বলছেন, 'পৃথিবীতে আবার কি রূপকথার রাজ্য ফিরে এলো? অদৃশ্য মানুষ! সারা দুনিয়াটা কি হঠাৎ পাগলা হয়ে গেলো?'

সন্ধ্যার পরে শহর যখন ঠাণ্ডা হলো ও রাজপথের জনতা কমে গেলো, পূর্ণবাবু তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে বসলেন। রাত যখন দুপুর তখনো তিনি কাজ করছেন একমনে।

আচমকা কি কতকগুলো ভাসা-ভাসা চিৎকার ও রিভলভারের শব্দ তাঁর কানে এসে ঢুকলো। কাজ করতে করতে মুখ তুলে পূর্ণবাবু বললেন, 'আবার কি গাঁজাখোরদের উপদ্রব শুরু হলো? কিন্তু রিভলভার ছুঁড়ছে কে?'—তারপর আবার তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই খুব জোরে তাঁর সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হলো। তারপর দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজ এলো তাঁর কানে।

চাকরকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে কড়া নাড়ছিলো?'

চাকর বললে, 'জানি না হুজুর! দরজা খুলে কারুকে তো দেখতে পেলুম না।'

চাকর চলে গেলো। পূর্ণবাবু আবার কাজ করতে লাগলেন। রাত দুটোর সময় তাঁর কাজ শেষ হলো। ধীরে ধীরে টেবিলের ধার থেকে উঠে তিনি তার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই একখানা চেয়ারের তলায় কি একটা দাগ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এগিয়ে গিয়ে দেখলে, খানিকটা রক্ত। আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, এখানে রক্তের দাগ এলো কেমন

করে? কিন্তু একটানা পরিশ্রমের পর তাঁর চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো, এ-সব বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি শয্যার দিকে আবার অগ্রসর হলেন। ঘুমের ঘোরে সে রাত্রে তিনি ক্ষুধার কথাও ভুলে গেলেন।

কিন্তু খাটের কাছে গিয়ে তিনি যা দেখলেন, তাতে তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে উঠলো। তাঁর সমস্ত শয্যা লণ্ডভণ্ড ও বিছানার চাদর ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে এবং তাতেও রক্তের দাগ রয়েছে। এ কী রহস্য!

অবাক হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'কি আশ্চর্য! এ যে পূর্ণ!'—পূর্ণবাবু একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, ঘরে তিনি ছাড়া আর জনপ্রাণী নেই! কণ্ঠহীন কণ্ঠস্বর? শ্রীপুরের পাগলামি তাঁকেও আক্রমণ করলো নাকি! ধেৎ!

হঠাৎ একখানা চেয়ারের দিকে তাঁর নজর পড়লো। চেয়ার থেকে ঠিক আধ হাত উপরে শূন্যে একটা ব্যান্ডেজ স্থির হয়ে আছে—আর তাতেও রক্তের দাগ। গোল ব্যান্ডেজ—কিন্তু তার ভিতরে কোনো বস্তু বা দেহের কোন অংশ নেই। এও কি সম্ভব? পূর্ণবাবুর কিছুমাত্র কুসংস্কার ছিলো না, কিন্তু এ-দৃশ্য দেখবার পর তাঁরও বুকের কাছটা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো। ঘরের ভিতর আবার কে তাঁকে ডেকে বললে, 'পূর্ণ! তুমি এখানে!'

বিপুল বিস্ময়ে পূর্ণবাবু হাঁ করে রইলেন।

কণ্ঠস্বর বললে, 'পূর্ণ, ভয় পেয়ো না! আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ।'

শ্রীপুরের পাগলামি তাঁর শয়ন-ঘরেও ঢুকেছে? না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখছেন? স্বপ্নের ঘোরেই তিনি যেন বললেন, 'এ্যাঁ?'

কণ্ঠস্বর আবার বললে, 'আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ!'

নিজের কানকে অবিশ্বাস করেও পূর্ণবাবু বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ? অদৃশ্য মানুষকে দেখতে কি ঐ ব্যান্ডেজের মতো?'

কণ্ঠস্বর বললে, 'না। ব্যান্ডেজটা আমার কোমরে বাঁধা আছে। তোমার বিছানার চাদর ছিঁড়ে এই ব্যান্ডেজ তৈরি হয়েছে।'

পূর্ণবাবু ভাবলেন, অদৃশ্য মানুষ যদি সত্যিকার মানুষই হয়, তাহলে অত্যন্ত অভদ্র তো! সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও তাঁকে 'তুমি' 'তুমি' বলে কথা কইছে! কিন্তু এ সবই বাজে ধাপ্পা! ম্যাজিকের ফক্কিকারিতে তাঁকে ভোলানো এতো সহজ নয়। সামনে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে তিনি ব্যান্ডেজটা ধরবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ দু-খানা তপ্ত রক্তমাংসের হাত তাঁর হাত সজোরে চেপে ধরলে—সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর বললে, 'পূর্ণ, বিশ্বাস করো। সত্যিই আমি অদৃশ্য মানুষ!'

এইবারে পূর্ণবাবুর গায়ে কাঁটা দিলে—তিনি চেঁচিয়ে লোকজন ডাকবার উপক্রম করলেন এবং তৎক্ষণাৎ দু-খানা অদৃশ্য হাত সজোরে তাঁর মুখ চেপে ধরলে।

—'পূর্ণ, বোকামি করো না! চ্যাঁচামেচি করলে তোমার ভালো হবে না। আমার গলা শুনেও তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি হচ্ছি বিধু!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পূর্ণবাবু বললেন, 'বিধু?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বিধু অর্থাৎ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিটি কলেজে তোমার সঙ্গে পড়তুম—মনে নেই, দিনে তিরিশ কাপ করে চা খেতুম বলে তুমি আমাকে কেবলই ধমক দিতে? আশ্চর্য, এতো শীঘ্র তুমি বন্ধুদের ভুলে যাও!'

পূর্ণবাবু আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, 'বিধু? হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে! কিন্তু অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সেই বিধুর কি সম্পর্ক? সে তো অদৃশ্য ছিলো না!'

—'না, তখন আমি অদৃশ্য ছিলুম না। এখন হয়েছি।'

—'এও কি সম্ভব? মানুষ অদৃশ্য হতে পারে?'

—'সে আলোচনা পরে করবো। আপাতত আমায় কিছু খেতে দাও—আজ তিন দিন আমার পেটে অন্ন যায়নি।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'আজ আমার ক্ষিদে নেই বলে আমি কিছু খাইনি। আমার খাবার তোমার পাশের টেবিলেই চাপা দেওয়া আছে। ইচ্ছে করলেই খেতে পারো।'

নিরাকার বিধুর আর তর সইলো না—পূর্ণবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর টেবিলের উপরে রক্ষিত খাবারের থালার ঢাকনিটা হঠাৎ যেন জ্যান্ত হয়ে এক লাফ মেরে টেবিলের আর এক পাশে গিয়ে পড়লো এবং তারপর খাবারগুলোও জ্যান্ত হয়ে শূন্যে টপাটপ লাফ মারতে শুরু করলে! খেতে খেতে নিরাকার বিধু বললে, 'আঃ, এতক্ষণে যেন বাঁচলুম! আমি ঈশ্বরের মতো নিরাকার হয়েছি বটে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে এখনও জয় করতে পারিনি। ভাগ্যিস দৈবগতিকে তোমার বাড়িতেই এসে পড়েছি!'

—'তোমার দেহ নিরাকার হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার দেহের রক্ত তো চর্মচক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে না! ব্যাপার কি? তুমি আহত হয়েছো কেন?'

—'সে অনেক কথা, পরে বলবো। আপাতত এইটুকু শুনে রাখো, একটা পাজী লোক আমার টাকা নিয়ে পালাচ্ছিলো তাকে ধরতে গিয়েই, আমার এই বিপদ হয়েছে।.....ভাই পূর্ণ, আজ আর আমি কথা কইতে পারছি না—তিন দিন আমি ঘুমোইনি, আমাকে ঘুমোবার একটু ঠাঁই দাও।'

—'তুমি এই ঘরেই ঘুমোতে পারো, আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি।'

—'আর তোমার দু-একটা বাড়তি জামা-কাপড় আমাকে দিয়ে যাও।'

—'আচ্ছা।'

পূর্ণবাবু একখানা আলোয়ান, একটা গরম কোট, একটা ফ্লানেলের শার্ট, একখানা কাপড় ও এক জোড়া জুতো এনে দিলেন।

বিধু যখন সেইগুলো পরলে, তখন তার দেহের একটা নির্দিষ্ট গঠন পূর্ণবাবুর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—যদিও জামার উপরে তার মুণ্ড, জামার হাতার তলায় তার হাত দুটো এবং

হাঁটুর কাপড় ও জুতোর মাঝখানে তার পা-দুটো দৃশ্যমান হলো না বলে সে দেহটাকে অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার দেখাতে লাগলো।

বিধু বললে, 'ভাই পূর্ণ, এইবারে আমি একটু ঘুমিয়ে নেবো। বাকি কথা সব কাল সকালে হবে।...হ্যাঁ, ভালো কথা! আমি এখানে আছি এ-কথা তুমি কারুকে বলবে না তো?'

—'কেন?'

—'লোকে আমার কথা টের পায়, এটা আমি পছন্দ করি না! সাবধান, আমার এ-কথা ভ্রমেও ভুলো না!'

পূর্ণবাবু সে-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে অন্য একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর চোখে সে রাত্রে আর ঘুম এলো না। একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে বসে পড়ে তিনি নানা কথা ভাবতে লাগলেন।

'অদৃশ্য মানুষ! শ্রীপুরের আর সকলের মতো আমারও মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি? এও কি সম্ভব? হ্যাঁ, সমুদ্রের জলে যারা বাস করে, আমাদের চোখে তারা অদৃশ্য বটে। পুকুরের জলে যেসব জীব বাস করে, তারাও অদৃশ্য। কিন্তু পৃথিবীর হাওয়ার জগতে যারা বাস করে, তারা কখনো অদৃশ্য হতে পারে না।'

ভেবে-চিন্তেও তিনি কূল-কিনারা পেলেন না।...রাত পুইয়ে গেলো। সকালবেলায় খবরের কাগজ এলো। খবরের কাগজে পূর্ণবাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অদৃশ্য মানুষের সমস্ত কীর্তি-কলাপ পড়ে ফেললেন। যে কথাগুলি তিনি জানতে পারলেন, সেগুলি হচ্ছে এই ঃ

(১) অদৃশ্য মানুষ 'স্বাস্থ্যনিবাস'-এর উপরে বিষম অত্যাচার করেছে। (২) অদৃশ্য মানুষ, ডাক্তার মানিকবাবুর বাড়ি থেকে টাকা চুরি করেছে। (৩) অদৃশ্য মানুষ শ্রীপুরের অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষকে আহত করেছে। (৪) অদৃশ্য মানুষ শ্রীপুরের ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার টাকার নোট নিয়ে পালিয়েছে, এবং রাজপথের পথিকদের পকেট কেটে অনেক টাকা সরিয়েছে। প্রভৃতি।

পূর্ণবাবু নিজের মনেই বললেন, 'সর্বনাশ। বিধু কেবল অদৃশ্য নয়, উন্মত্তও বটে! ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে সে সাংঘাতিক কাণ্ডও করতে পারে। মানুষের সমাজের সমস্ত নিয়ম বদলে দিতে পারে। আর আমি কিনা তাকে স্বাধীনভাবে আমারই ঘরে ছেড়ে রেখে এসেছি! তাকে কি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? কখনোই নয়!'

পূর্ণবাবু একখানা কাগজে তাড়াতাড়ি কি লিখলেন। তারপর কাগজখানা একখানা খামের ভিতরে পুরে চাকরকে ডেকে বলেন, 'এই চিঠিখানা চুপিচুপি থানায় দিয়ে এসো।'

ঠিক সেই সময়েই তাঁর শয়ন-ঘরের ভিতরে ঝন্‌ঝন্ করে একটা বেজায় আওয়াজ হলো—যেন কাঁচের কি কতকগুলো ভেঙে পড়লো! পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি শয়ন-ঘরের দিকে ছুটলেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, একটা জানালার সামনে বিধুর কন্ধকাটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং জানালার শার্সির ভাঙা কাঁচগুলো ঘরের মেঝের উপরে ছড়িয়ে রয়েছে!

পূর্ণবাবু বললেন, 'এ কি ব্যাপার?'

বিধু বিরক্তমুখে বললে, 'আমার মেজাজ বেজায় তিক্ত হয়ে আছে! কিছুই ভালো লাগছে না। ভয়ানক রাগ হচ্ছে। রাগের ঝোঁকে তোমার শার্সির কাঁচগুলো ভেঙে ফেলেছি!'

পূর্ণবাবু মনে মনে বললেন, 'উন্মাদ-রোগের পূর্ব লক্ষণ!' প্রকাশ্যে বললেন, 'তুমি আজকাল মাঝে মাঝে এই রকম করো নাকি?'

—'করি।'

পূর্ণবাবু ঘরের ভিতর নীরবে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর বিধুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'বিধু, শান্ত হয়ে বসো। কেমন করে তুমি অদৃশ্য হলে, সে-কথা আমাকে বলোনি। আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

—'অদৃশ্য হওয়া খুবই সহজ কথা!'

—'তোমার কাছে সহজ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার!'

—'কলেজ ছাড়বার পর আমি যে পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলুম, সে-কথা বোধ-হয় তুমি জানো না। মোহনপুরে আমার বাসা ছিলো। সেখানে প্রায় দিন-রাত একটা ঘরে বন্দী

হয়ে আমি কেবল পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে হরেকরকম পরীক্ষা করতুম। সেই পরীক্ষার ফলেই অদৃশ্য হবার এই অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছি।'

—'সে উপায়টা কি শুনি?'

—'সে-কথা ভালো করে বোঝাতে গেলে পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয় নিয়ে এখন ব্যাখ্যা করতে হয়। সে সময় আমার নেই। তবে খুব সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলছি, শোনো। ধরো, কাঁচের কথা। পাথরের চেয়ে কাঁচ স্বচ্ছ, তাই পাথরের ভিতর দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু কাঁচের ভিতর দিয়ে যায়। অস্পষ্ট আলোতে খুব পাতলা কাঁচ সহজে চোখে পড়ে না—কারণ সে আলো শোষণ ও প্রতিফলিত করতে পারে খুবই অল্প। সাধারণ সাদা কাঁচ তুমি যদি জলের ভিতরে ফেলে দাও, তাহলে সে বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আবার জলের চেয়ে ঘন কোনো তরল পদার্থের ভিতরে কাঁচকে ফেলে দিলে সে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়—কারণ, সেই তরল পদার্থ ভেদ করে খুব অল্প আলোই তার কাছে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। ঠিক এই কারণেই বাতাসের ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাস অদৃশ্য হয়ে থাকে। কাঁচকে যদি ভেঙে গুঁড়ো করা হয় তাহলে বায়ু-চলাচলের স্থানে তাকে রাখলে সকলেই দেখতে পায়। কিন্তু সেই দৃশ্যমান কাঁচের গুঁড়ো জলের মধ্যে ফেলে দিলে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাদা কাগজ স্বচ্ছ নয়—তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। কিন্তু ভালো করে তেল মাখিয়ে সাদা কাগজকেও স্বচ্ছ করা যায়। ..এই রকম সব ব্যাপারের উপরেই নির্ভর করে আমি এই অপূর্ব আবিষ্কার করেছি।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'তারপর কি হলো বলো!'

বিধু বলতে লাগলো—

'কয়েক বৎসর চেষ্টার পরে যখন আমার মনে হলো যে আমি পরীক্ষায় সফল হয়েছি, তখন একদিন একটা বিড়ালকে ধরে আনলুম। তারপর সেই বিড়ালের উপরে আমি আমার আবিষ্কৃত ওষুধ প্রয়োগ করলুম। বিড়ালটা ওষুধ খেয়ে কয়েক ঘন্টা ধরে ক্রমাগত চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। তারপর আমার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে তার দেহ শূন্যে মিলিয়ে গেলো। তার দেহ মিলিয়ে গেলো বটে, কিন্তু তার মিউ মিউ করে কান্নার জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলো। শেষটা অনেক কষ্ট করে ও তাড়াহুড়ো দিয়ে বিড়ালটাকে ঘর থেকে বিদায় করলুম। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে পথে গিয়ে আবার সে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললে। বিড়াল মিউ মিউ করছে, অথচ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! রাজপথে বেশ ভিড় জমে গেলো। যখন বিড়ালটাকে কিছুতেই আবিষ্কার করা গেলো না, তখন তাকে ভুতুড়ে বিড়াল মনে করে সবাই সেখান থেকে পলায়ন করলে।

এ ওষুধটা হয়তো এতো শীঘ্র আমি নিজের উপরে প্রয়োগ করতুম না, কিন্তু বাধ্য হয়ে শেষটা করতে হলো। পূর্ণ, আমি যে ধনীর ছেলে নই এ-কথা তুমি জানো। সামান্য যা কিছু পুঁজিপাটা ছিলো এই পরীক্ষা শেষ করতেই তা ফুরিয়ে গেলো। কয়েক মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালা বিষম তাগাদা শুরু করলে। তাগাদায় যখন ফল হলো না, তখন সে নালিশ করে আমার বিরুদ্ধে 'বডি-ওয়ারেন্ট' বার করলে। বাড়িওয়ালা ও ওয়ারেন্টকে ফাঁকি দেবার জন্যে শেষটা আমি মরিয়া হয়ে ওষুধ খেয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়লুম।

বাড়িওয়ালার চোখের সুমুখ দিয়েই আমি সরে পড়লুম, কিন্তু সে আমাকে মোটেই দেখতে পেলে না। রাজপথে জনতার ভিতর দিয়ে লক্ষ্যহীনের মতো এগিয়ে চললুম। কিন্তু খানিক দূর এগুতে না এগুতেই নানান্ রকম মুশকিল হতে লাগলো। মোটর গাড়িগুলো হর্ন না দিয়েই আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে চলে যেতে চায়। একটা মুটে একরাশ জিনিস-ভরা ঝাঁকা মাথায় করে আমার গায়ের উপরে এসে পড়লো। আমি সাঁৎ করে একপাশে সরে গেলুম বটে, কিন্তু আমার অদৃশ্য গায়ে ধাক্কা খেয়ে মুটেটা আশ্চর্য হয়ে এমনি চমকে উঠলো যে, তার সমস্ত মোটঘাট পথের উপরে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। তার ঝাঁকার ভিতরে কাঁচের কি একটা জিনিস ছিলো, তারই এক টুকরো ভেঙে আমার পায়ের তলায় ফুটে গেলো ও ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো। আমি কাঁচের টুকরোটা পা থেকে বার করে ফেলবার চেষ্টা করছি, ইতিমধ্যে সেখানে অনেক লোকজন জমে গেলো। তারা মুটেটাকে বললে, 'তুই কানা হয়ে পথ চলছিস নাকি?' মুটেটা বললে, 'না বাবু, ভূতে আমায় ধাক্কা মেরেছে!' সব লোক হেসে উঠলো। মুটে বললে, 'ঐ দেখুন, রক্তমাখা পায়ের দাগ!' বেগতিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালাতে লাগলুম। কিন্তু কি আপদ, যতই অগ্রসর হই—রক্তমাখা পায়ের রেখা আমার পিছনে পিছনেই চলে! রাস্তার ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠলো, সকলেই ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিত! সেই মস্ত ভিড় রক্তাক্ত পায়ের দাগ ধরে আমায় অনুসরণ করতে লাগলো। তার উপরে পথের লেড়ে কুকুরগুলো ব্যাপার আরো সঙ্গীন করে তুললো। তারা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলো না বটে, কিন্তু তাদের তীব্র ঘ্রাণ-শক্তি আমাকে আবিষ্কার করে ফেললে অনায়াসেই। হতভাগারা আমাকে ঘেউ ঘেউ করে কামড়ে দিতে এলো! ব্যতিব্যস্ত হয়ে কি করবো ভাবছি এমন সময় দেখি একখানা ফিটন গাড়ি সেইখান দিয়ে যাচ্ছে। একলাফে তার উপরে উঠে পড়লুম, গাড়িখানা দুলে উঠলো, গাড়োয়ান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে একবার দেখলে ; কিন্তু কিছুই না দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে আবার গাড়ি চালাতে লাগলো।

খানিক পরেই নূতন বিপদ! একটা ভীষণ মোটা মেম হঠাৎ সেই গাড়িখানার উপরে চড়ে বসলো। আমি তাড়াতাড়ি অন্য দরজা দিয়ে আবার পথের উপরে লাফিয়ে পড়লুম। এবারে খুব সাবধানে সকলকে এড়িয়ে পথ চলতে লাগলুম। সন্ধে পর্যন্ত এই রকম ঘুরে ঘুরে রীতিমতো ক্ষুধার উদ্রেক হলো। একখানা খাবারের দোকানের একপাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। দোকানী যেই একটু অন্যমনস্ক হয়, অমনি খান দুই-তিন লুচি বা দু-একখানা কচুরি বা দু-একটা আলুর দম প্রভৃতি টপাটপ সরিয়ে ফেলি। কিন্তু দু-একটা খাবার মুখে ফেলেই নতুন এক বিপদের সম্ভাবনায় মুষড়ে পড়লুম। আমার দেহের রক্ত যেমন বাইরের আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে এলে আর অদৃশ্য থাকে না, তেমনি বাইরের কোন খাবার জিনিসও হজম না হওয়া পর্যন্ত উদরের মধ্যে দৃশ্যমান হয়েই থাকে। এই সত্যটা ধরতে পেরেই পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে পালিয়ে এলুম।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ও অনাহারে শরীর এলিয়ে পড়লো। এখন উপায়? বাসায় ফেরবার পথ নেই, রাস্তায় রাস্তায় কতোক্ষণ আর এমন করে ঘুরে বেড়াবো? সারাদেহে এক টুকরো কাপড় নেই, তার উপরে পৌষমাসের প্রখর শীত! কাঁপতে কাঁপতে ভাবতে লাগলুম, কোনো রকমে যদি জামা-কাপড় ও জুতো যোগাড় করতে পারি, আর চশমা ব্যান্ডেজ ও পরচুলা প্রভৃতির সাহায্যে মুখের অদৃশ্য অংশগুলো ঢাকা দিতে পারি, তাহলে আমার চেহারা খুব চমৎকার দেখতে না

হলেও এক রকম চলনসই হতে পারে। কেউ শুধোলে বললেই হবে যে, 'দৈবদুর্ঘটনায় চোট খেয়েছি বলে মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়েছে।'—আরো মিনিট পনেরো পথ চলবার পরই যা খুঁজছিলুম সেই সুযোগই পেলুম! একটা বাড়ির সামনে সাইবোর্ডে লেখা রয়েছে—'এককড়ি বিশ্বাস অ্যাণ্ড কোং। এইখানে যাত্রা ও থিয়েটারের সকল রকম সাজ-পোশাক ও সরঞ্জাম সুলভে ভাড়া দেওয়া হয়!'

কোনো রকম ইতস্তত না করে একেবারে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলুম। ঘরের ভিতরে একটা টাক-মাথা বুড়ো একটা বাক্সের সামনে মাদুরের উপর বসে একখানা খাতায় কি লিখ-ছিলো। আমার পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে দেখলে,—কিন্তু সামনে কিছুই দেখতে না পেয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। চারিদিকে সিন্দুক, বাক্স ও তোরঙ্গ সাজানো রয়েছে, দেয়ালে হরেকরকম সাজপোশাক, পরচুল ও গোঁফ-দাড়ি ঝোলানো রয়েছে, নানা আকারের মুখোশ ও অস্ত্রশস্ত্র টাঙানো রয়েছে। আমি পা টিপে টিপে একটা কোণের দিকে যাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু এমনি আমার কপাল যে, হঠাৎ আমার ধাক্কা লেগে একটা তোরঙ্গ গেলো হুড়মুড় করে পড়ে। বুড়ো এবারে কাজকর্ম ফেলে একেবারে উঠে দাঁড়ালো। যে তোরঙ্গটা পড়ে গিয়েছিলো তার কাছে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে না পেরে আরো বেশি হতভম্ব হয়ে গেলো।

এ সুযোগ আমি ছাড়লুম না। হঠাৎ বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জোরে তার গলা টিপে ধরলুম! দু-চারবার গোঁ গোঁ করেই সে অজ্ঞান হয়ে গেলো। তারপর—'

পূর্ণবাবু বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন, 'বল কি হে, তুমি অনায়াসেই বুড়োটার গলা টিপে ধরলে?'

বিধু বললে, 'তখন তা ছাড়া আর কি উপায় ছিলো বলো? যে অবস্থায় আমি পড়েছিলুম, আমাকে বাঁচতে হবে তো?'

পূর্ণবাবু বিরক্তভাবে বললেন, 'তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অনায়াসেই তুমি অন্য কারুকে খুন করতে পারো? কি অন্যায়!'

বিধু উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'তা পারি! আত্মরক্ষা হচ্ছে জীবনের ধর্ম! নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নরহত্যা করা আমি অপরাধ বলে মনে করি না। এর ভেতরে তুমি অন্যায়টা দেখলে কোথায়?'

পূর্ণবাবু খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বিধু, তোমার স্বভাব ঢের বদলে গেছে দেখছি! কিন্তু সে কথা যাক। তুমি যা বলছিলে বলো।'

বিধু আবার আরম্ভ করলে—

'খানিকটা দড়ি নিয়ে বুড়োর হাত-পা আমি বেঁধে ফেললুম। তার মুখে কতোকগুলো ন্যাকড়া গুঁজে দিলুম, যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে না ওঠে। তারপর নিজের মনের মতো পোশাক বেছে নিয়ে পরে ফেললুম। পরচুল, দাড়ি-গোঁফ, একখানা ঠুলি-চশমা নিয়ে মুখের অদৃশ্য অংশ ঢাকা দিলুম। একটা মুখোশের নাক কেটে নিয়ে নিজের মুখের যথাস্থানে বসিয়ে দিলুম। তারপর মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করে একখানা আরশির সামনে পরীক্ষা

করে দেখলুম, আমার মুখখানা দেখতে অদ্ভুত হলেও অমানুষিক হয়নি। বুড়োর বাক্স হাতড়ে দু-শো পঁচিশ টাকা পেলুম। নোট ও টাকাগুলো পকেটে পুরে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।'

পূর্ণবাবু আবার বললেন, 'পরের টাকা নিতে তোমার সঙ্কোচ হলো না?'

বিধু বললে, 'কিছুমাত্র না! টাকা যার কাছে থাকে তারই হয়। লোকে তা বুঝলে এতদিন পৃথিবীতে আর গরিব থাকতো না। সেখান থেকে এক হোটেলে ঢুকে আগে পেটের ক্ষুধাকে শান্ত করলুম। তারপর কেমন করে আবার নিজের বাসায় ফিরে গিয়ে আমার পুঁথিপত্র ও ওষুধের শিশি-বোতলগুলো শ্রীপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে নিজেও এখানে এসে হাজির হলুম, সে-সব কথা আর না বললেও চলবে।

'শোনো পূর্ণ! আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ! কিন্তু নিরাকার হবার আগে অদৃশ্য হওয়ার যে-সব আনন্দ মনে মনে কল্পনা করেছিলুম, আজ সে-সব আকাশ-কুসুমের মতো মিলিয়ে গিয়েছে। এখন আমার মতো অসহায় আর কেউ নেই। আমাকে সবাই ভয় করে, ভীষণ শত্রু বলে মনে করে। কোন সাধারণ মানুষের সাহায্য না পেলে পৃথিবীতে আমার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। সেই জন্যই বংশীবদনকে আমার সঙ্গী করেছিলুম, কিন্তু সে হতভাগাও আমার পুঁথিপত্র ও টাকা চুরি করে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে!'

বিধু বললে, 'মনে করছি এখন তোমার এখানেই কিছুদিন থাকবো। ভগবান তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছেন। মনে করলেই আমরা দু-জনেই দু-জনকে অনেক উপকার করতে পারি! তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে, আমাকে লুকিয়ে রাখবে ; আর আমি দুনিয়ার ঐশ্বর্য লুটে নিয়ে এসে তোমার কাছে সঁপে দেবো। তুমি আমাকে সাহায্য করবে পূর্ণ?'

পূর্ণবাবু চুপ করে বসে রইলেন।

—'চুপ করে রইলে যে? পূর্ণ, তুমি কি আমার কথায় রাজী নও?' পূর্ণবাবু নীরবে যেন কি শুনতে লাগলেন।

—'পূর্ণ, নিচে যেন দরজা খোলার শব্দ হলো না?'

—'কই, আমি তো শুনতে পাইনি!'

বিধু খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'উঁহু, সিঁড়ির ওপরে নিশ্চয়ই কাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে। কারা ওপরে আসছে?'

পূর্ণবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কে আবার আসবে?'

কিন্তু বিধুর সন্দেহ দূর হলো না। সে তাড়তাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেলো,—কিন্তু পূর্ণবাবুও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার আগেই দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

বিধু গর্জন করে বললে, 'বিশ্বাসঘাতক'!—এবং তারপরেই সে পূর্ণবাবুর উপরে লাফিয়ে পড়লো ও দুই হাতে সবলে তার গলা টিপে ধরে তাঁকে একটানে মেঝের উপরে আছড়ে ফেললে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে পূর্ণবাবু তখনি উঠে বসলেন এবং সেই অবস্থায় দেখলেন, তাঁর চোখের সামনেই জামা-কাপড়গুলো টান মেরে খুলে ফেলে বিধু আবার নিরাকার হয়ে গেলো।

থানার দারোগা পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি উপরে আসছিলেন, এমন সময় আচমকা তাঁর দেহের উপরে হুড়মুড় করে একটা অদৃশ্য ভার এসে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হলেন একেবারে কুপোকাৎ! দারোগা-মশাই যখন আবার দু-পায়ে ভর দিয়ে

দাঁড়িয়ে উঠতে পারলেন, তখন দেখলেন পূর্ণবাবু রক্তাক্ত মুখে বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

তিনি দারোগাবাবুর সামনে এসে বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ আবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে!'

অদৃশ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

পূর্ণবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আপনারা বুঝি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চোর ধরতে যান?'

দারোগাবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'কেন বলুন দিকি?'

পূর্ণবাবু আরো রেগে বললেন, 'কেন, এখনো তা বুঝতে পারছেন না? আপনারার এমন গোলমাল করে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছেন যে, সে আগে থাকতেই সাবধান হয়ে পালিয়ে গেলো।'

দারোগাবাবু অপ্রতিভভাবে বললেন, 'তাই তো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে!'

—হ্যাঁ, এ ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই। অদৃশ্য মানুষকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন! তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সে বদ্ধপাগল! সে মানুষের টাকা কেড়ে নেবে, নরহত্যা করবে, পৃথিবী তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠবে! আমি তার সমস্ত মনের কথা শুনেছি, সে সমস্ত মানুষকে ঘৃণা করে, আজকের ব্যাপারের পর সে আর কারুকেই ক্ষমা করবে না! ছি ছি, কি সর্বনাশটাই করলেন বলুন দেখি!'

দারোগাবাবু ম্রিয়মাণ মুখে বললেন, 'তাকে কি ধরবার আর কোনোই উপায় নেই?'

পূর্ণবাবু বললেন, 'উপায় থাক আর না থাক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে তো!...দাঁড়ান, হয়েছে। শুনুন, শ্রীপুরের চারিদিকে চৌকিদার রাখুন—তারা সব পথঘাট আগলে থাক। পথে-ঘাটে কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ করলেই খোঁজ নিন! তার মুখেই আমি শুনেছি, সে অদৃশ্য হলেও কুকুররা তার অস্তিত্ব টের পায়। শ্রীপুরের সমস্ত লোককে সশস্ত্র আর সাবধান হয়ে থাকতে বলুন। কেউ যেন তার বাড়ির ভিতরে ঢোকবার পথ খোলা না রাখে। সর্বত্রই খাবারদাবার যেন লুকিয়ে রাখা হয়,—যেন সে খাবার চুরি করতে না পারে, যেন সে অনাহারে থাকে।

দারোগাবাবু বললেন, 'তাহলে আপনিও আসুন, এ-বিষয়ে চটপট একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাক!'

পূর্ণবাবু বললেন, 'যাচ্ছি। কিন্তু আর একটা কথা জেনে রাখুন। তার অদৃশ্য দেহের ভিতরে হজম না হওয়া পর্যন্ত খাবার দেখা যায়। খাবার হজম করবার জন্যে তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। এখানকার প্রত্যেক বনে-জঙ্গলে আর ঝোপে-ঝাপে পাহারা দেবার জন্যে লোক রাখতে হবে। যদি দরকার হয়, পথে-ঘাটে কাঁচের টুকরোও ছড়িয়ে রাখতে হবে। তার পা আহত হলে রক্ত পড়ে, আর সে রক্ত অদৃশ্য নয়। জানি, এ-ব্যবস্থা নিষ্ঠুর। কিন্তু উপায় কি? সে একে অদৃশ্য, তার ওপরে পাগল আর হিংস্র জন্তুর মতো ভয়ঙ্কর।'

দারোগা বললেন, 'এতো তো আটঘাট বেঁধে কাজ করতে বলছেন, কিন্তু তার আগেই সে যদি এ-মুল্লুক ছেড়ে লম্বা দেয়?'

পূর্ণবাবু বললেন, 'সে এখনি এখান থেকে নড়বে বলে মনে হয় না। বংশী বলে কে একটা লোক তার দরকারী পুঁথিপত্র নিয়ে পালিয়েছে। আমার বোধহয় সেগুলো সে আগে ফিরে পাবার চেষ্টা করবে।'

দারোগা বললেন, 'তাহলে আর দেরি নয়। আসুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

দু-জনে দ্রুতপদে নিচে নেমে গেলেন।

দৃশ্যে ও অদৃশ্যে

অদৃশ্য মানুষ নিশ্চয় দুর্জয় ক্রোধে অন্ধের মতো হয়ে পূর্ণবাবুর বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। কারণ সেই বাড়ির দরজার সামনে তখন একটি ছোট শিশু নিজের মনে খেলা করছিলো, আচম্বিতে কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেয় এবং বেচারীর একখানা পা ভেঙে যায়।

তারপর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আর তার কোনোই সন্ধান পাওয়া গেলো না। হয়তো পূর্ণ-বাবুর বিশ্বাসঘাতকতায় ও নিজের আশায় নিরাশ হয়ে খানিকক্ষণের জন্যে সে অত্যন্ত দমে গিয়েছিলো এবং কোনো নির্জন স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে বসে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলো।...

কিন্তু সে জানতে পারলে না, ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী কি রকম জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শ্রীপুরের ঘরে-ঘরে প্রত্যেক সদর দরজা আজ বন্ধ। কোনো স্কুল, কলেজ ও আপিসও আজ খোলা নেই। খাবারওয়ালারা পর্যন্ত তাদের দোকানে ঝাঁপ তুলে দিয়েছে। এবং পথে পথে সেপাইরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

শ্রীপুর শহরের প্রান্তে নদীর ঘাটে খেয়া পারাপার আজ বন্ধ। এবং শ্রীপুর স্টেশনে সমস্ত রেলগাড়িরই কামরার দরজা আর জানলা আজ বন্ধ।

শ্রীপুর থেকে মালগাড়ি যাওয়াও আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—কি জানি, খোলা মাল-গাড়ি পেয়ে অদৃশ্য মানুষ পাছে তার উপরে চড়ে সকলের অজান্তে পলায়ন করে!

মাঠে মাঠে বনে-জঙ্গলে আনাচে-কানাচে মোটা মোটা লাঠি-সোটা, রাম-দা, তরোয়াল ও সড়কি নিয়ে দলে দলে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হাওয়ায় কোথাও একটা পাতা নড়লেই হাঁ হাঁ করে সেই দিকে ছুটে যাচ্ছে।

অদৃশ্য মানুষ যে শ্রীপুরের মায়া এখনো ত্যাগ করেনি, শীঘ্রই সে প্রমাণ পাওয়া গেলো।

শ্রীপুরের এক পাটকলের ম্যানেজার ছিলেন চন্দ্রভূষণবাবু। সন্ধ্যার কিছু আগে নদীর ধারের মাঠের ভিতরে হঠাৎ তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেলো। চন্দ্রবাবুর সর্বাঙ্গে ভয়ানক প্রহারের দাগ এবং তাঁর মাথাটাও কে ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে। চন্দ্রবাবুর মৃতদেহের পাশে তাঁর নিজের মোটা বেতের লাঠিটা দু-টুকরো হয়ে পড়েছিলো এবং তারই খানিক তফাতে ছিলো একটা মোটা লোহার রক্তমাখা গরাদ! বেশ বোঝা গেলো, ঐ গরাদের সাহায্যেই চন্দ্রবাবুকে কেউ হত্যা করে গিয়েছে।

এই ব্যাপারে শহরময় অত্যন্ত হৈ-চৈ পড়ে গেলো। চন্দ্রবাবু ছিলেন নির্বিরোধী ভালোমানুষ লোক—শ্রীপুরে কেউ তাঁর শত্রু ছিলো না। সুতরাং সকলেরই ধারণা হলো, অদৃশ্য মানুষ ছাড়া

এ-কাজ আর কেউ করেনি! কিন্তু চন্দ্রবাবুকে খামোকা সে খুন করতে যাবে কেন? এ-খুন যে টাকার জন্যে নয় তার প্রমাণ, চন্দ্রবাবুর পকেট থেকে মানিব্যাগটা হারায়নি! তবে?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সঠিক ব্যাপারটা জানা না গেলেও, একটা হদিস পাওয়া গেলো। মাঠের ধারের একখানা বাড়ি থেকে একটি ছোট মেয়ে যা দেখেছিল, তাই নিয়ে সকলে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো। মেয়েটি বলে, মাঠের উপর দিয়ে একটা লোহার গরাদে ঠিক পাখির মতোই নাকি উড়ে যাচ্ছিলো, আর তার পিছনে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটছিলেন চন্দ্রবাবু। মেয়েটি তার পরের কথা আর কিছু বলতে পারলে না।

সবাই যা আন্দাজ করলে তা হচ্ছে এই—অদৃশ্য মানুষ বোধহয় সশস্ত্র হবার জন্যে কোনো বাড়ির জানলা থেকে এই লোহার গরাদেটা খুলে নিয়েছিলো। সে যখন মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তাকে দেখা না গেলেও তার হাতের লোহার গরাদেটা অদৃশ্য হয়নি। আর সেই উড়ন্ত গরাদে দেখে চন্দ্রবাবু বোধহয় আশ্চর্য হয়ে তাকে নিজের হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করবার চেষ্টা করেছিলেন। অদৃশ্য মানুষ তাঁর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেও যখন মুক্তি পায়নি, তখন তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

চন্দ্রবাবুকে হত্যা করে অদৃশ্য মানুষ যে কোন্ দিকে গেলো তাও ঠিক বোঝা গেলো না। তবে ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে যে মস্ত একটা চক্রান্তের সৃষ্টি হয়েছে, এটা বোধহয় সে বুঝে নিয়েছিলো। কারণ, চারিদিকে এমন সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও কেউ তাকে আর আবিষ্কার করতে পারলে না।

তবে সন্ধ্যার পরে একদল কুলী যখন মাঠ পার হয়ে শ্রীপুরের দিকে আসছিলো, তখন তারা নাকি শুনতে পেয়েছিলো যে, মাঠের ভিতরে কোন অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে কখনো কান্নার, কখনো হাসির ও কখনো গর্জনের রোমাঞ্চকর শব্দ হচ্ছে! ভূত মনে করে কুলীরা প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে এসেছিলো।

পূর্ণবাবুর বাড়ি আক্রমণ

সকাল বেলায় পূর্ণবাবু একখানা অদ্ভুত পত্র পেলেন। চিঠিখানা 'বেয়ারিং'। পত্রলেখক লিখেছে—

পূর্ণ, তুমি খুবই চালাক আর সাধু লোক—নয়? আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলুম। আর তুমি বন্ধু হয়েও আমাকে ধরিয়ে দিলে! আমার সঙ্গে এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার কি স্বার্থসিদ্ধি হবে, তা তুমিই জানো। তোমারি চক্রান্তে একটা দিন আমাকে হাটে-মাঠে-বাটে ঘেয়ো কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। যাতে আমি খেতে ও ঘুমোতে না পাই সে-জন্যে তুমি কোনো সুব্যবস্থা করতেই বাকি রাখোনি। তবু আমি পেট ভরে খেয়েছি ও সারারাত প্রাণ ভরে ঘুমিয়েছি। এ-খবর শুনে তুমি বোধহয় খুব খুশি হবে?

'এইবারে আসল নাটক শুরু হবে—হাসির নাটক নয়, বিয়োগান্ত নাটক, অর্থাৎ তার মধ্যে পতন ও মৃত্যুর কোনোই অভাব হবে না।

'এ-চিঠি যখন তুমি হাতে পাবে, তখন থেকেই বিভীষিকা শুরু হবে! আজ থেকে শ্রীপুরের সর্বশক্তিমান মহারাজা হচ্ছি আমি—অদৃশ্য মানব! কাকে রাখবো আর কাকে মারবো সে-কথা কেবল আমিই জানি।

'তবে, প্রথম দিনে আমি কি করবো, সে-কথাটা তোমার কানে কানে চুপিচুপি আমি জানিয়ে রাখছি। আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে কি হবে, তার একটা দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে প্রথম দিনেই একজনের জন্যে আমি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করবো। আসামীর নাম হচ্ছে, বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুর দূত এখনি তার দিকে অগ্রসর হয়েছে। সে ঘরের দরজার চাবি বন্ধ করে বসে থাকতে পারে, বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, নিজের চারিদিকে অগুন্তি সেপাই রাখতে পারে—সে যা খুশি করতে পারে, কিন্তু তবু মৃত্যু, অদৃশ্য মৃত্যু তাকে গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে আসছে!—তাকে আমি খুব সাবধান হতে বলি, কারণ লোকে তাহলেই বুঝতে পারবে যে, সাবধান হলেও আমার হাত থেকে রক্ষা নেই! যে তাকে সাহায্য করবে তাকেই মরতে হবে। তুমি শুনে রাখো বন্ধু, আজকে পূর্ণের মৃত্যু-দিবস!'

পূর্ণবাবু চিঠিখানা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বিধু ঠাট্টা করে এ-চিঠিখানা লেখেনি। সে তার মনের কথাই খুলে লিখেছে!' তিনি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সামনে যে গরম চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেদিকেও তাঁর কোন খেয়াল রইলো না। আগে চাকরকে ডেকে তিনি বাড়ির ভিতরে ঢোকবার সব পথ বন্ধ করে দিতে বললেন। তারপর দেরাজের ভিতর থেকে একটা রিভলভার বার করে নিজের পকেটে পুরলেন। তারপর ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করত নিজের মনেই বললেন, 'বিধু! তাহলে কাল আহার আর নিদ্রা থেকে তুমি বঞ্চিত হও নি? বেশ, বেশ! তাই মনের আনন্দে তুমি আমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছো? এও মন্দ কথা নয়! কিন্তু বিধু, তুমি যতোই অদৃশ্য হও, টেক্কা মারবো কিন্তু আমিই!'

বলতে বলতে তিনি টেলিফোনের কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং থানার দারোগাকে সকল কথা জানালেন। দারোগা বললেন, 'আমি এখুনি আপনার বাড়িতে যাচ্ছি।' টেলিফোনের কাছ থেকে তিনি একটা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ রাজ পথের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই আবার বললেন, 'কে জানে বিধু এতোক্ষণে আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে কি না! হয়তো সে এখন পথে দাঁড়িয়ে আমার পানেই তাকিয়ে আছে!'—একটা কি জিনিস ঝপ্ করে জানলার শার্সির উপরে এসে পড়লো। —পূর্ণবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি পিছু হটে এলেন এবং তারপরে উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললেন, 'চড়ুই পাখি! আমার মনে নিশ্চয় ভয় ঢুকেছে! নইলে সামান্য একটা চড়ুই পাখি আমাকে এমন চমকে দিতে পারে?'

সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হলো। তিনি নিজে নেমে গেলেন দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে?'

দরজার ওপাশ থেকে দারোগাবাবু সাড়া দিলেন।

পূর্ণবাবু দরজার খিল খুলে দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে আগে উঁকি মেরে দেখে নিলেন, সত্যই দারোগাবাবু কি না! তারপর নিঃসন্দেহ হয়ে দরজার এক পাটি খুব কম করে খুলে দারোগাবাবুকে ভিতরে এনে আবার খিল তুলে দিলেন।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে ওঠবার আগেই শুনলেন একটা ঘরের ভিতর থেকে ঝন্‌ঝন্‌ করে শার্সি-ভাঙার আওয়াজ এলো!

দুজনে সে ঘরে গিয়ে ঢুকতে-না-ঢুকতেই আরো শার্সির কাঁচ ভেঙে পড়লো!

পূর্ণবাবু বিবর্ণ-মুখে বললেন, 'বিধু তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। আমার বাড়ি অবরোধ শুরু হলো!'

দারোগা বললেন, 'বাড়ির বাইরে থেকে কোন কিছু ধরে কেউ উপরে উঠতে পারবে না তো?'

—'টিকটিকি আর পাখি ছাড়া আর কেউ পারবে না।'

দুম্‌দাম্‌, ঝন্‌ঝনাঝন, ঠক্‌ঠকাঠক্‌! বড়ো বড়ো ঢিল বৃষ্টি হচ্ছে, কতোকগুলো শার্সি ভাঙলো, গুনে বলা দায়! অদৃশ্য মানুষকে দেখা যাচ্ছে না—বাড়ির ভিতরে ঢুকতে না পেরে সে ঢিল ছুঁড়েই মনের আক্রোশ মিটিয়ে নিচ্ছে!

পূর্ণবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'এখন কি করা যায় বলুন দেখি?'

দারোগা বললেন, 'একটা উপায় আমার মনে হচ্ছে। আপনি কাল বললেন না যে, কুকুররা অদৃশ্য মানুষের গন্ধ পায়!'

—'হ্যাঁ।'

—'আমার তিনটে ডালকুত্তা আছে। বলেন তো নিয়ে আসি। তারা চোখে দেখতে না পেলেও ঠিক ঐ দুরাত্মাকে ধরে ফেলবে!'

—'কিন্তু বাইরে যাবেন কেমন করে? বিধু যে পথ আগলে আছে!'

—'আপনার রিভলভারটা যদি দেন, তাহলে ঠিক আমি যেতে পারবো। রিভলবারটা দেখলে ও-বদমাইশ নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে না।'

পূর্ণবাবু অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিভলভারটা দারোগার হাতে সমর্পণ করলেন। তারপর নিচে নেমে আচমকা সদর দরজাটা খুলে দারোগাকে বার করে দিয়েই তখনি আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দারোগা পূর্ণবাবুর বাড়ির ডানদিকের মাঠ দিয়ে সাবধানে চারিদিকে চোখ রেখে অগ্রসর হলেন।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর বললে, 'তুমি দাঁড়াও!'

দারোগা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রিভলভারটা মুঠোর ভিতরে চেপে ধরলেন।

কণ্ঠস্বর বললে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বুকের ধুকপুকুনি সামলে নিয়ে দারোগা মুখসাবাসি দেখিয়ে বললেন, 'সে খবরে তোমার দরকার কি?'

পর-মুহূর্তেই দারোগার নাকের উপরে যেন একটা পাঁচ-সের ওজনের ঘুষি এসে পড়লো! ধপাস করে মাটির উপরে বসে পড়ে যখন তিনি চোখের সামনে রাশি রাশি সর্ষেফুল-ফোটা

দেখতে লাগলেন, তখন হঠাৎ কার অদৃশ্য হস্ত এসে তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিলে!

কণ্ঠস্বর বললে, 'যাও, বাড়ির ভেতরে ফিরে যাও! নইলে—'

দারোগা হতাশ ভাবে মুখ তুলে দেখলেন, যেন কোনো যাদুবিদ্যার বলেই শূন্যে একটা রিভলভার স্থির হয়ে আছে—তার নলচেটা তাঁরই দিকে ফেরানো!

কণ্ঠস্বর বললে, 'উঠে দাঁড়াও! আমার সঙ্গে কোন রকম চালাকি খেলতে এসো না! মনে রেখো, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। সুড়্‌সুড়্ করে ভালো মানুষটির মতো বাড়ির ভেতরে ফিরে যাও।'

দারোগা বললেন, 'পূর্ণবাবু আর আমাকে দরজা খুলে দেবেন না!'

কণ্ঠস্বর বললে, 'কিন্তু তোমাকে ফিরে যেতেই হবে! নইলে তুমি লোকজন ডেকে নিয়ে আসবে! তোমার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই, কিন্তু আমার কথা না শুনলে তোমাকে আমি বধ করতে বাধ্য হবো!'

দারোগা আচম্‌কা এক লাফ মেরে রিভলভারটা অদৃশ্য হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের মুখ থেকে দপ্ করে বিদ্যুৎশিখা জ্বলে উঠলো এবং পর-মুহূর্তেই দারোগার দেহ ঘুরে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে রইলো।

দোতলার একটা জানলার পাল্লা ফাঁক করে পূর্ণবাবু সমস্ত দৃশ্যই দেখছিলেন। এবং ইতিমধ্যেই টেলিফোনে সাহায্যের জন্যে তিনি থানায় খবর দিয়েছিলেন। দারোগার পতনের পর রিভলভারটা সেখানেই শূন্যে দুলতে লাগলো! এমন সময় দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে দেখলেন, থানা থেকে চারজন পাহারাওয়ালা এসে হাজির

হয়েছে। তিনি চট করে তাদের ভিতরে এনে আবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের দারোগা আর বেঁচে নেই। অদৃশ্য মানুষের হাতে রিভলভার আছে। খুব সাবধান!'

বাড়ির পিছন দিকের একটা দরজার উপরে দুমুদুম্ করে পদাঘাতের শব্দ হতে লাগলো। খিড়কির সে-দরজাটা তেমন মজবুত ছিলো না—অদৃশ্য মানুষ বোধহয় সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পূর্ণবাবু সেই দিকে ছুটলেন—কিন্তু তার আগেই খিড়কির দরজার পলকা খিলটা সশব্দে ভেঙে গেলো!

পূর্ণবাবু চিৎকার করে বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ বাড়ির ভেতরে ঢুকলো! মনে রেখো, তার হাতে রিভলভার আছে!'

পাহারাওয়ালারা দু-হাতে লাঠি ধরে এদিকে ওদিকে লুকিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে রইলো। উপরি-উপরি দু-বার রিভলভারের গর্জন শোনা গেলো! কিন্তু তার আগেই পূর্ণবাবু তড়াক করে মস্ত লাফ মেরে একটা ঘরে ঢুকে পড়ে সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করলেন।

অদৃশ্য মানুষকে দেখা গেলো না বটে—কিন্তু এটা দেখা গেলো যে একটা চকচকে রিভলভার শূন্যপথে থেকে থেকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে!

হঠাৎ একটা পাহারাওয়ালা গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে রিভলভারের পিছনদিকে প্রচণ্ড এক লগুড়াঘাত করলে। একটা যন্ত্রণাময় চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা ছিট্‌কে তফাতে গিয়ে পড়লো! অদৃশ্য মানুষের হাতে আর রিভলবার নেই দেখে পূর্ণবাবু ও অন্য তিনজন পাহারাওয়ালাও আবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

যতক্ষণ অদৃশ্য মানুষের হাতে রিভলবারটা ছিলো ততক্ষণ তবু তার একটা ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছিলো। কিন্তু এখন সে যে কোথায় আছে সে রহস্য কিছুই বোঝা গেলো না।

কিন্তু যে পাহারাওয়ালা তার হাতে লাঠি মেরেছিলো, তাকে সে ক্ষমা করলে না। উঠানে এক কোণে একটা টুল ছিলো, হঠাৎ সেখানা শূন্যে উঠে ঘুরতে ঘুরতে প্রথম পাহারাওয়ালার মাথার উপরে এসে পড়লো। বিকট চীৎকার করে সে পপাত ধরণীতলে হলো!

তার পরেই পূর্ণবাবু সভয়ে দেখলেন, রিভলভারটা মাটির উপর থেকে আবার শূন্যে লাফিয়ে উঠলো! চোখের নিমেষে বাকি পাহারাওয়ালা আবার অদৃশ্য হলো এবং পূর্ণবাবু এবারে খিড়কির দরজা দিয়ে একেবারে বাড়ির বাইরের দিকে দৌড় দিলেন! দুম করে রিভলভারের একটা শব্দ হলো—কিন্তু সে গুলিও তাঁকে স্পর্শ করতে পারলে না।

অদৃশ্য মানুষ দৃশ্যমান হলো

পূর্ণবাবু মাঠের উপর দিয়ে ছুটছেন ঝড়ের মতো বেগে। রিভলভারের লক্ষ্যকে ব্যর্থ করবার জন্যে তিনি সাপের মতো এঁকে-বেঁকে ছুটতে লাগলেন। খানিক দূর গিয়ে মুখ ফিরিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, সেই নাছোড়বান্দা রিভলভারটা তখনো বেগে তাঁর অনুসরণ করছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! ছুটন্ত মানুষ, ও তার পিছনে শূন্যপথে উড়ন্ত রিভলভার! বাজারের একখানা ছবিতে দেখা যায়, ভীত পরশুরামের পিছনে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র শূন্যপথে তেড়ে আসছে। এ-দৃশ্যও অনেকটা সেই রকম।

রিভলভার আরো দু-বার অগ্নিময় ধমক দিলে, কিন্তু তাও ব্যর্থ হলো! অদৃশ্য মানুষ নিশ্চয়ই রিভলভার ছোঁড়ায় অভ্যস্ত ছিলো না, এবারের মতো পূর্ণবাবু কোনো গতিকে প্রাণে বেঁচে গেলেন! কিন্তু তবু সে পূর্ণবাবুর পিছু ছাড়লে না, খালি রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে ধরবার জন্যে আরো জোরে অদৃশ্য পা-দুটো চালিয়ে দিলে!

আমাদের ডাক্তার মানিকবাবু সেদিন পথের ধারে একটা পুকুরঘাটে বসে নিজের মনে মাছ ধরছিলেন। মানিকবাবুর জীবনে এই একটি মাত্র শখ আছে। আর, তাঁর এ-শখ এমন দুর্দান্ত যে, তিনি শীত-গ্রীষ্ম মানতেন না, যে কোনো পুকুর-ঘাটে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসে পড়তেন। কিন্তু এমন একজন অকৃত্রিম মাছ শিকারীর উপরে মাছের দল মোটেই সদয় ছিলো না—ঘাটের উপরে তাঁকে দেখলেই তারা যেন তাঁর ছিপকে 'বয়কট' করতো। কিন্তু সে জন্যে মানিকবাবুর উৎসাহ কিছুমাত্র কমে না! কেউ ঠাট্টা করলে উল্‌টে বলেন, 'ওহে, মাছ ধরতে গেলেই যে মাছ ধরতে হবে, এর কিছু মানে আছে? তোমরা তো রোজ কতো রকম মন্ত্র পড়ে ভগবানকে ডাকো, কিন্তু ভগবান তোমাদের দেখা দেন কি?' এমন অকাট্য যুক্তির উপরে কারুর আর কোনো কথা বলবার থাকতো না।

মানিকবাবু একমনে মাছ ধরছেন—অর্থাৎ ধরবার চেষ্টা করছেন এমন সময়ে দ্রুত পদশব্দ শুনে মানিকবাবু মুখ তুলে দেখলেন, ভয়-ব্যাকুল পূর্ণবাবু পথের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছেন, এবং ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলছেন, 'অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ!'

পুকুর-ঘাটে বসে মানিকবাবুর আর বেশি কিছু শোনবার দরকার হলো না। তখন জলের মাছ ডাঙায় না তুলে, অদ্ভুত একটা ডিগবাজি খেয়ে ডাঙার মানুষ মানিকবাবু ঝুপ করে একেবারে জলের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মাছেরা সেদিন কি ভাবলে জানি না। হয়তো তারা ভাবলে, ডাঙায় বসে রোজ বিফল হয়ে মানিকবাবু রাগ করে আজ তাদের ধরবার জন্যেই জলের ভিতরে ঝাঁপ দিয়েছেন!

মাছেরা কি ভাবলে আর না-ভাবলে সেটা ভাববার অবসর মানিকবাবুর মোটেই রইলো না। কারণ তিনি সাঁতার জানতেন না। জলের ভিতরে প্রবেশ করেই সে-কথাটা তাঁর মনে পড়লো। ভুঁড়ি ভরে জল খেতে খেতে একখানা নিরেট জগদ্দল পাথরের মতো ক্রমেই তিনি নিচের দিকে নামতে লাগলেন। তারপরেই হঠাৎ তাঁর মনে হলো, জলের ভিতরে এতো নিচে নামা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাগলের মতো দু-বার হাত-পা ছুঁড়তেই তাঁর দেহটা আবার উপর দিকে উঠতে লাগলো।

পুকুরের ধারে একটা মস্ত বটগাছ জলের ভিতরে অনেকগুলো ঝুরি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো—জলের ঝুরি ঝুলিয়ে সেও যেন মাছ ধরবার চেষ্টা করছে! ভাগ্যে মানিকবাবুর দেহটা ঠিক সেইখানেই ভস্ করে ভেসে উঠলো, তাই বটের ঝুরি ধরে সে-যাত্রা মানে মানে তিনি তাঁর পৈতৃক-প্রাণটি রক্ষা করলেন।

মানিকবাবু নিজের মনে বললেন, 'বাপ! যে জলটা আজ খেয়েছি, এ-জীবনে বোধহয় আর জলতেষ্টা পাবে না! অদৃশ্য মানুষের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে শেষটা আজ আত্মহত্যা করেছিলুম আর কি! ...কিন্তু পূর্ণবাবুর কি হলো?'

মানিকবাবু ভয়ে-ভয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু পূর্ণবাবুর কোন পাত্তাই পাওয়া গেলো না!

কিন্তু ওদিকে ইতিমধ্যেই পাশা উল্‌টে গেছে!

পূর্ণবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহারাওয়ালারা থানায় গিয়ে খবর দিয়েছে এবং সেখান থেকে দলে-দলে সেপাই পূর্ণবাবুকে রক্ষা করবার জন্যে ছুটে এসেছে!

এখন পালাবার পালা হচ্ছে অদৃশ্য মানুষের!

কিন্তু পাছে সে আবার ফাঁকি দেয় সেই ভয়ে পূর্ণবাবু সেপাইদের ডেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'শীগগির! হাত-ধরাধরি করে সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও। অদৃশ্য মানুষ এর মধ্যেই আছে।'

সকলে তাড়াতাড়ি পূর্ণবাবুর কথামতো কাজ করলে।

পূর্ণবাবু আবার বললেন, 'সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চক্রটাকে ছোট করে আনো! তাহলে অদৃশ্য মানুষ আর পালাতে পারবে না!—তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বিপুল বিক্রমে অদৃশ্য মানুষ আগে তাঁকেই আক্রমণ করলে! এবারে পূর্ণবাবুও তাকে ছাড়লেন না, তার অদৃশ্য দেহটাকে তিনি দুইহাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন! তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে পথের উপরে গিয়ে পড়লেন।

সেপাইরা সবাই ছুটে এলো—হাত দিয়ে অনুভব করে সকলে মিলে অদৃশ্য মানুষের মাথা, গলা, বুক, বাহু, কোমর, জানু ও পা সজোরে চেপে ধরলে!

অদৃশ্য মানুষ একবার যন্ত্রণা বিকৃত বদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠলো, 'উঃ! গেলুম!'—তারপরে তার সমস্ত দেহ একেবারে স্থির হয়ে গেলো!

পূর্ণবাবু বলে উঠলেন, 'ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়াও! ও আহত হয়েছে—আর পালাতে পারবে না!'

সেপাইরা কেউ কেউ বললে, 'বদমাইশটা দুষ্টুমি করে চুপ করে আছে, ছেড়ে দিলেই পালাবে!'

পূর্ণবাবুর ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছিল, তাঁর শরীরেও নানা জায়গায় কাটাকুটির দাগ। সেই অবস্থাতে তিনি উঠে অদৃশ্য মানুষের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আন্দাজে তার বুকের উপরে হাত দিয়ে বললেন, 'না, বিধু আর পালাতে পারবে না! এর হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে গেছে! এ আর বেঁচে নেই!'

তখন শ্রীপুর শহরের সমস্ত লোক সেইখানে এসে জড়ো হয়েছিলো। সকলেরই মুখে বিস্ময় ও আতঙ্ক! সকলেই নানারকম কথা বলে চ্যাঁচামেচি করছে!

একটা বুড়ী ভিড়ের ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অদৃশ্য মানুষকে দেখবার চেষ্টা করছিলো। হঠাৎ সে ভীতস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি ওকে দেখতে পেয়েছি, আমি ওকে দেখতে পেয়েছি!'

বুড়ীর কথা শুনে পূর্ণবাবুও সচকিত দৃষ্টিতে দেখলেন, পথের ধুলোর উপরে কাঁচের মতো স্বচ্ছ একখানা মানুষের হাত ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে তার স্বচ্ছতা দূর হয়ে গেলো, তখন তাকে দেখাতে লাগলো ঠিক যেন ঘষা কাঁচের একখানা হাতের মতো!

একটা সেপাই বলে উঠলো, 'আরে, আরে, ওর পা-দুটোও যে দেখা যাচ্ছে!'

দেখতে দেখতে সকলের স্তম্ভিত চক্ষের সামনে অদৃশ্য মানুষের সমস্ত দেহটাই মায়াময় ছায়ার মতো ফুটে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে সেই ছায়াটা ক্রমেই ঘন ও নিরেট হয়ে উঠলো! তারপর অদৃশ্য মানুষ যখন স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হলো, তখন সে রক্তমাংসের সম্পূর্ণ গঠন ফিরে পেয়েছে!

যে ওষধির প্রক্রিয়ায় তার জীবন্ত দেহ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো, মরণ সেই ওষধির গুণ নষ্ট করে তার রক্তমাংসে গড়া দেহকে পৃথিবীর ধুলায় আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেলো!

পথের উপরে শুয়ে আছে একটি তিরিশ বছর বয়সের যুবা পুরুষ—তার সমস্ত দেহে আঘাতের দাগ এবং তার মুখে চোখে নিরাশা ও ক্রোধের চিহ্ন!

পূর্ণবাবু দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওর মুখে কাপড় ঢাকা দাও—দোহাই তোমাদের! ওর মুখে কাপড় ঢাকা দাও!'

পৃথিবীতে প্রথম যে-মানুষ অপূর্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসাদে রক্তমাংসে গড়া নিরেট দেহকে অদৃশ্য করবার অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছিলো, দুর্ভাগ্যক্রমে এমনি শোচনীয়ভাবে সে তার ভয়াবহ, ভীষণ জীবন সমাপ্ত করলে।

উপসংহার

বাবু বংশীবদন বসুকে তোমরা নিশ্চয়ই কেউ ভোলে নি। তোমাদের কারুর যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সাধ হয়, তাহলে চুপিচুপি পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে এসো। গোলমাল করলে তাঁর দেখা পাবে না, কারণ তোমরা যে তাঁকে আগে থাকতে চেনো এ-কথা টের পেলেই তিনি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারেন।

শ্রীপুরের পান্থনিবাস হোটেলে আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, হোটেলের হলঘরের মাঝখানে, একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে পরম আয়েসে বসে বংশীবাবু কেমন মিষ্টি মিষ্টি হাসি হাসছেন! বংশীবাবু এখন দাতব্য-জুতো ও ময়লা জামা-কাপড়কে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। তাঁর মাথায় এখন চমৎকার টেরি-কাটা, গায়ে ইস্ত্রি-করা সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি ও পায়ে বার্নিশ করা চকচকে জুতো! আর, তোমরা শুনলে বোধহয় অবাক হয়ে যাবে যে, এতো বড়ো পান্থনিবাস হোটেলটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন, এখন কেবল তিনিই! 'পান্থ-নিবাস'-এর এখন এমন পসার যে, শ্রীপুরের কোন লোক 'স্বাস্থ্যনিবাস'-এর নাম আর মুখেও আনে না।

এ-জন্যে বংশীবাবু বড়োই খুশি। যখন-তখন একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলেন, 'হুঁ হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ তো দেখোনি! আমার ময়লা জামা-কাপড় আর ছেঁড়া জুতো দেখে মিস্টার দাস ভারি তাচ্ছিল্য করেছিলেন! এখন বোধ হয় তিনি বংশীবদনের মহিমা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন!'

তাঁর হোটেলে বসে কেউ অদৃশ্য মানুষের নিন্দা করলে তিনি মুখ-ভার করে বলেন, 'ওগো তোমরা সবাই থামো! আমি গুরুনিন্দা শুনবো না! তোমরা যাঁকে অদৃশ্য মানুষ বলছো, তিনি ছিলেন আমার গুরুদেব! তাঁর আশীর্বাদেই আজ আমার এতো বাড়বাড়ন্ত!'

বংশীবাবুর গুরুভক্তি দেখে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। অদৃশ্য মানুষের হুকুমে শ্রীপুর ব্যাঙ্ক থেকে নোট-প্রজাপতিগুলো ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে গিয়ে বংশীবাবুর পকেটে যে বাসা বেঁধে-ছিলো, এ-কথা কেউ না জানুক, তোমরা সকলে নিশ্চয় জানো। অতএব এসো, আমরাও সবাই মিলে বংশীবাবুর গুরুজীর জয় দিয়ে পালা সাঙ্গ করি।

অমানুষিক মানুষ

॥ প্রথম ॥

শিকারির স্বর্গে

কলের গাড়ি, কলের জাহাজ, উড়োজাহাজ আর হাওয়াগাড়ির দৌলতে দুনিয়ার কোনও দেশই আজ আর অজানা নয়। ভূগোল সারা পৃথিবীর কোনও দেশের কথাই বলতে বাকি রাখেনি। পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেরও মানুষ জীব আবিষ্কার করেছে। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, ত্রিভুবন আজ তাঁদের নখদর্পণে।

পণ্ডিতদের বিশ্বাসকে অবহেলা করছি না। কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, পণ্ডিতদের জ্ঞান-রাজ্যের বাইরে এখনও এমন সব অজানা, অচেনা দেশ আছে, ভূগোলে যার কথা লেখা হয়নি। এ কথার উত্তরে ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা হয়তো আমাকে রুখে বকতে আসবেন—কিন্তু তার আগেই তাঁরা যদি দয়া করে আমার এই আশ্চর্য ইতিহাস শোনেন, তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব। মুখের কথায় সত্যকে অস্বীকার করলেও, উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

লোকে বাঙালিকে কুনো বলে। আমার মতে, বাঙালি সাধ করে কুনো হয়নি, কুনো হয়েছে—বাধ্য হয়ে। ভারতবর্ষের আর সব জাতি পেটের ধান্দায় যত সহজে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, বাঙালিরা তা পারে না কেন? বাঙালির আত্মসম্মান জ্ঞান বেশি বলে। উড়িয়ারা বিদেশে গিয়ে পালকি বইতে বা মালি কি বেয়ারা হতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। মাড়োয়ারিরা কলকাতায় এসে মাথায় ঘিয়ের মটকা, খাবারের থালা বা কাপড়ের মোট নিয়ে পথে পথে ফিরি করতে লজ্জা পায় না। ভারতের আরও অনেক বড়ো জাতির লোকেরা ফিজি দ্বীপে, আফ্রিকায় বা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে অম্লানবদনে কুলিগিরি করে। এইখানে বাঙালির বাধে। ছোটো কাজে সে নারাজ। অন্য জাতের লোকেরা পরে বড়ো হবার জন্যে আগে ছোটো হতে অস্বীকার করে না, কিন্তু বাঙালি বড়ো হবার লোভেও বিদেশিদের কাছে সহজে মাথা নিচু করতে চায় না। ফিরিওয়ালা হব? কুলিগিরি করব? রামচন্দ্র! এই হল বাঙালিজাতের মনের ভাব। মান বাঁচিয়ে বাঙালি 'কুনো' অপবাদও সইতে রাজি।

তাই আফ্রিকার অনেক জায়গায় গিয়ে ভারতের নানাদেশি লোকদের মধ্যে যখন বাঙালির সংখ্যা দেখলুম খুবই কম, বিশেষ বিস্মিত হলুম না। ভারত থেকে এখানে যারা এসেছে, তাদের অধিকাংশই ভদ্রলোকের কাজ করে না। বাঙালিরা তাদের দলে ভিড়তে চাইবে কেন?

আমিও বাঙালি হয়ে আফ্রিকায় কেন গিয়েছি, এ কথা তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো। কিন্তু আমার জবাব শুনলে বোধকরি একটু আশ্চর্য হবে। কারণ, আফ্রিকায় চাকরি, কুলিগিরি বা দোকানদারি করতে যাইনি,—আমি গিয়েছিলুম, শিকার করতে।

ভারী আমার শিকারের শখ! অর্থও আছে, অবসরও আছে,—কাজেই ভালো করেই শখ মিটিয়ে নিচ্ছি। ভারতের বনে-জঙ্গলে যতরকম পশু আছে, তাদের কোনও নমুনাই সংগ্রহ করতে বাকি রাখিনি। এবারে হিপোপটেমাস, গরিলা আর সিংহেরা আমার বন্দুকের সামনে আত্মদান করে ধন্য হতে চায় কি না, তাই জানবার আগ্রহেই আফ্রিকায় আমার শুভাগমন হয়েছে।

বাংলা দেশ তার বাঘ, হাতি, গোখরো সাপ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর জন্যে কম বিখ্যাত নয়। পৃথিবীর সব দেশের শিকারির কাছেই আমাদের সুন্দরবন হচ্ছে স্বর্গের মতো। সুন্দরবনের ভিতরে আমিও আমার জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছি সুন্দর ভাবেই। তার অগণ্য জলাভূমি, অসংখ্য নদ-নদী, স্নিগ্ধশ্যাম বনভূমি, নির্জন বালুদ্বীপ, বিজনতার মাধুর্য ও সোঁদা মাটির সুগন্ধ এ জীবনে কোনওকালে ভুলতে পারব না। সেখানে জলের কুমির গাছের অজগরকে দেখতে পেয়ে বিফল আক্রোশে ল্যাজ আছড়ায়, সেখানে নলখাগড়ার বনে বনে হলদে কালো ডোরা কাটা বিদ্যুতের মতো রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছুটোছুটি করে, সেখানে স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে বিষাক্ত বাষ্প বা কুয়াশা সুঁদরী গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আকাশকে আচ্ছন্ন করে দেয়! সুন্দরবনের ভিতরে আসতে না পারলে যে কোনও শিকারিই তার জীবন ব্যর্থ হল বলে মনে করে।

কিন্তু আফ্রিকার বিপুল অরণ্যও হচ্ছে শিকারির পক্ষে আর এক বিরাট স্বর্গ। সুন্দরবন তার কাছে কত ক্ষুদ্র! পশুরাজ সিংহ, হস্তী, গন্ডার, হিপো, জিরাফ, জেব্রা, চিতা, লেপার্ড, প্যান্থার, গরিলা, বেবুন, শিম্পাঞ্জি, ম্যানড্রিল, বরাহ, নু, উট, উটপাখি, ওকাপি, বনমহিষ, নানাজাতের হরিণ, বানর ও কুমির—আফ্রিকাকে বিশেষ করে মস্ত এক পশুশালা বললেই হয়, এত পশু পৃথিবীর আর কোথাও একত্রে পাওয়া যাবে না।

আফ্রিকার যে তিনটি জীবের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমার সবচেয়ে বেশি ঝোঁক, তারা হচ্ছে—গরিলা, সিংহ ও হিপোপটেমাস।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল আফ্রিকার অত্যন্ত গভীর অরণ্যও মানুষের পক্ষে সুগম হয়েছে। বনের ভিতর দিয়ে ভালো ভালো পথ ও তাদের উপর দিয়ে ছুটছে বড়ো বড়ো মোটরগাড়ি। আগে তিন বছরেও আফ্রিকার যতটা দেখা যেত না, এখন তার চেয়ে বেশি দেখতে গেলেও তিন মাসেই কুলিয়ে যায়। পদে পদে যে অজানা বিপদের আনন্দে আগেকার শিকারিদের জীবন হয়ে উঠত বিচিত্র, স্থলে মোটরের ও জলে কলের নৌকার আবির্ভাবে সে আনন্দ আজ অনেকটা কমে গেছে। আজকাল কেউ কেউ আবার উড়োজাহাজে চড়েও আফ্রিকায় যান 'শিকারি' বলে নাম কেনবার জন্যে। এতে যে শিকারের কী আমোদ আছে, সেটা তাঁরাই জানেন! তার চেয়ে তাঁরা তো পশুশালায় গিয়েও বাঘ, সিংহ, গন্ডার মেরে আসতে পারেন। বিপদহীন শিকার, 'শিকার' নামেরই যোগ্য নয়!

কিন্তু কঙ্গো-প্রদেশের কাবেল নামক জায়গায় এসে এ যুগেও আর মোটরগাড়ির যাত্রী হওয়া যায় না। এখান থেকে আমি কাফ্রি কুলিদের মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে, পায়ে হেঁটে

কঙ্গোর ভিতর দিকে প্রবেশ করলুম—বেশ কিছুকালের জন্যে সভ্যতার কাছে বিদায় নিয়ে। গরিলা বা হিপো বা সিংহের কবলে পড়ে এ বিদায়—চিরবিদায় হবারও সম্ভাবনা আছে।

যাত্রাপথে পড়ল বুনিয়নি হ্রদ। এ যে কী সুন্দর হ্রদ, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। টলটলে নীল জল, ধারে ধারে জলের ভিতর থেকে জেগে উঠছে শরবন। নীল জলের পটে জীবন্ত আঁকা-ছবির মতো বড়ো বড়ো পদ্ম, তাদের গায়ে মাখানো লালাভ ল্যাভেন্ডারের রং। তেমন বড়ো পদ্ম ভারতে ফোটে না—আকারে তাদের প্রত্যেক মৃণাল দশ ফুটের কম হবে না এবং তা নারকেল দড়ির মতো শক্ত! হ্রদের তীর থেকে উঠেছে তৃণশ্যামল উচ্চভূমি, ইউফোর্বিয়ায় খচিত।

বাংলা দেশের অরণ্য সুন্দর বটে, কিন্তু এমন বিচিত্র নয়। এখানে বনের সঙ্গে সঙ্গে আছে পাহাড়, উপত্যকা, ঝরনা ও হ্রদ, সুন্দরবনে যা নেই। প্রতি পদেই নতুন নতুন দৃশ্য এবং নতুন নতুন বিস্ময়। দিনের পর দিন বনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু নতুনত্বের পর নতুনত্বের আবির্ভাবে মনের মধ্যে এতটুকু শ্রান্তি আসছে না!

কিন্তু এখানকার সমস্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে মেশানো আছে যেন কোনও অভাবিত বিপদের অপচ্ছায়া! মধুর রূপ দেখলেও এখানে কবিত্ব উপভোগ করতে হয় পরম সাবধানে, কবিত্বে বিহ্বল বা একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্বনাশের সম্ভাবনা!

একদিন সন্ধ্যার সময়ে একটা নদীর ধারে আমরা তাঁবু ফেললুম। একে সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, তায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তাই কোন জায়গায় তাঁবু ফেলা হল সেটা আর লক্ষ করবার অবসর ও উৎসাহ হল না। কিন্তু এইটুকু অসাবধানতার জন্যেই সেদিন যে অঘটন ঘটল, তা ভাবতে আজও আমার গা শিউরে ওঠে!

রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়লুম এবং ঘুম আসতে বিলম্ব হল না। জীবনের অধিকাংশই আমার কেটে গিয়েছে পথে-বিপথে, তাই যেখানে সেখানে খুশি আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারতুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, কিন্তু এইটুকু মনে আছে, কী যেন একটা সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল!

ঘুমের ঘোর ভালো করে কাটতে না কাটতে শুনলুম, তাঁবুর বাইরে বিষম একটা হট্টগোল ও হুটোপুটির শব্দ!

ঘুমের ঘোর যখন একেবারে কাটল, সমস্ত গোলমাল তখন থেমে গেছে। তাঁবুর ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। বসে বসে ভাবতে লাগলুম, গোলমালটা শুনলুম কি স্বপ্নে?

কিন্তু তারপর যা হল সেটা স্বপ্ন নয় নিশ্চয়ই! আমার ডান দিক থেকে খুব জোরে ভোঁস করে একটা আওয়াজ হল!

তাড়াতাড়ি টর্চটা তুলে নিয়ে জ্বেলেই দেখি, তাঁবুর কাপড়ের দেওয়াল দুলছে!

ঠিক সেই সময়ে আমার বাঁ দিক থেকেও তেমনি ভোঁস করে একটা বেজায় শব্দ উঠল—সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেও তাঁবুর গা দুলতে লাগল!

ব্যাপার কী? এ কীসের শব্দ? তাঁবু এমন দোলে কেন?

হতভম্ব হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে দুই দিক থেকেই আবার দুই-তিন বার তেমনি শব্দ হল ও তাঁবু ঘন ঘন কাঁপতে লাগল!

তখনই রাইফেলটা তুলে নিলুম। বাইরে ও কারা এসেছে? এমন শব্দ করে কেন? কী চায় ওরা?.....

পরমুহূর্তে কী যে হল কিছুই বুঝতে পারলুম না,—আচম্বিতে যেন ভূমিকম্প উপস্থিত, মাথার উপরে যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল! প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমি হাত কয় দূরে মাটির উপরে ছিটকে পড়ে গেলুম।

অন্য কেউ হলে তখনই হয়তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত! কিন্তু বহুকাল আগে থেকেই বিপদের সঙ্গে আমার চেনাশোনা, বহুবারই সামনে দেখেছি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে; তাই আহত ও আচ্ছন্ন অবস্থাতেই মাটির উপরে পড়েই আবার সিধে হয়ে উঠে বসলুম!

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় অবাক হয়ে দেখলুম, দূরে সাদা মতো প্রকাণ্ড কী একটা দুম দুম করে চলে যাচ্ছে—অনেকগুলো পায়ের ভারে পৃথিবী কাঁপিয়ে এবং কোথাও আমার তাঁবুর চিহ্নমাত্র নেই!

ফ্যাল ফ্যাল করে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলুম, কিন্তু এপাশে-ওপাশে, সামনে-পিছনে—আমার তাঁবু নেই কোথাও!

অনেক কষ্টে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েক পা এগিয়ে দেখি, এক জায়গায় কতকগুলো ভাঙা কাঠ ও ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়ে রয়েছে এবং পরীক্ষা করে বোঝা গেল, সেগুলো হচ্ছে আমারই ক্যাম্প খাটের ধ্বংসাবশেষ!

আমার সঙ্গে ছিল ত্রিশজন কুলি ও চাকরবাকর, কিন্তু তারাও যেন কোনও যাদুমন্ত্রে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিলে গিয়েছে!

দূরে আবার অনেকগুলো ভারী ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম। ফিরে দেখি একদল বড়ো বড়ো জীব আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!

ভাগ্যে কাছেই একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল, চটপট তার উপরে উঠে বসলুম।

জীবগুলো আর কিছু নয়—একদল হিপো! তারা গদাইলশকরি চালে চলতে চলতে যেখানে আমার তাঁবু ছিল সেইখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপরে প্রত্যেকেই দুই একবার সেই ক্যাম্প খাটের ভগ্নাবশেষকে ভোঁস ভোঁস শব্দে শুঁকে পরীক্ষা করে, এদিকে ওদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় এবং তারপর নদীর দিকে চলে যায়।

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল।

বন্য পশুদের জলপান করতে যাবার জন্যে এক একটা নির্দিষ্ট রাস্তা থাকে—প্রত্যহই তারা সেই চেনা পথ ব্যবহার করে। এটা হচ্ছে হিপোদের জলপান করতে যাবার রাস্তা।

অন্ধকারে ও তাড়াতাড়িতে না দেখে আমরা আস্তানা গেড়েছিলুম হিপোদের এই নিজস্ব রাস্তার উপরেই!

হিপোদের গায়ের জোর ও গোঁয়ারতুমি যেমন বেশি, বুদ্ধিশুদ্ধি তেমনি কম। দুটো হিপো আগে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথের উপরে তাঁবু দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের দেখে পালায় আমার লোকজনরা। তখন তারা দুজনে দু-দিক থেকে ভোঁস ভোঁস শব্দে আমার তাঁবু শুঁকে হিপো বুদ্ধিতে স্থির করে—এটা নিশ্চয়ই কোনও বিপজ্জনক বস্তু বা জন্তু, নইলে কাল এখানে ছিল না, আর আজ কোথা থেকে উড়ে এসে নদীর পথ জুড়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? অতএব মারো ওটাকে জোরসে এক ঢুঁ!

কিন্তু ঢুঁ মারার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত তাঁবুটা যেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে তাদের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরলে, অমনি সমস্ত বীরত্ব ভুলে নাদাপেটা হাঁদারামরা তাঁবু ঘাড়ে করেই অন্ধের মতো দৌড়ে পলায়ন করেছে!

বনের ভিতরে আনাচেকানাচে এমনিধারা কত যে ধারণাতীত বিপদ সর্বদাই অপেক্ষা করে, তা বলবার কথা নয়! একবারমাত্র অসাবধান হলেই জীবনে আর-কখনও সাবধান হবার সময় পাওয়া যাবে না।

পল গ্রেটেজ নামে একজন জার্মান সৈনিক আফ্রিকায় মহিষ শিকার করতে গিয়ে কী ভয়াবহ বিপদে পড়েছিলেন, এখানে সে গল্প বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মহিষ শিকারের কথা শুনে কেউ যেন অগ্রাহ্যের হাসি না হাসেন। কারণ বন্যমহিষ বড়ো সহজ জীব নয়, অনেক শিকারির মতে সিংহ ব্যাঘ্রের চেয়েও তারা হচ্ছে বেশি সাংঘাতিক! ঘটনাটি মেজর ডবলিউ রবার্ট ফোরানের 'Kill : or Be Killed' নামে শিকারের প্রসিদ্ধ পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সত্য গল্পটি গ্রেটেজ সাহেবের মুখেই শ্রবণ করুন, শিকারের এমন ভয়ানক কাহিনি দুর্লভ

আমি তখন রোডেশিয়ার বাংউয়েলো হ্রদে স্টিমারে করে যাচ্ছিলুম। আমার দলে ছিল ফরাসি আলোকশিল্পী অক্টেভ ফিয়ের, কাফ্রি পাচক জেম্‌স ও আর চারজন দেশি চাকর।

সেদিন সকালে ডাঙায় নেমে আমরা প্রাতরাশ আহার করছি, হঠাৎ মুখ তুলে দেখেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম!

আমাদের কাছ থেকে হাত ত্রিশ তফাতেই তিনটে বন্যমহিষ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে! তারা যে সে জীব নয়, এমন বিরাটদেহ মহিষ আমি জীবনে কখনও দেখিনি! তারা যে ছায়ার মতো নিঃশব্দে কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা কেউই তা টের পাইনি!

দুই এক মুহূর্তের জন্যে আমরা সকলেই নীরব হয়ে রইলুম। এ নীরবতা যেন মৃত্যুরই অগ্রদূত—জীবন ও পৃথিবী যখন শ্বাস রোধ করে থাকে!

পরমুহূর্তেই আমি আমার 'মসার' রাইফেলটা তুলে নিলুম। এবং আমার দেখাদেখি ফিয়েরও তাই করলে। কারণ এই মহিষ তিনটে যদি আগে থাকতে হঠাৎ আক্রমণ করে তাহলে আমাদের কারুরই আর রক্ষা নেই!

আমি বন্দুক ছুড়লুম—গাছের পাখিদের শশব্যস্ত করে আওয়াজ হল ধ্রুম! সবচেয়ে

বড়ো মহিষটা ধপাস করে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় মাথা নাড়া দিলে, তারপর উঠেই ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, অন্য দুটোও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

খানিক পরে দেখা গেল, অন্য মহিষদুটো অনেক দূরে নদীর ধার দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে! কিন্তু আহত বড়ো মহিষটার আর দেখা নেই।

কোথায় গেল সে? মারাত্মকরূপে জখম হয়ে সে কি ঝোপের ভিতরে কাত হয়ে পড়ে আছে?

মাটির উপরে রক্তের দাগ ধরে আমরা খুব সহজেই তার অনুসরণে চললুম, কিন্তু তখন জানতুম না আমরা চলেছি স্বেচ্ছায় মরণের সন্ধানে!

তাকে ধরা সহজ হল না। আমরা চলেছি তো চলেছিই—সে সুদীর্ঘ রক্তের দাগের যেন শেষ নেই!

ছয় ঘণ্টা কেটে গেল, আমাদের শরীর একেবারে কাবু হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ আর বিশ্রাম না করলেই নয়। একটা গাছের ছায়ায় বসে জিরুতে লাগলুম।

সূর্য অস্ত যাবার কিছু আগে হঠাৎ একজন কুলি এসে খবর দিলে যে, খানিক তফাতেই একটা ঝোপের ভিতরে সেই আহত মহিষটা পড়ে পড়ে ধুঁকছে!

আমরা দুজনে তখনই সোৎসাহে উঠে সেইদিকে ছুটলুম।

কিন্তু সেই ঝোপের কাছে যাওয়া মাত্রই মহিষটা উঠে আগেই আমাদের আক্রমণ করলে।

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক ছুড়লুম—মহিষটা আবার চোট খেলে, কিন্তু তবু থামল না!

তার পথ থেকে আমি সরে দাঁড়াতে গেলুম, কিন্তু দৈবগতিকে একটা গাছের শিকড়ে পা আটকে একেবারে ভূতলশায়ী হলুম।

মূর্তিমান যমদূতের মতো মহিষটা আমার উপরে এসে পড়ল এবং আমাকে শিঙে করে টেনে তোলবার চেষ্টা করলে।

আমি কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে তার শিংদুটো দু-হাতে চেপে ধরলুম! আমার হাত ছাড়াবার জন্যে মহিষটা বিষম এক মাথা নাড়া দিলে এবং তার একটা শিং প্রবল বেগে আমার গালের ভিতরে ঢুকে গেল! ভীষণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আমি তার শিংদুটো ছেড়ে দিলুম এবং পর মুহূর্তে অনুভব করলুম সে আমাকে শূন্যে তুলে ছুড়ে দূরে ফেলে দিলে! তারপরে কী হল আর আমি জানি না।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানলাভ করে দেখলুম, কুলিরা আমাকে নদীর ধারে এনে শুইয়ে দিয়েছে। আমার সর্বাঙ্গে রক্তপ্রবাহ ও অসহ যাতনা। একজন ঠান্ডা জল ঢেলে আমার ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছে।

কোনওরকমে অস্ফুট স্বরে আমি বললুম, 'আমার বন্ধু কোথায়?'

—'তাঁকে ধরাধরি করে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি বাঁচবেন না।'

—'মহিষটা?'

—'মরে গেছে।'

কাছেই নদীতে আমাদের মোটর বোট ভাসছিল।

আমি বললুম, 'শিগগির! ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এসো!' আমার মুখের ভিতর থেকে তখন হু হু করে রক্ত বেরিয়ে আসছে! আর—আর, সে কী ভয়ানক যাতনা!

ওষুধের বাক্স এল। একজন কুলি আমার মুখের সামনে আরসি ধরলে। নিজের মুখ নিজে দেখেই আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলুম!

আমার ডান গালে এত বড়ো একটা ছ্যাঁদা হয়েছে যে তার ভিতরে অনায়াসেই হাতের মুঠো ঢুকে যায়! নীচেকার ঠোঁটখানা ছিঁড়ে কাঁপতে কাঁপতে ঝুলছে। তলাকার চোয়াল দুই জায়গায় ফেটে ও ভেঙে গেছে—কান আর ঠোঁটের কাছে। একখানা লম্বা ভাঙা হাড়ও বেরিয়ে ঝুলে আছে, তার উপরে রয়েছে তিনটে দাঁত! তলাকার চোয়ালের সমস্ত মাংস একেবারে হাড় থেকে খুলে এসেছে। আমার জিভখানাও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যতবার থুতু ফেলেছি, ছোটো-বড়ো হাড়ের আর ভাঙা দাঁতের টুকরো ঝরে ঝরে পড়ছে!

সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব, নিজের হাতে সূচ নিয়ে গাল ও হাড়ের মাংস সেলাই করতে লাগলুম। আজও আমি ভেবে উঠতে পারি না যে, কী করে আমি সেই অসাধ্য সাধন করেছিলুম! যন্ত্রণার উপরে তেমন যন্ত্রণা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব!

কোনও রকমে ব্যান্ডেজ বেঁধে ফিয়েরের কাছে গেলুম। তার অবস্থা একেবারেই মারাত্মক। তার দেহের তিন জায়গা শিঙের গুঁতোয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বাঁ দিকের বুকের সমস্ত মাংসপেশি ছিঁড়ে ঝল ঝল করে ঝুলছে! তাকে নিয়েও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে বাঁচল না।

চার-পাঁচ দিন পরে অনেক দূর থেকে ডাক্তার আনা হল—এবং তারপরে আবার অস্ত্র চিকিৎসা—আবার নতুন নরকযন্ত্রণা! অনেকদিন ভুগে আমি বেঁচেছি বটে, কিন্তু আমার মুখ হয়েছে চিরকালের জন্যে ভীষণদর্শন!'

আগেই যে মেজর ডবলিউ রবার্ট ফোরানের নাম করা হয়েছে, বন্যমহিষের ভীষণ বিক্রম সম্বন্ধে চিত্তোত্তেজক কাহিনি বলেছেন, এখানে সেটিও তুলে দিলুম। বলা বাহুল্য এটিও সত্য গল্প এবং এরও ঘটনাস্থল আফ্রিকা।

'একদিন আমার কাফ্রি ভৃত্য হামিসির সঙ্গে আমি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ খানিক তফাত থেকে উত্তেজিত সিংহ ও মহিষের প্রচণ্ড গর্জন ও চিৎকার শুনতে পেলুম!—সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন লম্ফঝম্পের আওয়াজ!

বুঝলুম নেপথ্যে বিষম এক পশুনাট্যের অভিনয় চলছে, যা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ জীবনে একবারের বেশি আসে না! পা টিপে টিপে অগ্রসর হলুম, পিছনে পিছনে এল হামিসি।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা খোলা জমির উপর এসে পড়লুম এবং তারপর যে দৃশ্য

দেখলুম তা আমার নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়ে দিলে—এমনকি আমার বন্দুকের কথাও আর মনে রইল না!

আমার চোখের সামনেই মস্ত একটা কেশরওয়ালা সিংহ এবং বিরাট একটা মহিষ মৃত্যু পণ করে বিষম এক যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে আছে! এ যুদ্ধ একজন না মরলে থামবে না। হায়রে, আমার সঙ্গে একটা ক্যামেরা যদি থাকত!

আমার এ পথে আসবার কত আগে থেকে এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তা বুঝতে পারলুম না। তবে যুদ্ধ যে এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে যোদ্ধাদের রক্তাক্ত দেহ দুটো দেখলেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইলুম—কিন্তু কতক্ষণ তা জানি না, স্থান ও কালের কথা আমার মন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সিংহটা মহিষের কাঁধের উপর রীতিমতো জাঁকিয়ে বসে আছে এবং মহিষ তার কাঁধ থেকে শত্রুকে ঝেড়ে ফেলবার যতরকম কৌশল জানে কিছুই অবলম্বন করতে ছাড়ছে না! সেই অবস্থাতেই সিংহ তার মাথার গোটাকয়েক প্রচণ্ড ঢুঁ ও নিষ্ঠুর শিঙের গুঁতো খেলে, কিন্তু তবু সে অটল!

অবশেষে মহিষটা এক ঝটকান মেরে সিংহটাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে এবং সে সামনে সরে যাবার আগেই তীক্ষ্ণ শিঙের এক গুঁতোয় শত্রুর দেহটা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিলে! তারপর সে কী ঝটাপটি, কী গর্জন, চিৎকার! আকাশ বাতাস অরণ্য যেন থর থর করে কাঁপতে লাগল! আমার মন স্তম্ভিত, আমার মেরুদণ্ড দিয়ে ছুটছে বিদ্যুৎপ্রবাহ!

কোনওরকমে পশুরাজ নিজেকে আবার শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়াল এবং সরে যাবার আগেই দাঁত ও থাবা দিয়ে মহিষের দেহের অবস্থা এমন শোচনীয় করে তুললে যে সে আর বলবার নয়! মহিষের দেহের মাংস ফালা ফালা হয়ে ঝুলতে লাগল! চতুর্দিকে রক্ত ঝরছে ও ধুলোর মেঘ উড়ছে! দুজনেই পরস্পরের দিকে মুখ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে মণ্ডলাকারে ঘুরছে আর ঘুরছে! প্রত্যেকেই পরস্পরের উপরে আবার লাফিয়ে পড়বার জন্যে সুযোগ খুঁজছে! তাদের ঘোরা আর শেষ হয় না! তারা নিজেদের ক্ষত আর যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল, নিশ্বাসে তাদের নাসারন্ধ্র স্ফীত, এবং মুখ করছে ক্রমাগত শোণিতবৃষ্টি!

আমি ভাবলুম, বিখ্যাত সিংহ বিক্রম এইবারে ঠান্ডা হয়েছে, পশুরাজ এখন ভালোয় ভালোয় সরে পড়বার চেষ্টা করবে! কিন্তু আমার ধারণা ভ্রান্ত! আচম্বিতে ঠিক বিদ্যুতের মতোই আশ্চর্য তীব্র গতিতে সিংহ আবার লাফ মেরে মহিষের স্কন্ধের উপরে উঠে বসল!

আমি স্থির করলুম, আর রক্ষা নেই—এবারে মহিষেরই শেষ মুহূর্ত উপস্থিত! পশুরাজ অতঃপর তার ঘাড় কামড়ে ধরবে এবং থাবা দিয়ে তার মাথাটা চেপে ধরে ঘুরিয়ে মুচড়ে দেবে; তারপর ঘাড় ভাঙা মহিষের মৃতদেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়বে! সিংহরা এই উপায়েই শিকারের পশুদের বধ করে।

মহিষ দুই হাঁটু গেড়ে ভূমিতলে বসে পড়ল এবং সেই অবস্থাতেই শত্রুকে আবার পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। তারপর চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে সে টপ করে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল এবং তার বিষম ভারী দেহ নিয়ে সিংহের গায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল! তার দেহের চাপে জব্দ হয়ে সিংহ তাকে ছেড়ে দিতে পথ পেলে না! বুঝি তার ঘাড়টাই মটকে গেল!

কিন্তু সিংহ তখনও কাবু হয়নি! মহিষ দু-পায়ে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সিংহ চড়ে বসল পুনর্বার তার কাঁধের উপরে! এবার সে একপাশ থেকে ঝুলে পড়ে শত্রুর দেহ চার থাবা দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভীম বিক্রমে বারংবার দংশন করতে লাগল এবং মহিষটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল কাতর স্বরে!

কিন্তু মহিষ তবু হার মানলে না! বারংবার গা-ঝাড়া দিয়েও যখন সে ছাড়ান পেলে না, তখন সে শেষ উপায় অবলম্বন করলে। হঠাৎ শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে মহিষ উলটে চিত হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল এবং তার বিপুল ও গুরুভার দেহের তলায় পশুরাজের দেহ গেল অদৃশ্য হয়ে!

মাটি তখন রক্তে রাঙা এবং সমস্ত জায়গাটার উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে! সিংহ ও মহিষ—কেউ আর নড়ছে না, যেন তারা কেউ আর বেঁচে নেই! আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, পরিণামে কী হবে? একবার পিছন ফিরে হামিসির দিকে তাকালুম—তার মুখ দিয়ে বইছে দর দর ধারে ঘামের ধারা, দুই স্থির চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত, দুই ঠোঁট ফাঁক করা, যেন সে মায়ামন্ত্রে সম্মোহিত! আবার ঘটনাস্থলের দিকে দৃষ্টি ফেরালুম।

ধীরে ধীরে টলতে টলতে মহিষ আবার উঠে দাঁড়াল, এবং হেঁটমুখে শত্রুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে!

সিংহের সর্বাঙ্গ তখন থেঁতলে তালগোল পাকিয়ে গেছে, কিন্তু তখনও সে মরেনি। মহিষ শিং নেড়ে আবার তাকে দুই-তিন বার গুঁতো মারলে, সঙ্গে সঙ্গে পশুরাজের প্রাণ বেরিয়ে গেল!

যুদ্ধক্ষেত্র একেবারে স্তব্ধ; কাছের কোনও গাছে একটা পাখি পর্যন্ত ডাকছে না! আমি কেবল আমার দ্রুতচালিত হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলুম!

মহিষ তখন খুব জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে এবং তার দেহ টলমল করে টলছে! সেই অবস্থায় বিজয়ী বীর মৃত্যুকে বরণ করলে! তার দেহ সশব্দে পরাজিত শত্রুর মৃতদেহের উপরে লুটিয়ে পড়ল!

আমাদের তখন আর কথা বলবার শক্তিও ছিল না। অভিভূত প্রাণে বিজেতা ও বিজিতের দেহ সেই নির্জন অরণ্যের মধ্যে ফেলে রেখে আমরা দুজনে পায়ে পায়ে চলে এলুম।

পশুদেহ হলেও সম্মুখ যুদ্ধে মৃত সেই দেহ দুটিতে হাত দেওয়া অধর্ম!'

॥ দ্বিতীয় ॥

রাতের অতিথি

সিংহের চেয়ে গরিলা বধ করবার জন্যেই আমার ঝোঁক ছিল বেশি! আফ্রিকার বনে বনে সিংহের অভাব নেই, তাদের দলে দলে বধ করেছে এমন লোকও অসংখ্য। কিন্তু গরিলা হচ্ছে দুর্লভ জীব। পৃথিবীর খুব কম চিড়িয়াখানায় গরিলা দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকাতেও গরিলার সংখ্যা খুব কম। তার উপরে দৈহিক শক্তিতে ও মানসিক বুদ্ধিতে তারা পশুরাজ্যে অতুলনীয় বলে অধিকাংশ শিকারি তাদের কাছে ঘেঁষতেও ভরসা পায় না।

কিভুর অরণ্য হচ্ছে গরিলাদের রাজত্ব। আমি এখন সদলবলে এইখানেই এসে হাজির হয়েছি।

একটি ছোটো খাত দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে, স্থানীয় ভাষায় তাকে 'কানিয়ানামা গুফা' বা 'মৃত্যু-খাত' বলে ডাকা হয়। এর এমন ভয়ানক নাম কেন তা পরীক্ষা করবার সুযোগ পাইনি। এরই আশেপাশে রয়েছে প্রকাণ্ড বাঁশবন—এখানকার ভাষায় যাকে বলে 'রুগানো'। এইখানেই সর্বপ্রথমে আমি গরিলার পদচিহ্ন দেখতে পেলুম।

কচি বাঁশের রসালো অঙ্কুর হচ্ছে গরিলার শখের খাবার। এখানে বন বলতেও বুঝায় প্রধানত বাঁশের বন। মাইলের পর মাইল চলে গেছে কেবল বাঁশবনের পর বাঁশবন এবং তাদের ভিতর থেকে মেঘ ছোঁয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মিকেনো, কারিসিম্বি ও বাইশোক নামে তিনটি আগ্নেয়গিরি। ওই সব পাহাড়ের দুর্গম স্থানগুলিও বাঁশবনের অধিকারভুক্ত হয়েছে। সেখানে বাঁশের ঝাড় এত ঘন যে, গাছ না কেটে কিংবা হামাগুড়ি না দিয়ে তার ভিতরে ঢোকা বা নড়াচড়া করা যায় না। বাঁশবনের কাছে কাছে নীচে রয়েছে জলবিছুটি গাছ, লালাভ সাদা ফুসিয়া জাতীয় পুষ্পগুল্ম, অজস্র ফুলে ভরা দোপাটি গাছ, শ্বেতবর্ণ ভেরোনিকা গুল্ম এবং বেগুনি, হলদে ও আলতা রঙা রাশি রাশি অর্কিড!

এইসব বনে বেড়িয়ে বেড়ায় দলে দলে গরিলা, মহিষ ও হস্তী। চিতাবাঘ ও অন্যান্য হিংস্রজন্তুর অভাবও এখানে নেই। এক বনের কচি বাঁশ সাবাড় হয়ে গেলেই গরিলারা অন্য বনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মানুষের মতন অনেকটা দেখতে হলেও তারা মানুষের মতো সভ্য নয়, তাই উদর চিন্তায় তাদের ব্যতিব্যস্ত হতেও হয় না, খাবার কেনবার জন্যে পয়সা রোজগার করতেও হয় না! বনে গাছ আছে, ভেঙে খাও; নদীতে জল আছে, চুমুক দাও! তারপর গাছের ডাল পাতা ভেঙে নরম বিছানা তৈরি করো, এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিব্যি আমামে জোরসে নাক ডাকাও! গরিলারা কী সুখেই আছে!

কিভু-অরণ্যে দু-রকম গাছ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একরকম গাছের নাম দেশি ভাষায় 'মুসুঙ্গুরা'। তার পাতাগুলি খুব ছোটো এবং তাতে গোলাপের মতন দেখতে হলদে হলদে ফুল ফোটে। লম্বায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু হয়! আর একরকম গাছের নাম 'মুগেসী'।

তার পাতা আখরোট পাতার মতন এবং তার উচ্চতা একশো ফুট পর্যন্ত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে তাতে ম্যাজেন্টার আভা মাখানো বেগুনি রঙের থোলো থোলো ফুল ফোটে। পূর্বোক্ত দুই গাছের উপরেই সবুজ ও সোনালি রঙের শৈবালের বিছানা পেতে জেগে থাকে সব রঙিন ও বিচিত্র অর্কিডরা! এখানে আরও যে কতরকম বাহারি ফুল দেখলুম তা আর বলা যায় না! এ যেন ফুলের দেশ!

কিন্তু এই ফুলের দেশেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কবিতার খাতা নিয়ে নয়, হত্যাকারী বন্দুক ঘাড়ে করে!

গরিলা শিকারের একটা মস্ত সুবিধা আছে। অনেক খুঁজে কষ্ট পেয়ে তবে সিংহ বা বাঘের পাত্তা মেলে। কিন্তু একবার গরিলাদের দেশে আসতে পারলে তাদের দর্শন পেতে বেশি দেরি হয় না। তার কারণ, তাঁরা থাকে দলবদ্ধ হয়ে। একে তো তাদের প্রত্যেকের গায়ে অসুরের মতন জোর, সিংহও জোরে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে কি না সন্দেহ, তার উপরে তারা যখন দল বেঁধে থাকে, তখন হাতি পর্যন্ত গরিলাদের কাছে তুচ্ছ বলে গণ্য হয়! তারা নিজেদের এই প্রতাপ ভালো করেই জানে, তাই কোনও শত্রু বোকার মতন কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারলে সেটার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না! সিংহ বা মানুষ দেখলে প্রথমে তারা অবহেলা প্রকাশ করে, কাছে এগিয়ে এলে মুখ খিঁচিয়ে দু-চার বার ধমক দেয়, কিন্তু যে শত্রু তাতেও সাবধান না হয়, তার কপাল বড়ো মন্দ! গরিলা চলে-ফেরে গদাইলশকরি চালে ধীরে ধীরে, এমনকি খুব বেশি বিপদে না পড়লে দৌড়াদৌড়ি করে শরীরকে সে ব্যস্ত করতে চায় না। এইসব কারণে গরিলার পিছু নেওয়া অনেকটা সহজ।

গরিলাদের সন্ধানে কিভু অরণ্যে এসে এক জাতের মানুষ দেখে অবাক হয়েছি। ইংরেজিতে এদের নাম 'পিগ্‌মি', আমি বাল্যখিল্য বলতে চাই। পৃথিবীতে এই বালখিল্যদের চেয়ে ছোটো আকারের মানুষ আর চোখে পড়ে না, মাথায় এরা আমার কোমরের চেয়ে উঁচু নয়। দূর থেকে এই বালখিল্যদের দেখলে মনে হয়, যেন একদল নয়-দশ বছরের ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বালখিল্যদের রং কুচকুচে কালো, চুল কোঁকড়া, নাক থ্যাবড়া, কোমরে খালি তেলে-চোবানো একটুকরো ন্যাকড়া ঝোলে। ছোটো চেহারা হলেও এদের দেহ খুব বলিষ্ঠ, সুদৃঢ় মাংসপেশিগুলো দেহের উপরে ফুলে ফুলে ওঠে! এবং এরা পরম সাহসী। নিজেদের দেহের মতনই ছোটো ছোটো বর্শা নিয়ে এরা গভীর জঙ্গলে শিকার করতে ঢোকে ও বড়ো বড়ো হাতি আর বন্যমহিষ বধ করে! শিকারই এদের একমাত্র জীবিকা। শাকসবজি, শিকড় খেয়েই এরা দিন কাটাতে পারে, যখন মাংস খাবার সাধ হয় তখন তির ধনুক বা বর্শা নিয়ে বনে গিয়ে শূকর বা হরিণ মেরে আনে। বালখিল্যরা আফ্রিকার অন্য কোনও বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। সবুজ বনের ভিতরে নৃত্যশীলা নদীর তীরে ছোটো ছোটো পাতার কুঁড়ে বানিয়ে পরম শান্তিতে তারা সরল জীবন কাটিয়ে দেয় এবং সভ্যতার কোনও ধারই ধারে না।

একদিন পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলুম, এক জায়গায় বড়ো বড়ো গাছের তলায় মাটির উপরে পর পর অনেকগুলো বাসা সাজানো রয়েছে। গুনে দেখলুম, ত্রিশটা বাসা। লতা, ডাল ও শুকনো পাতা দিয়ে প্রত্যেকটি বাসা তৈরি।

জিজ্ঞাসা করাতে আমার কুলিদের সর্দার জানালে, এগুলো গরিলাদের বাসা।

আমি বললুম, 'শুনেছি গরিলারা এক বাসায় দুদিন শোয় না?'

সে জানালে,—না, তবে তারা নিশ্চয়ই খুব কাছে আছে। কারণ এ বাসাগুলো টাটকা।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। বাঁশবন ও অন্যান্য নানা জাতের গাছের স্নিগ্ধ ছায়া নরম ঘাসের বিছানার উপরে ঝিলমিল করছে। গাছের ডালে ডালে দাঁড়কাক, কাঠঠোকরা, ঘুঘু, মধুপায়ী সূর্যপাখি ও একরকম গীতকারী চড়াইপাখি বন-মর্মরের সঙ্গে নিজেদের কণ্ঠ মিশিয়ে দিয়ে মিশ্রসঙ্গীত সৃষ্টি করেছে। উঁচু গাছের ঘন পাতার পর্দা সরিয়ে মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়েই পালিয়ে যাচ্ছে সোনালি বানররা! একপাশ দিয়ে ছোট্ট একটি নদী রুপোর লহর দুলিয়ে এঁকেবেঁকে চোখের আড়ালে চলে গেছে।

সূর্য অস্ত যেতে দেরি নেই। দূর থেকে একটা শব্দ কানে এল—কারা যেন মড় মড় করে গাছ ভাঙছে!

কুলির সর্দারের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কারা গাছ ভাঙছে?'

—'গরিলারা।'

আমি বললুম, 'তাহলে এইখানেই ছাউনি ফ্যালো। জায়গাটি আমার ভালো লাগছে। কাল আমরা গরিলা শিকারে যাব।'

কিন্তু সেই রাত্রেই আমার জ্বর এল—পরদিন আর শিকারে যাওয়া হল না। পাঁচ দিন জ্বরে ভুগে উপোস করে এমন দুর্বল হয়ে পড়লুম যে, আরও দিন তিনেক সেইখানেই বিশ্রাম করতে হল।

ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল।

সেদিন সকালে সবে আমি পথ্য করেছি, শরীর বড়ো দুর্বল। সঙ্গে করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী নিয়ে গিয়েছিলুম, মাঝে মাঝে তার পাতা ওলটাই এবং মাঝে মাঝে তাঁবুর বাইরে গিয়ে একখানা ক্যাম্পচেয়ার পেতে বসি। নদীর নাচ দেখি আর পাখিদের গান শুনি। এমনি ভাবে সারাদিন কাটল। সন্ধ্যার কিছু আগে একদল হাতি বনের ভিতরে মহা শোরগোল তুলে মড়মড়িয়ে গাছ ভাঙতে ভাঙতে খানিক তফাত দিয়ে চলে গেল—তারা আমাদের দিকে চেয়েও দেখলে না। এসব দৃশ্য এখন আমার চোখেও সহজ হয়ে এসেছে। হাতির পাল কেন, বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে দূরে সিংহদেরও খেলা করতে দেখেছি এবং তারাও আমাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিও দেয়নি বা আক্রমণ করতেও আসেনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল, পাখিদের কনসার্ট ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে থেমে গেল। স্তব্ধ অরণ্যের অন্তঃপুর থেকে একটা চিতাবাঘের গলা জেগে উঠল। আমিও আস্তে আস্তে তাঁবুর ভিতরে এসে ঢুকলুম।

সেদিন গুরুপাক খাবার সইবে না বলে দু-টুকরো রুটি জেলি মাখিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লুম।

আফ্রিকার বনের পাখিরা ভালো করে আলো ফোটবার আগেই এত বেশি চ্যাঁচামেচি শুরু করে যে, ভোর হতে না হতেই ঘুম ভেঙে গেল।

অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ করলুম। চাকর-বাকররা তখনও জাগেনি, কাজেই নিজেই উঠে কিঞ্চিৎ খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টা করলুম।

প্রথমেই আবিষ্কার করলুম, আমার জেলির টিনটা টেবিলের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে! তারপর দেখলুম, কাল যে চারখানা রুটি আমি না খেয়েই শুয়ে পড়েছিলুম, টেবিলের উপরে সেগুলোও নেই!

অত্যন্ত রাগ হল। নিশ্চয়ই কোনও চোর ও পেটুক কুলি কাল রাত্রে লুকিয়ে আমার তাঁবুর ভিতরে ঢুকেছিল ভেবে সর্দারকে ডাকলুম।

সব কথা শুনে সর্দার অন্যান্য কুলিদের আহ্বান করলে।

কিন্তু তাদের কেউ দোষ স্বীকার করলে না।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, 'আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমার তাঁবুর ভিতরে যদি কোনও চোরকে ধরতে পারি, তাহলে গুলি করে তাকে মেরে ফেলব!'.....

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ঘুমোবার সময়ে আমার বৃষ্টি ভারী মিষ্টি লাগে। পৃথিবী যখন ধারাজলে স্নান করছে, মাটি যখন কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে এবং পথিকদের কাপড়-চোপড় যখন ভিজে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে, আমি যে তখন দিব্যি শুকনো ও উত্তপ্ত দেহে পরম আরামে বিছানায় শুয়ে আছি, এই পরিতৃপ্তির ভাবটুকু মনকে খুশি করে তোলে এবং চোখে তন্দ্রাসুখের আবেশ মাখিয়ে দেয়! গাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টিবিন্দুর টুপুর টুপুর শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল, বিস্কুটের যে নতুন টিনটা সবে কাল সন্ধ্যায় খোলা হয়েছিল, সেটা আর টেবিলের উপরে নেই!

মন যে কী-রকম খেপে গেল তা আর বলা যায় না। শহরে এমন খাবার চুরি হলে বিশেষ ভাবনা হয় না। কিন্তু সভ্যতা ও হাটবাজার থেকে এত দূরে এই গহন বনে যেখানে একটা মোহর দিলেও একখানা বিস্কুট কেনা যায় না, সেখানে নিত্য যদি এইভাবে খাবার চুরি যেতে থাকে তাহলে দু-দিন পরেই আমাকে যে পাততাড়ি গুটিয়ে মানে এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল মাটির উপরে। কাল রাত্রে বৃষ্টি পড়ে তাঁবুর দরজার সামনেকার মাটি নরম করে দিয়েছে এবং সেইখানে কতকগুলো স্পষ্ট পায়ের দাগ। সে পদচিহ্ন মানুষের।

সেদিনও আগে সর্দারকে ডেকে চুরির কথা বললুম ও পায়ের দাগগুলো দেখালুম।

সর্দার খানিকক্ষণ ধরে দাগগুলো পরীক্ষা করলে। আফ্রিকার বনে বনে ঘোরা যাদের

ব্যবসা, ভূমিতলে পদচিহ্ন দেখে ভালো ডিটেকটিভের মতন তারাও যে অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে পারে, এ আমি জানতুম। সুতরাং এই পদচিহ্নগুলো দেখে সর্দার কী বলে তা শোনবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সর্দার হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে দাগগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। লক্ষ করলুম, তার মুখে চোখে বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেছে! সর্দারের পরীক্ষা যখন শেষ হল তার মুখ তখন গম্ভীর।

—'কী সর্দার, ব্যাপার কী?'

সর্দার হতাশভাবে কেবল দুবার মাথা নাড়লে।

—'কিছু বুঝতে পারলে না? কিন্তু আমি বলছি, এগুলো মানুষের পায়ের দাগ। আর এ দাগগুলো যার পায়ের, সে নিশ্চয়ই কুলিদের দলে আছে। আমরা শেষ গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে এসে পড়েছি। রাত্রে এই বিপজ্জনক বন পার হয়ে সেখান থেকে কোনও চোর আসতে পারে না, এ কথা তুমি মানো তো?'

—'হ্যাঁ হুজুর, মানি।'

—'তাহলে আমাদেরই কোনও কুলি এই চুরি করেছে।'

সর্দার আবার প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'না হুজুর, আমাদের কোনও কুলিই এ চুরি করেনি!'

—'সর্দার, তাহলে তুমি কী বলতে চাও শুনি?'

—'হুজুর, আমি যা বলতে চাই, তা শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না!'

—'কেন?'

—'আপনি ভাববেন আমি অসম্ভব মিথ্যাকথা বলছি!'

—'আচ্ছা, তোমার কী বিশ্বাস বলো। আমি বিশ্বাস করব।'

—'হুজুর, কাল রাতে আপনার তাঁবুতে যে চুরি করতে ঢুকেছিল, সে পুরুষমানুষ নয়।'

—'তার মানে?'

—'অন্তত এই পায়ের দাগগুলো যে স্ত্রীলোকের, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই!'

—'সর্দার, সর্দার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? যে বন গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে, যে বনে গরিলা, হাতি, বুনোমোষ আর বাঘের বাস, সেখানে রাত্রে চুরি করতে আসবে স্ত্রীলোক?'

সর্দার দৃঢ়ভাবে বললে, 'ওসব কথা আমিও ভেবে দেখেছি। কিন্তু এগুলো স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ।'

আমি স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে রইলুম। তারপর সর্দার চলে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে বললুম, 'শোনো। এসব কথা যেন কুলিদের কাছে জানিও না!'

সর্দার অল্প হেসে বললে, 'আপনি মানা না করলেও আমি বলতুম না। এ গল্প শুনলে তারা পেতনির ভয়ে এখনই আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে!'

সর্দারের কথা নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করি, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। ভয়াবহ কিভু-অরণ্য, যার চতুঃসীমানায় লোকালয় নেই, যার ভিতর দিয়ে দিনের বেলায় পথিকরা দলবদ্ধ ও সশস্ত্র হয়েও সভয়ে পথ চলে, মানুষের জীবন যেখানে প্রতিমুহূর্তেই হিংস্র জন্তুর দুঃস্বপ্ন দেখে, সেখানে গভীর রাত্রে একাকিনী স্ত্রীলোক,—এ কল্পনা হাস্যকর! সর্দার নিশ্চয়ই ভুল করেছে!

দুপুরবেলায় একটা বন্দুক নিয়ে বাইরে গেলুম। কাছাকাছি যদি কোথাও দুই একটা শিকারের পাখি পাওয়া যায় তাহলে আজকের নৈশ আহারটা সুসম্পন্ন হবে, এই ভেবে নদীর ধার ধরে গাছে গাছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলুম।

নদীর জলধারায় ঝরে ঝরে পড়ছে উজ্জ্বল রৌদ্রধারা এবং তার সঙ্গে বাতাসে বাতাসে বয়ে যাচ্ছে শত শত পাখির গানের আনন্দ-ধারা! চারদিকের জীবন্ত স্নিগ্ধতাটুকু আমার এত ভালো লাগল যে, জীবহিংসা করতে আর সাধ হল না। বড়ো জাতের একরকম বনপায়রা আমায় দেখে কাছের গাছ থেকে দূরের গাছে উড়ে গিয়ে বসল, কিন্তু আমি তাকে অনুসরণ করলুম না। মন যেন আমাকে ডাক দিয়ে বললে,—'আজকের এই উত্তপ্ত সূর্যালোকের আনন্দ সভায় তোমাদের যতটুকু বাঁচবার অধিকার, ওরও অধিকার তার চেয়ে একটুও কম নয়!'

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার তাঁবুর দিকে ফিরলুম।

হঠাৎ নদীর তীরে কী একটা চকচকে জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সূর্যালোক তার উপরে পড়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে!

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখি, আমার বিস্কুটের টিনটা সেখানে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে!

তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিলুম। টিন একেবারে খালি!

নদী তীরের বালির উপরে মানুষের পায়ের অনেকগুলো দাগ!

যে আমার টিন চুরি করেছে, সে লোকালয়ে ফিয়ে যায়নি, বৃষ্টিসিক্ত গভীর রাত্রে, এই ভীতিসঙ্কুল বন্য নদীর তীরে বসে জমাট অন্ধকারে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত প্রাণে উদরের ক্ষুধানিবৃত্তি করেছে। কে সে? সে যে আমার কোনও কুলি নয় বা স্ত্রীলোক নয়, এটা ঠিক! কিন্তু পুরুষ হলেও সে কী রকম পুরুষ? তার কি কোনও মাথা গোঁজবার আশ্রয়ও নেই? তার মনে কি মানুষের স্বাভাবিক ভয়ও নেই?

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে ছাউনিতে ফিরে এসে দেখি, সর্দার একটা গাছতলায় চুপ করে বসে আছে।

তাকে আমার নতুন আবিষ্কারের কথা জানালুম। শুনে তার মুখে নতুন কোনও বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল না! সে আবার খালি হতাশ ভাবে মাথা নাড়লে।

তার ব্যবহার রহস্যজনক। যেন সে কোনও গুপ্তকথা জানতে পেরেছে, কিন্তু আমার কাছে প্রকাশ করতে চায় না!

আমিও জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম না। তার মনে একটা ভ্রমাত্মক বিশ্বাস জন্মেছে, হয়তো আবার একটা কোনও উদ্ভট কথা বলে বসবে!

কেবল বললুম, 'সর্দার, এই অদ্ভুত চোরকে ধরতে হবেই। আজ রাত্রে আমি ঘুমব না, তুমি জেগে সতর্ক হয়ে থাকতে পারবে কি?'

সর্দার বললে, 'আমি স্থির করেছি, আজ রাত্রে এই গাছের উপরে উঠে পাহারা দেব।'

আমি তাকে ধন্যবাদ দিলুম।

সে রাত্রে আহারাদির পর আলো নিবিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমলুম না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, আজ রাত্রে মেঘ ও বৃষ্টি নেই, চাঁদের আলো আছে,—আর বাইরের গাছের টঙে জেগে আছে সতর্ক সর্দার। চোরকে সে অনায়াসেই দেখতে পাবে! আর বিছানায় শুয়ে জেগে আছি আমি—চোরকে অনায়াসেই ধরতে পারব!

বাইরে নিশুত রাতের বুকে দুলছে আর দুলছে একতালে ঝিল্লির ঝঙ্কার! মাঝে মাঝে দূর বন থেকে ভেসে ভেসে আসছে হস্তীর চিৎকার! আমার তাঁবুর উপর থেকেও দু-তিন বার একটা প্যাঁচা ডাক দিয়ে যেন বলে বলে গেল—হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!

আমি হুঁশিয়ার হয়েই রইলুম। বাইরের চোখ বুঁজে শুয়ে আছি বটে, কিন্তু মনের চোখ খোলা আছে! তন্দ্রা অনেকবারই সোহাগ করে আমাকে ঘুম পাড়াতে এসেছিল, কিন্তু আজ আর তার কোনও জারিজুরিই খাটল না! আমি জোর করে সারা রাত জেগে রইলুম!

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এলো, কিন্তু রাত্রের চোর এলো না! পাখিদের সমবেত চিৎকার শুনে মনে হল, আমার ব্যর্থতা দেখে তারা যেন আমাকে টিটকারি দিচ্ছে!

বিরক্ত মনে তাঁবুর পর্দা ঠেলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সর্দার কাছের একটা বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে সেলাম করলে।

আমি তিক্ত স্বরে বললুম, 'সারারাত জেগে থাকাই সার হল। বদমাইস চোরটা কাল আসেনি।'

সর্দার বললে, 'সে এসেছিল।'

—'এসেছিল!'

—'হ্যাঁ হুজুর, ওই বাঁশঝাড়ের মধ্যে!'

—'ওর ভিতর দিয়ে রাত্রে বা দিনে কোনও মানুষ আসতে পারে না।'

—'হুজুর, তাকে মানুষ মনে করছেন কেন?'

—'কী সর্দার, তুমিও কি তাকে পেতনি বলে ভাবো?'

'আমি তাকে কী মনে করি, আল্লাই তা জানেন! কিন্তু সে ওই বাঁশঝাড়ের মধ্যে এসেছিল, আমি কাল রাতে ওইখানে শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ শুনেছি! আজ এখনই ওই জায়গাটা আমি পরীক্ষা করে আসছি। বাঁশঝাড়ের তলাকার জমি এখনও পরশু রাতের বৃষ্টিতে নরম হয়ে আছে। ওই জমিতে আমি হাঁটু আর হাতের ছাপ দেখেছি। সে হামাগুড়ি

দিয়ে বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে আসছিল। কিন্তু তার চোখ আমাদের চেয়ে ঢের বেশি তীক্ষ্ণ, সে চোখ তো এখন আর মানুষের চোখ নয়! গাছের উপরে আমাকে সে নিশ্চয় দেখে ফেলেছে। তারপর আর কী সে বাঁশঝাড় ছেড়ে বাইরে বেরোয়?'

রুদ্ধ আক্রোশে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

সর্দার আবার শুধোলে, 'হুজুর, আমাদের তাঁবু তুলে এখান থেকে আজ রওনা হবার কথা। কখন যাবেন?'

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'আগে ওই চোরকে ধরব, তবে এখান থেকে এক পা নড়ব! যদি এক মাস এখানে থাকতে হয়, তাও থাকব! সর্দার, আজ তোমার তাঁবুটা আমার তাঁবুর পাশে এনে খাটিয়ে ফ্যালো। আজ রাত্রে তুমি আর গাছে চোড়ো না, নিজের তাঁবুর ভিতরে জেগে বসে থেকো। আমার তাঁবুতে আমিও জেগে থাকব। আমার ডাক শুনলেই তুমি বেরিয়ে এসো।'

সর্দার ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

সে রাতেও আবার জাগবার পালা। আকাশে চাঁদ জাগছে, বনে রক্তপিপাসা জাগছে, তাঁবুতে আমার চোখ জাগছে, বাঁশঝাড়ে চোর জাগছে! আর জাগছে নদী—যেন ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে শোনাতে!

সর্দার বলে কী?—'তাকে মানুষ মনে করছেন কেন?' সে মানুষ নয়! সর্দারের মনে কুসংস্কারের উদয় হয়েছে? আশ্চর্য কী, সে-ও তো আফ্রিকারই লোক! এই আফ্রিকা হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত কুসংস্কারের স্বদেশ! এখানে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে ঘুরে বেড়ায় শুধু ভূত আর পেতনি! যে নরখাদক জন্তু বেশি মানুষ মারে, সে আর এখানে সাধারণ জন্তু থাকে না, লোকে বলে—দুষ্ট মানুষই নাকি ঝাড়ফুঁক তুকতাকের গুণে জন্তুর দেহ ধরে নরনারীর ঘাড় ভাঙছে! তাই এদেশে ভূতের চেয়ে রোজার দল ভারী!

কাল সারা রাত কেটেছে অনিদ্রায়, আজও রাত দুপুর হয়ে গেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে তন্দ্রার আমেজ এসেছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ তাঁবুর ভিতরে খটমট করে জিনিস নড়ার আওয়াজ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে চট করে আমার তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল!

ঘরের ভিতরে কেউ এসেছে! ঘুটঘুটে অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু বিষম একটা পূতিগন্ধে চারিদিক বিষাক্ত হয়ে উঠেছে! মানুষের গা দিয়ে এ রকম দুর্গন্ধ বেরোয় না!

আমি শ্বাস রোধ করে পাথরের মতন স্থির ভাবে শুয়ে রইলুম। যে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছে সেও নিসাড়,—তন্দ্রা ছুটে যাবার সময়ে হয়তো আমি সামান্য চমকে উঠেছিলুম, হয়তো সে দাঁড়িয়ে আমাকে তীক্ষ্ণনেত্রে পরীক্ষা করছে, হয়তো সে অন্ধকারেও দেখতে পায়!

এইভাবে মিনিট পাঁচেক কাটল। নীরবতার ভিতরে কেমন একটা বন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমার কানকে আঘাত করতে লাগল বারংবার। আর সেই পূতিগন্ধ! উঃ, অসহনীয়!

আবার খট খট করে শব্দ হল! কেউ আমার টেবিলের উপরে জিনিসপত্তর নাড়াচাড়া করছে! আমি ঘুমোচ্ছি ভেবে নিশ্চয় সে নিশ্চিত হয়েছে!

আগে আন্দাজ করে নিলুম, চোর আমার টেবিলের কোন দিকে আছে। তারপর কোনওরকম জানান না দিয়ে আচম্বিতে এক লাফ মেরে টেবিলের সেইদিকে লাফিয়ে পড়লুম এবং চোরকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরতে গেলুম—

—সঙ্গে সঙ্গে দু-খানা অত্যন্ত সবল বাহু আমাকে এমন প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারলে যে, আমি আবার ছিটকে বিছানার উপরে এসে পড়লুম!

—দৈবগতিতে আমার হাত পড়ল ইলেকট্রিক টর্চের উপরে,—বন্দুকের সঙ্গে এটাকেও আমি প্রতি রাত্রে পাশে নিয়ে শয়ন করি।

টর্চটা তুলে নিয়েই টিপলুম চাবি এবং পর-পলকেই বৈদ্যুতিক আলো প্রবাহের মধ্যে আমার চোখের সুমুখে যে-মুখখানা জেগে উঠল, তার স্মৃতি আমি জীবনে ভুলতে পারব না!

রাশীকৃত উচ্ছৃঙ্খল কিলবিলে কালো সাপের মতন কেশগুচ্ছের মধ্যে একখানা ভয়ানক কালো মুখ! সে মুখ স্ত্রীলোকের এবং সে মুখ মানুষের—এবং সে মুখ মানুষের নয়! ওই অগ্নিবর্ষী দুটো ভাঁটার মতন ক্ষুধিত চক্ষু—তা মানুষের চোখ নয় কখনও! ওই দংশনোদ্যত ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর দন্তগুলো—ওগুলো কি মানুষের দাঁত?

হঠাৎ তীব্র আলোকছটায় মূর্তির চোখদুটো নিশ্চয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

আমি চিৎকার করে ডাকলুম—'সর্দার, সর্দার, সর্দার!'

কান ফাটানো ভয়াবহ এক গর্জনে আমার তাঁবুর ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কোনও মানুষেরই কণ্ঠ সে রকম অমানুষী গর্জন করতে পারে না!

শিউরে উঠে বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলে নিলুম এবং সেই মুহূর্তেই মূর্তিটা সাঁৎ করে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল!

এবং তারপরেই বাহির থেকে শুনলুম, ঘন ঘন হিংস্র গর্জন ও সর্দারের গলায় আর্তনাদের পর আর্তনাদ!

ঝড়ের বেগে বন্দুক নিয়ে বাইরে ছুটে গেলুম!

চাঁদের আলোয় সভয়ে দেখলুম, তাঁবুর দরজার সামনেই সর্দার মাটির উপরে পড়ে গোঁ গোঁ ও ছটফট করছে এবং একটা ঘোর কালো বিভীষণা নগ্ন মূর্তি সর্দারের দেহ বৃহৎ সর্পের মতন দুই কৃষ্ণ বাহু দিয়ে চেপে রেখে তার টুঁটি কামড়ে ধরেছে প্রাণপণে! মূর্তিমতী হিংসা!

বন্দুক ছোড়বার উপায় নেই—সর্দারের গায়ে গুলি লাগবার ভয়ে। বন্দুক তুলে আমি সেই ভীষণ মূর্তির মাথায় কুঁদো দিয়ে করলুম প্রচণ্ড এক আঘাত!

মূর্তিটা তীব্র—তীক্ষ্ণ স্বরে পশুর মতন একটা বিশ্রী আর্তনাদ করে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—তার মাথার এলানো ঝাঁকড়া চুলগুলো চারিদিকে ঠিকরে

পড়ল—তারপর সে আমাকে লক্ষ্য করে আহত কেউটের মতন এক লাফ মারলে—আমি দুই পা পিছিয়ে এলুম এবং সে আবার ঘুরে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে মড়ার মতন স্থির হয়ে রইল!

সর্দারের কাছে দৌড়ে গেলুম, কিন্তু সে নিজেই উঠে বসল।

—'সর্দার, সর্দার, তোমার গলা দিয়ে রক্ত ঝরছে!'

সর্দার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে বললে, 'বেশি কামড়াতে পারেনি, কিন্তু আপনি আর একটু দেরি করলেই আমি মারা পড়তুম! ...কিন্তু—কিন্তু—ও কীসের আওয়াজ?' সে অত্যন্ত ভীত ভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল!

সত্য! নিঝুম রাত্রে আচম্বিতে অরণ্য যেন সজাগ হয়ে উঠেছে! মাটি থরথর করে কাঁপছে, বনের গাছ মড় মড় করে ভেঙে পড়ছে, বাঁশঝাড় টলমল করে টলছে! সঙ্গে সঙ্গে একটা একটানা অব্যক্ত, অদ্ভুত ও ভীতিময় সমবেত কণ্ঠধ্বনি ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে!

ততক্ষণে আমাদের সমস্ত কুলি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে। প্রায় পরিপূর্ণ চন্দ্র তখন মাঝ আকাশে সমুজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করছে, আলোআঁধারিমাখা অপূর্ব বনভূমির ধার দিয়ে চকচকে রুপোলি পাড়ের মতন নদীটি আপন মনে বয়ে যাচ্ছে কলসংগীতে মুখর হয়ে, এবং তৃণশ্যামল ভূমির উপরে আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে স্বপ্নময় জ্যোৎস্না!

কিন্তু এই সমস্ত সৌন্দর্যকেই ব্যর্থ করে দিলে সেই ক্রমবর্ধমান অজ্ঞাত সম্মিলিত কণ্ঠের ভয় জাগানো কোলাহল! আমরা সকলে মিলে কী একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে আড়ষ্ট নেত্রে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম,—সর্দারও তাড়াতাড়ি উঠে আমার পাশে এসে দাঁড়াল তার চোখদুটো তখন ভয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে!

পূর্ব দিকের অরণ্যের ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভীত পাখিরা ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করে বাসা ছেড়ে উড়ে পালাল, গোটাকয়েক সোনালি বানর ও একটা চিতাবাঘ সামনের জমি পার হয়ে পশ্চিম দিকে বেগে দৌড় দিলে!

সর্দার অস্ফুট স্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'হুজুর, ওইদিকে! ওইদিক থেকেই ওরা আসছে!'

অভাবিত কোনও বিভীষিকায় আমার গলা শুকিয়ে এসেছিল, কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওরা? ওরা মানে কারা?'

কিন্তু সর্দারের গলা দিয়ে আর কোনও কথা বেরুল না,—তার মুখ মড়ার মতন সাদা।

সেই বিপুল—অথচ অব্যক্ত কোলাহল তখন খুব কাছে এসে পড়েছে এবং মাটিতে তখন লেগেছে যেন ভূমিকম্পের ধাক্কা! আমি এমন অপার্থিব কোলাহল আর কখনও শুনিনি—এ মানুষের কোলাহল নয়, কিন্তু এ রকম কোলাহল তুলতে পারে এমন কোনও জন্তুও পৃথিবীতে আছে বলে জানি না!

হঠাৎ পূর্ব দিকের বাঁশঝাড়ে যেন ঝড়ের মাতন লাগল—কতকগুলো খুব বড়ো বাঁশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল!

তারপরেই—ও কী ও? ওরা কারা? জ্যোৎস্নাময় রাত্রে অরণ্যের স্বচ্ছ ছায়ায় দেখা যাচ্ছে এক জমাট অন্ধকারের জীবন্ত প্রাচীর!

স্তম্ভিত নেত্রে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, সেই অন্ধকার প্রাচীরের যেন অসংখ্য বাহু আছে—বাহুগুলো মানুষের বাহুর মতন!

এমন সময়ে আমার পাশ থেকে একটা কালো বীভৎস মূর্তি বিদ্যুতের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল—সে ছুটছে ওই অগণ্য বাহুকণ্টকিত জীবন্ত অন্ধকার প্রাচীরের দিকেই!

এক পলকের জন্যে ফিরে দেখলুম, মাটির উপরে সেই অচেতন দানবী মূর্তিটা আর নেই—কখন তার জ্ঞান হয়েছে আমরা কেউ দেখতে পাইনি, দেখবার সময়ও ছিল না!

দেখতে দেখতে মূর্তিটা সেই বিরাট অন্ধকার প্রাচীরের ভিতরে মিলিয়ে গেল!

আমি সেইদিকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলে গুলির পর গুলি ছুড়তে লাগলুম,—উত্তেজনায়, দুর্ভাবনায়, ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি যেন পাগলের মতন হয়ে উঠলুম—কাল রাত্রে টোটার মালা পরেই শুয়েছিলুম—বন্দুকে গুলি ভরি, আর ছুড়ি! নৈশ আকাশ আমার বন্দুকের ঘন ঘন গর্জনে বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল, কতবার যে বন্দুক ছুড়লুম তা আমি জানি না!

হঠাৎ সর্দার আমার হাত চেপে ধরে বললে, 'হুজুর, মিথ্যে আর টোটা নষ্ট করছেন কেন?'

তখন আমার হুঁশ হল! চক্ষের উদভ্রান্ত ভাব কেটে গেল, পূর্ব দিকে তাকিয়ে আর সেই জীবন্ত অন্ধকার প্রাচীরকে দেখতে পেলুম না! সেই অব্যক্ত ভীম কোলাহলের বিভীষিকাও আর নেই এবং বাঁশঝাড়ও আঁকা ছবির মতন একেবারে স্থির!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি মাটির উপরে বসে পড়লুম।

শ্রান্ত স্বরে বললুম, 'ওরা কারা আসছিল?'

—'গরিলারা।'

—'গরিলারা? কেন?'

—'টানাকে নিয়ে যাবার জন্যে।'

—'টানা আবার কে?'

—'যে চুরি করতে রোজ আপনার তাঁবুর ভিতরে ঢুকত!'

—'সর্দার, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ? তুমি কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না!'

—'হুজুর, টানা হচ্ছে মানুষের মেয়ে। তার বয়স যখন এক বছর, গরিলারা তখন তাকে চুরি করে নিয়ে পালায়। সে আজ পনেরো বছর আগেকার কথা! সেইদিন থেকেই সে গরিলাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, মানুষ হলেও তার ব্যবহার এখন গরিলারই মতন। অনেকদিন আগে আমি এই গল্প শুনেছিলুম, কিন্তু টানাকে আজ প্রথম দেখলুম। আল্লার কাছে প্রার্থনা তাকে যেন আর কখনও না দেখতে হয়!'

চন্দ্রলেখায় সুদূর বনভূমিকে পরি-পুরীর মতন দেখাচ্ছে। মানুষের মেয়ে টানা,—কিন্তু মানুষ এখন তার কাছে শত্রুর জাতি! হয়তো বনের ভিতরে বসে টানার গরিলা অভিভাবকরা এখন তার মাথার ব্যথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! আচ্ছন্নের মতন বনের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম! কী বিস্ময়কর এই বিচিত্র জগৎ।

॥ তৃতীয় ॥

সিংহের গহ্বরে

আমি তখন আফ্রিকার উগান্ডা প্রদেশে।

একটা সিংহ আমার বন্দুকের গুলিতে জখম হয়ে পালিয়ে গিয়েছে,—মাটির উপরে রক্তের দীর্ঘ রেখা রেখে। সেই রক্তের দাগ দেখে দেখে আমি সিংহের খোঁজে এগিয়ে চলেছি। আমার সঙ্গে আছে কাফ্রি জাতের কয়েকজন লোক।

সামনেই মস্ত এক পাহাড়। একটা পথ সমতল ক্ষেত্র থেকে পাহাড়ের উপরে উঠে মিলিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়েই যে সিংহটা পলায়ন করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলুম।

আমি পাহাড়ের উপরে ওঠবার উপক্রম করছি,—এমন সময়ে কাফ্রিদের দলের সর্দার আমাকে বাধা দিয়ে বললে, 'হুজুর, ও পাহাড়ে উঠবেন না!'

'কেন?'

—'ও হচ্ছে শয়তানের পাহাড়!'

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'শয়তানের পাহাড়! সে আবার কী?'

সর্দার মুখখানা বেজায় গম্ভীর করে বললে, 'ও পাহাড়ের শেষ নেই। ওর ভেতরে কারা থাকে তা আমি দেখিনি, কিন্তু শুনেছি তারা মানুষ নয়।'

—'তা আর আশ্চর্য কী? বনে-জঙ্গলে তো মানুষের বাস না থাকবারই কথা। আর আমি তো এখানে মানুষ শিকার করতে আসিনি!'

—'না, হুজুর! আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না! ও পাহাড়ের ভেতরে আছে জুজুদের রাজ্য। তাদের চেহারা দেখলেই মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যায়!'

—'কী বলছ সর্দার, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! জুজু-টুজু আমি মানি না,—আমি ওখানে যাবই! এসো আমার সঙ্গে!'

সর্দার ভয়ে আঁতকে উঠে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, 'আমি? এত তাড়াতাড়ি মরতে রাজি নই! আমার দলের কেউই ওখানে যাবে না,—হুজুর বরং নিজেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন!'

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও হল না—দলের সবাই একবাক্যে বলে উঠল, 'আমরা কেউ যাব না!'

ফাঁপরে পড়ে গেলুম। যে-সিংহটার পিছু নিয়েছি, তেমন প্রকাণ্ড সিংহ বড়ো একটা চোখে পড়ে না। বন্দুকের গুলিতে সে এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে যে, আর বেশিদূর পালাতে পারবে বলেও মনে হয় না। এমন একটা শিকারকে হাতছাড়া করব?

যা থাকে কপালে, এগিয়ে পড়ি! এই ভেবে বললুম, 'আচ্ছা সর্দার, তোমরা তবে আমার জন্যে এইখানেই অপেক্ষা করো,—আমি সিংহটাকে শেষ করে ফিরে আসছি!'

সর্দার বললে, 'হুজুর আমার কথা শুনুন, ওই জুজু পাহাড়ে গেলে কোনও মানুষ আর বাঁচে না!'

অসভ্যদের কুসংস্কার দেখে আমার হাসি পেল। আমি আর কোনও জবাব না দিয়ে, রক্তের চিহ্ন ধরে ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলুম।

আহত ব্যাঘ্র বা সিংহ যে কী বিপজ্জনক জীব প্রত্যেক শিকারিই তা জানে। কাজেই খুব হুঁশিয়ার হয়ে বন্দুক তৈরি রেখেই আমি এগিয়ে চলেছি।

প্রায় তিনশো ফুট উপরে উঠে দেখলুম, রক্তের দাগ হঠাৎ পথ ছেড়ে ডান দিকের এক জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। সে এমন ঘন জঙ্গল যে, তার ভিতরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব।

আমাকে তখন শিকারের নেশায় পেয়ে বসেছে। একটুও ইতস্তত না করে আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের নিবিড়তা দেখে বেশ বোঝা গেল, এ তল্লাটে কোনওদিন কোনও মানুষের পা পড়েনি। চারদিক ভয়ানক নির্জন। যেখান দিয়ে যাচ্ছি, দিনের বেলাতেও সেখানে আলো ঢোকে না।

হঠাৎ বাধা পেলুম। পাহাড়ের গায়ে সুমুখেই একটা গুহা রয়েছে এবং রক্তের দাগ গিয়ে ঢুকেছে সেই গুহার মধ্যেই।

আহত সিংহটা আছে তাহলে ওই গুহার ভিতরেই? হয়তো ওই গুহাটাই হচ্ছে তার বাসা!

গুহার ভিতরে কী অন্ধকার! অনেক উঁকিঝুঁকি মেরেও কিছুই দেখতে পেলুম না। সিংহটারও কোনও সাড়া নেই। হয়তো ভিতরে বসে সে-ও আমার গতিবিধি লক্ষ করছে! হয়তো আচম্বিতে মহা ক্রোধে আমার উপরে সে লাফিয়ে পড়বে!

কাছে ইলেকট্রিক টর্চ ছিল। টর্চটা জ্বেলে গুহার ভিতরে আলো ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, গুহার মুখ থেকে হাত-পাঁচেক তফাতেই প্রকাণ্ড একটা সিংহের দেহ মেঝের উপরে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে!

টর্চের তীব্র আলোতেও সিংহটা একটুও নড়ল না! খানিকক্ষণ লক্ষ করতেই বুঝলুম, তার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও লক্ষণ নেই! সিংহটা মরেছে!

কিন্তু সাবধানের মার নেই। আহত জন্তুরা অনেক সময়ে এমনি মরণের ভান করে।

তারপর হঠাৎ শিকারির ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণ কামড় বসিয়ে দেয়! কাজেই টর্চটা কৌশলে জ্বেলে রেখেই সিংহটার দেহের উপরে আরও দু-দুটো গুলিবৃষ্টি করলুম। তার দেহ তবু একটুও নড়ল না। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গুহার ভিতরে প্রবেশ করলুম। এত কষ্ট সার্থক হল বলে আমার প্রাণ তখন আমোদে মেতে উঠেছে!

গুহাটা ছোটো। কিন্তু কী ভীষণ স্থান! মাথার উপরে কালো পাথর, আশেপাশে কালো পাথর, পায়ের তলায় কালো পাথর—আর তাদের গায়ে মাখানো কালো অন্ধকার! সেই কালোর ঘরে চারিদিকে বিশ্রী ভয়াবহ ভাব সৃষ্টি করে মেঝের উপরে সাদা ধবধবে যে জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে, সেগুলো মাংসহীন হাড় ছাড়া আর কিছুই নয়! হয়তো তার ভিতরে মানুষেরও হাড়ের অভাব নেই!

মানুষের কথা মনে হতেই আর একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

গুহার কোণে হাড়ের রাশির সঙ্গে কালো রঙের কী একটা পড়ে রয়েছে। বন্দুকের নল দিয়ে নেড়েচেড়ে বোঝা গেল সেটা একটা জামা ছাড়া আর কিছুই নয়!

জামা! কোট! তাহলে এ সিংহটার মানুষ খাওয়ারও অভ্যাস ছিল!

বন্দুকের সাহায্যে কোটটাকে উপরে তুলতেই কী একটা জিনিস তার ভিতর থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

হেঁট হয়ে দেখি, একখানা পকেট বই! সিংহের আক্রমণে যার প্রাণের প্রদীপ নিবে গেছে, নিশ্চয়ই এটি সেই হতভাগ্যেরই সম্পত্তি!

খুব সম্ভব এটি কোনও শ্বেতাঙ্গ শিকারির জিনিস। ওর ভিতরে হয়তো তার পরিচয় লেখা আছে, এই ভেবে আমি পকেট বইখানা কৌতূহলী হয়ে কুড়িয়ে নিলুম।

পকেট বইখানা খুলে, তার উপরে টর্চের আলো ফেলেই চমকে উঠলুম!

এর পাতায় পাতায় যে বাংলাতে অনেক কথা লেখা রয়েছে!

আমার মন বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল! কোথায় বাংলা দেশ, আর কোথায় উগান্ডার সিংহ-বিবর! ঘরমুখো বাঙালি এতদূরে ছুটে এসেছে নিষ্ঠুর সিংহের ক্ষুধার খোরাক জোগাবার জন্যে!

তারপরেই মনে হল,—এ ব্যাপারে আর যে কেহ অবাক হতে পারে, কিন্তু আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়! কারণ, আমিও তো বাঙালি—এবং আমিও তো আজকেই সিংহের খোরাক হলেও হতে পারতুম! তারপর ওই হতভাগ্যের মতন আমারও হাড়গুলো হয়তো এখানকার অস্থিস্তূপকে আরও কিছু উঁচু করে দিত। সে হাড়গুলো দেখে কেউ আমার কোনও পরিচয়ই জানতে পারত না!

সেই ভীষণ গুহার—হিংসার ও হত্যার গুহার এবং তার সামনেকার জঙ্গলের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালুম।

তারপরেই মনে পড়ল কাফ্রিদের ভয়ের কথা—শিকারের উত্তেজনায় এতক্ষণ যে কথা ভুলে গিয়েছিলুম!

ওরা এই পাহাড়টাকে জুজু পাহাড় নাম দিয়েছে! কেন? ওরা বলে, এখানে যারা থাকে, তাদের দেখলেই মানুষ মরে যায়। কেন? এ মুল্লুকের কোনও মানুষই এ পাহাড়ের ত্রিসীমানায় আসে না। কেন?

তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকিয়ে এইসব 'কেন'র জবাব খোঁজবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। নির্জন পথ, নির্জন পাহাড়, নির্জন অরণ্য! নিস্তব্ধতা ও নির্জনতার উপরে ধীরে ধীরে গোধূলির ম্লান আলো নেমে আসছে! এই নিস্তব্ধতা ও নির্জনতা কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হল। তা ছাড়া আমার মনে কোনওরকম ভয়ের ভাবই জাগল না।

সন্ধ্যা আসছে,—এখানে আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে এলুম।

কাফ্রিদের সর্দারের মুখের ভাব দেখেই বুঝলুম, আমি যে আবার ফিরে আসব, এ আশা সে করেনি!

আমি হেসে বললুম, 'সর্দার, আমার মুখের পানে অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন? ভয় নেই, এখনও আমি ভূত হইনি!'

সর্দার খুব ভীত কণ্ঠে খুব মৃদুস্বরে বললে, 'আপনি তাদের দেখেছেন?'

—'কাদের?'

—'যারা মানুষ নয়?'

—'হ্যাঁ, মানুষ নয় এমন একটা জীবকে আমি দেখেছি বটে!'

সর্দার ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল, তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না!

তার ভাব দেখে আমি হো হো করে হেসে উঠে বললুম, 'হ্যাঁ সর্দার! মানুষ নয় এমন একটা জীবকে আমি সত্যিই দেখেছি—আর সে জীবটা হচ্ছে আমাদেরই সেই আহত সিংহটা! একটা গুহার ভেতরে সে মরে কাঠ হয়ে আছে!'

সর্দারের যেন বিশ্বাস হল না। থেমে থেমে বললে, 'আর কিছুই দেখেননি হুজুর?'

—'কিছু না—কিছু না—একটা নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত না!'

সর্দার তখন আশ্বস্ত হয়ে বললে, 'তাহলে আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। ও পাহাড়ে যারা যায়, তারা আর ফেরে না।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা সর্দার, বলতে পারো, আমার আগে ও পাহাড়ে আর কোনও বাঙালি কখনও গিয়েছিল?'

—'হ্যাঁ হুজুর, গিয়েছিল। ঠিক এক বছর আগে! আমিই তাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলুম। আপনার মতন সে-ও আমার কথা শোনেনি। আমার মানা না মেনেই সেই বাবু ওই পাহাড়ের ভেতরে যায়। কিন্তু সে বাবু আর ফিরে আসেনি।'

আমি বললুম, 'কেমন করে সে ফিরবে? তার হাড় সে সিংহের গর্তের ভিতরে পড়ে রয়েছে!'

কিন্তু সেই বাঙালিবাবুর প্রাণ গেছে যে সিংহের কবলে, সর্দার একথা বিশ্বাস করতে চাইলে না। সে 'শয়তান', 'জুজু' ও আরও কত কী নাম করে নানান কথা বলতে লাগল—কিন্তু সেসব কথায় আমি আর কান পাতলুম না।

পকেট বুকখানা এখন আমার পকেটেই আছে। ঠিক করলুম 'ক্যাম্পে' ফিরেই সেখানা ভালো করে পড়ে মৃত বাঙালিটির পরিচয় জানবার চেষ্টা করব।

আহা, বেচারি! হয়তো তার মৃত্যু সংবাদ এখনও তার আত্মীয়স্বজনরা জানতেও পারেনি!

॥ চতুর্থ ॥

পিপের চোখ

খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে ক্যাম্প খাটে শুয়ে সেই পকেট বুক বা ডায়েরিখানা পড়তে শুরু করলুম।

যতই পড়ি, অবাক হয়ে যাই! এ এক অদ্ভুত, বিচিত্র, অমানুষিক ইতিহাস বা আত্মকাহিনি, গোড়ার পাতা পড়তে আরম্ভ করলে শেষ পাতায় না গিয়ে থামা যায় না। এমন আশ্চর্য কাহিনি জীবনে আর কখনও আমি শুনিনি—শুনব বলে কল্পনাও করিনি!

শহরে বসে কারুর মুখে এ কাহিনি শুনলে কখনও বিশ্বাস করতুম না। কেউ একে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা করলে তাকে নিশ্চয়ই আমি পাগলা গারদে পাঠাতে বলতুম।

কিন্তু এইখানে,—আফ্রিকার এই বনে! এখানে বসে আজ সবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে! তাঁবুর পর্দা তুলে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম।

কী পরিষ্কার রাত! আকাশে যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্র এবং বাতাসে যেন জ্যোৎস্নার ঝরনা! ওই তো জুজু পাহাড়,—তার মেঘ-ছোঁয়া শিখরের উপরে পূর্ণচাঁদের রৌপ্য মুকুট! পাহাড়ের নীচের দিক গভীর জঙ্গলে ঢাকা—মানুষ যার মধ্যে ভরসা করে ঢোকে না। কিন্তু ফুটফুটে চাঁদের আলোয় এই ভয়াল গহন বনকেও দেখাচ্ছে আজ চমৎকার!

এই আনন্দময় সুন্দর চন্দ্রালোকের মধ্যেও যে অরণ্যের চিরন্তন নাট্যলীলা বন্ধ হয়ে নেই, তার সাড়াও কানের কাছে বেজে উঠছে অনবরত। কাছে, দূরে, আরও দূরে বনের মাটি কাঁপিয়ে ঘন ঘন বজ্রধ্বনির মতন সিংহদের ক্ষুধার্ত গর্জন শোনা যাচ্ছে, সভয়ে দুদ্দুড়িয়ে জেব্রার দল পলায়ন করছে—তাদের অসংখ্য ক্ষুরের শব্দ! হায়েনারা থেকে থেকে রাক্ষুসে অট্টহাসি হাসছে! গাছের উপরে বানরদের পাড়ায় কিচির-মিচির আওয়াজ এবং হয়তো সাপের মুখে পড়ে কোনও পাখি মৃত্যু যাতনায় আর্তনাদ করে উঠল ও তাই শুনে আশপাশের পাখিরা সচকিত হয়ে ডানা ঝাপটা দিলে! মাঝে মাঝে তক্ষকের মতন কী একটা জীব ডেকে উঠে যেন জানিয়ে দিচ্ছে, এই জীবনযুদ্ধক্ষেত্রে সে-ও একজন যোদ্ধা! প্যাঁচারা চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে উড়ে যাচ্ছে—রাত্রিকে যেন বিষাক্ত করে! এইসব শব্দ রেখার মতন এসে পড়ছে যেন শব্দময় আর একখানা বিরাট পটের উপরে এবং তা হচ্ছে অনন্ত অরণ্যের অশ্রান্ত, অব্যক্ত ধ্বনি! শব্দ-পটের উপরে শব্দ-রেখা পড়ে এঁকে যাচ্ছে এক বিচিত্র শব্দচিত্র!

তাঁবুর দরজা থেকে অল্প তফাতে হিংস্র পশুদের ভয় দেখাবার জন্যে আগুন জ্বেলে, বসে বসে গল্প করছে কাফ্রি বেয়ারা ও কুলিরা। তাদের কালো কালো মুখগুলোর খানিক খানিক অংশ আগুনের আভায় লাল দেখাচ্ছে। তাদের ভাষা জানি না, তারা কী গল্প করছে তাও জানি না, তবে একটা বিশেষ কথা বার বার আমার কানের কাছে বাজতে লাগল। তারা বারংবার উত্তেজিত স্বরে বলে বলে উঠছে, 'জুজু! জুজু! জুজু!'

বুঝলুম, এখনও তাদের ভিতরে ওই জুজু পাহাড় নিয়েই আলোচনা চলছে! এরা হচ্ছে সরল অসভ্য মানুষ,—শহুরে সভ্য মানুষের মনের মতন এদের মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে নেই, তাই এদের মাথার ভিতরে একটা কোনও বিশেষ নতুন চিন্তা ঢুকলে এরা সহজে আর সেটা ভুলতে পারে না।

কিন্তু জুজু পাহাড়ের যে বিভীষিকা এদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, সত্যসত্যই সেটা কি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়?

এই অজানা বাঙালির লেখা ডায়েরিখানা পড়বার পর সে কথা তো আর জোর করে বলতে পারি না! এ ডায়েরি যিনি লিখেছেন তিনি ওদের মতন অসভ্য নন। লেখার ভাষা দেখেই বুঝেছি, তিনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি যে কোনও ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের বর্ণনা দেননি, লেখা পড়লে তাও জানা যায়। কিন্তু যেসব কথা তিনি লিখেছেন—

হঠাৎ তাঁবুর পর্দা ঠেলে কাফ্রিদের সর্দার ভিতরে প্রবেশ করল। তার মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী ব্যাপার, সর্দার?'

সে বললে, 'আপনি কি এখানে শিকারের জন্যে আরও কিছুদিন থাকবেন?'

—'হ্যাঁ। এখানে দেখছি খুব সহজেই শিকার পাওয়া যায়। দিন পনেরো এখানেই থেকে যাব মনে করছি।'

সর্দার বললে, 'তাহলে আমাদের বিদায় দিন। আমরা কাল সকালেই এখান থেকে পালাতে চাই!'

আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কী! কেন?'

সর্দার বললে, 'এ জায়গায় জ্যান্ত মানুষের থাকা উচিত নয়! এখানকার ইট-কাঠ-পাথরের ওপরেও জুজুর অভিশাপ আছে!'

আমি হেসে উঠে বললুম, 'সর্দার! আবার তুমি পাগলামি শুরু করলে?'

সর্দার মাথা নেড়ে বললে, 'না হুজুর, না! এ পাগলামির কথা নয়। আজ এইমাত্র স্বচক্ষে যা দেখলুম!'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'স্বচক্ষে কী তুমি দেখেছ? ভূত? জুজু? পেতনি? না রাক্ষস?'

সর্দার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, 'না হুজুর, না! এসব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করা ভালো নয়। আজ আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, আর-একবার তা দেখলে আমি আর বাঁচব না!'

অধীর ভাবে বললুম, 'কিন্তু তুমি কী দেখেছ, আগে সেই কথাটাই বলো না!'

—'আমরা জানতুম হুজুর, জুজুরা ওই পাহাড়ের বাইরে আসে না। তাই আমরা নির্ভয়ে এদিকে-ওদিকে চলা ফেরা করে বেড়াচ্ছিলুম। কিন্তু আজ দেখছি, জুজুরা পাহাড় ছেড়ে নীচেও নামে। বোধহয় এটা আপনার দোষেই। আপনি আমাদের বারণ শুনলেন না। মানুষ হয়েও পাহাড়ে উঠে জুজু পাহাড়ের পবিত্রতা নষ্ট করলেন! তাই আপনাকে শাস্তি দেবার জন্যে তারা পাহাড় ছেড়ে নেমে এসেছে।'

আমি শুয়েছিলুম। এইবারে উঠে বসে বিরক্ত স্বরে বললুম, 'সর্দার! হয় তুমি কী দেখেছ বলো, নয় এখান থেকে চলে যাও! তোমার বাজে বকুনি শোনবার সময় আমার নেই।'

সর্দার বললে, 'একটু আগে আমি নদী থেকে এক বালতি জল আনতে গিয়েছিলুম। ফেরবার সময়ে ঠিক আমার সুমুখ দিয়েই একটা জিনিস গড়াতে গড়াতে তিরবেগে এধার থেকে পথ পার হয়ে ও ধারের জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেল। ধবধবে চাঁদের আলোয় সে জিনিসটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম।'

—'সে জিনিসটা কী? কোনও জন্তু-টন্তু?'

—'না।'

—'মানুষও নয়?'

—'না। একটা ছোটো পিপে।'

আমি বাধো বাধো স্বরে বললুম, 'একটা—ছোটো—পিপে?'

—'হ্যাঁ হুজুর। একটা ছোটো পিপে। কে কবে দেখেছে, পিপে আবার জ্যান্ত হয়ে গড়িয়ে বেড়ায়?'

—'হয়তো কেউ তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে পিপেটাকে ধাক্কা মেরে গড়িয়ে দিয়েছিল!'

—'না হুজুর! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, সেখানে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণী ছিল না। তারপর, আরও শুনুন। আমি বেশ ভালো করেই দেখেছি, সেই চলন্ত পিপেটার ভেতর থেকে দু-দুটো জ্বলন্ত রাক্ষুসে চোখ ভয়ানক ভাবে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! জলের বালতিটা সেখানেই ফেলে চোঁ-চা দৌড় মেরে আমি পালিয়ে এসেছি। পিপে যেখানে হেঁটে বেড়ায় আর চোখ কটমটিয়ে তাকায়, সেখানে আর আমাদের থাকা চলে না। আমরা কাল সকালেই এ মুলুক ছেড়ে সরে পড়ব!'—এই বলে সর্দার চলে গেল।

এবার আর সর্দারের কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারলুম না। কারণ এই ডায়েরিখানা আমি পড়েছি। সর্দারের কথা মিথ্যা বললে, যিনি ডায়েরি লিখেছেন তাঁকেও মিথ্যাবাদী বলতে হয়!

অবশ্য ডায়েরির অনেক জায়গায় চোখ বুলিয়ে আমার সন্দেহ হয়েছে বটে যে, আমি যেন কোনও ছেলে ভুলানো হাসির গল্প বা মজার রূপকথা পড়ছি, কিন্তু তবু লেখককে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। হয়তো মাঝে মাঝে বর্ণনার অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন আছে,—সত্যিকার জীবনের কথা লিখতে বসেও অধিকাংশ লেখক যে লোভ সংবরণ করতে পারেন না! কিন্তু...কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর কলেজে পড়া মোটরে চড়া বিজ্ঞান জানা সভ্য মানুষ আমি, একটা অসভ্য কাফ্রির কথা শুনে এবং একজন অচেনা মৃত ব্যক্তির ডায়েরির পাতা উলটে এমনধারা অদ্ভুত কাণ্ডকে ধ্রুবসত্য বলে একেবারে বিনা দ্বিধায় মেনে নেব?

কে জানে, ডায়েরি যিনি লিখেছিলেন, তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কি না? কে জানে, তিনি 'গালিভারের ভ্রমণ কাহিনি'র মতন একখানা কাল্পনিক উপন্যাস রচনা করে গেছেন কি না? হয়তো আজ তিনি এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু মৃত্যু যাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, তাঁর কাছ থেকে আর কোনও উত্তর পাবারই আশা নেই।

তারপরেই মনে হল, তবু সর্দার আজ এখনই যে গল্প বলে গেল, তার সত্য-মিথ্যা তো আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারি? ডায়েরির গল্পের সঙ্গে সর্দারের গল্পের কিছু কিছু মিল আছে। কেমন করে এমন মিল সম্ভবপর? সর্দারের গল্প যদি সত্য হয়, তাহলে ডায়েরির গল্প সত্য বলে মানা যেতে পারে। এমন একটা অসম্ভব বিস্ময়কর সত্যের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়ের এই সুযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়!

তখনই ক্যাম্প খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম এবং শিকারের পূর্ণ পোশাক পরতে লাগলুম। পোশাক পরতে পরতে মনের ভিতরে কেমন একটা বিপদের সাড়া জেগে উঠল। কিন্তু সে ভাবটাকে আমি মনের ভিতরে স্থায়ী হতে দিলুম না।

বাংলার সবুজ কোলের শান্তি ছেড়ে যে লোক সুদূর আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে কালো অন্ধকারের ভিতরে সিংহ, হাতি, গন্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে নির্ভয়ে এবং যার হাতে আছে বুলেট-ভরা বন্দুক ও কোমরে আছে ছ-নলা রিভলভার আর শিকারের ছোরা, বিপদের সামনে যেতে সে কেন ইতস্তত করবে? এই বিপদের গভীর আনন্দকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় উপভোগ করতে পারে বলেই পৃথিবীতে মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব হতে পেরেছে! উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, আমেরিকা, উড়োজাহাজ ও ডুবোজাহাজ প্রভৃতি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে কেন? বিপদের দৌলতে! এইসব আবিষ্কারের জন্যে কত মানুষ হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে এবং কত মানুষ হাসতে হাসতে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে! অধিকাংশ আবিষ্কারের মূলেই আছে এই বিপদের আনন্দ! যে জাতি এই বিপদের সাধনা শিখতে পারে, সে জাতির উন্নতির পথে কোনও বাধাই ট্যাঁকে না।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে পোশাক পরা শেষ হল। কোমরের বেল্টে একটা টর্চ তো গুঁজে নিলুমই, তার উপরে পেট্রল-জ্বলা একটা স্থির বিদ্যুতের মতন অতি উজ্জ্বল আলোর লণ্ঠনও নিতে ভুললুম না! আধা-অন্ধকারে অনেক সময়ে একটা বৃক্ষশাখার আবছায়া নড়লেও অন্য কিছু বলে ভ্রম হয়। স্পষ্ট আলো সন্দেহ দূর করে।

তাঁবুর বাইরে এসেই দেখি, কাফ্রি কুলিরা তাদের মোটমাট বাঁধতে বসেছে। সর্দারকে ডেকে শুধলুম, 'এসব কী হচ্ছে?'

সর্দার বললে, 'ওরা সবাই ভয় পেয়েছে। অনেকে আজ রাতেই পালাবে। ...কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

আমি বললুম, 'নদীর ধারে।'

—'নদীর ধারে! কেন হুজুর?'

—'তুমি আমার কাছে যা বলে এলে, তা সত্যি কি না দেখবার জন্যে!'

সর্দারের মুখ দেখে মনে হল, সে যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না!...খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, 'হুজুর অমন কাজ করবেন না! নদীর ধারে আজ জুজুর অভিশাপ জেগে উঠেছে, জ্যান্ত মানুষ সেখানে গেলে আর ফিরবে না। আজ সেখানে একলা গেলে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত!'

—'কেন, একলা কেন, তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো—কোনও ভয় নেই।'

সর্দার আঁতকে উঠে বললে, 'আমি যাব আপনার সঙ্গে? বলেন কী হুজুর। আমি তো পাগল হইনি! ঘরে আমার বউ ছেলে আছে, আমি কি শখ করে আত্মহত্যা করতে পারি?'

—'বেশ, তুমি যেয়ো না। কিন্তু নদীর কোন পথে তুমি সেই ব্যাপারটা দেখেছিলে?'

সর্দার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'এই সামনের পথ দিয়েই চলে যান। নদী খুব কাছেই। ...কিন্তু হুজুর, এখনও আমার কথা শুনুন, মানুষ হয়ে জুজুর সামনে যাবেন না।'

আমি তার কথার জবাব না দিয়ে অগ্রসর হলুম।

আজ যে পৃথিবীময় চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি, একথা আগেই বলেছি! চারিদিক ধবধব করছে। নদীর ধারে যাবার পথের রেখা একটা ঘুমন্ত ও অতিকায় অজগরের মতন এঁকে-বেঁকে স্থির হয়ে আছে। পথের দু-ধারে ঘন জঙ্গল চাঁদের আলোয় যেন স্বপ্ন-মাখানো! সেই জঙ্গলের মাঝখানে জুজু পাহাড়ের মাথা উঁচু হয়ে উঠে যেন নীল আকাশকে ঢুঁ মারতে চাইছে।

চারিদিক নির্জন হলেও নিস্তব্ধ নয়। অরণ্যের রহস্যময় বিচিত্র শব্দগুলো এখনও অবিরাম জেগে আছে—হায়নার রাক্ষুসে হাসি, বানরদের ভীত স্বর, প্যাঁচার চিৎকার—এবং আরও কত কী, হিসাব করে বলা অসম্ভব! কেবল আফ্রিকার এ অঞ্চলের জঙ্গলের যা প্রধান বিশেষত্ব, সিংহদের সেই মাটি কাঁপানো ঘন ঘন মেঘের মতন গর্জন এখন আর একেবারেই শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা ভরসার কথা নয়, ভয়ের কথা! কারণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ শিকারি মাত্রই জানেন, সিংহরা স্তব্ধ হলেই অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। কেননা, সামনে বা কাছে শিকারের দেখা বা সাড়া পেলেই সিংহরা একেবারেই চুপ মেরে যায়। তারপর চোরের মতন চুপিচুপি এসে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে! কে জানে, কাছের কোনও জঙ্গলেই লুকিয়ে কোনও দুর্দান্ত পশুরাজ আমাকে দেখে আসন্ন ফলারের লোভে উন্মুখ হয়ে উঠেছে কি না?

লণ্ঠনটা সামনের দিকে বাড়িয়ে পথের দু-পাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে নদীর দিকে এগিয়ে চললুম। কিন্তু আমার মাথার ভিতরে তখন সিংহের জন্যে কোনও ভয়-ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠতে পারলে না,—আমি ভাবছিলুম কেবল ডায়েরির ও সর্দারের কথা! জুজু এবং জীবন্ত পিপে!

দূরে—পথের পাশ থেকে ওপাশে চিতাবাঘের মতন কী একটা জন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল। একটা ঝুপসী গাছের ভিতর থেকে ডাল-পাতা সরিয়ে চার-পাঁচটা বেবুন সবিস্ময়ে মাথা বাড়িয়ে মুখ খিঁচিয়ে উঠল—এই বিজন ও ভীষণ অরণ্য পথে রাত্রিবেলায় আমার মতন একাকী মানুষকে দেখবার আশা তারা যেন করেনি!

একটু তফাতে আচম্বিতে গাছপালার আড়ালে অনেকগুলো পাখি ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল। প্রত্যেক শিকারিই পাখিদের এইরকম আকস্মিক চিৎকারের অর্থ বোঝে। নিশ্চয়ই তারা কোনও হিংস্র জীবজন্তুর সাড়া পেয়েছে। যেখানে পাখিদের গোলমাল উঠেছে সেইখানে লক্ষ করে দেখলুম, জঙ্গলটা দুলে দুলে উঠল,—যেন কোনও অদৃশ্য জন্তু তার ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে!

আমিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম। কিন্তু আর কোনও কিছু নজরে পড়ল না। আবার অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের সেই জায়গাটা যখন পার হয়ে গেলুম, মনের ভিতরে কেমন অস্বস্তি হতে লাগল!

নির্জনতা, জ্যোৎস্না ধোয়া পাহাড়, বন, নদী এবং চাঁদের তিলকপরা নীলিমা! মাঝে মাঝে বনফুলেরও অভাব নেই! মাসিকপত্রের কবিদের মুখে শুনি, তাঁরা নাকি এইসব প্রাণের মতো ভালোবাসেন! কিন্তু তাঁদের দলের ভিতর থেকে কারুকে ধরে এনে আজ যদি এইখানে একলা ছেড়ে দি এবং বলি, 'কবি এইবারে একটি কবিতা লেখো তো! তুমি যা যা ভালোবাসো এখানে সেসবের কিছুরই অভাব নেই! এইবারে একটি চাঁদ ওঠার, ফুল ফোটার আর মলয় বাতাস ছোটার বর্ণনা লেখো তো বাপু!'—তাহলে কবি কবিতা লেখেন, না পিঠটান দেন, না ভিরমি যান, সেটা আমার দেখবার সাধ হয়!

নদীর ধারে এসে পড়লুম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপারই চোখে পড়ল না। বন-জঙ্গলে যে সব ভয় থাকা স্বাভাবিক এখানে তার অভাব নেই, কিন্তু এসব তো থাকবেই এবং এমন ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য তো শিকারির কাছে পরম লোভনীয়ই! কিন্তু আমি যা দেখবার জন্যে আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছি, ডায়েরির পাতায় পাতায় যেসব অলৌকিক ঘটনা লেখা আছে এবং আজ সর্দারের মুখেও যার কিঞ্চিৎ বর্ণনা শুনেছি, তার ছিটেফোঁটাও তো এখনও পর্যন্ত দেখতে পেলুম না! মনে মনে হেসে মনে মনেই বললুম—'পক্ষীরাজ ঘোড়া রূপকথায় আর শিশুর স্বপ্নেই দেখা যায়! আমি হচ্ছি একটি নিরেট বোকা, তাই সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রের সুনিদ্রা নষ্ট করে বদ্ধপাগলের মতন এখানে ছুটে এসেছি!'

নদীর তীরে নজর গেল। একটা মস্তবড়ো কুমির ডাঙার উপরে দেহের খানিকটা তুলে

স্থির ভাবে আমার পানে তাকিয়ে আছে। যেন সে বলতে চায়—'বন্ধু কী আর বলব! আমার কাছে আর একটু সরে এসে দ্যাখো না, খিদে পেলে আমি কী করি?

মাঝনদীতে জীবন্ত 'বয়া'র মতন একদল হিপো ভাসছে। তিন-চারটে বাচ্চা হিপো জল খেলা খেলছে,—কেউ তার মায়ের কুপোর মতন পেটে গিয়ে ঢুঁ মারছে, কেউ বা জলের ভিতরেই উলটে পড়ে চমৎকার ডিগবাজি খাচ্ছে!

এমন সময়ে আচম্বিতে আমার মনে হল এখানে কেবল এই কুমির আর হিপোর পালই নেই,—যেন আরও সব অদৃশ্য জীব আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ করছে!

মনের মধ্যে এই সন্দেহ হতেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম; কিন্তু সারা পথটা জনশূন্য ও চন্দ্রালোকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে এবং পথের দু-ধারের বন জঙ্গলের ভিতর থেকেও কোনওকিছুই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল না।

তবু বুকের কাছটা কেমনধারা করতে লাগল। এতক্ষণ এমন হয়নি, এখনই বা হচ্ছে কেন? এখানে আর কে থাকতে পারে? সিংহ? ব্যাঘ্র? গন্ডার?

আশ্চর্য নয়! নদীর ধারে হয়তো কোনও বড়ো জন্তু জলপান করতে এসে আমাকে দেখে আর বাইরে বেরুতে পারছে না। কিংবা হয়তো সুমুখেই তৈরি খাবার দেখে জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে জলপানের আগেই আমার ঘাড়ের উপরে একটি লম্ফত্যাগ করবে কি না!

তা এখানটা পড়তে তোমাদের যতই ভালো লাগুক না কেন? ব্যাপারটা তখন আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। লণ্ঠনটা মাটির উপরে রাখলুম। টর্চটা কোমরবন্ধ থেকে খুলে পথের দু-পাশের ঝোপঝাপের উপরে আলো ফেলে পরীক্ষা করতে লাগলুম। হঠাৎ এক জায়গায় টর্চের আলো পড়তেই আমি চমকে উঠলুম!

কী ও-দুটো? একটা ঝাঁকড়া ঝোপের ভিতর থেকে দুটো অগ্নিময় গোলা আমার পানেই তাকিয়ে আছে! দুটো হিংসা ও ক্ষুধা ভরা জ্বলন্ত ও ভয়ানক চক্ষু!

ও-দুটো সিংহের, না ব্যাঘ্রের চক্ষু? যার চক্ষুই হোক, আমি আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলুম না, তাড়াতাড়ি বন্দুক বাগিয়ে ধরে সেই দুটো অগ্নিগোলকের দিকে উপর-উপরি দুইবার গুলি বৃষ্টি করলুম!

তারপরেই ভয়ংকর এক আর্তনাদ—পৃথিবীর কোনও সিংহ ব্যাঘ্রই সেরকম আর্তনাদ করতে পারে না! এবং পরমুহূর্তেই একটা অদ্ভুত শব্দ হল—যেন পিপের মতন কী একটা বড়ো জিনিস গড়গড় করে ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে!

এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জঙ্গলের ভিতর থেকে কারা যেন অসংখ্য কণ্ঠে অমানুষিক স্বরে চিৎকার করতে লাগল—সেই সমস্বরের অপার্থিব চিৎকার শুনলে অতিবড়ো সাহসীরও বুকের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়,—মানুষের কান তেমন চিৎকার কোনওদিন শোনেনি!

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন ভাবছি,—কারা ওরা, অমন চিৎকার করতে পারে এমন কোনও

জীব এই পৃথিবীতে আছে?—ঠিক সেই সময়ে আবার যে-কাণ্ডটা হল, তাতে আমার সমস্ত বুদ্ধি-সুদ্ধি যেন একেবারেই লোপ পেয়ে গেল!

আমি দাঁড়িয়েছিলুম পথের মাঝখানে। সেখান থেকে সামনের জঙ্গল ছিল প্রায় দশ-বারো হাত তফাতে! জঙ্গলের ভিতর থেকে যদি কোনও জন্তু আমাকে আক্রমণ করতে আসে, তবে তাকে এই দশ-বারো হাত জমি আমার চোখের সামনে পার হয়ে আসতে হবে!

কিন্তু হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে মোটা সাপের মতন কী-একটা বিদ্যুৎ বেগে শূন্যপথে উড়ে আমার বাঁ হাতের উপরে এসে পড়ল, আমার বন্দুকটা তখনই সশব্দে পথের উপরে ঠিকরে পড়ে গেল এবং তারপরেই কে যেন বজ্রমুষ্টিতে আমরা হাত চেপে ধরে আমাকে জঙ্গলের দিকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল!

প্রথমটা আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! তারপর কতকটা সামলে নিয়ে সেই বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়ান পাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু পারলুম না! তারপর প্রায় যখন জঙ্গলের কাছে গিয়ে পড়েছি, তখন আমার মাথায় বুদ্ধি জোগাল! আমার ডান হাত তখনও মুক্ত ছিল, ক্ষিপ্র হাতে কোমরবন্ধ থেকে রিভলভারটা বার করে নিয়ে আবার বার-তিনেক গুলি বৃষ্টি করলুম এবং অমনি আমার বাঁ হাতের উপর থেকে সেই বজ্রমুষ্টির বাঁধনটা খুলে গেল!

অমন দশ-বারো হাত জমি পেরিয়ে সেটা যে কী এসে আমার হাত ধরলে ও ছেড়ে দিলে, কিছুই আমি ভালো করে বুঝতে বা দেখতে পেলুম না, কারণ তখন আমি বিস্ময়ে হতভম্ব ও আতঙ্কে অন্ধের মতন হয়ে গিয়েছি!

ভালো করে কিছু বোঝবার বা দেখবার ভরসাও আর হল না,—যে পথে এসেছিলুম আবার তিরের মতন সেই পথেই ছুটতে লাগলুম আমার তাঁবুর দিকে! পিছনে তখনও বহু কণ্ঠে সেই অমানুষিক চিৎকার বন-জঙ্গল, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে!

সে চিৎকার বোধ হয় আমার তাঁবুর লোকেদেরও কানে গিয়েছিল কারণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তাঁবুর কাছে এসে দেখি, আমার কাফ্রি-কুলিরা আগুনের চারিপাশে ভয়-বিহ্বলের মতন দাঁড়িয়ে গোলমাল করছে!

আমাকে অমন ঝড়ের মতন বেগে ছুটে আসতে দেখে কুলিরা বোধ হয় স্থির করলে যে, যাদের ভয়ে আমি পালিয়ে আসছি, তারাও হয়তো আমার পিছনে পিছনেই ছুটে আসছে। তারা কী ভাবলে ঠিক তা জানি না, তবে আমাকে দেখেই কুলিরা একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠে যে যেদিকে পারলে পলায়ন করলে! তারপর তাদের আর কারুরই দেখা পাইনি!

কুলিদের কাপুরুষ বলে দোষ দিতে পারি না। আমি আজ স্বচক্ষে যা দেখলুম হয়তো তারাও এর আগেই তার কিছু কিছু দেখেছে বা শুনেছে! সে রাতটা তাঁবুর ভিতরে বসে দুশ্চিন্তায়, আতঙ্কে ও অনিদ্রায় যে ভাবে কেটে গেল, তা জানি খালি আমি এবং আমার ভগবানই!... পরের দিন সকালেই এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করলুম। আমার দামি বন্দুক আর লণ্ঠনটা নদীর ধারে পথেই পড়ে রইল। দিনের আলোতেও এমন সাহস হল না যে,

ঘটনাস্থলটা আর একবার পরীক্ষা করে নিজের জিনিস আবার কুড়িয়ে নিয়ে আসি! বিপদেই মানুষের চরিত্র বোঝা যায় বটে, কিন্তু বিপদেরও একটা সীমা আছে তো? বিপদকে ভালাবাসলেও, সাঁতার না জেনে কে জলে ঝাঁপ দিতে যায়?

ডায়েরিতে যা লেখা আছে, আমি এইখানে তা উদ্ধার করে দিলুম। কাহিনিটি তোমরাও শোনো। যদি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না হয়, তবে অবিশ্বাস করো।

ডায়েরির লেখক তাঁর গল্পটিকে বেশ গুছিয়ে বলেছেন। আমি তাঁর কোনও কথাই বাদ দিইনি, কেবল সকলের সুবিধার জন্যে গল্পটিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে দিলুম।

॥ পঞ্চম ॥

ডায়েরির গল্প শুরু হল

কুলিদের কথা যে সত্য, সে বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই!

অসম্ভবও যে সম্ভব হয়, স্বচক্ষে আমি তা দেখেছি। আমার যদি যথেষ্ট মনের জোর না থাকত, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমি বদ্ধপাগল হয়ে যেতুম।

সময়ে সময়ে নিজেরই সন্দেহ হয়েছে যে, আমি কোনও বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছি না তো? কিন্তু সেই অদ্ভুত দেশে গিয়ে আমি যে সব ছবি এঁকেছিলুম, সেগুলো এখনও আমার কাছে রয়েছে। ছবিগুলো তো আর স্বপ্ন হতে পারে না!

এই গল্পটি আমি তাড়াতাড়ি লিখে রাখলুম। আমার শরীরের যে অবস্থা হয়েছে, তা আর বলবার নয়। আজ সাত দিন আমি কোনও নিরেট খাবার খেতে পাইনি—আর জলপানের সুযোগ পাইনি তিন দিন! পাহাড়ের এদিকটা মরুভূমির মতন শুকনো। আমার আর এক পা চলবার শক্তি নেই।

এ গল্পের গোড়ার দিকটা যতই ভয়াবহ হোক, এর শেষ দিকটা হয়তো অনেকেরই কাছে প্রহসনের মতন হাসির খোরাক জোগাবে। অনেকেই হয়তো একে প্রহসনের মতোই হালকা ভাবে নেবেন। কিন্তু মানুষের এই জীবনটাই হচ্ছে প্রহসনের মতন! একজনের হাসি আর একজনের কাছে মৃত্যুর মতন সাংঘাতিক! গল্পের শেষ ঘটনাগুলি পড়ে পাঠকরা যখন হাসবেন, তখন তাঁরা হয়তো মনেও করতে পারবেন না যে, ঘটনার সময়ে আমার মনের মধ্যে হাস্যরসের একটা ফোঁটাও বর্তমান ছিল না!

আমার এই কাহিনির নাম দেওয়া যেতে পারে—'দুঃস্বপ্নের ইতিহাস'! মানুষ স্বপ্নে যেসব ভয়ঙ্কর ও অলৌকিক দৃশ্য দেখবার সময়ে অত্যন্ত ভয় পায়, জেগে উঠে তার কথা মনে করে হাসি আসে! আমারও অবস্থা এখন অনেকটা সেইরকম! কেবল দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আমি যা দেখেছি তার কথা ভেবে অনেককাল ধরে হাসবার মতন পরমায়ু আমার নেই।

কোনওরকমে পাহাড়ের এই গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে আমার এই দুঃস্বপ্নের ইতিহাস লিখছি! আমি যে আর বেশিক্ষণ বাঁচব, এমন আশা রাখি না। তবু আমার ইতিহাস লিখে রেখে গেলুম এইজন্যে, কোনও না কোনও দিন হয়তো এটা অন্য মানুষের চোখে পড়বে।

কুলিরা কেউ আমার সঙ্গে আসতে রাজি হল না। সকলেরই মুখে এক কথা—'জুজু পাহাড়ে মানুষ যায় না।'

আমার রোখ বেড়ে উঠল। জুজু পাহাড়ের ভিতরে কী রহস্য আছে, না জেনে এখান থেকে ফিরব না,—এই পণ করে কুলিদের পিছনে ফেলেই আমি একলা পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম।

উঠছি, উঠছি, উঠছি! জুজু বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড পাহাড়টা কী আশ্চর্যরকম নির্জন! কোথাও মানুষের একটা চিহ্নও নেই!

আরও খানিকটা উপরে ওঠবার পর আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। এ পাহাড়ে মানুষের পদচিহ্ন পর্যন্ত নেই কেন এবং কোনও মানুষ এখানে আসে না কেন? সূর্যের সোনার আলোয় ঝলমলে এমন সুন্দর পাহাড়; এখানে ওখানে কৌতুকময়ী ঝরনা রুপোর ধারা কুলকুচো করতে করতে ও নীলাকাশকে নিজের গানের ভাষা শোনাতে শোনাতে পাথর থেকে পাথরের উপরে লাফিয়ে নাচতে নাচতে পৃথিবীর কোলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে নীচে—আরও নীচে নেমে যাচ্ছে;—ফলে-ফুলে রঙিন ও লতায় পাতায় সাজানো, নরম ঘাসের সবজে সাটিনে ঢাকা আনন্দময় উপত্যকা, এ তো কবির স্বর্গ, ভ্রমণকারীর তীর্থ! তবু মানুষ এই পাহাড়কে পরিত্যাগ করেছে কেন? এত বড়ো একটা চমৎকার পাহাড়, তবু কোথাও এর বর্ণনা শুনিনি কেন?

আর একটা অদ্ভুত ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আমি উপরে উঠছি। আশপাশ, আনাচ-কানাচ, বন-জঙ্গলের আড়াল দিয়ে যেন আরও কারা সব নিঃশব্দ পদে আমার সঙ্গে সঙ্গেই উপরে উঠছে! এখানে মানুষ নেই, অন্য কোনও জীবেরও সাড়া নেই,—তবু যেন আমি একলা নই! কারা যেন অদৃশ্য হয়ে আমার সমস্ত গতিবিধি সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে! এদিকে তাকাই ওদিকে তাকাই, সামনে ফিরি পিছনে ফিরি—এমনকি হঠাৎ ঝোপেঝাপে গিয়েও উঁকি মারি, তবু জনপ্রাণীকেও দেখতে পাই না! তবু আসছে, আসছে,—অদৃশ্য আত্মারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে আর আসছে আর আসছে!.....এই অদ্ভুত ভাবটাকে কোনওরকমেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলুম না! কী অসোয়াস্তি!

ঘণ্টা চারেক এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ এক জায়গায় একটি ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

দু-ধারের পাহাড় কেটে কারা যেন একটা সরু রাস্তা তৈরি করেছে। রাস্তার মাঝে মাঝে শুকনো কাদা রয়েছে। তার উপরে মানুষের পায়ের ছাপ আছে কি না দেখবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলুম। মানুষের পায়ের একটিমাত্র ছাপও সেখানে নেই। তার

বদলে কাদার উপরে অনেকগুলো টানা টানা বিচিত্র চিহ্ন দেখলুম। মাটি যখন ভিজে ছিল, তখন এই পথ দিয়ে যেন অনেকগুলো পিপের মতন জিনিস কারা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাদের পায়ের চিহ্নগুলো কোথায় গেল?.....অদ্ভুত রহস্য!

পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ আমার পা গেল ফসকে! যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, ঠিক তার পাশেই ছিল একটা গভীর খাদ। কোনওরকমেই নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি সেই খাদের ভিতরে গিয়ে পড়লুম।

গড়াতে গড়াতে পাতালের ভিতরে নেমে যাচ্ছি! দেহের উপরে আঘাতের পর আঘাত! চারিদিক অন্ধকার—যন্ত্রণায় চিৎকার করছি!

হঠাৎ পাথরের উপরে মাথা ঠুকে অজ্ঞান হয়ে গেলুম!

॥ ষষ্ঠ ॥

ষোলো হাত লম্বা হাত

যখন আমার জ্ঞান হল, দেখলুম আমি একটা টেবিলের উপরে শুয়ে আছি। পরে জেনেছিলুম সেটা হচ্ছে 'অপারেশন টেবিল'—অর্থাৎ যাকে বলে রোগীকে অস্ত্র করবার টেবিল!

ভালো করে চেয়ে দেখি, আমি টেবিলের উপরে শুয়ে নেই—টেবিলটাই আছে আমার পিঠের উপরে! কড়িকাঠ থেকে এক ঝোলানো টেবিলে পিঠ রেখে আমি ঘরের মেঝের দিকে মুখ করে আছি! আমার হাত-পা বাঁধা নেই, তবু আমি পড়ে যাচ্ছি না! যদিও পরে এই রহস্যেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনেছিলুম—কিন্তু তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্য ও আড়ষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলুম, বোধ হয় আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি!

হঠাৎ চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝেতে একটা পিপের ভিতর থেকে একখানা অদ্ভুত মুখ উঁকি মারছে! ছবিতে গোল চাঁদের ভিতরে চোখ নাক ঠোঁট এঁকে দিলে যে-রকম হয়, সেই মজার মুখখানা ঠিক সেইরকম দেখতে! তখন আমার দৃঢ় ধারণা হল যে, আমি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখছি না!

চাঁদমুখো লোকটা একটু হাসলে। বললে, 'এই যে, তোমার জ্ঞান হয়েছে দেখছি। অমল, তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি ভাবছ এসব স্বপ্ন,—না?'

আমি হতভম্বের মতন বললুম, 'আপনি কী বলতে চান যে, আমি স্বপ্ন দেখছি না?'

—'না।'

—'এখন আমি কোথায়? এইটুকু আমার মনে আছে যে, আমি পাহাড়ের খাদে পড়ে গিয়েছিলুম!'

—'ঠিক তাই। তোমাকে আমরা সেইখান থেকেই কুড়িয়ে এনেছি। তুমি নিশ্চয়ই বাঁচতে না। তোমার মেরুদণ্ড আর দু-খানা পা ভেঙে গিয়েছিল। আমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবার তোমাকে বাঁচিয়ে তুলেছি।'

লোকটা বলে কী? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো এ কী দেখছি? মানুষ কখনও ঝোলানো টেবিলে এমনভাবে পিঠ রেখে শূন্যে শুয়ে থাকতে পারে? আর নীচে ওই যে প্রকাণ্ড চাঁদের মতন মুখখানা আমার সঙ্গে কথা কইছে, ওরকম মুখ দুনিয়াতে কেউ কখনও দেখেছে? আমার মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

পিপের মুখ আবার বললে, 'অমল, এখন তুমি আরোগ্য লাভ করেছ।'

আমি বললুম, 'আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?'

—'তোমার পকেট বই দেখে।...রোসো তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি।' —এই বলেই সেই চাঁদমুখো কেমন করে কী কল টিপলে জানি না, কিন্তু আমাকে সুদ্ধ নিয়ে টেবিলটা ধীরে ধীরে ঘুরে সোজা হয়ে মাটির উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

চাঁদমুখো বললে, 'এইবার তুমি নীচে নামতে পারো!'

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসে টেবিল ছেড়ে নেমে পড়লুম।

পিপের ভিতর থেকে একখানা হাত বেরুল—সেই হাতে একটা কাচের গেলাস। চাঁদমুখো বললে, 'নাও, এইটুকু পান করো।'

গেলাসে সবুজ রঙের কী একটা তরল পদার্থ ছিল। যেমনি তা পান করলুম, অমনি আমার দেহের ভিতর দিয়ে যেন একটা জ্বালাময় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে গেল!

আমি সভয়ে বলে উঠলুম, 'এ আমায় কী খাওয়ালেন?'

চাঁদমুখো হেসে বললে, 'ভয় নেই—ভয় নেই! ওতে তোমার উপকারই হবে!'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'আমি এখন কোথায় আছি?'

—'আফ্রিকার এক গুপ্ত দেশে।'

—'আপনি বাংলা শিখলেন কোথা থেকে?'

—'এখানে সবাই বাংলা বলে। আমাদের ইতিহাস পরে বলব অখন, এখন যা বলি শোনো। আমি জানি তুমি বাঙালি। কিন্তু এ দেশে বিদেশিদের প্রবেশ নিষেধ। তবু যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, তার কারণ তোমাকে নিয়ে আমি একটা নতুন রকম পরীক্ষা করতে চাই। কিন্তু মহারাজা তোমাকে এখানে থাকতে দেবেন কি না জানি না। শীঘ্রই মহারাজার সভা বসবে। সেই সভায় স্থির হবে, তোমাকে এদেশে থাকতে দেওয়া হবে কি তোমাকে হত্যা করা হবে!'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'হত্যা?'

চাঁদমুখো বেশ স্থির ভাবেই বললে, 'হ্যাঁ। এদেশে কোনও বিদেশি এলে তাকে হত্যা করাই হচ্ছে এখানকার আইন।'

চমৎকার আইন! আমার বুক ভারী দমে গেল।

চাঁদমুখো বললে, 'কিন্তু অমল, এ কথা ভেবে এখন তুমি মাথা খারাপ কোরো না। তোমাকে যাতে হত্যা করা না হয়, আমি প্রাণপণে সে চেষ্টা করব।'

আমি কৃতজ্ঞ স্বরে বললুম, 'ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার নামটি জানতে পারি কি?'

চাঁদমুখো বললেন, 'এ রাজ্যে কেউ আমার নাম ধরে ডাকে না। তুমি আমাকে পণ্ডিতমশাই বলে ডেকো। আমি মহারাজার প্রধান পণ্ডিত—জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাই আমার কাজ।'—বলেই পণ্ডিতমশাই ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে লাগলেন।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল! কী সর্বনাশ, পিপের ভিতর থেকে বেরিয়েছে তিনখানা মানুষের পা আর পিপের একদিকে আছে পণ্ডিতমশাইয়ের চাঁদ-মুখ—এবং এই মুখ-পা-ওয়ালা পিপেটা আমার চোখের সামনে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একটা জাপানি রূপকথায় আশ্চর্য এক চায়ের কেটলির বর্ণনা পড়েছিলুম। সেই চায়ের কেটলিটার বিষম এক বদ অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে হাত-পা-মুখ বার করে সে নাচের নানারকম প্যাঁচ দেখাত! কিন্তু সেসব হচ্ছে তো ছেলেভুলানো বাজে গল্প! আজ আমার চোখের সুমুখে হাত-পা-মুখ-ওয়ালা যে জ্যান্ত পিপেটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একে তো গাঁজাখোরের নেশার খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না কিছুতেই!

আমি হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে পণ্ডিতমশাই মুচকে হেসে বললেন, 'আমার দেহটা একটু নতুন রকম দেখাচ্ছে? আচ্ছা, এসব কথা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে অখন, আপাতত একটু কাজে আমি বাইরে যাচ্ছি। ততক্ষণ আমার মেয়ের সঙ্গে তুমি গল্প করো—আমি গেলেই সে আসবে!'

কাগজের একরকম সাপ দেখেছ? যখন জড়ানো থাকে তখন খুব ছোটো। তারপর ছেলেরা যেই ফুঁ দেয় অমনি ফুড়ুৎ করে হাত খানেক লম্বা হয়ে যায়! ঠিক সেই ভাবেই পিপে-পণ্ডিতের পাশ থেকে ফুড়ুৎ করে একখানা হাত বেরিয়ে পড়ল এবং একটানে ঘরের দরজাটা খুলে ফেলেই হাতখানা চোখের নিমিষে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে ঘরের দরজাটা ছিল ষোলো-সতেরো হাত তফাতে!

তারপরেই দেখি, পণ্ডিতমশাইয়ের ঠ্যাং তিনখানাও গুটিয়ে পিপের ভিতরে ঢুকে গেল এবং পিপেটা মাটির উপরে গড়াতে গড়াতে ঘরের দরজার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

নিজের চোখকেও আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না—এও কখনও সম্ভব হয়?

বিস্ফারিত নেত্রে দরজার দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি আর ঘেমে উঠছি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখি, সেখানেও এক অপূর্ব নতুন মূর্তির আবির্ভাব!

॥ সপ্তম ॥

মায়াময়ী কমলা

এবারে যার আবির্ভাব হল, তাকে দেখে ভয় পাবার কোনও কারণ ছিল না। কারণ তাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় আর প্রাণ-মন খুশি হয়ে উঠে। পরমাসুন্দরী সে—যেন রূপকথার রাজকুমারী!

পরমাসুন্দরী মেয়ের কথা অনেক উপকথায়, অনেক কাব্যে এবং অনেক গল্প-উপন্যাসে পাঠ করেছি। কিন্তু এ মেয়েটির রূপ সেসব বর্ণনার চেয়েও ঢের বড়ো! এর চেয়ে সুন্দর রং, গড়ন ও নাক-চোখ-মুখের কল্পনাও করা অসম্ভব! সৃষ্টিছাড়া পিপে-জগতে স্বপ্নালোকের এই মানস-কন্যাকে দেখে যেন মোহিনী-মন্ত্রে আমার মন অভিভূত হয়ে গেল!

আমার কাছে এসে মধুর হাসি হেসে সে বললে, 'আপনিই বুঝি আমার বাবার অতিথি? আপনার নাম কী?'

—'অমলকুমার সেন।'

—'আপনি বুঝি খুব ভয় পেয়েছেন?'

—'এখানে এসে ভয় পায় না, এমন মানুষ দুনিয়ায় আছে নাকি? যে জীবটি এখনই এখান থেকে চলে গেল, তাকে বোধহয় তুমি দ্যাখোনি?'

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'বাঃ, কেন দেখব না?'

—'তা দেখেও জিজ্ঞাসা করতে চাও, কেন আমি ভয় পেয়েছি! অমন আরও কতগুলো চাঁদমুখ তোমরা পিপেয় পুরে বন্ধ করে রেখেছ?'

—'অনেক। তা আর গুনে বলা যায় না।'

—'বলো কী! ওদের নিয়ে তোমরা কী করো?'

—'কী আবার করব? ওদের কেউ আমার বন্ধু, কেউ আমার শত্রু, কেউ আমার খেলার সাথি, কেউ আমার বাবা—'

—'তোমার বাবা! চাঁদের মতন গোল মুখ, ষোলো হাত লম্বা হাত, পিপের মতন দেহ আর তিনখানা পা,—উনিই কি তোমার বাবা?'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, উনিই আমার বাবা!'

—'কিন্তু তুমি তো দেখছি আমাদেরই মতন মানুষ!'

—'যা দেখছেন এ চেহারা আমার আসল চেহারা নয়।'

আমি হতভম্বের মতন বললুম, 'তার মানে?'

—'আমি আমার পূর্বপুরুষদের চেহারা নকল করেছি। আমার নিজের চেহারা আমি পছন্দ করি না।'

মেয়েটি পাগলি নাকি! চেহারার আবার আসল নকল কী? বললুম, 'তোমার আসল

চেহারা কী রকম শুনি?'

—'ওই বাবার মতনই আর কী! তবে বাবার গোঁফ আছে, আমার নেই! মাঝে মাঝে আমাকেও সেই মূর্তি ধারণ করতে হয়, কারণ এই নকল দেহ নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা চলে না। কষ্ট হয়।'

মেয়েটি বলে কী? পূর্বপুরুষদের চেহারার নকল, বাবার মতন মূর্তি ধারণ,—এসব উদ্ভট কথা শুনলেও যে পেটের পিলে চমকে ওঠে! এ কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে? কিন্তু তার সরল নির্দোষ শিশু মুখের পানে তাকালে তো সে কথা মনে হয় না!.....তবে আমি কি সত্যসত্যই কোনও প্রেতলোকে এসে পড়েছি? পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত বলেন, ইহলোকের পর পরলোক বলে যে জগৎ আছে, সেখানে প্রেত আর প্রেতিনী বাস করে! এই কি সেই পরলোক? জুজু পাহাড়ের খাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে আমার কি অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে—এখন কি আমিও ইহলোকের মানুষ নই এবং এই ভয়ানক সত্য কথাটা এখনও বুঝতে পারিনি? না, গল্পের বিখ্যাত অ্যালিসের মতন আমিও এখন 'ওয়ান্ডার-ল্যান্ডে' ঘুরে বেড়াচ্ছি—নিজের অজ্ঞাতসারে স্বপ্নের ঘোরেই?.....কিন্তু মনের এইসব দুর্ভাবনা আমি মুখে না প্রকাশ করেই বললুম, 'তাহলে তুমিও পিপের ভেতরে থাকো?'

—'হুঁ। কাছিমরা যেমন খোলের ভেতরে থাকে, আমরাও তেমনি পিপের ভেতরে থাকি! তবে তোমাদের মতন তো আমাদের দেহে হাড় নেই, তাই ইচ্ছে করলেই যে কোনওরকম মূর্তি ধারণ করতে পারি! আমাদের দেহ হচ্ছে রবারের মতন—খুশি মতন কমানো বাড়ানো যায়। 'এই দ্যাখো না'—বলেই সে গলাটাকে ক্রমেই বেশি লম্বা করতে লাগল! দেখতে দেখতে তার গলাটা আমাদের রাস্তায় জল দেবার নলের মতন এতটা লম্বা হয়ে উঠল যে, তার মাথাটা জানলার বাইরে গিয়ে হাজির হল!

আমি ভয়ানক ভড়কে গিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললুম, 'থামো থামো—আর দেখতে পারি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

এক মুহূর্তে তার গলা গেল আবার ছোট্ট হয়ে এবং তার মাথাটা হাসতে হাসতে রবারের বলের মতন এক লাফে আবার যথাস্থানে এসে হাজির!

সে বললে, 'আবার ইচ্ছে করলে আমার চোখ দুটোকে নিয়ে এই ভাবে খেলা করতে পারি'—কথা শেষ হবার আগেই তার চোখ দুটো কোটর থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি বেরিয়ে এসেই আবার সুড়সুড় করে নিজের কোটরে ফিরে গেল!

আতঙ্কে আমার প্রাণ ধড়ফড় করতে লাগল! রূপকথার রাক্ষস-রাক্ষসীরা খুশি মতন নানারকম মূর্তি ধারণ করতে পারে, তবে কি আমি কোনও রাক্ষস রাজ্যে এসে পড়েছি? আমার মাথার চুল ও গায়ের রোমগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল! এখন যে আর স্বপ্ন দেখছি না, এটুকু আমি বেশ বুঝেছি,—কিন্তু...কিন্তু...এসব কী অসম্ভব কাণ্ড!

মিনতি ভরা স্বরে বললুম, 'লক্ষ্মীমেয়েটি, তুমি অমন করে আর আমাকে ভয় দেখিয়ো না, তার চেয়ে আমাকে একেবারে মেরে ফ্যালো!'

সে আবার খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'ও! বুঝেছি, এসব দেখলে তুমি ভয় পাও? আচ্ছা, এই ঘাট মানছি, আর এ কাজ করব না! কিন্তু সত্যি বলছি, এতে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই, এখানে দু-দিন থাকলেই সব তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে! এখন তাহলে আসি।' সে চলে গেল।

মেয়েটি দেখছি ভারী গায়ে পড়া! এই একটু আগে 'আপনি' বলছিল, আর এখনই 'তুমি' বলতে শুরু করেছে! কাল থেকেই হয়তো আমাকে 'তুই-তোকারি' করবে!

হঠাৎ দরজার দিকে চেয়েই দেখি, চাঁদমুখো পণ্ডিতমশাই তিনপায়ে দাঁড়িয়ে পিপের ভিতর থেকে মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

তিনি বললেন, 'কী, অমন করে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছ যে? কমলা বুঝি তোমার সঙ্গেও দুষ্টুমি করছিল? হ্যাঁ, ও দুষ্টুমি না করে থাকতে পারে না!.....তারপর? কমলার চেহারা বোধহয় তোমার খুব পছন্দ হয়েছে? তা তো হবেই! তোমাদের মতে ওইরকম চেহারাই খুব সুন্দর! কিন্তু আমরা তা বলি না। কেন বলি না জানো? আচ্ছা সংক্ষেপে আগে আমাদের ইতিহাস শোনো!'

॥ অষ্টম ॥

জুজু রাজ্যের ইতিহাস

পণ্ডিতমশাই বলতে লাগলেন

'জানো তো, বাংলার বিজয়সিংহ সমুদ্রপথে সিংহলে এসে বাহুবলে সেখানকার রাজা হন? আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন সেই সিংহল জেতা বিজয়সিংহের সঙ্গে।

সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠে বিজয়সিংহের নৌবাহিনীর একখানা জাহাজকে বিপথে নিয়ে যায়। অনেকদিন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সেই জাহাজখানা শেষটা আফ্রিকায় এসে কূল পায়।

সেই জাহাজে যিনি ছিলেন প্রধান, তাঁর নাম হচ্ছে চন্দ্রসেন। তিনি কেবল সাহসী যোদ্ধাই ছিলেন না। নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বৈজ্ঞানিক রহস্য নিয়ে সর্বদাই আলোচনা করতেন। এমন সব ব্যাপার তিনি জানতেন, তোমাদের এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতও যার কোনোই খবর রাখেন না।

মানুষের দেহ আর মনকে উন্নত করে তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার এক গুপ্ত পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সে পদ্ধতি এখানে ব্যাখ্যা করলেও তুমি বুঝতে পারবে না, তা বড়োই জটিল। সে রহস্য জানবার জন্যে যদি তোমার কৌতূহল হয়, তাহলে এখানকার যাদুঘরে গিয়ে দেখো।

জাহাজে যেসব সঙ্গীরা ছিল, চন্দ্রসেন তাদের নিয়েই নিজের পদ্ধতিটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই পরীক্ষার ফলেই আমাদের সৃষ্টি হয়েছে!

সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমরা একসময়ে ছিলুম তোমাদেরই মতন বাঙালি এবং সেকেলে মানুষ! কিন্তু আমরা এখন তোমাদের মতন অক্ষম আর অসম্পূর্ণ মানুষ নই। আমাদের মন দেহের চাকর নয়, আমাদের মন দেহের প্রভু! আমাদের দেহে একখানাও হাড় নেই, কারণ তা অনাবশ্যক। এই দেহ নিয়ে আমরা যা খুশি করতে পারি,—কমলা বোধহয় তার দু-একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে না দেখিয়ে ছাড়েনি? তোমাদের মতন আমাদের brain—অর্থাৎ মগজ, খুলির ভিতরে চেপটে বন্দি হয়ে থাকে না। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন! তাই দেহের উপরে আমাদের অবাধ অধিকার। আমার এই একখানা মুখকে আমি কতরকম করতে পারি—দ্যাখো! (এই বলে পণ্ডিতমশাই কতগুলো এমন ভীষণ ভীষণ নমুনা দেখালেন যে, আমার সর্বাঙ্গ ছম ছম করতে লাগল!) যখন যতগুলো দরকার, তখন ততগুলো হাত আর পা আমরা সৃষ্টি করতে পারি! (এই বলে পণ্ডিতমশাই আমার বিস্মিত চোখের সামনে দু-কুড়ি হাত পা বার করে নেড়ে চেড়ে দেখালেন!) আমি তোমার মতন ধীরে ধীরে হাঁটতেও পারি, আবার দরকার হলে দৌড়ে মটরগাড়িকেও হারাতে পারি। আমি কতকাল বাঁচব, সেটাও আমার নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে!

রাবণ রাজা থাকতেন লঙ্কাদ্বীপে—অর্থাৎ সিংহলে। তাঁর দশ মুণ্ড আর বিশখানা হাত ছিল। আবার দরকার হলে তিনি সাধারণ মানুষের রূপও ধারণ করতে পারতেন। রাবণ রাজার ভাই কুম্ভকর্ণের দেহ ছিল তালগাছের চেয়েও উঁচু। এসব হচ্ছে দেহের উপরে মনের প্রভুত্বের দৃষ্টান্ত। তোমরা হচ্ছ সাধারণ মানুষ। তাই এসব ব্যাপারকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দাও। কিন্তু এ হচ্ছে তোমাদেরই বোকামি। রামায়ণ ও মহাভারত যাঁদের লেখা, তাঁরা কোনওকালে গাঁজা খেতেন বলে প্রমাণ নেই।

খুব সম্ভব রাবণ রাজার দেশে গিয়েছিলেন বলেই চন্দ্রসেন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করবার গুপ্ত পদ্ধতিটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তখনও সিংহলের কোনও কোনও পণ্ডিত হয়তো ওই গুপ্ত পদ্ধতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। এ পদ্ধতি এখন খালি আমরাই জানি। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কিছু কাল থাকো, তাহলে তুমিও হয়তো অনেক নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারবে!

অমল, আজ আর বেশি কিছু বলব না। একদিনে বেশি কথা শুনলে তোমার অসম্পূর্ণ ছোট্ট মগজ হয়তো গুলিয়ে যাবে। আজ এই পর্যন্ত। এসো আমার সঙ্গে!'

পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে আমি পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে দু-খানা জলচৌকির মতন ছোটো ছোটো টেবিলে রাশীকৃত ফলমূল সাজানো রয়েছে। পণ্ডিত তাঁর পিপে-দেহের একদিকটা মাটির উপরে বসিয়ে পা তিনখানা ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বললেন, 'বোসো অমল, খেতে বোসো। আমরা খাওয়া-দাওয়ায় বেশি সময় নষ্ট করি না।' বলেই তিনি অজগর

সাপের মতন মস্ত একটা হাঁ করে মিনিট দুয়েকের মধ্যে প্রায় একঝুড়ি ফল উদরস্থ করে ফেললেন। তারপর জলপান করে বললেন, 'ব্যাস, খাওয়া তো হল,—এইবারে ওঠো!'

খাওয়া হল না ছাই হল! এঁরা খাওয়া-দাওয়ায় বেশি সময় নষ্ট না করতে পারেন, কিন্তু দু-মিনিটে যারা দশজন লোকের খোরাক গপ গপ করে গিলে ফেলতে পারে, তাদের আর বেশি সময়ের দরকার কী? এই চাঁদমুখো পণ্ডিতের সঙ্গে খেতে বসলে আমাকে উপোস করে মরতে হবে দেখছি! তাড়াতাড়ি করেও দু-মিনিটে আমি দুটো আপেল পার করতে পারলুম না। কী আর করি, পণ্ডিত যখন চোখ বুজে জলপান করেছিলেন, তখন আমি, গোটাকয়েক ফল টপ টপ করে পকেটে পুরে ফেললুম!

পণ্ডিত মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'বেশি খেলে মগজ ভোঁতা হয়ে যায়। তাই আমি নামমাত্র খাই। কিন্তু আমাদের দেশেও এমন অনেক নিরেট বোকা আছে, যারা মনে করে বেশি খেলে দেহের তেজও বেশি হয়! এদের বুদ্ধির গলায় দড়ি। ওই যে, নাম করতে করতেই ওই দলের একটি নির্বোধ আমাদের দিকেই আসছে!'

ফিরে দেখি, প্রকাণ্ড একজন পিপে-মানুষ হেলে দুলে হাঁসফাস করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তার পিপেটা এমন ভয়ানক মোটা যে ওর মধ্যে পণ্ডিতের মতন দু-দুজন লোকের ঠাঁই হতে পারে! তার মুখখানাও সবচেয়ে বড়ো বারকোসের মতন। কপালে গালে বড়ির মতন বড়ো বড়ো আঁচিল আর তার ঠোঁটে এমনি ন্যাকামি মাখানো হাসি যে দেখলেই গা যেন জ্বলে যায়! লোকটাকে মোটেই আমার পছন্দ হল না!

সে এসে একবার সবিস্ময়ে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, 'প্রিয় পণ্ডিতমশাই, এই বুঝি সেই জীবটা? বটে! আমি এটাকেই দেখতে এসেছি!'

পণ্ডিত বললেন, 'এই ভদ্রলোকের নাম শ্রীঅমলকুমার সেন, নিবাস বাংলা দেশ! ভোম্বল, এঁর সম্বন্ধে তুমি ওরকম ভাষায় কথা কোয়ো না!'

ভোম্বল অমনি সুর বদলে চোখ মটকে বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনার বন্ধু তো আমারও বন্ধু!.....হ্যাঁ, ভালো কথা কমলা কোথায়?'

পণ্ডিত বললেন, 'এতক্ষণে সে বোধহয় মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছে। আপাতত তুমি এক কাজ করতে পারো ভোম্বল? অমলকে নিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসবে?'

ভোম্বল বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনার কথায় আমি প্রাণ দিতে পারি, এটা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার! আসুন অমলবাবু, আমার সঙ্গে আসুন! আপনাকে আমি যাদুঘরে নিয়ে যাব। সেখানে একটা ভালো হোটেল আছে, একটু-আধটু খাওয়া-দাওয়াও করা যাবে—কী বলেন?' বলেই সে মহা মুরুব্বির মতন আমার পিঠ চাপড়ে দিলে।

পণ্ডিত বললেন, 'সন্ধের আগেই ওকে আবার ফিরিয়ে আনা চাই। মনে রেখো, ওর ভার এখন তোমার উপরে, ওর জন্যে তুমি দায়ী হবে!' বলেই তিনি হাত-পা ভিতরে গুটিয়ে নিয়ে গড়াতে গড়াতে ঘর থেকে বেগে বেরিয়ে গেলেন।

॥ নবম ॥

নরডিম্ব

ভোম্বল চোখ দুটো নাচাতে নাচাতে বললে, 'যখন পণ্ডিতের হুকুম, পালন করতেই হবে! অমলবাবু, তাহলে আপনি হচ্ছেন একটি মনুষ্য? আমাদের দেখে আপনার কী মনে হয়?'—বলেই সে দন্তবিকাশ করে হাসলে।

আমি জবাব দিলুম না।

সে আবার দন্তবিকাশ করে হেসে বললে, 'আপনি গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটতে পারেন?'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'নিশ্চয়ই পারি না! দেখতেই পাচ্ছেন আমি পিপে নই!'

—'তাহলে উপায় নেই—আমাকেও দেখছি আপনার সঙ্গে ছোটোলোকের মতন পায়ে হেঁটে মরতে হবে! পায়ে হাঁটা এক ঝকমারি! হাঁপ ধরে।...আসুন, এই পথে।'

ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে দেখি, একটা পথ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। সেটা হচ্ছে সিঁড়ি! এদের সিঁড়িতে ধাপ নেই—তাই গড়িয়ে নামবার সুবিধা হয়। আমার কিন্তু একটু মুশকিল হল। ঢালু পথ দিয়ে নামতে গিয়ে দু-চার বার হুমড়ি খেয়ে পড়বার মতন হলুম। এবং শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে পারলুমও না। খানিকটা সড় সড় করে নেমে গিয়ে মস্ত একটা ডিগবাজি খেয়ে দড়াম করে নীচের চাতালের উপরে আছাড় খেয়ে পড়লুম।

ভোম্বলের কিন্তু কোনোই বালাই নেই। সে হাত-পা ভিতরে গুটিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের নিমিষে নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দন্তবিকাশ করে ন্যাকামির হাসি হেসে বললে, 'দেখছেন, শ্রীখোলের ভেতরে থাকার কত সুবিধে!'

আমি রাগে মুখ ভার করে বললুম, 'আমাদের দেশে গেলে আপনিও বুঝতেন কত ধানে কত চাল! আমাদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হলে আপনার খোলা ফেটে চৌচির হয়ে যেত!'

ভোম্বল বললে, 'আপনাদের দেশে যাচ্ছে কে? অসভ্য দেশ!'

আমি আর কিছু বললুম না। তার সঙ্গে বাড়ির বাহির হয়ে রাজপথের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে এক নতুন দৃশ্য! রাজপথের দু-ধারে সারি সারি বাড়ি—কিন্তু কোনও বাড়ির সঙ্গেই কোনও বাড়ির গড়ন মেলে না। প্রত্যেক বাড়ির উপর দিকটা খিলানের আকারে গড়া—আঁকা-বাঁকা, কিম্ভূতকিমাকার!

কলকাতার আপিস অঞ্চলে যেমন আকাশমুখো মস্ত মস্ত বাড়ি আছে, এখানেও তার অভাব নেই। কিন্তু এদেশি ঢ্যাঙা বাড়িগুলোর আমাদের চিলের ছাদের মতন ঢালু সিঁড়ির কথা ভেবে আমার বুক কাঁপতে লাগল! ওসব সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে এরা হয়তো যথেচ্ছভাবে বিশ-পঁচিশ খানা অসম্ভব ও ভূতুড়ে হাত-পা বার করে উপরে উঠে যায়, কিন্তু ওসব সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নাবা করতে গেলে গতর চূর্ণ হয়ে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত!

রাস্তায় আমাদের দেশের মতন গোলমালও নেই। পথ দিয়ে ধীরে ধীরে বা দ্রুতবেগে পিপের পর পিপে গড়িয়ে যাচ্ছে, খুব কম লোকই পায়ে হেঁটে চলছে! যারা পদব্রজে যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেরই তিনখানা করে পা দেখে বোঝা গেল যে, ইচ্ছামতো পদবৃদ্ধি করতে পারলেও সাধারণত এরা তিনখানা পদই ব্যবহার করে।

গোরুর গাড়ির চাকার মতনই বড়ো অনেকগুলো চক্রও রাস্তার উপর দিয়ে বন বন করে ছুটছে! এক-এক খানা চাকা আবার এত বড়ো যে, মাপলে আট-দশ হাতের কম চওড়া হবে না! চাকাগুলো ছুটে যাচ্ছে ঠিক মটরগাড়ির বেগে। এমন কায়দায় তারা এঁকেবেঁকে ছোটো ছোটো পিপের পাশ কাটিয়ে ছুটছে যে দেখলে তারিফ করতে হয়! কিন্তু পিপেদের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেও কোনও পক্ষ থেকেই এখানে যে আপত্তি হয় না, সে প্রমাণও পাওয়া গেল। কারণ একবার একখানা চাকা বিপরীত দিক থেকে ধাবমান একটা পিপের উপরে উঠে আবার গড়িয়ে নেমে চলে গেল, তবু কোনও পক্ষ থেকেই কোনও গোলমাল হল না—যেন এ ব্যাপারটা এত বেশি তুচ্ছ যে, লক্ষ করবার মতনই নয়!

আমার পাশের হৃষ্টপুষ্ট জীবটি—অর্থাৎ ভোম্বলদাস লকলকে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে বললে, 'কী অমলা, আমাদের দেশ দেখে তুমি যে দেখছি থ হয়ে গেলে!'

অমলা! আমি খাপ্পা হয়ে বললুম, 'আপনি আমাকে অমলা বলে ডাকছেন যে? আমার নাম অমল।'

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে বললে, 'ঠাট্টা করলে চটো কেন? ও অমল আর অমলা একই কথা!'

আমি বললুম, 'না, অমল আর অমলা একই কথা নয়! ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না!'

ভোম্বল বললে, 'বাপরে তুমি তো ভারি বেরসিক কাঠ গোঁয়ার হে? একটুতেই এত বেশি চটো কেন? তোমার মুখখানা এখন কীরকম দেখতে হয়েছে জানো? এইরকম!'—বলেই ভোম্বল তার মুখখানা বিকৃত করতে লাগল। এবং আমার চোখের সামনেই দেখতে দেখতে তার অদ্ভুত মুখখানা অবিকল আমার মুখেরই মতন হয়ে উঠল! সে যে কী প্রাণ চমকানো ব্যাপার, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না! আমার চোখের সুমুখেই আর একজন 'আমি'র আবির্ভাব! শেষটা আমি আর সইতে পারলুম না, বলে উঠলুম, 'ক্ষান্ত হন মশাই, ক্ষান্ত হন! আমি ঘাট মানছি!'

ভোম্বলের মুখ আবার ভোম্বলেরই মতন কুৎসিত হয়ে গেল। দন্তবিকাশ করে হেসে বললে, 'দেবরাজ ইন্দ্র যে বিদ্যার জোরে মহর্ষি গৌতমের মূর্তি ধারণ করেছিলেন, আমিও সেই বিদ্যা জানি! হ্যাঁ, আর পণ্ডিতের মেয়ে কমলাও এ বিদ্যায় ভারি পাকা। এ রাজ্যে এই বহুরূপী বিদ্যায় আমাদের আর জুড়ি নেই—আমাদের মতন ভালো নকল আর কেউ করতে পারে না!...না, মিছে কথায় সময় কাটানো হচ্ছে—আমার খিদে পেয়েছে! চলো যাদুঘরে

যাই! চাকা! এই চাকা!' বলেই সে এমন তীক্ষ্ণ শিস দিল যে আমার মনে হল কানের কাছে বুঝি কোনও কলের গাড়ির ইঞ্জিন বাঁশি বাজালে!

কোথা থেকে সোঁ সোঁ করে দু-খানা মস্ত চাকা আমাদের সামনে এসে হাজির! তাদের চক্রনাভির মধ্যে—অর্থাৎ মাঝখানে দুজন পিপে-মানুষ কী কৌশলে নিজেদের সংলগ্ন করে রেখেছে এবং হাতে করে পাখির দাঁড়ের মতন বেয়াড়া এক বসবার আসন ধরে আছে।—

লোকে যেমন করে ব্যাগ বা পোর্টম্যান্টো গাড়ির উপরে উঠিয়ে দেয়, ভোম্বল ঠিক তেমনি ভাবেই ধরে আমাকে সেই দাঁড় আসনে তুলে বসিয়ে দিলে! তারপর নিজেও আমার পাশে এসে বসে হেঁকে বললে, 'এই! যাদুঘর—শিগগির!'

বোঁ করে চাকা ছুটল—কে যেন আমাকে এক হ্যাঁচটা টান মেরে দাঁড় থেকে ফেলে দেয় আর কী! কী কষ্টে যে ঝোঁক সামলে নিলুম, তা আর বলবার নয়! চাকা দু-খানা ছুটল ঠিক আমাদের পাঞ্জাব মেলের মতন, হু হু হাওয়ার তোড়ে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। দাঁড়ের উপর বসে থাকে, কার সাধ্য!—ভোম্বলের কিন্তু কোনওই খেয়াল নেই—দন্তবিকাশ করে হাসতে হাসতে সে দিব্যি আরামেই যাচ্ছে! গাড়ির পায়ে নমস্কার!

আচমকা গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং এবারে আমি কিছুতেই টাল সামলাতে পারলুম না—দাঁড় থেকে ঠিকরে দশ হাত দূরে খুব নরম কী একটা জিনিসের উপর গিয়ে পড়লুম এবং পরমুহূর্তেই সে জিনিসটাও আমাকে তুলে ছুড়ে ফেলে দিলে।

খনখনে গলায় কে বলে উঠল, 'কীরকম লোক মশাই আপনি?'

আমি নিশ্চয় কারুর ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়েছিলুম। তাড়াতাড়ি মাটি থেকে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললুম, 'আমাকে মাপ করবেন! আমি—'

—'আপনি কি দেখতে পাননি যে, আমি এখন আমার শ্রীখোলের ভেতরে নেই? আপনি কি চোখের মাথা খেয়েছেন? আপনি কি—ও হরি, এটা যে সেই মানুষটা!'

এতক্ষণ পরে আমি একটু দম পেলুম এবং আমার চোখের ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবটা কেটে গেল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, একটা পিপে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

অনুতপ্ত স্বরে বললুম, 'দেখুন, এরকম দাঁড়ে চড়ার অভ্যাস আমার কোনও কালেই নেই। তাই—'

—'আরে গেল, এ যে আমার শ্রীখোলের সঙ্গে কথা কয়! মশাই কথা কইতে হয় তো আমার সঙ্গে কথা বলুন।'

তখন ডান দিকে ফিরে দেখি, পথের উপরে জেলি মাছের মতন কী একটা পড়ে রয়েছে! তার মাঝখানে একখানা থলথলে মুখ থরথর করে কাঁপছে! এবং তার চোখ দুটো ক্রোধে ও রুদ্ধ আক্রোশে আমার পানে তাকিয়ে যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে! মুখখানা এক-এক বার ফুলছে, আবার হাওয়া বেরিয়ে গেলে ফুটবলের ব্লাডারের অবস্থা যেমন হয়, তেমনি চুপসে যাচ্ছে!

এখন ভোম্বলের হাসির ঘটা দেখে কে! হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

অনেক চেষ্টার পর হাসি থামিয়ে সে বললে, 'অমল, তুমি একেবারে ও বেচারার মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপ খেয়েছ, আর ওর দম তাই ফুরিয়ে গেছে!...ওহে নসু! ভায়া, এ লোকটি জেনেশুনে এ কাজ করেনি, তুমি ঠান্ডা হও! আর এও বলি, রাস্তার মাঝখানে শ্রীখোল থেকে বেরিয়ে আসা তোমার উচিত হয়নি!'

নসু মুখ ভেংচে বললে, 'খুব তো মুখশাবাশি করছ, নিজে এ দশায় পড়লে টের পেতে! আমার গা-টা নদী না পুকুর, যে ও লোকটা এসে অমন করে ঝাঁপ খাবে! যাও, যাও—আমার পিলে একেবারে চমকে গেছে!' এমনি বক বক করতে করতে সে উঠে নিজের পিপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং তিনখানা ঠ্যাং ও খানকয়েক হাত বার করে বারকয়েক ছুড়লে এবং তারপর হঠাৎ সব গুটিয়ে নিয়ে গড়গড়িয়ে পথ দিয়ে ছুটে চলল!

ভোম্বল বললে, 'এই হচ্ছে আমাদের যাদুঘর। যাও, তুমি ভেতরে ঢুকে চারিদিক ভালো করে দেখে এসো গে যাও! মানকে! তুই এই ভদ্রলোককে সমস্ত দেখিয়ে আন!'—এই বলে সে একদিকে এগিয়ে চলল।

ভোম্বল আমাকে 'তুমি' বলে ডাকছে, তাই আমিও বললুম, 'ওহে ভোম্বল, তুমি কোথায় চললে?'

—'হোটেলে, আর যৎকিঞ্চিৎ পেটে না দিলে চলে না! যাদুঘর দেখে-শুনে তুমি আবার আমার কাছে এসো। সে আর আমার দিকে ফিরেও তাকালে না—খাবারের গন্ধ বোধহয় তার নাকে ঢুকেছে!

আমারও পেটে এখন আগুন জ্বলছে! একবার ভাবলুম আমিও হোটেলে গিয়ে ঢুকি, কিন্তু এদেশে আমাদের টাকা পয়সা যদি না চলে, তবে খাবারের দাম দেব কেমন করে? এমনি সাত-পাঁচ ভেবে শ্রীমান মানকের সঙ্গে আমি যাদুঘরের ভিতরেই প্রবেশ করলুম।

যাদুঘরের ভিতরে ঢুকে আমি যে কত রকমের অজানা জিনিস দেখলুম তা আর গুনে ওঠা যায় না! এই অদ্ভুত জীবদের স্রষ্টার নিজের হাতে আঁকা অনেকগুলো ছবিতে বুঝিয়ে দেওয়া আছে, মানুষের দেহের উপাদান থেকে কেমন করে এদের দেহ গড়া হয়েছে, কেমন করে তাদের মাংসের ভিতর থেকে হাড় বাদ দেওয়া হয়েছে, দ্রব্যগুণের মহিমায় এদের মগজের শক্তি কেমন করে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে প্রভৃতি। সেসব এখানে অকারণে বর্ণনা করে লাভ নেই, কারণ আসল ছবিগুলো না দেখলে কেউ কিছু বুঝতে পারবেন না!

অনেকগুলো পাথরের কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি রয়েছে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় এই পিপে-মানুষগুলোর চেহারা কীরকম ছিল, সেই মূর্তিগুলোর সাহায্যে তাইই দেখানো হয়েছে।

এক জায়গায় একটা যন্ত্র দেখলুম, তার নাম 'নরডিম্ব-প্রস্ফুটন-যন্ত্র'! তার পাশে রয়েছে উটপাখির ডিমের মতন মস্ত একটা ডিম—উপরে লেখা 'নরডিম'! দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল বললেও কম বলা হয়!—ওরে বাবা! ঘোড়ার ডিমের কথা তো লোকের মুখে শুনেছি, মানুষের ডিম আবার কী? এর কথা তো ঠাট্টা করেও কেউ বলে না!

অনেকক্ষণ সেই ডিম আর যন্ত্রের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। কিন্তু তবু কোনও হদিস না পেয়ে স্থির করলুম—নিশ্চয়ই এটা একটা বড়ো রকমের কৌতুক! যাদুঘরে এ-রকম গাঁজাখুরি কৌতুক থাকা উচিত নয়!

আর একটা ঘরে গিয়ে দেখলুম চন্দ্রসেনের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্তি। চন্দ্রসেন—এই অদ্ভুত জীবদের স্রষ্টা! সে মূর্তি দেখে মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হল না। বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়া, শীর্ণদেহের এক বৃদ্ধ—তার দুই চক্ষে ঠিক যেন হিংসা-পাগল হত্যাকারীর দৃষ্টি! দেখলেই ভয়ে বুক শিউরে ওঠে! আমার মনে হল চন্দ্রসেনের চোখদুটো যেন কুটিল ভাবে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে! এ রাজ্যে সাধারণ মানুষের আবির্ভাব দেখে চোখদুটো যেন মোটেই খুশি নয়!

ঘরের ভিতরটা তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। ভয়ে ভয়ে পিছন পানে তাকিয়ে দেখি, সেই মানকে বলে লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বললে, 'এ ঘরে আর বেশিক্ষণ থাকবেন না।'

আমি বললুম 'কেন?'

মানকে ভয়ে ভয়ে খুব চুপিচুপি বললে, 'অন্ধকার হলে এ ঘরে আর কেউ আসে না।'

—'কেন?'

একটা হাত তুলে চন্দ্রসেনের মূর্তি দেখিয়ে সে বললে, 'ওঁর ভয়ে!'

আমি আবার মূর্তির দিকে তাকালুম। কোনও জানলার ফাঁক দিয়ে একটি ক্ষীণ আলোকের টুকরো মূর্তির ঠোঁটের উপরে এসে পড়েছে। আমার মনে হল, চন্দ্রসেনের মুখে যেন একটা রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর হাসির রেখা ফুটে উঠেছে!

ফিরে বললুম, 'ওঁর ভয়ে কীরকম? ওটা তো পাথরের মূর্তি?'

সে বললে, 'অন্ধকার হলেই ওই মূর্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। তখন সকলেই শুনতে পায় কে যেন ভারী ভারী পাথুরে পা ফেলে ঘরময় চলে বেড়াচ্ছে। আসুন, আমি আর এখানে থাকব না।'

আমি তার কথা বিশ্বাস করলুম না বটে, কিন্তু এই ঘরে—এমনকি যাদুঘরেও আর থাকতে ইচ্ছা হল না। একেবারে বাইরে বেরিয়ে হোটেলের দিকে গেলুম ভোম্বলের খোঁজে।

সেখানে গিয়ে দেখি, ভোম্বল ততক্ষণে মহাধূমধাড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছে। তার খাবার টেবিলের উপরে পঁচিশ-ত্রিশ খানা থালা পড়ে রয়েছে এবং একটা ঘটিতে মুখ দিয়ে ঢক ঢক করে কী পান করছে।

আমাকে দেখেই ভোম্বল টেবিল চাপড়ে খুব ফুর্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'এই যে অমলা! এসো, এসো, একটু ভাং খাবে এসো!'

মনের রাগ কোনওরকমে সামলে বললুম, 'আমি সিদ্ধি ছুঁই না! সন্ধের আগে আমার ফেরবার কথা, আমাকে নিয়ে চলো!'

ভোম্বল তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে! চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। নইলে পণ্ডিতবুড়োটা রাগ করবে, আর তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না!'

—'মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না মানে?'

—'ওহো, তুমি জানো না বুঝি? কমলার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ যে স্থির হয়ে আছে!'

কমলা! অমন সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে এই বিটকেল জন্তুটার বিয়ে হবে! আশ্চর্য!

ভোম্বল বললে, শোনো। আমি যে ভাং খাই, পণ্ডিতবুড়োকে এ কথা বোলো না। যদি বলো, তাহলে তুমি বিপদে পড়বে! এখন চলো।'

আমরা দুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলুম।

ভোম্বল বেজায় টলছিল। তাই বোধহয় তিনখানা পায়ে আর টাল সামলাতে না পেরে খান ছয়েক পা বার করে হাঁটতে লাগল। তারপর চারখানা হাত বার করে চার হাতে তালি দিতে দিতে গাইতে লাগল—

ও তার নামটি যে ভাই অমলা!
ও সে নয়কো তবু অবলা!
তাকে দাও না সবাই কানমলা—
কানমলা হো! কানমলা—
কানমলা! তার নাম অমলা!
ঠ্যাং আছে তার মোটে দুটো,
মগজে তার মস্ত ফুটো,
বুদ্ধিতে তাই ডাহা ঝুটো—
করো না তাকে চ্যাং-দোলা!
ও তার নাম রেখেছি অমলা!
হয় কুপোকাৎ চড়লে গাড়ি,
ভবঘুরের নেইকো বাড়ি,
কী চেহারা! ঠিক আনাড়ি!
খোরাক খালি কাঁচকলা!
ও তার নাম রেখেছি অমলা!
ও সে নয়কো তবু অবলা!
তাকে দাও না জোরে কানমলা,
কানমলা হো! কানমলা—
কানমলা! তার নাম অমলা!

আমার এমন রাগ হতে লাগল ইচ্ছা হল, মারি তার গালে ঠাস করে এক চড়! কিন্তু হতভাগা এখন মত্ত, একে মারা না-মারা দুই-ই সমান! কাজেই মুখ বুজে তার সব অসভ্যতা সহ্য করতে হল।

॥ দশম ॥

আমি নতুন মানুষ হব

পরের দিন সকালে পাখির গানে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

জানলার ধারে পুচ্ছ নাচিয়ে একটি চমৎকার রঙিন পাখি মিষ্টি সুরে গান গাইছিল।

আমাদের চেনা পৃথিবীর পাখি দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল! ভাগ্যিস, চন্দ্রসেনের মগজে এখানকার পাখিদের দেহকেও উন্নত করবার খেয়াল গজায়নি!

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে সুন্দরী কমলা। তার মুখখানি কেমন যেন ম্লান ম্লান।

আমি শুধালুম, 'তোমার মুখ অমন কেন? অসুখ করেছে নাকি?'

কমলা বললে, 'না! বাবা আমার ওপরে রাগ করেছেন।'

—'কেন?'

—'আমি এইরকম মূর্তি ধরেছি বলে। তিনি বললেন, আমি যদি শ্রীখোলের ভেতরে না থাকি তাহলে আমার পাপ হবে। একথা কি সত্যি?'

—'তোমার যদি ভালো না লাগে, তবে কেন তুমি খোলার ভেতরে থাকবে?'

—'আমিও তাই বলি। বাবা কিন্তু বোঝেন না। বাবা ভারী একরোখা মানুষ। আচ্ছা, বাবা যে বলেন, তুমি নাকি আমাদের মতন হরেক-রকম মূর্তি ধরতে পারো না, তোমার দেহ নাকি হাড়ে হাড়ে ভরা, আর তুমি নাকি গড়াতে পারো না? এ কথা কি সত্যি?'

—'সত্যি।'

—'তোমার শ্রীখোল নেই?'

—'নিশ্চয়ই নেই! আমাদের দেশে খোলার ভেতরে থাকে কেবল কচ্ছপ, কাঁকড়া, শামুক আর গেঁড়ি-গুগলিরা।'

—'আমি কেতাবে তোমার মতন জীবের কথা পড়েছি বটে, কিন্তু এর আগে চোখে কখনও দেখিনি। আচ্ছা, তোমাদের দেশে সব মানুষই কি একরকম দেখতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার চেহারা আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, তোমাদের দেশের মেয়েদেরও দেখতে কি আমাদেরই মতন?'

—'হ্যাঁ। তবে তারা তোমার মতন এত সুন্দর নয়।'

আমার কথা শুনে কমলা খুব খুশি হয়ে হাসতে লাগল।

জানালা দিয়ে দূরের একখানা বাড়ি দেখিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা কমলা, ওই যে মস্ত বাড়িখানা দেখা যাচ্ছে, ওখানে কী হয়?'

কমলা একবার উঁকি মেরে দেখে বললে, 'ও হচ্ছে স্ফুটনাগার!'

—'সে আবার কী?'

—'দুর, তুমি ভারী বোকা! কিচ্ছু জানো না! ওখানে যে ছেলেমেয়েরা জন্মায়!...আমার পিঠ কট কট করছে, আমি এখন শ্রীখোলের ভেতরে ঢুকতে চললুম। আমার সে মূর্তি আমি তোমাকে দেখাব না, তাহলে তুমি আমাকেও ঠাট্টা করবে!'—পিঠে কালো কেশমালা দুলিয়ে কমলা একছুটে চলে গেল।

আমি দুই চোখ মুদে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, স্ফুটনাগার আবার কাকে বলে? কমলার কথায় তো কিছুই স্পষ্ট হল না!

হঠাৎ ঘরের ভিতরে পণ্ডিতমশাই ও আর-একজনের গলা পেলুম। আমি উঠে বসতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তারপরেই ভাবলুম ওরা কি বলাবলি করে চুপিচুপি শোনাই যাক না!

খানিক পরেই বুঝলুম, ওরা আমার সম্বন্ধেই কথা কইছে! ওরা বোধহয় ভেবেছে, আমার ঘুম এখনও ভাঙেনি, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!

অচেনা গলায় কে বললে, 'পণ্ডিতমশাই, আপনার এই নমুনাটি বেশ সরেস নয়।'

পণ্ডিত বললেন, 'তা না হতেও পারে। কিন্তু এই নিরেস নমুনা নিয়েই আমরা যদি কেল্লা ফতে করতে পারি, তাহলে তো আমাদের সুনাম আরও বেশিই হবে! আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে একবার অস্ত্র করলেই আমি ওর দেহকে ঠিক বদলাতে পারব।'

—'তারপর?'

—'আরও অনেক মানুষ ধরে এনে এই একই উপায়ে আমাদের জাতির জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলব। এ ছাড়া আর উপায় নেই—বহু বৎসরের পুরানো হয়ে পড়েছে বলে এখানকার সকলেরই জীবনীশক্তির অবস্থা হয়ে আসছে ক্রমেই ক্ষীণ।'

—'অস্ত্র করবার আগে ওই লোকটাকে কি সব কথা জানানো হবে?'

'অমরচন্দ্র, তুমি একটি আস্ত গাড়ল। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে অমল মোটেই খুশি হবে না।'

—'কী পদ্ধতিতে আপনি কাজ করবেন?'

—'প্রথমে অমলের দেহকে আমি লম্বালম্বি ভাবে ফালা ফালা করে কাটব। তারপর দেহের সেই খণ্ডগুলোকে বাজের আগুনে তাতিয়ে হাড়গোড় সব বার করে নেব।'

এতক্ষণ শান্ত ভাবে চুপ করে সব শুনছিলুম, কিন্তু এই পর্যন্ত শুনেই আতঙ্কে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম আর কী! ওরে চাঁদমুখো বুড়ো রাক্ষস, তোর মনে মনে এত শয়তানি?

অমরচন্দ্র বললে, 'কিন্তু পণ্ডিতমশাই, মনে আছে তো, গেল বছরে সেই তুর্কি লোকটার উপরে অস্ত্রাঘাত করে আপনি বিফল হয়েছিলেন? সেই থেকে মহারাজা হুকুম দিয়েছেন, এ রাজ্যে কেউ আর এরকম পরীক্ষা করতে পারবে না?'

—'হুঁ। কিছুই আমি ভুলিনি। কিন্তু আমি কাজ সারব খুব লুকিয়ে। তারপর যদি সফল হই, মহারাজা আর আমার উপরে রাগ করতে পারবেন না। সেবারের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল বলেই তো অত গোলমাল হয়!'

—'এখানকার অনেক পণ্ডিতও আপনার শত্রু, এ কথাটাও মনে রাখবেন! আর রাজসভায় ভোম্বলদাসের খুবই পসার, সে-ও আপনার বিশেষ বন্ধু নয়!'

পণ্ডিত বললেন, 'সবই আমার মনে আছে। যেদিন অস্ত্র করব, তুমি হাজির থাকবে তো?'

—'নিশ্চয়! প্রমোদকেও নিয়ে আসব।'

—'হ্যাঁ, তাকেও দরকার হবে বই কি,—ছুরি চালাতে ছোকরা খুব মজবুত!'

অমরচন্দ্র বললে, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার এবারকার পরীক্ষা যেন সার্থক হয়—চন্দ্রসেনের প্রেতাত্মা যেন আমাদের সাহায্য করেন!'

তারপর পায়ের শব্দে বুঝলুম, দুই শয়তান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হুঁ, তাহলে আমার দেহকে লম্বালম্বি ভাবে ফালাফালা করে কেটে, বাজের আগুনে তাতিয়ে, হাড়গোড় বার করে নিয়ে নতুন এক পরীক্ষা করা হবে? ওঃ, কী সুমধুর কথা রে, শুনে অঙ্গ যেন জল হয়ে গেল!

আমি ভয় পেয়েছি? ধেৎ, ভয় তো খুব ছোটো কথা, আমার বুকটা এরই মধ্যে কুঁকড়ে যেন শুকনো চামড়ার মতন শক্ত হয়ে উঠেছে!

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে আবার পায়ের শব্দ!

ইনি আবার কোন অবতার? এখানে এসে বুক ধড়াস ধড়াস করেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে দেখছি! সর্বদাই নতুন নতুন বিপদের ভাবনায় মনটা অস্থির হয়ে আছে। যে সৃষ্টিছাড়া দেশ!

কান পেতে মটকা মেরে পড়ে রইলুম।

তারপরেই ভোম্বলদাসের ভরাট ভারিক্কে গলায় শুনলুম, 'আরে ও কী! ওহে অমল, তোমাদের দেশের লোকেরা কি এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় কাত হয়ে থাকে?'

আমি উঠে বসে নির্বাক হয়ে রইলুম—ভোম্বল কালকে যে-গানটা গেয়েছিল, সেটা এখনও আমি ভুলতে পারিনি। আমার নাম অমলা? আমায় দেবে কানমলা? বটে!

ভোম্বল তার কাতলা মাছের মতন ড্যাবডেবে চোখে আমার মুখের পানে চেয়ে বুঝতে পারলে যে, আমি তার উপরে একটুও খুশি নই। সে আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, 'অমল! ভায়া! কাল সন্ধের সময়ে আমি ঝোঁকের মুখে একটা গান গেয়ে ফেলেছিলুম' তা ভাই, বন্ধুত্ব থাকলে অমন হয়েই থাকে। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

আমি নিজের মুখখানা আরও বেশি গোমড়া করে তুললুম। আর সত্যি বলতে কী, এই

ভূতুড়ে জন্তুটা আমাকে তার বন্ধু মনে করে শুনে আমার রাগ যেন আরও বেড়ে উঠল! আমি হব এইসব অপরূপ চেহারার বন্ধু? তা আর জানি না—কচুপোড়া খাও!

আমি এখনও কথা কইলুম না দেখে ভোম্বল আরও দমে গিয়ে বললে, 'হ্যাঁ ভাই অমল, তুমি কি সত্যি সত্যি আমাকে মাপ করবে না? দ্যাখো, এই আমি আট হাত বার করলুম! আট হাত জোড় করে আমি মাপ চাইছি এমন কাজ আর কক্ষনও করব না! বলো তো আমি চার-পাঁচটা নাক বের করে চার-পাঁচটা নাকে খত দেব!'

ধাঁ করে আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল! আমি বেশ বুঝলুম ভোম্বলের সিদ্ধি খাওয়ার কথাটা পণ্ডিতের কানে তুলে দিলে পাছে কমলার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যায়, সেই ভয়েই সে আমার কাছে এত কাকুতি-মিনতি করছে! নইলে মনে মনে সে নিশ্চয়ই আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না! হাতে যখন পেয়েছি, তখন আর একে হাতছাড়া করা নয়! এই ভীষণ শত্রুপুরীতে একে দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে—অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

কাজেই এইবারে আমি মুখ খুলে বললুম, 'ওরকম গান তুমি আর কখনও গাইবে না?'

—'না, না, না! এই তিন সত্যি!'

—'আচ্ছা, এবারের মতন তোমাকে মাপ করা গেল!'

—'কালকের কথা কারুকে বোলো না?'

—'না।.....কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কি রাজসভায় যাতায়াত আছে?'

—'খুব আছে! রাজা যে আমাকে বড়ো ভালোবাসেন।'

—'আচ্ছা ভোম্বল, তুমি অমরচন্দ্রকে চেনো?'

—'খুব চিনি! কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

—'তুমি বোধহয় ওই অমরচন্দ্র আর আমাদের পণ্ডিতকে দেখতে পারো না?'

ভোম্বলের মুখ শুকিয়ে গেল। চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, 'এ কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

আমি বললুম, 'যেমন করে হোক জেনেছি। আচ্ছা ভোম্বল, জ্যান্ত মানুষের দেহ নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটাকুটি করা কি ভালো?'

ভোম্বল বললে, 'কে কাটছে, আর কাকে কাটছে, তা না জেনে মত দি কেমন করে? এই ধরো, যদি কেউ বলে যে আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই ছুরি দিয়ে কেউ আমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করবে, তাহলে আমি এমন চেঁচিয়ে আপত্তি করব যে আকাশ ফেটে যাবে। কিন্তু তোমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করলে আমি আপত্তি না করতেও পারি!'

আমি চোখ রাঙিয়ে বললুম, 'বটে, বটে! তাই নাকি?'

থতমত খেয়ে ভোম্বল বললে, 'না ভাই, আমি ঠাট্টা করছিলুম!'

—'এ ঠাট্টাটা তোমার কালকের গানের চেয়েও খারাপ।'

—'যাইই বলো ভাই, তুমি ভারী বদরসিক! ঠাট্টা বোঝো না। এ দেশের লোকরা খুব ঠাট্টা বোঝে। আমি একবার ঠাট্টা করে একজনের চারটে হাত কেটে নিয়েছিলুম। সে কিছু বলেনি।'

—'বলবে কেন? চারটের জায়গায় তার আবার আটটা নতুন হাত গজিয়ে উঠেছিল!'

—'হ্যাঁ, এ কথা সত্যি বটে।...কিন্তু দ্যাখো অমল, তোমার আজকের কথা শুনে আমার আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে একটা তুর্কি পথ ভুলে আমাদের দেশে এসে পড়েছিল। পণ্ডিতমশাই সেই তুর্কিটার জ্যান্ত দেহ নিয়েই কাটাকুটি করেছিলেন।'

এর সঙ্গে যেন আমার নিজের কোনও সম্পর্কই নেই, এমনি উদাসীন ভাবে আমি বললুম, 'কেন?'

—'কেন, তা ঠিক জানি না। তবে গুজবে শুনেছিলুম, আমাদের চেয়েও নাকি নতুন একরকম মানুষ তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছিল।'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'তারপর?'

—'নতুন মানুষ তৈরি হল না ছাই হল! মাঝখান থেকে সেই তুর্কি বেচারাই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মারা পড়ল! সেই থেকে এখানে আইন হয়েছে, যার দেহ কাটাকুটি করা হবে, কাটবার আগে তার নিজের মত না নিলে চলবে না।'

একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম, বুকের উপর থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল! পণ্ডিত যদি খুব আদর মাখা মিষ্টি সুরেও বলেন—'অমল, তুমি লক্ষ্মীছেলে। আমি তোমার দেহখানি লম্বালম্বি ভাবে ছুরি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করতে চাই। আশা করি আমার এ অনুরোধ তুমি রাখবে।'—তখন আমি নিশ্চয়ই বলব না যে, 'আপনার আদেশ আমি মাথায় পেতে নিলুম! তবে আর দেরি কেন? দয়া করে ছুরি উঁচিয়ে এগিয়ে আসুন, আমি ধন্য হই!'

ভোম্বল বললে, 'দ্যাখো, আজ ক-দিন ধরে একটা ব্যাপার লক্ষ করছি! তুমি যার নাম করলে, ওই অমরা-ব্যাটা আর পণ্ডিত প্রায়ই একসঙ্গে কী গুজগুজ করে। ওরা বোধহয় আবার কোনও শয়তানি করবার চেষ্টায় আছে!'

আমি মনের ভাব লুকিয়ে বললুম, 'না না, আমাদের পণ্ডিতমশাই খুব সাধু লোক! দয়ার শরীর!'

—'হেঃ, সাধু লোক! দয়ার শরীর! তুমি তাহলে লোক চেনো না! জুজুবুড়ো—জুজুবুড়ো, পণ্ডিত হচ্ছে, একটি জুজুবুড়ো!...যাক সে কথা। আজ তুমি বেড়াতে যাবে নাকি?'

—'আবার!'

—'ভয় নেই! আজ আর আমি হোটেলেও যাব না—গান-টানও গাইব না!'

—'তবে কোথায় যাবে?'

—'মন্ত্রীসভায়। সেখানে আজ তর্ক হবে।'

—'আচ্ছা, পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। তাঁর মত নেওয়া চাই তো!'

॥ একাদশ ॥

আবার নরডিম্ব

বৈকালে আমরা যখন চা পান করি, এরা তখন লঙ্কার শরবত খায়! পণ্ডিতমশাই বলেন, 'পৃথিবীর সবটাই যে সুখের নয়, এ সত্য মনে রাখবার জন্যেই লঙ্কার ঝাল শরবতের ব্যবস্থা।'

পৃথিবীতে দুঃখ যে কত, জুজু রাজ্যের জুজুদের পাল্লায় পড়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তাই ঝাল শরবত পান করে সে দুঃখ আরও বাড়াবার চেষ্টা আমি কোনওদিন করিনি।

আজ বৈকালে ঝাল-শরবতের মহিমায় কমলা যখন হা হু করছিল, সেই সময়ে তার সঙ্গে আমার দেখা হল।

কমলা বললে, 'আজ নীল শাড়ি পরে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?'

আমি বললুম, 'চমৎকার।'

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে বলল, 'ও অমলবাবু! তোমাদের দেশের খোকা-খুকিদের কেমন দেখতে?'

আমাদের খোকা-খুকিদের একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলুম।

কমলা বললে, 'তোমার নিজের কোনও খোকা-খুকি আছে?'

—'না।'

কমলা দুঃখিত মনে বললে, 'আমারও নিজের কোনও খোকা-খুকি নেই! পঁচিশ বছর বয়স না হলে কেউ এখানে খোকা-খুকু কিনতে পারে না।'

আমি বিস্ময়ে খানিকক্ষণ বোবা হয়ে রইলুম। তারপর বললুম, 'তোমরা খোকা-খুকু কেনো?'

—'হ্যাঁ। খোকা-খুকুর বয়স যত কম, তার দামও হয় তত বেশি। আমার বাবা আমাকে দুই বৎসর বয়সে কিনেছিলেন।'

এমন সময়ে পণ্ডিত এসে হাজির। আমাদের কথাবার্তা এইখানেই থেমে গেল। মনে মনে ঠিক করলুম, ভোম্বলের সঙ্গে দেখা হলে আসল কথা জেনে নিতে হবে। এই খোকা-খুকুর ব্যাপারে একটা কিছু রহস্য আছে!

ভোম্বল যথাসময়েই এলো। মন্ত্রণাসভায় যাবার পথে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা! কমলা যে বলছিল দু-বছর বয়সের সময়ে তার বাবা তাকে কিনেছেন, এ কথার মানে কী?'

ভোম্বল বললে, 'মানে তো খুবই সোজা! বুঝেছি—কোথায় তোমার খটকা লেগেছে!.....তবে শোনো। চন্দ্রসেন যখন আমাদের সৃষ্টি করলেন, তখন ভেবে দেখলেন যে, সাধারণ দুর্বল মানুষরা যেভাবে জন্মায় সেভাবে আমরাও জন্মালে আমাদের সকলকার শক্তি

ঠিক সমানভাবে বাড়বে না। এই দ্যাখো না, তোমাদের একই পিতা-মাতার পাঁচটি সন্তানের শক্তি আর বুদ্ধি একরকম হয় না। চন্দ্রসেন তাই স্থির করলেন, আমরা ডিম পাড়ব।'

আমি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না—

'ডিম? তোমরা ডিম পাড়বে?'

—'হ্যাঁ। আমরা ডিম পাড়ি। পাড়বার পর প্রত্যেক ডিমটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করা হয়। যেসব ডিম নিরেস, অর্থাৎ খারাপ, সেগুলোকে নষ্ট করে ফেলা হয়। ভালো ডিমগুলোকে বেছে 'স্ফুটনাগারে' নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রাখা হয়। ডিম সেইখানে ফোটে।'

—'কেন? যাদের ডিম তারাই ফোটায় না কেন?'

—'তাহলে বেআইনি কাজ করা হবে। যেসব পুরুষ আর নারী নিজেদের ডিম লুকিয়ে রাখে, তারা কড়া শাস্তি পায়।'

—'যেসব পুরুষ আর নারী?'

—'হ্যাঁ। এদেশে পুরুষ আর নারী দুয়েরই ডিম হয়।'

—'বলো কী! এখানে পুরুষরাও ডিম পাড়ে?'

—'নিশ্চয়ই পাড়ে!'

—'তারপর?'

—'ওই সব ডিম ফোটবার পরেও খোকা-খুকিদের 'স্ফুটনাগারে'র ভেতরেই লালন-পালন করা হয়। তারপর যখন আমাদের সন্তান পালন করবার মতন বয়স হয়, তখন আমরা খোকা বা খুকিকে কিনে বাড়িতে নিয়ে আসি।'

আমি সব শুনে এতটা হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, মন্ত্রণাসভায় পৌঁছবার আগে আর কোনও কথাই কইতে পারলুম না।

মন্ত্রণাসভার বাড়িখানা খুবই প্রকাণ্ড। গোল বাড়ি।

ঢোকবার মুখেই কয়েকজন সেপাই বা দারোয়ান আমাদের জামাকাপড় ভালো করে হাতড়ে দেখলে এবং যা-কিছু সন্দেহজনক বা আপত্তিকর বলে মনে করলে, আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বললে, 'যাবার সময়ে চেয়ে নিয়ে যেয়ো!'

ভোম্বলকে শুধলুম, 'এ আবার কী নিয়ম?'

ভোম্বলদাস দন্তবিকাশ করে হেসে সংক্ষেপে বললে, 'মন্ত্রণা সভাকে প্রজারা বেশি ভালোবাসে না।'

বড়ো হলঘরটার ভিতরে গিয়ে আমরা যখন ঢুকলুম তখন সেখানে লোকজন ছিল না—কেবল মঞ্চের উপরে বসে একটিমাত্র পিপে নাক ডাকিয়ে আরামে নিদ্রা দিচ্ছিল।

পিপের সামনেই চকচকে পিতলের একটি নলচে।

ভোম্বল বললে, 'ওই নলচের সাহায্যে শান্তিরক্ষা করা হয়। ওর ব্যবহার আজকেই তুমি বোধহয় দেখতে পাবে।'

হলঘরটার বিশেষ বর্ণনা দেবার দরকার নেই। ঘরের মেঝেটা মাঝখান থেকে পাক খেয়ে উপরে উঠে গেছে—এইমাত্র তার বিশেষত্ব। সমস্ত সভাস্থলের মধ্যে কোথাও একখানা চেয়ার দেখা গেল না। চেয়ারের এখানে কোনও কাজ নেই। পিপেরা আসে, পিপের তলার দিকটা মাটিতে রেখে বসে পড়ে। কোনও ল্যাঠা নেই!

ঘুমন্ত পিপেটা আচম্বিতে জেগে উঠে ঢং করে একবার কাঁসর বাজালে। পরমুহূর্তে দুমদাম করে চারিদিককার অনেকগুলো দরজা খুলে গেল এবং দলে দলে পিপে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আসন গেড়ে বসল। হট্টগোলে কান পাতা দায়!

মঞ্চের পিপেটা আবার ঢং করে কাঁসর বাজিয়ে বললে, 'সভার কাজ আরম্ভ হোক!'—

অমনি এক সঙ্গে ডজনখানেক পিপে দাঁড়িয়ে উঠে হাত-পা নেড়ে ও মুখভঙ্গি করে চ্যাঁচাতে লাগল। তারা যেই থামল, অমনি আবার নতুন একদল পিপে লাফিয়ে উঠে গোলমাল শুরু করলে।

ভোম্বলের ভাব ও মাথা নাড়া দেখে আন্দাজ করলুম, পিপেরা যা বলছে সে তা বেশ বুঝতে পারছে। আমি কিন্তু সেই হ-য-ব-র-ল শুনে কোনও অর্থই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

বললুম, 'কখন তর্ক শুরু হবে?'

ভোম্বল বললে, 'তোমার মতন হাঁদাগঙ্গারাম আমি আর একটিও দেখিনি। ওই তো তর্ক চলছে!'

—'এই তর্ক! কিন্তু ওরা যে সবাই একসঙ্গে কথা কইছে!'

—'হ্যাঁ, একসঙ্গে কথা কইবে না তো কী করবে? একসঙ্গে কথা না কইলে ওরা কি সবাই আলাদা আলাদা করে কথা কইবার সময় কখনও পাবে?'

—'কিন্তু ওই হট্টগোলে কী করে ওরা পরস্পরের কথা বুঝতে পারে?'

—'বোঝাবার কোনও দরকার নেই তো!'

—'তাহলে রাজ্য চলবে কেন?'

আমার দিকে খুব একটা দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভোম্বল বললে, 'তোমার বুদ্ধি দেখছি ভারী কাঁচা! এও বোঝো না, প্রত্যেক সভ্য যখন তার নিজের দলের জন্যেই ভোট দেয়, তখন তার কথা বোঝা না গেলেও ক্ষতি নেই!'

—'তাহলে বাজে কথা কয়ে মিছে তর্ক করবার দরকার কী?'

—'আচ্ছা আহাম্মকের পাল্লায় পড়লুম যা-হোক! ওহে বাপু, কথাই যদি না কইবে, তবে সভ্য হয়ে লাভ কী?'

—'তাহলে পরস্পরের কথা শুনতে না পেলেও চলে?'

—'নিশ্চয়! ওরা অন্যের কথা শুনতে চায় না, নিজেদের কথাই শোনাতে চায়! সেইজন্যেই ওরা সভ্য হয়েছে!'

মঞ্চের পিপের নাক এই গোলমালের সময়ে রীতিমতো গর্জন করছিল। হঠাৎ আবার জেগে উঠে সে কাঁসর বাজালে। অমনি যেখানে যত পিপে সবাই একসঙ্গে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে একদিকে ছুটে গেল।

আমি বললুম, 'ও আবার কী?'

ভোম্বল বললে, 'ওরা ভোট দিচ্ছে।'

আচম্বিতে আর-একদিকে দুই দলের ভিতরে বিষম দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল।

মঞ্চের পিপে বোধহয় আবার ঘুমোবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখেই সে অত্যন্ত সজাগ হয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল! তারপর যেদিকে দাঙ্গা হচ্ছে, সামনের পিতলের নলচের মুখটাকে সেইদিকে ফিরিয়ে কী একটা টিপে দিলে। একটা ছোটো গোলা দড়াম করে যথাস্থানে পড়ে ফেটে গেল! দেখলুম, তিনজন লোক মাটির উপরে গিয়ে পড়ল—তখন তাদের আর পিপে বলে চেনবারই জো নেই! দেহগুলো ভেঙে-চুরে তাল পাকিয়ে বা গুঁড়ো হয়ে গেছে!

ভোম্বল বলে উঠল, 'ওই যাঃ! বুড়ো দেবেনের গতর চুরমার হয়ে গেল দেখছি!'

সমস্ত চ্যাঁচামেচি ও হুড়োহুড়ি একেবারে ঠান্ডা!

আমি সভয়ে বললুম, 'হ্যাঁ ভোম্বল, তাহলে সত্যিই কি ওরা মারা পড়ল?'

ভোম্বল বললে, 'তা পড়ল বই কি! তা ছাড়া শান্তিরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না যে! দোষ তো দেবেনেরই! প্রতিবারেই সে একটা না একটা হাঙ্গাম না করে ছাড়বে না! এইবারে বাপধন সায়েস্তা হলেন! কিন্তু ও কী! অমল, তোমার কি হঠাৎ কোনও অসুখ করল?'

আমি বললুম, 'তোমাদের মন্ত্রণাসভাকে নমস্কার করছি। আমাকে বাইরে নিয়ে চলো।'

॥ দ্বাদশ ॥

বিপদ মূর্তিমান

মন্ত্রণাসভার বিশ্রী ব্যাপারটা দেখে আমার প্রাণ-মন কেমন নেতিয়ে পড়েছিল। বাসায় ফিরে এসেও কিছুই ভালো লাগল না।

দেয়ালের গায়ে একখানা বেহালা টাঙানো ছিল, হঠাৎ তার দিকে আমার নজর গেল।

অন্যমনস্ক ভাবে বেহালাখানা নামিয়ে নিয়ে, তারগুলো বেঁধে একলাটি বসে বাজাতে লাগলুম।

একে তো এক উটকো সৃষ্টিছাড়া দেশে এসে প্রায় বন্দির মতনই আছি, তার উপরে শিয়রে সর্বদাই খাঁড়া ঝুলছে, খুনে পণ্ডিত কখন যে আমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে চাইবে

কিছুই বলা যায় না, কাজেই এ রকম মন নিয়ে আমি যে নিজের অজান্তে খুব একটা দুঃখের সুর বাজাব, তাতে আর সন্দেহ কী?

অনেকক্ষণ পরে যখন থামলুম, হঠাৎ একফোঁটা গরম জল আমার গলার উপরে এসে পড়ল!

চমকে ফিরে দেখি, ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কমলা, আর তার বড়ো বড়ো দুই চোখ ভরে কান্নার জল উপচে পড়ছে! আমি এমন তন্ময় হয়ে ছিলুম যে, কখন সে ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে, একটুও টের পাইনি!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কমলা, কমলা! তুমি কাঁদছ কেন?'

কমলা তাড়াতাড়ি তার চোখের জল মুছে ফেলে লজ্জার হাসি হেসে বললে, 'তুমি অমন দুঃখের সুর বাজাচ্ছিলে কেন? আমার যে কান্না পেল!'

আমি হেসে বললুম, 'তবে আমার দুঃখের সুরকে তুমি তোমার হাসির স্রোতে ভাসিয়ে দাও! তুমি একটি গান গাও, আর আমি তার সঙ্গে বাজিয়ে যাই। গাইবে?'

কমলা বললে, 'হুঁ, তা কেন গাইব না? শোনো—'

আকাশের চাঁদ-মুখ
ভেসে চলে নদীজলে
বাতাস কানেতে এসে
'কত ভালোবাসি' বলে।
নীল-লাল মুখ তুলি
দুলে দুলে ফুলগুলি
আতর-স্বপন দেখে
ঝরে পড়ে দলে দলে।
অচেনা গানের পাখি
আমারে বলিল ডাকি—
'হাসো-গাও! যতদিন
আছ ভাই, ধরাতলে'!'

গান শেষ হলে পর বললুম, 'কমলা! তোমার কী মিষ্টি গলা! সেদিন ভোম্বলের গান শুনে তোমাদের দেশের গানে অরুচি ধরে গিয়েছিল—'

কমলা বললে, 'সে তোমাকেও গান শুনিয়েছিল নাকি! ওই তো তার রোগ! সবাইকে তার গান না শুনিয়ে ছাড়বে না! নিজেকে মস্ত ওস্তাদ মনে করে, ভাবে, সারা দুনিয়া তারই গান শোনবার জন্যে কান খাড়া করে আছে! আমাকেও মাঝে মাঝে জোর করে ধরে বসিয়ে গান শোনায়—বাব্বাঃ! সে যে কী কাণ্ড! যেন তিনটে প্যাঁচা, দুটো গাধা আর একটা হুলো বেড়াল একসঙ্গে ঝগড়া করছে! গান শেষ হলে আবার জিজ্ঞাসা করা চাই—'ভালো লাগল

তো'? কিন্তু তার গান ভালো বললেই বিপদ বেশি! আমি যদি বলি—'ভয়ংকর ভালো লাগল', তাহলে আর রক্ষে নেই, অমনি আবার তানপুরো ঘাড়ে করে বলে 'তাহলে আর একটা এর চেয়েও ভালো গান শোনো!'

আমি হেসে ফেলে বললুম, 'না কমলা, ভোম্বল আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, আমাকে সে আর কখনও গান শোনাবে না!'

কমলা বললে, 'অমলবাবু, তাহলে মানতেই হবে যে, ভগবান তার মাথায় সুবুদ্ধি দিয়েছেন!'

আমি বললুম, 'আচ্ছা কমলা, তুমি আমাকে অমলবাবু বলো কেন, দাদা বলতে পারো না?'

—'দাদা বললে তুমি যদি রাগ করো?'

—'কেন রাগ করব? আমি যে তোমাকে ঠিক ছোটো বোনটির মতন দেখি!'

কমলা বললে, 'এ কথা শুনে আমার ভারী আহ্লাদ হল! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যদি তোমাদের মতন হতুম!'

—'কেন কমলা, তুমি তো ঠিক আমাদেরই দেশের মেয়ের মতন দেখতে?'

—'না, এটা তো আমার নকল দেহ! যাদুঘরে এইরকম মেয়ের ছবি দেখে আমার ভারী ভালো লেগেছিল, তাই তো আমি শখ করে প্রায়ই এইরকম মূর্তি ধরি। কিন্তু এই নকল দেহ নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে তো পারি না, আমাদের হাড় নেই বলে খানিকক্ষণ পরেই কষ্ট হয়, তখন তাড়াতাড়ি আবার সেই বিশ্রী শ্রীখোলের ভেতরে গিয়ে ঢুকি! চন্দ্রসেন আমাদের দেহ বদলে ভালো কাজ করেননি! এই যে এখন আমার চেহারা তোমার ভালো লাগছে, আমাকে তুমি নিজের বোনের মতন দেখছ, একটু পরে আমাকে সেই শ্রীখোলের ভেতরে দেখলে তুমিই হয়তো ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে! কেমন, এ কথা কি সত্যি নয়?'

আমি বললুম, 'ঘেন্না নয় কমলা, তবে ওরকম চেহারা দেখবার অভ্যাস নেই বলে অবাক হতে হয় বটে!'

—'না, এ তুমি আমার মন রাখা কথা বলছ! আমি তোমার চোখের ভাব দেখেছি, তুমি খালি অবাক হও না, ভয় পাও, ঘেন্না করো!'

—'কমলা, তুমি কি জানো, কেবল চন্দ্রসেন নন, একালেও তোমার বাবা আবার একরকম নতুন মানুষ তৈরি করতে চান?'

—'না। তবে আজকাল বাবার মুখ দেখে আমার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে!'

—'কী সন্দেহ?'

—'কিছুকাল আগে বাবা এক তুর্কির দেহে ছুরি চালিয়ে চালিয়ে সে অভাগাকে মেরে ফেলেছিলেন! সেই সময়ে তাঁর মুখের ভাব যেরকম হয়েছিল, আজকাল তাঁকে দেখলে তাঁর সেই মুখের ভাব আমার মনে পড়ে।'

—'কমলা, তাহলে শোনো। তুমি আমার বোনের মতন। তোমার কাছে আমি কিছু লুকব না'—বলে সেদিন পণ্ডিত আর অমরচন্দ্রের ভিতরে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল সমস্তই আমি কমলার কাছে প্রকাশ করলুম।

কমলা প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর উত্তেজিত স্বরে বললে, 'উঃ, বাবা এত নিষ্ঠুর? আবার তিনি তোমাকে হত্যা করতে চান? কিন্তু তোমার কোনও ভয় নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করব! এখন এদেশে জ্যান্ত মানুষের দেহে ছুরি চালানো বেআইনি! আমি এখানকার এমন অনেক লোককে চিনি যারা বাবাকে এরকম পাপকাজ কিছুতেই করতে দেবে না। এই ষড়যন্ত্রের কথা আমি নিজে গিয়ে তাদের কাছে বলে আসব!'

আচম্বিতে পিছন থেকে ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে শোনা গেল, 'যা শুনলুম, তা কি সত্য?'

চমকে ফিরে সভয়ে দেখলুম, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পণ্ডিতমশাই! তাঁর দুই চক্ষে দু-দুটো আগুনের শিখা! এবং সেই অগ্নিময় চোখদুটো একবার কোটরের বাইরে পাঁচ-ছয় হাত বেরিয়ে আসছে, তারপর আবার কোটরের ভিতরে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। এটা বোধহয় পিপে-মুল্লুকে বিশেষ রাগের লক্ষণ!

॥ ত্রয়োদশ ॥

কমলার পিপে

যে ভয়ানক দিনটাকে আজ কয়দিন মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলুম না, চোখের সামনে এখন সে যেন মূর্তি ধরে দেখা দিলে!

কমলার কথা পণ্ডিত শুনতে পেয়েছে! আমি যে তাদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছি, এটাও সে জানতে পেরেছে! আর আমার বাঁচোয়া নেই!

পণ্ডিতের এখনকার চেহারা দেখে ভোম্বলের কথা মনে পড়ল। জুজুবুড়ো—জুজুবুড়ো! তার মুখে-চোখে এখন পিশাচের ভাব ফুটে উঠেছে।

খুব টিটকিরি দিয়ে কমলার দিকে ফিরে পণ্ডিত বললে, 'মেয়ে আমার দেবী হয়েছেন! বাবাকে পাপ কাজ করতে দেবেন না! একটা বিদেশি জন্তুকে বাঁচাবার জন্যে পাঁচজনকে সব জানিয়ে আমার সর্বনাশের চেষ্টা করবেন! আহাহাহা—মরি মরি!'

কমলা জবাব না দিয়ে মাথা হেঁট করলে। তার মুখ তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে!

পণ্ডিত বললে, 'যখন তখন তুই ওই সেকেলে মানুষগুলোকে নকল করিস বলে বরাবরই আমার সন্দেহ ছিল যে, তোর বুদ্ধির গোড়ায় গলদ আছে! কিন্তু তুই যে এতটা অধঃপাতে

গিয়েছিস তা আমি বুঝতে পারিনি! জানিস, এ রাজ্যে বাপ-মায়ের অবাধ্য হলে ছেলে-মেয়েরা কী কঠিন শাস্তি পায়?'

কমলা বললে, 'কিন্তু অমলদাদাকে তুমি কিছুতেই খুন করতে পারবে না!'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পণ্ডিত বললে, 'কী? অমলদাদা! ওই সেকেলে জড়ভরতটাকে তুই আমার সামনে দাদা বলে ডাকছিস! রোস,—চুপ করে দাঁড়া! তোর সব ভিরকুটি আজকেই ঠান্ডা করে দেব!'

পণ্ডিত উগ্রদৃষ্টিতে অগ্রসর হয়ে কমলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কীরকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে দুটো হাত নাড়তে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে কমলার মুখে-চোখে ও সর্বাঙ্গে কেমন একটা তীব্র যাতনার ঢেউ বয়ে গেল,—তার ভাব দেখে আমাদের মনে হল, সে যেন কী একটা অদৃশ্য বিভীষিকাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা করছে—প্রাণপণে চেষ্টা করছে!

পরমুহূর্তেই স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখলুম, কমলার দেহ আকারহীন থলথলে মাংসপিণ্ডের মতন মাটির উপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে! যাদুঘরে যাবার দিনে চাকা-গাড়ি থেকে জেলিমাছের মতন যে দেহটার উপরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, কমলার দেহকে দেখতে হয়েছে এখন ঠিক সেইরকম।

মাংসপিণ্ডের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পণ্ডিত বললে, 'এইবারে আদর করে তোর অমলদাদাকে একবার ডেকে দেখ না! এখন ও আর তোর দিকে ফিরেও চাইবে না!'

রাগে গা আমার জ্বলে গেল। একবার মাংসপিণ্ডের দিকে তাকালুম। তার ভিতর থেকে দুটি চোখ অত্যন্ত কাতর ও দুঃখিত ভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে! কমলার দেহ বদলেছে, কিন্তু তার চোখদুটির শ্রী এখনও ঠিক আগেকার মতনই আছে! আমি মমতা-ভরা স্বরে বলে উঠলুম, 'তা, না কমলা! তোমার চেহারা বদলেছে বলে আমি তোমাকে বোনের মতনই দেখছি!'

পণ্ডিত ঠাট্টা করে বললে, 'ও হো হো হো! লক্ষ্মী বোনের লক্ষ্মী ভাই! চমৎকার! ওরে কে আছিস রে, কমলার শ্রীখোলটা এখানে নিয়ে আয় তো!'

একটা বড়ো পিপে এসে হাজির—তার হাতে একটা ছোটো পিপে!

পণ্ডিত কমলার দিকে ফিরে হুকুম দিলে, 'ঢোক ওর ভেতরে!'

কমলার পিণ্ডাকৃতি দেহের ভিতর থেকে মিনতি-মাখা করুণ স্বর এল, 'বাবা গো, তোমার পায়ে পড়ি! অমলদাদার সামনে আমাকে ওর ভেতরে ঢুকতে বোলো না, লজ্জায় আমি মরে যাব!'

পণ্ডিত ক্যাঁক-কেঁকে গলায় হুমকি দিয়ে বললে, 'চোপরাও! তুই মলে তো আমি বাঁচি! ঢোক শ্রীখোলের ভেতরে!'

মাংসপিণ্ডের মাঝখান থেকে তিনখানা হাত আর তিনখানা পা বেরিয়ে পড়ল! তারপর পিণ্ডটা উঠে পিপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। পিপের একদিকে একখানি মুখ—তা আমার চেনা

কমলার মতন দেখতেও বটে, দেখতে নয়ও বটে! তার দুই চোখ দিয়ে টসটস করে জল ঝরছে, লজ্জায় সে আমার দিকে তাকাতে পারছে না।

পণ্ডিত বললে, 'আমার এই হুকুম রইল, আজ থেকে এক মাস তুই ওই শ্রীখোল ছেড়ে বেরুতে পারবি না! যাঃ, এখন নিজের ঘরে যা!'

কমলা তার হাত-পা গুটিয়ে ফেললে, তারপর ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! আমি বুঝলুম, এই নিষ্ঠুর শত্রুপুরীতে আমার একমাত্র যে বান্ধবী ছিল, আমার বিপদে-আপদে যে আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করতে পারত, সে-ও আজ অসহায় ভাবে বন্দিনী হল। আজ থেকে আর কেউ আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবে না। আমার জীবনরক্ষার আর উপায় নেই!

পণ্ডিত আমার দিকে চেয়ে বললে, 'এইবারে তোমার পালা।'

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম, 'তাহলে পালা শুরু করুন।'

—'আমি তোমার প্রাণরক্ষা করেছি, তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, তার খুব প্রতিদান তুমি দিলে বটে!'

আমি বললুম, 'আমি কোনও অন্যায় করেছি বলে মনে পড়ছে না!'

পণ্ডিত চেঁচিয়ে বললে, 'অন্যায় করোনি? মেয়েকে বাপের অবাধ্য করা অন্যায় নয়? তোমাদের দেশে এটা অন্যায় না হতে পারে, কিন্তু এদেশে তা মহাপাপ! যে ছেলেমেয়েরা বাপের অবাধ্য, এদেশে তাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হয় তা তুমি জানো কি?'

আমি বললুম, 'না জানি না। জানতেও চাই না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, কমলাকে আমি কোনও দিন আপনার অবাধ্য হতে বলিনি।'

—'বলোনি? হেঃ, এই কথা আমি বিশ্বাস করব? আমি কি সেকেলে মানুষের মতন বোকা ভ্যাড়াকান্ত? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি মগজ থেকে কর্পূরের মতন উপে গেছে? তুমি তাকে কুশিক্ষা না দিলে সে কি কখনও আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার কথা মনেও আনতে পারে? আর আমি কিনা তোমারই প্রাণরক্ষা করেছি।'

আমার অসহ্য হয়ে উঠল। বললুম, 'বার বার আমার প্রাণরক্ষা করেছেন বলে জাঁক করছেন কেন? আপনি কেন যে আমার প্রাণরক্ষা করে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আমি কি তা জানি না? আপনি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন আমার প্রাণবধ করবার জন্যে!'

পণ্ডিত খাপ্পা হয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আর আমি বাজে কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। যাও, নিজের ঘরে গিয়ে বন্দি হয়ে থাকো গে! আর দয়া নয়!'

॥ চতুর্দশ ॥

ভোম্বলদাসের আসল চেহারা

ঘরে ভিতরে একলা বসে যেন অকূলপাথারে ভাসছি।

বাঁচবার কোনও আশা নেই। এক আশা ছিল কমলা, কিন্তু সে-ও এখন আমারই মতন বন্দি। পণ্ডিতের ষড়যন্ত্রের কথা সে আর কারুর কাছে গিয়ে প্রকাশ করে দিতে পারবে না।

এই উদ্ভট, ভূতুড়ে দেশের আইন কানুন সবই আজব! এখানকার দয়া-মায়া-ভালোবাসা সবই ভিন্নরকম। পৃথিবীর সভ্যদেশে মাঝে মাঝে ভূত-পেতনির কথা শুনতে পাই, নানানরকম মূর্তি ধারণ করে মানুষদের যারা ভয় দেখায়। সেসব এদেরই কীর্তি নয়তো? তারা রাত আঁধারে দেখা দিয়ে দিনের আলোয় কোথায় লুকোয়, তারা কোথা থেকে আসে কেউ তা জানে না,—কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা এই দেশেরই লোক! মানুষ যে পরলোকের কথা জানে, সেই পরলোক হয়তো এই এই পিপে-মুল্লুকই! আমি চোখের সামনেই ভোম্বলকে আমার মূর্তি ধরতে দেখেছি! এরাই হয়তো মানুষের দেশে গিয়ে রাত্রিবেলায় আমাদের মৃত আত্মীয়স্বজনের মতন চেহারা নিয়ে দেখা দেয়, আর আমরা ভূত দেখেছি বলে ভয়ে আঁতকে উঠি! এরা নিজেদের বলে 'নতুন মানুষ'! ছাই! পিপের ভিতরে কখনও মনুষ্যত্ব থাকে না!

হঠাৎ মৃদুস্বরে কে আমায় ডাকলে, 'অমলা, ও অমলা!'

মুখ তুলে দেখি, জানলার বাইরে ভোম্বলের মোটা, আঁচিল-ভরা, বারকোসের মতন মস্ত মুখখানা!

আমি রাগ করে বললুম, 'আবার তুমি আমাকে ওই নামে ডাকছ? আমি মরতে বসেছি বলে তোমার বুঝি খুব আহ্লাদ হয়েছে?'

ভোম্বল বললে, 'না ভাই, চটো কেন? তুমি তো জানোই আমরা মেয়ে-পুরুষ সবাই ডিম পাড়ি—কাজেই আমাদের কাছে অমলও যে অমলাও সে! একটা আকারের তফাত বই তো নয়! যাক সে কথা, তুমি জানলার কাছে এসো। চেঁচিয়ে কথা কইলে কেউ শুনতে পাবে! যা বলতে এসেছি, চুপিচুপি বলে যাই!'

জানি, এ অপদার্থটার দ্বারা আমার কোনোই উপকার হবে না, তবু সে কী বলে শোনবার জন্যে আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ভোম্বল চুপিচুপি বললে, 'তোমার জন্যে আমি কম চেষ্টা করিনি, এখানকার যেসব মোড়ল পণ্ডিত জুজুবুড়োকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না, তাদের অনেককেই গিয়ে ধরেছি। কিন্তু বিশেষ ফল হল না। তুমি একেবারে অচেনা লোক, তোমার নাম পর্যন্ত কেউ জানে না! তারা বলে, কোথাকার কোন একটা বাজে জীবের জন্যে পণ্ডিতের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করে মরতে যাব কেন? পণ্ডিতের এখানে খুব পসার কিনা? সবাই বলে, পণ্ডিত হচ্ছে দেশভক্ত লোক,—সে যা করবে দেশের ভালোর জন্যেই করবে!'

আমি বললুম, 'এ খবরটা জানাবার জন্যে তোমার কষ্ট করে এখানে না এলেও চলত!'

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে বললে, 'তা চলত বটে! তবু না এসে থাকতে পারলুম না, হাজার হোক তুমি আমার বন্ধু তো! তা দ্যাখো অমলা, তোমার জন্যে একটা কাজ আমি করেছি বোধহয়! মহারাজ একটা কথায় রাজি হয়েছেন। কেন যে ছুরি মেরে তোমার ভুঁড়ি ফাঁসানো হবে না, এর বিরুদ্ধে যদি তোমার কোনও যুক্তি থাকে, মহারাজা তা শুনতে আপত্তি করবেন না। যুক্তি দেখিয়ে তুমি যদি তাঁকে বোঝাতে পারো তাহলে তোমার ভুঁড়ি এ যাত্রা বেঁচে গেলেও যেতে পারে! কাজে-কাজেই এক বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমাকে আগে মহারাজার কাছে হাজির না করে তাঁর হুকুম না নিয়ে কেউ তোমার এই নাদুস-নধর দেহটিকে খণ্ড খণ্ড করতে পারবে না!'

আমি কৃতজ্ঞ স্বরে বললুম, 'ভাই ভোম্বল, এ খবরটা তবু মন্দের ভালো! তোমার এ উপকারের জন্যে ধন্যবাদ!

ভোম্বল বললে, 'ও বাজে ধন্যবাদ আমি চাই না। আগে বাঁচো, তারপর ধন্যবাদ দিয়ো। আমার এখন খিদে পেয়েছে, আমি হোটেলে চললুম!' জানালার ধার থেকে তার মুখ সরে গেল।

আমি ভাবতে লাগলুম, ভোম্বলকে আগে যতটা মনে হয়েছিল, এখন দেখছি সে ততটা মন্দ লোক নয়। ওর বাইরের চেহারা, হাবভাব আর কথাবার্তা কিঞ্চিৎ অভদ্র ও এলোমেলো হলেও ওর পিপের ভিতরে প্রাণ আর দয়া-মায়া আছে। ভোম্বল দেখছি একটি বর্ণচোরা আম!

হঠাৎ জানালার ধারে আবার ভোম্বলদাসের উদয় হল। বাইরের এদিকে-ওদিকে একবার চেয়ে সে বললে, 'হ্যাঁ ভালো কথা! খিদের চোটে একটা বিষয় ভুলে গিয়েছিলুম। এই ছোটো নলচেটা নিয়ে ভালো করে লুকিয়ে রাখো। ওর পেছনে যে কল আছে সেটিকে টিপলেই ওই নলচেটি তোমাকে সাহায্য করবে।' আর একবার দন্তবিকাশ করে হেসেই ভোম্বল আবার অদৃশ্য হল।

নলচেটি পরখ করে দেখলুম। সেদিন মন্ত্রণাসভায় এই রকমেরই একটি নলচের বিষম মহিমা দেখেছিলুম। তবে এটি তার চেয়ে ঢের ছোটো, অনায়াসে পকেটে লুকিয়ে রাখা যায়। এই নলচেই বোধহয় পিপেদের বন্দুক!

এমন সময়ে দরজা খোলার শব্দ পেলুম। নলচেটাকে ভিতরকার জামার পকেটে লুকিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল অমরচন্দ্র, পণ্ডিত ও আরও চারজন পিপে!

পণ্ডিত বললে, 'অমল, তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।'

বুঝলুম, এরা আজকেই আমাকে মহারাজার কাছে হাজির করতে চায়। বিনা-বাক্যব্যয়ে আমি তাদের সঙ্গে চললুম! আগে আগে পণ্ডিত আর অমরচন্দ্র, আমার দু-পাশে দুজন ও পিছনে দুজন পিপে! দস্তুরমতো কড়া পাহারা!

॥ পঞ্চদশ ॥

আমার মহা বীরত্ব

সবাই মিলে যে ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম, সেটা হচ্ছে সেই ঘর—যেখানে এদেশে এসে আমার প্রথম জ্ঞানোদয় হয়!

আজ দেখছি সে ঘরের রূপ বদলে গেছে। মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল, তার উপরে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চারিধারে তাকে তাকে হরেকরকম ওষুধ ও আরক প্রভৃতির শিশি, বোতল ও কাচের পাত্র!

অমরচন্দ্র কী একরকম সন্দেহপূর্ণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, 'ভালো করে এর চেহারা দেখে আজ মনে হচ্ছে, এর দেহ দিয়ে বোধহয় আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না!'

পণ্ডিত বললে, 'হোক আর নাই-ই হোক, পরীক্ষা আমি করবই!'

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনারা আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?'

পণ্ডিত বললে, 'তোমাকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করব বলে!'

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে বললুম, 'কীরকম? মহারাজার হুকুম কি আপনি জানেন না? আগে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে!'

পণ্ডিত বিপুল বিস্ময়ে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ কথা কে তোমাকে বলেছে?'

'যেইই বলুক, আপনি আগে আমাকে মহারাজার কাছে নিয়ে চলুন।'

অমরচন্দ্র দাঁত ছুরকুটে বললে, 'তা আর জানি না! সেখানে আমাদের শত্রুপক্ষ আছে, তুমি আমাদের হাত ফসকে কলা দেখিয়ে পালাও আর কী?'

আমি বললুম, 'সে কী, আপনারা মহারাজার হুকুম মানবেন না?'

পণ্ডিত ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, না, না! বিজ্ঞানের মর্যাদা রাখবার জন্যে আমরা মহারাজার হুকুম মানব না!' তারপর পিপেদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোরা ওকে ধর! ওর হাত-পা বেঁধে টেবিলের উপর শুইয়ে দে!'

এবারে রাগে অজ্ঞান হয়ে একলাফে পণ্ডিতের উপরে লাফিয়ে পড়ে মারলুম আমি তাকে এক লাথি—সে বিকট আর্তনাদ করে মাটির উপরে গড়িয়ে গেল! কিন্তু ততক্ষণে চারজন প্রহরী পিপে আমাকে সবেগে আক্রমণ করেছে!

টেবিলের উপরে বোধকরি আমারই দেহ কাটবার অস্ত্রগুলো ছড়ানো ছিল, আমি বিদ্যুতের মতন হাত বাড়িয়ে একখানা মস্ত ধারালো ছুরি তুলে নিয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানহারা হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে চালাতে লাগলুম! বেটাদের গায়ে তো হাড় ছিল না,—আমার ছুরি

তাদের হাতে-পায়ে যেখানে পড়ে সেইখানটাই কচুর মতন ক্যাঁচ করে কেটে উড়ে যায়! তারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে সেখান থেকে টেনে লম্বা দিলে! ঘরের মেঝেতে পড়ে তাদের কাটা হাত-পাগুলো টিকটিকির কাটা ল্যাজের মতন ধড়ফড় করতে লাগল!

তারপর আমি অমরচন্দ্রের দিকে ফিরে দাঁড়ালুম, কিন্তু চোখের পলক না ফেলতেই সে তার পিপের ভিতর থেকে টপাং করে মাটির উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং একটা বড়ো সাপের মতন কিলবিল করতে করতে দরজার ভিতর দিয়ে বেগে অদৃশ্য হল!

তারপর আমি পণ্ডিতের দিকে ফিরে দাঁড়ালুম—সে তখন ভীষণ চিৎকার করে চাকরদের ডাকাডাকি করছে!

আমি গর্জন করে বললুম, 'তবে রে জুজুবুড়ো! এবারে তোকে কে রক্ষা করে? আয়, আজ আমি তোরই অস্ত্র-চিকিৎসা করি'—বলেই ছুরি উঁচিয়ে আমি তাকে আক্রমণ করলুম।

দারুণ আতঙ্কে পণ্ডিতের মুখ তখন মড়ার মতন সাদা হয়ে গেছে, চোখদুটো কপালে উঠেছে! হঠাৎ তার পিপের নীচে থেকে অনেকগুলো ঠ্যাং বেরিয়ে পড়ল এবং সেই বড়ো টেবিলটার চারিপাশ ঘিরে ঠিক একটা প্রকাণ্ড মাকড়সার মতন এত বেগে ছুটতে আরম্ভ করলে যে, আমি কিছুতেই তার নাগাল ধরতে পারলুম না!

মাত্র দুই পায়ে ভর দিয়ে অতগুলো পায়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব না হলেও আমি পণ্ডিতের পিছু ছাড়লুম না—সে-ও ছোটে, আমিও ছুটি! এই ব্যাপার আরও কতক্ষণ চলত এবং কীভাবে শেষ হত তা আমি জানি না, কিন্তু আচম্বিতে বাহির থেকে দলে দলে নানা আকারের পিপে এসে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল—তাদের সর্বাগ্রে রয়েছে ভোম্বলদাস!

কে একজন হোমরা-চোমরার মতন ভারিক্কে গলায় বলে উঠল, 'এসব কাণ্ডের অর্থ কী?'

পণ্ডিত পরিত্রাহি চিৎকার করে বললে, 'মহারাজ, রক্ষা করুন! মহারাজ, রক্ষা করুন!'

মহারাজ? ফিরে দেখি ভোম্বলদাসের চেয়েও ঢের মোটা আর ডাগর একটা পিপে—যে-রকম পিপেতে আমাদের দেশে সিমেন্ট রাখা হয় তার চেয়েও বড়ো! তার গালদুটো লাউয়ের মতন ফোলা ফোলা এবং তার গোঁফজোড়া এত লম্বা যে ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। এই হল এদের মহারাজের মূর্তি?

মহারাজার মস্তবড়ো ঢাকের মতন মুখের ভিতর থেকে ট্যাঁপারির মতন দুটো ছোট্ট চোখ কোটরের ভিতর থেকে প্রায় একহাত বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে দুই মিনিট ধরে ঘুরে-ফিরে নিরীক্ষণ করলে। তারপর চোখদুটোকে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসে মহারাজা আমাকে সম্বোধন করে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'তুমি পাগল নও তো? তোমাকে দর্শন করে আমার কিন্তু তাই বিবেচনা হচ্ছে।'

আমি এত দুঃখেও হেসে ফেলে বললুম, 'আজ্ঞে না মহারাজ! আমি এখনও পাগল হতে পারিনি! তবে শীঘ্রই হতে পারব বলে আশা রাখি।'

মহারাজা দুলতে দুলতে বললেন, 'শুনে সুখী হলুম। যাদের পাগল হবার আশা নেই, তারা অতিশয় অভাগা।...উঃ, বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছি, ভারী জল-তেষ্টা!...ভৃত্য! সুশীতল বারি আনয়ন করো!'

ভৃত্য জল এনে দিলে। মহারাজা ঢকঢক করে জল পান করে ঊর্ধ্বমুখে বললেন, 'আঃ!...এইবারে রাজকার্য! ওহে ভোম্বলদাস, তুমি এই বিদেশি লোকটির কথাই না আমার কাছে উত্থাপন করেছিলে? হুঁ। ওর নাম কী?'

ভোম্বল আমার দিকে চেয়ে দন্তবিকাশ করে বললে, 'অমলা।'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে না মহারাজ! আমার নাম অমলা নয়, অমল।'

মহারাজা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'চুপ করো। তোমার অপেক্ষা ভোম্বলদাসকে আমি বেশি চিনি। তোমার কী নাম হওয়া উচিত, তোমার চেয়ে ভোম্বলদাস তা বেশি জানে! তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তোমার নাম অমলা।.....উঃ ভয়ংকর গ্রীষ্ম, ঘর্মে প্লাবিত হয়ে গেলুম যে!.....ভৃত্য! শীঘ্র ব্যজনী আনয়ন করো!'

দু-দিকে দুটো পিপে এসে তালপাতার পাখা নেড়ে মহারাজের মাথা ও গতর ঠান্ডা করতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাঁয়ুসেবন করে একটু ধাতস্থ হয়ে মহারাজা আবার দুলতে দুলতে বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো কথা! আচ্ছা অমলা, তুমি এতক্ষণ কী করছিলে? পণ্ডিতের সামনে দাঁড়িয়ে কি যুদ্ধের নৃত্য দেখাচ্ছিলে? ও নৃত্যটি আমার অত্যন্ত উত্তম লেগেছে। আর-একবার ওই নৃত্যটি আরম্ভ হোক!'

আমি হাতজোড় করে বললুম, 'আজ্ঞে না মহারাজ! কী করে অস্ত্রচিকিৎসা করতে হয়, পণ্ডিতকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছিলুম!'

মহারাজা গর্জন করে বললেন, 'কী! তুমি কি অবগত নও যে, এ রাজ্যে অস্ত্রচিকিৎসা নিষিদ্ধ? আমরা কবিরাজি ঔষধ ছাড়া আর কিছু সেবন করি না?.....তার চেয়ে পণ্ডিতকে তুমি বিষ-বড়ি ভক্ষণ করতে দিলে না কেন?'

আমি আবার হাত জোড় করে বললুম, 'আজ্ঞে, বিষ-বড়ির কথা আমার মনে ছিল না। তাহলে সেই ব্যবস্থাই করতুম।'

পণ্ডিত কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মহারাজা দু-চোখ রাঙিয়ে এক ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'স্তব্ধ, হও! বৃদ্ধ, তুমি কি অবগত নও, আমি সম্বোধন না করলে আমার নিকটে কেউ বাক্য উচ্চারণ করতে পারবে না?...উঃ, ভীষণ কান চুলকোচ্ছে, গেলুম যে!...ভৃত্য! কান-খুশকি আনয়ন করো।'

কান-খুশকি এলো। মহারাজা দু-চোখ বুজে খুব আরাম করে পাঁচ মিনিট কান চুলকোলেন। তারপর সহসা দুই চোখ চেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'অতঃপর?'

আমি বললুম, 'মহারাজ, আপনি বোধহয় জানেন না যে, এই পণ্ডিত আজ ছুরি দিয়ে

লম্বালম্বি ভাবে আমার দেহকে ফালা ফালা করবার চেষ্টা করছিল!'

মহারাজা ভয়ানক চটে উঠে বললেন, 'কী! তোমাকে আমার কাছে হাজির না করেই?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! পণ্ডিত বলে সে বিজ্ঞানের মর্যাদা রাখবে, আপনার মর্যাদা রাখবে না।'

মহারাজা দুই চক্ষু ছানাবড়া করে বললেন, 'অ্যাঁ! অ্যাঁ! এত বৃহৎ কথা! আমার মর্যাদা রাখবে না?...উঃ, মস্তক বেজায় ঘূর্ণায়মান হচ্ছে—বোঁ বোঁ বোঁ!...ভৃত্য! অবিলম্বে আমার শিরোঘূর্ণন বন্ধ করো!'

পিপের একমুখে মহারাজের গোল মাথাটা চরকির মতন এমন বন বন করে ঘুরছিল যে তাঁর চোখ-নাক-ঠোঁট কিছুই দেখা যাচ্ছিল না! ভৃত্য তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মাথাটা প্রাণপণে চেপে ধরে তার ঘুরুনি বন্ধ করে দিলে।—

খানিকক্ষণ হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিয়ে মহারাজা বললেন, 'দুরাচার পণ্ডিত! আমার হুকুম না নিয়েই আবার তুমি লম্বালম্বি ভাবে মানুষের দেহ কর্তন করতে চাও?...ভোম্বলদাস! সেবারের সেই কাণ্ড-কারখানার কথা তোমার মনে আছে?'

ভোম্বল চোখ পাকিয়ে বললে, 'ওঃ! মনে নেই আবার? পণ্ডিত সেই তুর্কি-চাচার দেহখানা এমন লম্বালম্বি ভাবে কেটেছিল যে, তাকে দেখতে হয়েছিল ঠিক পণ্ডিতেরই মতন!'

পণ্ডিত প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে মাথা নেড়ে বললে, 'না, তাকে আমার মতন দেখতে হয়নি। আমি এ কথার আপত্তি করি।'

মহারাজা বললেন, 'আবার তুমি গায়ে পড়ে বাক্য উচ্চারণ করছ? তুমি আপত্তি করতে পারবে না। কখন তোমার আপত্তি করা কর্তব্য, সে কথা আমি নিজেই বলে দেব।'

পণ্ডিত বললে, 'কোন কথায় আমি আপত্তি করব, সে-কথা আপনি জানবেন কেমন করে মহারাজ?'

মহারাজা মহাবিস্ময়ে মুখব্যাদান করে বললেন, 'ওহে ভোম্বল, পণ্ডিতটা বলে কী হে? কোন কথায় ওর আপত্তি করা উচিত, তাইই যদি না বলতে পারব, তবে আমি কীসের মহারাজ?'

ভোম্বল বললে, 'সত্যিই তো! তবে আপনি কীসের মহারাজা?'

পণ্ডিত বললে, 'মহারাজা! আমি বিচার প্রার্থনা করি।'

মহারাজা বললেন, 'বিচার? তুমি বিচার প্রার্থনা করো? ওহে ভোম্বল, পণ্ডিতটা যে বিচার প্রার্থনা করে! বেশ, আমি বিচার করব। ভোম্বলদাস, তুমি মন্ত্রীদের আসতে হুকুম দাও। আজ এখানেই আমার বিচারসভা বসবে। ভৃত্য! আমার রাজদণ্ড আনয়ন করো।

॥ ষোড়শ ॥

মহারাজের বিচার

রাজদণ্ড হাতে নিয়ে আরও বেশি গম্ভীর হয়ে মহারাজা বললেন, 'পণ্ডিত! এই সেকেলে মানুষটার দেহ কেন তুমি লম্বালম্বি ভাবে কর্তন করতে চাও, সে কথা আমার নিকটে যথাবিহিতসম্মানসহকারে নিবেদন করো।'

পণ্ডিত বললে, 'আজ্ঞে, আমাদের চেয়েও একেলে মানুষ সৃষ্টি করব বলে।'

মহারাজ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমাদের চেয়েও আধুনিক? তবে কি তুমি বলতে চাও যে, আমরা ক্রমেই প্রাচীন হয়ে পড়ছি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! আমার তাই বিশ্বাস। মনে করে দেখুন মহারাজ, আমাদের চেয়েও একেলে মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মানুষ হত ওই অমল! এ একটা কত বড়ো সম্মান! আমি ওকে হত্যা করতুম না, খুব আস্তে আস্তে একটু একটু করে ওর দেহটাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই লম্বালম্বি ভাবে কাটতুম। এ কাজে কুড়ি দিনের বেশি সময় লাগত না। ভেবে দেখুন মহারাজ আমার উদ্দেশ্য কত সাধু!'

মহারাজা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার উদ্দেশ্য যে সাধু, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। অমলা, তুমি পণ্ডিতের সাধু উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করতে গিয়েছিলে কেন?'

আমি বললুম, 'না মহারাজ, পণ্ডিতকে আমি বাধা দিইনি—আমি কেবল আত্মরক্ষা করেছিলুম। ওঁর মনকে খুশি রাখবার জন্যে বিশ দিন ধরে জ্যান্ত অবস্থায় একটু একটু করে কচুকাটা হব, অথচ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করব না, এই কি আপনার আদেশ মহারাজ?'

মহারাজা বললেন, 'না, এমন অন্যায় আদেশ কদাপি আমি প্রচার করি না!'

আমি বললুম, 'তারপর আর একটা কথা মহারাজ বিচার করে দেখুন। আপনাকে আগে জানিয়ে পণ্ডিত যদি আমার ওপরে ছুরি চালাত, তাহলে কখনোই আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতুম না, কিন্তু পণ্ডিত আপনার একটা হুকুম পর্যন্ত নেয়নি। এটা কি অপরাধ নয়?'

মহারাজা বললেন, 'অপরাধ নয় আবার? মহাগুরুতর অপরাধ!...ভৃত্য! আমার আইন পুস্তকের পঞ্চম খণ্ড আনয়ন করো!...দেখি, এটা কত ধারার অপরাধ!'

আইনের বই এল। মহারাজ পাতা উলটে বললেন, 'এই যে! এটা সাতশো সাতাশ ধারার অপরাধ! এর শাস্তি—প্রাণদণ্ড। পণ্ডিত! তোমার প্রাণদণ্ড হবে!'

পণ্ডিত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, 'মহারাজ, রক্ষা করুন! প্রাণদণ্ড দিলে আমি আর কিছুতেই বাঁচব না! এখনও আপনি সব কথা শোনেননি! ওই সেকেলে মানুষটা আমার মেয়েকে আমার অবাধ্য করে তুলেছে,—'

মহারাজা শিউরে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, বলো কী? মেয়েকে পিতার অবাধ্য করে তোলা! এ যে সাতশো ধারার চেয়েও গুরুতর অপরাধ! অমলা! তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?'

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনে বললুম, 'আছে মহারাজ! আগে আপনি গোড়া থেকে সব কথা শুনুন। কাল যখন আমি বসে বসে বাজনা বাজাচ্ছিলুম—'

মহারাজা বললেন, 'বটে, বটে, বটে! তুমি বাজনা বাজাতে পারো?'

—'পারি মহারাজ!'

—'তুমি গান গাইতে পারো?'

—'পারি মহারাজ!'

—'বটে, বটে, বটে! একটা গান আমাকে শোনাও না!'

আমি দুই হাত জোড় করে বললুম, 'কিন্তু মহারাজ, আমি হচ্ছি ওস্তাদ লোক। তবলা-বাঁয়ার সঙ্গত না থাকলে কেমন করে গান গাইব?'

মহারাজা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আদেশ দিলেন—'ভৃত্য? তবলা-বাঁয়া আনয়ন করো!'

ভোম্বলদাস তাড়াতাড়ি মহারাজের কানে-কানে কী বললে। মহারাজা সব শুনে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'অমলা! এটা হচ্ছে অস্ত্রোপচারের গৃহ—এখানে তবলা-বাঁয়া থাকে না। এখন উপায়?'

আমি বললুম, 'উপায় আছে মহারাজ! পণ্ডিতমশাইয়ের গাল দু-খানা দিব্যি চ্যাটালো। ওঁকে আমার কাছে আসতে হুকুম দিন। তবলা-বাঁয়ার অভাবে আমি ওঁর দুটো গাল দু-হাতে বাজিয়ে তাল রেখে গান গাইতে পারব!'

পণ্ডিত বললে, 'মহারাজ, আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করি না।'

মহারাজা প্রকাণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, 'পুনরায় তুমি বাচালতা প্রকাশ করছ? অমলার ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব তোমাকে সমর্থন করতেই হবে! যাও অমলার কাছে!'

পণ্ডিত নিরুপায় হয়ে ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু যেই আমি হাত তুলে তার গালে চপেটাঘাত করতে যাব, অমনি সে মুখ সরিয়ে নিলে! আর-একবার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে আমি বললুম, 'মহারাজ, পণ্ডিতমশাই তাঁর গাল বাজাতে দিচ্ছেন না!'

মহারাজা বলেলেন, 'বটে, বটে, বটে! প্রহরীগণ! দুষ্ট পণ্ডিতকে তোমরা ধৃত করো!'

প্রহরীরা তখন এসে পণ্ডিতকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরলে এবং আমিও দুই হাতে মনের সাধে তালে তালে তার দুই গালে চড় মারতে মারতে গান ধরলুম—

'জুজুবুড়ির দেশে এসে
দেখেছি এক জুজুবুড়ো,
মামদো-ভূতের সমন্দী সে,
হামদো-মুখোর বাবা-খুড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।

চোখদুটো গোল পানের ডিপে,
পেটের ওপর একটা পিপে,
বাক্যিগুলি মিষ্টি কত!
ঠিক যেন ভাই লঙ্কাগুঁড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।

*

করলে আদর ধমকে ওঠেন,
ধরলে গীতি চমকে ছোটেন,
থমকে হঠাৎ পটকে লোঠেন—
মেজাজটি তাঁর উড়ো-উড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।

*

তিনি যদি আসেন কাছে,
দৌড়ে চোড়ো শ্যাওড়া-গাছে,
ওপর থেকে থুতু দিয়ো,
কিংবা ছেঁড়া জুতো ছুড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।'

মহারাজা ঘাড় নেড়ে তারিফ করে বললেন, 'আ-হা-হা-হা! সাধু, সাধু, খাসা গলা! না ভোম্বল?'

ভোম্বল বললে, 'খাসা!'

পণ্ডিত তার দুই গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'মহারাজ, এ গানে আমি আপত্তি করি।'

মহারাজা বললেন, 'না, তুমি আপত্তি করবে না। তুমি কোথায় আপত্তি করবে, আমি বলে দেব।'

পণ্ডিত বললে, 'মহারাজ, ও গান আমাকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে।'

মহারাজা বললেন, 'তুমি কি নিজেকে জুজুবুড়ো বলে মানো?'

পণ্ডিত বললে, 'না, আমি মানি না।'

মহারাজা বললেন, 'তাহলে ও-গানে তুমি আপত্তি করতে পারো না। ওটা জুজুবুড়োর গান। না অমলা?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ!'

ভোম্বল বললে, 'মহারাজ, রাজকার্যে বেলা বাড়ছে। আমার খিদে পেয়েছে।'

মহারাজা বললেন, 'ভোম্বলের খিদে পেয়েছে। আমি আর দেরি করতে পারি না।

অমলা! পণ্ডিত! তাহলে আমার আজ্ঞা শোনো! তোমরা দুজনেই গুরুতর অপরাধ করেছ। তোমাদের দুজনেরই প্রাণদণ্ড হবে। মন্ত্রীগণ! এখন কার প্রাণদণ্ড আগে হবে, সেটা তোমরাই স্থির করো। কিন্তু বেশি দেরি কোরো না। ভোম্বলের খিদে পেয়েছে।'

মন্ত্রীগণ বেশি দেরি করলেন না। বললেন, 'অমলার অপরাধ গুরুতর। আগে ওরই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।'

মহারাজা বললেন, 'এইজন্যেই তো মন্ত্রীগণের দরকার! কত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল! অমলা! মন্ত্রীগণের কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করলে তো? অগ্রে তোমারই প্রাণদণ্ড হবে। পণ্ডিত! তুমি অমলাকে ওই টেবিলটার ওপরে শুইয়ে ওর দেহ লম্বালম্বি ভাবে কর্তন করো!'

আমি চক্ষে সর্ষের ফুল দেখতে লাগলাম! যেমন হবুচন্দ্র রাজা, তেমনি গবুচন্দ্র মন্ত্রী! এখন উপায়? অত্যন্ত অসহায় ভাবে ভোম্বলের দিকে তাকালুম।

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে কী যেন ইশারা করতে লাগল।

তার ইসারায় একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ভিতরকার জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখি সেখানে নলচেটা এখনও আছে!

মহারাজ বললেন, 'অমলা! তোমার বোধহয় আর কিছু বলবার নেই?'

আমি বললুম, 'মহারাজ! আমার আর দুটো কথা বলবার আছে।'

মহারাজা বললেন, 'তাড়াতাড়ি বলো। ভোম্বলের খিদে পেয়েছে?'

আমি বললুম, 'মহারাজ! আমার প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি আমাকে অমলা বলে ডাকতে পারবেন না। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম আপনাকে নাকচ করতে হবে।'

মহারাজা বললেন, 'আমি যদি তোমার ও-দুটো কথা না শুনি?'

পকেট থেকে নলচে বার করে মহারাজার মাথার কাছে ধরে আমি বললুম, 'তাহলে এখনই আমি নলচে ছুড়ব।'

মহারাজা ব্যস্ত হয়ে হাঁক দিলেন, 'প্রহরী! প্রহরী!'

আমি বললুম, 'প্রহরীরা এদিকে আসবার আগেই এ রাজ্যের সিংহাসন খালি হবে।'

মহারাজা বললেন, 'প্রহরীগণ! তোমরা শীঘ্র বিদায় হও, এদিকে এসো না—খবরদার!'

ভোম্বল বললে, 'মহারাজ! আমার খিদে পেয়েছে!'

মহারাজা বললেন, 'আচ্ছা, তোমাকে আর অমলা বলে ডাকব না। তোমার প্রাণদণ্ডও হবে না।'

নলচে নামিয়ে আমি বললুম, মহারাজের জয় হোক!

মহারাজা বললেন, 'কিন্তু প্রাণদণ্ডের বদলে তোমাকে নির্বাসনদণ্ড দিলুম। তুমি এ রাজ্যে থাকবার উপযুক্ত নও। ভোম্বলের খিদে পেয়েছে। অতএব সভা ভঙ্গ হোক।'

॥ সপ্তদশ ॥

আমার নির্বাসন

দলে দলে পিপে-প্রহরী চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেললে এবং আমার হাত থেকে নলচেটা কেড়ে নিলে।

তারপর রাজপথ দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল।

যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি, পিল পিল করে পিপের দল ছুটে আসছে। পুরুষ-পিপে, মেয়ে-পিপে, খোকা-পিপে, খুকি-পিপে! এ দেশে এত পিপে-মানুষ আছে, আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি!

প্রত্যেক পিপেই আমার উপরে মারমুখো হয়ে আছে! তাদের মহারাজের বিরুদ্ধে আমি যে নলচে ধরে দাঁড়িয়েছি, এ কথা বোধহয় দিকে দিকে রটে গেছে! পদে পদে আমার ভয় হতে লাগল—এই বুঝি তারা আমাকে আক্রমণ করতে আসে! কিন্তু তারা আক্রমণ করলে না, সকলে মিলে কেবল আমাকে ভয়ানক বিশ্রী মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

মহারাজার চাকা-গাড়ি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। মহারাজ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না, কিন্তু তাঁর পাশে বসে ভোম্বলদাসও আমাকে যাচ্ছেতাই মুখ ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে গেল।

আমি চিৎকার করে ডাকলুম—'মহারাজা! মহারাজা!'

মহারাজার চাকা-গাড়ি থামল। গাড়ির উপরে ফিরে বসে মহারাজা বললেন, 'আমাকে পিছু ডাকলে কেন? কী ব্যাপার?'

আমি বললুম, 'একটা নালিস আছে।'

—'আবার কীসের নালিস?'

—'ভোম্বল আমাকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।'

মহারাজা আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কাছে সেই নলচেটা নেই তো?'

আমি বললুম, 'না মহারাজ, প্রহরীরা সেটা কেড়ে নিয়েছে।'

মহারাজা বললেন, 'তাহলে ভোম্বল অনায়াসেই তোমাকে মুখ ভ্যাংচাতে পারে। খিদে পেলে ভোম্বল আমাকেও মুখ ভ্যাংচায়। না ভোম্বল?'

ভোম্বলদাস আবার আমাকে মুখ ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! কিন্তু ওই যাঃ! একটা ভারী ভুল হয়ে গেল তো!'

মহারাজা ভয়ানক চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঃ বলো কী ভুল হয়ে গেছে? কী ভুল?'

ভোম্বল বললে, 'মহারাজ, পণ্ডিতের প্রাণদণ্ডটা তো হল না!'

মহারাজা একগাল হেসে বললেন, 'ওঃ, এই ভুল? তার জন্যে আর ভাবনা কী?

পণ্ডিতও তো আর নির্বাসনে যাচ্ছে না, আগে তোমার খিদে ঠান্ডা হোক, তারপর তাকে ধরে এনে প্রাণদণ্ড দিলেই হবে!...গাড়োয়ানগণ! গাড়ি চালাও!'

মহারাজার চাকা-গাড়ি বোঁ-বোঁ করে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল!

প্রহরীরা একখানা কাপড়ে আমার চোখ বেঁধে দিলে। এ রাজ্যে আসবার পথ-ঘাট পাছে আমি চিনে রাখি, বোধহয় সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা!

এক দিন এক রাত পরে এক জায়গায় এসে তারা আমার চোখের বাঁধন খুলে দিলে। চেয়ে দেখি, আমি আবার জুজু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছি!

প্রহরীরা সবাই হাত তুলে কড়া গলায় বললে—'বিদেয় হও!'

হঠাৎ প্রহরীদের পিছনে আমার চোখ গেল।

দেখি একটি গুহার সামনে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে—কমলা!

প্রহরীরা বললে, 'এখনও গেলে না? যাও বলছি!'

বিমর্ষ প্রাণে চলে এলুম। মনে হল, আমার বোনকে আমি পিছনে ফেলে রেখে যাচ্ছি! মন কাঁদতে লাগল।

ইন্দ্রজালের মায়া

॥ এক ॥

রাত্রির অভিজ্ঞতা

হঠাৎ মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুমটা কেন ভাঙল জানি না।

খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আবছা আলো ঘরটাতে সামান্য একটু আলো-আঁধারির মায়া ছড়িয়েছিল। কিন্তু তাতে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

দেখলাম একটা অশরীরী ছায়া আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম—কে?

কোনও শব্দ নেই।

টর্চটা জ্বালতে গেলাম। কিন্তু সেটা খুঁজে পেলাম না।

কোথায় গেল টর্চ?

আমি তো আমার বালিশের পাশেই ওটা রেখেছিলাম।

আমার পাশেই শুয়েছিল আমার ছোটোভাই ভাস্কর। তাকে ডাকতে চাইলাম। হাত বাড়ালাম সে আমার পাশে আছে কি না তা দেখার জন্য।

কিন্তু আমার হাত যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। গলার স্বরও গেল বন্ধ হয়ে।

কাউকে ডাকবার শক্তি আমার নেই। আমি অসহায়।

এমন সময় ঘটল ভয়ংকর ব্যাপার।

অশরীরী ছায়াটা যেন তার আঁধার-মোড়া হাতটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরল। আমি চিৎকার করে উঠতে চেষ্টা করলাম। গলা দিয়ে স্বর বের হয় না।

কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

তবে বুঝতে পারছিলাম আমার মরণ নিশ্চিত।

কিছুক্ষণ আত্মবিহ্বলের মতো ছিলাম। হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে এল। কোথা থেকে আমার গায়ে শক্তি এল জানি না। সেই আসুরিক শক্তির বলেই যেন আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। তখনও অশরীরী ছায়ার হাত দুটো আমার গলা চেপে ধরে আছে।

আমি সেই হাত ছাড়াবার জন্য আমার গলায় হাত দিলাম। আমার হাতে কারুর হাত লাগল না। কিন্তু বুঝতে পারলাম সেই অশরীরী হাত আমার গলা ছেড়ে দিয়ে আমার কাঁধে ভর করেছে। আমাকে যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চাইছে বিছানার উপর।

আমি প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে উঠে দাঁড়ালাম। এবার আমরা দুজনে মুখোমুখি। আমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম সেই অশরীরী শয়তানকে। কিন্তু তার আগেই সে আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

তারপর কী হল আমি জানি না।

পরদিন ভোরবেলা জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি আমাকে ঘিরে আছে আমার মেসের বন্ধুরা।

ভাস্করই মেসের বন্ধুদের ডেকে এনেছে। সে-ও রাত্রিবেলায় সেই অশরীরীকে দেখেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তার জ্ঞান ফিরেছিল শেষ রাত্রে। আমাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে ছুটে গিয়েছিল আমার মেসে, আমার বন্ধুদের ডেকে এনেছিল।

পরিমল এই গল্প বলেছিল বৈজ্ঞানিক এবং ডিটেকটিভ সুমন্ত তরফদারের কাছে। খুব কৌতূহল নিয়েই তরফদার সেই গল্প শুনছিলেন।

পরিমল বলল, 'ভেবেছিলাম দেশ থেকে মা বোনকে এনে কলকাতায় রাখব। তাই ওই বাড়িটার খোঁজে গিয়েছিলাম।'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই বলে ওই বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়েছিলেন কেন? বাড়িটা কি ভাড়া নিয়েছিলেন?'

পরিমল বলল, 'হ্যাঁ, ভাড়া নিয়েছিলাম বই কি। আমি মেসেই বহুদিন ধরে আছি। একটা ছোটোখাটো চাকরিও করছি। হঠাৎ ছোটোভাই ভাস্কর দেশ থেকে এসে হাজির। বলল, দেশে মা আর আমার বোন থাকতে চাইছে না, তাদের অবিলম্বে কলকাতা নিয়ে আসা প্রয়োজন।'

—'কেন?'

—'দেশে নাকি জমিদারের নায়েব খুব জোরজুলুম করছে। বাবা থাকতেই বাড়ির জমির সীমানা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা ও ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর তাই আমার বিধবা মায়ের উপর চলছে জোর-জুলুম। ছোটোভাই ওখানেই থেকে দূরের গাঁয়ের স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করে। তারও নানারকম অসুবিধা হচ্ছিল। তাই এসেছিল আমাকে খবরটা জানাতে। আমি ভেবেছিলাম, গাঁয়ের বাড়িটা বিক্রি করে দেব। তাই খুঁজে খুঁজে এই বাড়িটা ঠিক করেছিলাম। কিন্তু—'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন—'ওটা কি ভূত না কোন ছদ্মবেশী মানুষ?'

পরিমল অবাক হয়ে বলল—'ছদ্মবেশী মানুষ? তা হবে কেন? ছদ্মবেশী মানুষ কেন আসবে আমাকে ভয় দেখাতে?'

তরফদার বললেন—'কলকাতার বাড়ির অনেকরকম রহস্য আছে। কেউ হয়তো ওই বাড়িটা ভাড়া নেবে ঠিক করেছিল, বাড়িওয়ালা তাকে না দিয়ে আপনাকে দিয়েছেন, তাই আক্রোশে ভয় দেখিয়ে আপনাকে হটাতে চাইছে। অথবা এমনও হয়তো হতে পারে, কেউ মওকায় ওই বাড়িটি নেবার চেষ্টায় আছে।'

পরিমল বলল—'না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ওটা অভিশপ্ত বাড়ি, ভূতুড়ে বাড়ি, বিনে পয়সাও দিলে আমি নেব না।'

তরফদার বললেন—'আপনি কি সে-বিষয়ে স্যাংগুইন? ভূত এর আগে কখনও দেখেছেন আপনি?'

—'না।'

—'তা হলে?'

—'এরকম ভূতুড়ে কাণ্ডের কথা আমি অনেক শুনেছি। এবার যে নিজের জীবনেই এরকম ঘটনা ঘটল।'

তরফদার বললেন—'আমি কিছুদিন ধরে ভাবছি, ভূত নিয়ে গবেষণা করব। এবার সত্যি সেই কাজে নেমে পড়ব ভাবছি।'

ঘটনাটা অনেকদিন আগের।

কিন্তু সেই ঘটনাচক্রের সঙ্গে যে নিজেকেই একদিন জড়িয়ে পড়তে হবে তা সুমন্ত তরফদার কখনও ভাবেননি।

ভূত-সংক্রান্ত কোনও ঘটনার কথা কানে এলেই তিনি তা শুনতে আগ্রহী হতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও ঠিক জুটিয়ে নিয়ে আসতে এমন সব লোকদের যাদের কাছ থেকে অনেক চমকপ্রদ কাহিনি তিনি শুনতে পেতেন। কোনওটি বিশ্বাস্য, কোনওটি বা অবিশ্বাস্য।

সুমন্ত তরফদারের নাম ধীরে ধীরে কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কত ঘটনা ঘটতে লাগল তাঁর জীবনে, সব ঘটনার রেকর্ড হয়তো তাঁর পক্ষে রাখা সম্ভব হত না।

এরপর যে ঘটনার কথা বলছি তার সঙ্গে আপাতত তরফদারের কোনও যোগাযোগ না থাকলেও পরবর্তীকালে সেই ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। এবার শুরু করছি পরবর্তী অধ্যায়।

॥ দুই ॥

বটব্যালের কাহিনি

'কী হে বটব্যাল, কী খবর?'

কোনও সাড়া নেই।

যে-লোকটি সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল, সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গায়ে বুশ সার্ট, চোখে চশমা। হাতে ফলিও ব্যাগ।

সুনীল বটব্যাল তার টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে। সেই দৃষ্টি অফিসের

কোনও কাগজপত্রের উপরও নয় বা কোনও ডিটেকটিভ বইয়ের উপরও নয়। দৃষ্টি নিবদ্ধ স্রেফ টেবিলের উপর। এবং যে স্থানটি নিতান্তই ফাঁকা।

'কী হে বটব্যাল, তুমি দেখছি খুবই চিন্তিত।'

তবু প্রতিপক্ষ থেকে কোনও প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না।

আগন্তুক মিহির মিত্র খুবই বিস্মিত হল। বটব্যালের এমনভাবে চিন্তায় নিমগ্ন থাকার কী কারণ থাকতে পারে? তবু তার চিন্তাসূত্রে বাধা না দিয়ে বটব্যালের মুখোমুখি একটি চেয়ারে মিহির চুপচাপ বসে পড়ল।

এবার হুঁশ হল বটব্যালের। মুখ তুলে বলল, 'ওঃ মিহির, তুমি? হঠাৎ কী মনে করে?'

'হঠাৎ নয় হে, হঠাৎ নয়।'—মিহির জবাব দিল। তারপর নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসেছি প্রায় দু-মিনিট উনত্রিশ সেকেন্ড। এক ঘণ্টা আগে একবার ফোন করেছি—কালও দুপুরে ফোন করেছি একবার। বাট নো রেসপন্স কী ব্যাপার বলো তো?'

বটব্যাল বলল, এক ঘণ্টা আগে ফোন করেছিলে? কাল দুপুরেও ফোন করেছিলে? কই, আমি তো কিছু জানি না। কেউ তো আমাকে ডেকে দেয়নি। কয়েকদিন হল আমার টেবিলের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা তারপর খবর কী? এত হন্যে হয়ে আমাকে খোঁজবার অর্থ তো কিছু বুঝতে পারছি না।

'ধীরে বন্ধু, ধীরে। আগে এক কাপ চায়ের অর্ডার দাও তো। সঙ্গে একটা টোস্ট বা মামলেট। এতক্ষণ আমাকে ডিটেন করার কমপেনসেশন।'

বটব্যাল কলিংবেল টিপল। কেউ এল না।

কিছুক্ষণ পর আবার টিপল। এবারও কেউ এল না। বিরক্ত হয়ে বটব্যাল বলল, 'আজকাল বেয়ারাগুলো হয়েছে সত্যি বেয়াড়া। কোনও কাজ ওদের দিয়ে করানো যায় না।'

মিহির বলল, 'হুকুম দিয়ে কাজ করাবার দিন চলে গেছে বন্ধু। এখন অনুরোধ করে কাজ করাতে হবে।'

বটব্যাল বলল, 'শুধু কি অনুরোধ? রীতিমতো তোষামোদ।'

এমন সময় বেয়ারা এসে হাজির হল। বটব্যাল জিজ্ঞেস করল 'কী হে অনন্ত, ঘুমোচ্ছিলে নাকি?' বেয়ারা কোনও জবাব দিল না।

বটব্যাল বলল, 'দু-কাপ চা আর দুটো মামলেট-এর ব্যবস্থা করে দাও তো অনন্ত।'

'আচ্ছা বাবু।'—বলে অনন্ত চলে গেল।

'কী ব্যাপার এবার বলো তো মিহির?' বটব্যাল উদগ্রীব হয়ে মিহিরের দিকে তাকাল।

মিহির বলল, 'আমাদের এক আত্মীয় সপরিবারে এসে গেছেন কলকাতায়। তাদের জন্যে একটা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে পড়েছি। সব বন্ধুদের কাছেই ধরনা দিয়েছি এজন্য। তোমার কাছে শুধু বাকি। তাই এলাম। বাড়ির কোনও হদিস তুমি দিতে পারো?'

বটব্যাল হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'চমকে উঠলে যে!'

বটব্যাল বলল, 'বাড়ির কথা শুনে।'

মিহির বলল, 'বাড়ির কথা শুনে চমকাবার কী হল?'

বটব্যাল বিষাদের হাসি হেসে বলল, 'আমি নিজেই বাড়ির বিভীষিকায় পড়েছি।'

'মানে তোমাদের তো নিজেদের বাড়ি রয়েছে।'

'বাড়িটা খুব পুরোনো, তা তো জানো। সেই বাড়ি রিপেয়ার হচ্ছে, কিছু কিছু অংশ ভাঙাও হচ্ছে। তাই একটা বাড়ি পেয়ে পরশুদিন চলে গেছি।'

'তাহলে তো বাড়ির সমস্যা মিটে গিয়েছে তোমার।'

'মিটে গেলে তো বাঁচতাম। কিন্তু সমস্যা আরো ঘোরালো হয়েছে।'

'মানে?'

'মানে আজকের মধ্যেই হয়তো বাড়িটা ছাড়তে হবে।'

'ছাড়তে হবে কেন? তা আবার আজকের মধ্যেই?'

এমন সময় অনন্ত দু-কাপ চা আর দুটো মামলেট নিয়ে এল। দুজনের সামনে চা আর মামলেটের প্লেট রেখে বটব্যালকে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটা লোক দেখা করতে চায় বাবু।'

বটব্যাল জিজ্ঞেস করল, 'দেখা করতে চায়? কে লোকটা?'

অনন্ত বলল, 'নাম বলছে ভজহরি। সাধারণ লোক। আধ ময়লা কাপড়-জামা পরনে।'

'রোগা বেঁটেখাটো লোক তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বটব্যাল বলল, 'কী মুশকিল!...একটু অপেক্ষা করতে বলো।'

অনন্ত চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে বটব্যাল বলল, 'আঃ, লোকটা অসময়ে জ্বালাতে এল।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে?'

বটব্যাল বলল, 'বাড়ির দালাল। ও-ই তো বাড়িটার সন্ধান দিয়েছিল। কথা ছিল বাড়ির এক মাসের ভাড়ার টাকা ওকে দিতে হবে। ওটা ওর দালালি। কিন্তু দু-দিনের বেশি বাড়িতে থাকতে পারলাম না, টাকা কেন দেব বলতে পারো?'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'থাকতে পারলে না কেন?'

বটব্যাল বলল, ভূতের উপদ্রবে।'

'ভূতের উপদ্রব? একী বলছ তুমি?'—অনেকটা অবাক হয়েই মিহির বলল, 'ভূত আছে বলে তুমি বিশ্বাস করো? তা ছাড়া কলকাতার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব—এ তো আরও আজগুবি কথা। পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে ওই রকম ঘটনা মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে। অবশ্য-আমি তা মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু কলকাতার বাড়িতে—'

মিহির একটু থামল। বটব্যাল বলল, বিশ্বাস তো আমিও করতাম না। কিন্তু দু-দিন ধরে ওই বাড়িতে যা ঘটছে তাতে অবিশ্বাস না করার কোনও কারণ নেই।'

'এমন কী ঘটছে বলো তো?'

'সে ভাই ভয়ানক, শুনলেও বুক কাঁপে।'

'তুমি নিজে দেখেছ না বাড়ির লোকেদের মুখে শুনেছ?'

'আমার নিজে দেখবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি। বাড়ির প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেই শুনেছি।'

'কী শুনেছ বলো তো। শুনে মনের কৌতূহল চরিতার্থ করি।'

এমন সময় অনন্ত এসে বটব্যালকে বলল, 'ওই লোকটা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বাড়িতে নাকি ওর বউয়ের খুব অসুখ, এখুনি ডাক্তার আনতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে। ওর টাকার খুব দরকার।'

বটব্যাল রাগত কণ্ঠে বলল, 'বলে দাও, আমার সঙ্গে এখন দেখা হবে না। ওকে কাল আসতে বলো।'

মিহির বলল, 'আহা বেচারির টাকার দরকার বলেই এমন তাগিদ দিচ্ছে।'

বটব্যাল বলল, 'ওদের টাকার দরকার সব সময়েই। বাড়িতে বউয়ের অসুখ না ছাই। টাকা আদায় করার একটা ছুতো মাত্র।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'আর কত টাকা পাবে?'

বটব্যাল জবাব দিল, 'কুড়ি টাকা; ত্রিশ টাকা দিয়েছি আর কুড়ি টাকা বাকি রয়েছে।'

'বাড়ি ভাড়া কত?'

'পঞ্চাশ টাকা।'

চেয়ারের উপর বসেই যেন লাফিয়ে উঠল মিহির।—'বলো কী? মোটে পঞ্চাশ টাকা বাড়ি ভাড়া? ঘর ক-খানা?'

'দু-খানা শোবার ঘর, একখানা রান্নাঘর। আর একখানা ঘরও ইচ্ছা করলে ব্যবহার করা যায়।'

'ইচ্ছা করলে মানে?'

'ওটা দোতলার ঘর, খালিই থাকে, তালা বন্ধ! এক বুড়ি বাড়ির দেখাশোনা করে। দরকার হলে তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে খুলে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

মিহির পকেট থেকে টাকা বের করল। তিনখানা দশ টাকার নোট বটব্যালকে দিয়ে বলল, 'এই নাও তোমার দেওয়া ত্রিশ টাকা আর দালালের কুড়ি টাকা।'

বটব্যাল অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকার মতো জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে তো কিছু বুঝলাম না?'

মিহির বলল, 'এর মানে ওই বাড়িটা নিলাম। তুমি যেদিন থেকে ছাড়বে, সেদিন থেকে ওই বাড়িটা আমার।'

'ওই ভূতের বাড়িটা?'

হ্যাঁ, ওই ভূতের বাড়িটাই নেব। ভূত-টুত আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া বাড়ির আমার ভয়ানক প্রয়োজন। বাড়ির খোঁজেই আজ তোমার এখানে এসেছিলাম।

'তাই বলে ওই বাড়ি?'

'কী করব? আমার এক মাসিমা সপরিবারে হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে উঠেছেন। অর্থাৎ আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছেন বলতে পারো। তাই ঘাড় থেকে বোঝা নামবার জন্যেই আমার খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি দরকার।'

'কিন্তু ওই ভূতের বাড়িটায় তোমার মাসিমারা থাকতে পারবেন কি না তা চিন্তা করেছ কি?'

'উঠুক তো আগে ওই বাড়িতে। তারপর ভূতের সঙ্গেই না হয় লড়াই করা যাবে।'

'ভূতের বাড়ির কথা শুনলে তোমার মাসিমাই বা ওই বাড়িতে যেতে চাইবেন কেন?'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল মিহির। বলল, 'আমি কি এতই বোকা? ভূতের বাড়ির কথা তাদের বলবই বা কেন? দেখি না কী হয়, তারপর যা ব্যবস্থা করতে হয় করব।'

বটব্যাল বলল, 'তুমি সত্যি বাড়িটা নেবে? তাহলে তো এখনই তোমাকে ভজহরির সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসতে হয়। তবে সাবধান, আমি বাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি এবং তুমি নিচ্ছ একথা ভজহরিকে বোলো না। তাহলে তোমার কাছেও দালালির টাকা চাইবে।'

মিহির বলল, 'সে আর বলার দরকার কী? কিন্তু তোমাদের মালপত্র যখন সরাবে তখন তো সে বুঝতে পারবে।'

বটব্যাল বলল, 'সে তো আর ওখানে থাকে না যে মালপত্র সরাবার সময় দেখতে পাবে। তা ছাড়া মালপত্র এখনও তেমন কিছু নেইনি। দু-তিন দিন পরে মালপত্র নেব বলে স্থির করেছিলাম।'

'তাহলে ভালোই হল। ডাকো তোমার ভজহরিকে। সামনা সামনি যা বলার বলে দাও। আমাকে ওই বাড়িটা দেখিয়ে দিক।'

বটব্যাল অনন্তকে বলল, 'ওই লোকটাকে ভিতরে নিয়ে এসো তো।'

'আচ্ছা বাবু, নিয়ে আসছি', বলে অনন্ত চলে গেল।

বটব্যাল বলল, 'তুমি তো আমার বাড়ির সবাইকে চেনো। ভিতরে ঢুকে কথাবার্তা বলো। ভজহরিকে আর আটকে রেখো না। ওকে ছেড়ে দিয়ো।'

এমন সময় ভজহরিকে নিয়ে অনন্ত এসে উপস্থিত হল।

বটব্যাল বলল, 'ওহে ভজহরি, এই নাও তোমার বাকি কুড়ি টাকা। তুমি খুশি হলে তো?'

ভজহরি আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, 'আমার ভারী উপকার করলেন বাবু। বউয়ের খুব অসুখ, একেবারে মরমর অবস্থা। এক্ষুনি ডাক্তার আনতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে, পথ্যের জোগাড় করতে হবে—'

সে আরও কী বলতে চাইছিল। বটব্যাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন তোমার বক্তৃতা রাখো। আমার এই বন্ধুটিকে সেই বাড়িতে নিয়ে যাও তো। আমি এখন যেতে পারছি না।'

ভজহরি মিহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঃ, উনি বুঝি বাড়িটা চেনেন না? তা ঠিকানা দিয়ে দিন না। ৪০ বাই ২-এর বাসে উঠে ঘুঁটেপাড়ার মোড়ে নেমে সেখান থেকে ৮০ বাই ৩-এর বাসে খালপুলের মুখে নেমে—'

বটব্যাল বলল, 'আঃ, আবার তোমার বক্তৃতা শুরু হল? যাতায়াত ভাড়ার জন্য চিন্তা কোরো না, আমার বন্ধু দেবেন।'

মিহির বলল, 'তা ছাড়া এই নাও এক টাকা বকশিশ।'

ভজহরি এবার পারে তো মিহিরবাবুকে মাথায় তুলে নিয়ে যায়। তাই বলল, 'চলুন বাবু, আমি তো পা বাড়িয়েই আছি।'

মিহির বলল, 'আচ্ছা চলো।'

বটব্যালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন আসি হে সুনীল, পরে আবার দেখা হবে।'

ভজহরিকে নিয়ে মিহির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুনীল বটব্যাল বসে বসে ভাবতে লাগল কাজটা ভালো হল কি?

অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলা হল। কিন্তু এ ছাড়া আর কি-ই বা করা যেত। মিহির তো জেনেশুনেই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিল।

দেখা যাক, এই ভুতুড়ে নাটকের পরবর্তী দৃশ্য কী!

॥ তিন ॥

ধূর্ত ভজহরি

ভজহরি বড়ো ধড়িবাজ লোক। জলের মতো সহজভাবে পথের নিশানা বলে গেল, কিন্তু যেতে গিয়ে দেখা গেল বড়ো ঘোরালো পথ।

দ্বিতীয়বার বাস থেকে নেমেই মিহির জিজ্ঞেস করেছিল, কী হে, কতদূর হাঁটতে হবে?'

ভজহরি জবাব দিয়েছিল, 'এই তো এসে গেছি বাবু।'

তারপর শুরু হল হাঁটা। পথ আর ফুরায় না।

মিহির ক্লান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হে আর কত বাকি?'

ভজহরি জবাব দিল, 'এই, আর কয়েক পা এগুলেই—বাবু—'

কয়েক পা-র বদলে কয়েক-শ পা হাঁটা হয়ে গেল। গলির পর এঁদো গলি তারপর

কানাগলি। সেই কানাগলির শেষ প্রান্তে বাড়িটি ১৪।৪।১-বি মদনবিহারী কালাকার লেন।

বাড়ির কাছে এসে মিহিরের প্রাণান্ত। জলতেষ্টা পেয়ে গেল। ভজহরি কিন্তু খুব খুশি। গদগদ হয়ে, 'দেখুন বাবু, কী চমৎকার বাড়িই না আপনার বন্ধুকে জোগাড় করে দিয়েছি। এত সস্তা ভাড়ায় এমন ভালো বাড়ি মাথাকুটেও কেউ পাবে না। আপনারও কি বাড়ির দরকার?

মিহির মনের ভাব গোপন করে বলল, 'না না, দরকার নেই।' বাড়িটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটের দরজা বন্ধ। কয়েকবার কড়া নাড়ার পর থুরথুরে এক বুড়ি এসে দরজা খুলে দিল। ক্যাটকেটে গলায় বলল, 'বাব্বা, এই ভর দুপুরে কী জ্বালাতন! কাকে চাই?'

মিহির বুড়িকে দেখে চমকে উঠল। কী বিশ্রী চামচিকের মতো চেহারা! মাংসের লেশমাত্র শরীরের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিহির বলল, 'এ বাড়িতে যে নতুন ভাড়াটে এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

বুড়ির এবার দৃষ্টি পড়ল ভজহরির দিকে। তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে আবার নতুন খদ্দের আনলি বুঝি?'

ভজহরি বলল, 'না না, উনি ভাড়াটের বন্ধুলোক।'

মিহির ভজহরিকে বলল, 'এবার তুমি যেতে পারো।'

ভজহরি বলল, 'আমার কাজ তো এখনও শেষ হয়নি, বাবু। বাড়ির লোকের সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিই।'

বুড়ি কী রকম অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর ভিতরে চলে গেল। ভজহরি মিহিরকে বলল, 'আপনি এদিকে আসুন।'

দোতলা বাড়ি। ছোট্ট একফালি চাতাল পেরিয়ে ভজহরি মিহিরকে নিয়ে একতলার একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরটা বন্ধ। ভজহরি নিজেই এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়াল। কিছুক্ষণ পরেই এক মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। মিহির তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন মাসিমা?'

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ মিহিরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।'

মিহির বলল, 'আমি সুনীলের বন্ধু মিহির।'

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে একটা হাসির আভাস ফুটে উঠল। বললে, 'ওঃ, তুমি মিহির? এতদিন পরে দেখে চিনতেই পারিনি। তারপর হঠাৎ কী মনে করে? এসো, ভেতরে এসো।'

মিহিরের সঙ্গে ভজহরিও ঘরে ঢোকবার জন্য পা বাড়াল। ভদ্রমহিলা স্বভাবসুলভ ভদ্রতায় বললেন, 'আসুন, আপনিও আসুন।'

মিহির কোনও আপত্তি করল না। তার সঙ্গে ভজহরিও ঘরে গিয়ে বসল। ঘরের আসবাবপত্র সব অগোছালো। একটি সোফা এক ধারে রেখে দেওয়া হয়েছে, তার পাশে

একটি টুল। মিহির সোফায় বসল, ভজহরি বসল টুলে। মিহির বলল, 'আগে এক গ্লাস জল দিন তো মাসিমা। গলি ঘুরতে ঘুরতে একবারে হাঁপিয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ দিচ্ছি' বলে ভদ্রমহিলা ভিতরের দিকে চলে গেলেন। তার একটু পরেই এলেন হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে। আবার ভিতরে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা হয়তো চা ও জলখাবারের ব্যবস্থার জন্যই তাদের একটু বসতে বলে গেলেন।

মিহির কিন্তু ভজহরির কার্যকলাপে বেশ একটু আশ্চর্য বোধ করল এবং ক্রমশ বিরক্তও হতে লাগল। ঘরে যার স্ত্রী মরণাপন্ন সে কীভাবে এতক্ষণ নিশ্চিন্তভাবে বাইরে থাকে আর যাবার নামটিও করে না! সুনীল যে বলেছিল, বউয়ের আসুক-বিসুক কিছু না, ওটা টাকা নেওয়ার ফন্দি, সে কথাটাই ঠিক।

কিন্তু এমনভাবে পেছনে লেগে থাকার মানে কী হতে পারে? লোকটা কি ভিতরের কোনও খবর জেনে নিতে চায়? অথবা এই বাড়িটা মিহির নেবার জন্য আগ্রহী তা সে অনুমান করতে পেরেছে?

লোকটা যে ঘুঘু তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মিহিরও সতর্ক, সহজে ধরা দেবে না।

ভদ্রমহিলা কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক—সম্ভবত বাড়ির পরিচারিকা—তার হাতে দু-কাপ চা ও দু-প্লেট খাবার।

মিহির তা দেখে একটু বিস্মিত হল। এই ভূতুড়ে বাড়িতে কি সবই ভূতুড়ে, এত তাড়াতাড়ি চা আর খাবার এল কী করে?

ভজহরি যেন চা আর খাবারের আশাতেই বসেছিল। প্লেটের চারখানা গরম লুচি সঙ্গে সঙ্গেই উদরস্থ করল। তারপর এক চুমুকেই সবটুকু গরম চা নিঃশেষ। তলানি পর্যন্তও রাখল না। মিহিরের কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল।

ভদ্রমহিলা সুনীল বটব্যালের মা। ধরিত্রীদেবী। তিনি তক্তাপোশের উপর বসে মিহিরের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বাড়ির কথা উঠতেই মিহির ভজহরিকে বলল, 'ভজহরি, তুমি এবার যেতে পারো। আমাদের এখন ঘরোয়া কথাবার্তা হবে। তা ছাড়া তোমার তো তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। বাড়িতে তোমার বউয়ের অসুখ। তুমি চলে যাও, আমার যেতে একটু দেরি হবে।'

ভজহরির তবু উঠবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এমন করে বলার জন্যই বুঝি নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়ল।

মিহির এবার ধরিত্রীদেবীকে বলল, 'নতুন বাড়িতে এলেন, চলুন, বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।'

ধরিত্রীদেবী মিহিরকে নিয়ে বাড়ির ঘরগুলি দেখাতে লাগলেন। বাড়িটা দেখে মিহরের ভালোই লাগল। বলল, 'বাড়িটা তো মোটামুটি ভালোই, তবে গলিটাই যা বিদঘুটে। তবু কলকাতায় যা বাড়ির সমস্যা তাতে এত কম ভাড়ায় এমন বাড়ি পাওয়া খুবই মুশকিল।'

একটা ঘর তালাবন্ধ। সে ঘরটা ধরিত্রীদেবী খুললেন না। মিহির জিজ্ঞেস করল, 'এ ঘরটা কি আপনাদের ভাড়ার মধ্যে নয়?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'এটার সঙ্গে ভাড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। ইচ্ছা করলেই ব্যবহার করা যায়। প্রথম দিন খুলেছিলাম। তারপর সুনীল এটা ব্যবহার করতে বারণ করে গেছে। খুলতেও বারণ করেছে।'

মিহির বলল, 'থাক, তাহলে আর খুলে দরকার নেই।'

একপাশে একটা সরু সিঁড়ি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওটা কি দোতলায় উঠবার সিঁড়ি?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'হ্যাঁ কিন্তু আমরা দোতলায় উঠি না। উঠে আর কী হবে?'

মিহির বলল, 'সুনীলের মুখে শুনলাম আপনারা নাকি এ বাড়িটা শিগগিরই ছেড়ে দেবেন?'

পেছন দিক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ধরিত্রীদেবী মিহিরকে নিয়ে চাতালের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, রাত হলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে। বাড়ির ঝি মোক্ষদা তো দু-দিন ধরে রোজই ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। তাই আমরা বড়ো ভাবনায় পড়ে গেছি।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখে সে চিৎকার করে আর কী জন্যই বা অজ্ঞান হয় তার খোঁজ নিয়েছেন কি?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'ও কিছু পরিষ্কারভাবে বলতে পারে না। শুধু বলে কী যেন ওর সামনে, কখনও পেছনে চলে বেড়ায়। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পায় না।'

মিহির বলল, 'আমার মনে হয় মোক্ষদা বড্ড ভিতু।'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'আমাদের বাড়িতে তো সে অনেকদিন কাজ করছে, কিন্তু ভিতু বলে তো কখনও মনে হয়নি। একদিন তো চোরের পেছনে ধাওয়া করে সে চোরের হাত থেকে জিনিস কেড়ে রেখেছিল। এ বাড়িতে এসেই যেন সে কেমন হয়ে গেছে। তাই তো আমরাও বড়ো ভাবনায় পড়েছি।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিছু দেখেছেন?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'না, এখনও কিছু দেখিনি। কিন্তু রাত হলেই শরীরটা কেমন ভার হয়ে যায়, বুকটা ধুকপুক করতে থাকে। মনে হয় কে যেন বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো কী একটা অশুভ জিনিস এই বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'সে জন্যই বুঝি সুনীল এ বাড়ি ছাড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'বাড়ি পেলে আজকেই আমরা চলে যাব।

এমন সময় হঠাৎ মিহিরের চোখে পড়ল, সেই বাড়িটারই অপর দিকের অংশের একটি

ঘরের জানালা খোলা। আর সেই জানালায় দুটি কৌতূহলী মুখ। তারা উৎকর্ণ হয়ে যেন এইসব কথাবার্তা শুনছে। দুটো মুখই চেনা। একটি মুখ সেই বুড়ির আর একটি মুখ ভজহরির।

ভজহরি তাহলে যায়নি? বুড়ির ঘরে লুকিয়ে আছে?

মিহিরের শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের শক লাগল। নিশ্চয়ই ভজহরির মনে কোনও দুষ্ট বুদ্ধি আছে। মনে হয় সব ব্যাপার সে আড়ি পেতে দেখছে ও শুনছে।

হঠাৎ জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। জানালা বন্ধের শব্দ শুনে ধরিত্রীদেবী সেদিকে তাকালেন। কিন্তু কোনও কিছু বুঝতে পারলেন না।

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'ওই ঘরে কে থাকে?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'এক বৃদ্ধা মহিলা। অনেকদিন ধরেই এই বাড়িতে আছেন। ধরতে গেলে উনিই এখন বাড়ির মালিক। কারণ মালিক নাকি কলকাতায় নেই। ওই বৃদ্ধাই বাড়িভাড়া আদায় করেন।'

মিহির বলল, 'ওই বাড়ির দালালটা কি রোজই এই বাড়িতে আসে? ওই যে, যে লোকটা আমার সঙ্গে বসে চা-জলখাবার খেয়ে গেল?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'অত কি আর আমি লক্ষ রাখি বাবা? তবে আমার চোখে তো পড়েনি।'

মিহির বলল, 'ওই লোকটাকে সাবধান। খুব সুবিধার লোক বলে মনে হয় না। যা হোক এখন আমি আসি মাসিমা। পরে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'আর একটু বসে যাও বাবা।'

মিহির বলল, 'না মাসিমা। আমার মাথায় ভারী বোঝা চেপে আছে। সে বোঝা নামাতে পারলেই তবে শান্তি।'

ধরিত্রীদেবী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন কী হয়েছ?'

মিহির বলল, 'সেসব কথা এক সময় বলব আপনাকে। ...পরে সবই জানতে পারবেন।'

মিহির চলে গেল। ধরিত্রীদেবী কী যেন আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, ভজহরি চোরের মতো চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুনীল বাড়িটা ছেড়ে দিল। নিজেদের ভাঙা বাড়িতেই আবার উঠে এল। মা ধরিত্রীদেবী কিছুতেই সেই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন না।

বললেন, 'কষ্টে-শিষ্টে থাকি তবু নিজের বাড়িতেই কোনওরকমে কাটিয়ে দেব। তবু ওই রকম ভয় ভাবনা নিয়ে রাত কাটানো চলে না। রাত হলে যেন গায়ের রক্ত শুকিয়ে যায়।'

॥ চার ॥

বিজয়ের প্রসঙ্গ

সেই বাড়িতেই এসে উঠলেন মিহিরের মাসিমা মলিনাদেবী। মিহিরদের বাড়িতে উঠে যে কষ্টের মধ্যে কয়েকদিন ছিলেন, এই বাড়িতে এসে সেই কষ্ট ভুলে গেলেন। হাত-পা মেলে ছড়িয়ে থাকতে পারলেন।

তথাকথিত বাড়িওয়ালি বুড়ি কিন্তু ভয়ানক সেয়ানা। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন সে টের পেল যে নূতন কিছু লোক বাড়িতে আমদানি হয়েছে, তখন জানালায় আড়ি পেতে দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারল বাড়ির সবগুলি লোকই নূতন। তখন তার খুব সন্দেহ হল।

বুড়ি হাঁটতে হাঁটতে এল মলিনাদেবীর ঘরে। এসে প্রথমে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। বলল, 'তোমরা নতুন এলে বুঝি? বেশ বেশ! তাই তো বলি ঘরে নতুন লোকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কেন?' বুড়ি একটু থামল। তারপর ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, 'রাত্রিবেলায় চুপি চুপি এলে, একটু জানতেও পারলাম না। তোমরা না হয় অচেনা লোক। কিন্তু যারা ছিল তারাও তো একটু জানিয়ে যেতে পারত।'

মলিনাদেবী বুঝতে পারলেন বাড়িওয়ালি বুড়ি তাঁর কাছ থেকে কথা বের করবার চেষ্টা করছে। তাই বলল, 'না, না, তারা তো যায়নি। আমরা তো তাদের বাড়িরই লোক। আমি তো সুনীলের মাসিমা।'

বুড়ি কিন্তু বাঁকা পথে চলল। বলল, 'মাসিই হও আর পিসিই হও—তোমাদের রেখে ওরা চলে গেল চুপিচুপি, এটা কেমন ভদ্রতা? আমি কি বাড়ির কিছুই নই? কাল আফিংটা একটু বেশি খেয়েছিলাম বলে ঝিমুনিটা একটু বেশি এসেছিল। তাই কিছু টের পাইনি।'

মলিনাদেবী বললেন, 'ওরা তো যায়নি। ওই তো ওদের জিনিসপত্র ঘরে রয়েছে। আবার ওদের দেখতে পাবেন।'

বুড়ি ঘরের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিল। মলিনাদেবী বললেন, 'আহা চলে যাচ্ছেন কেন? বসুন।'

'আর বসব কী করতে? সব তো জেনেই নিলাম।'

'চা খান।'

চায়ের কথা শুনে বুড়ির চোখ মুখের চেহারা যেন পালটে গেল। পেছন ফিরে বলল, 'আবার চা কেন?'

'আমাদের চা হচ্ছে। এসেছেন যখন—'

বলতে বলতেই চা এসে গেল। সঙ্গে মাখন-মাখানো পাউরুটি ও সন্দেশ। বুড়ি এমন লুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল মনে হল এ ধরনের খাবার সে কোনওদিন চোখে দেখেনি।

খাবার খেতে খেতে বুড়ি খুব খুশি হয়ে উঠল। মন যেন তার উদার হয়ে গেল। বলল, 'ওরা কেন চলে গেল তা জানি।'

মালিনাদেবী বিস্মিতভাবে বুড়ির দিকে তাকালেন। কী বলতে চায় বৃদ্ধা! আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জানেন আপনি?'

বুড়ি জবাব দিল, 'তা তোমাদের কাছে বলে আর কী হবে?'

মলিনাদেবী বললেন, 'বলুন না।'

বুড়ি বলল, 'তবে একটা কথা আমি বলতে পারি যারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তারা আর আসে না।'

মলিনাদেবী চমকে উঠলেন সে কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

বুড়ি তারিয়ে তারিয়ে পাউরুটি আর সন্দেশ সহযোগে চা খেতে লাগল। ফোকলা দাঁতে পাউরুটি চিবুতে চিবুতে বলল, 'আসবে কেন? আমি হলে আমিও আসতাম না। শুধু ভিটার মায়ায় পড়ে আছি। সে তোমরা বুঝবে না মা, পরে একদিন বলব।'

খেতে খেতে থামল একটু। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। মলিনাদেবী উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নিজের খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

বুড়ি কিন্তু অক্লেশে খেয়ে যেতে লাগল। বলল, 'তোমরাও হয়তো এমনি করে একদিন চলে যাবে।'

বুড়ি চা ও খাবার নিঃশেষ করে চলে গেল।

মলিনাদেবী বসে বসে ভাবতে লাগলেন, বৃদ্ধার কথাবার্তায় কী রকম যেন একটা রহস্য। মিহির কেমন বাড়িতে আমাদের নিয়ে এল?

যাক, বাড়িটা যে পাওয়া গেছে এটাই সবচেয়ে সৌভাগ্য। বাড়িওয়ালির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী? তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা না বললেই হল।

কিন্তু আবার ভাবতে লাগলেন, বৃদ্ধার মুখ থেকে বাকি কথাগুলো শুনে নেওয়া দরকার।

নানারকম চিন্তাভাবনার মধ্যে সেদিনটা কেটে গেল।

মলিনাদেবীদের সংসারের লোকজন নেহাত কম নয়। স্বামী পীড়িত, তাঁর জন্য একটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। সে ঘরে বিশেষ লোকজন যেতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য ঘরে ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে তিনি থাকেন। দোতলার ঘরটির চাবি নিয়ে রাখা হয়েছে, এখনও সেই ঘরটি ব্যবহার করা হয়নি।

বড়োছেলে বিজয় মিহিরের প্রায় সমবয়সি। অমরনাথ পীড়িত থাকায় বিজয়ই সংসারের সব কিছু দেখাশোনা করে।

বিকেলবেলা বিজয় কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় এল মিহির। কাল রাতটা মাসিমার কীভাবে কেটেছে তা জানবার জন্য তার

মনে একটা কৌতূহল রয়েছে। কিন্তু সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হল না। তাই প্রথমে কিছু জিজ্ঞেস না করে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল।

মলিনাদেবী হেসে মিহিরকে আপ্যায়ন করলেন, 'এসো, এসো মিহির।'

বিজয় কোথায় গেছে? ওকে দেখছি না তো?'

'দোকানে কী সব জিনিসপত্র কিনতে গেছে। সেই দুপুরে গেছে। অনেকক্ষণ আগেই তার ফেরার কথা; এখনও কেন যে এল না—বড়ো ভাবনা হচ্ছে।'

'ভাবনার কী আছে। কলকাতা শহর, হয়তো দোকানে বাজারে ঘুরছে।'

মিহির তক্তাপোশে বসতে যাচ্ছিল। মলিনাদেবী বললেন, 'ওখানে বসছ কেন বাবা। সোফায় বোসো।'

সুনীলদের সোফাটা তখনও সেই ঘরে ছিল। দু-দিন আগে এসে এখানেই সে বসেছিল। তাতেই আজও বসল। মলিনাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?'

'হ্যাঁ, ভালো আছে মাসিমা। আপনারা চলে আসার পর আমাদের বাড়ি যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। ভারী খারাপ লাগছিল আজ ভোরবেলায় উঠে।'

'তা তো লাগবেই। আমাদেরও খারাপ লাগছিল।'

এবার মিহির অন্য প্রসঙ্গে আসবার সাহস পেল। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আপনাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

মলিনাদেবী বললেন, 'না, কোনও অসুবিধা হবে কেন? বাড়িতে প্রচুর জায়গা। হাত-পা মেলে এখানে থাকতে পারছি।'

এমন সময় বিজয় এসে উপস্থিত হল। অনেক কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসেছে। কিছু এনেছে নিজের হাতে আর কিছু এনেছে কুলির মাথায়। এসেই মিহিরকে দেখে হই হই করে উঠল। বলল, 'তোদের বাড়িতে গেছলাম। তোকে না পেয়ে তোর মায়ের কাছে বলে এসেছি আমাদের এখানে অতি অবশ্য আসতে।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কী এমন জরুরি ব্যাপার?'

'নিশ্চয় জরুরি। এখন নয়, পরে বলব।'

মিহিরের বুক ধুকপুক করতে লাগল। নানা সন্দেহ তার মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। কথাটা শুনতেও ভরসা হচ্ছিল না, আবার না শুনেও কেমন অস্বস্তি লাগছিল।

বিজয় কুলির মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে কুলিকে বিদায় করে দিল। হাত-পা ধুয়ে এসে বসল মিহিরের পাশে।

চা খেতে খেতে অনেক গল্প গুজব হল। মিহিরের কিন্তু জরুরি কথাটি শোনবার জন্য ভয়ানক কৌতূহল। কিন্তু বিজয়ের বলবার কোনও আগ্রহ নেই।

মিহির ভাবল, এবার না উঠলে বিজয় জরুরি কথাটি বলবে না। তাই বলল, 'এবার উঠি মাসিমা, আসি বিজয়।'

বিজয় বললে, 'সে কী রে, উঠবি কেন?'

'বাঃ, বাড়ি যাব না?'

'না, আজকে যেতে হবে না, এখানেই থাকবি।'

'মানে?'

'মানে আর কী? এখানেই আহার, এখানেই রাত্রিবাস।'

'তা হলেই তো সর্বনাশ!'

'বাঃ, কবিতার মতো বেশ মিল করে কথা বলছিস দেখছি।'

'তা হল বটে। ওদিকে আমার বাড়িতে যে খাবার নষ্ট হবে।'

'না, নষ্ট হবে না। আমি মাসিমাকে বলে এসেছি।'

'কিন্তু বাড়ি না ফিরলে যে সবাই চিন্তার করবে।'

'না, চিন্তা করবে না। সে কথাও বলে এসেছি।'

যা হোক মিহিরকে থাকতেই হল।

সন্ধ্যা হতেই মিহির লক্ষ করল, বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। ঝি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। হ্যারিকেনটাও সদ্য কেনা বলে মনে হয়।

ঘরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মিহির বলল, 'বাড়িতে ইলেকট্রিক অয়্যারিং রয়েছে দেখছি। লাইট নেই কেন?'

বিজয় বলল, 'মান্ধাতা আমলের ইলেকট্রিক অয়্যারিং, কবে কোন যুগে এ বাড়িতে লাইট জ্বলত, তা হয়তো ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়।'

মিহির বলল, 'কলকাতায় বাস করতে হলে লাইট অবশ্য দরকার। তোরা চেষ্টা করে এবার আনিয়ে নে।'

বিজয় বলল, 'তা অবশ্য চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে না। বাইরে তো আমরা ইলেকট্রিক লাইট ছাড়াই বাস করতাম।'

বৈদ্যুতিক আলোতে বাস করা অভ্যাস, তাই মিহিরের খুব ভালো লাগছিল না। তবু বিজয়ের অনুরোধ ও উপরোধে তাকে থাকতেই হল। খাওয়া-দাওয়া করতে করতে বাজল রাত প্রায় দশটা।

বাড়িতে দোতলার যে ঘরটা বন্ধ ছিল, সেই ঘরটার উপর মিহিরের আগ্রহ জেগে উঠল। বলল, 'আয়, তোতে-আমাতে ওই ঘরটায় শুয়ে রাত কাটাই।'

বিজয় বলল, 'না, ও ঘরটা বড্ড অপরিষ্কার। রাত্রিবেলায় পরিষ্কার করাও সম্ভব হবে না।'

মিহির বলল, 'যতটুকু পরিষ্কার করা যায় তাতেই চলবে। পরে না হয় ভালোভাবে পরিষ্কার করা যাবে।'

তাই করা হল। দোতলার ঘরটা খুলতেই বেরিয়ে এল একটা ভ্যাপসা গন্ধ। জানালাটা

খুলতেই ভাঙা ঘুলঘুলিটা দিয়ে কয়েকটা চামচিকে উড়ে পালাল। মোটামুটি ঝাড়ু দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খুলে রাখা হল ঘরটাকে। নীচে থেকে তক্তাপোশও উপরে তোলা হল।

এবার শোবার পালা। শুতে শুতে হয়ে গেল রাত প্রায় বারোটা। পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে। কানাগলিতে একেই বিশেষ কোনও লোকের যাতায়াত নেই, তার উপর এত রাত্রে জায়গাটাকে একটা পল্লিগ্রাম বলেই মনে হল।

এই অবস্থায় বাস করতে মিহির অভ্যস্ত নয়। কাজেই তার কাছে খুবই অস্বস্তি লাগল। তবু তার মনের কৌতূহল—বিজয়ের সেই জরুরি কথাটা শোনবার আগ্রহ তার মনকে ব্যাকুল করে তুলল।

অনেকক্ষণ কেটে যায় তবু বিজয় কিছু বলে না। তখন মিহির নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, সেই জরুরি কথাটা বললি না?'

বিজয় বলল, 'কোন জরুরি কথা?'

'ওই যে বলবি বলেছিলি।'

হো হো করে হেসে উঠল বিজয়। বলল, 'সেই জরুরি কথা বলতে কি এখনও বাকি আছে?'

বিস্মিতভাবে মিহির জিজ্ঞেস করল, 'কখন বলবি?'

'তোকে যে এখানে খেতে হবে, থাকতে হবে এটা কি জরুরি ব্যাপার নয়?'

বাতাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে মিহির বলল, 'ওঃ, এই ব্যাপার?'

কৌতূহল কাটল কিন্তু অস্বস্তি গেল না। শোবার পর কত রকম ভাবনা তার মনে আসতে লাগল। সুনীলরা তিন রাত্রির বেশি এই বাড়িতে থাকতে পারলে না কেন? এদের তো আজ নিয়ে তিন রাত্রি কাটবে। এরা কি থাকতে পারবে এই বাড়িতে? যদি থাকতে পারে তবে তো ভালোই। কিন্তু না থাকতে পারলেই আবার ঝামেলা দেখা দেবে।

হঠাৎ ঘরের পেছন দিকে কী যেন একটা শব্দ শোনা গেল। লোকের পায়ের শব্দ কি?

তাহলে কি এ বাড়ির কেউ এখনও জেগে আছে?

কিন্তু এত রাত্রে কারুর জেগে থাকার তো কথা নয়?

মিহির ধীরে ধীরে ডাকল, 'বিজয়—বিজয়!'

বিজয়ের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

মিহিরের সন্দেহ হল। এত তাড়াতাড়ি বিজয় ঘুমিয়ে পড়ল! কিন্তু নানা ভাবনায় যে অনেকক্ষণ কেটে গেছে তা হয়তো খেয়াল নেই। তাই আবার ডাকল, 'বিজয়—বিজয়!'

এবারও সাড়া পাওয়া গেল না। বরং মৃদু নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

ওদিক থেকে কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল। আবার সেই পায়ের শব্দ।

সুনীলের মায়ের কথা মিহিরের মনে জাগতে লাগল। ধরিত্রীদেবী বলেছিলেন, কী যেন

কখনও সামনে কখনও পেছনে চলে বেড়ায়, কিন্তু চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। একি সেই আত্মা?

কিন্তু বিজয়রা কেউ এর সন্ধান পায়নি কেন? বিজয় তো বেশ নির্বিবাদে ঘুমোচ্ছে! এ বাড়ির অন্যান্য সকলেই বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বেলায় এমন হল কেন?

আবার সেই শব্দ। কয়েকবার শব্দ হওয়ার পর যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

এবার ঘুমোতে চেষ্টা করল মিহির। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না। নানারকম ভাবনা যেন তার মাথায় ঘুরতে লাগল।

বুড়ি তো এ বাড়িতে আছে অনেকদিন। তার কোনও ভয়-ভাবনা নেই কেন? বুড়ি কি এই ব্যাপারটা জানে? জানলেও সে ভয় পায় না কেন?

আবার সেই শব্দটা শোনা যায় কি না সেজন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল মিহির। ...না, শব্দটা আর শোনা গেল না।

এরও বেশ কিছুক্ষণ পর মিহির ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব ভোরেই মিহিরের ঘুম ভেঙে গেল। এত দেরি করে ঘুমোবার পরও ঘুম ভাঙতে দেরি হল না। অবশ্য মলিনাদেবী ও অন্যান্যরা অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছেন। কেবল বিজয়ই তখনও ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু নাক ডাকারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে চায়ের ডাক শুনেই কিন্তু বিজয় জেগে উঠল। মলিনাদেবী বললেন, 'ওর ঘুমটাই ওরকম। চ্যাঁচামেচি করলেও উঠবে না। কিন্তু চায়ের পেয়ালার টুং টাং আওয়াজ শুনেই জেগে উঠবে।'

মিহির হেসে বলল, 'এ-ও এক ধরনের কুম্ভকর্ণ। ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের কিন্তু চায়ের পেয়ালার শব্দে ঘুম ভাঙত না।'

মনে মনে ভাবল, ভূতের পায়ের শব্দেও হয়তো বিজয়ের ঘুম ভাঙবে না। যাক, তবু বাঁচোয়া।

কিন্তু শুধু বিজয়কেই যে সেই অশরীরী আত্মা আক্রমণ করবে তার নিশ্চয়তা কী? বাড়ির অন্যান্য লোকের ঘুম তো আর বিজয়ের মতো নয়। তবে?

চা খেয়েই বিদায় নিল মিহির। তাকে বাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে কাজে বেরুতে হবে। কিন্তু মন তার বিষণ্ণ—চিন্তায় ভরাক্রান্ত। এই বাড়ির রহস্যটা কী?

মিহির বাড়ি ফিরে ভাবতে লাগল—ওই ভূতুড়ে বাড়িতে মাসিমারা থাকতে পারবে কি? যদি না থাকতে পারে তবে আবার বাড়ি খুঁজতে হবে তাদের জন্য।

কিন্তু ওই ভুতুড়ে বাড়ির রহস্যটা কী? বর্তমান যুগে ভূতকে বিশ্বাস করাও অন্যায়। অথচ ভূতকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। বিশেষ করে কাল রাত্রের ঘটনায় মনে একটা সন্দেহও জেগেছে।

সারাদিন একটা অস্বস্তির ভিতর দিয়ে মিহির দিন কাটাল। সন্ধ্যা হতে না হতেই ভাবল,

আজ ওই বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাব কি? তা হলে রহস্যের একটা কিনারাও হয়তো হতে পারে।

যাই যাই করেও যাওয়া হল না। নানা চিন্তার মধ্য দিয়ে রাতটাও কেটে গেল।

॥ পাঁচ ॥

পায়ের শব্দ?

পরদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যথারীতি হাত-মুখ ধুয়ে মিহির চা খেতে বসেছে এমন সময় হঠাৎ বিজয় এসে উপস্থিত। তাকে দেখে মিহির চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'আরে বিজয় যে! এই সক্কালবেলা কী ব্যাপার?'

বিজয়ের মুখ গম্ভীর, দেখে মনে হল কোনও চিন্তায় তার মন ভরাক্রান্ত। তা দেখে মিহিরও চিন্তিত হয়ে পড়ল। জবাবের আশায় তাকিয়ে রইল বিজয়ের মুখে দিকে।

বিজয় বলল, 'ব্যাপার একটু গুরুতর। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। চল এসব কথা বাড়ি বসে হবে না, অন্য কোথাও যাই।'

মিহির বলল, 'তুই বড়ো বেরসিক রে! বোস, আগে চা-টা খা, তারপর অন্য কথা। এই বলেই মিহির চিৎকার করে বাড়ির ভিতরের উদ্দেশে ডাকল, 'মা, বিজয় এসেছে। আর এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক কাপ চা ও সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে মিহিরের মা সুনীতিদেবী নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বিজয়, কেমন আছ?'

বিজয় মুখে একটু কৃত্রিম হাসি ফুটাবার চেষ্টা করে বলল, 'এই মাসিমা চলে যাচ্ছে—'

'বাড়ির সবাই ভালো তো?'

'হ্যাঁ, ভালো।'

'বাড়িটা কেমন, পছন্দ হয়েছে তো?'

'হয়েছে বই কি। আপনি তো গেলেন না—' কথাটা শেষ করতে গিয়েও বিজয়ের মুখে আটকে গেল।

সুনীতিদেবী সেই অসমাপ্ত কথার জের টেনেই বললেন, 'ভাবছিলাম, একদিন গিয়ে তোমাদের বাড়িটা দেখে আসব। সময় করতে পারছি না। তোমার সঙ্গেই পরে একদিন যাব।'

বিজয় বলল, 'তা বেশ, যাবেন বই কি। আমিই এসে একদিন নিয়ে যাব।'

'বেশ, তাই হবে। এখন যাই বাবা, রান্নাঘরে অনেক কাজ রয়েছে।' সুনীতিদেবী চলে গেলেন।

মিহির ও বিজয় বসে চা খেতে লাগল। খাওয়া শেষ না হওয়া অবধি কেউ কোনও কথা বলল না। ঘরের আবহাওয়াটাও যেন ভারী হয়ে উঠল।

চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর বিজয় বলল, 'চল, বাইরে কোনও রকে বা পার্কে গিয়ে বসি। এখানে ওসব কথা নিয়ে আলোচনা ঠিক করা হবে না।'

মিহির অনুমান করতে পারল, কী আলোচনা বিজয় করতে চায়। তবু না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করল, 'এমন কী আলোচনা রে?'

বিজয় বলল, 'আলোচনাটা একটু গুরুতর। বাড়িতে মেয়েরা রয়েছে, তাদের মনে নানা সন্দেহ জাগতে পারে।'

মিহিরের মনে কিন্তু কোনও সন্দেহ রইল না। পরিষ্কার বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই কাল রাত্রে ওই বাড়িতে কোনও ভূতুড়ে কাণ্ড হয়েছে, যার জন্য ছুটে এসেছে বিজয়। তাই বলল, 'বেশ, তা হলে চল কোনও নিরিবিল জায়গায় গিয়ে বসি।'

কিছুদূর গিয়ে ছোট্ট একফালি পার্ক। সেখানে একটা ভাঙা বেঞ্চির পাশে দুজন বসল। মিহির বলল, 'কাল তুই চলে আসবার কিছুক্ষণ পরেই আমি বাজারে যাবার জন্য বের হলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় একটি লোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি দূর থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বলল, 'মশাই, আপনি বুঝি ১৪।৪।১-বি বাড়িটায় থাকেন?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

লোকটি বলল, 'ওটা তো হানাবাড়ি'।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'হানাবাড়ি! বলছেন কী মশাই?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, যে আসে সে তো তিন-চার দিনের বেশি থাকতে পারে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? কে এসে হানা দেয়?'

লোকটি বলল, 'তা আর বুঝতে পারছেন না? ও বাড়িতে যারা থাকবে তারাই ওর খপ্পরে পড়বে। পরিবারের লোকের মঙ্গল চান তো ভালোয় ভালোয় কোথাও উঠে যান।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'তুই লোকটাকে কী বললি?'

বিজয় বলল, 'আমি আর কী বলব? কথা শুনে তো আমার হৃৎকম্প হতে লাগল।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'সেই লোকটার চেহারা কেমন?'

বিজয় বলল, 'একটু রোগা, গালচাপা ভাঙা, পরনের কাপড়-জামা আধময়লা।'

মিহির উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'তাহলে এটা নিশ্চয় ভজহরি, বাড়ির দালাল। তোকে ভয় দেখাবার জন্য এসেছিল।'

বিজয় জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ভয় দেখাবে কেন?'

মিহির বলল, 'তোরা বাড়ী ছেড়ে গেলে অন্য ভাড়াটের কাছ থেকে সে সেলামি নেবে। লোকটা ভারি বজ্জাত। ওর কথা বিশ্বাস করিসনি।'

বিজয় বলল, 'বিশ্বাস আমি প্রথমে করিনি। কিন্তু তারপর রাত্রে যা ঘটনা ঘটল তাতে অবিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ তো দেখছি না।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রে কী ঘটনা ঘটল আবার?'

বিজয় বলল, 'জানিস বোধহয় আমার ঘুম গাঢ়! কুম্ভকর্ণের নিদ্রাও বলতে পারিস। রাত্রে নাকি ঘরের পিছনের দিকে কী ঘোরাঘুরি করে। তার পায়ের শব্দ শোনা যায়।'

'তুই শুনেছিস?'

'আমি কী করে শুনব? বললাম তো আমার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।'

'তবে কে শুনেছে?'

'মা শুনেছেন। তিনি নাকি প্রথম দিনও শুনেছিলেন। অত খেয়াল করেননি। কালকে শুনেই চুপি চুপি দরজা খুলে বেরিয়েছিলেন।'

'তারপর? উনি দেখিলেন?'

'না। দেখলেন না। শব্দ থেমে গেল। আবার এসে ঘরে শুলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার শব্দ। আবার বেরিয়ে এসে দেখেন—কিছু নেই। বড়ো রহস্যজনক আর ভয়ের ব্যাপার। মা মনে হয় বেশ ভয় পেয়েছেন।'

'ভজহরি কাল সকালে তোকে যা বলেছিল, সে কথা তোর মাকে বলেছিস নাকি?'

'না, সেকথা বললে তো মা আজই বাড়ি ছাড়বার জন্য পাগল হয়ে যেতেন। এখন কী করি বল তো?'

মিহিরের মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হল না। কী জবাব দেবে সে?

অনেকক্ষণ পর মিহির একটা সাময়িক সমাধান খুঁজে পেল।

বলল, 'আজ আমি তোদের বাড়িতে গিয়ে রাত্রিবেলায় থাকব। নিজে ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে চাই। তারপর একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

বিজয় বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে। তবে আজ থেকেই অন্য একটা বাড়ির খোঁজ করতে হবে। কারণ, বুঝতেই পারা যাচ্ছে ওই বাড়িতে থাকা চলবে না।'

মিহির বলল, 'কিন্তু জানিস, কলকাতায় বাড়ির কী সমস্যা। মাথা কুটেও বাড়ি পাওয়া যায় না।'

বিজয় বলল, 'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু তাই বলে ভূতুড়ে বাড়িতে থাকা—'

মিহির বলল, 'দরকার হলে ভূত তাড়িয়ে নিজেরা বাস করব।'

বিজয় আঁতকে উঠে বলল, 'সর্বনাশ! কী যে বলিস।'

'হ্যাঁ, সত্য কথাই বলছি। আজকে তোকে একটা কাজ করতে হবে। দোতলার ঘরটা আরও ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।'

'কেন? ওই ঘরেই আজ শুবি নাকি?'

'হ্যাঁ, সেই ঘরেই আজ রাত্রে শোব।'

'সর্বনাশ, আমাকেও শুতে হবে।'

'কেন, ভয় পাচ্ছিস বুঝি?'

বিজয় কোনও জবাব দিল না।

মিহির বলল, 'বেশ, আমাকে একা একা ঘরে শুইয়ে রেখে যদি তুই খুশি হোস তবে তাই করিস।'

'না তা নয়, তোকে একা রেখে আমি কি ঘুমোতে পারি? বেশ আমি আজই লোকজন নিয়ে ভালোভাবে ঘরটা পরিষ্কার করব।'

মিহির বলল, 'আচ্ছা এখন যা, সন্ধ্যার পর তো আমি যাচ্ছি।'

বিজয় বলল, 'নিশ্চয় কিন্তু যাবি। মনে থাকে যেন।'

'থাকবে, থাকবে।'

সন্ধ্যার অনেক পরে মিহির বিজয়দের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। দেরি দেখে বিজয় একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল। ছোটোখাটো নানা ঘটনা ঘটার পর থেকে বিজয় যেন নিজেকে একটু অসহায় বলেই মনে করছে।

মিহিরকে দেখে বিজয় একটু যেন নিশ্চিন্ত হল।

মিহির জিজ্ঞেস করল, ঘরটা পরিষ্কার করে রেখেছিস তো?

'হ্যাঁ।'

কোনও আলোচনাই তারা আর করল না। শুধু বিজয়কে এক সময় বলল, 'তোর টর্চলাইট আছে? একটা বেশ জোরালো টর্চলাইট চাই।'

বিজয় বলল, 'খুব জোরালো নেই, তবে একটা টর্চলাইট আছে।'

মিহির বলল, 'বেশ, তাতেই কোনওরকমে হবে। শোবার সময় আমার বালিশের কাছে রেখে দিবি।'

বিজয় জিজ্ঞেস করল, 'টর্চলাইট দিয়ে ভূতকে ফলো করবি নাকি?'

মিহির জবাব দিল, 'দরকার হলে করব।'

বিজয় বলল, 'সর্বনাশ, ওসবের মধ্যে কিন্তু আমাকে টানবি না।'

মিহির হেসে উঠল। তাকিয়ে দেখলে ঘরে কেউ নেই। তাই বলল, 'এই সাহস নিয়ে ভূতের বাড়িতে বাস করিস?'

বিজয় বলল, 'সত্যি যদি ভূতের বাড়ি হয় তা হলে কিন্তু আমি নাচার। পালাবার পথ পাব না।'

মিহির বলল, 'আমি একাই না হয় ভূতের সঙ্গে লড়ব। আমার সেই সাহস আছে।'

বিজয় এবার মনে একটু ভরসা পেল।

খাওয়াদাওয়ার আগেই মিহির বিজয়কে নিয়ে পরিষ্কার করা ঘরটি দেখে এল।

বিজয় বলল, কী নোংরা যে ঘরটা হয়েছিল তা আর কী বলব। এক মন ধুলো বেরিয়েছে আর বেরিয়েছে শ-খানেক আরশোলা। তা ছাড়া পাখির পালক আর ভাঙাচোরা জিনিস যে কত বেরিয়েছে!'

মিহির বলল, 'এটা দম বন্ধ করা ঘর। কালকেই তা বুঝতে পেরেছি। দরজা-জানালাগুলো খুলে রাখ। আর একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখ ঘরের মধ্যে। তা হলে ঘরের বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধটা চলে যাবে।'

বিজয় তাই করল।

খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমোবার পালা। নীচের ঘরের তক্তপোশটা কালকেই সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার ওপরেই বিছানা করা হল।

শোবার সময় হতেই যেন বিজয়ের মনটা কেমন করতে লাগল। আজ কী অঘটন ঘটবে কে জানে।

মিহির ব্যঙ্গ করে বলল, 'কী রে, আমাকে কি একাই এই ঘরে ঘুমোতে হবে না, তুইও থাকবি?'

বিজয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'না, একা ঘুমোবি কেন, আমি তো সঙ্গেই আছি।'

'সে কথা মনে থাকে যেন। রাত্রিবেলায় উঠে আবার পালিয়ে যাবি না তো?'

'না হে না, অত ভিতু আর বিশ্বাসঘাতক আমাকে মনে কোরো না।'

দুজনেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিজয় বলল, 'বাতিটা জ্বালানোই থাক, বরং একটু ডিম করে দিই।'

মিহিরের আবার ঘরে আলো থাকলে ঘুম আসে না। তবু সে কোনও আপত্তি করল না। বিজয়ের অবস্থার কথা বিবেচনা করেই সে একটু কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনের চোখে কোনও ঘুম নেই, তারপর কখন যে ঘুম এল কেউ হয়তো জানে না।

মিহিরের ঘুম আগে ভাঙল। তার চোখের ঘুম একটু পাতলা। কিন্তু জেগেই দেখল ঘরে আলো নেই। কখন নিভে গেছে কে জানে।

ঘুম ভাঙল তার একটা শব্দ শুনেই।

মনে হল ঘরে যেন কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিহির পাশে হাত বুলিয়ে দেখল—বিজয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার পাশে শুয়ে। তা হলে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে?

মিহির টর্চটা জ্বালল। কিন্তু ঘরে কেউ নেই তো। ঘর ফাঁকা।

তাহলে কীসের শব্দ?

নিশ্চয় সেই অশরীরী প্রেতাত্মা।

টর্চটা নিভিয়ে মিহির আবার শুয়ে পড়ল। বিজয়কে ডাকল না। ডাকলে হয়তো সে ভয় পাবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।

এবার কিন্তু সহজে ঘুম এল না মিহিরের।

সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ সমস্ত পল্লি। একটা রাত-জাগা পাখির ডাকও পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

সময়ের পর সময় যেন নিঃশব্দে পা ফেলে চলতে লাগল।

আবার পায়ের শব্দ—আরও জোরে—আরও কাছে।

মিহির সহসা টর্চটা জ্বালল না। অন্ধকারেই পায়ের শব্দটা অনুমান করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একটা দড়াম করে শব্দ ঘরের মধ্যে যেন কিছু একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মিহির ধড়মড় করে উঠে পড়ল বিছানার ওপর। টর্চটা জ্বালাল। ওদিকে তক্তাপোষের ওপর একটা প্রবল ঝাঁকানিতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙে উঠে পড়ল বিজয়।

মিহিরের পাশে বসে বিজয় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে?'

মিহির টর্চের আলো ঘরের চারদিকে ফেলতে লাগল। তারপর ফেলতে লাগল মেঝের ওপর। কিছুক্ষণ পর তক্তাপোষের কাছেই মেঝের এক জায়গায় টর্চের আলোটা স্থির হয়ে পড়ল।

মিহির বলল, 'ওই দেখ।'

বিজয় কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘরের চুনবালির আস্তর খসে পড়েছে রে। আর কিছু পড়েনি তো?'

'বোধহয়, না।'

বিজয়ের চোখে ঘুম ছড়িয়ে এসেছিল। বলল, 'এখন আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি কি?

মিহির বলল, 'হ্যাঁ, তুই আরামে নিদ্রা যেতে পারিস।'

পরদিন ভোরে উঠে মিহির বলল, 'ওপর থেকে চুনবালির ওই বিরাট চাপড়াটা আমাদের গায়েও পড়তে পারত।'

বিজয় বলল, 'পড়তে পারত বই কি! বাড়িটা ভয়ানক পুরোনো। তা ছাড়া এই ঘরটা যেন আরও জরাজীর্ণ।'

মিহির বলল, 'এই ঘরটা তো আর আগে তৈরি হয়নি। বাড়ির সঙ্গেই এক সময়ে তৈরি হয়েছে।'

বিজয় বলল, 'এই ঘরটা সব সময় বন্ধ থাকে কিনা, তাই এই দশা। বাড়িটা একটু রিপেয়ার করে চুনকাম করা দরকার। তারপর একটু থেমে মিহিরকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু দেখেছিস নাকি? না ওই শব্দ শুনেই জেগে উঠেছিস?'

মিহির বলল, 'পরে সে কথা বলব। তবে কালকেই গোটা বাড়িটা ভালো করে চুনকাম করে ফেল।'

বিজয় বলল, 'দুটো ঘর তো হোয়াইটওয়াস করাই আছে। শুধু এই ঘরটা আর বারান্দার দিকটা করলেই চলবে।'

মিহির বলল, 'ওটা তো দায়-সারা গোছের হোয়াইট-ওয়াস করা। এ বাড়িতে থাকতে হলে ভালো করে করতে হবে।'

বিজয় বলল, 'যদি থাকি তবে তো? তা না হলে এত খাটুনির দরকার কী?'

মিহির বলল, 'এই বাড়িতেই থাকতে হবে। ভাবনার কিছু নেই। ভূতকে তাড়াতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না।'

বিজয় বলল, 'তা হলে রাজমিস্ত্রিকে খবর দিই। রঙের দোকানে খবর দিলেই লোক চলে আসবে।'

মিহির বলল, 'শুভস্য শীঘ্রং। আজকেই ব্যবস্থা কর।'

বিজয় তখনই বাজার করতে গিয়ে রঙের দোকানে খবর নিয়ে এল। দু-তিন জন রাজমিস্ত্রি তাদের যন্ত্রপাতি ও মালমশলা নিয়ে হাজির হল। ভোরবেলা বিজয় ও মিহির ঘর থেকে বেরোবার সময় দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। রাজমিস্ত্রিরা এসে ঘর খুলল। খুলেই বলল—'এ কী! ঘরটা এমন কেন? ময়লা আবর্জনা আর জঞ্জালে ভরতি!'

রাজমিস্ত্রিদের কথা শুনে বিজয় বলল, 'তোমরা এ কী বলছ? ঘরে জঞ্জাল আসবে কোত্থেকে?'

রাজমিস্ত্রিরা বলল, 'আমরা কি মিথ্যে কথা বলছি বাবু? আপনারা নিজের চোখেই এসে দেখুন না।'

বিজয় আর মিহির তো অবাক। কালকের পরিষ্কার করা ঘর আজকেই এত নোংরা কী করে হল? এক ঘণ্টা আগেও তো পরিষ্কার ছিল।

তবে?

॥ ছয় ॥

অদৃশ্য শক্তি

বিজয় আশ্চর্য হয়ে গেল ঘরের ব্যাপার দেখে। ঘরে কোনও জনপ্রাণী ঢোকেনি, কোনও পাখি ঢুকবার জায়গা নেই, তবু এমন অবস্থা কেন হল? নিশ্চয়ই অদৃশ্য কোনও কিছুর কাণ্ডকারখানা।

মিহির ভেবেছিল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে যাবে, কিন্তু তার যাওয়া হল না। ভাবল, আজ অফিস কামাই দিয়ে এখানেই থাকবে। প্রয়োজন হলে রাত্রেও থাকবে এখানে।

তার মনের ভেতর যেসব সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল, সে সম্বন্ধে বিজয়কে সে কিছুই বলল না। রাজমিস্ত্রিদের বলল,—'তোমরা কাজে লেগে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।'

রাজমিস্ত্রিরা ভেবেছিল চুনকাম করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখল বালিসিমেন্টের কাজও রয়েছে প্রচুর। তাই বালি সিমেন্টের ফর্দ দিয়ে তারা কাজে লেগে গেল।

বিজয় চলে গেল বালি সিমেন্ট আনতে। রাজমিস্ত্রিরা কর্নিক ও হাতুড়ি দিয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া ঘরের দেওয়াল ও ছাদের আস্তরণগুলো খসাতে লাগল।

কুলির মাথায় করে বিজয় সিমেন্ট ও বালি নিয়ে এল বেশ কিছুক্ষণ পরে। মিহির তখন রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখাশোনা করছে।

ঘরটা অন্ধকার। দিনের বেলায়ও বাতি জ্বালবার দরকার হয়। তবু রাজমিস্ত্রি দুজন কাজ করতে লাগল। এরকমভাবে কাজ করা তাদের অভ্যাস আছে।

বিজয় ফিরতেই রাজমিস্ত্রিরা বলল,—'বাবু এত কাজ এক দিনে করা সম্ভব হবে না। অন্তত তিন দিন লাগবে।'

বিজয় বলল—'তিন দিন? এ কী কথা বলছ তোমরা? এতদিন লাগবে কেন?'

রাজমিস্ত্রি বলল—'হ্যাঁ বাবু, যেদিক দিয়ে ধরছি, সেদিক দিয়েই খসে পড়েছে। যদি বলেন তো কাজ ধরি, না হয় এখানেই ক্ষান্ত দিই।'

বিজয় মিহিরকে জিজ্ঞেস করল,—'কী রে, কী করব?'

মিহির বলল,—'কাজ যখন শুরু করেছিস তখন শেষ করেই নে। আধখানা করে লাভ কী?'

রাজমিস্ত্রিরা আবার কাজে লেগে গেল।

দুপুরবেলা মিহিরের আহারের ব্যবস্থা হল বিজয়দের বাড়িতেই। স্নান করে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার তারা গেল রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখতে। তখন রাজমিস্ত্রিরা ঘরের উপরের ছাতের দিকটার কাজ অর্ধেকও করে উঠতে পারেনি।

মিহির বলল—'এ কী, তোমরা এতক্ষণে অর্ধেকটাও করতে পারোনি?'

রাজমিস্ত্রিরা বলল—'কী করে করব বাবু, আপনাদের বাড়ির লোকেরাই তো কাজ করতে দেয় না।'

বিজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—'কাজ করতে দেয় না মানে? আমাদের বাড়ির কে তোমাদের কাজে বাধা দেয়?'

একজন রাজমিস্ত্রি বলল—'আপনাদের বাড়ির সবাইকে কি আমরা চিনি বাবু? আর কাজ ফেলে এত চোখে চোখে রাখবার সময় কি আমাদের আছে?'

বিজয় এই কথার কোনও অর্থ বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল—'তোমরা কী বলতে চাও ভালো করে বলো।'

রাজমিস্ত্রি বলল—'—বাবু, আমরা বাঁশের আড়ায় বসে কাজ করি। কেউ যদি বারবার ঝাঁকায় তাহলে কি কাজ করা যায়?'

সে কথা শুনে বিজয় এবং মিহির দুজনেই অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—'কে তোমাদের আড়ায় এসে ধাক্কা মারে? আমাদের বাড়িতে তো সে-রকম ছেলে বা কোনও লোক কেউ নেই।'

রাজমিস্ত্রিরা বলল—'সে কী কথা কর্তা! আমরা তো আপনাদের বাড়ির লোক বলেই কিছু বলিনি। শুধু দু-এক বার ধমক দিয়েছি মাত্র।

বিজয় জিজ্ঞেস করল—'সেই লোককে তোমরা নিজের চোখে দেখেছ?'

রাজমিস্ত্রি বলল—'অত কি তাকিয়ে দেখবার সময় আছে কর্তা! আমরা ধমক দিতেই বা তাকাতেই ছুটে পালিয়ে যায়। শুধু ছায়াটাই দেখেছি।'

সে কথা শুনে বিজয় এবং মিহির দুজনের মনেই রোমাঞ্চ জেগে ওঠে। তারা মনে মনে ভাবতে লাগল অনেক কিছু। কিন্তু রাজমিস্ত্রিদের কিছু বুঝতে না দিয়েই বলল—'বেশ তোমরা কাজ করে যাও, আমরা এখন এখানেই আছি।'

মিস্ত্রিরা কাজ করতে লাগল। বিজয় আর মিহির বসে বসে তাদের কাজ দেখতে লাগল কিন্তু কতক্ষণ একভাবে বসে থাকা যায়! ঝিমুনি এল দুজনেরই।

ঠিক সেই সময়েই ঘটে গেল এক অভাবনীয় ব্যাপার। হুড়মুড় করে শব্দ হল, আর সঙ্গে দুজন রাজমিস্ত্রিই বাঁশের আড়া থেকে পড়ে গেল নীচে।

চোখ মেলে বিজয় আর মিহির দেখল, রাজমিস্ত্রি দুজন মাটিতে পড়ে ছটফট করছে।

কী হল? কী হল? বাড়ির অন্যান্য লোক ছুটে এল। মিহির আর বিজয় দুজনেই হতভম্ব। এমন একটি ব্যাপারে যে কী করে ঘটল তা তাদের কল্পনাতেই আসে না।

রাজমিস্ত্রি দুজন খুব আঘাত পায়নি। চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে ও প্রাথমিক চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলা হল।

বিজয় বলল—'থাক, আজ তোমাদের আর কাজ করতে হবে না। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো। কাল সকালে আবার এসো।'

রাজমিস্ত্রি দুজনের শরীর তখনও কাঁপছে। তারা বলল—'না কর্তা, আমরা আর কাজ করতে পারব না। আমাদের মজুরি চুকিয়ে বিদায় করে দিন।'

মিহির জিজ্ঞেস করল—'সে কী, তোমরা কাজ করবে না কেন?'

কাঁদোকাঁদো স্বরে রাজমিস্ত্রিরা বলল—'এমনভাবে কি কাজ করা যায় বাবু? আপনারা ঘরে রয়েছেন তবু আমাদের কেমন করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।'

'ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল? কারা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মিহির ও বিজয়।

'সে কি আমরা দেখেছি? আপনারা নীচে বসেছিলেন, আপনারাই তো দেখেছেন। এমনভাবে আমরা কাজ করতে পারব না। শেষে একটা খুন-খারাপি হয়ে যাবে। আমাদের পয়সা মিটিয়ে দিন বাবু, আমরা চলে যাই। অন্য লোক এনে কাজ করান।'

কাজ যখন কিছুতেই করবে না তখন আর কীভাবে তাদের রাখা যায়? বিজয় হিসাব করে তাদের মজুরি মিটিয়ে দিল। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—এর পেছনে কী রহস্য আছে? কী রহস্যই বা থাকতে পারে!

মিহির সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যে ঘরে রাজমিস্ত্রিরা কাজকর্ম করছিল সেই ঘর চুনসুরকিতে ভরতি। কাজেই রাত্রে স্থানাভাব ঘটবে, এই

অজুহাতে মিহির বাড়ি চলে যেতে চাইল। বিজয় বলল—'না, আজ রাতটা তুই থেকে যা। মনে হয় আজ অনেক কিছু ব্যাপার ঘটবে।'

মিহির জিজ্ঞেস করল—'কী করে বুঝলে?'

বিজয় বলল—'দিনের বেলাতেই যখন এমন উৎপাত তখন রাতের বেলা যে কী করবে কে জানে। আমার কী মনে হয় জানিস?'

—'কী মনে হয়?'

'মনে হয় ওদের আস্তানায় আমরা হানা দিয়েছি বলেই ওরা খেপে উঠেছে।'

মিহির কোনও জবাব দিল না। চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল।

বিজয় বলল—'কাজেই আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। এখন যে কোনওরকম আক্রমণ আসতে পারে। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

সেদিন রাত্রিটা বিজয়ের খুব ভয়ে ভয়েই কাটল। তার সব সময়েই মনে হতে লাগল, ভূতের আস্তানায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলেই তারা খেপে উঠেছে।

তবু যে ভয় সে করেছিল, সে রকম ভয়ের কিছু ব্যাপার রাত্রিবেলায় ঘটল না।

খুব ভোরেই বিজয়ের ঘুম ভেঙে গেল। তখন বাড়ির ঝি ছাড়া কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি।

ঘুম থেকে ওঠার পরই কিন্তু গা-টা ছম ছম করতে লাগল বিজয়ের। তার কেন জানি মনে হতে লাগল বাড়িতে কী যেন একটা ঘটেছে। প্রথমেই সে গেল সেই ঘরে—যে ঘরে কাল রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছিল।

দরজাটা কাল রাত্রে বন্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু গিয়ে দেখল দরজার দুটি পাটই হাঁ করে খোলা।

বিজয় তা দেখে অবাক হয়ে গেল। ঝিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি এই ঘরের দরজা খুলেছ?'

ঝি অবাক হয়ে বলল—'আমি দরজা খুলব কেন? ও ঘরে আমার কি কোনও কাজ আছে?'

বিজয় বিস্মত হয়ে ভাবল, তা হলে এই ঘরের দরজা খুলল কে?

ঘরে ঢুকে বিজয়ের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কাল যে ঘরের উপরের দিকটা বালি ও সিমেন্ট দিয়ে আস্তর করা হয়েছিল আজ তা সব ঝরে পড়ে গেছে। মনে হয় কে যেন খামচিয়ে ওগুলো ফেলে দিয়েছে। এখানে ওখানে এবড়ো-থেবড়ো দাগ।

বিজয়ের মনে কোনও সন্দেহ রইল না। এখানে নিশ্চয়ই অশরীরী প্রেতাত্মার আস্তানা রয়েছে।

নাঃ, এ বাড়িতে কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।

হঠাৎ বুড়ির কথা তার মনে হল। একা এই বাড়িতে কীভাবে সে থাকে? তার কি কোনও ভয়-ডর নেই? বাড়িতে এমন উপদ্রব হয় সে কী করে তা সহ্য করে? তার উপর কি কোনও উপদ্রব হয় না?

বিজয় ঠিক করল, এই সব কথা বুড়িকে গিয়ে জানাবে। তাই সে বুড়ির ঘরের দিকে চলল।

বুড়ির ঘরের দরজাও খোলা। দরজার সামনে পা দিয়েই সে চমকে উঠল। ভাবল চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু মুখের ভাষাও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে বুড়ির আড়ষ্ট দেহ।

সে কি মরে গেছে? না তার অন্য কিছু হয়েছে?

বিজয় এসে তার মাকে খবর দিল। মলিনাদেবী খবর শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। সঙ্গে ঝি-ও গেল। গিয়ে দেখলেন অস্বাভাবিক অবস্থায় মাটির উপর পড়ে আছে সেই বুড়ি। দু-চোখ তার খোলা। কটমট করে সে যেন সবার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখলেই ভয় হয়।

॥ সাত ॥

বুড়ির সৎকার

এই আত্মীয়হীনা বৃদ্ধাকে নিয়ে কী করবে তা ভেবে খুবই বিব্রত হয়ে পড়ল বিজয়। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভজহরি এসে উপস্থিত হল। বিজয় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ভজহরি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'ভূতেই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।'

সে কথা শুনে সবাই চমকে উঠল। মলিনাদেবী বলে উঠলেন, 'এটা কি ভূতের বাড়ি।'

যে সন্দেহ সবার মনে কয়েকদিন ধরে উঁকিঝুঁকি মারছিল সেটা যেন এক মুহূর্তেই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ঝি 'ও মাগো' বলে সেইখানেই মূর্ছা গেল। তাকে নিয়েই তখন বেধে গেল হুলস্থূল কাণ্ড।

ভজহরি বলল, 'আপনারা কিছু ভাববেন বা বাবু। আমি লোকজন এনে এর সৎকারের ব্যবস্থা করছি।'

ভজহরি চলে গিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই লোকজন জোগাড় করে ফিরে এল।

মিহির কাল চলে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হল। বুড়িকে দেখে ও সব কথা শুনে সে একেবারে হতভম্ব। তারপর যে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করেছিল সেই ঘরের অবস্থা দেখে তার মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুট হল না।

ভজহরির লোকজনেরা বুড়িকে বাইরে বের করে নিয়ে এল। ভজহরি তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। তারপর বুড়িকে বেঁধেছেঁদে শ্মশানে নিয়ে গেল। এই ঘটনার পর বাড়ির আবহাওয়টা যেন আরও ভারী হয়ে উঠল।

বিজয় মিহিরকে জিজ্ঞেস করল, কী রে তোর কী মনে হয়?'

মিহির বলল, 'মনে হয় তো অনেক কিছু, কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।'

বিজয় বলল, 'ভাবনাচিন্তার আর কিছু নেই, এই বাড়িতে আর থাকা চলবে না।'

এদিকে বাড়ির ঝি কেঁদেকেটে সারা। এই ভূতের বাড়িতে সে আর থাকবে না।

সত্যি সে আর রইল না।

বিজয় বলল, দেখলি ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছে শিগগির ব্যবস্থা না করলে আর উপায় নেই। তুই ব্যাপারটার মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছিস না।'

মিহির বলল, 'গুরুত্ব আমি খুবই দিচ্ছি অর্থাৎ এখন দিতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আর একটা দিন আমাকে সময় দে। কালকের মধ্যে হেস্তনেস্ত একটা করে ফেলব।'

বিজয় বলল, 'কিন্তু এখন এখানে একটা দিন যে একটা বছর বলে মনে হচ্ছে।'

মিহির বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনও ভাবনা নেই।'

বিজয় বলল, 'আজ কিন্তু তোকে এ বাড়িতে থাকতেই হবে। আমি একা থাকতে আর ভরসা পাচ্ছি না। আজ রাত্রে হয়তো বুড়িই ভূত হয়ে আমাদের গলা টিপে মারতে আসবে।'

মিহির হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ আমি থাকব।'

বিজয় একটু আশ্বস্ত হল। বলল, 'আজকের রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি। কোনও অঘটন না ঘটলেই হয়।'

সেদিন রাত্রে সত্যি কোনও অঘটন ঘটল না। রাতটা নিরুপদ্রবেই কেটে গেল।

মিহির পরদিন ভোরে উঠে হাসতে হাসতে বলল, 'তোর ভূতেরা টায়ার্ড হয়ে পড়েছে, তাই একটু রেস্ট নিচ্ছে।'

একটু পরেই ভজহরি এসে উপস্থিত হল। মিহির তাকে বলল, 'ওহে ভজহরি, তোমাদের বুড়ি তো অক্কা পেয়েছে। এখন বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করে দাও। ভাড়া কার কাছে দেব?'

ভজহরি বলল, 'আমার কাছে দিলেই হবে বাবু। কোনও গোলমাল হবে না।'

মিহির বলল, 'তা তো বুঝি। কিন্তু বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমাদের অন্য দরকার আছে।'

ভজহরি বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। বাড়িওয়ালার লোক তো কলকাতায় থাকে না। এসেছে কি না খোঁজ নিয়ে আসব। তারপর কাল না হয় দেখা করবেন।'

মিহির বলল, 'বেশ তাই হবে।'

ভজহরি বুড়ির ঘরে কাল তালা লাগিয়ে চাবি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। একটু পরে তালা খুলে ভেতরে গিয়ে অনেকক্ষণ কী যেন কাজকর্ম করল তারপর কয়েকটা পোঁটলা পুঁটুলি নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে চলে গেল।

ভজহরি চলে যাবার পর মিহির বিজয়কে বলল, লোকটা বাস্তুঘুঘু। বুড়ির জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে চলে গেল। তবে ব্যাপারটা বড়োই রহস্যজনক। বুড়ির তিনকুলে কেউ আছে

কি না তাও জানি না।'

বিজয় বলল, 'জেনেই বা কী হবে? আমরা যখন এই বাড়িতে থাকবই না, তখন ওর জাত-গোত্র জেনে লাভ কী?'

মিহির বলল, বাড়িওয়ালার কাছে গেলে বুড়ির অনেক রহস্য জানতে পারা যাবে, এমনকি বাড়ির রহস্যও কিছু বেরিয়ে পড়বে।'

বিজয় বলল, 'তাতে কী লাভ হবে?'

মিহির বলল, 'কয়েকদিনের মধ্যেই এই বাড়ির রহস্য আমি বের করে ফেলব। সেদিক দিয়ে আমি অনেকটা এগিয়েও গিয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ শিগগিরই দেখতে পাবি। মনে মনে আমি সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি।'

ভজহরি বড়ো সেয়ানা লোক। সে ভেবেছিল নিজেই ভাড়ার টাকাগুলো আত্মসাৎ করবে। বুড়ি মরে গেছে, এখন ভাবনা কী? তাই বলল, 'বাড়ির মালিককে তো পাওয়া যাবে না।'

কিন্তু মিহির বলল, 'দ্যাখো, বাড়ির মালিকের সঙ্গে আমাদের দেখা না করিয়ে দিলে আমরা বাড়িও ছাড়ব না, ভবিষ্যতে ভাড়াও দেব না।'

ভজহরি দেখল, ভারী তো মুশকিল হল। তাই বলল, 'আচ্ছা চলুন, দেখি যদি পাওয়া যায়।'

মিহির ও বিজয়কে নিয়ে ভজহরি বাড়িওয়ালার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। বাড়িওয়ালা নিঃসন্তান, তাঁর স্ত্রীও মারা গেছেন। তাই তিনি বাইরে থাকেন। তীর্থে তীর্থে ঘোরেন। বাড়িওয়ালার একজন কর্মচারী থাকেন সেই বাড়িতে, নাম রমেন্দ্রনাথ, বয়স পঞ্চাশের ওপরে।

মিহির বলল, 'দেখুন, বাড়িটা ভাড়া নিয়ে আমরা বড়ো অশান্তি ভোগ করছি। কলকাতা শহরে এত বড়ো একটা বাড়ি এমন অবস্থায় পড়ে আছে, আপনারা কোনও ব্যবস্থা করেন না কেন?'

রমেনবাবু বললেন, 'যার করা উচিত তার কোনও গরজ নেই, আমি কেন মিছিমিছি করতে যাব?'

বিজয় বলল, 'ভাড়া দিয়ে বেশ কিছু উপার্জন করাও তো যায়?'

রমেনবাবু বললেন, 'উপার্জন করার স্পৃহা বাড়িওয়ালার নেই। কোনও ভাড়াটে ও-বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারে না। আমি ছ-বছর ধরে দেখাশোনা করছি কিন্তু আমিও বিরক্ত হয়ে পড়েছি।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বাড়ির ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

রমেনবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যজনক। কাজেই আমি নিজের

গরজে কিছু করতে চাই না।'

মিহির কিছুক্ষণ কী ভেবে বলল, 'আচ্ছা, যদি অন্য বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আরও কিছুদিন থাকি, তা হলে ভাড়ার বিষয়ে কী ব্যবস্থা করবেন?'

রামবাবু বললেন, 'যতদিন খুশি থাকুন। ভাড়া আপনারা যা খুশি তাই দেবেন। আর এই নিন দোতলার চাবি। সব ঘরই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন।'

বিজয় বলল, 'দোতলার চাবি তো আমরা আগেই পেয়ে গেছি।'

রমেনবাবু বললেন, 'না, এই চাবি আপনারা পাননি। এই চাবি শুধু আমার কাছেই আছে।'

—'এটা আবার কোন চাবি?'

—'দোতলার সামনের ঘরে আপনারা ঢুকেছেন, সঙ্গে পার্টিশন করা আর একটা ঘর আছে। ঘরের মাঝখানে দরজাটা দেখেননি?'

—'হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু ওই ঘরের দরকার নেই বলে আমাদের কোনও কৌতূহল জাগেনি।'

চাবিটা বিজয়ের হাতে দিয়ে রমেনবাবু বললেন, 'এই নিন। ঘরটা খুলে ব্যবহার করুন।'

বিজয় বলল, 'ধন্যবাদ।'

কথাবার্তা বলার আগে রমেনবাবু ভজহরিকে চলে যেতে বলেছিলেন। কাজেই সে সবকিছু জানতে পারল না। পথে বেরিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই মিহির ও বিজয়ের সঙ্গে তার দেখা হল।

বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল ভজহরি। তাদের দেখেই এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কী কথাবার্তা হল বাবু?'

মিহির জবাব দিল, 'কিছু না, তুমি এখন যেতে পারো।'

ভজহরিকে বিদায় দিয়ে তারা নিজেদের পথে চলতে লাগল। মিহির বলল, 'যাক ভালোই হল। এবার আরও বেশি মজা করে বাড়িতে থাকতে পারবে।'

বিজয় জিজ্ঞেস করল, 'মজা আরও বাড়ল কীসে?'

মিহির বলল, 'আর একটা ঘর বাড়ল।'

বিজয় অনেকটা হতাশ হয়ে বলল, 'সে কী? তুমি কি এটাকে মজা মনে করো? এসব ঘর নিয়েই ঝামেলা, তার উপর আর একটা ঘরের উৎপাত!'

মিহির বলল, 'উৎপাত নয় হে, দেখবে লাভই হবে। এ ব্যাপারে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার এক বন্ধু আছে সুমন্ত তরফদার—বৈজ্ঞানিক এবং ডিটেকটিভ। ভূত নিয়েও সে গবেষণা করছে। তার সঙ্গে আজই আমি দেখা করছি। দেখি সে এর একটা সুরাহা করে দিতে পারে কি না।'

॥ আট ॥

তরফদারের বিস্ময়

সেদিনই মিহির গেল তরফদারের বাড়িতে। সঙ্গে বিজয়ও গেল। তরফদার তখন বাড়ি ছিলেন না। তিনি কী একটা তদন্তের কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বাড়ির সামনের দিকেই তাঁর চেম্বার। সেই চেম্বারে মিহির আর বিজয় অনেকক্ষণ বসে রইল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর এলেন সুমন্ত তরফদার।

মিহিরকে দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার মিহির? হঠাৎ আমার খোঁজ পড়ল কেন?'

মিহির জবাব দিল, 'ব্যাপার খুব ভয়ানক। তোমাকেই এর একটা কিনারা করে দিতে হবে।'

তরফদার বললেন, ভয়ানক ব্যাপার! কেন, তুমি কি খুন হয়েছ নাকি?' হেসে উঠলেন তরফদার।

মিহির বলল, 'হাসির কথা নয় হে সুমন্ত। খুন কখনও হইনি, কিন্তু খুন হতে আর বিলম্ব নেই।'

এবার একটু গম্ভীর হলেন সুমন্ত। বললেন, 'আমার কাছে যখন এসেছ তখন বুঝেছি একটা কিছু ঘটেছে। ব্যাপারটা কী বলো তো?'

মিহির সব ব্যাপারটা খুলে বলতে লাগল।

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতে লাগলেন সুমন্ত তরফদার। এ যেন তাঁর পরিচিত ঘটনা। কোথায় যেন তিনি শুনেছেন।

সব কথা শোনা শেষ হওয়ার পর তরফদার জিজ্ঞেস করলেন—'এই বাড়িটা কোথায় বলো তো?'

মিহির রাস্তার নামটা বলল। তা শুনে প্রায় যেন লাফিয়ে উঠলেন তরফদার। বললেন—'এই বাড়ির ঘটনা নিয়ে তো বেশ কয়েকমাস আগে আমার কাছে একজন লোক এসেছিল। আমি তো ঘটনাটাকে খুব বেশি আমলই দিইনি।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে বাড়িটা বিখ্যাত ভূতুড়ে বাড়ি তো! অনেকদিন ধরেই এই সব কাণ্ড-কারখানা চলছে।'

—'কিন্তু বাড়িটা ভূতুড়ে না অন্য কিছু তাতেও সন্দেহ জাগছে। কৌতূহলও হচ্ছে খুব।'

—'সন্দেহ জাগার কারণ কী ঘটল?'

—'সে এখন বলব না। তবে ভূতের গবেষণা নিয়ে মেতে ওঠার ব্যাপারে আমার উৎসাহ আরও এতে বেড়ে গেল!'

—'তবে কি মনে করো ভূতের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারও এর সঙ্গে থাকতে পারে?'

—'এখন কিছু তোমাদের সঠিক করে বলতে পারব না। তবে কত পার্সেন্ট ভূত এই ব্যাপারের সঙ্গে আছে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।'

—'তা হলে সেই ভারটা তুমি নিচ্ছ?'

—'হ্যাঁ, নিচ্ছি।'

—'কবে থেকে?'

—'কালকে থেকেই নিতে পারি। কিন্তু তার আগে বাড়িটা খালি করে দিতে হবে। তা না হলে আমার কাজের পক্ষে অসুবিধা হবে।'

—'তা করে দেব। কাল দুপুরের মধ্যেই বাড়িটা খালি করে দেব। তবে কতদিনের মধ্যে এর একটা সুরাহা হয়ে যাবে মনে করো?'

তরফদার একটু চিন্তা করে বললেন—'তিন-চার দিন তো লাগবেই। তবে একটু এদিক-ওদিক হলেও হতে পারে।'

'বেশ, তাই হবে।'

সব কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল।

এক দিনের মধ্যেই বাড়িটাতে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। বিজয়ের পরিবারের সকলেই মিহিরের বাড়িতে গিয়ে উঠল।

ওদিকে মিহিরের সেই ডিটেকটিভ বন্ধু সুমন্ত তরফদার তৈরি হলেন ভূতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাবার জন্য। বাড়ির সমস্ত চাবি মিহির তাঁকে আগেই দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই তিনি সেই বাড়িতে চলে এলেন। সঙ্গে তাঁর সাহসী ভৃত্য নিবারণ এবং প্রিয় বুলটেরিয়ার কুকুর—নাম বাঘা। তরফদারের বহুদিনের ইচ্ছা ভুত দেখবেন। ভূত বলে কোনও কিছু আছে কি না তার পরীক্ষা করবেন।

প্রথমে বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখলেন তরফদার। ঘুরে দেখবার সময় কুকুর বাঘা কী রকম যেন ভাবভঙ্গি করতে লাগল। মনে হল সে কী যেন দেখতে পেয়েছে—কী যেন খুঁজছে এদিকে-ওদিকে! তরফদার তা লক্ষ করে বললেন 'কী রে বাঘা, তুই ভূতের গন্ধ পেয়েছিস বলে মনে হচ্ছে!'

বাঘা চুপচাপ বসে পড়ে লম্বা জিভটা বের করে মাথাটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল।

বাড়ির বাইরের দিকটা দেখা হয়ে গেল মোটামুটি, এবার তরফদার ভিতরে ঢুকে ঘরগুলি দেখতে লাগলেন। একতলার ঘরগুলি দেখে নিয়ে একটা ঘরের সোফায় বসে সিগারেট ধরালেন। একটু আয়েস করতে করতে ডাকলেন নিবারণকে।

নিবারণ তখন বাইরে দাঁড়িয়ে বুড়ির ঘরের দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন দেখছিল। তরফদারের ডাকে তার হুঁশ হল। সে বলল, 'আজ্ঞে কর্তা!'

—'এদিকে এসো।'

নিবারণ কাছে এলে তরফদার বললেন, 'নিবারণ, তুমি দোতলার ঘরগুলো ঘুরে দ্যাখো তো। এই নাও চাবি। বাঘাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।'

নিবারণ বাঘাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। পুরোনো ভাঙা সিঁড়ি, তার ওপর নোংরা। প্রথমে কুকুরই উপরে উঠল, পেছনে পেছনে নিবারণ।

দোতলার ঘরের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ হঠাৎ তার নাকে এসে ঢুকল। অস্বাভাবিক ভ্যাপসা গন্ধ। যে কুকুরটা এতক্ষণ ঘরে ঢুকবার জন্য হাঁসফাঁস করছিল, সেও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর নিবারণ ঘরে ঢুকল। বাঘাও ঢুকল সেই সঙ্গে। নিবারণ সামনের দিকের ঘরটা দেখতে লাগল। একটা তক্তাপোশ ছাড়া ঘরে কোনও আসবাবপত্র নেই।

নিবারণ বেশ কিছুক্ষণ আগে উপরে উঠেছে—এখনও ফিরছে না। তরফদার আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবলেন, উপরে উঠবেন। এমন সময় দেখলেন নিবারণ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে নিবারণ, তুমি চলে এলে যে?'

নিবারণ বলল, 'বাবু ঘরগুলোতে ঢুকলেই গা ছমছম করে। কী অন্ধকার ঘর! আপনার টর্চলাইটটা দিন, নইলে ঘরের জানালা খোলা যাচ্ছে না, ভিতরের ঘরের দরজাটাও খোলা যাচ্ছে না।

এই কথা বলতে না বলতেই দেখা গেল বাঘা সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে ছুটে আসছে। জিভ বের করে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে—হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে।

তরফদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী বাঘা ফিরে আসছে কেন?'

নিবারণ বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।'

বাঘা ছুটে সিঁড়ির নীচে নেমে এল আর কুঁই কুঁই করে শব্দ করতে লাগল।

তরফদার লক্ষ করলেন, বাঘা যেন পালিয়ে যেতে চায়। তাই ভাবলেন, ব্যাপার কী? আদর করে মাথা চাপড়াতে বাঘা কিছুটা শান্ত হল! তরফদার বললেন, 'চলো তো নিবারণ, ওপরটাই একবার ভালো করে দেখি।'

তরফদার নিবারণকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। বাঘা এবার চলল তাঁদের পেছনে পেছনে। তার মনে যেন কী রকম ভয় ভয় ভাব।

দোতলার যে ঘরটায় ঢুকতে নিবারণের গা ছমছম করছিল, সেই ঘরটার সামনে এসে দুজন দাঁড়াল। নিবারণ বলল, 'একটা শব্দ শুনছেন?'

—'কই? না তো?'

তরফদার শব্দ শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। তারপর টর্চটা জ্বেলে ভেতরের দিকের ঘরটা খুললেন। মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখেছ? ভালো করে লক্ষ করো। তুমি কি একটু আগে এই ঘরে ঢুকেছিলে?'

নিবারণ বলল, 'না বাবু, আমি তো এ ঘরটায় ঢুকিনি।'

তরফদার বললেন, 'তা হলে এরকম কেন? মনে হয় একটু আগে কেউ এই ঘরে ঢুকেছিল। কয়েকটি স্পষ্ট পদচিহ্ন।'

কার পায়ের ছাপ এগুলো? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, তারপর আর একটা। —মোট পাঁচটা। না, তারপর আর নেই। তারপরেই খাড়া দেওয়াল। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার তো!

তরফদার বললেন, 'প্রত্যেকটাই শিশুর পায়ের ছাপ। তাই নয় কি নিবারণ?'

নিবারণ বলল, 'হ্যাঁ বাবু।'

—'ভালো করে দ্যাখো তো।'

—'হ্যাঁ, ভালো করেই তো দেখছি।'

তরফদার বললেন, 'কিন্তু কোনও শিশু কি এমনভাবে চলতে চলতে দেয়াল বেয়ে কোথাও যেতে পারে? কিছুতেই পারে না তবে?'

নিবারণ বলল, 'ব্যাপারটা তো কিছু বুঝতে পারছি না কর্তা।'

তরফদার বললেন, 'এবার জানালাগুলো খুলে ঘর দুটি ভালো করে দেখা যাক।'

নিবারণ জানালাগুলো খুলতে চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তরফদার দেখলেন বাঘা নেই। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাঘা গেল কোথায়?'

নিবারণ বলল, 'কই, ওকে দেখছি না তো?'

ঘরে চেয়ার, টেবিল, আয়না অনেক কিছু আছে। মনে হয় অনেক কাল আগে এগুলো কেউ ব্যবহার করত, এখন আর করে না। তরফদার একটা চোয়ারে বসবার জন্য এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ভয়ংকর ধুলো। তাই মনে হয় বহুদিন কেউ এই চেয়ারে বসেনি। বললেন, 'নিবারণ, চেয়ারটা একটু ঝেড়ে দাও তো, বসব।'

নিবারণ চেয়ারের ধুলো ঝাড়বার জন্য এগিয়ে গেল। নিবারণ জানালা খুলতে পারছিল না বলে তরফদার নিজেই গেলেন খুলবার জন্য। অনেকদিন খোলা হয়নি বলে ভয়ানক আঁট হয়ে গিয়েছে। জানালা খুলবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'নিবারণ চেয়ারটা দরজার সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও তো।'

কিন্তু নিবারণ চেয়ারখানা নিয়ে যেতে যেতে কেবলই পিছন দিকে ফিরতে লাগল। কেউ যেন তাকে পেছন দিকে ধীরে ধীরে ঠেলছে। তাই সে বলল, 'কর্তা' আমার পিঠে হাত দিচ্ছে কে?'

তরফদার সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ভেবে পেলেন না, কেন নিবারণ ওরকম কথা বলছে। সেই মুহূর্তেই নিবারণ বেশ চড়া গলায় বলে উঠল, 'এ কী কর্তা আমাকে চড় মারলে কেন?'

তরফদার বলতে গেলেন, 'চড়! আমি তোমাকে চড় মারব কেন?' কিন্তু তিনি কথাটা বলবার আগেই ওদিকে নিবারণ চেয়ারখানা নিয়ে উলটে পড়ে গেল। মনে হয় কে যেন

তাকে ঠেলে ফেলে দিল। নিবারণ কোনও রকমে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে তরফদারকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার পিঠের ওপর আপনি এমন করে এত জোরে ধাক্কা মারলেন কেন কর্তা?'

তরফদার অবাক হয়ে জবাব নিলেন, 'আমি তোমাকে কেন ধাক্কা মারতে যাব? তুমি বিশ্বাস করো আমি ধাক্কা মারিনি।'

—'আপনি ধাক্কা মারেননি?'

—'না।'

নিবারণ প্রথমে সত্যি বিশ্বাস করেনি। এবার সে বিশ্বাস করল। কিন্তু অবাকও যেমন হল, ভয়ও তেমনি পেল। সে আমতা আমতা করে বলল, 'তবে কে ধাক্কা মারলে?'

এমন সময় বাঘার ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল। তরফদার বললেন, 'নিবারণ, বাঘা ডাকছে।'

নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'বাঘা, বাঘা, এই যে আমরা এখানে।'

নিবারণ ভেবেছিল ডাক শুনলেই কুকুরটা তাদের কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু তা হল না। বাঘাটা ছুটে পালাতে লাগল। নিবারণ তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেল তাও পারল না। তার কেমন যেন খটকা লাগল। সে-ও পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে বলল, 'কর্তা, আসুন আমরা নীচে উঠোনের দিকে যাই।'

তরফদার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনিও সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের দিকে যেতে লাগলেন। মুখে বললেন, 'নিবারণ আমি আসছি।'

বাঘা এসে বাড়ির একটা পাঁচিলের কাছে থামল। নিবারণ আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল, তরফদারও সেখানে এসে থামলেন। একটা আশ্চর্য ব্যাপার তাঁরা দেখলেন, সেখানেও সেই শিশুর পায়ের ছাপ।

বাঘাটা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে লাফাবার উদ্যোগ করছিল। নিবারণ আদর করে বারকয়েক মাথা চাপড়ে দিতেই যেন বাঘা অনেকটা শান্ত হল। আগে বাঘার এরকম অবস্থা কখনও হয়নি।

তরফদার বললেন, 'নিবারণ, আমরা আজ রাত্রে উপরের ওই ঘরেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করব। তুমি ওই ঘরটা একটু পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করো।'

নিবারণ বলল, 'কোন ঘরে কর্তা? যে ঘরে আমাকে চেয়ার শুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল!'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ'

নিবারণ বলল, 'সর্বনাশ! ও ঘরে রাত কাটানোর চেয়ে বিষ খাওয়া ভালো। আমি পারব না কর্তা।'

তরফদার বললেন, 'ভয় নেই আমি তো আছি। বোধহয় কোনও জাদুকর ভোজবাজির

খেলা দেখিয়ে আমাদের অবাক করে দিতে চায়। ভেল্কিটা যে কী ধরতে পারছি না বটে, কিন্তু আজ রাত ফুরবার আগেই তাকে আমরা ধরে ফেলবই ফেলব।'

॥ নয় ॥

রাতের ঘটনা

দুজনেই ক্লান্ত।

এবার শোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিছানাপত্র সব সঙ্গেই ছিল। ভিতরের ঘরখানায় ছিল একটি সেকেলে পালঙ্ক। ঝাড়ামোছা করে তার উপর বিছানা পাতা হল। সেখানে হল নিবারণের শোবার ব্যবস্থা। সামনের ঘরে তরফদারের বিছানা করা হল। দু-ঘরের মাঝখানে একটি দরজা। সেই দরজাটা খুলে দেওয়া হল।

ঘুমঘুম ভাব থাকলেও ঘুম অবশ্য কারুর চোখেই এল না। কেটে গেল অনেকক্ষণ।

দুজনের মনেই কী রকম যেন একটা অস্বস্তিভাব।

এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

হঠাৎ ঘরের ভেতর আবির্ভূত হল মস্ত একটা বিবর্ণ আলোক। একটা মনুষ্যমূর্তির মতোই কিন্তু গঠনহীন ও অবাস্তব। দুই ঘরের মাঝখানে সেই মূর্তিটা নড়ে-চড়ে উঠল এবং তারপর ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে।

তরফদার ডাকলেন, 'নিবারণ'!

নিবারণ সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল, 'কর্তা?'

'উঠে পড়ো।'

'হ্যাঁ, উঠেছি কর্তা।'

'কিছু দেখতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

তরফদার বললেন, 'ওই জিনিসটাকে লক্ষ্য করে আমাদের চলতে হবে।'

ভয়ার্তকণ্ঠে বলল নিবারণ, 'ওই আলোকটাকে?'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো দেরি করার সময় নেই।'

নিবারণ বললে, 'এই রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে?'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ, ওই অন্ধকারের মধ্যেই চলতে হবে। টর্চ তো রয়েছে ভয় কী?'

দুজনেই এগিয়ে চলল। তরফদারের এক হাতে টর্চ, আর এক হাতে রিভলভার।

নিবারণের হাতে একটি কাঠের ডাণ্ডা। এই বাড়ির ভেতরেই সে কাঠের ডান্ডাটি খুঁজে পেয়েছিল। তাই লাঠির বদলে ওটাই হয়েছিল তার সম্বল।

ওই বিবর্ণ আলোছায়াটি নীচে গিয়ে প্রবেশ করল একটি ঘরের ভিতরে, তারপর একটি বিছানার উপরে গিয়ে উঠল। ওই আলোছায়াটি ক্রমশ ছোটো হতে লাগল, তারপর একটি ছোটো বিন্দুতে পরিণত হল। এক মুহূর্ত সেখানে স্থির হয়েই কাঁপতে কাঁপতে একেবারে নিভে গেল সেই অদ্ভুত আলোকবিন্দু।

বাঘার কথা এতক্ষণ কারুর মনে ছিল না। তাদের পেছনে পেছনে থেকেও বাঘা কোন ফাঁকে খাটের তলায় লুকিয়েছিল তা কেউ দেখতে পায়নি। লক্ষ পড়ল যখন সে বেরিয়ে এল।

এবার বাঘা বাইরে বেরিয়ে চলল অন্য ঘরের দিকে।

তরফদার বললেন, 'নিবারণ চলো আমরা বাঘার পেছনে পেছনে যাই।'

দুজনে তাই করলেন।

তাঁরা দেখলেন, একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে বাঘা দাঁড়াল। সেটা বুড়ির ঘর। ঘরটা তালা বন্ধ। বাঘা সেই ঘরে ঢোকবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

তরফদার বললেন, 'এই ঘরটাতে ঢোকবার জন্য বাঘার এত চেষ্টা কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও রহস্য রয়েছে। তালা ভেঙে ঘরটা খুলতে হবে।'

নিবারণ বলল, 'তালাটা ভাঙতে হয়তো একটু কষ্ট হবে। কিন্তু দরজাটা ভারী পুরানো ওটাকে সহজেই ভাঙা যাবে।'

সামনে বড়ো বড়ো ইট ও পাথর পড়ে ছিল। নিবারণ সেগুলির সাহায্যে ঠোকাঠুকি করতেই দরজাটা খুলে গেল। পরপর দুটি ঘর। পেছনের ঘরের দরজাটা খুলতে খুব অসুবিধা হল না। সেই ঘরে ঢুকে বাঘা দেওয়াল-আলমারিটার কাছে গিয়ে তার বন্ধ দরজাটা বারবার আঁচড়াতে লাগল।

তরফদার বললেন, 'বাঘার ভাবগতি দেখে আমার মনেও সন্দেহ হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে এর ভেতর। আমাদের তা দেখতে হবে।'

আলমারিটার দরজা খুব দামি। কিন্তু বিনা যত্নে ও অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইটের কয়েকটা ঘা মেরে ওটাকে খোলা হল।

আলমারিটা খুলে পাওয়া গেল পুরোনো বিবর্ণ একটা রুমাল। আর একটা খোপে রয়েছে মেয়েদের ব্যবহার্য কিছু পোশাক-পরিচ্ছদের অংশ এবং বিবর্ণ হলদে ফিতে দিয়ে বাঁধা দু-খানা খামে ভরা চিঠি।

তরফদারের কৌতূহল তাতে উগ্র হয়ে উঠল। চিঠি দু-খানা তিনি হাতে নিলেন।

হঠাৎ যেন মনে হল কারও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অদৃশ্য লোকের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। খুব জোর নয়, অস্পষ্ট। নিবারণের মনে ভয় জাগল, তরফদারের মনে জাগল কৌতূহল।

নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চিঠি দু-খানা রয়েছে তরফদারের হাতে। তিনি ঘর থেকে বাইরে পা দিতেই বাঘা ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

তরফদার বললেন, 'কী রে বাঘা, তোর আবার কী হল?'

কিন্তু বলতে না বলতেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। কে যেন তরফদারের কবজি চেপে ধরে তার হাত থেকে চিঠি দু-খানা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে। অবশ্য সেই হাতের স্পর্শ খুব কঠিন নয়। তরফদার আরও জোর করে চিঠি দু-খানা চেপে ধরলেন। বাঘা ঘেউ ঘেউ করে উঠল আরও জোরে। তারপর আর সেই অশরীরী আত্মার কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

আবার তরফদার নিজের নির্দিষ্ট ঘরে দোতলায় ফিরে গেলেন। যাবার আগে নীচতলার ঘরে একটি টেবিল ল্যাম্প দেখতে পেয়ে নিবারণকে বললেন, 'নিবারণ, এই টেবিল ল্যাম্পটা উপরে নিয়ে এসো তো।

নিবারণ টেবিল ল্যাম্পটা হাতে তুলে নিল।

দোতলায় গিয়ে তরফদার বললেন, 'নিবারণ, ল্যাম্পটা জ্বালাও।'

নিবারণ ল্যাম্পটা জ্বালালে তরফদার টেবিলের উপর চিঠি দু-টি রাখলেন, রিভলবারটা রাখলেন তার পাশে। বসে একটু সুস্থির হয়ে বললেন, 'নিবারণ, তুমি কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, ওটা যেন এক কোণে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে।'

নিবারণ কুকুরটার দিকে এগিয়ে গেল।

তরফদারের মন রয়েছে চিঠি দু-খানির দিকে। একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে একমনে চিঠি পড়তে লাগলেন।

চিঠি দু-খানিতে খুব বেশি কথা লেখা নেই। তারিখ দেখে বোঝা গেল ঠিক ছত্রিশ বছর আগেকার লেখা। স্ত্রীকে সম্বোধন করে চিঠি দু-খানা লিখছে কোনও ভদ্রলোক। লেখার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, পত্রলেখক রীতিমতো শিক্ষিত। কিন্তু জায়গায় জায়গায় কথাগুলো অস্পষ্ট। তাতে পাওয়া যায় যেন কোনও গুপ্ত অপরাধের ইঙ্গিত। ইঙ্গিতগুলিও রহস্যপূর্ণ।

তরফদার খুব সন্দিগ্ধভাবেই পড়তে লাগলেন চিঠিগুলি...

(১) 'খুব সাবধান, জানাজানি হয়ে গেলে সবাই আমাদের অভিশাপ দেবে।'

(২) 'রাত্রে ঘরের ভেতর আর কোনও লোক নিয়ে শুয়ো না। তোমার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলার বদ অভ্যাস আছে।'

(৩) 'যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আমাদের ভয় কী, আমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। মরা মানুষ আর বাঁচে না।'

—এইখানে মেয়েলি হাতে ব্র্যাকেটের ভেতর লেখা (হ্যাঁ, মরাও আবার বেঁচে ওঠে)।

অদ্ভুত হেঁয়ালিপূর্ণ চিঠি।

অথচ অনেক রহস্য, অনেক চক্রান্ত যেন লুকিয়ে রয়েছে লেখাগুলির ভেতর।

চিঠি দু-খানা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে তরফদার মনে মনে কথাগুলির মর্মার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

তখন রাত হয়েছে অনেক। চারিদিক নিস্তব্ধ।

চিঠি দু-খানা টেবিলের উপর রেখে তরফদার টেবিল ল্যাম্পটা একটু ডিম করে দিলেন। নিবারণকে বললেন, 'নিবারণ, তুমি সামনের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ো মাঝখানের দরজা খোলাই থাক।'

শুয়ে শুয়েও তরফদার চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ঘুম যেন চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে। কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে খাটের তলায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগল।

রাত তখন ক-টা কে জানে?

হঠাৎ মনে হল, সাঁ করে যেন একটা দমকা কনকনে হাওয়া গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল। খট করে যেন শব্দ হল একটা।

চমকে উঠলেন তরফদার। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল নাকি? তরফদার মাথা তুলে দেখলেন—না, যেমন খোলা ছিল তেমনি খোলাই আছে।

টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন বাতিটা তেমনি নিবু নিবু ভাবে জ্বলছে। কোথাও কেউ নেই। অথচ কী আশ্চর্য, টেবিলের উপর থেকে হাতঘড়িটা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে, একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সর্বনাশ, এবার রিভালভারটা উধাও হবে না তো?

তরফদার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। চট করে টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলেন রিভলভারটা।

ঠিক সেই সময়ে দুটি ঘরের মাঝখানে কীসের যেন একটা শব্দ হল। যেন মেঝের উপর কিছু ঠোকার শব্দ হল। ঠক—ঠক—ঠক। ঠক—ঠক—ঠক, ঠক—ঠক—ঠক।

—পর পর তিনবার।

পাশের ঘর থেকে নিবারণ জিজ্ঞেস করল, 'ও শব্দ কি আপনিই করছেন কর্তা?'

তরফদার জবাব দিলেন, 'না, আমি করছি না।'

—'তবে কে এমন শব্দ করলে?'

তরফদার ভাবলেন, ঘরে কেউ ঢোকেনি তো? তিনি নিবু নিবু বাতিটা বাড়িয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি যেন তাঁর গায়ে লাগল। বাড়াতে গিয়ে উলটে বাতিটা কমে গিয়ে একেবারে নিভেই গেল।

টর্চলাইটটা খুঁজতে লাগলেন এবার। অন্ধকারে টেবিলের উপর হাতড়িয়ে তবে সেটা খুঁজে পেলেন। টর্চের আলো ফেললেন ঘরের মেঝের উপর এদিকে-ওদিকে।

কই, কোনও লোক নেই তো?

দেখা গেল কুকুরটা জেগে উঠে মেজের উপর চলে এসেছে। তার সর্বাঙ্গের লোম যেন খাড়া হয়ে হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিও তেমনি হিংস্র।

তরফদার বললেন, 'কী রে বাঘা, তোর হল কী? এমন করছিস কেন?'

বাঘা কিছু না বলে শুধু এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

তরফদার টর্চের আলোতে দেখলেন, ঘরের দরজা তেমনি ভেতর থেকে বন্ধ আছে। ঘরে কেউ ঢুকলে দরজা খোলা থাকত।

বাঘা কুকুরটাও ঘরের মাঝখানে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘেউ ঘেউ করছে না, ছোটাছুটিও করছে না। তার দৃষ্টিটা যেন বার বার গিয়ে পড়ছে ঘরের জানালাটার দিকে। জানালাটা খোলা।

কিন্তু কোনও লোক কি ওই জানালা দিয়ে ঢুকতে পারে? কী করে ঢুকবে?

তরফদার বললেন, 'নিবারণ, তুমি টেবিল ল্যাম্পটা আবার জ্বালাও।'

নিবারণ জেগে বিছানার উপর চুপচাপ বসেছিল। সে এবার সন্তর্পণে এগিয়ে এল। বলল, 'কর্তা, দেশলাইটা কোথায়?'

তরফদার পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে দিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিবারণ টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালতে পারল না। দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বলেই নিভে যায়। হঠাৎ যেন কোনদিক দিয়ে ছুটে আসে দমকা হাওয়া।

তরফদার এগিয়ে যেতে লাগলেন জানালার দিকে। নিবারণের সঙ্গে তাঁর গায়ের ধাক্কা লাগল। তাতে ঘটে গেল আর এক বিভ্রাট। নিবারণ সেই সময়ে টেবিল ল্যাম্পের চিমনিটা সামলাতে গিয়েছিল, হঠাৎ হাত লেগে চিমনিটা ভেঙে গেল।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল?'

নিবারণ জবাব দিল, 'চিমনিটা ভেঙে গেল কর্তা।'

—'যাক, তা হলে আর জ্বালাতে হবে না।'

হঠাৎ নিবারণের যেন কী হল। সে অন্ধকারের মধ্যেই খুলে ফেলল ঘরের দরজাটা তারপর বলল, 'কর্তা, পালান, পালান। আমাকে সে ধরতে আসছে।' বলে মুহূর্তের মধ্যে সে বাইরে চলে গেল।

তরফদার চেঁচিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও নিবারণ, দাঁড়াও, দাঁড়াও।'

কিন্তু সে তরফদারের কথা শুনল না। বেগে সিঁড়ি দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। শোনা গেল বাইরের সদর দরজা খোলার শব্দ। তারপর সব চুপচাপ।

ভূতুড়ে বাড়িতে তরফদার একা।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি, নিবারণ ভিতু মানুষ হয়েও কেমন করে একা বাইরে চলে গেল? তা হলে কি বাড়ির ভিতরের ভয়টা বাইরের ভয়ের চেয়েও বেশি?

এখন এই নির্জন বাড়িতে বাঘা কুকুরটা ছাড়া তাঁর আর কোনও সঙ্গী নেই।

কিন্তু এ কী! কুকুরটা কী রকম শব্দ করছে যেন! ঘরের ভিতর আবার সেই ঠক ঠক শব্দ।

তরফদার টর্চের আলোটা বাঘার উপরে ফেললেন। এ কী দেখছেন তিনি? দুঃস্বপ্ন নয় তো?

একটা ছায়ামূর্তি কুকুরটাকে গলা টিপে ধরেছে। তার হাত দুটোই শুধু একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন—মূর্তিটাকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না।

কুকুরটা বাঁচবার জন্য ছটফট করছে। অথচ চিৎকার করার উপায় নেই। মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে এক অস্বাভাবিক শব্দ।

তরফদার আর সহ্য করতে পারলেন না। ওই ছায়ামূর্তিটাকে লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি ছুড়লেন।

গ্রুম!

হঠাৎ যেন ঘরের ভেতর একটা তোলপাড় হল। কী হল তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না।

ছায়ামূর্তিটা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নানাদিকে। তাঁর উপরও বুঝি এসে পড়বে। কোনও বুদ্ধি ঠিক করতে না পেরে তরফদার আবার রিভলভারের গুলি ছুড়লেন।

গ্রুম—গ্রুম—

এবার তাঁর লক্ষ্য হয়তো স্থির ছিল না, তাই একটা গুলি লাগল বাঘার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তির গায়েও হয়তো লাগল।

বাঘা রক্তাক্ত দেহে ছিটকে পড়ল মেঝের উপর।

এবার তরফদার বাঘার গায়ের উপর টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, বাঘা নির্জীব হয়ে পড়ে আছে, তার দেহে প্রাণ নেই।

কিন্তু সেজন্য দুঃখ করার সময় এখন নেই।

এবার ছায়ামূর্তির সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

সেজন্য প্রস্তুত হলেন তরফদার। আজ তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এসপার-ওসপার একটা কিছু করতেই হবে।

কিন্তু কোথায় ছায়ামূর্তি?

সারা ঘরটা যেন ধোঁয়ার মতো কী একটা জিনিসে ভরে উঠতে লাগল। তরফদার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। এবার টেবিলের ধারে এসে চেয়ারের উপর বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলেন ঘরের ভেতর যেন জানালা দিয়ে একটু একটু চাঁদের আলো ঢুকছে। আজ কী তিথি তা তিনি জানেন না। তবু বুঝলেন, আকাশে চাঁদ উঠছে।

এবার চোখের সামনে যা দেখলেন তা অতি আশ্চর্য।

ঘরের ভেতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করছে একটা বিরাট অন্ধকার। কিন্তু ওটা কী?

ক্রমে ক্রমে ওটা বেশি কালো হয়ে উঠছে। কী বীভৎস। কী ভয়ংকর! ওই অন্ধকার মূর্তির নিম্নার্ধ আছে কক্ষতলে, কিন্তু উপরার্ধ প্রায় স্পর্শ করছে ছাদের কড়িকাঠ।

তরফদার চেয়ার ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যেন মহাভার কোনও শক্তি তাঁকে চেপে আছে। আর খুব উঁচু থেকে তাকে যেন লক্ষ করছে ভাঁটার মতো দুটো চক্ষু।

হঠাৎ তরফদারের মনে পড়ল টেবিলের উপর চিঠি দুটো রয়েছে। সেই চিঠি দুটো হস্তগত করা দরকার। তাই এবার টর্চের আলো ফেললেন টেবিলের উপর।

ওই তো, চিঠি দুটো টেবিলের উপর রয়েছে। তরফদার তা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু পারলেন না। কে যেন হাত বাড়িয়ে চিঠি দুটো তুলে নিল।

ছায়ার মতো দুটো হাত। দু-হাতে দুটি চিঠি চোখের পলকে তুলে নিয়ে গেল অদৃশ্য কোনও মানুষ। লোকটিকে বাইরে যেতে দেখলেন না, কিন্তু চিঠি দুটিও আর দেখা গেল না।

একটু পরেই আবার শোনা গেল সেই শব্দ ঠক—ঠক—ঠক, ঠক—ঠক—ঠক।

কী আশ্চর্য!

শব্দ লক্ষ্য করে তরফদার সেদিকে টর্চের আলো ফেললেন। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির দিকে। তরফদার ভাবলেন, বুঝি নিবারণ ফিরে এল। তাঁর মনে সাহস ফিরে এল একটু। তিনি ডাকলেন, 'নিবারুণ! নিবারুণ!'

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। নিবারণ এলে নিশ্চয়ই সাড়া দিত।

তা হলে? তার কী হল?

কার পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির উপর!

কোনও লোক এলে নিশ্চয়ই তার দেখা পাওয়া যেত!

তরফদার ভাবলেন, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখবেন কেউ আসছে কি না। কিন্তু একটু নড়বার শক্তিও যেন তাঁর নেই।

কী এক অজানা ভয়, অদৃশ্য শক্তি আর প্রবল অনিচ্চা তাঁকে পাষাণের মতো নিথর করে দিয়েছে।

ভয়ানক দমে গেলেন তরফদার। তাঁর সঙ্গী ছিল দুজন, এই সংকট সময়ে একজনও কাছে নেই। একজন মৃত—একজন অতি আশ্চর্য ভাবে উধাও।

নিবারণকে সাহসী বলেই তরফদার জানতেন। কিন্তু এমনভাবে সে চলে গেল, সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার।

রহস্যজনকও বটে।

প্রভুকে এমনভাবে একলা ফেলে পালিয়ে যাবার মানুষ তো সে নয়।

তা হলে? তার কী হল?

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে কেমন যেন হয়ে গেলেন তরফদার।

এমন সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

॥ দশ ॥

বিভীষিকা

তরফদার যেখানে বসেছিলেন তার কাছাকাছি আর একটা খালি চেয়ার ছিল। সেই চেয়ারটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। দৃশ্যমান কেউ তাকে নিয়ে গেল না, কিন্তু সে নিজে নিজেই হড় হড় শব্দে এগিয়ে টেবিলের ওপাশে গিয়ে নিতান্ত জড়ের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ সেই চেয়ারের উপর মূর্তিধারণ করল এক নারী। জীবন্ত আকৃতি নয়, মৃতবৎ পাংশুবর্ণ। কিন্তু সে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

কী তার উদ্দেশ্য কে জানে?

সে কি কাউকে দেখতে চায়?

এমন সময় আবার যা ঘটল তা আরও অদ্ভুত।

দরজার সামনেই আবির্ভূত হল এক পুরুষ মূর্তি। যুবক। কিন্তু মরার মতো পাংশুবর্ণ। ছায়ার উপরার্ধে জ্বলে জ্বলে উঠছে দুটো চক্ষু এবং তার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে সোফায় বসা সেই নারীমূর্তির দিকে।

তরফদার দেখলেন, ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কে দরজা বন্ধ করছে তা বোঝা গেল না। নারীমূর্তিটিও ঠিক সেই সময়ে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

তরফদার বন্ধ দরজার উপর টর্চের আলো ফেললেন। দেখলেন, দরজাটা আঁটসাঁট ভাবে বন্ধ। কেউ যেন ভিতর থেকে ঠেলে অথবা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

কে সে? কোথায় সে লোক?

আর সহ্য করতে পারলেন না তরফদার। একটা জীবন্ত মানুষের পক্ষে এ ব্যাপার সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। সমস্ত গা তাঁর ছমছম করছে। চিৎকার করে তিনি বললেন, 'কে দরজা বন্ধ করছ? তাড়াতাড়ি খোলো দরজা।'

কিন্তু দরজা খুলল না।

পুরুষমূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল নারীমূর্তির দিকে। নারীমূর্তি চঞ্চল হয়ে উঠে

দাঁড়াল। সে যেন ভয় পেয়েছে। পুরুষটির হাতে দেখা গেল একটি ছোরা। সেই ছোরা নিয়ে সে আক্রমণ করতে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটি চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠল।

মুখের ভঙ্গিতে বোঝা গেল সে চিৎকার করছে। কিন্তু সেই চিৎকারের শব্দ শোনা গেল না। এ যেন নির্বাক চলন্ত ছায়াচিত্র। লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপরে। ছোরা দিয়ে তাকে আঘাত করল। ধস্তাধস্তি শুরু হল দুজনের মধ্যে।

তরফদার কী করবেন, কিছু স্থির করতে পারলেন না। গুলি করবেন কি? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, তার পরিণাম কী হবে কে জানে? তাঁর নিজের কী সম্পর্ক আছে এই ঘটনার সঙ্গে? কাজেই যতক্ষণ নিজের উপর কোনও আঘাত না আসবে ততক্ষণ নীরব দর্শক হয়ে থাকাই উচিত; কিন্তু যা অবস্থা ঘটছে তা খুবই ভয়াবহ। হয়তো পুরুষটি নারীটিকে খুন করেই ফেলবে।

নারীর কপাল দিয়ে রক্তের ধারা বইছে। সে আর আঘাত সহ্য করতে পারছে না। এবার সে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় দেখা গেল সেই কালো ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসছে সেদিকে। সেই ছায়ামূর্তিটা বুঝি একটা বাধা সৃষ্টি করার জন্যই তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

অকস্মাৎ তাদের প্রত্যেকেই ঢাকা পড়ে গেল নিবিড় এক অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে। তারপর জ্বলে উঠল আবার একটা বিবর্ণ আলো এবং দেখা গেল দুই ভূতুড়ে নর-নারী মূর্তি যেন সেই অতিকায় ছায়ামূর্তির কবলগত।

আবার জ্বলে জ্বলে উঠল ছোট্ট ছোট্ট আলোর ফানুসগুলো! আবার তারা ব্যস্তভাবে আনাগোনা ও ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক, উপরে-নীচে সর্বত্র। তারা হয়ে উঠল আরও বেশি পুঞ্জীভূত, তাদের গতি যেন আরও বেশি বন্য ও দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা।

সুমন্ত তরফদার বুঝতে পারলেন না কী ব্যাপার ঘটছে।

সব যেন এলোমেলো—বীভৎস—ভয়ংকর!

ছায়াছবির মতো যেন ব্যাপার ঘটছে।

মূর্তি ধারণ করল এক বৃদ্ধা নারী—আর দেখা গেল টেবিলের উপর থেকে যা অদৃশ্য হয়েছিল, সেই চিঠি দু-খানা তার হাতে রয়েছে। তার পরেই নারীমূর্তির পায়ের তলায় মেঝের উপরে আর এক দৃশ্য জেগে উঠল। একটা ছন্নছাড়া অপরিচ্ছন্ন শিশুমূর্তি হুমড়ি খেয়ে রয়েছে—তার মুখে-চোখে কেমন এক আতঙ্কের আভাস। তরফদার নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলেন, বৃদ্ধার মুখের উপর থেকে ধীরে ধীরে জরার চিহ্ন মুছে গিয়ে যৌবনের লালিত্য ফুটে উঠেছে। তারপর এগিয়ে এল সেই কালো ছায়া, তার নিরেট কালিমার মধ্যে সবকিছু অবলুপ্ত হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর তখন শুধু ক্ষুদ্র লৌকিক জীব সুমন্ত তরফদার, আর সেই বিপুল অলৌকিক ছায়ামূর্তি। আবার দেখা দিল কেউটের মতো দুটো উৎকট চক্ষু। আলোর বুদবুদগুলো আবার

অনিয়মিত, এলোমেলো গতিতে উঠছে, নামছে, ছটোছুটি করছে, ঘরের ভেতর এসে পড়া চন্দ্রকিরণের সঙ্গে করছে মেলামেশা।...

ঘরের অন্ধকার সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, কালো ছায়াও হয়ে আসছে ক্ষীণ, ক্রমেই ক্ষীণ। ছায়া যত ক্ষীণতর হচ্ছে, জানালার ভেতর দিয়ে গলিয়ে আসা চাঁদের আলো হয়ে উঠেছে ততই উজ্জ্বলতর।

ঘরের এক জায়গায় কুকুরটা স্থির হয়ে শুয়ে আছে। তরফদার তাকে ডাকলেন। সে জাগল না, নড়লও না। সে মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তার চোখ দুটো বেরিয়ে পড়েছে কোটরের ভিতর থেকে। জিভখানাও মুখের বাইরে ঝুলছে।

আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার। তরফদার তার ঘড়িটাও আবার টেবিলের উপরেই দেখতে পেলেন। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, চলছে না।

সত্যি, এ এক অসহনীয় ব্যাপার!

এই অবস্থার মধ্যেও তরফদার নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। সেখানেই সূর্যোদয় পর্যন্ত রইলেন। কিন্তু বাকি রাতটুকুর মধ্যে আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবু দিনের আলোতেও বুকের মধ্যে অনুভব করলেন কেমন বিষম আতঙ্কের শিহরন! ...তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। আবার কালকের মতো শুনতে পেলেন তাঁর আগে কার যেন পদশব্দ।

তারপর নীচে এসে যখন দরজা খুললেন, তখন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, তাঁর পেছন থেকে নিম্নকণ্ঠে কে হেসে উঠল। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না।

॥ এগারো ॥

নিবারণ নিরুদ্দেশ

বাড়িতে ফিরে তরফদার ভেবেছিলেন নিবারণের দেখা পাবেন। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।

কিছুক্ষণ পরেই তরফদার রমেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, 'আমার কৌতূহল তৃপ্ত হয়েছে। কালকের রাত্রের কথা শুনতে চান?'

রমেনবাবু বললেন, 'ও রকম কথা অনেক শুনেছি, আর শোনবার আগ্রহ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আপনি এই ভূতুড়ে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন কি না?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনাকেও একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি 'হিপনোটিজম' বা সম্মোহন বিদ্যার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

'হ্যাঁ!'

'জানেন তো, সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীর প্রভাবে পড়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই নানা কাজ করে। সম্মোহনকারী ঘটনাস্থানে উপস্থিত না থাকলেও বিদ্যমান থাকে তার সম্মোহনের প্রভাব। সে দূর থেকেই যা দেখতে চায়—তা যত উদ্ভট বা আশ্চর্যই হোক না কেন—সম্মোহিত ব্যক্তি দেখে সেইসব বস্তু বা দৃশ্য।'

'এই রকম সব কথা শুনেছি বটে। কিন্তু সম্মোহন বিদ্যার সঙ্গে বাড়ির ভৌতিক ঘটনাগুলোর সম্পর্ক কী?'

'বলছি। আপনি প্রেততত্ত্ববিদদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন?'

'না।'

'তাদের কার্যকলাপের কথা শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'কী শুনেছেন?'

'শুনেছি তাঁরা নাকি ভূতের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ছায়াটাকে টেনে এনে অনেক কাণ্ডকারখানা করেন।'

'সেই কাণ্ডকারখানা দেখেছেন কখনও?'

'না।'

'সে সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান?'

'বলুন।'

'তারা টেবিল-চেয়ার সচল করেন, শরীরী প্রেতও নাকি দেখান। ভারতের এক শ্রেণির জাদুকরের কীর্তি পৃথিবী বিখ্যাত। তাদের খেলার নাম রোপট্রিক বা দড়ির ফাঁসি। জাদুকরের একগাছা মোটা দড়ি সোজা লাঠির মতো শূন্যে বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। তারপর একটা ছেলে সেই দড়ি অবলম্বন করে উপরে উঠে সকলের চোখের আড়ালে কোথায় মিলিয়ে যায়। তারপর নাকি শূন্য থেকে ঝুপ-ঝুপ করে নীচে এসে পড়ে ছেলেটার খণ্ড খণ্ড দেহ। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। জাদুকর আবার দেহের অংশগুলো জুড়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তোলে।'

'আপনার বক্তব্য কী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব বলার অর্থ কী?'

'রমেনবাবু, আমার মতে ওই সব ব্যাপারের প্রত্যেকটির মধ্যে কাজ করে সম্মোহন। আমার সৃষ্ট মোহিনীশক্তির গণ্ডির ভিতরে যে এসে পড়বে, তাকে আমি যা দেখাব, সে তাই দেখবে, আমি যা শোনাব, সে তাই শুনবে। তারা হবে আমার মস্তিষ্ক বা ইচ্ছাশক্তির দাস—আমার প্রভাবে সকল রকম অসম্ভবই তাদের কাছে হবে সম্ভবপর। এসব কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'বেশ। আমি তর্ক করতে চাই না। বলুন, তারপর আপনি কী বলতে চান?'

'রমেনবাবু, আমার বিশ্বাস আপনাদের ওই বাড়ির ভিতরে ওই রকমের কোনও মস্তিষ্কের

প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করে। সে কে বা তার কার্যপদ্ধতি কী আমি তা জানি না। হয়তো আজ সে জীবিত নেই, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব তবু লুপ্ত হয়নি। সেই শক্তিই অদৃশ্যভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'

'আপনার কথা শুনে খুবই বিস্ময় বোধ হচ্ছে। এখন আপনার শেষ বক্তব্য কী বলুন।'

তরফদার বললেন, 'আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তবে আমার মনে হয় ওই বাড়িটাকে আমি ভূতের উপদ্রব থেকে মুক্ত করতে পারব।'

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী আমাকে করতে হবে তাই আমাকে বলুন?'

তরফদার বললেন, 'আপনাকে সঙ্গে করে আমি ওই বাড়িটা একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

রমেনবাবু বললেন, 'বেশ তাই হবে। অসুবিধা কী আছে, কবে যাবেন বলুন?'

তরফদার বললেন, 'আমার সহকারী নিবারণ এখনও বাড়ি ফেরেনি, তার জন্য চিন্তায় আছি। তাকে আজ খোঁজ করতে হবে। কাল সকালে চলুন।'

'বেশ, তাই হবে। আমি কাল সকাল আটটায় ওই বাড়ির সামনে থাকব। আপনি যাবেন।'

কথাবার্তা ঠিক করে তরফদার বাড়ি ফিরে দেখলেন নিবারণ ফেরেনি। তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, কোথায় গেল নিবারণ? কোথায় সে যেতে পারে?

কিন্তু সেজন্য বসে থাকলে চলবে না। কর্তব্য তাঁকে করতেই হবে।

পরদিন আটটার সময় তরফদার সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলেন, রমেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুরে ঘুরে তাঁরা গোটা বাড়িটা দেখলেন নীচতলার শেষ ঘরটার সংলগ্ন একটি ছোটো ঘর দেখে তরফদারের কেমন যেন সন্দেহ হল। এই ঘরটাতে কিছু নেই। হয়তো কয়লা ঘুঁটে বা অন্য কিছু জিনিস রাখবার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। এখন সেখানে কয়েকটি পাথর পড়ে আছে। তরফদার একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন, সেগুলো যেন সিঁদুরমাখা।

অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন তরফদার।

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছেন?'

তরফদার বললেন, 'আমার মনে হয় যত উপদ্রব আর অমঙ্গলের মূল আছে এই ঘরেই। যদি আমার কথা শোনেন, তবে ওই ঘরটা ভেঙে ফেলতে হবে।'

রমেনবাবু বললেন, 'বেশ ভেঙে ফেলব।'

তরফদার বললেন, 'এই বাড়ি যে বুড়ির জিম্মায় ছিল, বোধহয় তাকেই লেখা দু-খানা চিঠি আমি দেখেছি। খুব সন্দেহজনক চিঠি। চিঠি দু-খানা টেবিলের দেরাজে রেখে দিয়েছি। আপনিও পড়ে দেখতে পারেন। তারপর যদি ইচ্ছা করেন, বুড়ির পূর্বজীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবেন।'

রমেনবাবু চিঠি দু-খানি পকেটে পুরলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, খোঁজখবর নেব। যথাসময়েই সব খবর পাবেন।'

দুজনেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কয়েকদিন পর তরফদার রমেনবাবুর কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। তাতে লেখা—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দু-দিন পরেই আমি সেই হানাবাড়িতে গিয়েছিলাম। ভজহরিকে সঙ্গে নিয়ে নানারকম খোঁজখবর সংগ্রহ করেছি। বৃদ্ধাকে লেখা চিঠি দু-খানি আমি পাঠ করেছি এবং পাঠ করে বিস্মিত হয়েছি। কোনও অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। তবে খোঁজখবর নিয়ে যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই :

বৃদ্ধার নাম সৌদামিনী। সে সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে। আগে সহোদর অনন্তলালের কাছেই থাকত। অনন্তলাল বিপত্নীক, ছয় বৎসরের একটি পুত্রের পিতা। সেই ছেলেটির লালনপালনের ভার ছিল সৌদামিনীর ওপরে।

ছত্রিশ-সাযত্রিশ বৎসর আগে সৌদামিনী তার ভাই অনন্তলালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন একটি লোককে বিবাহ করেছিল, প্রথম জীবনে সে নাকি ছিল ডাকাত। বিবাহের ঠিক এক মাস পরেই অনন্তলাল হাওড়া পুলের তলায় জলে ডুবে মারা যায়। কিন্তু লাশ পাওয়া যাবার পর দেখা যায়, তার গলায় রয়েছে আঙুলের দাগ—যেন কেউ গলা টিপে তাকে হত্যা করেছে। কী কারণে জানি না, ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ প্রথমে মাথা ঘামালেও পরে সব কিছু চাপা পড়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক।

ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবিকা হয় সৌদামিনীই। কিন্তু পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পরেই শিশুপুত্রটিও মারা পড়ে। সেই মৃত্যুর কারণও দৈব দুর্ঘটনা। শিশু নাকি কেমন করে দোতলা থেকে একতলার উঠানের উপরে পড়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে এর পেছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে। এরপর স্বাভাবিকভাবেই পৈর্তৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় সৌদামিনী।

কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! বিবাহের পর বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই তার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়। তারপর আর সে ফিরে আসেনি। কানাঘুষায় শোনা যায়, বিদেশে কোথায় ডাকাতি করতে গিয়ে সে মারা পড়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলেও সৌদামিনীর অর্থের অভাব রইল না। তবে সে সুখও হল অল্পকালের জন্য স্থায়ী। হঠাৎ একটি বড়ো ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলে তার আর্থিক সৌভাগ্যকে ব্যর্থ করে দিল। তখন সে এক ধনী লোকের কাছে বাড়ি বিক্রি করে দেয়। সেই বড়োলোক সৌদামিনীকে তার জীবিতকাল পর্যন্ত বাড়িতে বাস করবার অনুমতি দেন। এই হল সংক্ষেপে সৌদামিনীর ইতিহাস। আমি সেই বাড়ির মালিকেরই নিযুক্ত করা লোক।

এবার এদিকের কথা শুনুন। আপনি যে ছোটো ঘরখানা ভেঙে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন, সে ঘরে আমি অনেকক্ষণ ছিলাম। অবশ্য সেখানে আমি কিছু দেখিনি, কোন শব্দও শুনিনি, কিন্তু কেন জানি না সারাক্ষণই আমার মনের ভিতরে জেগে উঠেছিল এক প্রবল আতঙ্ক। মেঝে ভেদ করে যেন কেমন একটা বিষাক্ত ভাপ বাইরে বেরিয়ে আসছিল। সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠছিল।

আমি আপনার পরামর্শ মতোই কাজ করব। জনকয় মজুর ঠিক করেছি, তারা আসছে, রবিবার সকালেই ওই ঘরখানা ভেঙে ফেলতে শুরু করবে। সেই সময়ে আপনি উপস্থিত থাকলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। ইতি—

রমেন্দ্রনাথ রায়

॥ বারো ॥

ঘটনার রহস্যজাল

চিঠি পড়ে তরফদার আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। বৃদ্ধা সৌদামিনীর জীবনের রহস্য যে কী তা যেন ক্রমেই তাঁর কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে লাগল।

দুর্বোধ্য হয়তো থেকেই যেত যদি না হঠাৎ সেই বাড়ির মালিক বেড়াতে এসে দু-দিনের জন্য কলকাতায় এসে না উঠতেন।

আর দৈবচক্রেই বাড়িওয়ালা পরিতোষ চৌধুরির সঙ্গে তরফদারের দেখা হয়ে গেল। পরিতোষবাবু বৃদ্ধার মৃত্যুসংবাদ রমেনবাবুর কাছে শুনেই কী মনে করে বাড়িটি দেখতে এলেন। সেই সময়ে তরফদারও সেই বাড়িতে ছিলেন।

তরফদার পরিতোষ চৌধুরির সঙ্গে আলাপ করে সব ঘটনা খুলে বললেন। রমেনবাবু কিন্তু চাইছিলেন তরফদার যেন খুঁটিনাটি সব ঘটনা বাড়িওয়ালার কাছে না বলে। কারণ তাতে তাঁর স্বার্থহানি ঘটতে পারে।

বাড়ির ব্যাপারে রমেনবাবুর কী গোপন স্বার্থ আছে তা তরফদার জানেন না। তাই তিনি রমেনবাবুর নানা রকম ইশারা ও বারণ অগ্রাহ্য করে অকপটে সব বলে যেতে লাগলেন।

পরিতোষ চৌধুরি বিস্মিতভাবেই বললেন, 'এত সব ব্যাপার তো আমি জানি না। আমি শুধু শুনেছি এটা ভূতুড়ে বাড়ি, এ বাড়িতে যে বাস করে সে-ই নির্বংশ হয়। ভয়ে কেউ এ বাড়ি ভাড়া নেয় না। কিন্তু আপনার কাছে থেকে সব ঘটনা শুনে যেন আমার কেমন মনে হচ্ছে।'

তরফদার বললেন, 'আমিও সেই রকম শুনেছিলাম। তবে আমারও মনে হয় এ বাড়ির ভেতর কোনও রহস্য রয়েছে।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'আপনি কি সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন বলে মনে করেন?'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ, পারব বলে মনে হয়। তবে আপনাকেও এই ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।'

'কী রকম সাহায্য করব বলুন?'

'এই বাড়ির বৃদ্ধা সৌদামিনীর সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু জানা থাকে আমাকে খুলে বলতে হবে।'

পরিতোষবাবু বলতে লাগলেন,—'অনন্তলালের নাম নিশ্চয়ই আপনি আমাদের বাড়ির সরকার রমেন রায়ের মুখে শুনেছেন। সে ছিল সত্যি ভালো লোক। কিন্তু ওই সৌদামিনী জীবনে এমন ভুল করেছিল যার জন্য সারা জীবন তাকে ভুগতে হয়েছিল।

সৌদামিনী যাকে বিয়ে করেছিল সে ছিল অনন্তলালের খুবই পরিচিত। লোকটির নাম বঙ্কুবিহারী। এমন কোনও জঘন্য কাজ ছিল না যা বঙ্কুবিহারী না করতে পারত।

বঙ্কুবিহারী যে খারাপ লোক তা অনন্তলাল জানত। কাজেই বিয়েতে তার মত ছিল না। কিন্তু সৌদামিনীর দিকে তাকিয়েই তাকে সম্মতি দিতে হয়েছিল।

বঙ্কুবিহারী যতই ভালো মানুষ সেজে থাকুক না কেন কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বরূপ প্রকাশ হতে লাগল।

প্রথম থেকেই বাড়িটার উপর তার লোভ ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল অনন্তলালকে না সরাতে পারলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই অনন্তলালকে সে-ই খুন করে। বঙ্কুবিহারীর এক সাকরেদ ছিল তার এই অপকর্মের সহায়। তার সাহায্যেই বঙ্কু এই গুরুতর কাণ্ড করতে সাহস পায়।

হাওড়ায় পুলের নীচে অনন্তলালের মৃতদেহ যখন পাওয়া গেল তারপর পুলিশ বঙ্কুবিহারীর খোঁজ করে। বঙ্কুবিহারীর গোপন আড্ডায় হানা দিয়ে তার সাকরেদকে গ্রেফতার করে। বঙ্কুবিহারী পালিয়ে যায়। এরপর থেকেই সে আত্মগোপন করে থাকে।

কিন্তু আত্মগোপন করে থাকলেও তার গোপন কার্যকলাপ বন্ধ হয় না। অনন্তলালের ছেলেকে সে-ই হত্যা করে। প্রথমে সৌদামিনী দোতলাতেই বাস করত। অনন্তলালের ছেলেটিও থাকত তার সঙ্গে। রাত্রিবেলায় মাঝে মাঝে বঙ্কু সেই বাড়িতে আসত। সৌদামিনীকে বলত সে যেন কোনও কথা প্রকাশ না করে। ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য নানারকম পরামর্শ দিত।

সৌদামিনী তাতে রাজি হয়নি। অনন্তলালের ছেলেকে সে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসত। তখন বঙ্কুই একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলেটিকে দোতলা থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। ছেলেটি মারা যায়। সৌদামিনী বঙ্কুর কথামতোই পাড়ার লোককে বলে, ছেলেটি দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে।

সৌদামিনী বুঝতে পেরেছিল তার জীবন সুখের হবে না। সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন কিছু করার আর উপায় ছিল না। বঙ্কুর কবল থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা থাকলেও সে তখন হয়ে পড়েছিল অসহায়। বঙ্কু ছাড়া তার আপনজনও আর কেউ ছিল না।

কিন্তু বঙ্কুর জীবনও ছিল অভিশপ্ত। ইচ্ছা থাকলেও স্বাধীনভাবে সে চলাফেরা করতে পারত না। প্রায় আত্মগোপন করেই তাকে থাকতে হত।

যখনই লুকিয়ে মাঝে মাঝে সে এই বাড়িতে আসত তখনই সৌদামিনী তাকে ভর্ৎসনা করত। কাজেই তার জীবনেও শান্তি ছিল না।

বঙ্কুবিহারী চেয়েছিল সৌদামিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করে বাড়িটা তার কাছ থেকে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে। অনেক রকম ফন্দিফিকির সে করেছিল। ভেবেছিল সেই ফন্দি সফল হলে সে আত্মপ্রকাশ করবে।

কিন্তু সৌদামিনী রাজি হয়নি।

তখন বঙ্কুবিহারী সৌদামিনীকে হত্যা করবার ভয় দেখায়। সৌদামিনী তখন পাল্টা ভয় দেখাতে থাকে যে তার আগেই সে সব ঘটনা পুলিশের কাছে প্রকাশ করে দেবে।

কাজেই বঙ্কুবিহারী খুবই মুশকিলে পড়ে যায়।

তবু বঙ্কুবিহারী তার স্বভাবগত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে ছাড়েনি। সে বহুদিন সৌদামিনীকে মারধর করেছে। খুন করবার চেষ্টাও করেছে।

সৌদামিনী নিজের শক্তির জোরে বেঁচে গেছে মৃত্যুর হাত থেকে।

অবশেষে বঙ্কুবিহারী বোধহয় স্থির করে এই বাড়ির আশা ত্যাগ করে সে অন্য প্রদেশে চলে যাবে। একদিন সে সৌদামিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করে। তারপরেও সে মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আসত। চুপচাপ থাকত—সৌদামিনীর সঙ্গে কথা বলত না। মাঝে মাঝে গভীর রাতে কয়েকজন লোক নিয়ে বাড়িতে আসত। সৌদামিনীর ঘরে ঢুকত না। তারা কী করত সৌদামিনী জানে না। রাত শেষ হবার আগেই সবাই চলে যেত।

যেদিন বঙ্কু শেষবারের মতো এই বাড়িতে আসে, সেদিন যাবার সময় বলে যায়, 'এই বাড়িতে আমি আর কোনওদিন আসব না। কিন্তু এ কথা জেনে রেখো এই বাড়িতে তুমিও সুখে বাস করতে পারবে না।'

এরপর বঙ্কুবিহারী সত্যি আর এই বাড়িতে আসেনি। দিনের পর দিন যেতে লাগল। অনুতপ্ত জীবন নিয়ে দিন কাটাতে লাগল সৌদামিনী। উপরের ঘর ভাড়া দিয়ে নীচে বাস করতে লাগল সে। আর্থিক অনটন তার হয়তো কোনওদিনই হত না, যদি না তার সঞ্চিত অর্থ যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল সেই ব্যাঙ্ক ফেল করত।

বাংলার বাইরে অন্য এক প্রদেশে ডাকাতি করতে গিয়ে বঙ্কুবিহারী মারা পড়েছিল সে খবর কী ভাবে যেন জানতে পেরেছিল সৌদামিনী। তারপরেই সে এই বাড়িটা বিক্রি করবার চেষ্টা করে। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। কান্নাকাটি করে আমার কাছে

অনেক কথাই সে বলেছিল। তবে অনুরোধ করেছিল, আমি যেন কাউকে এই কথা না বলি। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। অসহায় বিধবার মুখের দিকে তাকিয়েই তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলাম। তার ইচ্ছানুসারেই স্বীকার করেছিলাম যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন এই বাড়িতেই বাস করবে।

সৌদামিনী মারা গেছে, তাই এখন আর কোনও কথা প্রকাশ করতে বাধা নেই। বাড়ির আমার দরকার ছিল না। শুধু বিধবাকে সাহায্য করবার জন্যই বাড়িটা কিনেছিলাম। কিন্তু এই বাড়িটা যে এত অভিশপ্ত তা কে জানত? আপনার কাছে সব কথা শুনে আমার তো মশাই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে।

তরফদার বললেন, 'আমারও আক্কেল গুড়ুম হবার জোগাড়! কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে আমার কৌতূহল আছে বলেই আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। চিন্তা করছি, যে কোনও উপায়ে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় কি না।'

পরিতোষ চৌধুরি বললেন, যদি রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে পারেন তবে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, পরিতোষবাবু, বঙ্কুর সেই গোপন আড্ডাটি কোথায় ছিল তা বলতে পারেন?'

পরিতোষবাবু বললেন, 'না, আমি তা জানি না। ও সম্বন্ধে জানবার কৌতূহলও আমার কোনওদিন হয়নি।'

তরফদার আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বঙ্কুবিহারীর সেই সাগরেদটির খবর কিছু রাখেন কি? সে কি বেঁচে আছে, না এখনও জেলে আছে অথবা নিজের ব্যবসাই শুরু করেছে আবার?'

পরিতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'নিজের ব্যাবসা আবার কী? তারও কোনও নিজের ব্যবসা ছিল নাকি? আপনি কি তার খবর রাখতেন? আমি তো তার ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু বলিনি আপনাকে।

তরফদার বললেন, 'সে আবার কি বলতে হয়? ছিনতাই, রাহাজানি এ সবই তো ছিল তাদের জাত-ব্যবসায়।'

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন পরিতোষবাবু। বললেন, 'ও, আমি আপনার কথার রহস্য বুঝতে পারিনি।'

পরিতোষ চৌধুরি সেদিনই চলে গেলেন। তরফদার ভাবতে লাগলেন আকাশ-পাতাল। কিন্তু সবার আগে, তাঁর দুশ্চিন্তা হতে লাগল নিবারণের ব্যাপার নিয়ে। নিবারণ কোথায় গেল? তার বাড়িতেও সে ফেরেনি। তা হলে তার অন্তর্ধানের পেছনেও কি কোনও রহস্য আছে?

কে জানে?

॥ তেরো ॥

নিবারণের অন্তর্ধানের রহস্য

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল।

নিবারণ সেই যে ছুটে চলে গেছে আর সে আসেনি। কোথায় গেল সে?

তরফদার নানা জায়গায় তার খোঁজ করলেন। কোথাও খোঁজ না পেয়ে চলে গেলেন থানায়। থানার ও সি চঞ্চল লাহিড়ী তরফদারকে চিনতেন। তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার? আমাদের এখানে কী মনে করে? কোনও খুনের ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

তরফদার বললেন, 'খুনের ঘটনা না ঘটলেও ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। আমার ভৃত্য ও সহকারী নিবারণ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন তরফদার।

চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, 'ভয় পেয়ে সে তার দেশের বাড়িতে চলে যায়নি তো?'

তরফদার বললেন, 'যে ভূতকে এত ভয় পায় সে কি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবে?'

চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, 'কথাটা মন্দ বলেননি। কিন্তু যাবেই বা কোথায়? রাস্তায় খুনটুন হয়নি তো?'

তরফদার বললেন, 'খুনটুন হলে তো আপনাদের এখানেই রিপোর্ট আসত।'

চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, 'আমার এরিয়া হলে এই থানার খবর আসত, কিন্তু অন্য এরিয়ায় এই ঘটনা ঘটলে তা তো আর এখানে আসবে না।'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

চঞ্চল লাহিড়ী জবাব দিলেন, 'কলকাতায় কত রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটে, কাজেই আগাম কিছু বলা অসম্ভব। তবে আমি একটা ডায়েরি লিখে রাখছি।'

তরফদার থানা থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে গেলেন। বিকেলের দিকে তৈরি হয়ে আবার এসে উপস্থিত হলেন সেই ভূতুড়ে বাড়িতে। কিন্তু মনটা তার ভয়ানক নিঃসঙ্গ। বাঘা নেই, নিবারণও নেই। একজন সঙ্গী থাকলে কাজে খুব সাহস বাড়ত।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে তরফদার বাড়ির ভিতরে পা দিলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বাড়ির ভিতরটায় কী রকম যেন একটা গুমোট ভাব।

নীচের তলার সামনের ঘরে পা দিয়েই থমকে গেলেন তরফদার। এ কী? মেঝের উপর কে পড়ে আছে অমন ভাবে?

কাছে গিয়ে দেখলেন, নিবারণ। একটা গোঙানির শব্দ তার মুখ থেকে বেরুচ্ছে। একেবারে জ্ঞানহারা সে হয়নি। জ্ঞান কিছুটা তখনও আছে।

বিস্মিত হয়ে গেলেন তরফদার। বাড়ির ভেতরেই একটা জলের কল ছিল। সেখান থেকে

রুমালটা ভিজিয়ে এনে নিবারণের মুখে চোখে ঘষতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে প্রকৃতিস্থ হল।

স্থির হয়ে মেঝের উপরে উঠে বসল নিবারণ। তারপর তার মুখ থেকে যে ঘটনা শোনা গেল তা খুবই আশ্চর্যজনক।

নিবারণ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এমন ভয় পেয়েছিল যে কিছুতেই সে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। পথে বেরিয়েও স্থির করতে পারছিল না কোথায় যাবে। তারপর কীসের যেন আকর্ষণে সে ছুটে গিয়েছিল পথের বাঁক ঘুরে ছোট্ট ঝিলটার পাশে।

তরফদার এবার তাকে একটু থামতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, তুমি বাড়িতে চলে যেতে পারলে না?'

নিবারণ জবাব দিল, 'আমার যে একটা থাকবার আস্তানা আছে সে কথাও ভুলে গিয়েছিলাম কর্তা।'

তরফদার বললেন, 'আর এটাও তো জানো, আমি বাড়িতেই রয়েছি, আমি থাকতে তোমার কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। বিপদ হলে দুজনেরই হবে।'

নিবারণ বলল, 'আমার কোনও কিছুই খেয়াল ছিল না কর্তা। আমার কী যে হয়েছে তা নিজেই জানি না। হয়তো কোনও মায়াবী ভর করেছিল।'

তরফদার বললেন, 'বাজে কথা রাখো। তারপর কী হয়েছিল বলো।'

নিবারণ বলল, 'সত্যি আমি যেন নেশার ঘোরে ছুটে চলেছিলাম। কোনদিকে যাচ্ছিলাম নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। চলতে চলতে দেখলাম একটা ঝিলের পাশে এসে পড়েছি।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কী হল?'

নিবারণ জবাব দিল, 'তারপর কী হল আমি কিছুই জানি না কর্তা। আমার মাথাটা ঘুরছিল। তারপর বোধহয় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।'

তরফদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি এখানে আবার এলে কী করে?'

নিবারণ বলল, 'আজ দুপুরবেলায় আমার জ্ঞান ফিরে এল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। ভাবলাম, আপনি এই বাড়িতে একা রয়েছেন। তাই আপনার খোঁজে এই বাড়ির দিকে রওনা হলাম।'

'তারপর?'

'বাড়িতে ঢুকবার মুখেই আমি শুনতে পেলাম বাঘা যেন ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে।'

'বাঘা ডাকছে? এ কী কথা তুমি বলছ নিবারণ?'

'হ্যাঁ কর্তা। আমি নিজের কানে শুনেছি।'

'কিন্তু বাঘা যে মারা গেছে তা তো তুমি জানো? তার মৃতদেহটা এখনও পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে।'

'হ্যাঁ, তা তো জানি। কিন্তু—'

'চলো নিজের চোখেই তার মৃতদেহটা দেখে আসি। ওটাকে তো ঘর থেকে সরানোও দরকার। নইলে পচে দুর্গন্ধ বের হবে।'

'চলুন কর্তা।'

নিবারণকে নিয়ে তরফদার দোতলার ঘরে গেলেন যেখানে কাল রাত্রে অনেক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখলেন সেখানে বাঘার মৃতদেহ নেই।

চাপ চাপ রক্তের দাগ রয়েছে মেঝেতে, কিন্তু মনে হয় সেই রক্তের দাগ যেন আগের চেয়ে অস্পষ্ট—কিছুটা ম্লান। তা হলে অন্য কোনও জন্তু কি সেই রক্ত চেটে খেয়েছে?

সব কিছুই যেন রহস্যজনক মনে হতে লাগল তরফদারের কাছে। কী ব্যাপার?

নিবারণ জিজ্ঞেস করল, 'কর্তা, কেউ কি তা হলে এ বাড়িতে এসেছিল আমাদের চলে যাওয়ার পর? মরা কুকুরটাকে কি কেউ টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে দিল, না ওটা আবার বেঁচে উঠল? আমি ঘেউ ঘেউ শব্দই বা শুনলাম কীসের?'

তরফদার বললেন, 'ওসব কথা এখন থাক নিবারণ। এখন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসো। তোমার কাছে ব্যাপারটা শুনি।

দুজনে ঘরে বসলেন। নিবারণ বসল খাটটার ওপর আর তরফদার বসলেন চেয়ারে। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল এ বাড়িতে পা দিয়েই তুমি কুকুরের ডাক শুনতে পেয়েছিলে, সেটা কি বাঘার ডাক না অন্য কোনও কুকুরের ডাক?'

নিবারণ বলল, 'না কর্তা, ওটা ঠিক বাঘার ডাক। আমি কি বাঘার ডাক আর অন্য কুকুরের ডাক বুঝতে পারি না?'

'তখন তোমার কী মনে হল?'

তখন আমার মনে হল—বাঘা কি তাহলে বেঁচে উঠেছে? বাঘা কি মরেনি?

'বেশ তারপর?'

'ঘেউ ঘেউ শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কর্তা। একবার মনে হয় ওপরে—একবার মনে হয় নীচের ঘরে। ওপরের ঘরের দিকে যাবার জন্য সিঁড়ির অর্ধেক পথে উঠতেই আবার বাঘার ঘেউ ঘেউ শব্দ নীচের দিকে শুনতে পেলাম। তখন নীচের ঘরে এসে ঢুকলাম। কিন্তু দেখি ঘর ফাঁকা। তখন বেরিয়ে আসবার জন্য পা বাড়ালাম। কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারি না। হঠাৎ একটা আবছা ছায়ামূর্তি আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। কিছুতেই আমাকে বের হতে দিল না। সাহস করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু এক প্রবল ধাক্কায় মেঝের ওপর পড়ে গেলাম।

তরফদার এবার সত্যি মনের মধ্যে একটা প্রবল ধাক্কা খেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কী হল?'

নিবারণ বলল, 'তারপর কী হল, আমি কী করে বলব কর্তা। আপনিই তো আমাকে চোখে মুখে জল দিয়ে সুস্থ করে তুললেন। আমার বড়ো ভয় লাগছে কর্তা।'

তরফদার একটু থেমে বললেন,—'আর কোনও ভয় নেই নিবারণ। আজ রাতটা এখানে কাটাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আর কাটাব না। আজ ফিরে চলো। বাড়িওয়ালার সরকারের সঙ্গে আমার সব কথাবার্তা হয়ে গেছে। রবিবার দিন আমরা আবার এখানে এসে মিলিত হব। এবার আর একা নয়—সঙ্গে থাকবে কয়েকজন লোক আর কুলি-মজুর। ভূতের আড্ডা এবার ভাঙতে পারব আশা করি। তোমাকে ফিরে পেয়ে আমার প্রাণটাও যেন ফিরে এসেছে। চলো বাড়ি যাই।'

সদরটা এবার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন তরফদার। তারপর দুজনে ফিরে চললেন।

॥ চৌদ্দ ॥

রহস্যের অনুসন্ধান

যথানির্দিষ্ট দিনে ও যথাসময়ে আবার তরফদারের হানাবাড়িতে আবির্ভাব ঘটল। গিয়ে দেখলেন, মিস্ত্রি ও মজুরদের নিয়ে রমেনবাবু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

সেই ছোটো ঘরটাতেই আগে ঢোকা হল। ঘরে সিঁদুর মাখা কয়েকটা পাথর ও কতগুলি ভাঙা জিনিসপত্র দেখে তরফদার বললেন, '—এই জিনিসগুলি আগে সরানো দরকার।'

মজুরদের সাহায্যে সেই সব পাথর ও ভাঙা জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে ফেলা হল। দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল, মেঝের ওপর চৌকো দরজার মতো কী একটা জিনিস বসানো রয়েছে। সেটা লোহার শিকল ও তালা দিয়ে বন্ধ।

তরফদার বললেন, 'এটা কী? মনে হয় কোনও চোরাদরজা।'

মজুররা বলল, 'আমাদেরও তাই মনে হয় হুজুর।'

তরফদার বললেন, 'ভেঙে ফ্যালো দরজার শিকল ও তালা।'

হাতুড়ি ও শাবল প্রভৃতির সাহায্যে তালা ও শিকল ভেঙে ফেলা হল। দরজা খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল স্যাঁতসেঁতে বন্ধ বাতাসের দুর্গন্ধ।

রমেনবাবু উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'রমেনবাবু, কী দেখছেন ভিতরে?'

রমেনবাবু বললেন, 'মশাই, এটা তো একটা চোরাকুঠুরি বলে মনে হচ্ছে, ভেতরটা যে একেবারে অন্ধকার।'

তরফদার উঁকি দিয়ে দেখলেন, তাঁর মনে হল বহুকাল এই চোরাকুঠুরি ব্যবহার হয়নি। এর মধ্যে সাপ আছে কি ব্যাং আছে বোঝবার উপায় নেই। তাই বললেন, 'আলো না নিয়ে নীচে নামা কিছুতেই নিরাপদ নয়।'

রমেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

লণ্ঠন জ্বালিয়ে আনার ব্যবস্থা হল। তরফদার বললেন, 'আসুন রমেনবাবু আমার পেছনে।'

রমেনবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'এবার আমার পৈতৃক প্রাণটা যাবে দেখছি।'

তরফদার একটুখানি ঢুকেই বললেন, 'পাশের ওই দেয়ালটাও ভাঙতে হবে, নইলে ঢোকা যাবে না।'

মজুরদের দিয়ে দেয়ালটারও কিছু অংশ ভাঙতে হল। তখন ভিতরে যাবার পথটি যেন আরও প্রশস্ত হল। তখন তরফদার রমেনবাবুকে বললেন, 'এবার এগিয়ে আসুন।'

তরফদার নিজেও এগিয়ে যেতে লাগলেন।

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকেও সত্যি ওখানে ঢুকতে হবে নাকি?'

তরফদার জবাব দিলেন, 'ঢুকতে হবে না তো কী? দেখছেন না আমি ঢুকছি।'

রমেনবাবু বললেন, 'আমার ঢুকে কী লাভ বলুন?'

তরফদার বললেন, 'লোকসান হবে বলেই বা ভাবছেন কেন? লাভও তো হতে পারে।'

রমেনবাবু বললেন, 'কিন্তু—'

তরফদার বললেন, 'কিন্তু নয়, আসুন, লাভ লোকসান যা হবে দুজনেই না হয় ভাগ করে নেব।'

রমেনবাবু সেই গন্তব্যস্থলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও মশায়, আপনি কি মনে করেন ওখানে গুপ্তধন আছে নাকি?'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

রমেনবাবু জবাব দিলেন, 'আমার মনে হয়, গুপ্তধনের আশা যদি আপনি করে থাকেন তবে খুবই ভুল করছেন।'

তরফদার বললেন, 'আপনার ভয় করছে নাকি? জানেন তো গোলাপ তুলতে গেলে কাঁটার আঘাত পেতে হয়।'

রমেনবাবু বললেন, 'তা জানি।'

তরফদার বললেন, 'তবে আর দেরি করছেন কেন? দেখছেন তো আমি ঢুকছি।'

রমেনবাবু আর আপত্তি করতে পারলেন না। তরফদারের পদাঙ্ক অনুসরণ তাঁকে করতে হল।

কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে দুজন সেই চোরাকুঠুরিতে ঢুকলেন। দুজন মজুরকেও সঙ্গে নেওয়া হল। অন্ধকার চোরাকুঠুরি। কোনও দিক থেকে আলো ঢুকবার ব্যবস্থা নেই। প্রথমে সবাই সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে সবারই চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর অন্ধকারটা যেন চোখে একটু সয়ে এল। কিছু কিছু দেখা যেতে লাগল ঘরের ভেতরটা।

চোরাকুঠুরির ভেতরে আসবাবপত্র কিছুই নেই, আছে শুধু একটা লোহার সিন্দুক।

সিন্দুকটায় মরচে ধরে গেছে, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত। চাবি বন্ধ করা। কিন্তু চাবি কোথায়! অনেক খুঁজেও চাবি পাওয়া গেল না। তখন মজুরদের সাহায্যেই অনেক চেষ্টা করে সিন্দুকটার ডালা খোলা হল।

সকলেরই কৌতূহল ছিল, ভিতরে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনও ধনদৌলত বা বহুমূল্য জিনিস পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল একখানি হাতে লেখা পুথি আর তার উপরে বসিয়ে রাখা একখানা চিনেমাটির রেকাবি।

রমেনবাবু বললেন, ওটা কী?'

সবার মনেই কৌতূহল আর আশঙ্কার ভাব। কিন্তু কেউ ওটাকে ধরবার সাহস পেল না।

তরফদার টর্চের আলোতে ভালো করে জিনিসটা দেখলেন। তারপর রমেনবাবুকে বললেন, 'আমার টর্চটা ধরুন।'

রমেনবাবু টর্চটা হাতে নিলে সাহস সঞ্চয় করে আস্তে আস্তে রেকাবিখানা হাতে করে তুলে নিলেন তরফদার।

সবার তখন কৌতূহল সেদিকে।

তরফদার রমেনবাবুকে বললেন, 'টর্চের আলোটা ভালো করে এটার উপর ফেলুন তো।'

রমেনবাবু টর্চের আলো নিবদ্ধ করলেন সেই রেকাবিটার উপরে। দেখা গেল তাতে জলের মতো টলমল করছে কী একটা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও তরল পদার্থ। তারই ভিতরে বসানো আছে কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্রের মতো দেখতে একটি ছোটো যন্ত্র। একটি কাঁটাও রয়েছে যন্ত্রের মধ্যে এবং সেটা অতি দ্রুত গতিতে ঘোরাফেরা করছে এদিকে আর ওদিকে।

সবাই একটু অবাক হয়ে গেল, সেই জিনিসটি দেখে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই, নির্বাক দর্শকের মতো সবাই সেই আশ্চর্য জিনিসটি দেখতে লাগল।

সবাই ক্রমে ক্রমে অনুভব করল, সেই জলের মতো পদার্থ থেকে চারদিকে যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। গন্ধটা তীব্র নয়, খারাপ কিছু বলেও মনে হল না।

কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন তরফদার। তাঁর দেহমন ও শিরা উপশিরার মধ্যে সেই অজানা গন্ধ আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করল। তাঁর শরীরে যেন একটা মৃদু কম্পন অনুভব করতে লাগলেন। তারপর শুধু তরফদারের উপরে নয়, অন্যান্য সকলের উপরেও সেই প্রভাব পড়তে বিলম্ব হল না। তারাও যেন দেহে মৃদু কম্পন অনুভব করতে লাগলেন।

ক্রমেই যেন বাড়তে লাগল সেই প্রতিক্রিয়া।

তরফদারের হাতের আঙুল থেকে মাথার চুলে পর্যন্ত এমন অসহনীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচল করতে লাগল যে, তিনি যেন কী রকম একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কী

রকম যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি! রেকাবিখানা আর ধরে রাখতে পারলেন না তরফদার। সেটা মাটির উপরে পড়ে সশব্দে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তরল পদার্থটা মেঝের উপরে গড়াতে লাগল এবং যন্ত্রটাও ছিটকে পড়ল একদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে লাগল এক অলৌকিক ব্যাপার।

ঘরের চারদিকের দেওয়াল কাঁপতে কাঁপতে দুলতে লাগল—মনে হল যেন কোনও বিপুলবপু মহাদানব প্রচণ্ড আক্রোশে ঘরের সব মানুষের উপর ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে।

প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সবাই নির্বাক, নিস্তব্ধ। কিন্তু তারপরেই সকলের মুখে ভাষা ফুটে উঠল। 'পালান! পালান!' রব উঠল কুঠুরির মধ্যে।

সবাই সন্ত্রস্ত। সবাই চঞ্চল। সকলেই বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কিন্তু হতবুদ্ধি হয়ে তারা যেন বাইরে বেরুবার পথও হারিয়ে ফেলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে সকলে কোনওরকমে চোরাকুঠুরির বাইরে পালিয়ে এল।

কিন্তু ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে পালাবার সময়ও তরফদার পুথিখানা আনতে ভুললেন না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন—সেটা কোনও ছাপানো বই নয়—হাতে লেখা 'মহানির্বাণতন্ত্র'।

বাইরে আসার পর কোনও কম্পন আর কেউ অনুভব করতে পারল না। তরফদার একটু নিশ্চিন্তভাবেই পুথিখানা খুলে দেখতে লাগলেন। ভিতরে পাওয়া গেল একখণ্ড কাগজ। তার উপরে কতগুলি কথা লেখা। অনেকদিন আগেকার লেখা বলেই মনে হয়। বিবর্ণ হয়ে গেছে লেখাগুলি।

তরফদার লেখাগুলির বক্তব্য উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন। সকলেই সেই কাগজখণ্ডটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তরফদার কথাগুলির মর্ম উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। কাগজটিতে এই কথাগুলি লেখা—

'এই বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে সচেতন বা অচেতন জীবন্ত বা মৃত যা কিছু আছে, যন্ত্রের কাঁটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চলবে আমার ইচ্ছাশক্তির বশবর্তী হয়ে। অভিশপ্ত হোক এই বাড়ি—অশান্তিপূর্ণ হোক এখানকার প্রত্যেক আত্মা।'

সুমন্ত তরফদার ভাবতে লাগলেন এগুলি দিয়ে কী করবেন।

রমেনবাবু এতক্ষণ প্রায় হতভম্ব নীরব দর্শকই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছেন তরফদারবাবু?'

তরফদার জবাব দিলেন, 'এগুলি নিয়ে কী করব তাই ভাবছি।'

রমেনবাবু বললেন, 'এসব শত্রুকে নষ্ট করে ফেলুন, পুড়িয়ে দিন।'

—'হ্যাঁ, তাই করব।'

—'করব নয়, এখনই করুন।'

—'বেশ তাই হোক।'

পুথি, কাগজপত্র ও যন্ত্র সব বাইরে এনে জড়ো করা হল। জড়ো করা হল কিছু শুকনো কাঠ ও নানা জিনিসপত্র। তারপর তরফদার মজুরদের বললেন, 'এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও।'

আগুনে সব কিছু পুড়িয়ে দেওয়া হল।

তরফদার বললেন, 'এ বাড়ি নিয়ে আমার গবেষণা শেষ। আজ থেকে আমার ছুটি।'

রমেনবাবু বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, ভূতের উপদ্রব আর এ বাড়িতে হবে না?'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।'

রমেনবাবু বললেন, 'কিন্তু—'

তরফদার বললেন, 'যদি এর পরও কোনও কিছু উপদ্রবের কথা শোনেন, তবে আমাকে খবর দেবেন। আমি আবার নতুনভাবে গবেষণা করব।'

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তরফদার।

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। এরপর ওই বাড়িতে আর কোনও উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি।

বিশাল গড়ের দুঃশাসন

পূর্বার্ধ

এক

ছিটগ্রস্ত রাজাবাহাদুর

বিশালগড় আগে ছিল স্বাধীন দেশীয় রাজ্য।

বিশালগড়ের স্বাধীনতা আজ আর নেই বটে, কিন্তু তার অধিকারীকে এখনও লোকে স্বাধীন রাজার মতোই ভয় ও ভক্তি করে। তাঁর নাম রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ।

মধ্যভারতের বিন্ধ্য শৈলমালার ছায়ায় বসে এই বিশালগড় আজও যেন তাকিয়ে আছে সেই সুদূর অতীতের দিকেই। তার চারিপাশেই আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন নেই কিছুমাত্র। কারণ, রাজার জমিদারি থেকে অনেক তফাতেই নির্মাণ করা হয়েছে এই বিশালগড় নামে দুর্গপ্রাসাদখানি। তার চারিদিকেই বিরাজ করছে ছোটো-বড়ো পাহাড়ের পর পাহাড়, গিরিশিখরের পর গিরিশিখর, বিপুল অরণ্যের গহন শ্যামলতা, শস্যহীন প্রান্তর, কলরবে মুখরা গিরিতরঙ্গিনী। সেখানে শব্দ সৃষ্টি করে কেবল নিবিড় বনের পত্রমর্মর ও নানান জাতের বিহঙ্গেরা, এবং সেখানে নৈশ আকাশের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে থেকে থেকে নিশাচর বাদুড়ের আন্দোলিত পক্ষ, আর কালপেচকের কর্কশ কণ্ঠ, আর বনবাসী হিংস্র পশুদের ভয়াল গর্জন। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এমন এক স্থানে বিশালগড়ের দুর্গপ্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তার মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। একটিমাত্র পথ দিয়ে প্রাসাদের তোরণদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায়। সে পথও এমনি দুর্গম ও বন্ধুর যে, কোনও সাধারণ পথিককেই তা আকৃষ্ট করতে পারে না। কখনও নতোন্নত পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনও বেগবতী স্রোতস্বতীর উপরকার জীর্ণ সেতুকে আশ্রয় করে, কখনও ধু-ধু প্রান্তরের একটি অংশকে চিহ্নিত করে এবং কখনও বা দিনেরবেলাতেও বিজন বনের অন্ধকারকে ভেদ করে সেই সুদীর্ঘ পথ অজগরের মতো এঁকে-বেঁকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে বিশালগড় অভিমুখে।

এই বিচিত্র দুর্গপ্রাসাদের বয়স কত, এখনকার কেউ তা জানে না। তবে আকার দেখে মনে হয়, বহু শতাব্দীর বহু ঋতু তার উপরে রেখে গিয়েছে আপন-আপন হাতের চিহ্ন। অভিশপ্ত তার মূর্তি! কোথাও তার কঠিন পাথরের দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে শূন্যের দিকে বাহু বিস্তার করেছে রীতিমতো বড়ো বড়ো অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, কোথাও তার দেওয়ালের বাঁধন ছেড়ে নীচেকার ভূমিকে আশ্রয় করেছে ছোটো-বড়ো পাথরের পর পাথরের খণ্ড, এবং কোথাও বা তার সু-উচ্চ দেওয়াল এমনভাবে হেলে পড়েছে যে দেখলেই মনে হয়, তারা সশব্দে মাটির উপরে আছড়ে পড়বে এই মুহূর্তেই। লোকে বিশালগড়ের রাজাবাহাদুরকে জানে ধনকুবের বলে। কিন্তু বিশালগড়ের ছন্নছাড়া মূর্তি দেখলে লোকের এই ধারণাকে একটুও সত্য বলে মনে হয় না। রাজার সম্বন্ধে লোকে আরও অনেক আশ্চর্য কথাই বলে। কিন্তু সে সব কথায় কান

পাতবার আগে আপনারা আমার কাহিনী শ্রবণ করুন। আমি যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি, তাই এখানে অকপটে লিপিবদ্ধ করতে চাই। এ কাহিনী এতই ভয়াবহ, এতই রোমাঞ্চকর এবং এতই অপার্থিব যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো অনেকেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। অনেকে আমাকে যদি উন্মাদগ্রস্ত বলে ভাবেন, তাহলেও আমি বিস্মিত হব না। কিন্তু লোকের বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কিছুই এসে যায় না আমার। কারণ আমি নিজে স্বচক্ষে যা দর্শন করেছি তা অসত্য নয় বলেই মনে করি।

এইবারে আমার নিজের কথা আরম্ভ। আমি কলকাতার এক অ্যাটর্নি-বাড়ির শিক্ষানবিশ, এবং নিজেও অ্যাটর্নি হবার জন্যে শেষ পরীক্ষা দিয়েছি। বিশালগড়ের রাজা আমাদের অফিসে পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েক বিঘা জমি সমেত তিনি একখানি সুবৃহৎ বাগানবাড়ি ক্রয় করতে চান। এবং সেইসঙ্গে তিনি আর একটি অদ্ভুত অনুরোধও করেছেন। বাগানবাড়িখানি খুব জীর্ণ ও পুরাতন হলেই তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। এ-রকম অদ্ভুত অনুরোধ আমাদের অফিসে আর কখনও আসেনি।

কর্তা আমাকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখো বিনয়, লোকটির মাথায় বোধহয় দস্তুরমতো ছিট আছে। কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। সে পাগলই হোক, আর ছিটগ্রস্তই হোক, মক্কেল হচ্ছে মক্কেল। আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য পেলেই আমরা তুষ্ট হব। কী বলো, তোমার কী মত?'

—'আজ্ঞে, আমারও ওই মত।'

—'এখন শোনো। এই ছিটগ্রস্ত রাজাবাহাদুরটি যে-রকম বাড়ি চান, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেইরকমই একখানা বাড়ি আমাদের হাতে আছে। কলকাতার খুব কাছেই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে থাকলেও ওই বাড়িখানাকে কেউ কিনতে চায় না। কারণ সবাই বলে, ওখানা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি। আমি মনে করছি, রাজাবাহাদুরকে ওই বাড়িখানিই কিনতে বলব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে?'

—'কেন হবে না?'

—'রাজা পুরোনো বাড়ি চেয়েছেন বটে, কিন্তু ভুতুড়ে বাড়ির উপরে তাঁর কোনও লোভ না থাকতেও পারে।'

কর্তা বললেন, 'বাপু, আমি মক্কেলকে ঠকাব না। তিনি কেনবার আগেই তাঁকে ওই দুর্নামের কথা জানিয়ে দেব। কিন্তু সে কথা যাক। এখন তোমাকে ডেকেছি কেন, শোনো। রাজা থাকেন মধ্যভারতের বিশালগড়ে। তুমি কি বিশালগড়ের নাম শুনেছ?'

—'আজ্ঞে না, বিশালগড় যে কোথায় তাও আমি জানি না।'

—'তোমার জানবার বিশেষ দরকারও নেই। কারণ, একখানি কাগজে পথের সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে তোমার হাতে আমি দেব। তা দেখলেই তুমি অনায়াসে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে পারবে, কারণ আমি স্থির করেছি, বিশালগড়ের রাজার কাছে পাঠাব তোমাকেই। রাজার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহারও হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, যথাস্থানে আর যথাসময়ে আমার প্রতিনিধির জন্যে তাঁর গাড়ি উপস্থিত থাকবে। কালই তোমাকে বিশালগড়ে যাত্রা করতে হবে।'

দুই

শরীরী প্রেত

যথাসময়ে রেলপথে বিশালগড় এস্টেটের কাছারিবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলুম, রাজার জমিদারি বিশালগড় নামে পরিচিত হলেও আসল বিশালগড় আছে সেখান থেকে আরও পঞ্চাশ মাইল দূরে। রাজা নাকি বেশির ভাগ সময়েই সেইখানেই থাকেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলেও আমারও সেখানে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কাছারিবাড়িতে আমার নামে লেখা রাজা রুদ্রপ্রতাপের একখানি পত্রও পেলুম। তাতে লেখা আছে :

'প্রিয় বিনয়বাবু,

আশা করি আপনি নিরাপদে আমার দেশে এসে পৌঁছেছেন। ওখান থেকে আমার প্রাসাদ অবশ্য খুব কাছে নয়, কিন্তু সেজন্যে আপনার চিন্তার কারণ নেই, কারণ ওখান থেকে গোরুর গাড়ি চড়ে আপনি অনায়াসে 'পঞ্চগ্রাম' পর্যন্ত আসতে পারবেন। সকালে বা দুপুরে কোনও একটা সময়ে গোরুর গাড়ি আপনাকে পঞ্চগ্রামে পৌঁছে দেবে। সেখানে একখানি সরাই আছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি সেইখানেই অপেক্ষা করবেন। তারপর আমার নিজের গাড়ি আপনাকে আনবার জন্যে পঞ্চগ্রামে উপস্থিত হবে। ইতি

রুদ্রপ্রতাপ'

পঞ্চগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সরাই খুঁজে নিতে দেরি হল না। ছোটো সরাই, আমার মতন আরও কয়েকজন পথিকও এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এবং তাদের তদারক করছেন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তিনিই নাকি সরাইয়ের মালিক। তিনি বিধবা; এই সরাই থেকে যে আয় হয় তার দ্বারাই তাঁর সংসার চলে যায়।

আমার মতন লোক এই সরাইয়ে বোধহয় বেশি আসে না। কারণ, আমার পরিচ্ছদ দেখে অনেকেরই চোখ হয়ে উঠল যেন সচকিত। তারা চুপিচুপি পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগল। কিন্তু তাদের চোখ-মুখ দেখে বেশ বুঝলুম যে তারা আলোচনা করছে আমার সম্পর্কেই।

সরাইয়ের বৃদ্ধা অধিকারিণী হিন্দি ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললুম, 'আমি কলকাতা থেকে আসছি, যাব বিশালগড় রাজপ্রাসাদে।'

বৃদ্ধা যে রীতিমতো চমকে উঠলেন, সেটা আমার নজর এড়াল না। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আপনি বিশালগড় রাজপ্রাসাদে যাবেন! কেন?'

—'রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে ডেকেছেন।'

বৃদ্ধার মুখের উপর দিয়ে যেন কেমন একটা কালো ছায়া পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। তিনি যেন উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠলেন, 'রাজাবাহাদুর আপনাকে ডেকেছেন! রাজা রুদ্রপ্রতাপ?'

—'হ্যাঁ, তিনিই। কিন্তু রাজার নামে আপনি যেন কিছু বিচলিত হয়েছেন। এর কারণ কী?'

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'এর কিছুই কারণ নেই বাবুজি! আপনি তো সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানেই থাকবেন? আসুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দি।'

দুপুরে খাবার জন্যে আমার ডাক পড়ল। খাবার ঘরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক প্রবেশ করল। সকলে একসঙ্গে খেতে বসল।

খেতে খেতে বেশ লক্ষ করলুম, সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে। সকলেরই চোখে ফুটে উঠেছে যেন একটা ভয়ের ও করুণার ভাব। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, এ-রকম দৃষ্টির অর্থ কী হতে পারে?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎ একটি মাঝবয়সি লোক আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'মশাই, ক্ষমা করবেন। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

আমি হেসে বললুম, 'অনায়াসেই।'

—'শুনলুম, আপনি নাকি বিশালগড়ের রাজবাড়িতে যাচ্ছেন?'

—'ঠিকই শুনেছেন।'

—'আপনি এর আগে কখনও এখানে এসেছেন?'

—'না।'

—'বিশালগড়ের রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

—'না।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এখান থেকে বিশালগড়ের রাজবাড়ি হচ্ছে ত্রিশ মাইল দূরে। কেমন করে আপনি এই পথটা পার হবেন?'

—'রাজাবাহাদুরের গাড়ি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে সন্ধ্যার সময় এখানে আসবে।'

ঘরের ও-কোণ থেকে হঠাৎ আর-একজন লোক ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল—'আজ হচ্ছে অমাবস্যার শনিবার!'

আর-একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি স্বরেই বললে, 'তার উপরে আবার সন্ধ্যার সময়ে!'

আরও তিন-চারজন লোকের কণ্ঠে ফুটল অস্ফুট আর্তধ্বনি। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলুম না। অবাক হয়ে এর-তার-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম। অমাবস্যার শনিবারের সন্ধ্যা এদের কাছে এমন কী গুরুতর অপরাধ করেছে?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে শেষটা জিজ্ঞাসা করলুম, 'মশাই, অমাবস্যার শনিবারের সন্ধ্যা নিয়ে আপনাদের এত বেশি মাথাব্যথা কেন? দেখছি, আপনারা তাকে মোটেই পছন্দ করেন না!'

খানিকক্ষণ কেউ আর কোনও সাড়া দিলে না; সকলে আহার করতে লাগল নীরবে। খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়েছে এবং আমি যখন উঠি-উঠি করছি, তখন প্রথম যে মাঝবয়সি লোকটি কথা কয়েছিলেন তিনি বললেন, 'আর একটু বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ভদ্রলোক প্রায় আমার কানের কাছে মুখ এনে অতি মৃদুস্বরে বললেন, 'এ অঞ্চলের সবাই কী বিশ্বাস করে জানেন? বিশালগড়ের দিকে যেতে ওই যে নিবিড় অরণ্য দেখছেন, প্রতি অমাবস্যার শনিবারে সেখানে যখন রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে তখন বনের ভিতরে যে-সব নিশাচর আনাগোনা করে, লোকে বলে তারা মানুষ নয়।'

আমি হেসে বললুম, 'রাত্রে বনে বনে যারা বেড়ায় তারা যে মানুষ নয়, একথা সকলেই জানে। বনের জীব হচ্ছে বাঘ, ভাল্লুক, শেয়াল। তারাই তো নিশাচর।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই, আমি বাঘ-ভাল্লুকের কথা বলছি না।'

—'তবে আপনি কাদের কথা বলছেন?'

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাদের নাম আমি মুখে আনতে পারব না। এইটুকু জেনে রাখুন, তারা বাঘ-ভাল্লুকও নয়, আর মানুষও নয়।'

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, 'ও, আপনি বুঝি ভূত-প্রেতের কথা বলছেন? কিন্তু আমরা হচ্ছি কলকাতার ছেলে, কলেজে বিজ্ঞান পড়েছি। 'ভূতপ্রেত' শব্দ আমাদের অভিধানে নেই। ভূত আমি বিশ্বাস করি না। আর ভূত থাকলেও তারা তো অশরীরী, আমাদের মতো শরীরী মানুষের কোনওই অনিষ্ট তারা করতে পারে না।'

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। একটা হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ওদিক থেকে আর-একজন লোক বললে, 'বাবুজি, আপনি কি শরীরী প্রেতের কথা কখনও শোনেননি?'

—'না। কখনও শুনিওনি, কখনও দেখিওনি, আর কখনও দেখবার বা শোনবার আশাও করি না।' এই বলে আমিও আসন ছেড়ে উঠে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

পথশ্রমে শরীরটা কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘণ্টাচারেক একটানা নিদ্রার পর জেগে উঠে দেখি, সন্ধ্যাসমাগমের আর বেশি বিলম্ব নেই। জানলা-পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সামনের নিবিড় অরণ্যের উপর দিয়ে দলে দলে বক আর বুনো হাঁস বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে। নীচের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরও একজন মানুষও নজরে পড়ল না। সবাই যেন সন্ধ্যার আগেই সেখান থেকে সরে পড়েছে কোন অজানা আতঙ্কে। কিছুক্ষণ মাথা ঘামিয়েও সেই আতঙ্কটা যে কী তা আন্দাজ করতে পারলুম না। শরীরী প্রেত? প্রেত কি কখনও শরীরী হতে পারে? প্রেতের কথা যদি মানা যায় তাহলেও দেখা যায়, মানুষের আত্মা নিরেট দেহ ত্যাগ করবার পরই 'প্রেতাত্মা' আখ্যা লাভ করে। তার পক্ষে শরীরী হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এইসব ভাবতে ভাবতে চারিদিক ছেয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে। তারপরেই দেখতে পেলুম, অরণ্যের ওদিককার অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে দুটো আলো। ঘোড়ার পায়ের ও গাড়ির চাকার শব্দও শুনতে পেলুম।

কিছুক্ষণ পরে একখানা গাড়ি এসে থামল সরাইয়ের সামনে।

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন সরাইয়ের মালিক সেই বৃদ্ধা। অল্পক্ষণ করুণ চোখে আমার দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'বাবুজি, রাজাবাহাদুরের গাড়ি এসেছে।'

আমি তখন উঠে পড়ে নিজের সুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলুম।

বৃদ্ধা তখনও সেখান থেকে চলে গেলেন না। আমি ভাবলুম, তিনি নিজের পাওনা বুঝে নিতে এসেছেন। মনিব্যাগটা বার করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাকে কত দিতে হবে?'

বৃদ্ধা ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'বাবুজি, আপনার যা খুশি হয় দেবেন। আমি পাওনা আদায় করবার জন্যে এখানে আসিনি।'

—'তবে আপনি কী চান?'

—'আমি কিছু চাইতে আসিনি। আমি খালি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনি কি সত্যসত্যই ওই গাড়িতে চড়ে আজ রাত্রে বিশালগড়ে যেতে চান?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কি চলবে না?'

—'না। কাল সকালে আবার আমি এখানে ফিরে এসে দুপুরের ট্রেনে কলকাতায় যেতে চাই।'

বৃদ্ধা বললেন, 'কিন্তু রাজা কি আপনাকে ফিরতে দেবেন?'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফিরতে দেবেন না মানে?'

বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না বাবুজি, আমার কথার কোনও মানে নেই। আমি শুধু কথার কথা বললুম। আচ্ছা, আজ যদি নিতান্তই যেতে চান, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আবার আসছি।'

বৃদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার সুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলুম।

একটু পরেই বৃদ্ধা আবার ফিরে এলেন, তারপর আমার কাছে এসে সস্নেহে বললেন, 'আমার একটি ছেলে ছিল, আপনাকে অনেকটা তারই মতো দেখতে।'

—'আপনার সে ছেলেটি এখন বেঁচে নেই?'

বৃদ্ধার দুই চক্ষু হয়ে উঠল সজল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'না বাবু, আজ তিন বছর তাকে হারিয়েছি। আপনাকে দেখে তার কথা আবার নতুন করে আমার মনে জেগে উঠেছে।'

আমি দরদভরা কণ্ঠে বললুম, 'আহা, আপনার কথা শুনে আমারও দুঃখ হচ্ছে। আপনার ছেলের কী অসুখ হয়েছিল?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বৃদ্ধা বললেন, 'বাবুজি, তার কোনওই অসুখ হয়নি। এক রাতে ওই বনের ভিতরে গিয়ে সে আর আমার কাছে ফিরে আসেনি। তাই তো আমি ভয় পাচ্ছি বাবুজি, তাই তো আমার ইচ্ছা নয় যে আজ রাত্রে আপনি ওই বনের ভিতরে যান।'

বৃদ্ধার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝে আমি সহানুভূতি-মাখা স্বরে বললুম, 'না মা, আমার কোনও বিপদ হবে না—আমি তো যাচ্ছি রাজাবাহাদুরের গাড়িতে।'

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন, 'তাই তো আমার বেশি ভয় হচ্ছে বাবুজি, তাই তো আমি আপনার জন্যে এত ভাবছি!'

আমি আবার বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, 'রাজাবাহাদুরের গাড়িতে যাচ্ছি বলে আপনার ভয় আরও বেড়ে উঠেছে! এ কেমন কথা?'

বৃদ্ধা আবার তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'না বাবুজি, আবার আমি ভুল বলছি। আজ আমার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু ও-সব কথা যাক। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

—'কী অনুরোধ?'

কাপড়ের ভিতর থেকে একটা জিনিস বার করে বৃদ্ধা বললেন, 'এই কবচখানা আমি আপনার গলায় পরিয়ে দিতে চাই। এতে আপনি আপত্তি করবেন না তো?'

—'কী আশ্চর্য, আমার জন্যে আপনি কবচ এনেছেন কেন! এ কবচ নিয়ে আমি কী করব?'

—'আপনাকে কিছুই করতে হবে না বাবুজি, এ কবচখানা সর্বদাই যেন আপনার গলায় থাকে।'

—'তাতে আমার কী উপকার হবে?'

—'উপকার কী হবে জানি না, তবে অপকার কিছু হবে না। এ হচ্ছে রক্ষাকবচ। এ কবচ গলায় থাকলে কোনও অপদেবতা আপনার কিছুই অনিষ্ট করতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'এখানকার আর সকলের মতো আপনিও বুঝি অপদেবতার ভয় করছেন? কিন্তু জেনে রাখুন, আমি নিজে অপদেবতাকে ভয় করি না, এমনকি অপদেবতার অস্তিত্বও স্বীকার করি না।'

বৃদ্ধা মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন, 'বাবুজি, আপনি অপদেবতা মানুন আর নাই-ই মানুন, এই কবচখানা গলায় পরে থাকতে ক্ষতি কী? বুড়ির এই কথাটি কি আপনি রাখবেন না?'

আমি আর 'না' বলতে পারলুম না। কবচখানা পরতে অস্বীকার করলে এই স্নেহময়ী প্রাচীনা নিশ্চয়ই প্রাণের ভিতরে আঘাত পাবেন।

বৃদ্ধা রেশমি সুতোয় বাঁধা একখানি তামার কবচ আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

সরাইখানার বাইরে গিয়ে দেখি, চারিদিকের অন্ধকার হয়ে উঠেছে আরও ঘন, আরও নিরেট—তা ভেদ করে দুই হাত দূরেও নজর চলে না। দুই হাতের ভিতরেও যা দেখা যায়, তাও হচ্ছে আবছায়ার মতো।

হঠাৎ সরাইখানার দরজার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কে আমার কানে কানে বললে, 'বাবু, রাত বারোটার সময় বিশেষ সাবধানে থাকবেন। বনের যত ভয়, জেগে ওঠে ওই সময়েই।'

রাস্তার উপর থেকে খনখনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে একজন সকৌতুকে হেসে উঠল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সামনেই রয়েছে একখানা টোঙাগাড়ি, আর তার ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা দীর্ঘ মূর্তি।

সবই দেখা গেল ভাসা-ভাসা, ঝাপসা। কিন্তু হাসল যে ওই মূর্তিটাই, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। মূর্তি এবার দুই পা এগিয়ে এসে বললে, 'বিনয়বাবু, ওই লোকটা আপনাকে এমন চুপিচুপি সাবধান হতে বললে যে, এতদূর থেকেও আমি তার কথা শুনতে পেয়েছি।'

বিস্মিত হলুম। কারণ যে আমাকে সাবধান করে দিলে, সত্যসত্যই সে এত চুপিচুপি কথা হয়েছিল যে, কারুর পক্ষে অতদূর থেকে তা শুনতে পাওয়া সম্ভবপর নয়। তবু সে কথা যদি ওই লোকটি শুনতে পেয়ে থাকে তাহলে তার শোনবার শক্তি যে অত্যন্ত অসাধারণ, এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তার উপরে আর এক কথা। এই অন্ধকারে ওই মূর্তি আমাকে চিনলে কেমন করে? আমার নাম পর্যন্ত ওর অজানা নয়। তবে উনিই কি রাজাবাহাদুর স্বয়ং?

জিজ্ঞাসা করলুম, 'মহাশয় কি রাজাবাহাদুর?'

মূর্তি জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না, আমি তাঁর কর্মচারী। অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে, দয়া করে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন।'

সুটকেসটা নিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজার সেই কর্মচারী একখানা দৃঢ় হস্তে আমার বাঁ হাতখানা চেপে ধরে আমাকে গাড়ির উপরে উঠতে সাহায্য করলেন। তাঁর মুষ্টির দৃঢ়তা দেখেই

বুঝতে পারলুম, লোকটি হচ্ছে অসাধারণ ক্ষমতাশালী। আমার মতন লোককে সে হয়তো শিশুর মতো অনায়াসেই দশ-পনেরো হাত দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে।

তিন

নীল আলো এবং মৃত্যুর দূত

গাড়ি বেগে ছুটেছে বনের পথ দিয়ে। তার দুটো লণ্ঠনের আলোকশিখায় পথের দুইদিকেই দেখতে পাচ্ছি শুধু নানা জাতের গাছের পর গাছ, আর জঙ্গলের পর জঙ্গল। পৃথিবীর সমস্তই যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে,—গাছের পাতারা, বন্য বাতাস বা কোনও জীবজন্তুই কিছুমাত্র শব্দের সৃষ্টি করছে না—কেবল শুকনো পাথুরে পথের উপর জেগে জেগে উঠছে এই গাড়ির তেজি ঘোড়াটার অশ্রান্ত পায়ের শব্দ। গাড়ির চালক রাজার সেই কর্মচারীই।

মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনজঙ্গল, এবং তার বদলে দেখা যাচ্ছে এক-একটা মস্ত মাঠের তিমিরাচ্ছন্ন শূন্যতা। আবার কোথাও বা গাড়ি চলছে উঁচু নিচু পাহাড়ে পথের উপর দিয়ে এবং সেখানে এপাশে-ওপাশে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারেরও চেয়ে কালো কালিতে আঁকা ছোটো-বড়ো পাহাড়ের শিখর। এ-রকম বন্ধুর পথের উপর দিয়ে কোনও সাধারণ টোঙাগাড়ি যে এত বেগে আর এমন অনায়াসে অগ্রসর হতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবতে লাগলুম।

ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখে এসেছিল তন্দ্রা তা আমি বুঝতে পারিনি। খানিক পরে কী এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ আমার তন্দ্রা গেল ছুটে। ভালো করে উঠে বসে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেখি, আমার হাতঘড়িতে বেজেছে তখন ঠিক রাত বারোটা। সমানে ছুটে চলেছে গাড়ি।

বনের কোথা থেকে একটা কুকুর সুদীর্ঘ স্বরে কেঁদে উঠল। সে আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠস্বরে জাগছে যেন একটা অত্যন্ত যন্ত্রণার ভাব। সে কান্না শেষ হতে-না-হতেই আবার আর-একটা কুকুর জুড়ে দিলে ঠিক সেই রকমই আতঙ্কগ্রস্ত ক্রন্দন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটার পর আর-একটা আবার তারপর আর-একটা—এমনি অনেকগুলো কুকুরই সমস্বরে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিলে। বন্য কুকুরদের সেই অদ্ভুত কান্নার ঐকতান ভেসে ভেসে আসতে লাগল যেন পাহাড়ের উপর দিয়ে, অরণ্যের ভিতর দিয়ে, এমনকি অন্ধকারের অন্তঃপুর ভেদ করে।

গাড়ির ঘোড়াটাও চমকে চমকে উঠে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু চালকের আশ্বাসবাণী শুনে সে যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হল। তারপর, পাহাড়ের ভিতরে দুধার থেকেই সমস্বরে জেগে উঠল আর এক সুতীক্ষ্ণ ও উচ্চতর চিৎকার। একসঙ্গে চিৎকার করছে অনেকগুলো নেকড়ে বাঘ।

গাড়ির ঘোড়াটা বিষম চমকে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং আমারও ইচ্ছা হল, এইবেলা গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ে যেদিক থেকে এসেছি আবার সেইদিকেই দৌড় মারি।

সরাইখানায় যতক্ষণ ছিলুম, ততক্ষণই শুনেছি কেবল আতঙ্ক আর অমঙ্গল আর ভূতপ্রেতের কথা। বিশ্বাস করি আর না-করি, সেইসব জল্পনা-কল্পনা আমার অজ্ঞাতসারেই এখন যে মনের

ভিতরে কাজ করছে, এটুকু বেশ বুঝতে পারলুম। সরাই ত্যাগ করবার অল্প আগে বৃদ্ধার মুখে শুনেছি, তাঁর ছেলে রাত্রে এই বনের ভিতরেই হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। দরজার কাছে কে আবার বলে দিলে, রাত বারোটার সময় সাবধানে থাকতে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অন্তরের মধ্যে জাগতে লাগল কেবল এইসব কথাই। নেকড়েগুলো সেই রকমই চিৎকার করছে বটে, তবে, চালকের আশ্বাসবাণী শুনে ঘোড়াটা আবার ছুটতে আরম্ভ করলে—কিন্তু আর তেমন জোরে নয়, এবং ভয়ে ভয়ে।

আচম্বিতে দেখলুম আর এক অদ্ভুত দৃশ্য। খানিক তফাতে জঙ্গলের ভিতরে জ্বলছে একটা আশ্চর্য নীল রঙের আলো। সে আলোটা অত্যন্ত তীব্র বটে, কিন্তু তবু তার আভায় বনের আশপাশকার অন্ধকারের নিবিড়তা কিছুমাত্র কমে যাচ্ছে না। নীল আলো জ্বলছে, কিন্তু নিজের বাইরে এতটুকু আলো বিকীর্ণ করছে না।

চালকও আলোটা দেখলে। তখনই সে গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে পড়ল এবং এগিয়ে চলল সেইদিকে। আর-একটা ব্যাপার যা লক্ষ করলুম, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। চালকের মূর্তি ঠিক আমার আর আলোকের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এমন অবস্থায় আলোটা তার দেহের দ্বারা আবৃত হয়ে যাবারই কথা; কিন্তু দেহটাকে না ঢেকে সেই অস্বাভাবিক নীল আলোটা তার দেহ ভেদ করেই আমার চোখের সামনে জেগে রইল সমানভাবেই। এও কি সম্ভব? যে দেহ ফুটে এমনভাবে আলো বেরুতে পারে, সে কী রকম দেহ? রক্ত-মাংসে গড়া কোনও দেহই এমন স্বচ্ছ হতে পারে না।

আমি কি আবার ঘুমিয়ে পড়েছি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? কিংবা জেগে থেকেও আমার চোখ ভুল দেখছে?

আচমকা গাড়ির ঘোড়াটা আবার সভয়ে লাফিয়ে উঠল। যদিও গাড়ির দুটো লণ্ঠনের আলোতে বেশিদূর পর্যন্ত চোখ চলে না, তবু মনে হল, গাড়ি থেকে কিছু দূরে আমার দুই পাশে আর সামনের দিকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যেন অত্যন্ত সন্দেহজনক কতকগুলো জীবন্ত দেহ! থেকে থেকে সেখান থেকেও দপ-দপ করে জ্বলে উঠছে যেন কতগুলো ক্ষুধিত ও নিষ্ঠুর দৃষ্টি!

টর্চটা তুলে নিয়ে এদিকে-ওদিকে ও সামনের দিকে নিক্ষেপ করলুম সমুজ্জ্বল আলোক-শিখা। কী ভয়ানক! মাটির উপরে সামনের দুই থাবা পেতে বসে আছে দলে দলে নেকড়ে বাঘ—চক্ষে তাদের জ্বলন্ত হিংসা, এবং প্রত্যেকেরই মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে টকটকে লাল ও লকলকে জিহ্বা। সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির পিছন দিকেও একবার আলোক-শিখা সঞ্চালন করে দেখলুম, সেখানেও বসে আছে আরও কতগুলো নেকড়ে বাঘ। সর্বনাশ, নেকড়ের দল যে চারিধার থেকেই ঘিরে ফেলেছে আমাদের গাড়িখানা! নিশ্চয় তারা কেবল আমাদের মুখ দেখে খুশি হবার জন্যেই এখানে এসে হাজির হয়নি, যে-কোনও মুহূর্তেই তারা তিরের মতো ছুটে এসে আক্রমণ করে আমাদের দেহ করে ফেলতে পারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন!

চালক তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অপার্থিব নীল আলোটার কাছে। সেখানে সে যে কী করছে তা সেইই জানে, কিন্তু তার ভাব দেখলে মনে হয়, হয়তো সে নিজের বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এত কাছে এসেছে যে দলে দলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত, এটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে আমি তাকে ডাকলুম।

চালক আবার গাড়ির দিকে পায়ে পায়ে ফিরে আসতে লাগল।

প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি নেকড়েগুলো লাফ মেরে চালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দেহকে করে দেয় খণ্ডবিখণ্ড! নেকড়েগুলো গাড়ির চারিদিক বেষ্টন করে মণ্ডলাকারে বসে রয়েছে, চালক কি তা দেখতে পাচ্ছে না? কেমন করে হিংস্র পশুদের এই ব্যূহ ভেদ করে গাড়ির কাছে সে আসবে?

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য! চালক যেন নিজের মনেই বিড় বিড় করে কী বললে এবং কয়েকবার দিলে হাততালি। তারপর সে খুব সহজভাবেই সোজা গাড়ির কাছে এসে আবার নিজের আসনে উঠে বসল, সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে।

অতটা ভয় ও বিস্ময়ের মধ্যেও আমি দমন করতে পারলুম না আমার কৌতূহল। তাড়াতাড়ি আবার টর্চটা জ্বেলে চারিধারে নিক্ষেপ করলুম আলোক-শিখা।

যে জন্যেই হোক, নিশ্চয় আজ আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, কারণ কোনওদিকে তাকিয়ে আমি আর দেখতে পেলুম না একটামাত্র নেকড়ে বাঘকে!

চার

রাজা রুদ্রপ্রতাপ

শেষ রাত।

পূর্বাচলে ধরণীর ললাটে তখনও জাগেনি প্রভাতের জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ। অন্ধকার একটুখানি পাতলা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তখনও ঘোচেনি দৃষ্টির অন্ধতা।

বোধহয় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম, কারণ টোঙা যে কখন বিশালগড়ের সিংহদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে তার বিপুল আঙিনার প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে, সেটা আমি একটুও টের পাইনি। গাড়ি থামতেই ছুটে গেল আমার তন্দ্রা।

স্পষ্ট তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না, ঝাপসা ঝাপসা যেটুকু দেখা গেল মনে হল, আমরা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। আকাশের গায়ে যে কালিমালিপ্ত অট্টালিকার বহিঃরেখা আঁকা রয়েছে তা যেমন উচ্চ, তেমনই প্রশস্ত।

সেইদিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ টোঙাচালক আমার উপর-হাতটা চেপে ধরে বললে, 'এইবার আপনাকে নামতে হবে।' তখন যেমন করেছিলুম, এখনও তেমনই অনুভব করলুম, চালকের হস্তে আছে অসুরের মতন শক্তি। সে একটু জোরে চাপ দিলেই হয়তো গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে আমার হাতের হাড়!

নীচে নেমে সে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়ার মুখ ধরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে কোথায়, কে জানে। উঃ! চারিদিক কী স্তব্ধ! একটা কীটপতঙ্গেরও সাড়া নেই। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সেই অপরিসীম স্তব্ধতা যেন বিরাট একখানা জগদ্দল পাথরের মতন পেষণ করবার চেষ্টা করছে আমার হৃদয়-মনকে।

এমন প্রকাণ্ড অট্টালিকা, অথচ কোথাও নেই একটিমাত্র আলো বা একটিমাত্র মানুষ। প্রায়

পনেরো মিনিটকাল ধরে চিন্তা এসে আমার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে। এ আমি কোথায়, কার কাছে এসে পড়লুম? আরম্ভেই যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। রহস্যময় গাড়ির চালক ও রহস্যময় নীল আলো! তারপর সেই সাঙ্ঘাতিক নেকড়েগুলো! তারা আমাকে আক্রমণ করতে এসে চালককে দেখে নিঃশব্দে আবার অদৃশ্য হল কেন? নেকড়ের মতন হিংস্র পশুদের উপরে কোনও মানুষের যে এমন প্রভাব থাকতে পারে, মন এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর যাঁর বাড়িতে আজ আমি এসেছি, সেই রাজাবাহাদুরই বা কী রকম মানুষ? সরাইখানার লোকগুলি যে কেউ রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করে, এমন তো মনে হল না। বরং তারা নানাভাবে, নানা ইঙ্গিতে আমাকে এখানে আসতেই নিষেধ করেছে বারংবার।

এইসব ভাবছি, হঠাৎ হড়-হড় করে একটা শব্দ হল, এবং সেই শব্দ শুনে কেবল আমি নয়, এখানকার সমস্ত অন্ধকার ও স্তব্ধতাও যেন চমকে জাগ্রত হয়ে উঠল। তারপর সামনের দিকে সুবৃহৎ একটা দ্বারপথের ভারী ভারী পাল্লা দু-খানা খুলে গেল ধীরে ধীরে। একটা লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকরেখা দরজার ভিতর থেকে বেরিয়ে একেবারে আমার মুখের উপর এসে পড়ল।

ভালো করে চেয়ে দেখি, দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ। তাঁর মুখের মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজোড়া লম্বা গোঁফ। কাঁকড়ার দাড়ার মতো লম্বা গোঁফের দুই প্রান্ত ওষ্ঠাধরের দুই পাশ দিয়ে চিবুকের তলা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পরনে তাঁর ঘন কৃষ্ণবর্ণের কোর্তা ও পায়জামা। ডান হাত তুলে পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আসুন বিনয়বাবু, আজ আপনি আমার অতিথি হয়েছেন। বাড়ির ভিতরে আসুন।' আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বৃদ্ধ আর এক পদও অগ্রসর হলেন না, সেইখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠিক একটা পাথরের মূর্তির মতো।

তাঁকে নমস্কার করে আমি যখন বাড়ির দরজার ভিতর প্রবেশ করলুম, তখন তিনি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এত জোরে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন যে আমার হাতের আঙুলগুলো যেন ভেঙে যাবার মতো হল। কোনও বৃদ্ধের হাতে এমন শক্তি থাকতে পারে, আমার পক্ষে এটা ছিল একেবারেই অভাবিত। কেবল তাই নয়, বৃদ্ধের হাত যেন কনকনে তুষারের মতো ঠান্ডা, আমার হাতের উপর রয়েছে যেন কোনও মৃতদেহের হাত!

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'স্বাগত, স্বাগত! স্বেচ্ছায় আমার বাড়ির ভিতরে আসুন! আবার নিরাপদে যখন ফিরে যাবেন তখন যে আনন্দ আপনি সঙ্গে করে এনেছেন, তার খানিকটা যেন এখানে রেখে যেতে ভুলবেন না।'

তখনও আমি নিজেকে ঠিক সামলে নিতে পারিনি। বৃদ্ধের বাহুর শক্তি আমাকে মনে করিয়ে দিলে সেই টোঙাচালকের বাহুর শক্তিকে। অন্ধকারে সেই চালকের মুখ একবারও আমি দেখতে পাইনি। আমার সন্দেহ হতে লাগল যে, হয়তো সেই টোঙার চালক আর এই বৃদ্ধ দু-জনেই অভিন্ন। তাই সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্যে কিঞ্চিৎ দ্বিধাভরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ?'

—'হ্যাঁ, আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি। বিনয়বাবু, আমি আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। রাত্রে পথে আসতে নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। আসুন, আগে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিন।'

যদিও শেষ-রাত্রে সেই জলযোগের প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুত শোনাল, তবু আমি কোনও প্রতিবাদ করলুম না।

রাজা হেঁট হয়ে পড়ে আমার সুটকেসটা মাটির উপর হতে নিজেই তুলে নিতে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিতে গেলুম, কিন্তু তিনি কোনও মানা না মেনেই আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, 'না বিনয়বাবু, আপনি আমার অতিথি। বাড়ির লোকজনেরা কেউ এখন জেগে নেই, কাজেই আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। আসুন।'

দ্বারপথ পার হয়ে খানিক গিয়েই পেলুম এক সোপানশ্রেণী। দ্বিতলে উঠে একটা দালানের উপরে এসে পড়লুম, তার মেঝেটা মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো।

দালানের একপ্রান্তে এসে রাজা ঠেলে একটা দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলুম, প্রকাণ্ড ঘর, একটা ঝাড়লণ্ঠনের আলোকে সমস্ত ঘরখানাই আলোকিত। মাঝখানে টেবিল ঘিরে খানকয়েক চেয়ার, এবং টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে কয়েক রকম খাবারের থালা। রাজা ঘরের এক কোণে আমার সুটকেসটা রেখে দিয়ে আর এক দিকের আর একটা দরজা ঠেলে খুললেন। তারপর ইঙ্গিতে আমাকে সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন।

ঘরে ঢুকে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানি পালঙ্ক, তার উপরে ধবধবে সাদা চাদরে মোড়া বিছানা পাতা। খাদ্য দেখে আমার মন কিছুমাত্র লুব্ধ হয়নি, কিন্তু রাত্রের অত কষ্টের পর এই কোমল শয্যা দেখে আমার ইচ্ছে হতে লাগল, এখনই ছুটে গিয়ে সেখানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি।

রাজা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। কারণ তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, দেখছি আপনি বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আর কোনও কথা নয়। এখন আপনি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার যা কিছু দরকার এই ঘরেই খুঁজে পাবেন। কাল সকালে একটু কাজে আমায় বাইরে যেতে হবে। সন্ধ্যার চায়ের আসরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ

তিনটে অদ্ভুত স্বপ্ন

পরদিন সকালবেলা। রাজাবাহাদুরকে দেখতে পেলুম না এবং সকালের চা নিয়েও কেউ এল না। কিন্তু দুপুরে পাশের ঘরে টেবিলের উপরে পেলুম অন্যান্য আহার্য। তবে আশ্চর্য এই, সব খাবার ঠান্ডা। কোনও মানুষের সাড়াও শুনলুম না। কালকের অনিদ্রার ঘোর এখনও যায়নি। তাই এসব নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম এবং সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্য গিয়েছে অস্তে।

তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করে মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় পরছি, এমন সময় ঘরের দরজার ওপাশে শোনা গেল রাজার কণ্ঠস্বর, 'বিনয়বাবু, আপনার দিবানিদ্রা ভেঙেছে কি? এদিকে চা আর খাবার প্রস্তুত।'

দরজা খুলে বাহিরে বেরুতেই রাজা আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। মাঝখানে টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে দামি দামি চায়ের সরঞ্জাম এবং টোস্ট, ডিম ও অন্যান্য খাদ্য।

আমি বললুম, 'রাজাবাহাদুর, চায়ের সঙ্গে এত খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। এ করেছেন কী?'

রাজা বললেন, 'এ নির্জন বনের ভিতরে এর বেশি আর কিছু আয়োজন করতে পারা যায় না। শহরে থাকলে আপনাকে এর চেয়ে ঢের বেশি খাবার খেতে হত। নিন, এখন আসন গ্রহণ করুন।'

টেবিলের একধারে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বসে পড়লুম, রাজা বসলেন গিয়ে অন্য প্রান্তে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বিনয়বাবু, আমি আগেই চা আর খাবার খেয়ে নিয়েছি, কাজেই এখন আপনাকে একলাই খেতে আর চা পান করতে হবে।'

খাবার খেতে খেতে রাজাবাহাদুরকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলুম। তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তিনি একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক। তাঁর মাথার চুলগুলি পেকে সাদা ধবধবে হয়েছে। তাঁর ভ্রূর উপরেও খুব পুরু চুলের গোছা। সুদীর্ঘ নাসিকা। লম্বা ও মস্ত গোঁফজোড়ার মাঝখানে তাঁর ওষ্ঠাধর দেখলে তাঁকে একজন নির্দয় লোক বলেই মনে হয়। ওষ্ঠাধরের ফাঁকে যে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে অসাধারণ তাদের তীক্ষ্ণতা।

রাজা কাল যখন আমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনই আমি আরও দু-একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করেছিলুম। তাঁর দুই হাতের তালুর মাঝখানে আছে এক গোছা চুল, এবং তাঁর আঙুলের নখগুলোও যেন অস্বাভাবিক ধারালো। কেবল তাই নয়, আমার নাকেও এমন একটা বিশ্রী ঘ্রাণ এসে লেগেছিল, যে আর একটু হলেই আমি বমন করে ফেলতুম। যদিও সেটা অসম্ভব, তবু আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন কোনও গলিত মাংসের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আমার মুখের ভাব দেখে রাজা তখন তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়েছিলেন।

চা পান করতে করতে রাজার কাছে আমি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই পুরোনো ও ভাঙা বাগানবাড়িটার কথা তুললুম। রাজা নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করলেন। আমার বক্তব্য শেষ হবার পর তিনি খুশি মুখে বললেন, 'ধন্যবাদ বিনয়বাবু, ধন্যবাদ। আমি ঠিক যেরকম বাড়ি আর জমি চাই, আপনি আজ তারই সন্ধান দিলেন। দেখুন, আমি সেকেলে মানুষ। তার উপরে শহরের বিলাসিতা আর আধুনিকতা ছেড়ে আমি বনের ভিতরে সাদাসিধে জীবন যাপন করতে চাই। আমার এই বিশালগড় দেখছেন? কতকাল আগে আমার পূর্বপুরুষরা এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা আর এই গড় তৈরি করে গিয়েছেন; কত যুদ্ধবিগ্রহের স্মৃতি এই বিশালগড়ের প্রত্যেক পাথরের গায়ে মাখানো আছে, অতীতের কত ঐশ্বর্য আগে একে অপূর্ব করে রেখেছিল, আজ আমরা সে সব কল্পনাতেও আনতে পারব না। আজ আমাদের সে গর্ব, ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধি নেই বটে, কিন্তু আজও আমার দেহের ভিতরে, ধমনীতে ধমনীতে রক্তধারার সঙ্গে জীবন্ত হয়ে আছে আমাদের সেই প্রাচীন বংশগৌরব। সেইজন্যেই এই ভাঙা আর পুরোনো বিশালগড়কে আজও আমি ভুলতে পারিনি। আর এইখানে থেকে থেকে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পরম আধুনিক প্রকাণ্ড কোনও রাজপ্রাসাদ পেলেও তার ভিতরে গিয়ে বাস করবার প্রবৃত্তি আমার হবে না। তাই একেলে শহর কলকাতাতে গিয়েও কোনও অট্টালিকায় বাস করবার ইচ্ছা আমার নেই। বংশে আমি প্রাচীন, মনে আমি প্রাচীন আর বয়সেও আমি প্রাচীন, তাই তো আমি কিনতে চেয়েছি প্রাচীন কোনও বাগানবাড়ি। সুতরাং আমার এই অদ্ভুত রুচি দেখে আপনারা কেউ বিস্মিত হবেন না, এমন আশা আমি করতে পারি।'

আমি বললুম, 'যেচে কেউ যে পুরোনো বাড়ি কিনতে চায় এটা আমরা জানতুম না। কাজেই আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম বইকি। কিন্তু এতক্ষণ পরে আপনার কথা শুনে সে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু আর একটি কথা জানতে আমার আগ্রহ হয়েছে। আপনি বোধহয় বাঙালি নন?'

রাজাবাহাদুর বললেন, 'না, জাতে আমরা রাজপুত।'

—'কিন্তু আপনি এত ভালো বাংলা শিখলেন কী করে? বাংলা দেশে গিয়ে কখনও থেকেছিলেন কি?'

রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'না। কিন্তু খালি বাংলা কেন, ভারতবর্ষের আরও অনেক দেশের ভাষাই আমি জানি। ওপাশের ঘরে আমার লাইব্রেরিতে গেলে দেখবেন, সেখানে অন্তত হাজার-দুই বাংলা বই আছে। বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা, আমি ওই সব বই পড়েই অর্জন করেছি। এমনকি আপনাদের কলকাতায় কোথায় কোন রাস্তা আছে, আর কোন কোন রাস্তায় কে কে বিখ্যাত ব্যক্তি বাস করেন, সে খবরও আমার নখদর্পণে।'

—'বই পড়তে আমি বড়োই ভালোবাসি, পড়বার ইচ্ছে হলে আমি কি আপনার লাইব্রেরিতে যেতে পারি?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! এই বিশালগড়ের যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন; কিন্তু দরজা যেখানে বন্ধ দেখবেন সেখানে কোনওদিন ঢোকবার চেষ্টা না করলেই আমি খুশি হব। কারণ এই বিশালগড় আপনাদের কলকাতা শহরের কোনও অট্টালিকা নয়। এখানে এমন অনেক কিছুই আছে, যার অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। সেইজন্য আগে থাকতেই আপনাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত মনে করছি।'

হঠাৎ আমার মনে পড়ল কালকের রাত্রের রহস্যময় ঘটনাগুলোর কথা। তাই নিয়েই রাজার কাছে আমি কোনও কোনও প্রশ্ন তুললুম। তিনি কোনও প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং কখনও নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

তখন তাঁর কাছে সেই নীল আলোর প্রসঙ্গ তুললুম। তিনি বললেন, 'আপনি তো শুনেছেন, এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে যে কোনও কোনও নির্দিষ্ট রাত্রে—যেমন, অমাবস্যার শনিবারের রাত্রে—এ অঞ্চলের গভীর অরণ্যে প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে যেখানে দেখা যায় নীল রঙের একটা অদ্ভুত আলো সেইখানেই মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় গুপ্তধন। আমার কর্মচারী বোধহয় গুপ্তধনের লোভেই সেই নীল আলোর কাছে গিয়েছিল।'

আমার চা পান শেষ হল। রাজাও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনাদের অফিসে আমি এখনই খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি যে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়ি আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি কলকাতায় যাবার আগেই আমি এখান থেকেই ও-বাড়িখানা কেনবার জন্যে আমার একজন প্রতিনিধি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা-দুই পরে কামাবার আরশিখানা বার করে টেবিলের উপরে রেখে একমনে দাড়ির উপর ক্ষুর চালনা করছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বললে, 'অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

এই সম্ভাষণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, চমকে উঠতে ক্ষুর লেগে আমার চিবুক গেল কেটে।

ফিরে দেখি, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুর। বিস্মিত হলুম। কারণ আরশির ভিতর দিয়ে

আমার পিছন দিক ও দরজার কাছটা দেখা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্ট। অথচ রাজা যে কখন ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন আমি তা একটুও দেখতে পাইনি। সন্দেহ দূর করবার জন্যে আর-একবার আরশির দিকে ফিরে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু কী আশ্চর্য, রাজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার ঠিক পিছনেই, অথচ দর্পণের মধ্যে নেই তাঁর মূর্তির ছায়া। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এদেশে এসে পর্যন্ত যেসব অভাবিত কথা শুনছি আর যেসব অপার্থিব দৃশ্য দর্শন করছি, তার কোনওটারই অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। আজ এখনই যা দেখলুম, তাও কি সেইরকমই কোনও আজগুবি ব্যাপার? মানুষ আছে, দর্পণে নেই মানুষের দেহের ছায়া?

কিন্তু তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলুম না, কারণ আমার চিবুকের ক্ষত থেকে ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছিল।

স্টিকিং প্লাস্টার বার করবার জন্যে সুটকেসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় রাজাও আমার চিবুকের অবস্থাটা দেখতে পেলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল অসম্ভব রূপে। মনে হল, আমার সামনে দেখছি যেন একটা রক্তলোভী হিংস্র জন্তুর ভয়াবহ মুখ—তার মধ্যে নেই কিছুমাত্র মানবতার চিহ্ন! রাজা আচম্বিতে বাঘের মতন আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে চেপে ধরলেন আমার দুই স্কন্ধদেশ। তাঁর বিকৃত মুখখানা এগিয়ে এল আমার মুখের খুব কাছে এবং তার পরেই তাঁর চোখ পড়ল আমার গলায় ঝোলানো কবচখানার দিকে। দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা আবার শান্ত হয়ে এল। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, সাবধানে থাকবেন। আমার বাড়িতে রক্তপাত করা নিরাপদ নয়!'

তারপর হঠাৎ সামনের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে আরশিখানা তুলে নিয়ে সক্রোধে তিনি বললেন, 'এই আরশিই হচ্ছে সর্বনাশের জিনিস! মানুষ নিজের আমিত্বকে বড়ো করে দেখবার জন্যে সৃষ্টি করেছে এই আরশি! চুলোয় যাক,—চুলোয় যাক!' বলতে বলতে জানলার ধারে গিয়ে আরশিখানা তিনি ছুড়ে ফেলে দিলেন বাইরের দিকে। তারপর আর কোনও কথা না বলেই হন-হন করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। কী থেকে কী যে হল আর কেন যে হল, তার কোনও হদিশ খুঁজে পেলুম না। পরে-পরে মনের ভিতরে জাগল তিনটে অদ্ভুত প্রশ্ন। আরশিতে রাজার ছায়া পড়ল না কেন? আমার চিবুকের রক্ত দেখে রাজার মুখের ভাব অমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কেন? আর আরশি দেখে তাঁর অতটা রাগের কারণই বা কী?

ছয়

রাত্রির সন্তান

আমি বন্দি। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই। আজকে জানতে পেরেছি এই ভয়াবহ সত্য কথাটা। কেমন খেয়াল হল দোতলা থেকে নেমে প্রকাণ্ড সদর দরজাটার কাছে গেলুম। ইচ্ছা ছিল একবার বেরিয়ে বাইরের চারিদিকটা ঘুরে আসি। কিন্তু দরজার পাল্লা টানতে গিয়ে দেখি, বাহিরের থেকে সেটা বন্ধ।

তখন ভিতরে ফিরে এসে একতালার চারিদিক অন্বেষণ করতে লাগলুম, বাইরে বেরুবার যদি আর কোনও দরজা থাকে। লম্বায় চওড়ায় প্রায় দুশো ফুট ব্যাপী প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ উঠোন, তার চারিধারে প্রশস্ত দরদালান এবং তার পর সারি সারি ঘরের পর ঘর। কিন্তু প্রত্যেক ঘরের দরজাতেই বড়ো-বড়ো কুলুপ লাগানো এবং কোনও দিকেই জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সেখানকার অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমি যেন কোনও অভিশপ্ত, পরিত্যক্ত হানাবাড়ির ভিতরে এসে পড়েছি।

প্রাঙ্গণের আর-একদিক দিয়ে আর-একটি পথ আছে। এবং সেই পথের শেষেও আর একটা বন্ধ দরজা। খুব সম্ভব এটা হচ্ছে এ মহল থেকে অন্য মহলে যাবার পথ, কারণ সেখানকার রাজারাজড়াদের প্রাসাদে বা কোনও ধনী ব্যক্তির অট্টালিকায় তিন-চারটির কম মহল থাকত না। এখানকার অন্য মহলে কী আছে তা জানবার কোনওই উপায় নেই, কেননা ওদিকে যাবার যে একটিমাত্র দ্বার, তাও ওপাশ থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

আবার উপরে লাইব্রেরি-ঘরে ফিরে এসে বসলুম। এমনভাবে নিজেকে বন্দি বলে বুঝে মনটা বড়োই খারাপ হয়ে গেল। দুই-তিনখানা কেতাব নিয়ে নাড়াচাড়া করলুম, পড়তে ভালো লাগল না। উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

নীচেই দেখা যাচ্ছে বিশালগড়ের বিস্তৃত অঙ্গন। এক সময়ে অঙ্গনের সমস্তটাই যে পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল, দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু এখন অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডই স্থানচ্যুত বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সেইসব শৈবাল-চিত্রিত শিলাখণ্ড দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না, যে তাদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু শতাব্দীর ঝড় ও বৃষ্টি। অঙ্গনের যে-সব জায়গার পাথর সরে গিয়েছে, সে-সব স্থান বন্য লতাগুল্ম ও ঝোপঝাপের দ্বারা সমাবৃত।

অঙ্গনের পরে বিশালগড়ের সু-উচ্চ এবং সুদীর্ঘ প্রস্তর-প্রাচীর। ভূমিতল থেকে তার উচ্চতা ৫০ ফুটের কম নয়। এই প্রাচীর লঙ্ঘন করে কোনও মানুষের পক্ষেই ভিতর থেকে বাহির বা বাহির থেকে ভিতরে আসা সম্ভবপর নয়। প্রাচীরের ওপাশে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পর পাহাড় এবং কোথাও বা সুদূর বনের সুনীল রেখা এবং তার উপরে নত হয়ে পড়েছে সূর্যের অস্তরাগরেখায় বিচিত্র নীলাকাশ। বাহির থেকে ভেসে আসছে স্বাধীন বিহঙ্গদের কলকাকলি। তাদের সেই মুক্ত প্রাণের সঙ্গীত শুনে আমার প্রাণে জাগল দীর্ঘশ্বাস। স্বাধীন, তারা স্বাধীন—কিন্তু আমি? বন্দি!

নীচের সদর দরজা খোলার শব্দ পেলুম। গবাক্ষ দিয়ে হেঁট হয়ে দেখি, রাজা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ছয়-সাত মিনিট কেটে গেল, রাজা তবু আমার কাছে এলেন না। কৌতূহলী হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম, আমার শোবার ঘরের দরজাটা আধখানা খোলা রয়েছে। আলতো পায়ে এগিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে সবিস্ময়ে দেখলুম, আমার জন্যে রাজা করছেন, স্বহস্তে শয্যারচনা। নিঃশব্দে আবার ফিরে এলুম লাইব্রেরি-ঘরে। তাহলে আমি মনে মনে যে সন্দেহ করেছিলুম তা মিথ্যা নয়? এই বিশাল অট্টালিকায় রাজা একাকী বাস করেন। এমনকি, আমার জন্যে তাঁকে আহার্য আর শয্যা পর্যন্ত প্রস্তুত করতে হয়!

এখানে যখন রাজা আর আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, তখন টোঙার যে চালক সরাই থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল, সে-ও তাহলে রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। এতক্ষণ পরে আমার মনে পড়ল, অন্ধকারে আমি টোঙাচালকের মুখ একবারও দেখতে পাইনি, নিশ্চয় রাজা ইচ্ছে করেই গ্রহণ করেছিলেন অন্ধকারের সেই সুযোগ।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সমস্ত হৃদয়-মন। সেই ভয়াবহ টোঙাচালক, যার দেহ ভেদ করে ওপাশের আলো দেখা যায়, যার একটিমাত্র নীরব ইঙ্গিতে ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের দল শিকার ছেড়ে অদৃশ্য হয় এবং যার দুই বাহুতে আছে ভীমের মতন অসাধারণ শক্তি!

সরাইখানায় যা শুনেছিলুম, আবার সেইসব কথা একে-একে মনে পড়তে লাগল। তারা সকলেই একবাক্যে আমাকে এখানে আসতে মানা করেছিল। অনেকে শরীরী প্রেতের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়েনি। আর সেই পুত্রহারা বৃদ্ধা, যে রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে দিয়েছিল আমার কণ্ঠদেশে, তার কথা ভেবে আমার সমস্ত অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার অবিশ্বাসী মন তখন এই কবচের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেনি, কিন্তু এখন এই কবচখানা যে আমার গলায় ঝুলছে, এটা ভেবেও আমি অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারলুম।

এর পর আমার কী করা উচিত? আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, রাজাকে জানতে না দেওয়া যে আমি তাঁর কোনও গুপ্ত কথা আবিষ্কার করতে পেরেছি। রাজা যে ইচ্ছা করেই আমাকে এখানে বন্দি করে রাখতে চান, এটা বেশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে আমি যে বন্দি বলে জেনেছি, এই ভাবটা কিছুতেই তাঁর কাছে প্রকাশ করা হবে না। আমার দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদাই দৃষ্টিকে সজাগ রাখা এবং রাজা কী করছেন না করছেন পদে পদে সেইদিকে লক্ষ রাখা। জনশূন্য বিশালগড়ে আমি বন্দি; এখন একমাত্র নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করা ছাড়া আমার মুক্তিলাভের আর কোনও উপায় নেই।

রাজা এই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে সেই ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদ। আজ নতুন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাজার বর্ণ গৌর বটে, কিন্তু তাঁর হাত ও মুখের শুভ্রতার ভিতরে রক্ত-আভার কোনওরকম আভাস নেই। বহুক্ষণ-মৃত মানুষের মতন তাঁর দেহের বর্ণ হচ্ছে পাণ্ডুর। কালো পোশাকের ভিতরে সেই পাণ্ডুরতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজা এসেই বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনাদের ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই বাড়িখানা কেনবার জন্যে আমার প্রতিনিধি আজকেই কলকাতায় যাত্রা করেছেন।'

আমি বললুম, 'রাজাবাহাদুর, তাহলে আমার কর্তব্য তো শেষ হয়েছে, আমিও তো এখন অনায়াসেই কলকাতায় চলে যেতে পারি?'

—'এত শীঘ্র?'

—'আমি স্বাধীন নই, অপরের কর্মচারী মাত্র। বলে এসেছি, তিন-চার দিনের বেশি এখানে থাকব না। যথাসময়ে কলকাতায় না ফিরলে আমার উপরওয়ালা অসন্তুষ্ট হতে পারেন।'

রাজা মাথা নেড়ে বললেন, 'না না বিনয়বাবু, তা হতেই পারে না। আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। এত শীঘ্র আপনাকে ছাড়া হবে না। আরও কিছুদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করতেই হবে।'

নাচারভাবে বললুম, 'বেশ, তাহলে আর উপায় কী?'

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি স্থির করে গম্ভীরভাবে ও কঠিন স্বরে রাজা বললেন, 'আর একটা কথা আপনাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই। আপনাকে যে-কয়টি ঘর ব্যবহার করতে দিয়েছি, তা ছাড়া আর কোনও ঘরেই আপনি যেন ঢোকবার চেষ্টা না করেন। এই প্রাসাদ হচ্ছে অনেক কালের পুরোনো, এর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে বহু কালের বহু প্রাচীন স্মৃতি। অনেক স্মৃতিই সুখের নয়; তারা আনন্দ দেয় না, ভয় দেখায়। নিজের সীমা অতিক্রম করলে আপনাকে রীতিমতো বিপদগ্রস্ত হতে হবে। আর সেইসব বিপদ এমন কল্পনাতীত যে—' বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন এবং উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনতে লাগলেন।

আমিও শোনবার চেষ্টা করলুম। জানলা দিয়ে দেখলুম, বাহিরের সমস্ত দৃশ্য লুপ্ত করে নেমে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধ যবনিকা। চারিদিক স্তব্ধ, পাখিরাও নীরব। কিন্তু সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে এমন এক রোমাঞ্চকর ধ্বনি, যা হিম করে দেয় বুকের রক্ত! তা হচ্ছে একদল নেকড়ে বাঘের গর্জন।

রাজার দুই চক্ষু যেন জ্বলে উঠল উৎকট আনন্দে। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'শুনুন, শুনুন! রাত্রির সন্তানদের কণ্ঠস্বর শুনুন! আহা, তারা রচনা করছে কী মধুর সঙ্গীত!'

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম, কোনও কথাই বলতে পারলুম না।

রাজা অল্প একটু হেসে বললেন, 'ও, বুঝেছি। আপনারা হচ্ছেন শহুরে জীব, শিকারির বন্য আনন্দ অনুভব করবার শক্তি আপনাদের নেই।' বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতপদে।

আমি যেন তলিয়ে গেলুম বিস্ময়-সাগরে। হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল সন্দেহে এবং আতঙ্কে। এমন সব অপার্থিব কথা আমি ভাবতে লাগলুম, বাইরে যা প্রকাশ করা অসম্ভব। ভগবান আমাকে রক্ষা করুন!

সাত

ত্রিমূর্তি

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখন আমার এমন অবস্থা, যে ভালো মন্দ কোনওরকম চিন্তা করবার শক্তিই আমার ছিল না। মিনিট কয়েক পরে ধীরে ধীরে কেটে গেল আমার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা। বাড়ির ভিতরে রাজার কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আস্তে আস্তে দোতলার দালানে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দোতলা থেকে আরও উপরে উঠে গিয়েছে। আনমনার মতো সেই সোপান ধরে আমিও উঠতে লাগলুম উপরদিকে। দোতলার পর তেতলা পার হয়ে পেলুম মস্ত বড়ো একটা খোলা ছাদ। ছাদের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। নিজেকে বন্দি জেনে এবং সঙ্কীর্ণ ঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে এতক্ষণ আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল, এখন মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে মনের ভিতরে জাগল একটা পরম আশ্বস্তি।

সেদিন ছিল প্রতিপদের রাত্রি। সুন্দর আলোকে চারিদিক ঝকঝক করছে প্রায় দিনের বেলার মতো। রুপোলি কিরণধারায় দূরের পাহাড়গুলো যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। বনে বনে আর

উপত্যকায় দুলছে আলোছায়ার বিচিত্র দোলা। ওই পাহাড়ে যে বিচরণ করে সজাগ মৃত্যুদূতরা, সে কথা ভুলিয়ে দেয় আজকের এই প্রকৃতির জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য। তাকিয়ে রইলুম বিমুগ্ধ হয়ে।

আচম্বিতে তেতলার একটা গবাক্ষের দিকে আমার দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। সেখানে গবাক্ষের তলা থেকে ভূমিতল পর্যন্ত বাড়ির যে জীর্ণ অংশটা ছিল তার নানাস্থানেই দেওয়ালের পাথরগুলো দেওয়াল থেকে অল্প-সল্প বেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। গবাক্ষের ভিতর থেকে বাহিরে এল আস্তে আস্তে একটি কালো পোশাক পরা মানুষের মূর্তি। এত উঁচু থেকে তার মুখ দেখতে না পেয়েও আমার বুঝতে বিলম্ব হল না যে সে মুখ রাজার ছাড়া আর কারুর নয়।

তারপরে সভয়ে দেখলুম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। নীচের দিকে মুখ এবং উপর দিকে পা করে রাজা দেওয়ালের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগলেন মস্ত একটা সরীসৃপের মতন! প্রথমটা ভাবলুম আমারই বুঝি দেখবার ভুল হয়েছে। তারপর ভালো করে দেখলুম, রাজা, হাতের আঙুল—এবং যেন পায়ের আঙুলগুলোও—দিয়ে সেই দেওয়াল থেকে বেরিয়ে-পড়া পাথরের ধার চেপে ধরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছেন। তাঁর ঝলঝলে কালো পোশাক দেহের দুই দিকে ছড়িয়ে থাকাতে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড একটা বাদুড়ের মতো।

ভগবান জানেন, এই রাজা কোন জাতীয় জীব! এঁকে মানুষের মতন দেখতে বটে, কিন্তু ইনি কি মানুষ? বাড়িতে সিঁড়ি থাকতেও কোনও মানুষ কি এমন করে দেওয়াল বেয়ে মাটিতে গিয়ে নামতে চায়?

কী ভয়ানক জায়গাতেই আমি এসে পড়েছি! দেখছি আমার আর উদ্ধার নেই! গবাক্ষ থেকে প্রায় একশো ফুট নীচে আছে পৃথিবীর দৃশ্য। মাটিতে নামবার পর রাজার মূর্তি আর দেখতে পেলুম না। হয়তো একটা গর্ত বা অন্য কোনও কিছুর ভিতরে ঢুকে তিনি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

রাজা বাড়ির ভিতর নেই জেনে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলার দালানে নেমে এলুম। সেখানে রয়েছে ঘরের পর ঘর। টর্চটা আমার সঙ্গেই ছিল। টর্চের আলো ফেলে ঘরের দরজাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলুম। প্রত্যেক দরজাতেই রয়েছে এক-একটা বড়ো কুলুপ। দরজাগুলো পুরাতন বটে, কিন্তু কুলুপগুলো নতুন। যেন সবে কিনে এনে লাগানো হয়েছে। দরজার পর দরজার উপরে দৃষ্টি চালনা করতে করতে সেই সুদীর্ঘ দালানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেরিয়ে গেলুম। সেখানে দুটো ছোটো ছোটো কুঠরির দরজা ছিল খোলা, কিন্তু ভিতরে ঢুকে কেবল ধুলো আর আবর্জনা আর দু-চারটে ভাঙাচোরা সেকেলে আসবাব ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না। বোধহয় এ দুটো হচ্ছে পরিত্যক্ত ঘর। তারপরেই আর একটা দরজা এবং বাহির থেকে কেবলমাত্র শিকল তুলে সে-দরজাটা বন্ধ করা আছে। শিকল খুলে ঘরে প্রবেশ করলুম। মস্ত ঘর—হলের মতো বড়ো। একপাশে সার-গাঁথা জানলাগুলোর ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে সমস্ত ঘরখানাকে অনেকটা স্পষ্ট করে তুলেছে। একটা জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টিচালনা করে দেখলুম, বিশালগড়ের প্রাকারের এক পাশে অদূরেই রয়েছে একটা উপত্যকা। তারপরেই অনেকগুলো পাহাড়ের পর পাহাড় আর শিখরের পর শিখর ক্রমেই আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছে।

ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করতে লাগলুম। এ ঘরটা খুব বেশি পরিষ্কার না হলেও এখানে

ধুলো-জঞ্জালের কোনওই বাড়াবাড়ি নেই। কয়েকখানা সোফা, কৌচ, চেয়ার, লেখবার টেবিল ও সাজপোশাক পরবার টেবিল প্রভৃতি আসবাবও রয়েছে। কিন্তু কোনও আসবাবই একালের উপযোগী নয়। তবে, এইটুকু কেবল অনুমান করতে পারলুম, খুব সম্ভব এটা হচ্ছে কোনও স্ত্রীলোকের ঘর। সেকালে বোধহয় রাজবাড়ির কোনও নারী এই ঘরটা ব্যবহার করতেন।

মনের ভিতরে জাগল কেমন শ্রান্তির ভাব। শরীর যেন এলিয়ে পড়তে চাইলে। একটা সোফার উপরে ঝুপ করে বসে পড়লুম। তারপর সেই আধা-আলো ও আধা-অন্ধকারে আমার চোখের উপরে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল তন্দ্রার আমেজ। একটা অসীম স্তব্ধতাকে বুকের ভিতরে অনুভব করতে করতে বোধহয় আমি ঘুমিয়েই পড়লুম। রাজা যে আমাকে বলেছিলেন আমার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরের বাহিরে অন্য কোথাও গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, একথা আমার একবারও মনে পড়ল না। এবং মনে পড়লেও হয়তো আমি তাঁর হুকুম মানতুম না। তাঁর অবাধ্য হওয়াও এখন আমার কাছে বিশেষ একটা আনন্দের মতো।

খানিকক্ষণ পরে মনে হল, ঘরে আমি আর একলা নই। আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলুম কি না জানি না, কিন্তু চোখ খুলেই দেখলুম চন্দ্রালোকে সমুজ্জ্বল ঘরের একটা অংশ। সেইখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সুন্দরী তরুণী। আশ্চর্য এই, তারা চাঁদের আলোর দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, তবু মূর্তিগুলোর সামনের দিকে মেঝের উপরে নেই কারুর দেহের ছায়া।

যেমন সঙ্গীতের ধ্বনি জাগে, তাদেরও হাসির ধ্বনি হচ্ছে সেইরকমই সুমধুর।

একটি মেয়ে বললে, 'দিদি, এগিয়ে যা! প্রথমে তোরই পালা!'

আর-একজন বললে, 'লোকটার বয়স দেখছি কাঁচা। নিশ্চয় এর রক্তও খুব তাজা!'

এই অদ্ভুত উক্তি শুনে আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কিন্তু কী যেন মোহিনী-মন্ত্রে অভিভূত হয়ে আমি একটুও নড়তে, উঠে বসতে বা দাঁড়িয়ে উঠতে পারলুম না। অত্যন্ত অসহায়ের মতো বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলুম, একটি তরুণী এগিয়ে এসে আমার সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে তার মুখ আমার দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল এবং তার দুই চক্ষে জাগল একটা উৎকট ও ক্ষুধিত আনন্দের দীপ্তি। তারপরেই আমার কণ্ঠদেশে অনুভব করলুম দুটো ধারালো দাঁতের দংশন।

কিন্তু আমার গলার উপরে তার দাঁত দুটো ভালো করে চেপে বসতে না বসতেই ঘরের ভিতরে আবির্ভূত হল আর একটি সুদীর্ঘ মূর্তি। দেখেই চিনলুম। স্বয়ং রাজা রুদ্রপ্রতাপ।

রাজার চোখদুটো জ্বলছে জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো। সে চক্ষের দীপ্তি যেন ভয়ানক নরকাগ্নির মতন। যে তরুণী আমার কণ্ঠের উপরে দংশন করেছে, রাজার একখানা বলবান হাত বেগে গলা চেপে ধরে এক টানে তাকে দাঁড় করিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলে।

ভীষণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, 'কোন সাহসে তোরা এর কাছে এসেছিস? কোন সাহসে তোরা এর উপরে নজর দিয়েছিস—আমি কি তোদের মানা করিনি? চলে যা, চলে যা এখান থেকে! এ লোকটার উপরে আমি ছাড়া আর কারুর অধিকার নেই!'

তিন তরুণী আনন্দহীন তীক্ষ্ণ হাস্যধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা পরিপূর্ণ করে তুললে। সে কী অলৌকিক হাসি, আমার প্রাণ যেন হৃদয়ের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়তে চাইল।

একটি তরুণী বললে, 'আমাদের উপরে তোমার কোনও দয়া নেই!'

রাজা খুব মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করলেন আমার মুখের উপরে। তারপর ফিরে সহজভাবে সান্ত্বনাভরা মৃদু কণ্ঠস্বরে বললেন, 'তোদের উপরে যে আমার দয়া আছে, এ কথা কি তোরা জানিস না? আচ্ছা, এ লোকটাকে নিয়ে আগে আমার কাজ শেষ হোক, তারপর একে সঁপে দেব তোদের হাতে। এখন যা যা, চলে যা! আমাকে এখন একে জাগাতে হবে!'

আর-একজন তরুণী বললে, 'আজ কি তাহলে আমাদের উপবাস?'

—'না, কে তোদের উপবাস করতে বলছে? এই নে।' বলেই তিনি একটা পোঁটলা মেঝের উপরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। পোঁটলাটা মাটির উপরে পড়েই নড়ে-নড়ে উঠল—যেন তার ভিতরে আছে জীবন্ত কোনও-কিছু।

একটা স্ত্রীলোক পোঁটলাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘিনীর মতন মহা আগ্রহে। তারপর পোঁটলাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলুম একটা হাঁপিয়ে-ওঠা চাপা গলার কান্নার শব্দ। কেঁদে উঠল যেন কোনও কচি শিশু। তারপরেই নিদারুণ ভয়ে স্তম্ভিতের মতন দেখলুম, সেই ভয়ানক পোঁটলাটা নিয়ে স্ত্রীলোক তিনটে একসঙ্গে ছুটে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। কেমন করে বেরিয়ে গেল আমি জানি না, কারণ যেখান দিয়ে তারা অদৃশ্য হল, সেখানে দরজা বা গবাক্ষ কিছুই ছিল না। তারা মিশিয়ে গেল যেন চাঁদের আলোর সঙ্গে। তারপরেই জানলার ভিতর দিয়ে ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখলুম, শূন্যের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে যেন তিনটে জীবন্ত ছায়া।

আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

আট

নেকড়ের খোরাক

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি, শুয়ে আছি নিজের বিছানায়।

কেমন করে আমি এখানে এলুম? রাজা কি নিজেই আমাকে বহন করে এনেছেন?

ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লুম। রোদের সোনামাখা আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতরে। সকালের স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ পেয়ে কালকের রাত্রের ঘটনাগুলো মনে হতে লাগল মিথ্যা স্বপ্ন বলে। তারপরেই বোধ হল, আমার গলার এক জায়গা যেন জ্বালা করছে। সেখানে হাত দিয়েই বুঝলুম, আমার গলায় রয়েছে একটা ক্ষত। সামান্য ক্ষত বটে, কিন্তু কাল রাত্রে এইখানেই তো পেয়েছিলুম সর্বনেশে স্ত্রীলোকটার দাঁতের স্পর্শ! বেশ বোঝা যাচ্ছে, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্নের ক্ষত কখনও জাগরণে থাকে না। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। কাল রাত্রে আমি কাদের পাল্লায় গিয়ে পড়েছিলুম? তবে কি তারা প্রেতিনী? চলতি কথায় যাদের বলে পেতনি? প্রেতিনী এত সুন্দরী হয়? রাজাকে দেখতে তো মানুষের মতো, প্রেতিনী কি মানুষের মতো; প্রেতিনী কি মানুষের হুকুম তামিল করে? আর এই অদ্ভুত রাজাই কি প্রেতিনীদের খোরাক জোগান?

ভীষণ, ভীষণ এই চিন্তা! আজ থেকে আর আমি রাজার অবাধ্য হব না, সন্ধ্যার পর আর

কোনওদিন নিজের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করব না! আবার অন্য ঘরে গেলে আর বোধহয় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব না। আমার পক্ষে এই ঘরই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

সেদিন দুপুরে বাইরের অঙ্গন থেকে কয়েকজন লোকের গলার সাড়া পাওয়া গেল। জানলার ধারে গিয়ে দেখি, সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে কয়েক জন লোক। পোশাক দেখে তাদের বেদে বলেই মনে হল।

ভাবলুম, আচ্ছা এদের সাহায্যে আমার অবস্থার কথা লিখে কলকাতায় লুকিয়ে চিঠি পাঠালে কেমন হয়? এই কথা মনে হতেই ছুটে টেবিলের ধারে গিয়ে বসলুম। এবং তাড়াতাড়ি কয়েকটা লাইন লিখে কাগজখানা খামে মুড়ে তার উপরে দিলুম আমার অফিসের ঠিকানা। তারপর সেই খামের সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট একগাছা সুতো দিয়ে বেঁধে আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমি হাত নেড়ে ইঙ্গিত করতেই একজন যুবক বেদে আমার জানলার ঠিক তলায় এসে উপস্থিত হল।

যতটা সম্ভব নিচু গলায় তাকে বললুম, 'এই চিঠিখানা যদি ডাকঘরে দেবার ব্যবস্থা করতে পারো, তাহলে দশ টাকা বকশিশ পাবে।'

লোকটা আমাকে সেলাম করে হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানালে, আমার কথামতো কাজ করতে সে নারাজ নয়।

নোটের সঙ্গে চিঠিখানা নীচের দিকে ফেলে দিলুম, লোকটা আর-একবার সেলাম ঠুকে হন-হন করে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

সন্ধ্যাবেলায় রাজা আমার ঘরে এসে হাজির। তিনি আমার পাশে এসে বসলেন এবং অত্যন্ত শান্ত, মিষ্ট স্বরে বললেন, 'একজন বেদে এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে গেল।'

আমার বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু মুখে কোনও কথা বললুম না। রাজা একটুখানি হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে একটি কাঠি জ্বেলে চিঠিখানা তার শিখার উপরে তুলে ধরলেন। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চিঠিখানা।

আর একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করে রাজা ধীর পদে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে।

হতাশভাবে বসে রইলুম। ওই বেদেগুলো যে রাজারই লোক সেটা বেশ ভালো করেই বোঝা গেল। চিঠিখানা যে রাজা পড়ে দেখেছেন সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। ব্যর্থ হল আমার মুক্তির চেষ্টা।

জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম দুঃখিতভাবে।

বাইরে চন্দ্রালোকের মহা সমারোহ। বন থেকে ভেসে আসছে গানের পাখির কণ্ঠস্বর। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য আজ আমার মন গ্রহণ করতে পারলে না।

আমার দৃষ্টি দেখছিল আর একটা দৃশ্য। চন্দ্রকিরণের স্থানে স্থানে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন অনেকগুলো অতি-শুভ্র ধুলোর কণা এবং মণ্ডলাকারে উড়তে উড়তে জায়গায় জায়গায় তারা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। দৃশ্যটা দেখতে আমার চোখে ভালোই লাগল।

হঠাৎ উপত্যকার দিক থেকে একদল কুকুরের কেঁউ-কেঁউ করে আর্তস্বরে কান্না জেগে উঠল এবং আমার দেহের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল কেমন একটা চমৎকার শিহরণ। কুকুরের কান্না ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে এবং সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রালোকে উত্তপ্ত ধূলিপুঞ্জগুলো যেন নূতন নূতন আকার গ্রহণ করতে লাগল। আমার মনে হল, কে যেন কোথা থেকে আমাকে ডাকছে, ডাকছে, আর ডাকছে! সেই অজানার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আমার কেমন একটা আগ্রহ হতে লাগল। কানে কানে ও প্রাণে প্রাণে শুনলুম ও অনুভব করলুম সে কী এক অদ্ভুত সম্মোহন-মন্ত্র।

শূন্যে ধূলিপুঞ্জের নৃত্য হয়ে উঠল দ্রুততর। তারা বেগে সঞ্চালিত হতে লাগল এপাশে-ওপাশে, উপরে ও নীচে। চন্দ্রালোকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল কীসের একটি কম্পন। তারপরে ক্রমে-ক্রমে সেই ধূলির পুঞ্জগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কী রকম সব আকার লাভ করতে লাগল! তারপর দেখলুম যেন চাঁদের আলো দিয়ে তৈরি তিনটে নারীর মূর্তি। কাল রাত্রে যাদের আমি ও-ঘরের ভিতরে স্বচক্ষে দেখেছিলুম, তারা ছাড়া এরা আর কেউ নয়।

রাজা কাল বলেছিলেন, পরে তাদেরই হাতে আমাকে তিনি সমর্পণ করবেন। এরা কি আজ তারই জন্যে আমাকে আবার দাবি করতে এসেছে? সভয়ে তাড়াতাড়ি দুমদাম শব্দে ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলুম। আমার কাছে এই অন্ধকার ঘরই নিরাপদ, এখানে নেই বাইরের বিপজ্জনক চন্দ্রালোক! জানলা বন্ধ করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

ঘণ্টা-দুই কেটে গেল। আমার ঘরের ঠিক উপরেই ছিল রাজাবাহাদুরের শয়নগৃহ। মনে হল, সেইখানেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল যেন এক কিশোর কণ্ঠস্বর। তারপর হঠাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হলে যেমন হয়, তেমনিভাবেই থেমে গেল শিশুর সেই ক্রন্দন। আমার বুকের কাছটা ধড়ফড় করতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরুতে গেলুম, কিন্তু ঘরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ। হতাশভাবে নিজের বিছানায় এসে বসলুম। কী কর্তব্য, তাই চিন্তা করতে লাগলুম।

তারপরে বাড়ির বাইরে নীচের দিক থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার কেঁদে উঠল কোন এক নারীর কণ্ঠ। আবার উঠে ছুটে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি একটা জানলা খুলে দিলুম। মুখ বাড়িয়ে দেখি জানলার ঠিক নীচেই অঙ্গনের উপরে জানু পেতে বসে আছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এক নারীমূর্তি। তার এলানো চুলগুলো বিশৃঙ্খলভাবে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং দুই হাত দিয়ে এমনভাবে সে নিজের বুকখানাকে চেপে ধরেছে যে দেখলেই বোঝা যায়, অনেক দূর থেকে সে ছুটতে ছুটতে এখানে এসে পড়ে নিজের হাঁপ সামলাবার চেষ্টা করছে।

জানলায় আমার মুখ দেখে সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর তীব্র স্বরে চিৎকার করে বললে, 'দে রাক্ষস, আমার খুকিকে ফিরিয়ে দে!'

সে আবার জানু পেতে বসল ও দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে এমনভাবে আবার সেই কথাগুলো উচ্চারণ করলে যে, নিদারুণ দুঃখে বুকটা যেন আমার ভেঙে গেল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে কখনও সে মাটির উপরে আছড়ে-পিছড়ে পড়তে ও কখনও দুই হাতে বুক চাপড়াতে ও কখনও নিজের মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য!

বোধহয় উপরের ঘর থেকেই শুনতে পেলুম রাজার কর্কশ কণ্ঠস্বর। তিনি যা বলছিলেন, তার একটা বর্ণও বোঝা গেল না। কারণ সে যেন কতকগুলো অর্থহীন অদ্ভুত ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই

নয়। সঙ্গে-সঙ্গে এদিক ওদিক ও সুদূর থেকে আকাশ-বাতাসকে যেন বিষাক্ত করে তুললে দলে-দলে নেকড়ে বাঘের বুভুক্ষু গর্জনের পর গর্জন। রাজা কি তবে তাদেরই আহ্বান করেছেন? মানুষের পক্ষে দুর্বোধ রাজার এই অর্থহীন ধ্বনির অর্থ কি তাহলে নেকড়েদের কাছে সুস্পষ্ট? রাজা কি নেকড়েদের ভাষাও জানেন? আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মূর্তিমান ঝড়ের মতো বেগে একদল নেকড়ে বাঘ রাজার অঙ্গনের ভিতরে এসে অভাগী নারীমূর্তিটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারীর কণ্ঠ থেকে আর কোনও শব্দ শোনা গেল না, নেকড়েদেরও গর্জন হল স্তব্ধ। খানিক পরে তারা একে-একে লকলকে জিভ দিয়ে নিজেদের মুখ চাটতে চাটতে অঙ্গনের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে গেল।

মনে মনে বললুম, মৃত্যুই শ্রেয়, অভাগীর মৃত্যুই শ্রেয়! তার শিশুর কী পরিণাম হয়েছে, তা আমি জানি। এর পরও বেঁচে আর লাভ নেই।

কিন্তু আমি কী করব, আমি কী করতে পারি? কেমন করে আমি এই ভয়াল রাজা এবং ভীষণ আতঙ্ক এবং অন্ধকার রাত্রির কবল থেকে নিস্তার লাভ করব? ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন আকাশের কোলে খেলা করছে আনন্দময়ী তরুণী ঊষা।

রাত্রে যে আমার মতন যম-যন্ত্রণা ভোগ করে, তার কাছে ভোরের আলো যে কতখানি মিষ্টি, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই তা বুঝতে পারবে না। বিশালগড়ের উচ্চ তোরণের ঠিক উপরেই আকাশপথে দেখা দিলে গৌরবময় প্রভাতসূর্য। তাকে দেখেই আমার সমস্ত ভয় সর্বাঙ্গ থেকে খসে পড়ল বিষধরের খোলসের মতো। এইবার আমাকে নামতে হবে কার্যক্ষেত্রে। যা কিছু করবার, দিনের আলো থাকতে থাকতেই সব শেষ করে ফেলতে হবে। উঠে দাঁড়ালুম। সামনের আনলাটার দিকে নজর গেল। সেটা একেবারেই খালি। সেখানে আমার যত জামা-কাপড় ও চাদর সাজানো ছিল, সমস্তই অদৃশ্য হয়েছে। তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার 'পোর্টম্যান্টো'টা পর্যন্ত আর ঘরের ভিতরে নেই।

এ কীর্তি যে রাজার, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এখন কী করব? আমি যে একেবারে রিক্ত! আমার পরনে আছে কেবল একখানা আধ-ময়লা কাপড় আর একটি মাত্র গেঞ্জি। আমার পায়ের তিন জোড়া জুতো পর্যন্ত খুঁজে পেলুম না। এমন বেশে, এমন নগ্নপদে আমি যে বাড়ির বাহিরে যেতে পারব না, নিশ্চয় তাই বুঝেই রাজা এই ব্যবস্থা করেছেন।

নয়

রাজার দেহ

কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেবল রাত্রিবেলাতেই আমি হই নানান আতঙ্কের দ্বারা আক্রান্ত। রাত্রেই আমার জন্যে যেন অপেক্ষা করে রকম-রকম বিপদ-আপদ। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই, আজ পর্যন্ত দিনের

বেলায় সূর্যাস্তের আগে একদিনও আমি রাজার দেখা পাইনি। এর হেতু কী? পৃথিবী যখন জাগে, উনি কি তখন ঘুমোন, আর পৃথিবী যখন ঘুমোয়, তখনই কি তিনি ওঠেন জেগে?

আজ সকালে দেখছি, আমার ঘরের দরজাটা বাহির থেকে আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। খালি পায়ে আর প্রায় অর্ধনগ্ন দেহে আমি যে এই বিশালগড় ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করব না, এইটুকু আন্দাজ করেই রাজা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েছেন আমার সম্বন্ধে।

কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে চলাফেরায় আমার যখন বাধা নেই, তখন দিনের বেলায় এখানকার রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? খুব সম্ভব সমস্ত রহস্যের মূল তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে রাজার ওই তিনতলার শয়নগৃহে প্রবেশ করলে। কিন্তু কেমন করে সেখানে যাব? দেখছি সে-ঘরের দরজা সর্বদাই তালাবন্ধ থাকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। আচ্ছা, রাজা নিজের ঘরের গবাক্ষের ভিতর দিয়ে যেভাবে নীচে নেমে আসেন সেইভাবেই কি কেউ বাহির থেকে দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারে না? আমি নিজের চোখে তাঁকে ওখান থেকে নামতে দেখেছি, চেষ্টা করলে আমিই বা কেন ওই পথ দিয়ে উপরে উঠতে পারব না? অবশ্য পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু আসুক বিপদ, আমি এখন মরিয়া। এখানে আর কিছুদিন থাকলেও যখন বাঁচব না, তখন বাঁচবার চেষ্টা করেও যদি মরতে হয়, তবে সেটা হবে মন্দের ভালো। বেশ, দেখা যাক। ভগবান আমাকে সাহায্য করবেন।

জানলার কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখলুম, আমার ঘরের গবাক্ষের ঠিক নীচে দিয়ে বাড়ির এদিক আর ওদিকে চলে গিয়েছে দোতলার সুদীর্ঘ কার্নিশটা। সেকালকার বড়ো-বড়ো বাড়ির কার্নিশ এমন চওড়া হত যে একটু চেষ্টা করলেই তার উপর দিয়ে অনায়াসেই পদচালনা করতে পারা যেত। রাজার তিনতলার ঘর থেকে জীর্ণ দেওয়ালের যে ধার-বার-করা পাথরগুলো একতলা পর্যন্ত নেমে গিয়েছে, আমার এই গবাক্ষ থেকে দেওয়ালের সেই অংশটার দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। সুতরাং ওখানে গিয়ে পৌঁছতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না বলেই মনে করি।

গবাক্ষ দিয়ে বেরিয়ে কার্নিশের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। বুকটা একবার কেঁপে উঠল, কারণ এই সেকেলে বাড়ির অতি পুরাতন কার্নিশ আমার ভারে যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, তাহলে বিদায় আমার পৃথিবী, বিদায় আমার বাঁচবার আশা!

নীচের দিকে তাকালুম না—হয়তো ভূমিতলের দূরত্ব দেখে মাথা ঘুরে যেতে পারে। দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে পায়ে পায়ে রাজার ঘরের নীচেকার এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলোর কাছে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলুম। তারপর দুই হাত আর দুই পায়ের সাহায্যে সেই ধার-বার-করা পাথরগুলো অবলম্বন করে সাবধানে ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে লাগলুম।

এই তো সেই গবাক্ষ, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে রাজা সেদিন নীচের দিকে নেমে গিয়েছিলেন। ঘরের ভিতরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই বুকটা আমার দুরদুর করে উঠল। কিন্তু তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম, ঘরের ভিতরে জনপ্রাণী নেই। জানলার উপরে হাত চাপড়ে কয়েকবার শব্দ করলুম, ভিতর থেকে তবু কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বিশেষ বিস্মিত হলুম। রাজা তাহলে দিনের বেলাতেও ঘরের বাইরে যান? কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর সঙ্গে আমার কোনওদিন দেখা হয়নি কেন? আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি কেবল নিশাচর রূপেই।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে গবাক্ষ-পথ দিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে নামলুম। গৃহতল মর্মর-মণ্ডিত বটে, কিন্তু ধুলোর প্রলেপে ও যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে মর্মরের তাজা শুভ্রতা। সেই প্রশস্ত ঘরের চারিদিকেই রয়েছে হরেক রকম আসবাব। প্রত্যেক আসবাবই অত্যন্ত গুরুভার ও বহুকাল আগেকার। এসব আসবাব যে ব্যবহৃত হয়, এমন কোনও প্রমাণও পেলুম না।

এক জায়গায় রয়েছে মস্ত-বড়ো একটা সেকেলে টেবিল। তার উপরে স্তূপীকৃত হয়ে আছে অনেক রকম স্বর্ণমুদ্রা। সেই স্বর্ণ-স্তূপের উপরেও জমে উঠেছে প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু ধুলোর স্তর। বোঝা গেল সেসব মুদ্রাও অনেক কাল স্পর্শ করা হয়নি। মুদ্রাগুলো পরীক্ষা করলুম। কোনও মুদ্রারই বয়স তিনশো বছরের কম নয়। তাহলে কী বুঝতে হবে, এইসব স্বর্ণমুদ্রা তিন শতাব্দীর মধ্যে কোনও মানুষের ব্যবহারে আসেনি? কেবল কি মুদ্রা? মণিমুক্তোখচিত ভারী ভারী কতরকম জড়োয়া গহনা! সেরকম গহনাও একালে কারুর দেহেই শোভা পায় না।

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এ কী অদ্ভুত ঘর! এখানে এসে দাঁড়ালে বর্তমানের আধুনিকতা যেন চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সুদূর অতীতের সমস্ত রহস্য যেন কার জাদুমন্ত্রে জীবন্ত হয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে!

শুনেছিলুম এটা নাকি রাজার শয়নগৃহ। কিন্তু তিনি শয়ন করেন কোথায়? চারিদিকে তাকিয়েও কোনও খাট-পালঙ্ক, এমনকি ঘরের মেঝেতে পাতা কোনও শয্যা পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না। এটা শয়নগৃহ হলে মানতে হয়, এর মালিক শয়ন করেন ধূলিধূসর নগ্ন মেঝের উপরে। কিন্তু সেটাও সম্ভবপর বলে মনে হল না। দেখলুম ঘরের ভিতরে একদিকের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে আর একটা দরজা। তার পাল্লা দুখানা বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল। আলো-আঁধারের মধ্যে দেখা গেল একটা সরু পথ। অগ্রসর হয়ে পথের শেষে দেখলুম, সঙ্কীর্ণ এক সার সিঁড়ি ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নেমে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। সে-রকম অন্ধকারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হল না। আবার ঘরের ভিতরে ফিরে এলুম। সেখানে খোঁজাখুঁজি করে একটা টেবিলের তলা থেকে বার করলুম সেকেলে এক বাতিদান, তার উপরে রয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ পোড়া একটা বাতি। বাতির মুখে আলো জ্বেলে আবার সেই সরু পথটার ভিতর দিয়ে এগিয়ে সিঁড়িগুলোর কাছে গেলুম। তারপর খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নামতে লাগলুম নীচের দিকে।

একটা জিনিস লক্ষ করলুম, সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপেই জমে আছে যে কত যুগের পুরাতন ধুলো, আন্দাজে তা হিসাব করে বলা অসম্ভব। মনে হল, শতাব্দীর পরে এই সিঁড়িগুলোর উপরে সর্বপ্রথমে পড়ল আমার পদচিহ্ন। কারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেও ধুলার পটে পেলুম না আর কারুর পায়ের দাগ। ভাবতে লাগলুম, প্রাসাদের তিনতলায় রাজার শয়নগৃহের পাশে এক সার সিঁড়ি থাকার সার্থকতা কী? তবে কি এর নীচে আছে সেকালকার চোরাকুঠরির মতো কোনও একটা জায়গা,—সমূহ বিপদের সময়ে যার ভিতরে আত্মগোপন করা যায়?

ক্ষীণ দীপালোকের ধাক্কায় অন্ধকারের নিবিড়তাকে অল্প অল্প সরিয়ে নীচের দিকে যতই নেমে যাচ্ছি, মনের ভিতরে ততই প্রবল হয়ে উঠছে একটা রোমাঞ্চকর অপার্থিব ভয়। আমার আত্মা যেন অনুভব করতে লাগল, ইহলোকের দিকে পিছন ফিরে এগিয়ে চলেছে সে অলৌকিক এক রহস্যের অভিমুখে।

অবশেষে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম সেখানে পায়ের তলায় পেলুম

শীতল কাঁচা মাটির স্পর্শ। বোধহয় আমি আবার নেমে এসেছি বাড়ির একতলায়। সামনে আবার একটা গলিপথ। সেখানে বদ্ধ হাওয়ায় জমে রয়েছে কেমন একটা ভীষণ দুর্গন্ধ। সে যেন কোনও গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ, তা সহ্য করা অসম্ভব। তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিলুম, কিন্তু তবু তার কবল থেকে নিস্তার পেলুম না।

দ্বিগুণতর ভয়ে বুকের ভিতরে জাগল ঘন-ঘন কম্পন। আমি কোথায় যাচ্ছি, কীসের এই দুর্গন্ধ? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলুম না বটে, তবু যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই পদচালনা করে গলিপথটার শেষে গিয়ে পেলুম আর একটা অত্যন্ত নিচু ও সঙ্কীর্ণ ঘর। সেখানকার বাতাস পর্যন্ত যেন বিষাক্ত, প্রতি মুহূর্তে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। সেখানকার অন্ধকার এমন পুঞ্জীভূত যে, ক্ষীণ দীপশিখাটাকে দেখাতে লাগল তার গায়ে একটা তুচ্ছ, রক্তহীন ও হলদে ক্ষতচিহ্নের মতো। সেখানকার আনাচে-আনাচে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি মেলে আমার পানে তাকিয়ে আছে যেন এমন সব অভাবিত বিভীষিকা, যে-কোনও মুহূর্তে যারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো দৃশ্যমান হয়ে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে পারে জীবন-প্রদীপের শিখা।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব বিসদৃশ চিন্তাকে মনের ভিতর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মনে মনে নিজের মনকে ডেকে নিজেই বলে উঠলুম—তুমি জাগ্রত হও, ভুলে যাও অন্য সব তুচ্ছ ভাবনা। তুমি এসে পড়েছ এখন রহস্যের শেষ প্রান্তে। এখন আর ইতস্তত করলে চলবে না।

ভিজে স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা কুলুঙ্গি। তার উপরেই রেখে দিলুম বাতিদানটা।

ঘরের কোনওদিকেই কোনও কিছুই নেই—কেবল মাঝখানে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স। মেপে দেখলুম বাক্সটা লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়ায় দুই হাত। খুব মজবুত পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি সেই বাক্সটা, তার ডালাটা এত ভারী যে টেনে তুলতে যথেষ্ট শক্তির দরকার হয়।

কিন্তু ডালা তুলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম বিদ্যুতাহতের মতো। দুঃস্বপ্নেও এমন দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না! কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!

বাক্সের মধ্যে লম্বমান হয়ে শুয়ে রয়েছে রাজার দেহ। বুঝতে পারলুম না সে দেহ মৃত কি নিদ্রিত। কারণ, তার দুই চক্ষুই ছিল বটে উন্মুক্ত ও আড়ষ্ট, কিন্তু মৃতের চক্ষে থাকে যে-রকম অস্বাভাবিক ভাব, এখানে তার কোনওই চিহ্ন নেই; মুখের বিবর্ণতার মধ্যেও ফুটে আছে যেন জীবনের তপ্ততা এবং ওষ্ঠাধরের আরক্ত আভাও মলিন হয়ে যায়নি কিছুমাত্র।

কিন্তু জ্যান্ত মানুষের বুক যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠে এবং নামে এই দেহে তার কোনও চিহ্নই নেই। বক্ষস্থল একেবারে স্থির। আমি রাজার উপরে নত হয়ে পড়লুম। জীবনের একটুখানি ইঙ্গিত পাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু বৃথা, বৃথা, বৃথা।

আচম্বিতে লক্ষ করলুম, রাজার সেই আড়ষ্ট মৃত চক্ষুর ভিতরেও ফুটে আছে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব। সে চক্ষুদুটো আমাকে যে দেখতে পাচ্ছে না এবং আমার সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অচেতন এটাও আমি বুঝতে পারলুম বটে, কিন্তু সেই মারাত্মক মরা দৃষ্টি আমার অন্তরাত্মার মধ্যে করতে লাগল আতঙ্কবৃষ্টি। সহ্য করতে পারলুম না, প্রাণপণে ছুটে সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলুম—এমনকি, বাতিদানটাও তুলে নিয়ে আসবার অবসর পর্যন্ত পেলুম না।

দশ

আজ, নয় কাল

সূর্য অস্তাচলে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও আকাশের মেঘে মেঘে খেলা করছিল খানিকটা পরিত্যক্ত রক্তরাগ। আর একটু পরেই হবে তিমিরাবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যার আগমন।

আজও আমি উপরের খোলা ছাদে একলা দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমার বন্দিজীবনে এখানকার মুক্ত আলোক ও বাতাস ছাড়া আর কিছুই উপভোগ করবার উপায় নেই। তাই মাঝে মাঝে ছাদে না এসে থাকতে পারি না।

হঠাৎ দেখলুম রাজার ঘরের গবাক্ষের কাছে কী যেন একটা নড়ে নড়ে উঠছে। ভালো করে দেখেই আমার চোখ উঠল চমকে। এ যে একখানা ভয়ঙ্কর কালো মুখ! মানুষের মুখ নয়, কোনও কুৎসিত জন্তুর মুখ। তার দুটো ছোটো-ছোটো চোখে কী বিষম তীব্রতা! মনে হল, জ্বলন্ত চক্ষে সেই মুখখানা তাকিয়ে আছে আমার পানে।

আলোক তখন অস্পষ্ট, ওটা যে কী জন্তু তা আন্দাজ করা গেল না। তারপর আমার দৃষ্টিকে অধিকতর বিস্মিত করে সেই জন্তুর সমস্ত দেহটা করলে আত্মপ্রকাশ। একটা মস্ত বড়ো বাদুড়। বাদুড় যে এমনভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষের ঘরে বসে থাকতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না। তারপরেই মনে হল, রাজা তো মানুষের দেহেও মানুষ নন। তাঁকে অমানুষ বললেও কোনও অত্যুক্তি হয় না। এমন অমানুষের সঙ্গে যে বাদুড় ও পেচক প্রভৃতি অমঙ্গলকর জীব বাস করবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

বাদুড়টা তখনও মুখ ফিরিয়ে আছে আমার দিকে। অমন করে ও আমাকে দেখছে কেন? আমাকে দেখে ওর তো লুকিয়ে পড়বার কথা। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে আমি জোরে কয়েকবার হাততালি দিলুম। তার দুই ক্রুদ্ধ চক্ষে ঠিকরে পড়ল যেন আগুনের ফিনকি! তারপর সে হঠাৎ উঠে ছাদের প্রাচীরের উপরে এসে বসল এবং আবার দীপ্ত চক্ষে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

এ-রকম আশ্চর্য বাদুড় জীবনে কখনও দেখিনি। মানুষকেও ভয় করে না, উলটে মানুষের কাছে এগিয়ে আসে এবং জ্বলন্ত চোখ পাকিয়ে চেষ্টা করে ভয় দেখাবার!

একবার ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে বাদুড়টার উপরে এক ঘুসি বসিয়ে দিই। কিন্তু তাও পারলুম না, কেমন ভয় হল। হয়তো রাজা যেমন মানুষ হয়েও মানুষ নন, এই বাদুড়ের পিছনেও তেমনই কোনও রহস্য আছে। হয়তো এটাকে বাদুড়ের মতন দেখালেও বাদুড় নয়।

দূর থেকে তাকে ছুড়ে মারবার জন্যে ছাদের উপরে হেঁট হয়ে একখণ্ড ইষ্টক তুলে নিলুম। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলেই দেখি বাদুড়টা আর সেখানে নেই, দুদিকে দুখানা পাখনা বিছিয়ে দিয়ে সবেগে উড়ে যাচ্ছে সান্ধ্য আকাশের তলায় প্রকাণ্ড একটা অভিশপ্ত কালো প্রজাপতির মতো।

অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ধীরে, ধীরে, ধীরে। আর ছাদের উপরে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা। এখনই এখানে এসে দেখা দিতে পারে সেই তিন পেতনির মূর্তি। তাদের কথা স্মরণ

করেই বুক ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতরে পালিয়ে এলুম। তারপর বিছানার উপর শুয়ে পড়তেই অসময়ে চোখে এল ঘুম।

খানিক পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রাজা স্বয়ং। তাঁর মুখ এমন গম্ভীর যে দেখলেও ভয় হয়।

কিন্তু রাজা শোনালেন সুমিষ্ট এক আশ্বাসবাণী। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু, এখানে আজই আপনার শেষ রাত্রি। কালকেই আপনি কলকাতায় যাত্রা করতে পারবেন। আমি আজই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, কারণ আর একটু পরেই আমাকেও করতে হবে বিদেশ যাত্রা। বিশেষ এক গোপনীয় কারণে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আপনার যাওয়ার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা তা আমি করে যাব।'

এই হানাবাড়িতে আমাকে একলা থাকতে হবে? এমন চিন্তাও আমার পক্ষে ভয়াবহ। বললুম, 'আমিও তো আজকেই যেতে পারি?'

—'তা হয় না বিনয়বাবু। আমার কোচম্যান আজ এখানে নেই।'

—'কিন্তু যদি আপনি আদেশ দেন, তাহলে আমি পায়ে হেঁটেই এখান থেকে যাত্রা করতে পারি।'

রাজা হাসলেন একটুখানি শান্ত হাসি। আমার সন্দেহ হল, এই শান্ত হাসির পিছনে আছে নিশ্চয়ই কোনও নূতন অশান্তি। তিনি বললেন, 'সঙ্গের জিনিসপত্তর না নিয়েই আপনি চলে যেতে চান?'

—'চুলোয় যাক জিনিসপত্তর! পরে সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে আমি লোক পাঠিয়ে দেব।'

অতিশয় ভদ্রের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, 'বেশ, তাহলে আসুন, বন্ধু! আপনি যদি এখনই যেতে চান, আমি কোনওই বাধা দেব না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করি না।'

মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিপুল আনন্দে। কিন্তু মনের ভাব বাইরে গোপন করে রাজার পিছনে পিছনে আমি হলুম অগ্রসর। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একেবারে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

রাজা দরজার পাল্লা দুখানা খুলে দিলেন—খানিকটা চাঁদের আলো দ্বারপথের ভিতরে এসে পড়ল। রাজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'শুনুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বে তুললেন তাঁর দীর্ঘ একখানা বাহু এবং তাঁর বাহু ঊর্ধ্বোত্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ত্রস্ত কর্ণে প্রবেশ করল একদল নেকড়ে বাঘের বীভৎস চিৎকার-ধ্বনি। তারপরেই সভয়ে দেখলুম, আঙিনা জুড়ে দরজার দিকে পালে পালে ছুটে আসছে নেকড়ের পর নেকড়ে! তাদের ক্রূর চক্ষু ও নির্দয় দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠছে চাঁদের আলোয়।

আমি বাড়ির ভিতর পালিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই রাজা বজ্রমুষ্টিতে ডান হাতটা চেপে ধরলেন। আমি তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলুম না, কারণ চেষ্টা করলেও আমি সফল হতুম না—আগেই পেয়েছি ওই বাহুর শক্তির পরিচয়। নাচার হয়ে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ মনে হল একটা ভয়ানক কথা। নেকড়েগুলো তখন আমাদের খুব কাছেই এসে পড়েছে।

দুরাত্মা রাজা কি নেকড়েদের কবলেই আমাকে সমর্পণ করতে চান? তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'দরজা বন্ধ করুন, আজ আমি এখান থেকে যেতে চাই না!'

নির্বাক মুখে সশব্দে রাজা দরজার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলেন। এবং নির্বাক মুখেই দুজনে আবার দোতালার ঘরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর মৌনব্রত ভঙ্গ না করেই রাজা আবার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে আমি বন্ধ করে দিলুম।

অল্পক্ষণ পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি যখন শোবার চেষ্টা করছি, তখন হঠাৎ আমার ঘরের দরজার ওপাশে শুনতে পেলুম কাদের কণ্ঠস্বর। ফিস-ফিস করে কারা কথা কইছে। দরজার উপরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাজা বলছেন, 'বিদেয় হ, বিদেয় হ! নিজের জায়গায় চলে যা! এখনও তোদের সময় আসেনি। সবুর কর! ধৈর্য ধর! আজকের রাত হচ্ছে আমার। কাল আসবে তোদের রাত।'

তারপরেই শুনতে পেলুম নিম্ন অথচ মিষ্ট মেয়ে-গলায় খিলখিল করে হাসির রোল।

দুর্জয় ক্রোধে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেলুম। সশব্দে দরজাটা খুলে ফেলে দেখলুম, সেই তিনটে প্রেতিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। আমাকে দেখেই তারা খলখল অট্টহাস্য করে উঠে দ্রুতপদে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

দাঁড়িয়ে রইলুম পাথরের পুতুলের মতো। আজ নয়, কাল? আমার অন্তিমকাল কি এতখানি ঘনিয়ে এসেছে? আজ নয়, কাল—আজ নয়, কাল! ভগবান, ভগবান, ভগবান!

এগারো

মুক্তি

সকাল হবার আগেই আমার ঘুম গেল ভেঙে। আজ আমার মৃত্যুর দিন। কিন্তু মৃত্যু যদি আসে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় আত্মদান করব না।

দূর থেকে একটা মোরগ ডেকে উঠে পৃথিবীকে জানিয়ে দিলে, আবার এসেছে নতুন প্রভাত।

মৃত্যুকে আসন্ন জেনেও মন হল প্রসন্ন। বুঝলুম, রাত্রি যখন বিদায় নিয়েছে, তার বিভীষিকাগুলো এখন আর আমাকে ভয় দেখাতে আসবে না। আকাশে যতক্ষণ সূর্য আছে, আমিও ততক্ষণ নিরাপদ। কিন্তু এই দিনের আলো থাকতে থাকতেই আজ আমাকে প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথমেই মনে জাগল একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা। রাজা কোথায় আছেন আমি জানি, আমি আর একবার তাঁকে দেখতে চাই।

প্রথম দিন যে উপায়ে রাজার ঘরে ঢুকেছিলুম, সেদিনও তাই করলুম। ভাবলুম, রাজা যদি জেগে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় এই মুহূর্তেই আমাকে হত্যা করবেন। কিন্তু আজই যখন আমাকে মরতে হবে, তখন আর মৃত্যুকে ভয় করে লাভ কী? এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম। না, আজও রাজা ঘরে নেই।

সেদিনও বাতিটা নিয়ে ঘরের ভিতরকার দরজা দিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলুম। হঠাৎ মনে পড়ল, এই বাতিদানটা সেদিন আমি ফেলে এসেছিলুম নীচেকার ঘরের কুলুঙ্গিতে। কিন্তু বাতিদানটা আবার উপরে নিয়ে এল কে? নিশ্চয়ই রাজা নিজেই। তাহলে তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে আমার সব কীর্তি? বুঝেছি, এইজন্যেই হয়েছে আমার উপরে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। রাজার গুপ্ত কথা যখন জেনে ফেলেছি, তখন আর আমার রেহাই নেই। উত্তম! তাহলে আমিও আজ রাজাকে একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই!

সেই স্যাঁতসেঁতে ভীষণ অন্ধকার গৃহ, সেই অসহনীয় গলিত শবের দুর্গন্ধ। সেই প্রকাণ্ড বাক্সটা আবার পড়ে আছে আমার চোখের সুমুখে।

দুই হাতে টেনে ভারী ডালাটা খুলে ফেললুম। তারপর এমন কিছু দেখলুম যে, আমার আত্মা পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কল্পনাতীত এক আতঙ্কে।

তেমনিভাবেই চিত হয়ে বাক্সের ভিতরে রাজা শুয়ে আছেন, কিন্তু রাজার জরাগ্রস্ত দেহের ভিতরে আবার ফিরে এসেছে যেন যৌবনের তারুণ্য। মাথার সেই ধবধবে সাদা চুলগুলো পর্যন্ত আবার কালো হয়ে উঠেছে। তাঁর দুই গণ্ড ছিল কোটরগত, এখন হয়েছে পুরন্ত। সারা মুখখানার উপরে ফুটে উঠেছে গোলাপি আভা। কিন্তু রাজার ওষ্ঠাধরের দুই পার্শ্ব দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ও কীসের চিহ্ন? রক্ত, রক্ত? হ্যাঁ, রাজার ঠোঁটের দুই পাশ দিয়ে রক্তধারা গড়িয়ে তাঁর চিবুক ও কণ্ঠদেশ পর্যন্ত করে দিয়েছে চিহ্নিত। এমনকি, তাঁর সেই বীভৎস চোখদুটোও হয়ে উঠেছে যেন নবজীবনের উচ্ছ্বাসে জীবন্ত। বোধ হল, এই ভয়াবহ জীবটা কার রক্ত পান করে দেহের ভিতরে আবার সঞ্চয় করেছে নবযৌবনের শক্তি ও স্বাস্থ্য।

বুকটা আমার শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, কিন্তু সমস্ত অন্তরাত্মা হয়ে উঠল বিদ্রোহী। ভালো করে একবার রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলুম। মনে হল, আমাকে দেখে সে-মুখ যেন হাসছে বিদ্রূপ-হাস্য। সেই হাসি দেখে রাগে আমি যেন পাগলের মতো হয়ে উঠলুম। এই অমানুষিক মানুষ পৃথিবীতে প্রতিদিন করছে নরহত্যার পর নরহত্যা এবং এখনও হয়তো করবে আরও কত নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা। এ যখন কলকাতাতেও যেতে চায়, তখন বোধ হচ্ছে সেখানে গিয়েও দিনের পর দিন দেবে আরও কত নরবলি। আর এই পিশাচকেই কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য করতে আজ আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি! এই মূর্ত মহাপাপ কলকাতায় গিয়ে যদি হাজির হয়, তবে তার সমস্ত অপরাধের জন্যে দায়ী হতে হবে আমাকেই। না, আমি একে কিছুতেই সে সুযোগ দেব না!

ঘরের এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম, মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা ভারী শাবল। আমি তখনই শাবলটা নিয়ে মাথার উপরে তুলে ধরলুম, তারপর মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে আঘাত করলুম সবলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজার মুখখানা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বিজাতীয় চক্ষু দিয়ে করলে যেন অগ্নিশিখা বর্ষণ। আমার দেহ হয়ে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো আড়ষ্ট এবং হাতের শাবলটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে রাজার কপালের উপর দিয়ে চলে গিয়ে কেবল একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলে। শাবলটা আবার যখন টেনে তুলতে গেলুম, তখন তার ধাক্কা লেগে বাক্সের ডালাটা আবার পড়ে গেল সশব্দে। সে ডালাটা আর আমার খোলবার ইচ্ছা হল না। জীবন্ত মৃতদেহের যে দৃশ্য দেখলুম, আমার পক্ষে হল তাই-ই যথেষ্ট।

ভাবতে আর ভাবতে আর ভাবতে লাগলুম, অতঃপর আমার কর্তব্য কী? যেমন করেই হোক, আজ দিনের বেলাতেই এখান থেকে পালাতে না পারলে আমার পক্ষে আজকের রাত্রিই হবে শেষের রাত্রি।

বাড়ির উপরতলা থেকে একতলায় নামবার উপায় তো আমার হাতেই রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে যে-পথটা বাড়ি থেকে বেরুবার জন্যে রাজা নিজে ব্যবহার করতেন, যদিও তাকে কুপথ বা বিপথ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, তবু সেই পথই আজ আমাকে বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। কারণ, রাজার মতন আমিও জানি ওই পথটা কেমন করে ব্যবহার করতে হয়।

কিন্তু কেবল বাড়ির বাইরে গেলেই তো চলবে না, বাইরের অঙ্গনের পরেই আছে বিশালগড়ের অত্যন্ত উচ্চ প্রাচীর। সেই দুরারোহ প্রাচীর পার না হতে পারলে বাড়ির বাইরে গিয়ে কোনওই লাভ নেই।

প্রাঙ্গণের ভিতরে কাল রাত্রে দেখেছি রাজার পোষ মানা সেই নেকড়ে-বাঘগুলোকে। হয়তো আজ দিনের বেলায় তারা এখানে পাহারা দিচ্ছে না। খুব সম্ভব ওই নেকড়েগুলোও হচ্ছে রাজার মতো নিশাচর, দিনের আলোয় আসতে ভয় পায়।

কিন্তু প্রাচীর পার হই কেমন করে—প্রাচীর পার হই কেমন করে! মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির তেতলায় গিয়ে উঠলুম। সেখানে সেই যে ধুলো-জঞ্জাল-আবর্জনাভরা ছোটো ছোটো দুখানা কামরা দেখেছিলুম, সে-দুটোর দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে না; হঠাৎ মনে পড়ল তারই একখানার ভিতরে দেখেছিলুম অনেকগুলো নারিকেল দড়ি। আজও আবার সেই ঘরে ঢুকে দেখলুম, দড়ির গোছা যথাস্থানে সেইভাবেই পড়ে রয়েছে। সেই দড়িগুলো নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পাকিয়ে ও যুক্ত করে সুদীর্ঘ একগাছা কাছি তৈরি করে ফেললুম। তারপর আবার নীচে নেমে এলুম।

ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাঙ্গণ ও প্রাচীরের এধার ওধার পর্যন্ত লক্ষ করে দেখতে লাগলুম। কারণ কাছি ঝুলিয়ে আমি প্রাচীরের বাইরের দিকে নেমে যেতে পারি বটে, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে প্রাচীরের উপরে আরোহণ করব কী উপায়ে?

ভগবানের আশীর্বাদে তারও উপায় আবিষ্কার করে ফেললুম। অঙ্গনের ভিতরে প্রায় প্রাচীর ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সুউচ্চ ও প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষ এবং তারই কতকগুলো মোটা মোটা ডাল প্রাচীরের উপর দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়েছে। ওই গাছটা হবে এখন আমার অবলম্বন।

এর পরের কথা আর বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ির বাইরে অঙ্গনের ভিতরে গিয়ে পড়লুম। কোথায়ও জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেউ আমাকে বাধা দিতে এল না। গাছে উঠে ডাল ধরে প্রাচীরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর প্রাচীরের উপর দিয়ে বেরিয়ে-পড়া একটা ডালে কাছিগাছা বেঁধে ঝুলে পড়লুম দুর্গা বলে। পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হতে বেশিক্ষণ লাগল না।

আবার আমি স্বাধীন! নরকের ভিতর থেকে আমি ধরিত্রীর শ্যাম কোলে ফিরে এসেছি! নরকের দূতরা আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না!

শরীরী প্রেত—শরীরী প্রেত! তার কথা জীবনে কোনওদিন শুনিনি, কিন্তু এখানে এসে তাকে দেখেছি স্বচক্ষে। তার কথা আর অবিশ্বাস করতে পারব না।

খুব সম্ভব এর পর এই শরীরী প্রেতের কর্মক্ষেত্র হবে কলকাতার মুক্ত জনতার মধ্যে। শরীরী প্রেতকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি। কিন্তু তার অমানুষিক কবল থেকে কলকাতাকে রক্ষা করতে হবে,—রক্ষা করতে হবেই! এখন আমার সামনে রইল কেবল এই কর্তব্য।

খালি পা। দেহে আছে খালি ময়লা গেঞ্জি ও কাপড়। এই বেশে আমার এই ছন্নছাড়া চেহারা দেখলে কেউ হয়তো আমাকে ভদ্রলোক বলে স্বীকার করবে না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। এখন যে-কোনও উপায়ে একবার কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়।

পথ-খরচের জন্যে ভাবি না। পথ-খরচের জন্যে যে টাকার দরকার হবে, এটা আমি ভুলিনি। তাই বাড়ির বাইরে আসবার আগে রাজার ঘরের সেই টেবিলের উপর থেকে আমি দুই মুঠো সোনার মোহর পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

(বিনয়ের ডায়েরি আপাতত এইখানেই শেষ হল)

উত্তরার্ধ

এক

কলকাতায় ভ্যাম্পায়ার

অবিনাশবাবু একজন রীতিমতো মজলিশি লোক। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের উপরে ছিল তাঁর বসতবাড়িখানি। সেইখানে রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠকখানায় হত নানা শ্রেণীর লোকের আগমন। এবং রোজই সেখানে তপ্ত পিয়ালার গরম চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশত সিগার-সিগারেট বা গড়গড়ার ঘূর্ণায়মান ধূম্ররাশি। তার উপরে প্রতিদিন যে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবারের ব্যবস্থা হত না, অবিনাশবাবু সম্বন্ধে এমন অভিযোগও করা যায় না।

অবিনাশবাবু পঞ্চাশের ওপারে গিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ তাঁকে বৃদ্ধ বললেও তিনি আপত্তি করতে পারবেন না—যদিও তাঁর মাথার চুল ও ঠোঁটের উপরকার গোঁফজোড়াটি এখনও পক্কতার উপরে দাবি করতে পারে না। তাঁর দেহ এখনও আছে দস্তুরমতো কর্মঠ ও বলিষ্ঠ। তাঁর পিতা পরলোকে যাবার সময় ইহলোকে এমন কিছু রেখে গিয়েছেন যার মহিমায় অবিনাশবাবুকে কোনওদিনই ভাবতে হয়নি ভাত-কাপড়ের দুর্ভাবনা। সংসারের ভাবনাকেও জলাঞ্জলি দিতে পেরেছেন, কারণ আজ পর্যন্ত তিনি সুদূরে পরিহার করে এসেছেন বিবাহ নামক সুপ্রসিদ্ধ উপদ্রবটা। বিয়ের পর রাঙাবউ আসা ব্যাপারটা নিতান্ত মন্দ নয়, তবে ওই পর্যন্ত। তারপর আসতে শুরু করে যখন 'পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা', ব্যাপারটা তখন গুরুতর হয়ে ওঠবার উপক্রম করে। তারপরে সেই সূত্রে আসে যে কতরকম বিপদ, বিভ্রাট ও বিভীষিকা, এখানে তার তালিকা দাখিল করবার দরকার নেই। অতএব আপনারা খালি এইটুকুই জেনে খুশি থাকুন, অবিনাশবাবুর গৃহস্থালিতে তিনি নিজেই হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়।

কিন্তু তাঁর বৈঠকখানায় রোজ যে নিয়মিত আসরটি বসে, তার প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা নেই। এই আসরের মাঝখানটিতে বসতে পারলেই তিনি ছাড়তে পারেন আরামের নিঃশ্বাস। প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রোজই সেখানে চলে তাস-দাবা-পাশা খেলা এবং গোটা দুনিয়াকে নিয়ে উত্তপ্ত বা অল্পতপ্ত বা অতি শান্ত আলোচনা। সন্ধ্যা ও প্রথম রাত্রিটা এইভাবে না কাটালে তাঁর উপরে দয়া করতেন না নিদ্রাদেবী।

অবিনাশবাবুর আর একটি শখ হচ্ছে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা। এ-বিষয় নিয়ে হাতে-নাতে পরীক্ষা করে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। বাংলায় ও বাংলার বাইরেও প্রথম শ্রেণীর প্রেততত্ত্ববিদ বলে অবিনাশবাবুর খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে কারুর কোনও জিজ্ঞাসা থাকলেই জবাব খোঁজবার জন্যে তিনি হতেন অবিনাশবাবুর দ্বারস্থ। এই জিজ্ঞাসুদের জন্যে অবিনাশবাবু প্রতিদিনই অনেকটা সময় ব্যয় করতে বাধ্য হন।

সেদিন সকালবেলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করে অবিনাশবাবু দেখলেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন একটি যুবক। মানুষটির মনের ভিতরে যে বিশেষ এক উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে, মুখ দেখলে সে কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

অবিনাশবাবু নিজের নির্দিষ্ট আসনখানি গ্রহণ করে জিজ্ঞাসু চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যুবক শুধোলে, 'মহাশয়ের নাম কি অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

—'একটি গুরুতর কারণে আমি আপনার কাছে এসেছি।'

—'কারণটি কী?'

—'কারণ বলার আগে এই খবরের কাগজের একটা জায়গা আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি?'

—'অনায়াসেই।'

যুবক একখানি খবরের কাগজ বার করে পাঠ করতে লাগল

'কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘটনা কেবল রহস্যময়ই নহে, উপরন্তু রীতিমতো বিপজ্জনক। এমনকি, সাঙ্ঘাতিক!

'গত একমাসের মধ্যে ওখানে একই কারণে সাতজন লোক মারা পড়িয়াছে। ভারতের প্রধান নগর কলিকাতায় মাত্র সাতজনের মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, প্রতি মিনিটেই সেখানে হয়তো একাধিক ব্যক্তি করিতেছে মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ। তথাপি এই সাতজন লোকের মৃত্যু লইয়া কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে যে অত্যন্ত বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিশেষ কারণের অভাব নাই।

'কারণগুলি এই

'পরে-পরে এই সাতজন লোকেরই মৃত্যু হইয়াছে শয্যায় শায়িত অবস্থায়, নিদ্রার সময়ে।

'প্রত্যেক লোকটিরই স্বাস্থ্য ছিল ভালো এবং কোনও পীড়ায় তাহাদের মৃত্যু ঘটে নাই। যদিও হত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কণ্ঠদেশে পাওয়া গিয়াছে অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন, তবু কোনও হত্যাকারীর কবলে পড়িয়া যে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, এমন সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ, প্রতি ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তিরা ছিল রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে। প্রতি ঘটনাস্থলেই বাহিরের কোনও লোকের প্রবেশ ও প্রস্থানের কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। কোনও মৃত ব্যক্তিরই এমন শত্রু ছিল না, যে তাহাকে হত্যা করিতে পারে। কাহারও ঘর হইতে কোনও মূল্যবান দ্রব্যও অদৃশ্য হয় নাই।

'অথচ প্রত্যেকেই মারা পড়িয়াছে একই অস্বাভাবিক কারণে। ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর কারণ রক্তহীনতা। মৃত ব্যক্তিদের কাহারও রক্তহীনতা ব্যাধি ছিল না, অথচ কোনও মৃত ব্যক্তিরই দেহের মধ্যে পাওয়া যায় নাই একবিন্দু রক্তের অস্তিত্ব। রক্তহীনতা ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটিলেও মানুষের দেহের এমন অবস্থা ঘটে না। দেখিলে মনে হয়, তাহাদের দেহের ভিতর হইতে সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে শোষণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে উপর-উপরি সাত-সাতজন লোকের একই কারণে এমনভাবে মৃত্যু হওয়াতে শহরের উত্তরাঞ্চলে এক ভয়াবহ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

'কাহারও কাহারও ধারণা, এ একরকম নূতন রহস্যময় ব্যাধি, হয়তো অবিলম্বে সাবধান না হইলে এই বিশেষ ব্যাধি মড়কের আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে।

'কেহ-কেহ এই ঘটনাগুলিকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। কিন্তু পুলিশ বিপদে

পড়িয়াছে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই কণ্ঠের উপরকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন লইয়া। মৃত্যুর আগে তাহাদের কাহারও কণ্ঠে যে ও-রকম ক্ষতচিহ্ন ছিল না, তাহারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওই সব ক্ষতচিহ্নের জন্য দায়ী কে? এটুকুও বুঝা গিয়েছে, অত ছোটো ক্ষতের জন্য কোনও মানুষের মৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু ওই লোকগুলির মৃত্যুর সঙ্গে যে ওই-সব ক্ষতের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

'কোনও কোনও লোক আর-এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এইসব মৃত্যুর জন্য দায়ী হইতেছে Vampire Bat বা পিশাচ-বাদুড়। এই জাতীয় বাদুড়দের স্বভাব, নিদ্রিত জীবজন্তুদের রক্ত শোষণ করা।

'তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কেহ-কেহ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পিশাচ-বাদুড়ের স্বদেশ হইতেছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। ও-শ্রেণীর বাদুড় পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। উত্তরে প্রথম দল বলিতেছেন, পিশাচ-বাদুড়রা যে কেবলমাত্র আমেরিকাতেই বাস করে, একথা তাঁহাদেরও কাছে অবিদিত নাই। কিন্তু দৈবগতিকে ওই জাতীয় দু-একটা বাদুড় যে ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে পারে না, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। হয়তো আমেরিকা হইতে আগত কোনও জাহাজের সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতসারেই তাহারা কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছে।

'এ সম্বন্ধে কাহার কথা সত্য ও কাহার কথা মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারই যে অত্যন্ত রহস্যময় ও বিপজ্জনক, সকলকেই সে কথা স্বীকার করিতে হইবে।'

পড়া সাঙ্গ করে যুবকটি বললে, 'এ-সম্বন্ধে আপনার মত কী?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমার কোনও মতামত নেই। আপনি পড়লেন, আমি শুনলুম—এইমাত্র।'

—'লোকগুলি এমনভাবে যে মারা পড়ল, তার কি কোনও বিশেষ কারণ থাকতে পারে না?'

—'কারণ তো অনেকেই দেখিয়েছে, আমি আর নতুন কী কারণ দেখাতে পারি?'

—'আজ্ঞে, আপনি তাই পারেন বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

—'কী রকম? আমি গোয়েন্দাও নই, ডাক্তারও নই; মৃত্যুর বা হত্যার রহস্য নিয়ে কোনওদিনই কারবার করিনি।'

—'কিন্তু আপনি হচ্ছেন বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেততত্ত্ববিদ।'

অবিনাশবাবুর দৃষ্টি সচকিত হয়ে উঠল। চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসে যুবকের মুখের উপরে ভালো করে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার নাম কী?'

—'শ্রীবিনয়ভূষণ ভৌমিক।'

—'কী করেন?'

—'আমাকে আইন-ব্যবসায়ী বলে মনে করতে পারেন।'

—'আমি প্রেততত্ত্ববিদ বলেই কি আপনি আমার কাছে এসেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আপনি কি মনে করেন, খবরের কাগজের ওই রহস্যময় ঘটনাগুলোর সঙ্গে প্রেততত্ত্বের কোনও সম্বন্ধ আছে?'

—'আজ্ঞে, তা না মনে করলে আপনার কাছে আসব কেন?'

—'আপনার এ-রকম সন্দেহের কোনও কারণ বুঝলুম না।'

বিনয় সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'Vampire কাকে বলে?'

—'সার্বিয়ান ভাষার Vampir শব্দ থেকে ইংরেজি এই Vampire কথাটির জন্ম। সার্বিয়ানদের বিশ্বাস, কোনও দানব বা সদ্যোমৃত লোকের প্রেতাত্মা অন্য কোনও মানুষের মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করে জীবন্ত জীবদের রক্ত শোষণ করে বেড়ায়। বাংলায় Vampire কে আমরা পিশাচ বলে ডাকতে পারি।'

—'আচ্ছা অবিনাশবাবু, পৃথিবীতে পিশাচ আছে, এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

—'করি।'

—'আপনি কখনও পিশাচ দেখেছেন?'

—'স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু তার অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ পেয়েছি।'

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কলকাতাতেও এক দুর্দান্ত পিশাচের আবির্ভাব হয়েছে। ওই সাতজন লোকের মৃত্যু তারই কীর্তি।'

অবিনাশবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'কোনওরকম প্রমাণ না পেয়েই আপনি এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন?'

—'না অবিনাশবাবু, তা নয়। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

—'যথা?'

—'ঠিক ওভাবে আমি কোনও প্রমাণ দেখাতে চাই না। আপনার কাছে একটি কাহিনি বলতে চাই, আর সে-কাহিনির নায়ক হচ্ছি আমিই। আপনি কি দয়া করে সে কাহিনিটি শুনবেন?'

বিনয়ের মুখের উপরে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'বেশ, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

তারপর বিনয় একে-একে যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করলে সে সব কথা তার ডায়েরি পাঠ করে আগেই আমরা জানতে পেরেছি।

গম্ভীর মুখে খুব মন দিয়ে অবিনাশবাবু কাহিনির সমস্তটা শ্রবণ করলেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে, যেন নিজের মনে মৃদু স্বরে বললেন, 'এ-রকম আশ্চর্য কাহিনি আর কখনও আমি শুনিনি। বিনয়বাবু, আপনি যা বললেন তা শ্রবণ করে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জাগছে।'

—'কী-কী প্রশ্ন?'

—'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই ভাঙা বাগানবাড়িটা রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ কি এরই মধ্যে কিনে নিয়েছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'রাজা কি বাড়িখানা কেনবার জন্যে নিজেই কলকাতায় এসেছিলেন?'

—'না। তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।'

—'রাজা কলকাতায় এসেছেন বলে আপনারা কি কোনও খবর পেয়েছেন?'

—'না।'

—'ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়িতে এখন কোনও লোক বাস করে কি?'

—'একদিন আমি বাড়িখানা দেখতে গিয়েছিলুম। বাড়ির দরজায় তালাবন্ধ ছিল। কিন্তু বাগানের কোণে যেখানে মালিদের ঘর আছে সেখানে এসে আড্ডা গেড়েছে একদল বেদে জাতের লোক। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম, রাজা এখনও কলকাতায় আসেননি। কিন্তু রাজা না এলেও ওই বেদেগুলো যে রাজারই আশ্রিত লোক, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। রাজার বিশালগড়েও আমি অনেক বেদে দেখেছি।'

—'কলকাতায় এই যে রক্তহীনতার জন্যে সাতজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, আপনি কি সন্দেহ করেন যে এর মধ্যে রাজার কোনও হাত আছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্দেহ করি না বললে সত্য বলা হয় না।'

—'রাজা যদি কলকাতায় না থাকেন, তাহলে ওই মৃত্যুগুলোর জন্যে তিনি দায়ী হবেন কেন?'

—'আমার বিশ্বাস, রাজা কলকাতাতেই আছেন। বেদেরা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে।'

—'আপনার এ-রকম বিশ্বাসের কারণ বুঝলুম না।'

—'একটা কারণের কথা আমি বলতে পারি, কিন্তু বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।'

—'কেন?'

—'কথাটা এতই আজগুবি, শুনলে হয়তো আমাকে আপনি পাগল বলে মনে করবেন।'

অবিনাশবাবু একটুখানি হেসে বললেন, 'আজ যে কাহিনি আমাকে বললেন, তা শুনেও যখন আপনাকে পাগল বলে মনে করিনি, তখন আরও কিছু অদ্ভুত কথা শুনলে আপনার সম্বন্ধে আমার আগেকার ধারণা একটুও বদলাবে না। বিনয়বাবু, আমি প্রেততত্ত্ববিদ। অনেকের মতে প্রেততত্ত্বটাই হচ্ছে একটা আজগুবি ব্যাপার। কিন্তু আমি ভূত যখন মানি, আমার কাছে অলৌকিক বা আজগুবি বলে কোনও কিছু নেই। আপনি যা বলতে চান, অসঙ্কোচে বলুন।'

বিনয় বললে, 'আমার বাড়ির বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা বড়ো কাঁঠাল গাছ আছে। আমার দোতালার শোবার ঘর থেকে কাঁঠাল গাছটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সেই গাছটার একটা ডালে আজকাল মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত বাদুড় এসে বসতে শুরু করেছে।'

—'অদ্ভুত বাদুড়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সাধারণত বাদুড়দের স্বভাব, দুখানা পা দিয়ে গাছের ডাল ধরে নীচের দিকে মাথা করে ঝুলে থাকা। কিন্তু এ-বাদুড়টা ঠিক পাখির মতোই ডালের উপরে বসে থাকে। কাজেই তাকে অদ্ভুত ছাড়া আর কী বলব বলুন?'

—'আজ কদিন থেকে বাদুড়টাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন?'

—'প্রায় মাসখানেক ধরে। কিন্তু সে রোজ আসে না। একমাসের মধ্যে তিনদিন সে দেখা দিয়েছে, আর সেই তিনদিনই ছিল শনিবার। সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, সে দেখা দেয় ঠিক তখনই। আকারেও সে সাধারণ বাদুড়ের চেয়ে অনেক বড়ো—এত বড়ো বাদুড় আমি জীবনে কখনও দেখিনি।'

—'এই বাদুড়ের সঙ্গে রাজার কলকাতায় আগমনের সম্পর্ক কী?'

—'সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু তবু আগে আমার সব কথা শুনুন। কাঁঠাল গাছের ডালে বসে বাদুড়টা এক দৃষ্টিতে কেবল আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। বললে হয়তো আপনি

বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তার চোখদুটোও ঠিক বাদুড়ের মতো নয়। দেখে আমার মনে হয়েছে, যেন ঠিক দুটো মানুষের চোখ উগ্র দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছে। আর সেই চোখদুটোও দেখতে যেন অবিকল রাজার চোখের মতো। রাজার চোখের মতো দেখতে বাদুড়ের চোখ—এ কথাটা হাস্যকর নয়?'

অবিনাশবাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'না বিনয়বাবু, মোটেই হাস্যকর নয়! কী বললেন? মানুষের চোখের মতো দেখতে বাদুড়ের চোখ? আর সেই চোখদুটো কেবল তাকিয়ে থাকে আপনার দিকেই?'

—'হ্যাঁ অবিনাশবাবু। একেবারে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সেই সময় আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, কে যেন আমাকে বাড়ির বাইরে যাবার জন্যে প্রাণপণে আকর্ষণ করছে! কে যে আকর্ষণ করছে তা বুঝতে পারি না, কিন্তু মনের মধ্যে তার আকর্ষণকে রীতিমতো অনুভব করি। তখন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জানলার ধার থেকে সরে যাই। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে, তখনও বাদুড়টা সেখানে থাকে কি না আর বোঝা যায় না।'

অবিনাশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সাবধান বিনয়বাবু! হয়তো আপনাকে কেউ সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে। আপনার পক্ষে রাত্রে একলা রাস্তায় বেরুনো নিরাপদ নয়।'

বিনয় বললে, 'আর একটা আশ্চর্য কথা শুনুন। গেল শনিবারে, রাত যখন তিনটে বেজে গেছে, হঠাৎ কার ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বিছানার উপরে উঠে বসে শুনলুম বাড়ির বাহির থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আশু বলে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, মনে হল তারই কণ্ঠস্বর। কিন্তু অবিনাশবাবু, বিশালগড় থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই রাত্রে যা-কিছু দেখি আর শুনি তাইতেই আমার মন সন্দিহান হয়ে ওঠে। ডাকের কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। গুরুজনরাও ছেলেবেলায় সাবধান করে দিতেন, রাত্রের কারুর ডাকে সাড়া দিতে নেই—অন্তত তিনবার ডাকবার আগে। হঠাৎ সেই কথাটাই আমার মনে হল। আমি সাড়া দিলুম না। কিন্তু কে ডাকছে, তা দেখবার জন্যে টর্চটা হাতে করে জানলার কাছে গেলুম। নীচে টর্চের আলো ফেলে কারুকেই দেখতে পেলুম না। কেবল শুনতে পেলুম, কাঁঠাল গাছের একটা ডাল সশব্দে নড়ে উঠল। তারপরেই দুখানা বড়ো বড়ো পাখনার ঝটপট শব্দ। শূন্যে আলো ফেলে দেখি, মস্তবড়ো একটা বাদুড় উড়তে উড়তে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। পরদিন ভোরবেলাতেই আশুর বাড়িতে ছুটলুম। সেখানে শুনলুম যে কাল রাত্রে আমাকে ডাকতে আসবে কী, জ্বরের আক্রমণে আজ তিন দিন ধরে সে শয্যাগত হয়ে আছে। এ-সব কী ব্যাপার অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশালগড়ে যাবার সময় সরাইখানার সেই বুড়ি আপনাকে যে কবচখানা দিয়েছিলেন, সেখানা এখনও আপনার গলায় ঝোলানো আছে তো?'

—'আজ্ঞে না, কলকাতায় এসে সেখানা গলা থেকে খুলে রেখেছি।'

অবিনাশবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যস্তভাবে বললেন, 'সর্বনাশ, করেছেন কী! জানেন, সেই কবচের গুণেই বিশালগড় থেকে আপনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন? বিশালগড়ের রাজা সত্য-সত্যই যদি পিশাচ হয় তাহলে তার ভৌতিক দৃষ্টি এখনও আপনার উপরে নিবদ্ধ আছে। সে যখন স্বহস্তে আপনাকে স্পর্শ করেছে, তখন কলকাতায় এলেও আপনি খুব সহজেই আবার তার

প্রভাবে গিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু ওই রক্ষাকবচখানি আপনার গলায় থাকলে সে আর কিছুতেই আপনাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। এখন আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার সেই কবচ ধারণ করা। তারপর আর এক কথা। আজও তো শনিবার। আপনার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে সেই কাঁঠাল গাছে আজও আবার বাদুড়ের আবির্ভাবের সম্ভাবনা। আমি আজ সন্ধ্যার আগে আপনার বাড়িতে যেতে চাই! আপনার আপত্তি নেই তো?'

বিনয় খুশি হয়ে বললে, 'বিলক্ষণ! আপত্তি কী মশাই, এটা তো আমার পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয়!'

দুই

বাগানবাড়ির ঝোপ

সেইদিন সন্ধ্যার আগে।

বিনয়ের শয়নগৃহ। অবিনাশবাবু ও বিনয়।

সূর্য অস্তগত। ধীরে ধীরে ময়লা হয়ে আসছে দিনের আলো। আর মিনিট-কয়েক পরেই চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে। এখনই দৃষ্টির সামনে ভাসছে কেমন একটা ছায়া-ছায়া ভাব।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিনয় একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ওই দেখুন অবিনাশবাবু, ওই দেখুন!'

সাগ্রহে দৃষ্টিচালনা করে অবিনাশবাবু দেখলেন, খানিক দূর থেকে উড়ে আসছে মস্ত বড়ো একটা কালো বাদুড়।

বাদুড়টা সোজা এসে কাঁঠাল গাছের একটা বড়ো ডালের উপরে চুপ করে বসে পড়ল।

বিনয় বললে, 'দেখুন আমার কথা সত্য কি না। আর এও দেখছেন তো, বাদুড়টা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার ঘরের দিকেই? ওর চোখদুটোও লক্ষ করুন!'

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'সবই দেখছি, সবই লক্ষ করছি। আপনি ঠিকই বলেছেন, ওর চোখদুটো মোটেই বাদুড়ের মতো নয়। বাদুড়ের চক্ষু-কোটরের ভিতর দিয়ে মানুষেরও দৃষ্টি ফুটে ওঠেনি—এ হচ্ছে কোনও অভিশপ্ত অমানুষের দৃষ্টি! ও-দৃষ্টি যার উপরে পড়বে তার সর্বনাশ না হয়ে যায় না!'

বিনয় কাতর কণ্ঠে বললে, 'তাহলে এখন আমি কী করব?'

—'আজকেও কি কোনও আকর্ষণ আপনাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে?'

—'না অবিনাশবাবু। আজ আমি সে-সব কিছুই অনুভব করছি না।'

—'সেই কবচখানা ধারণ করেছেন তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'জানবেন, ওই কবচ আপনার গলায় থাকলে কোনও দুষ্ট আত্মাই আর আপনাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। আর একটা বিষয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

—'কী বিষয়ে?'

—'আমি দেখতে চাই, ওই বাদুড়টার ভিতরে সত্য-সত্যই কোনও অপার্থিবতা আছে কি না।'

—'কেমন করে দেখবেন?'

—'আপনার ওই কবচখানা বাহিরে বার করুন। তারপর ও-খানা হাতে করে তুলে ধরে একেবারে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ান। সত্যই যদি ওই কবচের কোনও গুণ থাকে, তাহলে এখনই তার স্পষ্ট প্রমাণ আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

অবিনাশবাবুর কথামতো বিনয় কবচখানা বার করে জানলার ধারে গিয়ে সামনের দিকে তুলে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যেন কোনও অদৃশ্য হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে বাদুড়টা কাঁঠাল গাছের ডালের উপর থেকে নীচের দিকে ঠিকরে পড়ল। কিন্তু মাটিতে গিয়ে পড়বার আগেই সে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে তিরবেগে আকাশের দিকে উঠে চলে গেল একেবারে চোখের আড়ালে।

অবিনাশবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আর আমার কোনওই সন্দেহ নেই। ওটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সাধারণ বাদুড় নয়। আপনার কবচের শক্তি দেখলেন তো?'

বিনয় অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, 'আপনার কথাই সত্য অবিনাশবাবু, কবচ খুলে ফেলে বিপদকে আমি যেচেই ডেকে আনতে চেয়েছিলুম। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন কাজ করব না!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভবিষ্যতের কথা এখন থাক, আপাতত আমরা কী করব, তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক। আপনার ধারণা, পিশাচ রাজা আবার কলকাতায় এসেছে?'

—'আমার তো তাই ধারণা। ওই বাদুড়টা দেখে আপনারও মনে কি ওই-রকম সন্দেহ জাগছে না?'

—'খালি সন্দেহ নিয়ে কোনও কাজই হবে না, আমি চাই স্পষ্ট প্রমাণ।'

—'কী রকম প্রমাণ?'

—'শুনুন। পিশাচ বা ভ্যাম্পায়ারের একটা বিশেষ স্বভাব আছে। দিনে তারা কোনও গোরস্থানের কবরে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ঠিক মৃতদেহের মতোই পড়ে থাকে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার হয় তাদের জাগরণ। তখন তারা জ্যান্ত মানুষের মতন লোকালয়ে গিয়ে শিকার খুঁজে বেড়ায়। সারা রাতটাই তাদের কেটে যায় এইভাবে। তারপর পূর্ব-আকাশে দিনের আলো ফোটবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই তারা আবার স্বস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজা কলকাতায় এসেছে কি না, আর সে সত্য-সত্যই পিশাচ কি না, এটা আমরা অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পারি।'

—'কেমন করে?'

—'আপনি তো ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়িটা চেনেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আজ রাত্রে আমার সঙ্গে আপনি সেখানে যেতে পারবেন?'

বিনয় শিউরে উঠে বললে, 'রাত্রে! সেই পোড়ো বাড়িতে!'

—'ভয় পাবেন না বিনয়বাবু, ভয় পাবার কিছুই নেই। স্মরণ রাখবেন, আপনার সঙ্গে আছে অব্যর্থ রক্ষাকবচ। ওই পোড়ো বাড়িটা হানাবাড়ি হলেও কবচের গুণে আপনার কোনও ভয় নেই। আর আমারও কোনও ভয় নেই,—কারণ, আমার সহায় মন্ত্রশক্তি। আমাদের মতন যারা প্রেততত্ত্ব

নিয়ে কারবার করে, দুষ্ট আত্মাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সর্বদাই তাদের মন্ত্রশক্তির সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়। তাহলে কী বলেন, আজ এই বাগানবাড়িতে গিয়ে রাত জাগতে রাজি আছেন?'

বিনয়ের মুখ দেখে মনে হল না যে সে বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছে। নাচারের মতন বললে, 'আপনি যখন বলছেন, তখন আমাকে যেতেই হবে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনার কোনও ভাবনা নেই। আমরা সেই বাগানবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করব। আপনার মুখে শুনেছি, বাড়ির চারিদিকেই অনেকখানি জমি আছে। সুতরাং এটুকু অনুমান করতে পারি যে, সেই পোড়ো বাগানে ফুল আর ফলগাছ না থাক, ঝোপ-ঝাপ আগাছা আছে যথেষ্টই। তাই নয় কি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই জমির উপরে আছে দস্তুরমতো একটি জঙ্গল। ঝোপঝাপ খুঁজে নিতে একটুও দেরি লাগবে না।'

—'ব্যস্, তাহলেই চলবে। পোড়ো জঙ্গলেই আজ আমরা রাত্রিবাস করব। মন্দ কী? এও একটা নূতনত্ব!'

রাত্রি এখন যাত্রী হয়েছে প্রভাত-তীর্থে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে। কিন্তু প্রভাত আসন্ন হলেও এখনও ভোরের পাখিদের ঘুম ভাঙেনি এবং ঊষার শুভ্র ছোঁয়ায় এখনও হয়নি বিষণ্ণ অন্ধকারের মৃত্যু।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ভাঙা বাড়ির পোড়ো বাগানের যেখানে আগে ছিল মস্তবড়ো ফটকটা, এখন তার কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নেই। কিন্তু সেখান দিয়ে একটা পথ ভিতর দিকে অগ্রসর হয়ে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

সেই পথের ধারেই ছিল এমন একটা প্রকাণ্ড ঝোপ যে, তার ভিতরে একটা হস্তীরও স্থানসঙ্কুলান হতে পারে। অবিনাশবাবুর সঙ্গে বিনয় আশ্রয় নিয়েছে সেই ঝোপটার মধ্যেই। বাহির থেকে কোনও দৃষ্টিই তাদের আবিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু ভিতর থেকে ঝোপের ফাঁক দিয়ে পথের উপরটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে তারা।

সারারাত শুকনো পাতা নড়লেই সাপের ভয়ে চমকে চমকে উঠে, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে হৃষ্টপুষ্ট মশকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিনয়ের দেহ মন কাবু হয়ে পড়েছে একেবারে। অবিনাশবাবু কিন্তু এমন স্থিরভাবে বসে আছেন যে দেখলে মনে হয় না তিনি একটামাত্র মশারও কামড় খেয়েছেন।

খুব দূরে কোথা থেকে একটা বড়ো ঘড়ি ঢং-ঢং করে পাঁচ বার বেজে উঠল।

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে বিনয়ের গায়ে ঠেলা মেরে বললেন, 'হুঁশিয়ার!'

বিনয় আঁতকে উঠে বললে, 'কী হয়েছে অবিনাশবাবু?'

—'হবে আর কী? এখানে সত্যিই যদি কোনও পিশাচ থাকে, তাহলে তার আসবার সময় হয়েছে। ওই দেখুন, রাত্রির অন্ধকার ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে, পূর্ব দিকের আকাশও এখন অনেকটা ফরসা। পিশাচের চোখ কোনওদিন ঊষার আলো পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।'

—'আমাকে এখন কী করতে হবে?'

—'কিছু করতে হবে না, চোখ দুটোকে সজাগ রেখে খালি চুপ করে বসে থাকতে হবে।'

ভোরের বাতাসের প্রথম ঝাপটা তাদের কপালের উপর বুলিয়ে দিয়ে গেল ভারী মিষ্টি একটি ঠান্ডা ছোঁয়া। কোনও গাছ থেকে ডেকে উঠল দুটো-একটা কাক।

—'অবিনাশবাবু!'

—'চুপ, ওইদিকে দেখুন!'

হালকা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা সুদীর্ঘ মূর্তি বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে। মূর্তির দেহের কালো পোশাকটা অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখের শুভ্রতা। মস্ত একজোড়া পাকা গোঁফের দুই প্রান্ত হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে, বিনয় তাও দেখতে পেলে। মুখখানাকে ভালো করে চিনতে পারলে না বটে, কিন্তু জাঁদরেলি গোঁফজোড়া চিনে ফেলতে তার একটুও কষ্ট হল না। এই গোঁফের একমাত্র মালিক রাজা রুদ্রপ্রতাপ।

বাগানের ভিতরে ঢুকে মূর্তিটা ঝোপের ঠিক পাশের পথে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কী সন্দেহ হল জানি না, কিন্তু সে যখন ফিরে ফিরে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিচালনা করছিল, তখন তার দুই চক্ষে জ্বলে জ্বলে উঠছিল যেন তীব্র বিদ্যুতের শিখা।

আচম্বিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে অমানুষিক কণ্ঠে মূর্তিটা করে উঠল ভয়াবহ অট্টহাস্য। বিনয় সভয়ে অবিনাশবাবুর একখানা হাত দুই হাতে চেপে ধরলে এবং অবিনাশবাবুও খানিকটা স্তম্ভিতের মতন হয়ে গেলেন। এমন অট্টহাসি মানুষের কর্ণ বোধহয় কোনওদিনই শ্রবণ করেনি।

তেমনি হা হা হা হা হা হা হাসতে হাসতে মূর্তিটা দ্রুতপদে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল। তারপর শোনা গেল দরজা খোলার ও দুম করে বন্ধ হবার শব্দ।

বিনয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'অবিনাশবাবু! ও অমন করে হাসলে কেন?'

—'হয়তো আমাদের অস্তিত্ব জানতে পেরেছে।'

—'কিন্তু তবু ও তো আমাদের আক্রমণ করলে না?'

—'ভোরের পাখি ডেকে উঠেছে। ওর আর কোনও শক্তিই নেই।'

তিন

আবার নতুন খবর

পরদিনের বেলা সাড়ে দশটা।

বিনয় হন্তদন্তের মতো অবিনাশবাবুর বৈঠকখানায় এসে হাজির, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

গতকল্যকার নিশা-জাগরণের পর আজ অবিনাশবাবুর ঘুম ভেঙেছিল বেশ একটু বেলায়। প্রথম চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় বিনয়কে দেখে বিস্মিত স্বরে তিনি বললেন, 'ব্যাপার কী! আপনার মুখের ভাব তো সন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে না?'

বিনয় একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'আপনার কথার উত্তর না দিয়ে আমি এই খবরের কাগজখানা পাঠ করতে চাই।'

—'আবার খবরের কাগজ! কাল কি আবার নতুন কোনও মানুষ রক্তশূন্যতা রোগে মারা পড়েছে?'

—'শুনুন।' এই বলে বিনয় খবরের কাগজখানা পাঠ করতে লাগল

'কলিকাতায় ভ্যাম্পায়ার বাদুড়!

অনেকেই এতদিন যে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন, কাল রাত্রে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। ইয়াঙ্কি মুল্লুকের ভ্যাম্পায়ার বাদুড় দেখা দিয়াছে ভারতের প্রধান নগর কলিকাতায়।

পুলিনবিহারী বসু শ্যামবাজার অঞ্চলে বাস করেন। তিনি একজন কারবারি লোক। গতকল্য সন্ধ্যার পর আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি নিজের শয়নগৃহে গমন করেন। তাহার পর যথাসময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। তাঁহার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না, নিজের কোনও আত্মীয়ের বাড়ি বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি আবার বাড়িতে ফিরিয়া আসেন। পুলিনবাবু সেদিন শয়নগৃহের দরজা কেবল ভেজাইয়া রাখিয়াছিলেন, স্ত্রী আসিলে দরজার অর্গল খুলিবার জন্য পাছে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, সেই ভয়েই ভিতর হইতে তিনি দরজা বন্ধ করেন নাই।

তাঁহার স্ত্রী দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের আলো জ্বালাই ছিল, এবং সেই আলোতে তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন ভয়াল এক দৃশ্য।

প্রকাণ্ড একটা কৃষ্ণবর্ণের কী জীব তাঁহার নিদ্রিত স্বামীর দেহের উপরার্ধ প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া শয্যার উপরে স্থির হইয়া আছে। সেই দৃশ্য দেখিয়াই তিনি প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবটা তাঁহার স্বামীর দেহের উপর হইতে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ডানার ঝটপট শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে জীবটা বাদুড় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুলিনবাবুর স্ত্রী বিছানার পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন, তখনও তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই এবং তাঁহার কণ্ঠদেশের উপর হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে রক্তের ধারা। তাহার পর অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বামীর নিদ্রা ভাঙিতে না পারিয়া পুলিনবাবুর স্ত্রী ডাক্তারের বাড়িতে খবর পাঠান।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষার পরে বলেন, পুলিনবাবু জীবিত আছেন বটে এবং তাঁহার প্রাণেরও কোনও আশঙ্কা নাই, তবে রক্তশূন্যতার জন্য অত্যন্ত নির্জীব হইয়া পড়িয়াছেন।

যদিও এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এখনও আমরা পাই নাই, তবু যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি, ইহার আগে কলিকাতায় গত এক মাসের মধ্যে উপর-উপরি সাত-সাতজন লোকের যে রহস্যময় মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সহিত এই ঘটনার নিশ্চয়ই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ওই সাতজন লোকও মারা পড়িয়াছে রক্তশূন্যতার জন্য। পুলিনবাবুও যে ঠিক এই কারণেই মৃত্যুমুখে পড়িতেন সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই। তাঁহার স্ত্রীর আকস্মিক আগমনের জন্যেই এ-যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছেন।

পূর্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি, রক্তশূন্যতার জন্য এতগুলি লোকের মৃত্যু দেখিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইসকল দুর্ঘটনার জন্য দায়ী আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। যে-কোনও উপায়েই হউক, এক বা একাধিক ওই জাতীয় জীব কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদেরই মত সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। কারণ, পুলিনবাবুর স্ত্রী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে তাঁহার স্বামীর দেহের উপরে একটা প্রকাণ্ড কালো বাদুড় স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। এবং এই বাদুড়টাই যে পুলিনবাবুর রক্ত শোষণ করিতেছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এতদিন পরে উত্তর-কলিকাতার এই বিচিত্র রহস্যের একটা সমাধান হইল। কিন্তু এখন একটা বড়ো প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কোন উপায়ে ওই ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কবল হইতে শহরবাসীরা উদ্ধার লাভ করিবে? কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করিতেছি।'

সমস্ত শুনে অবিনাশবাবু আগে নীরবে খালি করলেন চায়ের পেয়ালাটা। তারপরে বললেন, 'কাগজওয়ালাদের বিশ্বাস, এতদিন পরে সব রহস্যের সমাধান হয়েছে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ও দেখা গিয়েছে, আর সাতজন লোকের মৃত্যুর কারণও জানতে নাকি কারুর বাকি নেই। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আমরা মানুষ, আসল রহস্যের কতটুকু খবরই বা আমরা রাখতে পারি? ভ্যাম্পায়ার বাদুড়! রাবিশ! আসল কথা জানতে পারলে শহরবাসীদের নাড়ি একেবারে ছেড়ে যাবে!'

বিনয় কাতর মুখে বললে, 'অবিনাশবাবু, কলকাতাবাসীদের মাথার উপরে কী ভীষণ বিপদের খাঁড়া ঝুলছে, এটা তো এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন? আপনি কি চেষ্টা করলে এই বিপদ দূর করতে পারেন না?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'পারি বিনয়বাবু, পারি। চেষ্টা করলে হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরেই আমি ওই পিশাচ রাজার সব লীলাখেলা সাঙ্গ করে দিতে পারি।'

—'তবে সেই চেষ্টাই করুন অবিনাশবাবু, সেই চেষ্টাই করুন!'

অবিনাশবাবু ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললেন, 'ব্যাপারটা একটু ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করুন। পুলিশের কাছ থেকে আমরা কোনওই সাহায্য পাব না, কারণ পুলিশ কোনওদিনই ভূত-প্রেত, পিশাচ, দৈত্য বা দানব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হবে না। আমাদের মুখে সব কথা শুনলে তারা আমাদের তাড়াতাড়ি পাঠাতে চাইবে পাগলা গারদে। সুতরাং পুলিশের কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে আমাদের দুজনকে কাজ করতে হবে খুব গোপনে আর স্বাধীনভাবে।'

—'হ্যাঁ অবিনাশবাবু, আপনার এ অনুমান মিথ্যা নয়।'

—'বিনয়বাবু, কাল রাতে আপনি ছিলেন বিনিদ্র। আজকেও কি সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে পারবেন?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সূর্যোদয়ের পরেই পিশাচ রাজা ওই বাড়ির ভিতরে কোনও এক জায়গায় নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে, সন্ধ্যার আগে তার দেহে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দিনের বেলায় তার অবস্থা হয় একান্ত অসহায়ের মতন; আক্রান্ত হলেও সে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারে না। পিশাচকে বধ করবার উপায় আমার অজানা নেই। দিনের বেলায় একবার তাকে হাতে পেলেই তার কবল থেকে তখনই পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারি।'

—'এ জন্যে রাত জাগবার দরকার কী, অবিনাশবাবু? কাল সকালেই তো সূর্যোদয়ের পরে আমরা ওই বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারি?'

—'বিনয়বাবু, আপনি ছেলেমানুষের মতন কথা বলছেন। বাগানবাড়ির মালিদের ঘরে একদল বেদেকে কি আপনি স্বচক্ষে দেখেননি? ওরা কেন যে ওখানে আছে, তাও কি বুঝতে পারছেন না? ওরা হচ্ছে রাজার মাহিনা-করা অনুচর; বাড়ির উপরে পাহারা দেবার জন্যেই রাজা ওদের নিযুক্ত করেছে। রাজা নিজেও জানে, দিনের বেলায় সে হয় অত্যন্ত অসহায়। তাই সেই সময় বাড়ির চারিদিকেই থাকে বেদেদের কড়া পাহারা। আমরা কেমন করে তাদের চোখে ধুলো দেব? অতএব

দিনের কথা ভুলে গিয়ে ওই বাগানবাড়িতে যেতে হবে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে। বাড়িখানা আমিও দেখেছি। প্রকাণ্ড বাড়ি। চোরের মতন বাড়ির ভিতর ঢুকে, আনাচে-কানাচে বা কোনও একখানা ঘরের ভিতরে লুকিয়ে বসে আমরা দুজনে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করব। তারপর পিশাচ যখন হবে জড় পদার্থের মতো, তখন আমরা তার দেহটিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করব।'

—'কিন্তু যে সময় আমরা ওই বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকব, রাজা যদি তখন সেইখানে উপস্থিত থাকে?'

—'রাত্রে সেখানে রাজার উপস্থিতির সম্ভাবনা খুবই অল্প। সাধারণত পিশাচরা সূর্যাস্ত হলেই শিকারের সন্ধানে যাত্রা করে। আমাদের বিশ্বাস, অলৌকিক শক্তির গুণে রাজা বাদুড়ের আকার ধারণ করতে পারে। যে কালো বাদুড়টা আপনাকে জ্বালাতন করতে যেত, সেটা যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই সেই কাঁঠাল ডালে গিয়ে বসত, এরই মধ্যে এ কথা কি আপনি ভুলে গিয়েছেন?'

বিনয় একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'না, ভুলিনি অবিনাশবাবু। আপনার মতোই অভ্রান্ত বলে বোধ হচ্ছে। যদিও সেই প্রেতপুরীর মধ্যে রাত্রি যাপন করবার কথা মনে করেই আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছে, তবুও মানুষের এই মহাশত্রুকে বধ করবার জন্যে সমস্ত বিপদকেই আমি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারি।—তাহলে এই কথাই রইল অবিনাশবাবু। কখন আমরা ওই বাগানবাড়ির দিকে যাত্রা করব?'

—'রাত বারোটার পর।'

চার

যম থাকে যমালয়ে

রাত যখন একটা, প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তারা উপস্থিত হল সেই বাগানবাড়িখানার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে দীপ্ত জোনাকিদের দেখাচ্ছে অশরীরীদের ভুতুড়ে আলোফুলের মালার মতো। ঝিল্লিদের ঝঙ্কারও শোনাচ্ছে কেমন যেন অস্বাভাবিক, ইহলোকের কানে কানে যেন শোনাতে চায় পরলোকের কর্কশ সঙ্গীত। বাতাসে বাতাসে গাছে গাছে জাগছে যে পত্রমর্মর, তাও যেন অভিশপ্ত আত্মাদের করুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। রাত্রে পৃথিবীর উপর অন্ধকারের যবনিকা নেমে এলে সৃষ্টির প্রভাত থেকে মানুষের মনের ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে আসছে এক অবর্ণনীয় অপার্থিব ভাব। তখন সহজ বস্তুকেও আর সহজ বলে মনে হয় না, অন্ধদৃষ্টি আর কিছুই দেখতে না পেলেও কল্পনায় চারিদিকেই দেখে বা দেখছে বলে সন্দেহ করে রহস্যময় আতঙ্ক আর আতঙ্ক।

অবিনাশবাবু বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনি এমন বোবার মতন চুপ করে আছেন কেন? আপনার ভয় হচ্ছে নাকি?'

বিনয় বললে, 'ভয় যে হচ্ছে না, কেমন করে বলি? এখন আমি চারিদিকেই দেখছি সেই ভয়ানক রাজার মূর্তি! প্রত্যেক ঝোপঝাপ নড়ে নড়ে উঠছে আর আমার মনে হচ্ছে, রাজা বুঝি টের পেয়েছে

আমাদের অস্তিত্ব। আমরা হচ্ছি আলোর ভক্ত, আর রাজা হচ্ছে অন্ধকারের জীব। এই নিশাচর যে আমাদের অনুসরণ করছে না, কিছুতেই আমি মনে করতে পারছি না এই কথাটা।'

—'কিন্তু আপনাকে তো আমি বারবার বলছি যে ওই কবচ সঙ্গে থাকতে আপনার কোনওই আশঙ্কা নেই?'

—'জানি অবিনাশবাবু, জানি। দুর্বল মন তবু সহজে প্রবোধ মানতে চায় না।'

বিনয়কে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার হাত ধরে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আগেও তো আপনি এই বাড়িখানা দেখেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ বাড়ির ভিতর-বাহির, সবই আমার দেখা।'

—'খুব সম্ভব বাড়ির সদর দরজাটা বাহির থেকে তালাবন্ধ করে রেখেছে। এই বাড়িতে ঢোকবার আর কোনও উপায় আপনি জানেন?'

—'বাড়ির পিছনে দেখেছিলুম পাল্লাহীন একটা খিড়কির দরজা। সেখান দিয়ে অনায়াসেই ভিতরে প্রবেশ করা যায়।'

—'বেশ, তাহলে ওই পথই আমরা অবলম্বন করব। বেদেদের কোনওই সাড়া নেই। আর এত রাত্রে তাদের সাড়া থাকবার কথাও নয়। তারা জানে, তাদের রাজা বেরিয়েছে এখন নৈশ বিহারে, অতএব বাড়ির উপরে আর পাহারা দেবার দরকার নেই। নিশ্চয়ই তারা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে। আসুন বিনয়বাবু।'

অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বার-কয়েক হোঁচট খেয়ে তারা উপস্থিত হল বাড়িখানার পিছন দিকে।

অন্ধকার যেখানে ঘন নয় এমন একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, 'ওইখানে আছে একটা পানায় সবুজ মস্ত বড়ো পুরোনো পুকুর। আর এইদিকে আছে খিড়কির সেই ভাঙা দরজাটা।'

দ্বারপথ আবিষ্কার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ভিতরে ঢুকে অবিনাশবাবু বললেন, 'আর কোনও অযাচিত লোককে ভয় করবার কারণ নেই। এইবারে আমরা টর্চ জ্বেলে একটা গা-ঢাকা দেবার মতো জায়গা খুঁজে বার করতে পারি।'

টর্চের চাবি টিপে আলো জ্বেলে দুজনে অগ্রসর হতে লাগল। তাদের চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে প্রায় ধ্বংসস্তূপের মতো জীর্ণ বাড়ির আগাছাভরা উঠোন, দালানের ভেঙে-পড়া খিলানের পর খিলান, ধসে-পড়া সোপান ও হেলে-পড়া দেওয়ালের উপর ঝুলে-পড়া কড়ি ও বরগা। এক জায়গা থেকে তাদের পদশব্দ শুনে দুটো শেয়াল বেগে ছুটে পালিয়ে গেল। একাধিক সর্পেরও সন্ধান পাওয়া গেল। একটি ঘরের ভিতর কী রকম ঝটপট ঝটপট শব্দ। উপর দিকে আলো ফেলে শুকনো গলায় বিনয় বলে উঠল, 'বাদুড়!'

সে ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে আসছিল, কিন্তু অবিনাশবাবু তার কাঁধের উপর হাত দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'ও-রকম ছোটো বাদুড় দেখে আপনি আঁতকে উঠলেন কেন? ওটা তো সাধারণ বাদুড় ছাড়া আর কিছুই নয়।'

আর একটা ঘরে ঢুকেই তারা শুনতে পেলে বিকট কণ্ঠের কয়েকটা অদ্ভুত চিৎকার। বিনয়ের সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল এবং যেন খাড়া হয়ে উঠল তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত।

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, 'ও তক্ষক, কোনও ভয় নেই।'

তারপর তারা প্রবেশ করলে খুব বড়ো একটা ঘরের ভিতরে। সে ঘরখানার অবস্থা অন্যান্য ঘরের মতন শোচনীয় ছিল না, যদিও তার মেঝের উপরে জমে আছে বহুকালের সঞ্চিত ধুলো এবং তার দেওয়ালের গা থেকেও খসে পড়েছে চুন-বালির প্রলেপ, তবু চেষ্টা করলে সে ঘরখানাকে এখনও মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া যায়।

সেই ঘরেরই এক কোণে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা সিন্দুক।

সেটা দেখেই চমকিত চক্ষে বিনয় বলে উঠল, 'ওই সিন্দুকটাকেই আমি দেখেছি বিশালগড়ে! দিনের বেলায় রাজা মড়ার মতন শুয়ে থাকে ওরই ভিতরে!'

অবিনাশবাবু এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ভারী ডালাটা খুলে ফেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সিন্দুকের ভিতরে দেখছি বিছানার বদলে রয়েছে রাশীকৃত স্যাঁতসেঁতে মাটি। হ্যাঁ, পিশাচেরই উপযুক্ত শয্যা বটে! দিনের বেলায় পিশাচ শুয়ে থাকতে চায় কবরের ভিজে মাটির বিছানায়। এখানে পিশাচ কবরের বদলে ব্যবহার করেছে একটা সিন্দুককেই, কিন্তু নিজের স্বভাব ভুলতে না পেরে নগ্ন মাটির উপরেই শয্যা রচনা না করে পারেনি।'

বিনয় নিজের হাতের ঘড়ি দেখে বললে, 'রাত তিনটে বেজেছে। রাজার আসতে এখনও অনেক দেরি।'

কিন্তু তার কথা ফুরোতে না ফুরোতেই সেই প্রকাণ্ড ঘরটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল পৈশাচিক অট্টহাসির তরঙ্গে।

দুজনেই বিদ্যুতের মতো ফিরে দেখে, কখন নিঃশব্দপদে রাজা এসে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেই ঘরের মাঝখানে।

রাজা হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলে বজ্রের মতন কঠিন স্বরে চিৎকার করে বললে, 'ক্ষুদ্র মানুষ! তোরা যে আজ এইখানে আসবি, কালকেই আমি তা অনুমান করেছিলুম। তোরা হচ্ছিস নশ্বর, দুনিয়ায় এসেছিস দুদিনের পরমায়ু নিয়ে! কতটুকু তোদের বুদ্ধি? আমি হচ্ছি অমর, আজ তিন শতাব্দী ধরে এই পৃথিবীর বুক মাড়িয়ে আমি বিচরণ করছি দিগ্বিদিকে—আমার মনের মধ্যে আছে তিন শতাব্দীকালের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা! এত বড়ো দুঃসাহস তোদের, আমার সঙ্গে করতে চাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা? তোদের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ লুপ্ত করে দেব আমি এই মুহূর্তেই!' দুই ক্রুদ্ধ চক্ষে দুটো দপদপে শিখা জ্বালিয়ে রাজা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে—সামনে সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে।

ভয়ে, দুশ্চিন্তায় বিনয়ের মুখ হয়ে গেল মড়ার মতো পাণ্ডুর। পায়ে পায়ে সে-ও পিছোতে লাগল, চমকে উঠতে উঠতে।

অবিনাশবাবু কিন্তু নিশ্চল। তাঁর নেই এতটুকু ভয়ের লক্ষণ। স্থির গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'নির্ভয় হোন বিনয়বাবু! আপনার অস্ত্রের কথা আবার ভুলে গেলেন? শিগগির বার করুন সেটা!'

বিনয় কাঁপতে কাঁপতে নিজের জামার তলা থেকে টেনে বার করে ফেললে গলায় ঝোলানো সেই কবচখানা।

বিকট আর্তনাদ করে রাজা তখনই ঘুরে মাটির উপরে পড়ে গেল বিদ্যুতাহতের মতো। তারপর চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই আবার উঠে ঝড়ের মতো বেগে ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয়ের হাত ধরে টানতে টানতে অবিনাশবাবুও ছুটলেন ঘরের বাইরে।

উঠোনের উপর আবার দেখা গেল পলাতক রাজার ছুটন্ত মূর্তি।

অবিনাশবাবু দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না বিনয়বাবু, ছুটে চলুন আমার সঙ্গে! পিশাচ এখন শক্তিহীন। আমাদেরই ভয়ে সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়। ওই কবচ একবার যদি ওর গায়ে স্পর্শ করাতে পারি, তাহলে এখনই ও মূর্ছিত হয়ে আমাদের হস্তগত হবে। তারপর? তারপর যা করবার, আমিই করব।'

রাজার মূর্তি বৃদ্ধের মতো বটে, কিন্তু তার দেহে আছে যেন একাধিক যুবকের প্রবল শক্তি। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে কখনও রাশীকৃত ইষ্টকস্তূপের উপর লাফ মেরে এবং কখনও বা মাটির উপর দিয়ে দ্রুতগামী হরিণের মতো ছুটতে ছুটতে ক্রমেই সে দূরে চলে যেতে লাগল। খিড়কির ভাঙা দরজা দিয়ে অবিনাশবাবুর সঙ্গে বিনয়ও বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলে, সেই পানায়-ভরা পুকুরের জলের ভিতরে কে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপর শোনা গেল সাঁতার কাটতে কাটতে জলে ছুপ্‌ছুপ শব্দ তুলে কে ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে।

অবিনাশবাবুও পুকুরের ডান পাড়ের উপর দিয়ে দৌড়ে ওদিকে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ পায়ে গাছের শুকনো শিকড়ের মতো কী-একটা জিনিসের বাধা পেয়ে মাটির উপরে সটান পড়ে গেলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে আবার বসিয়ে দিলে। তখন জলের উপরে সাঁতারের শব্দ থেমে গিয়েছে, এবং পরমুহূর্তেই জেগে উঠল আর একটা নূতন শব্দ।

শূন্যে বাদুড়ের ডানার ঝটপটানির শব্দ।

ক্রুদ্ধ মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'রাজা আবার আমাদের নাগালের বাইরে। ওই দেখুন।'

একটা অসম্ভব প্রকাণ্ড কালো বাদুড় দুইদিকে দুখানা ডানা বিস্তৃত করে আকাশের গায়ে উড়ে যাচ্ছে উপরে—আরও উপরে।

পরদিনের গভীর রাত্রি।

অবিনাশবাবু ও বিনয় আবার সেই বাগানবাড়িতে।

কিন্তু সেই বড়ো ঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল, মস্ত সিন্দুকটা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

বিনয় মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'অবিনাশবাবু, পাখি কি উড়েছে?'

—'পাখি যে উড়েছে, সেটা তো কাল স্বচক্ষেই আমরা দেখেছি। আপনার কবচ তার সহ্য হবে না।'

—'বেদেরা?'

—'পাখির বাসা আছে সেই সিন্দুকে। বেদেরা নিশ্চয়ই বাসা নিয়ে ফিরে গেছে বিশালগড়েই।'

—'এখন উপায়?'

—'আমাদেরও যেতে হবে বিশালগড়ে!'

—'বলেন কী, আবার সেই মারাত্মক জায়গায়?'

—'যমকে খুঁজতে গেলে যমালয়েই যেতে হয়।'

পাঁচ

আবার বিনয়ের ডায়েরি

বিশালগড়ের বিপুল অরণ্যের প্রান্তে আবার সেই সরাইখানায়। এবং আমাকে দেখে সচকিত বিস্ময়ে সর্বপ্রথমে অভ্যর্থনা করতে এলেন আবার সেই প্রাচীনা নারী।

বললেন, 'বাছা, সেবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েও আবার আপনি এখানে এসেছেন?'

আমি সহাস্যে বললুম, 'মায়ীজি, আপনার দেওয়া রক্ষাকবচ যখন আমার গলায় ঝুলছে, তখন যমকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু এবারে আমি একলা আসিনি, আমার সঙ্গে এসেছেন বন্ধুটিও।'

প্রাচীনা অবিনাশবাবুর মুখের দিকে এবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'এঁরও গলায় কোনও রক্ষাকবচ আছে কি?'

—'না মা, এঁর কোনও কবচের দরকার নেই। এঁর কারবারই হচ্ছে ভূত-প্রেত নিয়ে খেলা করা।'

—'ও, উনি বুঝি রোজা?'

অবিনাশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার কথাই সত্য। এক হিসাবে আমি রোজাই বটে, তবে, আমি হচ্ছি অতি-আধুনিক রোজা।'

প্রাচীনা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে বাবুজি, আপনাদের জন্যে আমার আর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু আপনাদের আবার এখানে আসবার কারণ কী?'

আমি বললুম, 'আমরা এসেছি রাজা রুদ্রপ্রতাপের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে।'

প্রাচীনা বিস্মিত মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'কিন্তু বাবুজি, রাজা তো বিশালগড়ে নেই!'

আমি বললুম, 'রাজা কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কাল রাত্রেই তিনি আবার কলকাতা ত্যাগ করেছেন। বিশালগড় ছাড়া তাঁর যাবার আর কোনওই জায়গা নেই। আমাদের মতন তাঁরও আজকে এখানে আসার কথা।'

প্রাচীনা বললেন, 'কিন্তু এখনও তিনি এখানে আসেননি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ কথা আপনি কেমন করে জানলেন?'

প্রাচীনা বললেন, 'বাবুজি, বিশালগড়ে যেতে আর সেখান থেকে বাইরে আসতে হলে পথ আছে একটি মাত্র। সে পথ এসে পড়েছে ঠিক এই সরাইখানার সামনেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, রাজা বিশালগড়ে ফিরে গেলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেতুম।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি যখন রাজার সব খবর রাখেন, তখন এটুকুও নিশ্চয় জানেন যে ইচ্ছা করলে তিনি রূপান্তর গ্রহণ করতে পারেন?'

ভয়ে ভয়ে একবার চারিদিকে তাকিয়ে প্রাচীনা চুপি-চুপি বললেন, 'এত জোর গলায় রাজার কথা নিয়ে আলোচনা করবেন না! এখানে বনের গাছ-পাতা আর বাতাসেরও বোধহয় কান আছে, রাজার কথা তারা সব শুনতে পায়। রাজা যদি একবার জানতে পারেন যে তাঁর কথা নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে এইভাবে আলাপ করছি, তাহলে আমার জীবনের মূল্য হবে না একটিও

কানাকড়ি। হ্যাঁ বাবুজি, আমি শুনেছি যে মাঝে-মাঝে বন থেকে এমন সব নেকড়ে বেরোয়, আর আকাশ দিয়ে উড়ে যায় এমন এক মস্ত বাদুড়, যাদের আত্মার সঙ্গে নাকি রাজার আত্মার কোনওই তফাত নেই। অবশ্য, এটা সত্যি কি মিথ্যা কথা আমি তা জানি না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'কাল কলকাতায় প্রায় শেষ রাতে আমরা রাজাকেই দেখেছি বোধহয় বাদুড়রূপে। রাজা যদি শূন্য পথে বিশালগড়ে গিয়ে হাজির হন?'

প্রাচীনা একটু ভেবে বললেন, 'কাল প্রায় শেষ রাতে রাজা যদি সত্য-সত্যই বাদুড়-মূর্তি ধারণ করে থাকেন, তাহলে শূন্যে উড়েও তিনি ভোরের আগে এতটা পথ পার হতে পারবেন না।'

—'আপনি কী বলতে চান?'

—'লোকে বলে, সূর্যোদয় হলেই রাজা হন মড়ার মতো। সে ক্ষেত্রে তাঁকে বিশালগড়ে আসতে হবে অন্য লোকের সাহায্যে পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে।'

—'রাজাকে সাহায্য করতে পারে, এমন সব লোকও আছে নাকি?'

—'আছে বইকি বাবুজি! কিন্তু তারা এ অঞ্চলের কোনও ভালো লোক নয়। তারা হচ্ছে বিদেশি বেদে। রাজার কথায় তারা ওঠে-বসে। কিন্তু রাজার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিশালগড় থেকে অদৃশ্য হয়েছে। কিছুদিন আগে আমি দেখেছি, তারা একটা ভারী সিন্দুক মাথায় করে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে ইস্টিশানের দিকে চলে গেল। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত আর তাদের দেখা পাইনি।'

বিনয় বললে, 'সেই সিন্দুকের রহস্য আপনি জানেন?'

প্রাচীনা কেমন শিউরে উঠে বললেন, 'লোকে নানান আজগুবি কথা বলে, আমি ঠিক জানি না।'

—'বেদেরা সেই সিন্দুকটা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাজার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক-সুদ্ধ সেই বেদেদেরও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেদেরা সেই সিন্দুকটা নিয়ে কোথায় যেতে পারে, আপনি বলতে পারবেন কি?'

—'রাজার মতো ওই বেদেরাও হচ্ছে বিশালগড়ের জীব। সিন্দুক নিয়ে তারা সেখানে ছাড়া আর কোথাও যাবে বলে মনে হয় না।'

অবিনাশবাবু হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সিন্দুক নিয়ে বেদেরা এখনও বিশালগড়ে ফিরে যায়নি?'

—'হ্যাঁ বাবুজি, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।'

—'জয় গুরু! বেদেরা তাহলে এখনই বা একটু পরেই সিন্দুক নিয়ে এই পথে ফিরে আসবে।'

আমি বললুম, 'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেন?'

—'কেন? আরে, আপনি কি এও বুঝতে পারছেন না যে, বেদেরা এই সিন্দুক নিয়ে আমাদেরই মতো রেলপথে এইখানে আসবে? কলকাতা থেকে বিশালগড়ে আসবার ট্রেন আছে মাত্র একখানা। যদিও আমরা তাদের দেখতে পাইনি, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছেছি। তারা বহন করে আনছে একটা মস্ত ভারী সিন্দুক, তাই আমাদের আগে এখানে এসে হাজির হতে পারেনি। কিন্তু তারা এল বলে। চলুন বিনয়বাবু, তাদের আগেই আমরা বিশালগড়ে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই।'

প্রাচীনা বললেন, 'বাবুজি, এতদূর থেকে আসছেন, আপনারা কি দয়া করে এখানে একটু বিশ্রামও করবেন না?'

আমি বললুম, 'প্রণাম মায়ীজি, আজ আর আমাদের বিশ্রামের সময় নেই। যদি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসি, আবার এখানে এসে বিশ্রাম করব। চলুন অবিনাশবাবু।'

ছয়

গোলাপি, বেগুনি, নীল আলো

সন্ধ্যা। কিন্তু আজকের সন্ধ্যা নয় চন্দ্রহীন। চারিদিক ছন্দোময় হয়ে আছে জ্যোৎস্নার মৌন আলোক-সঙ্গীতে।

আবার সেই বিশালগড়ের অসমোচ্চ পথের উপরে। দুইদিকে তার গহন অরণ্য, নৃত্যশীলা তটিনী, ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ের পর পাহাড়। সেদিন ছিল অন্ধকারের বিভীষিকা, কিন্তু আজ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে গীতিকবিতার ঐশ্বর্য।

এইসব দেখতে দেখতে অবিনাশবাবুকে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম আগে আগে। আজ আমি নির্ভয়, কারণ কবচের মহিমা আমাকে করে তুলেছে পরম সাহসী। রুদ্রপ্রতাপ আজ যদি একেবার আমার সামনে এসেও দাঁড়ায় তাহলেও আমি পশ্চাৎপদ হব না এক ইঞ্চিও।

প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাদের এমনভাবে অভিভূত করে রাখলে যে অনেকখানি পথ পার হয়েও আমরা কেউ কারুর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করবার অবসর পেলুম না। আমাদের হয়ে তখন কথাবার্তা কইতে লাগল উচ্ছ্বসিত সুগন্ধ বাতাস, মর্মরিত তরুলতা, কলরবমুখরা নদী ও নাম-না-জানা সব গানের পাখি। এই শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ী মোহিনী রাত্রি খানিকক্ষণের জন্যে ভুলিয়ে দিলে সেই বিভীষণ রাজা রুদ্রপ্রতাপের স্মৃতিও।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন অবিনাশবাবু। বললেন, 'বিনয়বাবু, একটা বিষয় আমি অনুমান করতে পারছি।'

—'কী?'

—'রুদ্রপ্রতাপ বিশালগড়ে ফিরবে কেমন করে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?'

খানিক দূরে একটা পাহাড়ের বুকে নির্ঝর ঝরে পড়ছিল তরল রৌপ্যধারার মতো। সেইদিকে তাকিয়ে আমি বললুম, 'আমি এখন কোনও কথাই অনুমান করবার চেষ্টা করছি না অবিনাশবাবু। আমি বাস করছি এখন অন্য জগতে।'

—'মানে?'

—'রাজা রুদ্রপ্রতাপ নয়, আমার ঘাড়ে চেপেছে এখন কোনও কবির প্রেতাত্মা।'

—'কী রকম?'

—'কবিরা যা নিয়ে কারবার করেন, আমি হয়েছি তারই কারবারি।'

—'অর্থাৎ?'

—'আমার উপরে দেখছি চাঁদকে, নীলিমার গায়ে দেখছি জ্যোৎস্নাকে, পাহাড়ের উপরে দেখছি

নির্ঝরিণী আর বনে বনে দেখছি কত রূপ, কত রস, কত ছন্দ! ভুলে গিয়েছি অবিনাশবাবু, আপনার ওই রুদ্রপ্রতাপকে একেবারে ভুলে গিয়েছি।'

অবিনাশবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ যে আমাদের ভোলেনি, সেটাও আপনি ভুলে গিয়েছেন নাকি?'

তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে বললুম, 'এবারে আমার স্বর্গ থেকে হল পতন। এমন সুন্দর জগতে সেই মূর্তিমান অন্ধকারের কথা কেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন?'

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, 'স্মরণ না করিয়ে দিয়ে উপায় নেই। আমাদের হাতে সময় খুব অল্পই, যে-কোনও মুহূর্তে রুদ্রপ্রতাপকে আবার আমরা চোখের সামনে দেখতে পারি।'

—'বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমাকে কী অনুমান করতে বলছিলে

—'রুদ্রপ্রতাপ কেমন করে বিশালগড়ে ফিরে আসছে, সেকথা বলতে পারেন?'

'আপনি আমার সঙ্গে আছেন বলে ও-সব বিষয় নিয়ে আমি মস্তক ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করিনি। আপনি কিছু অনুমান করেছেন?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'রুদ্রপ্রতাপ বিশালগড়ে আসবে সেই সিন্দুকেরই ভিতরে, যা বহন করে আনছে একদল বেদে।'

—'তাই নাকি?'

—'সেইরকম তো সন্দেহ হয়। সূর্যোদয়ের পূর্ব-মুহূর্তে কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রুদ্রপ্রতাপ আশ্রয় নিয়েছে সেই সিন্দুকের ভিতরে। দিনের বেলায় যে হয় মৃতবৎ, নিশ্চয়ই সে বাইরের পৃথিবীর চোখের সামনে থাকবে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখন আবার রাত্রি হয়েছে। রাজা যে এখনও সজীব হয়ে ওঠেনি, একথা কি জোর করে বলা যায়?'

—'তা যায় না। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে এর মধ্যেই নিশ্চয় আবার আমরা রাজার দেখা পেতুম। আমার মনে হয়, যে-কারণেই হোক রাজা এখনও তার নিরাপদ বাসা ছেড়ে বাইরে বেরুতে সাহস করেনি।'

আচম্বিতে খুব কাছে বনের ভিতর থেকে হা হা হা হা করে জেগে উঠল আবার সেই অতিপরিচিত ও ভয়াবহ অট্টহাসির পর অট্টহাসির উচ্ছ্বাস।

আমার চোখের সুমুখে এক মুহূর্তে যেন দপ করে নিবে গেল আকাশ ও পৃথিবী-ভরা পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার ঔজ্জ্বল্য।

এক লাফে পিছিয়ে এসে ও প্রায়-আবদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলুম, 'অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু!'

ব্যাপারটার আকস্মিকতা এতই অভাবিত যে অবিনাশবাবু পর্যন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। ও স্বর যে কার তা বুঝতে কিছুই বিলম্ব হয় না। পৃথিবীতে একমাত্র লোকেরই কণ্ঠ থেকে ওরকম পৈশাচিক হাস্যধ্বনি জাগ্রত হতে পারে।

আমরা পরস্পরের হাত ধরে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কিন্তু অট্টহাসি আর শোনা গেল না। অট্টহাসি থেমে গেলেও তার প্রতিধ্বনি তখনও শোনা যেতে লাগল দূরে দূরে পাহাড়ের শিখরে শিখরে এবং উপত্যকায় উপত্যকায়। আলোর উপরে নেমে এল যে অদৃশ্য অন্ধকারের ঘেরাটোপ, তা চোখে দেখা না গেলেও যেন হৃদয় দিয়ে অনুভব

করা যায়। কম্পিত স্বরে বললুম, 'অবিনাশবাবু, আপনার ধারণা সত্য নয়। রাজার দেহ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কেবল জ্যান্ত হয়নি, বোধহয় সে আমাদের অনুসরণও করছে।'

ত্রস্ত চোখে পিছন দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কিন্তু তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তাকে দেখতে পাচ্ছেন না কারণ সে দেখা দিতে সাহস করছে না।'

—'সাহস করছে না?'

—'না। আপনার কবচের কথা আবার ভুলে যাচ্ছেন নাকি?'

—'এমন অবস্থায় ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়! কিন্তু রাজা যদি সত্য-সত্যই ভয় করে, তবে অকারণে এমনভাবে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিলে কেন?'

—'সেইটেই আমি বুঝতে পারছি না। তার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন সে করেনি তখন তার মনের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও গোপন অভিসন্ধি আছে। তার শয়তানি বুদ্ধি এখন কোন পথ ধরবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। আত্মরক্ষার জন্যে এখন আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।'

—'এই বনে কী করে আমরা আরও সাবধান হব?'

—'অপেক্ষা করুন, এখনই দেখতে পাবেন।'

আমরা তখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলুম তার একদিকে পাহাড় আর বন এবং আর একদিকে জঙ্গল শেষ হয়ে গিয়ে আরম্ভ হয়েছে সুদূর-বিস্তৃত একটা প্রান্তর। অনেক দূরে প্রান্তরের মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ রৌপ্যরেখা থেকে-থেকে চকচক করে উঠছিল—বোধহয় কোনও নদী।

আমাকে নিয়ে অবিনাশবাবু পথ ছেড়ে নেমে প্রান্তরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বিড়বিড় করে কি এক দুর্বোধ মন্ত্র বলতে বলতে মাটির উপরে মণ্ডলাকারে টেনে দিতে লাগলেন একটা রেখা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ও কী করছেন অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু নিজের কার্য শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মন্ত্রঃপূত গণ্ডী টেনে দিলুম।'

—'কেন?'

—'রুদ্রপ্রতাপ যখন আবার জেগেছে, তখন এই গণ্ডীর ভিতরে বসেই আজকের রাতটা আমাদের পুইয়ে দিতে হবে। সাবধান, এই গণ্ডীর ভিতর থেকে কিছুতেই বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না। এর বাইরে গেলেই বিপদ। কিন্তু ভিতরে থাকলে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব—কেউই আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। রুদ্রপ্রতাপের সমস্ত শয়তানি বুদ্ধিই এই গণ্ডীর বাইরে একেবারে মাঠে মারা যাবে। আসুন বিনয়বাবু, মাঝখানে এসে বসুন। মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করুন। ইচ্ছা করেন তো রীতিমতো নাক ডাকিয়ে রাত কাবার করলেও কোনও ক্ষতি হবে না।'

আমি বললুম, 'আমার নাক আজ রাতে ডাকবার চেষ্টা করবে? আপনি কি পাগল হয়েছেন?'

—'তবে আপনার নীরব নাসিকা দিয়ে লক্ষ্মীছেলেটির মতো এইখানে বসে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করুন।'

—'তাও অসম্ভব। আমার ঘাড় থেকে কবির প্রেতাত্মা এখন নেমে গিয়েছে। রুদ্রপ্রতাপের সাঙ্ঘাতিক মূর্তি ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

—'উত্তম। গণ্ডীর ভিতরে বসে তাও দেখলে ক্ষতি নেই; কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, গণ্ডীর বাইরে একবারও পা বাড়াবেন না।'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, মুখে কিছু বললুম না।

অবিনাশবাবু একটা মস্ত হাই তুলে বললেন, 'ঘুম আমাকে হাতছানি দিচ্ছে, আমি জেগে থাকতে পারব না। গণ্ডীর ভিতরে আম্‌রা সম্পূর্ণ নিরাপদ। প্রেতলোকের পল্টন এলেও এ ব্যূহ ভেদ করতে পারবে না। তাই আবার বলি বিনয়বাবু, আমার সঙ্গে আপনিও করুন নিদ্রাদেবীকে সাধনা।'

—'ক্ষমা করবেন অবিনাশবাবু, আমার চোখ থেকে সব ঘুম ছুটে গিয়েছে।'

অবিনাশবাবু নাচারভাবে দূর্বাকোমল মাটির উপরে দেহকে লম্বমান করে কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে বললেন, 'কিন্তু ঘুমোবার আগে একটা কথা বলে রাখি বিনয়বাবু। সর্বদাই মনে রাখবেন, দুষ্ট আত্মা—অর্থাৎ পিশাচ করেছে আপনার দেহকে স্পর্শ। রাজা কে, আপনি তা জানেন। যতই রক্ষাকবচ ধারণ করুন, আপনাকে সে সহজেই ভোলাতে পারবে। পিশাচের ছলনা কোন দিক থেকে যে আপনাকে আকর্ষণ করবে, আপনি জেনেও তা বুঝতে পারবেন না বলেই মনে করি। কিন্তু সর্বক্ষণই স্মরণ রাখবেন, আপনার পক্ষে গণ্ডীর ভিতরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আর গণ্ডীর বাহিরটা হচ্ছে একান্ত বিপজ্জনক।' তিনি পাশ ফিরে শুলেন। মিনিটকয়েক যেতে না-যেতেই তাঁর নাসিকার মধ্যে জাগ্রত হল দস্তুরমতো হুঙ্কারধ্বনি। সেই কোলাহল শ্রবণ করে দুটো শৃগাল চরম বিস্ময়ে উৎকর্ণ হয়ে একটা ঝোপের ভিতর হতে একবারমাত্র মুখ বাড়িয়ে মুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ করতে বিলম্ব করলে না।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম মাঠের উপরে দূরের চাকচিক্যময় রুপোলি নদী-রেখার দিকে। ধীরে ধীরে আবার মনের ভিতরে হতে লাগল অসাময়িক কবিত্বের সঞ্চার। সে কবিত্বকে অসাময়িক ছাড়া আর কী বলব? যেখানে একটু আগেই শোনা গেছে অলৌকিক এবং পৈশাচিক অট্টহাস্য, সেখানে কোনও সত্যিকার মহাকবির মনও ধারণায় আনতে পারত না পেলব কবিত্বকে।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল আমি তা জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার সন্দেহ হতে লাগল, সমুজ্জ্বল নদী-রেখার ঠিক উপরেই ক্রমে-ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে দুগ্ধধবল চন্দ্রকরধারার কতক কতক অংশ।

ভুল দেখছি ভেবে আমি একবার দুই হাতে দুই চোখ কচলে আরও ভালো করে দেখলুম, সেই পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্না যেন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে আরও এগিয়ে আরও এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে ধীরে আমারই দিকে। জ্যোৎস্নার এমন কল্পনাতীত ব্যবহার এর আগে আর কখনও আমি লক্ষ করিনি। এও কি সম্ভব?

আসছে, আসছে, আসছে—কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত পুঞ্জীকৃত জ্যোৎস্না।

ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলুম না। আবার বোধশক্তি যেন ক্রমেই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। কেবল এইটুকুই অনুভব করলুম, আমার মনের মধ্যে যেন নূপুর বাজাচ্ছে কী এক অজানিত আনন্দের ছন্দ। যেন এই

আনন্দকে লাভ করতে পারলে আমি অনায়াসেই পরিত্যাগ করতে পারি যে-কোনও সাম্রাজ্যের সিংহাসন!

আরও কাছে—আরও, আরও, আরও কাছে একে একে একে এগিয়ে এল সেই আশ্চর্য চন্দ্রকিরণপুঞ্জ। যা ছিল প্রথমে ছায়া-ছায়া স্বচ্ছ, দেখতে দেখতে তা গ্রহণ করতে লাগল এক-একটা নির্দিষ্ট আকার।

ঘনীভূত হয়ে উঠছে, আকারগুলো ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। পরে পরে, অবশেষে পাশে পাশে আত্মপ্রকাশ করলে তিন-তিনটে মূর্তি। মূর্তিগুলো যেন পরিচিত, এর আগে যেন দেখেছি তাদের কোনও স্বপ্নজড়িমায়। কিন্তু সে কোথায়, সে কোথায়?.....

কোথায়? তা ধারণাতেও আনতে পারলুম না। আমি তখন একেবারেই আত্মবিস্মৃত। আমার কাছ থেকে তখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে যেন পৃথিবীর অস্তিত্ব।

পাশাপাশি তিনটি তরুণীর সঞ্চারিণী লতার মতন তনু। এমন সব পরমা সুন্দরী আমার চক্ষু জীবনে আর কখনও দেখেনি। রূপকথার রাজকন্যারাও তুচ্ছ তাদের কাছে। বকপক্ষশুভ্র তাদের দেহ এবং তাদের একজনের চক্ষে জ্বলছে গোলাপি আলো, আর-একজনের চক্ষে বেগুনি আলো এবং আর-একজনের চক্ষে নীল আলো। চোখে যে এতরকম রঙের আলো জ্বলতে পারে, একথা জানতুম না কোনওদিনই।

তিনটি তরুণী এগিয়ে এসে দাঁড়াল পাশে পাশে পাশে।

যার চোখে জ্বলছিল গোলাপি আলো, সে বীণানিন্দিত স্বরে বললে, 'বন্ধু, আমায় কি চিনতে পারছ না?'

আমি তাকে চিনলুম, কিন্তু মুখ আমার হয়ে গেছে বোবা!

যার চোখে জ্বলছিল বেগুনি আলো, সে এগিয়ে এসে নির্ঝরিণীর ছন্দভরা কণ্ঠে বললে, 'এসো বন্ধু, এখানে এসো—আকাশের চাঁদ চায় পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে!'

যার চোখে জ্বলছিল নীল আলো, সানুনয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে কলভাষিণী নদীর মতন স্বরে সে বললে, 'বন্ধু, ও বন্ধু! আজ তুমি আমায় চিনতে পারছ না? সেদিন তোমায় দেখেছিলুম কী চমৎকার! কিন্তু আজ দেখছি তোমার গলায় ঝুলছে তামার তৈরি কী একটা বিশ্রী জিনিস! ওটা দিয়ে যাও আমার হাতে—আমি ছুড়ে ফেলে দি ওটাকে নদীর জলে! অমন সুন্দর দেহে অমন কুৎসিত জিনিস কি মানায়? দাও দাও, ওটা আমায় দাও, আর ওর ভার বহন কোরো না!' বলতে বলতে সে সামনে বাড়িয়ে দিলে দুইখানি ফুলের পাপড়ির মতন নরম হাত।

আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম মাতালের মতন টলতে টলতে—সমস্ত পৃথিবী যেন আমার ধারণার বাইরে। নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি গলা থেকে কবচখানা টেনে বার করলুম, তারপর অবিনাশবাবুর টানা রেখা-মণ্ডলের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালুম—

কিন্তু পর-মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক হাতের টানে আছাড় খেয়ে মাটির উপরে পড়লুম পিছন দিকে।

ক্রোধে বিচলিত কণ্ঠে অবিনাশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'ভাগ্যিস আমি হঠাৎ জেগে উঠেছি, নইলে আপনার কী হত বলুন দেখি? আপনি গণ্ডীর বাইরে গিয়ে কবচ দিতে যাচ্ছিলেন কার হাতে? আপনি মূর্খ, আপনাকে গালাগালি দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না! চুপ করে বসে থাকুন এইখানে!'

এবারে আর অট্টহাসি নয়—আচম্বিতে কোথা থেকে কার কণ্ঠে জেগে উঠল এমন আর্তস্বর, নরকেও যা কেউ কোনওদিন শ্রবণ করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই তিনটে অপূর্ব-সুন্দর—কিন্তু অপার্থিব নারীমূর্তি সরে সরে—ক্রমে দূরে, আরও দূরে সরে গেল। দেখতে দেখতে তাদের দেহ মিলিয়ে যেতে লাগল যেন কোনও বায়বীয় পদার্থের মতো বাতাসের সঙ্গে। কোথায় গোলাপি আলো, কোথায় বেগুনি আলো, কোথায় নীল আলো! কেমন একটা অদ্ভুত ক্রন্দন প্রথমে অস্পষ্ট আর অস্পষ্ট হয়ে শোনাতে লাগল বহু—বহু দূরের প্রতিধ্বনির মতো। তারপর তাও মিলিয়ে গেল—জাগ্রত হয়ে রইল কেবল স্বাভাবিক এবং পরিপূর্ণ চাঁদের আলো।

অবিনাশবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'বিনয়বাবু! যা বারণ করেছিলুম, আপনি তাই করতে যাচ্ছিলেন!'

আমি হাতজোড় করে বললুম, 'সব এখন বুঝতে পেরেছি! আমি যাচ্ছিলুম নরকে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এখানে ক্ষমার কথা হচ্ছে না বিনয়বাবু। এখানে আছে কেবল যুক্তির কথা—যাক, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। বিগতকে নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করতে চাই না। চেয়ে দেখুন, পূর্ব-চক্রবালে দেখা যাচ্ছে গোলাপি ঊষার মোহনীয় দৃষ্টি। এইবারে শেষ হবে যত ভৌতিক চক্রান্ত।'

একটু একটু করে ধবধবে নরম আলোর আভায় ভরে গেল সমস্ত আকাশ। দূরে, কাছে—গাছে গাছে গেয়ে উঠল জাগ্রত প্রভাতে গীতকারী বিহঙ্গের দল।

উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ণকণ্ঠে বললুম, 'জয়, প্রভাত-সূর্যের জয়! চলুন অবিনাশবাবু, আর কোনওদিন আমি পদচ্যুত হব না!'

সাত

আমরা হত্যাকারী

আবার ধরেছি বিশালগড়ের পথ।

চিকন রোদে চারিদিক করছে ঝলমল, কোথাও নেই এতটুকু কালিমার আভাস। গাছপালার ছায়া পর্যন্ত যেন মাজাঘষা, সমুজ্জ্বল। সারা পথ ধরেই কানে জাগছে পাখিদের আনন্দগীতি, ঝরনার সুরও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিশালগড়ের অরণ্য থেকে এখন বিলুপ্ত হয়েছে সমস্ত বিভীষিকার ভাব।

আমার মনও নির্ভয়। এখন দিনের বেলা, শয়তানের রাজা অসহায় মড়ার মতন পড়ে আছে কোথায়, সে আর আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

অবিনাশবাবু বললেন, 'বিনয়বাবু, আমাদের আরও তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে।'

—'কেন অবিনাশবাবু, তাড়াতাড়ির দরকার কী?'

—'দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা যদি বিশালগড়ে পৌঁছতে না পারি, তাহলে আমাদের

চরম বিপদের সম্ভাবনা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পিশাচ হবে জীবন্ত; সঙ্গে সঙ্গে আবার জাগবে রক্তভক্ত নেকড়ের দল, আর সেই ভীষণ-সুন্দর নারীমূর্তিগুলো। তখন কোন দিক দিয়ে কেমন করে যে আসবে বিপদ-আপদ, আমরা তা ধারণাতেও আনতে পারব না।'

অবিনাশবাবুর সাবধান-বাণী শুনে পায়ের গতি করলুম দ্রুততর। বিশালগড়ে যখন পৌঁছলুম, বেলা তখন পাঁচটা।

দিনের বেলায় সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানাকেও যেন দেখাচ্ছে মৃতবৎ। বিস্তৃত অঙ্গনের উপরে জাগতে লাগল কেবল আমাদের পায়ের জুতোর শব্দ, তা ছাড়া কোনওদিক থেকে কোনও শব্দই শুনতে পেলুম না। এখানে হয়েছে যেন নিখিল জীবনের সমাধি। এখানে যেন কণ্ঠস্বরকে মুক্ত করতেও হয় আতঙ্ক।

সেই প্রকাণ্ড দরজা। পাল্লা দুখানা ছিল বন্ধ, হাত দিয়ে ঠেলতেই যেন কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ করতে করতে খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকে সোজা গিয়ে হাজির হলুম সেই ঘরে, যেখানে কিছুদিন আগে বাস করেছিলুম বন্দির মতো।

ঘরের সাজসজ্জার কিছুই পরিবর্তন হয়নি, নূতনত্বের মধ্যে দেখলুম খালি, সর্বত্রই পড়েছে ধুলোর একটা আবরণ।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'এখন আমরা কী করব অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'প্রথমেই আমাদের যেতে হবে রাজার শয়নগৃহে।'

—'কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি, দিনের বেলায় রাজা তার ঘরের ভিতর থাকে না।'

অবিনাশবাবু যেন অধীরভাবেই বললেন, 'জানি বিনয়বাবু, ও-কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমি যেতে চাই একতালার সেই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে, যেখানে আপনি সিন্দুকের ভিতরে রাজাকে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।'

—'তাহলে আমার সঙ্গে এদিকে আসুন।'

তারপর ঠিক যেভাবে প্রথমে রাজার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলুম, কার্নিশের উপর দিয়ে ঠিক সেইরকম করেই আবার ঢুকলুম সেই ঘরের ভিতরে। সে-ঘরেরও কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেকেলে টেবিলের উপরে ধুলো-মাখানো স্বর্ণমুদ্রাগুলো পর্যন্ত ঠিক সেইভাবেই পড়ে রয়েছে।

দেওয়ালের দরজাটা ঠেলে পেলুম আবার সেই সরু পথ ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির সার।

এবারে আমাদের সঙ্গে ছিল দুটো টর্চ, তার দুটো তীক্ষ্ণ আলোকে অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে আবার নামতে লাগলুম নীচের দিকে। সেবারের মতো এবারও মনের মধ্যে জেগে উঠল একটা রোমাঞ্চকর অপার্থিব ভাব। ইহলোক থেকে যেন এগিয়ে যাচ্ছি পরলোকের দিকে। জানি পিশাচ রাজা এখন উপদ্রব করবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, তবু এই অপার্থিব ভাবটা মনের ভিতর থেকে তাড়াতে পারলুম না। অবিনাশবাবু কী ভাবছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি একেবারেই চুপচাপ।

তারপর সেই ঘর। কিন্তু আজ আর সেখানে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধও নেই, আর সেই প্রকাণ্ড সিন্দুকটাও সেখান থেকে অদৃশ্য।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে অবিনাশবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'আমাদের ভয়ে রুদ্রপ্রতাপ কি তার শোবার ঘর বদলেছে?'

—'হতেও পারে, অসম্ভব নয়।'

—'তাহলে আজ দেখছি বাড়ির সর্বত্রই তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে হবে। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে সেটা সম্ভব হবে কি? যাক, পরের কথা পরেই ভাবা যাবে, এখন আসুন, আমাদের অন্বেষণ আরম্ভ হবে একেবারে বাড়ির উপরতালা থেকে।'

উঠে গেলুম তিনতলার সেই সুদীর্ঘ দালানে। সেখানে সেই ঘরের পরে ঘর, আর প্রত্যেক ঘরের দরজাতেই একটা করে তালা লাগানো। কিন্তু সেদিনকার মতো আজকেও দেখলুম সেই বড়ো হলঘরটির দরজায় কুলুপ লাগানো নেই, হাত দিয়ে ঠেলতেই ধীরে ধীরে পাল্লা দু-খানা খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই বুকের ভিতরে লাগল একটা মহা-আতঙ্কের ধাক্কা। তাড়াতাড়ি আবার পিছিয়ে এলুম।

অবিনাশবাবুও এগিয়ে দেখলেন, তারপরে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন স্থির মূর্তির মতো।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে একখানা মস্ত বড়ো খাট এবং তার উপরে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে সেই ভীষণ-সুন্দর ও অপার্থিব তিন নারীমূর্তি।

খানিকক্ষণ পরে অবিনাশবাবু মুখ ফিরিয়ে আমাকে বললেন, 'আসুন!'

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টভাবে এবং রীতিমতো ভয়ে-ভয়েই আমিও ঘরের ভিতর ঢুকে সেই ভয়াবহ খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সত্য, এদের দেখবার আগে এমন সৌন্দর্যের কল্পনাও করা যায় না। তাদের তিনজনের পরনে তিনখানি গোলাপি, বেগুনি আর নীল রঙের পাতলা ফিনফিনে শাড়ি। তা ছাড়া দেহের অন্য কোথাও কোনওরকম অলঙ্কারই নেই। এই নিরলঙ্কার দেহের জন্যেই যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে তাদের আকৃতি। মাথার চিকন কালো চুলের রাশি এলিয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মোমের মতো নরম দেহের উপর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন ভিতরকার রক্তের আভা। কী নিটোল বাহু, কী টানা টানা ভুরু, কী চমৎকার ডাগর ডাগর চোখ! ঠোঁটগুলি যেন ঠিক মিহিন ফুলের পাপড়ি এবং আধ-খোলা ঠোঁটের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে ধবধবে দাঁতগুলি মুক্তাসারির মতো। পাশাপাশি শুয়ে আছে যেন বড়ো শিল্পীর হাতে গড়া তিনটি চমৎকার পুতুল।

কিন্তু এই সুন্দর আকৃতির পিছনে আছে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতি, এখন তাদের দেখে কিছুতেই তা আন্দাজ করা সম্ভবপর নয়। তাদের চোখের পাতা খোলা থাকলেও তাদের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে না কোনও জাগ্রত দৃষ্টির আভাস। শ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের উত্থান-পতন নেই বটে, কিন্তু তাদের দেখলে মৃত বলেও সন্দেহ হয় না। এরা আশ্চর্য জ্যান্ত মড়া!

—'এদিকে সরে আসুন!' এমন গম্ভীর ও কঠোর স্বরে অবিনাশবাবু এই কথাগুলো বললেন, যে আমি সচকিত দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে ফিরে তাকালুম। তাঁর মুখের উপরে একটা নৃশংস দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব।

সরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'অবিনাশবাবু, এখন আপনি কী করবেন?'

অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন না, হাতব্যাগ খুলে ভিতর থেকে টেনে বার করলেন একখানা ধারালো চকচকে ভোজালি।

আমি বিপুল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'একী অবিনাশবাবু? আপনি ভোজালি বার করলেন কেন?'

দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'মড়া যাতে আর না বাঁচতে পারে, সেই ব্যবস্থাই আমি করব!'

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। শিউরে উঠে বললুম, 'তার মানে? আপনি কি এদের হত্যা করতে চান?'

অবিনাশবাবু পাগলের মতো হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'মড়াকে আবার কেউ হত্যা করতে পারে নাকি?'

—'কিন্তু আপনি তো জানেন এরা কেউ মড়া নয়? এরা ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে ওঠে?'

—'হ্যাঁ, আবার জেগে ওঠে, জীবন্ত মানুষের রক্তপান করবার জন্যে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, ওদের ঠোঁট অত বেশি রাঙা কেন? ওদের ঠোঁটে এখনও মাখানো রয়েছে মানুষের শুকনো রক্তের দাগ। আর খানিক পরেই ওরা আবার জেগে উঠবে, আর রাক্ষসীর মতো আক্রমণ করবে আমাদেরই। কিন্তু ওদের জাগার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি আর ওদের জাগতে দেব না—না, না, কখনওই না!'—বলতে বলতেই তিনি ভোজালিখানা তুলে ধরলেন মাথার উপরে।

আমি বলে উঠলুম, 'করেন কী, করেন কী অবিনাশবাবু!'

বিষম রাগে চেঁচিয়ে উঠে অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি নির্বোধ! প্রেতিনীর উপরে দয়া?'

ভোজালিখানা তুলে অবিনাশবাবু আবার ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

সে দৃশ্য সহ্য করতে পারব না বলে আমি বেগে ঘরের ভিতর থেকে পালিয়ে এলুম। তারপরেই দালানে দাঁড়িয়ে আচ্ছন্নের মতো শুনলুম আঘাতের পর আঘাতের শব্দ, এবং তিনটে বিভিন্ন কণ্ঠে তিন-তিনবার কান-ফাটানো তীব্র চিৎকার।

অবিনাশবাবু দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখচোখ উদভ্রান্তের মতো এবং তাঁর জামাকাপড়ে টকটকে লাল টাটকা রক্তের দাগ। তাঁর হাতের ভোজালি থেকেও ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। প্রায় অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'চলে আসুন বিনয়বাবু, শিগগির এখান থেকে চলে আসুন! পৃথিবী থেকে তিনটে মহাপাপ চিরদিনের জন্যে বিদায় হয়েছে—ওদের মুণ্ড আর জোড়া লাগবে না।'

আট

নেকড়ে এবং রুদ্রপ্রতাপ

অবিনাশবাবুর সঙ্গে আমি আবার বিশালগড়ের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

বিশালগড়ের ভিত্তির তলায় আছে বোধহয় কোনও ছোটো পাহাড়। কারণ এখানটা চারিদিকের অন্য সব জায়গার চেয়ে অনেক উঁচু। এখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত।

পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, আর খানিকক্ষণ পরেই হবে সূর্যাস্ত। মনে হতেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ততক্ষণ পর্যন্ত পিশাচের নিদ্রাভঙ্গ হবে না। কিন্তু তারপর?

বোধহয় সেই কথাই ভাবছিলেন অবিনাশবাবুও। কারণ তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, বিশালগড়ের ভিতরে তো রুদ্রপ্রতাপের কোনওই পাত্তা পেলুম না। খুব সম্ভব এই অরণ্যেই কোনও গুপ্ত স্থানে সে দিবানিদ্রায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই হবে আবার তার জাগরণ, আর আমাদের পক্ষে সেটা হবে অত্যন্ত বিপদের কথা।'

আমি বললুম, 'রাতের বেলায় এই বিশাল অরণ্যের কোথাও আমরা নিরাপদ নই। পিশাচ তার অপার্থিব শক্তি নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বার করবে। সূর্যাস্তের আগে আমরা কিছুতেই এই বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব না। তখন আমাদের কী উপায় হবে অবিনাশবাবু?'

—'আত্মরক্ষা করার জন্যে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে কালকের মতো আবার মন্ত্রঃপূত গণ্ডীর মধ্যে রাত্রিযাপন করা।'

—'মানলুম, আপনার মন্ত্রঃপূত গণ্ডীর ভিতরে কোনও প্রেত কি পিশাচ আসতে পারবে না। কিন্তু আর একটা পার্থিব বিপদের কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

—'আপনি কী বিপদের কথা বলছেন?'

—'আপনাকে কি সেই নেকড়ের দলের কথা আমি বলিনি? সেই দারুণ নেকড়ের দল রুদ্রপ্রতাপের বশীভূত। সে যদি নেকড়ের দলকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, তাহলে ওই মন্ত্রঃপূত গণ্ডী কি আমাদের রক্ষা করতে পারবে?'

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'নেকড়ের দলের কথা সত্যিই আমার মনে ছিল না। গণ্ডী তো তাদের বাধা দিতে পারবে না! তবে, আমাদের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমরা নিরস্ত্র নই। আমাদের দুইজনেরই সঙ্গে আছে রিভলভার; অন্তত যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ তাদের বাধা দিতে পারব!'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ। কিন্তু তারপর?'

'তার পরের কথা এখন আর ভেবে কোনওই লাভ নেই। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলুম, তা সম্পূর্ণরূপে সফল হল না। পিশাচীদের বধ করেছি বটে, কিন্তু পালের গোদা সেই পিশাচ এখনও বর্তমান। সে যে কী করবে আর না করবে, তাও আমরা অনুমান করতে পারছি না। আমাদের সম্বল কেবল ভগবানের দয়া। তাঁরই উপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনওই উপায় নেই।'

আবার আকাশের নিকে তাকিয়ে দেখলুম।

অস্ত যাবার আগে সূর্যের মুখ যতই রাঙা হয়ে উঠছে, তার কিরণ হয়ে আসছে ততই পরিম্লান। দিনের আলো থাকতে থাকতে বাসায় ফেরবার জন্যে এখনই পাখিদের মধ্যে জেগেছে ব্যস্ততা। শূন্য পথ দিয়ে দলে দলে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁস, বক, কাক, শালিক ও চিল প্রভৃতি বিহঙ্গের দল। কখনও হাঁস ও বকের ঝটাপট শব্দে এবং কখনও বা টিয়া ও শালিকের কলরবে থেকে-থেকে ভেঙে যাচ্ছে অরণ্যের নিস্তব্ধতা। হঠাৎ বাতাসও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সঙ্গে

সঙ্গে জাগল যেন আসন্ন রাত্রির ভয়ে অরণ্যের মর্মর-কাতরতা। তার পরেই অনেক, অনেক দূর থেকে শুনতে পেলুম একটা ভয়াবহ অস্পষ্ট ধ্বনি।

সচকিত কণ্ঠে বললুম, 'অবিনাশবাবু, শুনছেন?'

—'কী?'

—'আপনি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?'

—'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ও কীসের শব্দ?'

—'নেকড়েরা আসছে!'

—'নেকড়েরা?'

—'হ্যাঁ। নেকড়েরা আসছে, আর ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে। যে শব্দ শুনছেন, ও হচ্ছে নেকড়েদের গর্জন। ওই ভয়ানক শব্দ আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। পিশাচ রুদ্রপ্রতাপের সঙ্গে নেকড়েদের কী অলৌকিক যোগাযোগ আছে আমি তা জানি না কিন্তু এরই মধ্যে কোনও অদ্ভুত উপায়ে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে রুদ্রপ্রতাপের আদেশ। হয়তো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই নেকড়েরা আমাদের কাছে এসে পড়বে। অবিনাশবাবু, মাত্র দুটো রিভলভারের গুলিতে আমরা কি শতাধিক নেকড়েকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব?'

অবিনাশবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন। আমি উৎকীর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম, নেকড়েদের চিৎকার ক্রমেই স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সূর্যাস্তের আর কত দেরি? বোধহয় মিনিট পনেরোর বেশি নয়। নেকড়েদের এখানে আসতে আর কত দেরি? হয়তো মিনিট পনেরোরও কম।

হঠাৎ অবিনাশবাবু বলে উঠলেন, 'ভয় নেই বিনয়বাবু, ভয় নেই। আত্মরক্ষার একটা উপায় আমি আবিষ্কার করেছি!'

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী উপায়, অবিনাশবাবু?'

—'ওই যে খুব উঁচু বড়ো গাছটা দেখছেন, ওরই উপরে উঠে আজ আমরা রাত্রিযাপন করব।'

—'ওই গাছের উপরে আমরা নেকড়েদের ফাঁকি দিতে পারব বটে, কিন্তু আপনি রুদ্রপ্রতাপের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? গাছে উঠলে তাকেও কি ফাঁকি দিতে পারব?'

—'রুদ্রপ্রতাপের কথা আমি ভুলিনি বিনয়বাবু। ওই গাছের চারিদিক ঘিরে আমি কেটে দেব মন্ত্রপড়া গণ্ডী। রুদ্রপ্রতাপ যদি গণ্ডীর ভিতরে ঢুকতে না পায়, তাহলে সে গাছের উপরে গিয়ে উঠবে কেমন করে?'

আমি শুকনো হাসি হেসে বললুম, 'রুদ্রপ্রতাপ যদি একটা বাদুড় হয়ে শূন্যপথে ওই গাছের উপরে গিয়ে আবির্ভূত হয়?'

—'না, তা সে পারবে না। ওই গণ্ডীর উপরকার শূন্যপথও তার কাছে বন্ধ।'

নেকড়ের চিৎকার এখন বেশ ভালো করেই শোনা যাচ্ছে। সে কী ক্ষুধিত চিৎকার! তার প্রভাবে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিও যেন হয়ে উঠল বিষাক্ত!

আমার সামনে পড়ে ছিল বিশালগড়ে আসবার সেই সুদীর্ঘ সোজা রাস্তাটি। হঠাৎ দেখলুম,

সেই রাস্তার উপর দিয়ে কারা এগিয়ে আসছে এইদিকেই। সচমকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝলুম, কয়েকটা লোক মাথার উপর কী যেন একটা বহন করে আনছে।

অবিনাশবাবু সেই বড়ো গাছটার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ত্রস্তকণ্ঠে ডাকলুম, 'অবিনাশবাবু!'

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'কী?'

—'পথ দিয়ে কারা আসছে!'

অবিনাশবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে পথের দিকে করলেন দৃষ্টিপাত। কয়েকটি মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, 'পথ দিয়ে কারা আসছে, বুঝতে পারছেন না?'

—'কারা আসছে?'

—'সেই বেদের দল। আর ওদের সঙ্গে রয়েছে সেই বড়ো সিন্দুকটা, যার ভিতরে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে রুদ্রপ্রতাপ।'

আমি সভয়ে বললুম, 'রুদ্রপ্রতাপকে নিয়ে ওরা আমাদের সামনে আসতে সাহস করবে? সে তো এখনও মৃতবৎ!'

গম্ভীর স্বরে অবিনাশবাবু বললেন, 'সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

সূর্য তখন একটা ঝিমন্ত লাল আলোর গোল ফানুসের মতো। আর মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে দিকচক্রবালরেখার ওপারে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি কি জানেন না বিনয়বাবু, ভোরের আলো ফোটবার আগেই রাতকানা পাখিদের ঘুম যায় ভেঙে? তেমনই বোধহয় সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা আসবার আগেই দিনকানা রুদ্রপ্রতাপের দেহে জাগে জীবনের চিহ্ন। বেদেরা আমাদের কাছে আসবার আগে সূর্যের মুখ আর আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাব না। অতএব আমাদের এখন বেগে দৌড়ে এগিয়ে যেতে হবে ওই বেদেগুলোর দিকে।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'কেন অবিনাশবাবু?'

—'সূর্যাস্তের পরমুহূর্তেই রুদ্রপ্রতাপ হবে সিন্দুকের ভিতর থেকে অদৃশ্য।'

—'বেদেরা দেখছি দলে ভারী। ওরা আমাদের বন্ধু নয়।'

অবিনাশবাবু আমার হাত ধরে টানতে টানতে অগ্রসর হয়ে বললেন, 'জানি বিনয়বাবু, জানি। ওরা আমাদের শত্রু। আমরাও ওদের বন্ধু নই। আমরাই ওদের আক্রমণ করব। বার করুন রিভলভার, দৌড়ে চলুন—আর কথা কইবার সময় নেই!'

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও হলুম সবেগে ধাবমান। তিনিও রিভলভার বার করলেন, আমিও।

উত্তেজনায় আর একটা মস্ত বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তখন আমাদের খুব কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছে নেকড়েদের ভীষণ চিৎকার। তাদের ঘন ঘন চিৎকারে থর-থর করে কাঁপছে যেন সারা বন। তারা এসে পড়ল বলে।

খানিকটা ছুটেই আকাশে শঙ্কিত চক্ষু তুলে দেখলুম, চোখের আড়ালে নেমে গিয়েছে তখন সূর্যের আধখানা।

আমাদের ওইভাবে দৌড়ে যেতে দেখে বেদের দল দাঁড়িয়ে পড়ল। বাহকরাও সিন্দুকটা নামিয়ে রাখলে মাটির উপরে। তারপর লক্ষ করলুম, তাদের প্রত্যেকেরই হাতে কী যেন চকচক করে উঠছে। অস্ত্র?

তাদের দলে লোক ছিল প্রায় পনেরো-ষোলো। আমরা মোটে দুজন দেখে তাদের সাহস বেড়ে উঠল। তারাও বেগে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

যখন আমরা তাদের কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে এসে পড়েছি, অবিনাশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'রিভলভার ছুড়ুন বিনয়বাবু, রিভলভার ছুড়ুন!' দৌড়তে দৌড়তেই রিভলভার তুলে তিনি ঘোড়া টিপতে লাগলেন। আমিও ছুড়তে লাগলুম রিভলভার।

তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হতভম্বের মতো। একটা বেদে গুলি খেয়ে মাটির উপরে দড়াম করে পড়ে গেল এবং তারপরে আবার দাঁড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল ওপাশের গভীর বনের দিকে। আর একটা বেদেও গুলি খেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর অন্য বেদেগুলোরও সাহস গেল একেবারে উবে। তারা সকলেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো যে যেদিকে পারলে দৌড় মেরে সরে পড়ল। পরমুহূর্তে আমরা গিয়ে দাঁড়ালুম সেই সিন্দুকটার পাশে।

রিভলভারটা বাম হাতে নিয়ে অবিনাশবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আগ্নেয়াস্ত্রে পিশাচ মরে না। পিশাচ বধ করতে গেলে তার মুণ্ডটাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে হবে দেহ থেকে!' ডান হাত দিয়ে কোমরে ঝোলানো ভোজালিখানা তিনি টেনে বার করে ফেললেন।

সেই সঙিন মুহূর্তেও আমার দৃষ্টি তখন আকৃষ্ট হল অন্য একদিকে। পথের ওপারে ছিল একটা মাঝারি আকারের এবড়ো-খেবড়ো মাঠ এবং তারই প্রান্তে ছিল গভীর জঙ্গল। আড়ষ্ট নেত্রে দেখলুম, সেই জঙ্গলের ঝোপঝাপের ভিতর থেকে লাফ মেরে মাঠের উপরে এসে আবির্ভূত হচ্ছে নেকড়ের পর নেকড়ে। তারা প্রত্যেকেই ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকেই।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'অবিনাশবাবু! নেকড়েরা এসে পড়েছে!'

অবিনাশবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আসুক নেকড়ের দল! পিশাচকে মেরে তবে আমরা মরব! ওই দেখুন, সূর্য ডুবে গিয়েছে, আর সময় নেই।'

তাঁর মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরুতেই সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল সশব্দে। তারপর স্তম্ভিত চক্ষে দেখলুম, সিন্দুকের ভিতরে সিধে হয়ে বসে আছে জাগ্রত রুদ্রপ্রতাপের ভয়াল মূর্তি। তার দুই চক্ষে জ্বলছে হিংস্র দৃষ্টি এবং ওষ্ঠাধরে মাখানো রয়েছে তীব্র বিদ্রূপের হাস্য।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে লাফ মেরে সিন্দুকের বাইরে এসে পড়ল। তারপর বিকট অট্টহাস্য করে সচিৎকারে বললে, 'ওরে আয় রে, আয় রে আয়, আমার বনের সন্তানেরা! তোদের সামনে এসেছে বলির পশু, দৌড়ে আয় রে, দৌড়ে আয়! তোদের উপবাস ভঙ্গ কর, নিবারণ কর তোদের উদরের ক্ষুধা!'

প্রায় সারা মাঠটাই তখন যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি নেকড়ের পর নেকড়ে—চক্ষু তাদের রক্তবর্ণ, হাঁ-করা মুখ তাদের দন্ত-কণ্টকিত, কণ্ঠ তাদের ভৈরব গর্জনে পরিপূর্ণ।

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন রুদ্রপ্রতাপের পিছন দিকে। প্রথমটা তিনিও থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন

রুদ্রপ্রতাপের উপরে এবং চোখের পলক পড়বার আগেই দুই দুই বার চালনা করলেন তাঁর হাতের ভোজালিখানা।

একটা প্রচণ্ড আকাশ-ফাটানো বিকট চিৎকার, এবং তারপরই একদিকে ছিটকে পড়ল রুদ্রপ্রতাপের মুণ্ডটা এবং আর একদিকে ধরাশায়ী হল তার মুণ্ডহীন দেহটা।

চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। নেকড়েদেরও চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখি, নেকড়ের দল আবার ছুটে ফিরে যাচ্ছে মাঠের উপরকার নিবিড় অরণ্যের দিকে। রুদ্রপ্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি ফুরিয়ে গেল তার অপার্থিব মন্ত্রশক্তি? এতক্ষণ তারই ইচ্ছাশক্তি কি চালনা করছিল ওই নেকড়েগুলোকে?

হঠাৎ অবিনাশবাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'দেখুন বিনয়বাবু, এদিকে ফিরে দেখুন!'

ফিরে দেখলুম এক অভাবিত ব্যাপার। রুদ্রপ্রতাপের মুণ্ডহীন দেহ এবং দেহহীন মুণ্ড আশ্চর্য রূপান্তর গ্রহণ করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সেখানে পড়ে রইল কেবল একটা বড়ো ও একটা ছোটো জীর্ণ ধূলির পুঞ্জ। যে অভিশপ্ত দুর্দান্ত আত্মা এই রক্ত-মাংসে গড়া দেহটাকে অস্বাভাবিক রূপে জীবন্ত করে রেখেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, আজ সেই আত্মার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই নশ্বর দেহটা আবার ফিরে পেয়েছে তার স্বাভাবিক অবস্থা। ধুলায় গড়া নশ্বর দেহ আবার পরিণত হয়েছে ধূলিপুঞ্জে।

অবিনাশবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ দিন বিনয়বাবু! এতকাল পরে রুদ্রপ্রতাপের শাপমুক্ত দেহের আবার সদ্গতি হল। আর সে জাগবে না।'

খানিকক্ষণ আমরা দুইজনেই ভারাক্রান্ত মনে সেইখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলুম নীরবে। —অরণ্যের উপরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকারের যবনিকা, কিন্তু সে অন্ধকারকে আজ যেন মনে হল স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর।

বিভীষণের জাগরণ

প্রথম

আর্তনাদ ও সিংহনাদ

রাত দুপুর।

একে 'ব্ল্যাক আউট'-এর মহিমায় মানুষের চক্ষু হয়েছে প্রায় অন্ধ, তার উপরে চারিদিকে ঝরছে ঘোর অমাবস্যার তিমির-ঝরণা!

কলকাতার রাস্তায় একটিমাত্র গ্যাসের আলো জ্বলছে না এবং কোথাও নেই একখানি মাত্র দোকানের এতটুকু বাতির শিখা। মাথার উপরে দীপ্তনেত্রে জেগে আছে বটে লক্ষ লক্ষ তারকা, কিন্তু আকাশের অস্তিত্ব ছাড়া মানুষকে তারা আর কিছুই দেখাতে পারছে না। অনায়াসেই বলা চলে, অন্ধকারের অতলে ডুবে কলকাতা এখন মরে কালো পাথরের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

কেবল কোনও কোনও বাড়ির বন্ধ জানলার পিছন থেকে মাঝে মাঝে জাগছে ক্ষুধিত শিশুর কান্না, পথের মোড়ে মোড়ে এক আধখানা শোনা যাচ্ছে পাহারাওয়ালার পদশব্দ এবং হয়তো বা দূর হতে থেকে থেকে ভেসে আসছে কুকুরদের ঝগড়ার শব্দ—ব্যস, এছাড়া জীবনের আর কোনও লক্ষণই নেই।

শহরের উত্তরাঞ্চলের একটি পথকে হঠাৎ জাগ্রত করে তুললে দুই পথিকের বাধো বাধো জুতোর শব্দ। তারা অতি সাবধানে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে পথ চলছিল দৃষ্টিহীনের মতো। তাদের নাম হচ্ছে, হেমন্ত ও রবীন—পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিশ্চয়ই নতুন করে তাদের পরিচয় আর দিতে হবে না।

এই পূর্ণ ব্ল্যাক-আউট-এর সময়ে চোর-ডাকাত ছাড়া কলকাতার কোনও ভদ্র বাসিন্দাই পথে পা বাড়াতে সাহস করে না। কিন্তু শখের ডিটেকটিভ হেমন্ত ও তার সহকর্মী বন্ধু রবীন কলকাতার ছেলে হলেও, বহুকাল পরে বিদেশ থেকে সম্প্রতি শহরে ফিরে এসেছে, কাজেই এখনকার কলকাতার হালচাল তাদের ভাল করে জানা ছিল না।

তারা একটি বিচিত্র কেস হাতে নিয়ে অপরাধীর সন্ধানে গিয়েছিল পূর্ব আফ্রিকায়। মামলার কিনারা করবার পরই বাধল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এবারকার মহাযুদ্ধ যে কতখানি গুরুতর হয়ে উঠবে, সেটা কেউই তখন অনুমান করে উঠতে পারেনি। কাজেই রবীন যখন প্রস্তাব করলে যে, "আফ্রিকার এত দূরে যখন এসেছি, তখন গোটাকয়েক সিংহ, হিপো, গণ্ডার আর গরিলার সঙ্গে আলাপ না জমিয়ে কলকাতায় ফেরা হতে পারে না", তখন হেমন্ত সহজেই রাজি হয়ে গেল।

কিছুকাল তারা ঘুরে বেড়ালে আফ্রিকার বনে বনে। তাদের হাতের বন্দুক যে কত হিংস্র জীবকে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলে এবং তাদের বিস্মিত চক্ষু যে কত অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নানাজাতের অসভ্য মানুষ দর্শন করলে, চিত্তাকর্ষক হলেও তার বিবরণ দেবার জায়গা নেই।

তারপর তারা সভ্য জগতে ফিরে এসে দেখলে, বর্তমান যুদ্ধ হয়ে উঠেছে পৃথিবীব্যাপী সর্বজাতির যুদ্ধ। এমনকি, তাদের প্রিয় স্বদেশের উপরেও পড়েছে যুদ্ধদেবতার ক্রুদ্ধদৃষ্টি। তখন তারা তাড়াতাড়ি দেশের দিকে যাত্রা করলে।

কাল তারা কলকাতায় এসেছে। আজ গিয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর মুখে তারা শুনলে দেশের খবর এবং তাদের মুখে বন্ধু শুনলেন আফ্রিকার শিকার কাহিনী। দুই পক্ষই পরস্পরের কথা শুনতে ব্যস্ত, ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা কখন যে বারটার ঘর পেরিয়ে গেল সেটা কারুর খেয়ালেই এল না।

হঠাৎ বন্ধু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "কি বিপদ, রাত বারটা বেজে গেছে যে। হেমন্ত, রবীন, আজ আর তোমাদের বাড়ি যাওয়া চলবে না,—পথ একেবারে অন্ধকার।"

হেমন্ত বললে, "এতকাল পরে দেশে ফিরে এসে নিজের বাড়িকে ভারি মিষ্টি লাগছে। হোক পথ অন্ধকার, বাড়িতে আমি যাবই।"

রবীন বললে, "আমরা কলকাতার ছেলে, সারা শহর আমাদের নখদর্পণে। দুই চোখ মুদেও আমরা বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে পারব।"

বন্ধুর মানা তারা মানলে না, তখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু দু'চার পা হেঁটেই রাস্তার অবস্থা দেখে তারা রীতিমতো দমে গেল। এতটা কল্পনা করা অসম্ভব। এ হচ্ছে, অচেনা কলকাতা,—রবীনের 'নখদর্পণে' এর কিছুই দেখা যায় না।

মিনিট চার চলতে না চলতেই তারা বার কয়েক হোঁচট খেলে। পঞ্চম মিনিটে রবীন সটান লম্বমান হল ফুটপাতের উপর নিদ্রিত প্রকাণ্ড একটা কালো ষাঁড়ের পিঠের উপরে। ষাঁড়টা 'এ কি হল' ভেবে চমকে ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং রবীন 'বুঝি গুঁতো খেলুম' ভেবে তার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল একগাদা গোবরে মুখ গুঁজড়ে! ইতিমধ্যে হেমন্ত একটা কুকুরের ল্যাজ মাড়িয়ে দিয়ে, কামড় খাবার ভয়ে মেরেছে মস্ত এক লাফ এবং পরমুহূর্তেই অদৃশ্য কলা বা আমের খোসায় পা হড়কে করেছে কঠিন ভূতলে শয়ন!

রবীন মুখ থেকে গোবরের দুর্গন্ধ প্রলেপ চাঁচতে চাঁচতে ম্রিয়মাণ স্বরে বললে, "ভাই হেমন্ত, বাড়িতে যাচ্ছি বটে, কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কি?"

হেমন্ত গায়ের ধুলো-কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, "ভাই রবীন, আমারও সেই সন্দেহ হচ্ছে! কে জানত কলকাতার অন্ধকার এমন ভয়াবহ হতে পারে!"

তারপর তারা সন্তর্পণে বাড়ির দেওয়াল ধরে ধরে এগুতে লাগল ধীরে ধীরে।

খানিক পরে হেমন্ত বললে, "আন্দাজে বোধ হচ্ছে, পাশের গলিটাই কানাইবাবুর লেন।"

রবীন বললে, "ওটা বলাইবাবুর স্ট্রিট হলেও আশ্চর্য হব না। আমার চোখ ভরে ঝরছে খালি আলকাতরার বৃষ্টি!"

—"এটা যদি কানাইবাবুর লেন হয়, তাহলে এখান থেকে আমাদের বাড়ি আছে এক মাইল দূরে!"

—"এক মাইল? এই অন্ধকারে এক মাইল মানে, বিশ মাইলের ধাক্কা! বাপ, এ অন্ধকার যেন জীবন্ত বিভীষিকার মতো!"

হঠাৎ কাছ থেকে হুমকি জাগল—"এই! কোন হায় রে!" সুমিষ্ট সম্ভাষণ শুনেই বোঝা গেল, কোনও সজাগ লালপাগড়ির টনক নড়েছে!

হেমন্ত বললে, "আমরা ভদ্রলোকের ছেলে বাবা, অন্ধকারে হয়ে পড়েছি অন্ধ নাচারের মতো!"

পাহারাওয়ালা বললে, "ঝুট বাত! তোম লোক কো থানামে যানে হোগা!"

হেমন্ত বললে, "বেশ, তাই চলো বাবা! এ অন্ধকারের চেয়ে, থানা ঢের ভাল! হে লালপাগড়ি, আমাদের পথ দেখাও।"

পাহারাওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই খানিক তফাৎ থেকে জাগল সে কী বিকট ও ভয়ঙ্কর কোলাহল! রাত্রির তিমিরাবগুণ্ঠন ভেদ করে ভেসে আসতে লাগল বহু কণ্ঠের আর্তনাদের পর আর্তনাদ, দুড়ুম দড়াম দড়াম শব্দ এবং বর্ণনাতীত ও অমানুষিক গর্জনের পর গর্জন—যা শুনলে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং হৃদয় হয়ে যায় স্তম্ভিত!

দ্রুত পদধ্বনি শুনে হেমন্ত ও রবীন বুঝলে, পাহারাওয়ালা বেগে ছুটল—যেদিক থেকে কোলাহল ভেসে আসছে সেইদিকে।

রবীন অভিভূত কণ্ঠে বললে, "হেমন্ত, ভাই! ও কী গর্জন! ও যে কলকাতার মুখে আফ্রিকার হুহুঙ্কার!"

হেমন্ত বিস্ময়রুদ্ধ স্বরে বললে, "হ্যাঁ রবীন, হ্যাঁ! ও যে সিংহের গর্জন!"

রবীন বললে, "কিন্তু দারুণ ভয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে কারা? অমন দুড়ুম দড়াম শব্দ কিসের? আর এখানে সিংহের আবির্ভাবই বা হবে কেমন করে?"

আর্ত চিৎকার ও দুড়ুম দড়াম শব্দ কমে এল, কিন্তু সিংহনাদ তখনও থামল না।

কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে হেমন্ত ও রবীনের মনে হল, তারা দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিকার ভীষণ জঙ্গলে—যেখানে নিশীথ রাতের স্তব্ধ বুক ও গহন বনের বিজন মাটি কাঁপিয়ে জাগে রক্তলোলুপ পশুরাজ সিংহের কণ্ঠে মুহুর্মুহু মেঘধ্বনির মতো গুরুগম্ভীর গর্জন!

আরও মিনিটখানেক পরে থেমে গেল সিংহনাদ।

রবীন বললে, "এ পাড়ার কোনও ধনী হয়তো শখ করে সিংহ পুষেছে, আর সেই সিংহটা—" হঠাৎ আবার বিকট আর্তনাদ ও সিংহনাদ শুনে সে সচমকে মুখ বন্ধ করলে!

হেমন্ত উত্তেজিত স্বরে বললে, "রবীন, রবীন, এবারে চিৎকার যে খুব কাছেই এগিয়ে এসেছে!"

রবীন সভয়ে বলে উঠল, "সিংহটা নিশ্চয় খাঁচা ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়েছে—"

—"খালি তাই নয়, সে এদিকেই ছুটে আসছে, রবীন, আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! শিগগির পালিয়ে এসো—শিগগির!"

কিন্তু তারা পালাবারও সময় পেলে না, অন্ধকারের ভিতর থেকে ঝড়ের বেগে হুড়মুড় করে তাদের উপরে এসে পড়ল বিরাট একটা তুষারশীতল দেহ—হেমন্ত ও রবীন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দুইদিকে ছিটকে পড়ে ভূতলশায়ী হল এবং পরমুহূর্তেই কানফাটানো সিংহনাদেই ফুটল খল খল খল অট্টহাস্য আর সঙ্গে সঙ্গে বন্য দুর্গন্ধে চারিদিক হয়ে উঠল পরিপূর্ণ! তারপরেই কার ভারি ভারি দ্রুত পদ মাটি কাঁপাতে কাঁপাতে দূরে চলে গেল!

রবীন উঠে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "সিংহের কণ্ঠে মানুষের অট্টহাস্য। একি অসম্ভব ব্যাপার!"

হেমন্তও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে, "রবীন, যে জীবটা এখান দিয়ে ছুটে চলে গেল সে সিংহ নয়! অন্ধকারের ভিতরে মাটি থেকে প্রায় পনের ষোল ফুট উঁচুতে আমি তার জ্বলন্ত চক্ষু দু'টো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি! জীবটা অন্তত হাতির সমান উঁচু!"

রবীন অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বললে, "তুমি কী বলছ হেমন্ত? সিংহের মতন গর্জন করতে আর মানুষের মতন হাসতে পারে, অথচ হাতির মতন উঁচু—এমন কোনও জীবই পৃথিবীতে কখনও ছিল না, এখনও নেই।"

হেমন্ত বললে, "সে কথা আমিও জানি রবীন। কিন্তু নিজের চোখ-কানকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না,। আশ্চর্য কাণ্ড, আজকের অন্ধকার কি অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে চায়?"

—"না হেমন্ত, আজকের অন্ধকারে আমাদেরই মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। যে দেহটার ধাক্কায় আমরা গড়াগড়ি খেলুম, তার ভয়াল স্পর্শটা অনুভব করতে পেরেছ কি? জ্যান্ত দেহ মড়ার চেয়ে ঠাণ্ডা! এ কি অসম্ভব ব্যাপার! তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ি এসো!" তারা আর অন্ধকার মানলে না, জোরে পা চালিয়ে দিলে। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে হল না—হঠাৎ পথের ধারে বাধা পেয়ে হেমন্ত আবার হল প্রপাতধরণীতলে!

রবীন বললে, "কি মুশকিল, আছাড় খেয়ে খেয়ে আজ যে আমাদের গতর চূর্ণ হয়ে যাবে দেখছি।"

হেমন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "রবীন, এখানে পথের উপরে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ।" বলেই সে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে।

দেশলাইয়ের কাঠির পর কাঠি জ্বেলে দেখা গেল, এক বীভৎস দৃশ্য! রক্তধারার মাঝখানে পাহারাওয়ালার পোশাক পরা একটা মুণ্ডহীন নরদেহ পথের উপরে দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এবং তার ছিন্নমুণ্ডটাও ছিটকে পড়ে আছে দেহ থেকে আট-দশ হাত তফাতে!

রবীন শিউরে উঠে বললে, "নিশ্চয়ই এই হতভাগ্য একটু আগে আমাদের সঙ্গে কথা কয়েছিল!"

হেমন্ত বললে, "এর কাঁধের আর দেহের দিকে তাকিয়ে দেখো! কোনও অস্ত্র দিয়ে এর মুণ্ডটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি—এর কাঁধের আর দেহের উপর রয়েছে বড় বড় দাঁত আর নখের চিহ্ন।"

এমন সময় পেছনে বেজে উঠল ঘনঘন মোটরের ভেঁপু!

তারা দু'জনেই চমকে ফিরে দেখলে, পথের অন্ধকারকে তীব্র 'হেডলাইট'-এর উজ্জ্বল আলোতে ভাসিয়ে দিয়ে একখানা মোটর গাড়ি বেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে!

দ্বিতীয়

টেলিফোনে সিংহনাদ

মোটরখানা হুড়মুড় করে একেবারে কাছে এসে পড়ল—তাদের চাপা দেয় আর কি!

হেডলাইট-এর তীব্রতায় হেমন্ত ও রবীনের চোখ তখন অন্ধ হয়ে গেছে। কোনওরকমে নিজেদের সামলে নিয়ে তারা পথের পাশের দিকে লাফিয়ে পড়ল! সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িখানাও।

গাড়ির ভেতর থেকে হুমকি জাগল—"কে তোমরা? এত রাতে, এই অন্ধকারে এখানে কি করছ?"

হেমন্ত গাড়ির কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে, "কে কথা কয়? আওয়াজটা যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে!"

—"আরে, আরে, একি! হেমন্তবাবু যে! আপনি না পগার পার হয়ে আফ্রিকায় লম্বা দিয়েছিলেন?"

হেমন্ত হেসে বললে, "পগার নয় ভূপতিবাবু, আমরা সমুদ্র পার হয়েছিলুম।"

—"এই উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ আর কলের জাহাজের যুগে সমুদ্র হয়ে পড়েছে পগারেরই মতন ছোট্ট। পার হতে কতক্ষণই বা লাগে।...কিন্তু সে কথা যাক! কবে এলেন? এখানে কি করছেন?"

—"আজই এসেছি। বন্ধুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলুম। কিন্তু পথের মাঝে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি।"

—"স্তম্ভিত হয়েছেন! কেন?"

—"এখানে শুনেছি, মানুষের কণ্ঠে আর্তনাদ আর মানুষের কণ্ঠে সিংহনাদ।"

—"মানে?" ভূপতিবাবু তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন! যাঁরা "রাত্রির যাত্রী" পড়েছেন, তাঁদের কাছে ইনস্পেক্টার ভূপতিবাবুর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

হেমন্ত বললে, "সঙ্গে টর্চ আছে তো? ওই দিকে আলো ফেলে দেখুন। মানেটা বুঝতে দেরি হবে না"।

ভূপতিবাবুর হাতের টর্চ অন্ধকারকে ছ্যাঁদা করে টেনে দিলে অগ্নিশিখার দীর্ঘ রেখা। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল পাহারাওয়ালার মুণ্ডহীন দেহ এবং দেহহীন মুণ্ড!

ভূপতিবাবু হতভম্ব। মোটর থেকে পুলিসের অন্যান্য লোকেরাও টপাটপ নেমে পড়ল।

হেমন্ত বললে, "ভূপতিবাবু, এত সহজে হতভম্ব হবেন না। লাশের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখুন!"

মোটর ফিরিয়ে হেডলাইট-এর শিখা ফেলা হল মৃতদেহের উপর।

ভূপতিবাবু দেহটা খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তাঁর হতভম্ব ভাবটা আরও বেড়ে উঠল। তিনি অতিশয় হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

হেমন্ত বললে, "লাশের ওপরে থাবা আর নখের চিহ্ন দেখছেন?"

—"দেখছি তো।"

—"পাহারাওয়ালা মারা পড়েছে কোনও হিংস্র জন্তুর আক্রমণে।"

—"কলকাতা শহরে হিংস্র জন্তু!"

—"অসম্ভব কথা বটে। কিন্তু আপাতত তা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।"

—"কিন্তু, কি জন্তু?"

—"জানি না। যদিও আমি সিংহনাদ শুনেছি।"

—"সিংহ? বলেন কি মশাই?"

—"হ্যাঁ, আমি সিংহনাদ শুনেছি বটে—কিন্তু মানুষের কণ্ঠে।"

—"এ কি হেঁয়ালি, বাবা!"

—"একটা জীব অন্ধকারে আমাদের পাশ দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলে গেল। সেটা হাতির মতন উঁচু।"

ভূপতিবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, "আজব কথা নম্বর এক হচ্ছে, কলকাতা শহরে সিংহ। নম্বর দুই হচ্ছে, সিংহ চিৎকার আর হাস্য করে—মানুষের কণ্ঠস্বরে। নম্বর তিন হচ্ছে, সিংহটা হাতির সমান উঁচু। হেমন্তবাবু, এই কি রূপকথা বলবার সময়?"

হেমন্ত জবাব দিলে না, পথের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হেডলাইট-এর মহিমায় পথের খানিকটা দিনের বেলার চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

ভূপতিবাবু ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, "কি ব্যাপার, হেমন্তবাবু? এইবারে পথের ধুলোর ভিতর থেকে আপনি কি সিংহটাকে পুনরাবিষ্কার করতে চান?"

—"না ভূপতিবাবু, পথের ধূলোয় আমি আবিষ্কার করেছি এক আশ্চর্য মানুষের পদচিহ্ন! আপনার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—আজব কথা নম্বর চার।"

—"কই, দেখি!"

—"এই দেখুন—পরে পরে কতকগুলো পায়ের দাগ! প্রত্যেক পদচিহ্ন লম্বায় প্রায় আঠার-উনিশ ইঞ্চি!"

ভূপতিবাবুর চোখ দু'টো যেন ঠিকরে পড়বার মতো হল।

সাব-ইনস্পেক্টর পতিতপাবন এসেছিল ভূপতিবাবুর সঙ্গে। সে বললে, "স্যর, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা এদিকে এসেছি জরুরি ফোন পেয়ে!"

ভূপতিবাবু চমকে উঠে বললেন, "ঠিক বলেছ। কিন্তু কি করব ভাই, পথের মাঝে যা দেখছি আর যা শুনছি, তাতে যে দুনিয়াকেই ভুলে যেতে হয়। এখন কোন দিক সামলাই বলো দেখি?"

পতিত বললে, "আপনি আর একটা মস্ত কথাও ভুলে যাচ্ছেন। টেলিফোনেও আপনি সিংহের গর্জন শুনেছেন!"

ভূপতিবাবু লম্ফত্যাগ করে বললেন, "ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ! এখানেও সিংহনাদ, টেলিফোনেও সিংহনাদ! আমি এখন কি করব? কোন সিংহনাদের পিছনে ধাবিত হব?"

পতিত বললে, "স্যর, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

—"হচ্ছে নাকি? মানে?"

—"হ্যাঁ স্যর, হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, থানার টেলিফোনে আর এই রাস্তায় গর্জন করেছে একই সিংহ!"

—"ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ! পতিত, তোমাকে ধন্যবাদ!"

হেমন্ত বললে, "টেলিফোনে সিংহনাদ ব্যাপারটা বুঝলুম না!"

—"আরে মশাই, আমিও একটু-আধটু যা বুঝেছিলুম, আপনার কথা শুনে তাও গুলিয়ে গিয়েছে! ব্যাপার কি জানেন? দিব্যি শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম, হঠাৎ ফোনে এল ডাক। রিসিভারটা

তুলে নিয়েই শুনলুম, কে একজন লোক বিষম ভয় পেয়ে বলছে—'আপনারা শীঘ্র আসুন—আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে—আমি দশ নম্বর কানাইবাবুর লেনে থাকি...', তারপর হঠাৎ তার স্বর থেমে গেল, আমার কানে এল দুমদাম আওয়াজ আর একটা সিংহের ভীষণ গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ। তারপর সব চুপ!"

হেমন্ত বললে, "আপনি কি দলবল নিয়ে সেইখানেই যাচ্ছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু যেতে যেতে পথে এই কাণ্ড!"

—"ভূপতিবাবু, ঘটনাস্থল বোধহয় খুব কাছেই। মানুষের আর্তনাদ, সিংহের গর্জন, দুড়ুম দড়াম শব্দ আমরাও শুনেছি—আর বেশিদূর থেকেও নয়।"

—"এইটেই তো কানাইবাবুর লেন। খানিক তফাতে এতক্ষণ পরে কতকগুলো আলো দেখা যাচ্ছে না?"

পতিত বললে, "হ্যাঁ স্যর, অনেক লোক ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে! বোধহয় এতক্ষণ ওরা ভয়ে চুপটি মেরে লুকিয়েছিল!"

—"ঠিক বলেছ পতিত, ঠিক বলেছ! কিন্তু ভয়ের আর অপরাধ কি বল? কলকাতায় সিংহের তর্জন-গর্জন শুনলে হিটলার-মুসোলিনিও ভয়ে ভড়কে যেতেন! তার ওপরে হেমন্তবাবুর কথায় আমার পিলে চমকে গেছে। হাতি নয়, অথচ হাতির মতো উঁচু জানোয়ার—যা নয়, তাই। সেটাও না হয় গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিলুম, কিন্তু, এগুলো কি বাবা? আঠার-উনিশ ইঞ্চি লম্বা মানুষের পায়ের দাগ! স্বচক্ষে দেখছি, এগুলো তো উড়িয়ে দিলেও উড়ে যাবে না? আচ্ছা, এসব নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে—এখন আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হওয়া যাক। আসুন হেমন্তবাবু, আপনিও আসুন।"

তৃতীয়

উন্মত্ত প্রেতাত্মার অট্টহাসি

কানাইবাবুর লেনের দশ নম্বর। মস্ত বড় বাড়ি—প্রাসাদ বললেও চলে। চারিদিকে রেলিং ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান। বড় বড় ফুল-ফলের গাছ সবুজ ফুলওয়ারী জমির উপরে ছায়ার আদর ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে! এখানে ওখানে সাজানো মর্মর মূর্তি। মাঝখানে একটি মার্বেল পাথরের ফোয়ারা—উপরে ভৃঙ্গার হাতে করে একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে সকৌতুকে জল ঢালছে নিচের দিকে। বাড়ির পিছনদিকে একটি মাঝারি পুকুর।

কানাইবাবুর লেনের মতন একটা গলির ভিতরে এ রকম অট্টালিকা—দৃষ্টিকে সচকিত করে তোলে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো। বাড়ির মালিক যে লক্ষপতি, সেটা বুঝতেও বিলম্ব হয় না।

বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে কোলাহল সৃষ্টি করেছে বিপুল এক জনতা। অনেকের হাতে লণ্ঠন—তারা এতটা উত্তেজিত হয়েছে যে ব্ল্যাক-আউট-এর আইন ভঙ্গ করতেও ভীত নয়।

পুলিস দেখে লোকেরা পথ ছেড়ে দিলে।

পুলিসের সঙ্গে হেমন্ত ও রবীন বাড়ির সামনে এসে দেখলে, ফটকের লোহার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার লোহার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, বাগানের মাটির উপরে

একটা মানুষের মূর্তি অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে। টর্চ-এর আলো ফেলে বোঝা গেল, লোকটা মৃত—তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মাটির উপরেও রক্তের ধারা।

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন মাতব্বর গোছের লোক বেছে নিয়ে ভূপতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নাম কি?"

—"শ্রী সুদর্শন বিশ্বাস।"

—"বাড়ি?"

—"সামনেই।"

—"আপনি কিছু দেখেছেন?"

—"দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না। তবে শুনেছি যথেষ্ট।"

—"মানে?"

—"এই ব্ল্যাক-আউট-এর দিনে মানুষের চোখ তো অন্ধেরই সামিল। তবে গোলমাল যা শুনেছি তা আর বলবার নয়।"

—"আচ্ছা সুদর্শনবাবু, গোড়া থেকে সব গুছিয়ে বলুন দেখি!"

—"এই বাড়িখানা হচ্ছে, অবনীকান্ত রায়চৌধুরীর। অবনীবাবু পূর্ববঙ্গের জমিদার, অনেক টাকার মালিক, এ পাড়ার মাথা বললেও চলে। তিনি খুব ধার্মিক, দিনরাত পুজো আর আহ্নিক নিয়ে থাকেন, প্রায়ই তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে মাঝে মাঝে প্রবাসেই মাসকয়েক কাটিয়ে আসেন। শুনেছি, বিন্ধ্যাচলের এক মহাতান্ত্রিক সন্ন্যাসী তাঁর গুরু। মাঝে মাঝে তাঁর গুরুভাইরাও এখানে এসে অতিথি হন, তাঁরাও সবাই সন্ন্যাসী। এই কালকেই তাঁর একদল সন্ন্যাসী-গুরুভাই এখানে এসেছিলেন।"

হেমন্ত বললে, "সন্ন্যাসীরা কি বাংলাদেশের লোক?"

—"হিন্দস্তানি।"

—"তারা এখন নেই?"

—"না। কাল এসে, কালকেই চলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি তারা আর কোনওবারে যায় না। দশ-পনেরদিন এইখানেই কাটিয়ে যায়।"

—"এবারে এত তাড়াতাড়ি গেল কেন, বলতে পারেন?"

—"না। তবে কাল দুপুরে বাড়ির ভেতর থেকে রাগারাগি আর বচসার সাড়া পেয়েছিলুম। বোধহয় অবনীবাবুর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের ঝগড়া হয়েছিল। ঝগড়ার কারণ জানি না।"

—"অবনীবাবুর বাড়ির ফটক ভিতর থেকে বন্ধ। কোনও লোকজনেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ কি?"

—"কেমন করে বলব? বোমার ভয়ে অবনীবাবু পরিবারবর্গকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি একলা নেই, বাড়িতে দাসদাসী দারোয়ান আছে অনেক। দেখতেই পাচ্ছেন, একজন দারোয়ান ওখানে মরে পড়ে আছে। কিন্তু বাকি লোকজনরা কোথায় গেল জানি না।"

ভূপতিবাবু বললেন, "বাড়ির ভিতরে ঢুকলেই সেটা বোঝা যাবে। তারপর আপনার কথা বলুন।"

—"রোজ রাতে ঘুমোবার আগে আমি খানিক পড়াশোনা করি। আজ রাত বারটা বাজবার পর আমি বই মুড়ে আলো নেবাবার উপক্রম করছি, হঠাৎ ভীষণ চিৎকার শুনে চমকে বারান্দায় ছুটে এলুম।"

—"ভীষণ চিৎকার?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কে যেন 'বাপ রে, মা রে, মেরে ফেললে রে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। বারান্দায় এসে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু অবনীবাবুর বাড়ির ভিতরে তখন কি যে হুলুস্থূল বেধেছিল, তা ভগবানই জানেন! একসঙ্গে অনেক লোকের আর্তনাদ, দুড়ুম দড়াম করে যেন দরজা-জানলা ভাঙার শব্দ, ছুটোছুটি হুটোপুটি, হুঙ্কারের পর হুঙ্কার—"

হেমন্ত বাধা দিয়ে বললে, "কি রকম হুঙ্কার?"

—"সেটা হুঙ্কার না বলে অন্য কিছু বললে আপনারা হয়তো আমাকে পাগল মনে করবেন।"

—"অসঙ্কোচে বলুন, আমরা কিছু মনে করব না।"

—"আমার মনে হল, বাড়ির ভিতরে যেন একটা ক্রুদ্ধ সিংহ ক্রমাগত গর্জন করছে! যদিও আমি বেশ জানি, এখানে সিংহের আবির্ভাব অসম্ভব।"

—"অবনীবাবু শখ করে সিংহ পোষেননি?"

—"পাগল! অবনীবাবুকে যে চেনে, সে জানে যে, তাঁর ও রকম অদ্ভুত শখ হতেই পারে না!"

—"তারপর?"

—"কিন্তু সিংহগর্জনের চেয়েও ভয়ানক আর একটা শব্দ আমি শুনেছি।"

—"কি?"

—"খলখল করে অট্টহাসি! সিংহের গর্জন যতবার থেমেছে, সেই প্রচণ্ড অট্টহাসি জেগে উঠেছে ততবার! সে এমন বিশ্রী হাসি যে, ভাবতেও আমার বুক এখনও শিউরে উঠছে! আপনারা হাসবেন না, কিন্তু আমার মনে হল, একটা প্রেতাত্মা যেন হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে গিয়ে অট্টহাস্য করছে!"

অন্য কেউ হাসলে না, কিন্তু ভূপতিবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "উন্মত্ত প্রেতাত্মার অট্টহাস্য! সুদর্শনবাবু, আপনার কল্পনাশক্তি আছে!"

সুদর্শন আহত কণ্ঠে বললেন, "ঘটনার সময়ে এখানে হাজির থাকলে আপনি কেমন করে হাসতেন, দেখতুম! আমি যা শুনেছি আর দেখেছি, কোনও কল্পনাশক্তিই তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না!"

—"তাহলে শুধু শোনা নয়, আপনি কিছু দেখেছেনও?"

—"এই অন্ধকারে ছায়া ছায়া যা দেখেছি তা না দেখারই সামিল।"

—"তবু কি দেখেছেন বলুন!"

—"আমি বলব না।"

—"মানে?"

—"আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমি ভুল দেখেছি। সুতরাং সে কথা বলে আপনার হাসিকে আর উৎসাহিত করতে চাই না।"

—"মশাই, পুলিসের কাছে কিছু লুকোবেন না। ভুল হোক, ঠিক হোক, বলুন।"

—"দেখছেন, ফটকের পাশে এই আধঘোমটা দেওয়া মিটমিটে গ্যাসের আলোতে এখানটায় অল্পস্বল্প নজর চলে? যদিও এরকম মর মর আলো গাঢ় অন্ধকারের চেয়েও খারাপ। কারণ, এমন আলোতেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। তার উপরে সেইসব তীব্র আর্তনাদ, বিকট হুঙ্কার আর অমানুষিক অট্টহাসি শুনে আমার অবস্থা হয়েছে তখন আচ্ছন্নের মতো। ধরতে গেলে তখন আমার ভাল করে দেখবার শক্তিই ছিল না। আমি যা দেখেছি বলে মনে করছি তা হচ্ছে একেবারেই অলৌকিক। অলৌকিক কথা বলে খোকাদের মন ভোলানো যায়, কিন্তু পুলিসের কাছে তার কোনও দামই নেই!"

—"তবু বলুন, আর আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।"

—"অবনীবাবুর বাড়ির সেই বিষম গোলমাল থামবার পরেই শুনলুম, ধুপধুপ করে মাটি-কাঁপানো পায়ের শব্দ—যেন একটা মত্ত মাতঙ্গ ধেয়ে আসছে। এত দূরে বারান্দার উপর থেকেও আমি সেই আশ্চর্য পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম! তারপরেই ফটকের কাছে এই না-আলো না-অন্ধকারে আবির্ভূত হল এক বিভীষণ ছায়ামূর্তি।"

—"ছায়ামূর্তি?"

—"ঠিক ছায়ামূর্তি নয়, তবে আবছা আলোয় তাকে দেখাচ্ছিল বিরাট একটা ছায়ার মতো!"

—"বিরাট মানে?"

—"বিরাট মানে মহাপ্রকাণ্ড। মূর্তিটা আমার চোখের সামনে জেগে ছিল এক কি দুই মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু তার মধ্যেই আমি দেখেছিলুম, মূর্তির মাথাটা ফটক ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। এই ফটকটা দেখুন। এটা চোদ্দ ফুটের চেয়ে কম উঁচু নয়। তাহলেই বুঝুন, মূর্তিটা বিরাট কিনা?"

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "সেটা কিসের মূর্তি?"

—"তা বলতে পারব না, স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে তো হল, সে একটা অতিকায় মানুষের দেহ, আর মানুষের মতোই সে সিধে হয়ে হাঁটছিল। কিন্তু তার দেহের উপর দিকটায় যেন কি একটা অবর্ণনীয়, অমানুষিক বিভীষিকার ভাব ছিল, আলোর অভাবে যা দেখতে পাইনি, কেবল অনুভব করতে পেরেছি।"

—"তারপর? তারপর?"

—"মূর্তিটা ঝড়ের মতো ছুটে এল, তারপর খুব সহজেই এই উঁচু ফটকটা এক লাফে পার হল—সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার তাকে যেন গ্রাস করে ফেললে—পথের উপরে শুনলুম কেবল ধুপধুপ শব্দ আর সিংহের গর্জন! ভয়ে অজ্ঞানের মতো হয়ে আমি কাঁপতে কাঁপতে বারান্দার উপর বসে পড়লুম!"

ভূপতিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ধ্যেৎ! যত সব বাজে কথা! ফটকের চেয়ে উঁচু মানুষ-দানব, আবার সিংহের গর্জন!"

হেমন্ত বললে, "সিংহের গর্জন আপনিও শুনেছেন, আমরাও শুনেছি। আর পথের উপরে সেই প্রকাণ্ড পদচিহ্ন কি আমরাও দেখিনি?"

ভূপতিবাবুর মুখ ম্লান হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, "চলুন চলুন, আর দেরি নয়! এইবারে বাড়ির ভিতরে ঢোকা যাক।"

চতুর্থ

ভূপতিবাবুর হৃৎকম্প

হেমন্ত শুধোলে, "ভূপতিবাবু, আপনি ফোনে শুনেছিলেন, দশ নম্বর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে! কিন্তু এখানে ডাকাত-টাকাতের কথা কেউ তো বললে না!"

ভূপতিবাবু বললেন, "ঠিক কথা! ও সুদর্শনবাবু! বলি, মস্ত বড় নরদানবের কথা চেপে যান, আদালতে ওকথা তুললে হাকিম আপনাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে। আসল ব্যাপারটা ভাঙুন দেখি! এখানে ক'জন ডাকাত হানা দিয়েছিল?"

সুদর্শন বললে, "ডাকাত! কোনও ডাকাতের সাড়া বা দেখা আমি পাইনি।"

—"লুকোবেন না দাদা, খুলেই বলুন না!"

—"না মশাই, ডাকাতের কথা আমি জানি না।"

—"এখানে আর কেউ ডাকাতদের দেখেছে?"

ভিড়ের কেউ বললে না—হ্যাঁ।

—"তবে চলুন বাড়ির ভেতরে।"

একজন কনস্টেবল লোহার রেলিং টপকে বাগানের ভিতরে গেল। ফটকের ভিতর থেকে তালা লাগানো ছিল। তালা ভেঙে ফটক খোলা হল।

প্রথমেই বাগানের মধ্যে দারোয়ানের যে মৃতদেহটা পড়েছিল সকলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মৃতদেহের অবস্থা দেখলে শিউরে ওঠে সর্বাঙ্গ। মাথার বেশির ভাগ উড়ে গিয়েছে, ঘাড়টা ভেঙে একদিকে লটকে পড়েছে—দেহের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে মাংস, খুলি ও মস্তিষ্কের রক্তাক্ত টুকরো।

হেমন্ত বললে, "দেখছেন, এখানেও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি? একে একবার মাত্র প্রচণ্ড, তীক্ষ্ণ আঘাত করা হয়েছে!"

ভূপতি বললেন, "কিন্তু কিসের আঘাত?"

—"আমার বিশ্বাস, বড় বড় নখওয়ালা থাবার।"

—"থাবার! গাঁজার ধোঁয়া আপনারও মাথায় ঢুকেছে? আপনিও ভাবছেন এখানে সিংহ-টিংহ কিছু এসেছিল?"

—"সিংহনাদ শুনেছি বটে, কিন্তু সিংহ আমি দেখিনি। এ লোকটা যে সিংহেরই থাবায় মরেছে, এমন কথাও আমি জোর করে বলছি না। তবে এর মৃত্যুর কারণ যে কোনও বিষম বলবান জন্তুর নখযুক্ত থাবা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

ভূপতি জবাব না দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। বাড়ি একেবারে স্তব্ধ—কোথাও একটি মাত্র আলোও জ্বলছে না। আলো জ্বালবার জন্যে পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পতিত বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

এত রাত্রে ঘুম ভাঙানোর জন্যে ভূপতি অদৃশ্য ডাকাতদের উদ্দেশ্যে বাছা বাছা গালাগালি বৃষ্টি করতে লাগলেন।

রবীন বললে, "ভাই হেমন্ত, আজকের সব ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে না?"

—"কেবল অদ্ভুত নয়, অপার্থিব। বাড়ির কেউ ফোনে পুলিসকে ডেকে বলেছে, এখানে ডাকাত পড়েছে। পাড়ার কেউ কিন্তু ডাকাতদের দেখেনি। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, এখানে কোনও অমানুষিক দানবের আবির্ভাব হয়েছিল। আমরা কিছু দেখিনি বটে, কিন্তু যে অট্টহাসি আর গর্জন শুনেছি, আর যে অদ্ভুত দেহের ধাক্কা খেয়েছি দুঃস্বপ্নেই তা স্বাভাবিক। সত্য কথা বলতে কি রবীন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমারও মাথা দস্তুরমতো গুলিয়ে গিয়েছে!"

বাড়ির ভিতরে ভীত ও বিস্মিত কণ্ঠের সাড়া জাগল।

পতিত দৌড়ে এসে উত্তেজিত স্বরে বললে, "স্যর, স্যর! শিগগির—শিগগির আসুন!"

ভূপতি পায়ে পায়ে পিছোতে পিছোতে বললেন, "মানে? শিগগির যাব কি রকম? না, আমি শিগগির যাব না! আগে কি হয়েছে বলো!"

—"স্যর, ভয়ঙ্কর ব্যাপার?"

ভূপতি তখনও পিছোচ্ছেন। দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, "সেই সিঙ্গিটা এখনও বাড়ির ভেতরে আছে? যাও পতিত, দৌড়ে যাও—শিগগির ফোন করে দাও—সেপাই আসুক, বন্দুক আনুক, একটা মেশিন গান আনলেও মন্দ হয় না! হেমন্তবাবু, রবীনবাবু, পালিয়ে আসুন মশাই, পালিয়ে আসুন!"

পতিত বললে, "পালাবেন না স্যর, পালাবেন না। সিঙ্গি-টিঙ্গি কিচ্ছু নেই! খালি লাশ!"

—"লাশ? মানে?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যর! লাশ—খালি লাশ—লাসের পর লাশ! বাড়ির উঠোনে লাশ, সিঁড়িতে লাশ, দালানে লাশ, ঘরে লাশ! বাড়িময় লাশ! ভীষণ হত্যাকাণ্ড! একটা লোকও বেঁচে নেই!"

ভূপতি ঢোঁক গিলতে গিলতে বললেন, "ও হেমন্তবাবু, উপায়?"

—"কিসের উপায়?"

—"আমার ভগ্নদূত কি খবর এনেছে শুনলেন তো? বাড়িময় লাশ—খালি লাস! এত লাশ আমি একলা সামলাতে পারব কেন? বড়সায়েবকে খবর পাঠাব নাকি?"

—"আগে নিজেরাই গিয়ে দেখি না, ব্যাপারটা কি?"

ভূপতি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঝাড়ু মারি এই পুলিসের কাজে! এখন পৃথিবীর সমস্ত ভদ্রলোক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে সুখস্বপ্ন দেখছে, আর আমাদের কিনা, মুদ্দাফরাসের মতো মড়ার গাদা ঘেঁটে মরতে হবে।...বাবা পতিত, তুমি দুই চক্ষু উন্মীলন করে আর একবার চারিদিক ভাল করে দেখে এসো তো! কে জানে সিঙ্গি ব্যাটা আনাচে কানাচে কোথাও ঘুপটি মেরে বসে আছে—শেষটা লাশ দেখতে গিয়ে কি, লাশ হব বাবা?"

—"না স্যর, আমি খুব ভাল করে দেখেছি—সিঙ্গি-ফিঙ্গি কিছু নেই, খালি লাশ! আমি গুণে দেখেছি—সবসুদ্ধু উনিশটা!"

—"ওরে-ব্বাপ রে, উনিশটা! ডাকাতের দল তাহলে রীতিমতো ভারি ছিল বলো? বাড়ির ভিতরে উনিশটা, বাগানে একটা আর রাস্তার আর একটা—কি সর্বনাশ, একরাত্রে এক জায়গায় একুশটা খুন! আমার যে হৃৎকম্প হচ্ছে!"

হেমন্ত অগ্রসর হয়ে বললে, "আসুন ভূপতিবাবু, আর সময় নষ্ট করবেন না।"

বাড়ির মধ্যে ঢুকে যে বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল, এখানে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে চাই না। পতিত একটুও অত্যুক্তি করেনি—বাড়ির সর্বত্র, ঘরে, দালানে, সোপানে, উঠানে বইছে যে রক্তগঙ্গার ঢেউ—কোথাও দারোয়ানের, কোথাও দাস বা দাসীর এবং কোথাও বা পড়ে আছে বাড়ির অন্যান্য লোকের মৃতদেহ! প্রত্যেক দেহই ভয়াবহ রূপে ক্ষতবিক্ষত এবং অনেক দেহেই মুণ্ডের চিহ্নমাত্র বর্তমান নেই।

ভূপতি আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, "এতকাল এ লাইনে আছি, কিন্তু এমন অভাবনীয় ব্যাপার কখনও দেখিনি। কখনও শুনিওনি।"

ত্রিতলের একটি ঘরে ঢুকে আবার যা দেখা গেল, তার চেয়ে ভীষণ দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। ঘরের মেঝেয় এমন জায়গা নেই যেখান দিয়ে বইছে না রক্তের প্রবাহ! কেবল কি মেঝেয়? দেওয়ালের—এমনকি ছাদেরও গায়ে গিয়ে লেগেছে রক্তের ফিনকি!

এবং গৃহতলে—এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মানুষের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! কোথাও হাত, কোথাও পা, কোথাও দেহের বিভিন্ন অংশ এবং কোথাও চূর্ণবিচূর্ণ মুণ্ড! চেনবারও জো নেই সেটা মানুষের মুণ্ড কিনা!

রবীন বলল, "আমার গা কেমন করছে, আমি চললুম।"

হেমন্ত বললে, "আমারও দেহ সুস্থ নয়। কিন্তু পালালে চলবে না ভাই, এই নৃশংস হত্যাকারীকে ধরতেই হবে!"

ঘরের মেঝের উপরে পড়েছিল টেলিফোনের তার ছেঁড়া রিসিভারটা। সেটা তুলে নিয়ে ভূপতি বললেন, "যাঁর খণ্ড দেহ এখানে পড়ে রয়েছে, তিনিই বোধহয় ফোনে থানায় খবর পাঠিয়েছিলেন।"

হেমন্ত বললে, "আর তিনি ফোন ছাড়বার আগেই হত্যাকারী এসে তাঁকে আক্রমণ করেছিল।"

সুদর্শনও সকলের সঙ্গে উপরে এসেছিল। সে বললে, "এটা অবনীবাবুর শোবার ঘর।"

ভূপতি বললেন, "বলেন কি, তাহলে এগুলো কি অবনীবাবুরই দেহের অংশ?"

হেমন্ত বললে, "খুব সম্ভব তাই। বোঝা যাচ্ছে, অবনীবাবুরই ওপরে হত্যাকারীর আক্রোশ ছিল বেশি! সে তাঁকে কেবল হত্যা করেনি, তাঁর দেহকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে। লক্ষ্য করে দেখুন, এখানেও কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি—অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন দাঁতে কামড়ে আর থাবা মেরে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে! আবার ওইদিকে দেখুন, রক্তের উপরে সেই এক হাতেরও চেয়ে লম্বা পায়ের ছাপ!"

পঞ্চম

অত্যাশ্চর্য হাত

ভূপতি অনেকক্ষণ আগে থেকেই মনে মনে ভড়কে গিয়েছিলেন, কেবল মুখে কিছু ভাঙেননি। কিন্তু এবারে আর সামলাতে পারলেন না, একখানা চেয়ারের উপরে ধপাস করে বসে পড়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "ভাই হেমন্তবাবু, একি সর্বনেশে মামলা আমাদের হাতে পড়ল!"

ঠিক সেই সময়ে বাইরের দালান থেকে পতিত ভয়ার্ত স্বরে বললে, "স্যর শিগগির আসুন!"

একসঙ্গে ভূপতির মুখ চোখ ভুরু ভুঁড়ি হাত পা সব চমকে উঠল! লাফ মেরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "ওই রে বাবা, সেরেছে। দরজা বন্ধ করে দিন—দরজা বন্ধ করে দিন!"

হেমন্ত বললে, "দরজা বন্ধ করব কেন?"

—"আরে মশাই, আগে দরজা বন্ধ করুন! পতিত নিশ্চয় সেই সিঙ্গিটাকে দেখেছে!"

শুনেই সুদর্শন রক্তময় মেঝের উপরে ঝাঁপ খেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল।

বাহির থেকে পতিত বললে, "সিঙ্গি-ফিঙ্গি কিছু নয় স্যর! সিঙ্গির দেখা পেলে আমি কি আর এখানে থাকি—আমি কি তেমনই কাঁচা ছেলে, স্যর!"

বুকের উপরে হাত দিয়ে বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ করবার চেষ্টা করে ভূপতি বললেন, "সিঙ্গি-ব্যাটা নয়? আঃ বাঁচলুম!...পতিত, তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি, ফের যদি তুমি 'শিগগির আসুন' বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠো, তাহলে তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব। 'শিগগির আসুন'! না, আমি শিগগির যাব না!"

—"তাহলে স্যর, আপনি ধীরে ধীরেই একবার এদিকে এলে ভাল হয়!"

—"কেন, ওদিকে আবার কি মাথামুণ্ডু আছে?"

—"মাথাও নয় স্যর, মুণ্ডুও নয়। খালি একখানা হাত!"

—"হাত! হাত মানে?"

—"হাত মানে, একখানা অত্যাশ্চর্য হাত!"

—"হাত আবার অত্যাশ্চর্য! নাঃ পতিত, তুমি আমাকে জ্বালালে দেখছি। চলুন হেমন্তবাবু, পতিতবাবুর হুকুম—অত্যাশ্চর্য হাত দেখতে হবে!"

কিন্তু দালানে এসে পতিতের অঙ্গুলি নির্দেশে দেওয়ালের উপর দিকে তাকিয়ে সত্য সত্যই ভূপতির চক্ষুস্থির হয়ে গেল!

মাটি থেকে প্রায় চোদ্দ পনের ফুট উঁচুতে, দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একখানা প্রকাণ্ড রক্তমাখা করতলের ছাপ। সে হাতখানা সাধারণ মানুষের হাতের চেয়ে প্রায় আড়াইগুণ বড়!

ঘর্মাক্ত কপাল মুছতে মুছতে ভূপতি ভয়ে ভয়ে কেবল বললেন, "বাপ!"

হেমন্ত বললে, "যে দেহের ওই হাত, সে দেহটা কত উঁচু, কল্পনা করতে পারেন ভূপতিবাবু?"

ভূপতি হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে করুণস্বরে বললেন, "না। এসব দেখেশুনে আমি কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।"

সুদর্শন বললে, "এখন কি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে?"

—"না বলবার শক্তি আমার নেই।"

হেমন্ত বললে, "হাতের আঙুলগুলোর ডগার দিকে তাকিয়ে দেখুন। প্রত্যেক আঙুলের ডগায় একটা করে রক্তের আঁচড়ের মতো রেখা রয়েছে দেখছেন? রেখাগুলোর প্রত্যেকটাও প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা।"

—"দেখছি বটে। কী ওগুলো?"

—"নখের দাগ!"

—"বাস রে বাস! আক্কেল-গুড়ুম বলে একটা কথা শুনেছি, আজ তার মর্ম বুঝতে পারলুম।"

—"কিন্তু বাড়িতে ডাকাত পড়েছে বলে ফোন করা হয়েছিল, তাদের তো কোনও চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না।"

—"মশাই, যা দেখছি তাই-ই কি যথেষ্ট নয়? এর ওপরেও ডাকাতদের চিহ্ন দেখতে চান? বোঝার ওপরে শাকের আঁটি!"

—"কিন্তু ও কথা বলে ফোন করা হয়েছিল কেন, সেটা তো জানা দরকার!"

—"এ প্রশ্নের জবাব দিতেন যিনি, তিনি এখন পরলোকে।"

—"আমার কি সন্দেহ হচ্ছে, জানেন? অবনীবাবু হয়তো নিজেই জানতেন না, কে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে! নিচের তলায় দুমদাম দরজা ভাঙার শব্দ, লোকজনের আর্তনাদ, চিৎকার, হুটোপুটি, একটা অজানা ভৈরব হুঙ্কার শুনে তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।"

—"অসম্ভব নয়।"

—"আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মতো। হত্যাকারী বাড়ির সব লোককে বধ করেছে, সাক্ষ্য দিতে পারে এমন একজনও লোক রেখে যায়নি। তবু যে আমরা কিছু কিছু অনুমান করতে পেরেছি, সে হচ্ছে, দৈবের কৃপা।"

—"আমিও আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। হত্যাকারী দরজা ভেঙেছে, হত্যার পর হত্যা করেছে, কিন্তু কোনও দেরাজ আলমারি বা সিন্দুকে হাত দেয়নি। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য যদি চুরি না হয়, তবে আর কি হতে পারে?"

—"খুনের কত রকম কারণ থাকে। ঈর্ষা, ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিহিংসা, গৃহবিবাদ। দু'দিন পরেই কোনও না কোনও সূত্র পাওয়া যাবেই।"

রবীন বললে, "আমার বিশ্বাস, কোনওরকম সূত্রই পাওয়া যাবে না। ঈর্ষা, ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিহিংসা, গৃহবিবাদ—এসবের সঙ্গে থাকে মানুষের যোগাযোগ। কিন্তু আজকের এই আশ্চর্য হত্যাকাণ্ডের ভিতরে মানুষের হাত আমি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।"

ভূপতি বললেন, "ঠিক বলেছেন রবীনবাবু! ওই হাত! আর ওই পা! একি মানুষের হাত পা? বড় ভাবনায় পড়ে গেলুম মশাই! আমি এখন কি রিপোর্ট লিখি বলুন তো?"

—"কেন, যা দেখলেন আর যা শুনলেন, তাই লিখবেন।"

—"বিলক্ষণ! ভারি পরামর্শ দিলেন তো! আমি যদি রিপোর্টে লিখি, দশ নম্বর কানাইবাবুর লেনে এমন একজন হত্যাকারী এসেছিল, যার দেহ হাতির চেয়ে উঁচু, হাত হচ্ছে এক হাতের চেয়ে বড় আর পা হচ্ছে আঠার উনিশ-ইঞ্চি লম্বা, চিৎকার করে যে সিংহের কণ্ঠস্বরে আর হাস্য করে মানুষের মতো, আর লাফ মেরে উঠতে পারে একতলা ছাদে—তাহলে কাল কি আমার চাকরি থাকবে?... হেঁঃ! রিপোর্ট লিখব, না ছাই লিখব!"

—"স্যর!"

—"মরছি নিজের জ্বালায় পতিত, তুমি আবার 'স্যর স্যর' কর কেন বাপু?"

—"স্যর, সুদর্শনবাবুর কথাই ঠিক।"

—"মানে?"

—"এখানে এক উন্মত্ত প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছিল।"

—"তুমি আমাকে রিপোর্টে ওই কথাই লিখতে বল নাকি?"

—"স্যর, অনেক রকম প্রেতাত্মার গল্প শুনেছি, তারা কেবল মাঝে মাঝে মানুষকে ভয় দেখিয়েই খুশি হয়। কিন্তু আজকের এই প্রেতাত্মাটা উন্মত্ত না হলে—"

—"চোপরাও পতিত, চোপরাও! তোমার মূল্যবান উপদেশ আমি শুনতে চাই না!"

—"দেখবেন স্যর, দেখবেন! এ খুনের কিনারা করা পুলিসের কর্ম নয়! শেষ পর্যন্ত রোজা যদি ডাকতে না হয়, আমি নাকে খত দেব!"

ষষ্ঠ

দ্বিতীয় হত্যানাট্য

পরের দিনের সকালবেলার কথা। প্রভাতী চা-পান সাঙ্গ হয়েছে। মধু বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে গেল।

ইজিচেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে হেমন্ত খবরের কাগজখানা টেনে নিলে।

রবীন বললে, "খবরের কাগজের ভিতরে একটু পরে ডুব দিও। আগে একটা জিজ্ঞাসার জবাব দাও।"

হেমন্ত হেসে বললে, "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তোমার জিজ্ঞাসাও নিশ্চয় কালকের ঘটনাক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে দৌড়তে পারবে না?"

—"না। তোমার মনও কি এরই মধ্যে কালকের ঘটনাক্ষেত্রের বাইরে যেতে পেরেছে?"

—"সেটাকি স্বাভাবিক?"

—"স্বাভাবিক নয় জানি। তাই তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"গোলাম হাজির।"

—"ঠাট্টা নয় হেমন্ত। কাল যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না।"

—"আমিও না। কাল যেন আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল আরব্য উপন্যাসে কথিত এক আজগুবি রাত্রি। আলাদিনের দেখা পাইনি বটে, কিন্তু তার বন্ধু দৈত্যের পদধ্বনি শুনেছি।"

—"আলাদিনের দৈত্য নরহত্যা করত না।"

—"আলাদিনের হুকুম পেলে করতে পারত।"

—"কিন্তু এখানে আলাদিন কোথায়?"

—"আলাদিন আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমি এই আধুনিক আলাদিনকে আবিষ্কার করতে পারলে সুখী হব।"

—"কোথায় তাকে পাবে বলে সন্দেহ কর?"

—"একদল সন্ন্যাসীর মধ্যে!"

রবীন সচমকে বললে, "হেমন্ত, অবনীবাবুর মৃত্যুর আগের দিন যে সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল, তুমি কি তাদেরই সন্দেহ কর?"

—"অল্পবিস্তর করি বৈকি!"

—"তাদের ঠিকানা তুমি জান না।"

—"রবীন, এইবার তুমি বোকার মতো কথা কইলে। মাত্র একজন অজানা খুনি খুব চুপিসাড়ে কাজ সেরে পালিয়ে গিয়েও ধরা পড়ে। একদল সন্ন্যাসীর সন্ধান করা কি বিশেষ শক্ত কথা?"

—"কিন্তু খুনের রাত্রে সন্ন্যাসীদের কেউ দেখেনি। আর ঘটনাক্ষেত্রেও তাদের উপস্থিতির কোনও প্রমাণ নেই।"

—"মানি। আমিও জানি, সন্ন্যাসীদের সন্ধান পেলেই খুনি ধরা পড়বে না। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে খুনের কোনও সম্পর্ক আছে।"

—"সন্দেহের কারণ?"

—"কারণ খুব স্পষ্ট বা মস্ত নয়।"

—"তবু?"

—"প্রথমত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঝগড়ার পরের দিনই এই হত্যাকাণ্ড হল কেন? দ্বিতীয়ত, অবনীবাবু থানায় ফোন করে 'আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে' বলেছিলেন কেন?"

—"তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের কোনও মানে হয় না।"

—"হয়। নিচের তলায় হট্টগোল মারামারি শুনেই অবনীবাবু ভেবেছিলেন তাঁর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। হঠাৎ তাঁর এরকম ভাববার কারণ কি? আগের দিনে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছে, হয়তো তিনি এইরকম আক্রমণেরই আশঙ্কা করেছিলেন।"

—"হতে পারে। কিন্তু তাঁর সে আশঙ্কা অমূলক। সন্ন্যাসীরা তাঁর বাড়ি আক্রমণ করেনি। ঘটনাক্ষেত্রে যার সাড়া, দেখা আর চিহ্ন পাওয়া গেছে, সে যেই হোক—সন্ন্যাসী নয়।"

—"হত্যাকারী যে সন্ন্যাসী এ কথা আমিও বলছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, অবনীবাবু হয়তো সন্দেহ করেছিলেন, তাঁর উপরে চটে একদল সন্ন্যাসী তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে। আমার অনুমান ঠিক হলে দেখা দরকার, কেন তাঁর মনে এমন সন্দেহ হয়? কেন তাঁর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের ঝগড়া হয়েছিল? সুদর্শনবাবুর মুখে শুনলে তো, অন্য অন্য বারে সন্ন্যাসীরা অবনীবাবুর বাড়িতে দশ-পনের দিন না কাটিয়ে যায় না। এবারে কেন তারা এসেই চলে গেল? তারা কি যথার্থ সাধু নয়? তাই কি অবনীবাবু তাদের বিদায় করে দিয়েছিলেন? আমি এইসব প্রশ্নের উত্তর চাই। আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঝগড়ার পরের দিনেই অবনীবাবু খুন হলেন কেন?"

—"তোমার কথা শুনে এইবারে বুঝেছি, খুনের কিনারা হোক বা না হোক সন্ন্যাসীদের সন্ধান নেওয়া দরকার বটে।"

হেমন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "রবীন, তুমি অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিশ্বাস কর?"

—"হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন?"

—"বলো না, বিশ্বাস কর কিনা?"

—"কি করে বলব? আমি কোনও অতিপ্রাকৃত—অর্থাৎ অসম্ভব ঘটনা দেখিনি।"

—"কালকের ঘটনা কি অতিপ্রাকৃত নয়?"

—"না হতেও পারে।"

—"কেন?"

—"কালকের ঘটনার উপরে রয়েছে গভীর রহস্যের আবরণ। এ আবরণ সরে গেলে হয়তো দেখা যাবে, সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।"

—"অসম্ভব নয়। কিন্তু তুমি অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিশ্বাস কর না?"

—"এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

—"কিন্তু আমার প্রবৃত্তি হয়।"

—"আশ্চর্য কি, লোকচরিত্র বিচিত্র। চার সহোদরের প্রকৃতি চাররকম হয়।"

—"রবীন, আমি অন্ধের মতো কোনও কিছুতে বিশ্বাস করি না। এ বিশ্বের সর্বত্র যে রহস্যময়, অজ্ঞাত শক্তি বাস করে, আমরা যদি তার সঠিক খবর রাখতে পারতুম, তাহলে প্রত্যেক মানুষই হয়ে উঠত মহামানুষ। 'স্পিরিচুয়ালিজম' নিয়ে তুমি কিছু পড়াশোনা করেছ?"

—"বিশেষভাবে নয়।"

—"এমন অনেক মানুষ আছে, যারা স্পর্শ না করেও ধাতুকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ আগুনের উপর দিয়ে নগ্নপদে হাঁটতে পারে, হাজার হাজার লোক এ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছে। তারা এসব শক্তি কেমন করে অর্জন করলে?"

—"ও প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না হেমন্ত!"

—"বিলাতের এক সাহেব গেল শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি তোমার আমারই মতন সাধারণ মানুষ—যোগী বা সাধু নন। কিন্তু তাঁর ভিতরে আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রকৃতির এক দুর্লভ শক্তি। এই জড়দেহ নিয়েই তিনি শূন্যে বিচরণ করতে পারতেন। ইউরোপের বড় বড় প্রসিদ্ধ লোকের সামনে তিনি শূন্যপথে ঘরের এক জানলা দিয়ে বেরিয়ে, আর এক জানলা দিয়ে আবার ভিতরে এসে ঢুকেছিলেন।"*

—"তোমার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি।"

—"আমেরিকার এক পরীক্ষাক্ষেত্রে নামজাদা ডাক্তাররা একত্র হয়ে এক সমাধিগ্রস্ত যোগীকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করে বলেছিলেন, তাঁর দেহে জীবনের কোনও লক্ষণ নেই—এমনকি তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে—আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যা মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু তারপর সমাধিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই যোগীর দেহে জীবনের পূর্ণলক্ষণ ফিরে এসেছিল। দেখছো রবীন, তুমি যে বিজ্ঞানের দোহাই দিচ্ছ, বিশ্বব্যাপী রহস্যময় শক্তির কাছে সে কতখানি পঙ্গু!"

—"বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী রহস্যময় শক্তিকে মানুষের সামনে পূর্ণভাবে প্রকাশ করা। সুতরাং বিজ্ঞানের দোহাই দেব না কেন?"

---

* এ গল্প নয়, বাস্তবিকই সত্যকথা। ঐ ইংরেজ ভদ্রলোক জনসাধারণের সামনে বারংবার নিজের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং ইউরোপের অসংখ্য পুস্তকে ও পত্রিকায় সেই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।—লেখক

—"কেবল বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কোনও লাভ নেই ভাই, বিজ্ঞানের সত্যিকার ভক্ত নিজের চোখ আর মন সর্বদাই খোলা রাখেন। ভারতবর্ষের অনেক যোগী যে ভূপ্রোথিত হয়ে সমাধিগ্রস্ত হয়ে ত্রিশ-চল্লিশ দিন কাটিয়েছেন, শত শত প্রত্যক্ষদর্শী তার সাক্ষ্য দিতে পারেন। একবার ভেবে দেখো দেখি, চারিদিক অন্ধকার—সমস্ত দেহ ঘিরে বিরাজ করছে ছিদ্রহীন পাতালের মাটি—আর সেই দেহও সমাধিগ্রস্ত, অর্থাৎ পঙ্গু, বিজ্ঞানের ভাষায়, জীবনহীন! তারপরে আলো নেই, বাতাস নেই, জল নেই, খাবার নেই—যার অভাবে জীব বাঁচে না—অন্তত একেলে বিজ্ঞান বলবে, বাঁচা অসম্ভব! ত্রিশ-চল্লিশ দিন পরে সমাধি ভেঙে যোগী কেমন করে অক্ষত আর জীবন্ত দেহ নিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন? কোন অজানা রহস্যময় শক্তির আশীর্বাদ তিনি লাভ করেছেন? এসব কি অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়? এসব চোখে দেখলেও কি বিশ্বাস করব না? বিজ্ঞান—অর্থাৎ নব্য বিজ্ঞান এখনও শিশু, এই রহস্যসাগরে মগ্ন হবার শক্তি এখনও সে অর্জন করেনি। কিন্তু প্রাচীন জগতের বিজ্ঞান এসব সত্য বলে জানত আর মানত, কারণ গভীর অনুসন্ধানের ফলে রহস্যলোকের চাবি একবার সে হস্তগত করতে পেরেছিল। আজ সে পুরনো চাবি হারিয়ে গিয়েছে, তোমাদের নূতন চাবি দরজায় আর লাগছে না!"

—"তোমার হঠাৎ এই বক্তৃতার কারণ কি হেমন্ত? কালকের ব্যাপারের মধ্যে তুমি কি অতিপ্রাকৃত কোনও কিছুর খোঁজ পেয়েছ?"

—"খোঁজ আমি কিছুই পাইনি। তবে আপাতত কালকের ঘটনাগুলোকে অসাধারণ বলতে পারি বটে। হয়তো তোমার অনুমানই ঠিক। রহস্যের আবরণ সরিয়ে নিলে কালকের ঘটনাগুলো খুবই সাধারণ হয়ে পড়বে।"

হেমন্ত মুখ বন্ধ করে খুললে খবরের কাগজ। রবীন মধুর উদ্দেশে চেঁচিয়ে আর এক পেয়ালা চা পান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে।

রবীন চা পান করছে, হেমন্ত হঠাৎ অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, "কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ?"

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে রবীন জিজ্ঞাসুভাবে বন্ধুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

হেমন্ত খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বললে, "রবীন, কাগজে কালকের ঘটনা বেরিয়েছে।"

—"আমাদের পক্ষে ও তো পুরনো খবর। এ জন্য তোমার অতটা অভিভূত হবার কারণ নেই।"

—"না! আমি অভিভূত হয়েছি, আর একটা খবর পড়ে! অবনীবাবুর হত্যাকারীই কাল রাত্রে আর এক জায়গাতেও আর এক হত্যানাট্যের অভিনয় করেছে!"

—"বল কি, বল কি!"

—"শোনো।" হেমন্ত উচ্চস্বরে খবরটা পড়তে লাগল:

—"দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে দুই নম্বর তালপুকুর স্ট্রিটে।

—"বাড়ির মালিকের নাম বিধুরঞ্জন বসু। তিনি চিরকুমার, বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। তাঁহার আত্মীয়স্বজন কেহ নাই—অন্তত তাঁহার সঙ্গে কেহ বাস করিতেন না। বাড়িতে থাকিত কেবল একজন পাচক ও একজন বেয়ারা।

"যতদূর জানা গিয়াছে, বিধুবাবুও অবনীবাবুর মতো ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন, তান্ত্রিক পূজা-অর্চনাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ। এবং তাঁহার বাড়িতেও মাঝে মাঝে কোথা হইতে একদল সন্ন্যাসী আসিয়া দিন কয়েকের জন্য রীতিমতো আসর জমাইয়া তুলিতেন!

"গত রাত্রে প্রায় একটার সময় অমাবস্যা ও ব্ল্যাক আউটের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ এক গোলমালে প্রতিবেশীদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। গোলমাল হইতেছিল বিধুবাবুর বাড়ির ভিতরে। ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া প্রতিবেশীরা লাঠি, দা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসে। তাহাদের মধ্যে ছিলেন ও পাড়ার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ও লাঠিয়াল বিনোদলাল। সর্বাগ্রে সাহস করিয়া তিনিই বিধুবাবুর বাড়ির দরজার নিকটে গিয়া উপস্থিত হন।

"তাহার পর কি হইল, কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। তবে সকলে বলে, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মাটি হইতে সতের-আঠার ফুট উপরে দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ভাঁটার চেয়ে বড় দু'টো তীব্র, ক্রুদ্ধ ও অগ্নিময় চক্ষু, জাগিয়া উঠিল বজ্রধ্বনির মতো প্রচণ্ড সিংহের গর্জন ও তার পরেই খলখল অট্টহাস্য—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা মর্মভেদী আর্তনাদ। তাহার পর সকলের মনে হইল, যেন একটা মদমত্ত হস্তী পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়া গেল।

"এই কাণ্ডের পর প্রতিবেশীরা কেহই আর অগ্রসর হইতে ভরসা করিল না। ইতিমধ্যে কে থানায় ফোনে খবর দিয়াছিল, পুলিস আসিয়া পড়িল! পুলিস আসিয়া রাস্তার উপরে সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করিল হতভাগ্য যুবক বিনোদলালের মৃতদেহ। কোনও দারুণ হিংস্র জন্তু যেন কাঁধের উপর হইতে তাহার মুণ্ডুটা থাবার এক আঘাতে উড়াইয়া দিয়াছে! বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুলিস দেখিল, নিচের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে বিধুবাবুর পাচক ও বেয়ারার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। উপরতলায় শয়নকক্ষের মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে বিধুবাবুর দেহ না বলিয়া, দেহাবশেষ বলা উচিত। কারণ, এই নৃশংস হত্যাকারী অবনীবাবুর মতন বিধুবাবুর দেহকেও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে!

"কে এই হত্যাকারী? বেশ বুঝা যায়, অবনীবাবু ও বিধুবাবুর হত্যাকারী একই ব্যক্তি। কিন্তু কে সে? একই রাত্রে কেন এই দুই হত্যাকাণ্ড? একদিনে একই ব্যক্তি বা দলের দ্বারা পঁচিশটি নরহত্যা কলিকাতায় কখনও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এরপরেও আমরা যদি পুলিসকে অকর্মণ্য বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে কি অন্যায় করা হইবে?

"দুই ঘটনাক্ষেত্রেই সিংহনাদ ও অট্টহাস্য শোনা গিয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের দেহ দেখিলেও বুঝা যায়, কোনও প্রকাণ্ড জন্তুর কবলে পড়িয়াই সকলকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। অট্টহাস্য করিয়াছে হয়তো হত্যাকারীরাই। কিন্তু সিংহনাদের অর্থ কি? হত্যাকারীরা কি কোনও পালিত, পোষমানা সিংহ লইয়া ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়াছিল? অনেকে নাকি সন্দেহ করিতেছেন, এই দুই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপারের সম্পর্ক আছে। প্রথম ঘটনাক্ষেত্রে নাকি আশ্চর্য ও প্রকাণ্ড হাত ও পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ওসব হইতেছে পুলিসের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপের জন্য কৌশলী হত্যাকারীদের ছলনামাত্র। ওই হাত ও পায়ের ছাপ হইতেছে নকল ছাপ।

"দুই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দুই স্থলেই কোনও মূল্যবান দ্রব্য চুরি যায় নাই। সুতরাং হত্যার কারণ অর্থলোভ নয়।"

রবীন স্তম্ভিতপ্রায় স্বরে বললে, "ভয়ানক! এর ওপরে কোনওরকম মত প্রকাশ করবার শক্তি আমার নেই।"

হেমন্ত বললে, "বন্ধু খবরের কাগজের এই রিপোর্টারটি তোমার দলভুক্ত হলেও তোমার চেয়ে উচ্চশ্রেণীর মনুষ্য।"

—"কি রকম?"

—"ইনি তোমার দলের লোক, কারণ অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন না। আবার ইনি তোমার চেয়ে উচ্চশ্রেণীরও বটে, কারণ হরেকরকম মূল্যবান মত প্রকাশ করেছেন।"

—"মূল্যবান মত?"

—"যথা, পুলিস অকর্মণ্য, অট্টহাসি হেসেছে হত্যাকারীরা, তাদের পরিচালনায় হত্যা আর সিংহনাদ করেছে পোষা সিংহ, সেই হাত আর পায়ের ছাপ জাল—পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে!"

—"চুলোয় যাক রিপোর্টারের গবেষণা। হেমন্ত, এখন তুমি কি করতে চাও?"

—"আপাতত ফোনের কাছে যেতে চাই—ওই শোনো ঘণ্টা বাজছে।"

টেলিফোন ছেড়ে ফিরে এসে হেমন্ত বললে, "অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার সতীশবাবুর টনক নড়েছে, তিনি নাকি সোজা আমার বাড়ির দিকেই ধাবমান হয়েছেন!"

সপ্তম

কড়িকাঠের সার্থকতা

হেমন্তের বৈঠকখানাতে ঢুকেই সতীশবাবুর প্রথম কথা—"নতুন খবরটাও শুনেছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কি কাণ্ড!"

—"কল্পনাতীত।"

—"ভুতুড়ে বললেও চলে।"

—"কেন?"

—"হাতির মতো উঁচু জীব, দানব-মানুষের হাত-পায়ের ছাপ, মাটি থেকে সতের-আঠার ফুট ওপরে অগ্নিময় চক্ষু, খলখল অট্টহাস্য, সিংহনাদ, আঁচড়ে কামড়ে পঁচিশটা নরহত্যা—এসব কী?"

—"আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন, জবাব পাবেন না। কারণ, আমিও হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।"

—"আপনি হতভম্ব হলে তো চলবে না হেমন্তবাবু! খবরের কাগজওয়ালারা পুলিসের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছে। আমরা যে আপনারই সাহায্য চাই।"

—"ভূপতিবাবু কি বলেন?"

—"ভূপতির কথা ভুলে যান! সে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছে! বলে, ভুত-প্রেতের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না—তা চাকরি থাক আর যাক!"

—"ভূপতিবাবুর সহকারি পতিতবাবু উপদেশ দিয়েছেন, রোজা ডাকবার জন্যে।"

—"পতিত? এর মধ্যেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করে সে তিনমাসের ছুটি চেয়েছে।"

—"তাই নাকি?"

—"তার অসুখটা ভান। আসল কথা, সে এ মামলা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে রাজি নয়।"

—"আমি কিন্তু ঠিক তার উল্টো। আমি চাই এ মামলার রহস্যটা ভাল করে বুঝতে। আপনার অবস্থা কি রকম?"

—"সুবিধের নয়। তাই তো আপনার দরজায় ধর্না দিতে এসেছি।"

—"আমাকে লজ্জা দেবেন না সতীশবাবু! নিজের তুচ্ছতার কথা আমি ভাল করেই জানি।"

—"আপনার তুচ্ছতা অনেক শ্রেষ্ঠতারও চেয়ে লোভনীয়।"

—"থাক সতীশবাবু, থাক! বিনয়ে আপনাকে হারাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে আর সময়ের অপব্যবহার করব না। এইবার কাজের কথা হোক। দ্বিতীয় ঘটনাক্ষেত্রের কি কি সূত্র পেয়েছেন?"

—"সূত্র? যা পেয়েছি, প্রথম ঘটনাক্ষেত্রেও সেইরকম সব সূত্রই পাওয়া গিয়েছে।"

—"বলুন দেখি, পরশু দিন একদল সন্ন্যাসী বিধুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কি না?"

সতীশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "আপনি কি এর মধ্যেই ঘটনাস্থলে ঘুরে এসেছেন?"

—"না।"

-"তবে কেমন করে জানলেন?"

—"অনুমানে।"

—"আশ্চর্য আপনার অনুমানশক্তি। হ্যাঁ, বিধুবাবুর প্রতিবেশীদের মুখে খবর পেয়েছি, ঘটনার আগের দিন একদল হিন্দুস্তানি সন্ন্যাসী বিধুবাবুর বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই তারা আবার চলে যায়! হ্যাঁ, হেমন্তবাবু, আপনি কি এই সন্ন্যাসীদের সন্দেহ করেন? না, না, অসম্ভব। ঘটনার সময়ে কেউ তাদের দেখেনি। যে এসেছিল, যার সাড়া আর চিহ্ন পাওয়া গেছে, সে তো এক বিভীষণ মূর্তি! সে মানুষ, না দানব, না জন্তু—কিছুই ঠিক করে বলবার উপায় নেই!"

হেমন্তের ভাব দেখে মনে হয়, সতীশবাবুর কোনও কথাই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল না, দুই চোখ মুদে সে যেন কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে!

সতীশবাবু বললেন, "বিধুবাবুর ঘর থেকে একটা জিনিস পেয়েছি হেমন্তবাবু!"

—"কি বললেন?"

—"বিধুবাবুর একখানা ডায়েরি পেয়েছি।"

সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেমন্ত ডায়েরিখানা গ্রহণ করলে। দুই এক পাতা উল্টে বললে, "যাদের ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে, আমি তাদের ভালবাসি। পুলিসের বহু সমস্যার সমাধান করতে পারে এই ডায়েরি।" আরও কয়েকখানা পাতার উপরে চোখ বুলিয়ে বললে, "ওরে মধু, সতীশবাবুকে চা আর খাবার দিয়ে যা! ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ অলস হয়ে বসে থাকে। আমি পড়ি ডায়েরি, আর সতীশবাবু নিযুক্ত থাকুন পানাহারে। কি বল রবীন?"

—"আর আমি?"

—"তুমি একবার আমার দিকে, আর একবার সতীশবাবুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কর্তন কর। যার যা কাজ।"

—"তার মানে তুমি বলতে চাও, আমি হচ্ছি নির্বোধ, আর সতীশবাবু হচ্ছেন পেটুক?"

কিন্তু হেমন্ত আর কিছু বলতে চাইলে না, হেঁটমুখে একমনে ডায়েরির পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল।

চা আর খাবার এল। রবীন খবরের কাগজখানা টেনে নিলে। চায়ের পেয়ালা আর খাবারের থালা খালি করে সতীশবাবু ফিরে দেখলেন, হেমন্ত হাঁ করে এক দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

সতীশবাবু হেসে-ফেলে বললেন, "হাতে বই, চোখ কড়িকাঠে। আপনি উচ্চশ্রেণীর পাঠক!"

—"যা পড়বার, পড়েছি। এখন আমি ভাবছি—কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমার চিন্তাশক্তি বাড়ে।"

—"জানা রইল। এবারে আমিও এই পদ্ধতি পরীক্ষা করব। কিন্তু আপনার চিন্তাশক্তি বাড়াবার প্রয়োজন হল কেন?"

—"ডায়েরিখানা পড়েছেন?"

—"না। এখনও সময় পাইনি।"

—"তাহলে এই অংশটুকু শুনুন।"

হেমন্ত পড়তে লাগল :

"না, না, অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব! গুরুর ইচ্ছা হয়েছে বলে পাপাচার সমর্থন করতে পারব না। একজটা স্বামীজি বলেছিলেন, আমাদের গুরুভক্তি তিনি পরীক্ষা করবেন। মহাকালী নাকি স্বপ্নে তাঁকে আদেশ দিয়েছেন, এক বৎসরকাল ধরে প্রতি অমাবস্যায় তিনি একটি করে নরবলি চান। গুরুদেব তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর ভেতর থেকে বারজনকে বেছে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের প্রত্যেককে একটি করে বলির জীব সংগ্রহ করতে হবে। মহাকালীর ইচ্ছা পূর্ণ করলে আমিই যে কেবল পূর্ণসিদ্ধি লাভ করব, তা নয়; আমার অনুগ্রহে তোমরাও দৈবশক্তির অংশ লাভ করবে!' গুরুদেবের অন্যদেশীয় শিষ্যেরা সম্মত হল, কিন্তু আমরা তিনজন বাঙালি—আমি, অবনী আর শক্তিপদ—দৃঢ় প্রতিবাদ না জানিয়ে পারলুম না। গুরুদেব ক্রুদ্ধ হলেন। আমরা তিনজনেই একবাক্যে বললুম, 'আমরা নরহত্যায় সাহায্য করতে পারব না। এমন কি, গুরুদেব যদি এই নিষ্ঠুর আর অন্যায় সংকল্প পরিত্যাগ না করেন, তাহলে আমরা

পুলিসে খবর দিতেও বাধ্য হব।' গুরুদেব শাসিয়েছেন, যোগবলের দ্বারা তিনি আমাদের সর্বনাশ করবেন। আমরা কিন্তু তাঁর শাসানি গ্রাহ্য না করে কলকাতায় চলে এসেছি।"

সতীশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "আশ্চর্য কথা! কে এই ভয়ানক গুরু!"

—"তার নাম আছে বটে, ধাম নাই।"

—"ভারতবর্ষে এখনও এমন ধর্মোন্মাদ আছে!"

—"ভারতবাসী এখনও অতীতকে ভুলতে পারেনি। ভাল করে খোঁজ নিলে দেখবেন, অশিক্ষিতদের তো কথাই নেই, অধিকাংশ শিক্ষিতদের মনেও প্রাচীন সংস্কারের ধারা এখনও অল্পবিস্তর মাত্রায় বর্তমান আছে।"

—"মানি। কিন্তু এ যে একেবারে চরম!"

হেমন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক পরে বললে, "সতীশবাবু, আমি সূত্র পেয়েছি!"

—"পেয়েছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। অন্তত সূত্রের একটা দিক। যদিও সূত্রের অন্য প্রান্ত আছে এখনও নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে।"

—"তবেই তো!"

—"নির্ভয় হোন সতীশবাবু! মামলাটা যতই জমকালো আর চমকদার হোক, একটা হেস্তনেস্ত করতে বোধহয় বেশি বেগ পেতে হবে না। সূত্রের একদিক যখন হাতে পেয়েছি, তখন অন্য প্রান্তে যতই অন্ধকার থাক, এই সূত্রের খেই ধরে অন্ধের মতো যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে পারব।"

—"তাহলে আপাতত আমাদের কর্তব্য কি?"

—"শক্তিপদকে আবিষ্কার করুন।"

—"শক্তিপদকে! কেন?"

—"মাথা স্থির করে একটু ভেবে দেখুন। অবনী, বিধু আর শক্তিপদ হচ্ছে কোনও দুরাচার তান্ত্রিক গুরুর বিদ্রোহী শিষ্য। গুরু শাসিয়েছে এই তিন বিদ্রোহী চ্যালাকে শাস্তি দেবে বলে। তিনজনের মধ্যে দুইজনকে একরাত্রেই রহস্যময় উপায়ে পথ থেকে সরানো হয়েছে, বাকি রইল একজন মাত্র, আর সে হচ্ছে শক্তিপদ। খুব সম্ভব, সে এখনও ইহলোকেই বিদ্যমান আছে, কারণ তার মৃত্যুর খবর এখনও পাওয়া যায়নি। সতীশবাবু, এই ডায়েরি আমাদের সকল সন্দেহ ঘুচিয়ে দিয়েছে! জাগ্রত হোন, শক্তিপদকে আমাদের পাওয়া চাই-ই চাই! সেই হবে আমাদের অকূল পাথারের কাণ্ডারী!"

সতীশবাবু বিশেষ জাগ্রত হয়েছেন বলে মনে হল না। বললেন, "শক্তিপদকে খুঁজে বের করতে গেলে সময়ের দরকার। ইতিমধ্যেই সে যে খুনিদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে না, এমন কথা কে বলতে পারে?"

—"কেউ বলতে পারে না সতীশবাবু, কেউ বলতে পারে না!"

—"তার চেয়ে আগে এই নরবলির ভক্ত, বদমাইশ গুরুর সন্ধান করা হোক না কেন? একেবারে গোড়ায় কোপ মারাই কি ঠিক নয়?"

—"এখনও সময় হয়নি। তারপর দেখুন—প্রথমত, আমরা গুরুমশাইয়ের ঠিকানা পর্যন্ত জানি না। দ্বিতীয়ত, সে এখনও নরবলি দিয়েছে বলে প্রমাণ নেই। সুতরাং ও অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কলকাতার এই দু'টো মহা হত্যাকাণ্ডের জন্যেও তাকে বা তার দলকে বন্দী করবার মতো প্রমাণও আমরা পাইনি। তবে তাকে লক্ষ্য করে আমাদের কি লাভ হবে?"

—"আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত বটে।"

—"কিন্তু শক্তিপদকে যদি আমরা হাতে পাই, গুরুকে হস্তগত করতে বেশি বিলম্ব হবে না।...আচ্ছা, রসুন—রসুন, শক্তিপদ লাভ করবার একটি সহজ উপায় আমার মাথায় আছে। হ্যাঁ, সেই ঠিক! রবীন, কাগজ-কলম নিয়ে বোসো। যা বলি, লিখে নাও!'

রবীন কথামতো কাজ করলে। হেমন্ত বলতে লাগল :

"শক্তিপদবাবু,

আপনি অবনীকান্ত রায়চৌধুরী ও বিধুভূষণ বসুর গুরুভাই। আপনার মাথার উপরে বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। যদি নিজের প্রাণরক্ষা করতে আর বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিতে চান, তাহলে বিনা বিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ইতি—"

তলায় রইল হেমন্তের নাম ও ঠিকানা।

রবীন বললে, "তুমি বোধহয় চিঠিখানা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় প্রকাশ করতে চাও?"

—"হ্যাঁ। সমস্ত বাংলা কাগজে।"

—"এ বিজ্ঞাপন হত্যাকারীদের চোখে পড়বে। তারাও সাবধান হয়ে যাবে।"

—"ডায়েরিতে দেখছি আর সুদর্শন প্রভৃতিরও মুখে শুনেছি, সন্ন্যাসীরা হিন্দুস্তানি। সম্ভবত তারা বাংলা পড়তে জানে না। তবে তুমি যা বললে, সে সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়। তবু দৈবের উপরে নির্ভর করলুম, হয়তো দৈব আমাদের সহায় হবে।"

সতীশবাবু প্রশংসা ভরা স্বরে বললেন, "হেমন্তবাবু, আপনি এত তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে আর পথ বাতলাতে পারেন যে, চমৎকৃত হতে হয়।"

হেমন্ত হাতজোড় করে বললে, "দোহাই সতীশবাবু, কথায় কথায় আমাকে এত উঁচু স্বর্গে তুলবেন না মশাই। আমি মর্ত্যের মানুষ। যদি মাথা ঘুরে যায়, পড়ে গতর চূর্ণ হয়ে যাবে!"

অষ্টম

ভাবেরও মূর্তি আছে

দিন তিনেক কাটবার পর।

হেমন্ত পাঠাগারের এককোণে একটি প্রকাণ্ড সোফার সুগভীর কোলের মধ্যে প্রায় যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে একখানি পুস্তকপাঠে নিযুক্ত ছিল। তার সামনের গোল টেবিলের এবং পদতলের কার্পেটের উপরেও ছোট বড় মাঝারি ও রোগা মোটা দোহারা হরেক আকারের আর হরেক রঙের গ্রন্থ ছড়ানো রয়েছে।

রবীন ঘরের ভিতরে ঢুকে হেমন্তকে প্রথমে খুঁজেই পেলে না। সে আপন মনেই বললে, "তাই তো, বাড়ির কোথাও নেই! বন্ধু আমার যাত্রা করলেন কোন সিন্ধুপারে?"

—"কোথাও নয়! আপাতত বন্ধু তোমার স্তম্ভিত হয়ে আছে তোফা আরামে সোফার অন্তরালে।"

—"ওখানে! চোরের মতো চুপিচুপি কি করছ হে?"

—"প্রেতবিদ্যাচর্চা।"

—"প্রেতবিদ্যা—অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিজম? শরীরী তুমি, অশরীরীদের নিয়ে হঠাৎ মাথা ঘামানোর কারণ কি?"

—"কথায় কথায় তুমি বড্ড কারণ জানতে চাও রবীন।

মনে করো শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর ছাঁদ
তুমি রইবে চুপটি করে, অন্যে করবে সিংহনাদ!

তারপর? সোনার না হোক—ননীর দেহ পুড়বে চিতার আগুনে। তারপর তোমাকে—আমাকে—সকলকেই হতে হবে অশরীরী। কাজেই শরীরটা বজায় থাকতে থাকতেই অশরীরীদের রহস্য একটু ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করছি।"

—"সাধু! কিন্তু কি বুঝছ?"

—"বুঝছি অনেক কিছুই। তবে একটা বড় কথা এই যে, শরীর নষ্ট হলে আত্মা অশরীরী হয় বটে, কিন্তু দরকার হলে সে আবার অস্থায়ীভাবে শরীর ধারণ করতে পারে।"

—"এইসব রাবিশে তুমি বিশ্বাস কর?"

—"বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি ভাই!" হেমন্ত একখানা মস্ত বড় বই টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে কতগুলো সচিত্র পাতা উল্টে বললে, "এগুলো কি দেখছ?"

—"ছবি।"

—"ছবি বটে, কিন্তু ফোটোগ্রাফ। প্রেতাত্মাদের ফোটো।"

—"জাল!"

হেমন্ত চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসল। রীতিমতো ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "জাল? তুমি কি বিচার করে এ কথা বলছ? প্রেততত্ত্বের কী জান তুমি?"

—"কিছু না ভাই, কিছু না! জানতে চেও না। প্রেততত্ত্বে আমার বিশ্বাস নেই।"

—"তুমি খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস কর?"

—"না।"

—"তুমি খ্রিস্টধর্মকে জাল মনে কর?"

—"না।"

—"কেন? তুমি তো খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস কর না?"

—"বিশ্বাস না করা এক কথা, জাল বলা আর এক কথা। খ্রিস্টধর্মের ভালমন্দ জানি না বলেই বিশ্বাস করি না।"

—"তবে প্রেততত্ত্বে তোমার বিশ্বাস নেই বলে এই ফোটোগুলোকে জাল বললে কেন?"

রবীন অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইল।

হেমন্ত বললে, "স্যর উইলিয়ম ক্রুকস, স্যর অলিভার লজ, স্যর কন্যান ডইল, ওয়ালেস, ফ্লামেরিয়ন আর স্টেড প্রমুখ পৃথিবীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক আর লেখকদের মতো পণ্ডিত লোকেরাও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে বুদ্ধি বা বিদ্যা কিছুরই পরিচয় দেওয়া হয় না। যা জান না, তাকে অবহেলা কোরো না। ও বাহাদুরি নয়, ও মূর্খতা।"

—"আমার দু' অক্ষরে একটিমাত্র কথার ওপরে তোমার অসংখ্য অক্ষরের এত বড় বক্তৃতা হচ্ছে, সানকির ওপরে বজ্রাঘাতের মতো। বেশ ভাই, অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করো। ...কিন্তু যদি রাগ না কর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

—"অনায়াসে।"

—"প্রেততত্ত্ব নিয়ে এত গভীর আলোচনা কেন?"

—"আমিও দেখতে চাই, কত ভাবে কত উপায়ে প্রেতাত্মারা স্থূল শরীর লাভ করতে পারে।"

—"দেখে তোমার লাভ।"

—"জ্ঞান।"

দু'জনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হেমন্ত ধীরে ধীরে বললে, "প্রেততত্ত্ববিদরা আর একটা কথা বলেন, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে রবীন।"

—"কি কথা?"

—"প্রত্যেক ভাব বা মানসিক চিন্তা হচ্ছে বস্তু।"

—"বুঝলুম না।"

—"প্রত্যেক ভাব বা মানসিক চিন্তার এক একটা নিজস্ব রূপ আছে। সেইসব রূপকে চোখের সামনে দেখানো যায়।"

—"আরও পরিষ্কার করে বলো। এসব বিষয়ে আমি হচ্ছি শিশুর মতো নির্বোধ।"

—"তোমাকে বোঝাবার জন্যে আমি খুব সহজ একটা উপমা দিচ্ছি। ধর, লক্ষ্মীদেবী। এই দেবীটি হিন্দুর সংসারে নিত্য পূজা পান বটে, কাব্যেও এঁর অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, এঁকে স্বচক্ষে কেউ দেখেছে বলে শুনিনি। প্রেততত্ত্ববিদদের মত মানলে বলতে হয়, লক্ষ্মীদেবীকে স্থূলশরীরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা যায়।"

—"কি বলছ হেমন্ত!"

—"লক্ষ্মীদেবীর একটি চিন্তার বা ভাবের প্রতিমা প্রত্যেক হিন্দুর মনেই বিরাজ করে। মানস চক্ষে সেই ভাবপ্রতিমা দেখে ভক্ত করে পূজা, কবি আঁকে শব্দছবি, শিল্পী গড়ে মূর্তি। ভক্তি বা শিল্পের রাজ্যে বাস্তবতা নেই—যথার্থ জীবন নেই। কিন্তু প্রেততত্ত্ববিদরা বলেন, আমরা ইচ্ছা করলে গভীর ধ্যান বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে শরীরিণী আর জীবন্ত করে তুলতে পারি। তিনি তখন কথা কইবেন, চলে বেড়াবেন, আমাদের স্পর্শ করবেন!"

—"রক্ষে কর ভাই, এসব কথা আমার মাথায় ঢুকছে না।"

—"কেন ঢুকবে না, পাঁকেও ফোটে পদ্মফুল।"

—"তার মানে, তুমি বলতে চাও আমার মাথাটি গোবর ভরা?"

--"যা বোঝো তাই।...রবীন, পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ববিদদের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের শাস্ত্রকারদেরও কি এই মত নয় যে, সিদ্ধসাধকরা ধ্যানশক্তির দ্বারা মানসিক দেব-দেবতার মূর্তিকে বাইরের স্থূলচক্ষে জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পান? তা যদি তাঁরা দেখতে না পেতেন, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি শত শত মহাজ্ঞানী সাধক যুগে যুগে কিসের পিছনে ছুটে নিজেদের সারাজীবন কাটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন? আমার দৃঢ়বিশ্বাস, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, সাধক রামপ্রসাদ, একালের রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি বাইরের পৃথিবীতেই স্বচক্ষে জীবন্ত কালীদেবীকে দর্শন করেছেন!"

রবীন নাচারভাবে বললে, "তোমার কথার প্রতিবাদ করতে চাই না। কিন্তু যখন আমরা সাধক নই—কখনও হতেও পারব বলে মনে হয় না, তখন ওসব অজানা ব্যাপার নিয়ে তর্ক করবারও দরকার নেই। তুমি বললে, আমি শুনলুম—ব্যস, ফুরিয়ে গেল!"

—"ফুরিয়ে যায় না ভাই, ফুরিয়ে যায় না! অজানাকে জানবার চেষ্টাই হচ্ছে মানুষের প্রধান ধর্ম। অজানাকে জানবার চেষ্টা না করলে মানুষ আজ সভ্য হত না।"

মধু বেয়ারা ঘরে ঢুকে বললে, "একটি বাবু ডাকছেন।"

—"কেন? কি নাম?"

—"কেন তা জানি না, তবে নাম বললেন, শক্তিপদ মজুমদার।"

এক লাফে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হেমন্ত বললে, "শক্তিপদ? যা, যা, এখানে ডেকে আন্!"

রবীন বললে, "শক্তিপদবাবুকে ধন্যবাদ! প্রেততত্ত্বের কবল থেকে নিস্তার পেলুম!"

নবম

ভয়াবহ মৃত্যুদূত

ঘরের মধ্যে যে লোকটি প্রবেশ করলে তার বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। রং শ্যাম, দেহ দোহারা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, পরনে চাদর, পাঞ্জাবি, কাপড়, ক্যাম্বিসের জুতো। চেহারায় উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, দশজনের ভিড়ে হারিয়ে যায় অনায়াসেই। কিন্তু তার হাতের লাঠিগাছা উল্লেখযোগ্য, এত মোটা লাঠি নিয়ে ভদ্রলোকেরা পথে বেরোয় না।

হেমন্ত তার হাতের লাঠির দিকে চোখ রেখে বললে, "আপনিই শক্তিপদবাবু?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। হেমন্তবাবু কার নাম?"

—"আমার।"

—"কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আপনি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন। লাঠিগাছা দিন—ঘরের কোণে রেখে দিই।"

শক্তিপদ ইতস্তত করলে।

হেমন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, "ভয় নেই, এখানে আপনার আত্মরক্ষা করবার দরকার হবে না। শক্তিবাবু, কার ভয়ে আপনি অত বড় গুপ্তি নিয়ে পথে বেরিয়েছেন?"

শক্তিপদ প্রথমে চমকে উঠল। একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বললে, "দিনকাল ভাল নয়, রাস্তার আলো থাকে না। ফিরতে হয়ত সন্ধ্যে উৎরে যাবে। তাই—"

—"বুঝেছি। কিন্তু শক্তিবাবু, যাদের ভয়ে আপনি অস্ত্রধারণ করেছেন, ওই গুপ্তি দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারবেন কি?"

শক্তিপদর মুখে ফুটল অতি করুণ ভাব। আস্তে আস্তে বললে, "আপনি কে?"

—"আপনার বন্ধু।"

—"কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না।"

—"আমিও আপনাকে চিনি না, তবু আপনার গুপ্তকথা জানি।"

—"জানেন?" কি করে জানলেন? এ কথা জানতেন শুধু আমার দুই বন্ধু।"

—"যদি বলি তাঁদের কারুর কাছ থেকেই আপনার কথা আমি জানতে পেরেছি?"

—"অসম্ভব।"

—"এক্ষেত্রে অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আপনার সব কথা এখনও আমি জানতে পারিনি—যা শোনবার জন্যে আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ করেছি। আমাকে যদি বিশ্বাস না করেন। তাহলে খুব শীঘ্রই আপনাকেও অবনীবাবু আর বিধুবাবুর অনুসরণ করতে হবে।"

শক্তিপদ শিউরে উঠল! বললে "আমাকে রক্ষা করবার শক্তি যে আপনার আছে, এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করব?"

—"বিশ্বাস করা, না করা আপনার হাত। তবে সন্ন্যাসীদের ষড়যন্ত্র থেকে আমিও যদি আপনাকে বাঁচাতে না পারি, তাহলে কলকাতায় আর কেউ বাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না।"

বিপুল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে শক্তিপদ বললে, "সন্ন্যাসীদের কথাও আপনি জানেন?"

—"আপনার নরবলিভক্ত গুরুজীরও পরিচয় জানতে আমার বাকি নেই।"

শক্তিপদ আর ইতস্তত করলে না, একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাতে হেমন্তের দুই হাত চেপে ধরে আকুলকণ্ঠে বললে, "তাহলে আমাকে রক্ষা করুন!"

—"সেইজন্যেই আপনাকে ডেকেছি। কিছু না লুকিয়ে সমস্ত কথা আমাকে খুলে বলুন। কোনও ভাবনা নেই। আমি সত্যই আপনার বন্ধু।"

ইতিমধ্যে সতীশবাবুও এসে হাজির হলেন। শক্তিপদর পরিচয় পেয়ে একখানা আসন গ্রহণ করে কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শক্তিপদ চেয়ারের উপরে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলতে আরম্ভ করলে ঃ

—"অবনী, বিধু আর আমি—তিনজনেই বন্ধু। আমাদের তিনজনের রুচি আর প্রকৃতি প্রায় একরকম বলে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কও হয়ে উঠেছিল বেশি ঘনিষ্ঠ। আমাদের ভিতরে অবনী ছিল সবচেয়ে ধনবান। বিধুর আর আমার অর্থভাণ্ডার অফুরন্ত না হলেও ভাল ভাবে সংসার চালিয়ে অপব্যয় করবার ক্ষমতা আমাদেরও ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু সাধারণ বিলাসী ধনীর মতো আমরা অর্থের অপব্যয় করতুম না। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের তিনজনের ধর্মকর্ম আর সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে প্রাণের টান ছিল অত্যন্ত। সৎগুরুর সন্ধান করবার জন্যে আমরা প্রায়ই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তুম। তীর্থক্ষেত্রে সাধুদের ভিড় হয় বলে আমরা ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে এসেছি বারংবার।

প্রায় পাঁচ বছর আগে বিন্ধ্যাচলে একজটা স্বামী নামে এক বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। বিপুল দেহ, দীপ্ত চক্ষু, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। তিনি বাক্যসংযমে অভ্যস্ত—প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মিনিট কয়েকের জন্যে দু'চারটি মাত্র বাক্যব্যয় করেন। তাঁর মধ্যে এতটুকু শান্তভাব ছিল না, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ—দেখলে ভক্তির চেয়ে ভয় হয় বেশি।

সকলেরই মুখে শুনলুম, তিনি সিদ্ধপুরুষ, শবসাধনা করেছেন, শ্মশানকালীর বর পেয়েছেন, জলে-স্থলে-শূন্যে তাঁর অবাধ গতি। তাঁর এমন কয়েকটি কার্যকলাপও দেখবার সুযোগ পেলুম, সত্যসত্যই যা অলৌকিক বলে বিশ্বাস হল।

তাঁর শিষ্যের সংখ্যা হয় না। কি এক মর্মভেদী দৃষ্টির আকর্ষণে আমরা তিনজনেও তাঁর বশীভূত হয়ে শিষ্যের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ফেললুম।

তারপর প্রতি বৎসরেই তিন চারবার করে আমরা তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গিয়েছি। ভারতের কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রে অজস্র অর্থব্যয় করে গুরুদেবের জন্যে নূতন নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি। প্রণামীর জন্যেও তাঁর পায়ে যে কত টাকা ঢেলেছি, সে কথা ভাবলেও আজ দুঃখ হয়। গুরুদেবের আদেশ বহন করে বারংবার দলে দলে গুরুভাই সন্ন্যাসীরা বেশ কিছুকালের জন্যে আমাদের বাড়িতে এসে অতিথি হয়ে রাজভোগ লাভ করে গিয়েছে। গুরুদেবের কাছ থেকে বিনিময়ে পেয়েছি কেবল শূন্য আশীর্বাদ। এ কথাও বলে রাখা ভাল, মাঝে মাঝে গুরুদেব সম্বন্ধে এমন সব ভাসা ভাসা কথা শুনেছি, যা কদর্য। কিন্তু সে সব আমরা দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছি। কী মোহটানে বাঁধা পড়েছিলুম, কিছুতেই আমাদের গুরুভক্তি কমেনি।

আমরা শেষবার গুরুদেবের দর্শন করতে যাই মাসখানেক আগে।

গুরুদেব আমাদের দেখে বললেন, "বৎস, তোমরা এসেছ, ভাল করেছ। আমি এমন এক স্বপ্নাদেশ পেয়েছি যা পালন করতে গেলে তোমাদের সাহায্যের দরকার হবে।'

অবনী বললে, 'আমরা পতঙ্গের মতো তুচ্ছ। আপনার মতো মহাপুরুষকে আমরা কি সাহায্য করতে পারি?'

বলছি, গুরুদেব ছিলেন স্বল্পবাক আর কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে তিনি বললেন, 'আজ তিনরাত্রি ধরে মহাকালী স্বপ্নে আমাকে আদেশ দিয়েছেন'—"

এইখানে হেমন্ত বাধা দিয়ে বললে, "শক্তিপদবাবু, একজটা স্বামী স্বপ্নে কি আদেশ পেয়েছেন তা আমি জানি। আপনারা তিনজনে যে তাঁর অনুরোধে বলির পশু অর্থাৎ মানুষ সংগ্রহে রাজি হননি, উল্টে পুলিসে খবর দেবার ভয় দেখিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তাও আমার অজানা নেই! একজটা স্বামীও যোগবলে আপনাদের সর্বনাশ করবেন বলেছেন, কেমন এই তো? তারপরের কথা বলুন—যা আমি জানি না!"

শক্তিপদ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে হেমন্তের মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, "এত কথা আপনি জানেন? আশ্চর্য! কিন্তু এরও পরে তো আর বেশি কিছু বলবার নেই!"

—"আছে বৈকি! একজটা স্বামী কি স্বপ্নাদেশ পালন করতে—অর্থাৎ নরবলি দিতে আরম্ভ করেছেন?"

—"না। তাহলে আমরাও পুলিসে খবর দিতুম। আসছে কালীপুজোর রাত্রে তাঁর প্রথম নরবলি দেবার কথা।"

—"বেশ। এইবারে কলকাতার এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতেচাই।"

—"অবনী আর বিধু কেমন করে মারা পড়েছে, তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কেবল খবরের কাগজে আমি দুই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা পাঠ করেছি। তবে একটা বিষয়ে আমার খটকা লেগেছে আর নিজের জন্য যথেষ্ট ভয়ও হয়েছে।"

—"কি রকম?"

—"গুরুদেব আমাদের সর্বনাশ করবেন বলেছিলেন, সে কথা আমি ভুলিনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই দুই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হয়তো গুরুদেব কিংবা তাঁর শিষ্যদের কোনও যোগাযোগ আছে।"

—"আপনার এ রকম সন্দেহের কারণ?"

—"কারণ, গুরুদেবের শিষ্যরা কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে।"

—"তাই নাকি? আপনার সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে?"

—"না। মাঝে আমি দিন চারেকের জন্যে কলকাতার বাইরে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে বাড়ির লোকের মুখে শুনলুম, একদল সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমি কলকাতায় নেই শুনে চলে গিয়েছে।"

—"কি করে জানলেন তারাই আপনার গুরুভাই?"

—"কারণ, গুরুদেবের শিষ্যরা ছাড়া দল বেঁধে আর কারা আমার বাড়িতে আসবে?"

—"সেটা কোন তারিখে?"

—"ঠিক তার পরের দিনেই অবনী আর সিধু মারা পড়েছে।"

হেমন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে, "শক্তিপদবাবু, সন্ন্যাসীরা কেন এসেছিল জানেন?"

—"ঠিক জানি না।"

—"তারা জানতে এসেছিল, নরবলি সম্বন্ধে আপনি মত পরিবর্তন করেছেন কিনা?"

—"তাদের সঙ্গে দেখা হলে বলতুম—না, আমি মত পরিবর্তন করিনি।"

—"তাহলে পরের দিন আপনাকেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত।"

—"কী বলছেন আপনি?"

—"হ্যাঁ, এই আমার অনুমান। জানেন শক্তিপদবাবু, ঠিক ওই দিনে সন্ন্যাসীরা অবনীবাবুর বাড়িতেও গিয়েছিল?"

—"তাই নাকি? কেন?"

—"এ খবরও পেয়েছি, অবনীবাবুর সঙ্গে কোনও কারণে তাদের ঝগড়া হয়, তারা খাপ্পা হয়ে চলে যায়। আমার অনুমান, নরবলি সম্বন্ধে অবনীবাবু মত পরিবর্তন করেননি বলেই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়। আমার বিশ্বাস, তারপর তারা গিয়েছিল বিধুবাবুর বাড়িতে, আর সেখানেও তারা মনের মতন উত্তর পায়নি। ফল—পরদিনেই অবনী আর বিধুবাবুর মৃত্যু!"

—"কি ভয়ানক!"

—"আপনি যে তারিখ বললেন তাইতেই বোঝা যাচ্ছে, সন্ন্যাসীরা ওই দিনেই আপনারও বাড়িতে গিয়েছিল। আপনিও যদি তাদের বিপক্ষতা করতেন, পরদিন তাহলে অবনী আর বিধুবাবুর সঙ্গে আপনাকেও পরলোকে প্রস্থান করতে হত। কিন্তু আপনি যে এখনও সশরীরে আমাদের সামনে বিদ্যমান আছেন, তার কারণ হচ্ছে প্রথমত, সন্ন্যাসীরা আপনার মত জানতে পারেনি; দ্বিতীয়ত, তারা খবর পেয়েছিল, আপনি তাদের নাগালের—অর্থাৎ কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন।"

বিষম আতঙ্কে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে শক্তিপদ বললে, "বলেন কি হেমন্তবাবু! এতক্ষণ পরে আমি আপনার বিজ্ঞাপনের অর্থ বুঝতে পারলুম।"

—"যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, কিন্তু এইবারে আমরা সাবধান হব। একজটা স্বামী যোগবলে আপনাদের সর্বনাশ করবেন বলেছিলেন, এ কথার অর্থ কি?"

—"জানি না। গুরুদেবের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু এটাও জানা কথা যে, অনেক সময়ে ম্যাজিককেও অলৌকিক ব্যাপার বলে ভ্রম হয়!"

—"সন্ন্যাসীদের কলকাতায় আস্তানা কোথায়?"

—"গড়িয়াহাটা থেকে খানিক তফাতে জঙ্গলের ভেতরে একটি পুরনো ভাঙা কালীমন্দির আছে। একজটা স্বামীর অনেক চ্যালা সেইখানে এসে থাকেন। কলকাতায় সন্ন্যাসীদের আর কোনও আস্তানা আছে বলে জানি না।"

—"আচ্ছা, সে খোঁজ আমরা নেব। কালি-কলম নিয়ে বসুন দেখি! আমার কথামতো আপনাকে একখানি চিঠি লিখতে হবে।"

শক্তিপদ বিস্মিত চোখে হেমন্তের মুখের পানে তাকালে। কিন্তু কোনও প্রতিবাদ না করে কালি-কলম নিয়ে বসল।

হেমন্তের কথামতো যে পত্রখানা লেখা হল, তা হচ্ছে এই :

শ্রীশ্রীএকজটা স্বামীজি সমীপেষু,

প্রভু,

আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম না, তখন আপনার কয়েকজন শিষ্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি জানিনা। এখন আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আপনার কোনও আদেশ থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

প্রভুর চরণে আর একটি নিবেদন করিতেছি। মহাকালীর স্বপ্নাদেশ মানিবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনার অভিপ্রায়ের কথাও শীঘ্রই পুলিসকে জানাইতে চাই। ইতি

সেবক—শ্রীশক্তিপদ মজুমদার

হেমন্ত উৎসাহিতভাবে বললে, "সন্ন্যাসীরা যদি গড়িয়াহাটার কাছে থাকে, চিঠিখানা কাল বৈকালের মধ্যেই পাবে।"

সতীশবাবু এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললেন, "তারপর?"

"তারপর? অবনী আর বিধুবাবুর বাড়িতে রাত্রে যে বা যারা হানা দিয়েছিল, শক্তিপদবাবুর বাড়িতেও তার বা তাদের আসবার সম্ভাবনা আছে—অবশ্য, এ ব্যাপারের সঙ্গে সত্যই যদি সন্ন্যাসীদের কোনও যোগাযোগ থাকে!"

শক্তিপদ শিউরে উঠে বললে, "কি সর্বনাশ! আপনি কি আমাকেও যমালয়ে পাঠাতে চান?"

—"মোটেই নয়, যম-দ্বার থেকে আপনাকে ফিরিয়ে আনতে চাই। কাল আপনাকে সপরিবারে আমার আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।"

—"আমাকে? সপরিবারে?"

—"হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যার আগেই আপনি সপরিবারে আমার বাড়িতে এসে রাত্রি যাপন করবেন। আপনার বাড়ির ভার নেব আমরা।"

সতীশবাবু বললেন, "সুন্দর ফন্দি! কিন্তু এত সহজ চালে আমরা কি কিস্তিমাত করতে পারব?"

—"অনেক সময়ে বোড়ের চালেই দাবা মরে। সতীশবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ মামলাটার মধ্যে এমন কোনও অদ্ভুত, অজানা রহস্য আছে, যা সাধারণ গোয়েন্দার ধারণার বাইরে। তাই সম্পূর্ণ নূতন দিক দিয়ে এই মামলাটাকে দেখবার চেষ্টা করছি। শেষ পর্যন্ত যদিও-বা রহস্য ভেদ করতে পারি, আসামীদের আইনের কবলে আনতে পারব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

—"হত্যাকারীকে জানতে পারলেও?"

—"হত্যাকারীকে জানতে পারলেও। যথার্থ আসামী হয়তো হত্যাকারী নয়।"

—"তাহলে সে কি কোনও দূতকে পাঠায়?"

—"ধরুন তাই। কিন্তু এ হচ্ছে এমন ভয়াবহ মৃত্যুদূত, কোনও কারাগারের পাথরের দেওয়ালও তাকে ধরে রাখতে পারবে না। অন্তত আমি সেই সন্দেহ করছি। আমার সন্দেহ মিথ্যা হতেও পারে।"

সতীশবাবু হতাশভাবে বললেন, "মশাই, আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম পরিচয় নয়, নইলে আপনাকে আমি পাগল বলে মনে করতুম। যাক ও কথা। এখন আমাদের কি করতে হবে বলুন।"

—"আমি, আপনি আর রবীন, আমাদের দল হবে কেবল এই তিনজনকে নিয়ে। আমরা আশ্রয় নেব শক্তিপদবাবুর বাড়ির আশেপাশে কোথাও।"

—"আর, ভূপতি?"

—"ঠিক বলেছেন, এ মামলার ভার পেয়েছেন ভূপতিবাবু। তাঁকে দলে না নিলে তিনি আবার অভিমান করতে পারেন!"

—"আমাদের সঙ্গে জনকয় পাহারাওয়ালা নিলে ভাল হয় না? হত্যাকারীর যে অমানুষিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে—"

—"তার কাছে লালপাগড়িদের সব জারিজুরি ব্যর্থ হওয়াই সম্ভব। তবু ইচ্ছা যদি করেন তাদের নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তাদের তফাতে লুকিয়ে রাখবেন আর বলে দেবেন যে, সঙ্কেত-বাঁশি না বাজালে তারা যেন কিছুতেই আত্মপ্রকাশ না করে।"

শক্তিপদর মুখ তখন মড়ার মতো সাদা হয়ে গেছে। তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে সতীশবাবু বললেন, "আপনার কোনও ভয় নেই মশাই! আপনি এখানে নিরাপদেই থাকবেন, কারণ, হত্যাকারীরা এ ঠিকানা জানে না। আপনার বিপদের ভার গ্রহণ করব আমরাই।"

দশম

ভূপতির ক্ষুধা সর্বদাই জাগ্রত

শক্তিপদর বাড়ির সদর দরজায় ঢুকতে গেলে ছোট্ট একটি জমি পার হতে হয়। জমির উপরে দু'টি গাছ আছে—একটি জাম, আর একটি কাঁঠাল গাছ। সেই দুই গাছের মাঝখান দিয়ে পথ।

জমির এপারে রাজপথ। তারও এপাশে একখানা প্রায় সম্পূর্ণ তিনতলা বাড়ি, এখনও তার ভিতরে-বাহিরে বালির কাজ আরম্ভ হয়নি—বাড়ির নিচে থেকে উপর পর্যন্ত মিস্ত্রীদের বাঁশের ভারা বাঁধা। স্থির হয়েছে, এই বাড়ির দোতলার একখানা ঘরের ভিতরে আশ্রয় নেবে হেমন্ত ও তার সঙ্গীরা।

যাদের অভ্যর্থনার জন্যে আজ তাদের এখানে আগমন, ব্ল্যাক আউট ও রাতের আঁধারে গা ঢেকে কখন যে তারা শক্তিপদর বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে সাংঘাতিক অভিনয় আরম্ভ করবে, কেউ তা বুঝতে পারবে না। যথাসময়ে তাদের উপস্থিতি আবিষ্কারের জন্যে হেমন্ত এক সহজ, কিন্তু ফলপ্রদ কৌশল অবলম্বন করলে। সন্ধ্যার পরেই কুলিদের দ্বারা ছোট্ট জমিটুকুর উপরে প্রায় একহাত পুরু করে বিছিয়ে রাখলে রাশি রাশি শুকনো পাতা! যে কেহ আসুক, মড়মড় ধ্বনি না জাগিয়ে নিঃশব্দে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না।

সতীশবাবু বললেন, "ছোট ছোট ব্যাপারে আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হতে হয়! আজ এখানে পাহারাওয়ালার কাজ করবে শুকনো ঝরাপাতারা! চমৎকার!"

এমন সময়ে মোটা ভুঁড়ি নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে ভূপতির আবির্ভাব। তিনি এসে ঘনায়মান অন্ধকার ভেদ করে চারিদিকটা দেখবার চেষ্টা করে ভুরু কুঁচকে বললেন, "পাহারাওয়ালারা কোথায়? তাদের সাড়া পাচ্ছি না বড় যে?"

সতীশবাবু বললেন, "তারা তফাতে লুকিয়ে আছে।"

—"তফাতে? তারা কাছে থাকলেই ভাল হত না?"

হেমন্ত বললে, "না। হত্যাকারীর পথ আমি খোলা রাখতে চাই।...কেবল তাই নয়, আমি পাহারাওয়ালাদের প্রাণরক্ষা করতে চাই।"

—"মানে?"

—"হত্যাকারীর প্রকৃতি কিছু কিছু আপনারও তো জানা আছে! তারপরেও 'মানে' জানতে চাইবেন না।"

—"চাইব না কি রকম? আমাদের প্রাণের বুঝি কোনও দাম নেই?"

সতীশবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "থামো ভূপতি, বাজে বোকো না! তোমাকে জবাই করবার জন্যে এখানে আনা হয়নি। আমরা থাকব ওই বাড়ির দোতলায়। এসো!"

সকলে সেই প্রায় সম্পূর্ণ বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলেন। নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে দেখা গেল, এককোণে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন।

ভূপতি খুঁতখুঁত করতে লাগলেন!—"মোটে একটা টিমটিমে হারিকেন! এর মানেই হয় না!"

হেমন্ত বললে, "একটু পরে এও নিবিয়ে দেওয়া হবে।"

—"ও বাবা! মানে!"

—"বলেন তো হত্যাকারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চার পাঁচটা লণ্ঠনও আনতে পারি।"

—"থাক মশাই, অতটা উপকার নাই-বা করলেন! আমার অন্ধকারই ভাল।"

ঘরটা বেশ বড়সড়। রাস্তার দিকে ছয়টা জানলা। কোনও জানলাতেই গরাদে নেই। তাদের ভিতর দিয়ে চোখ চালালে শক্তিপদর বাড়িটা আঁধারে ছায়া ছায়া দেখা যায়।

ভূপতি বললেন, "ঘরের কোণে ওটা আবার কি?"

হেমন্ত বললে, "ক্যামেরা।"

—"জানিনে বাপু, আপনার সবই যেন কেমনধারা! আমরা কি জন্যে এখানে এসেছি, শুনি? ছবি তুলতে, না খুনি ধরতে?"

—"হয়তো খুনিকে আমরা ধরতে পারব না!"

—"মানে?"

—"হয়তো খুনিকে ধরবার শক্তি আমাদের হবে না—ধরবার আগেই সে অদৃশ্য হবে!"

—"মানে?"

—"ভাবচি যদি পারি, তার একখানা ফোটো তুলে রাখব।"

—"এই অন্ধকারে?"

—"ফোটো উঠবে ফ্ল্যাশ-লাইটে।"

—"জানিনে বাপু!"

—"আপনার কিছু জানবার দরকার নেই। আমাদের জানবার কথা হচ্ছে, আপনার ক্ষিদে-টিদে পেয়েছে কি?"

ভূপতির দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "আজকালকার ছেলেদের মতো আমি ডিসপেপটিক নই। আমার ক্ষিদে সর্বদাই জাগ্রত।"

—"তাহলে ডানহাত বার করুন। এ কাজটা সময় থাকতে সেরে নেওয়া যাক।"

ভূপতি একগাল হেসে বললেন, "ভারি সমজদার মানুষ আপনি! এইখানে আপনার সঙ্গে আমার ভারি মেলে। পেটে খেলে, পিঠে সয়। কিন্তু এসে পড়েছি বেমক্কা জায়গায়, খাবারের ফর্দ নিশ্চয়ই খুব ছোট?"

—"নিশ্চয়ই বড় নয়। ফিস স্যালাড, চিকেন ওমলেট, চিকেন রোস্ট, কিমা কারি আর কাশ্মিরী পোলাও!"

—"বলেন কি, বলেন কি! এই মরুভূমিতে এ যে রীতিমতো সরস ভোজ! কই, কই দু'একখানা ডিশ ধীরে ধীরে ছুড়ে মারুন না!"

আহারাদি সমাপ্ত। খানিকক্ষণ হত্যাকারী সম্বন্ধে আলোচনা চলল। ভূপতি যতই শোনেন, ততই মুষড়ে পড়েন। মাঝে মাঝে খাবারের শূন্য পাত্রগুলোর দিকে করুণ চক্ষে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে চেয়ে রবীন বললে, "হেমন্ত, রাত এগারটা।"

—"তাহলে আলো নেবাও।"

ঘর অন্ধকার—বাইরেও চোখ প্রায় অচল। কেবল আকাশে জেগে আছে আলোকের ম্লান স্মৃতি মাত্র।

ভূপতি সকলের অগোচরে চুরি করে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে দেওয়ালে ঠেস দিলেন। তিনি হেমন্ত ও রবীনের জন্যে নির্দিষ্ট চিকেন রোস্ট আর ফিস স্যালাড পর্যন্ত নিজের পাতে টেনে নিয়েছেন। আর কাশ্মীরী পোলাও এত বেশি পেটে ঠেসেছেন যে সকলেরই ভাগে কম পড়ে গিয়েছিল। এর পরে মানুষের আর সজাগ হয়ে থাকা অসম্ভব।...সতীশবাবু মৃদুস্বরে হেমন্ত ও রবীনের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।...

রাত বারটা। ইতিমধ্যে গ্যাসের ক্ষীণ শিখাগুলো একেবারে নিবিয়ে দিয়ে গেল—পুরো ব্ল্যাক আউট! রাজপথে নেই জনপ্রাণীর পদশব্দ। অন্ধকার আর অন্ধকার! রাস্তার ধারের বাড়িগুলো যেন অধিকতর নিবিড় অন্ধকারের নিরেট প্রাচীর।

কী স্তব্ধতা—যেন শরীরী, যেন চেষ্টা করলে তাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরা যায়, যেন হিংস্র জন্তুর মতো সে বুকের উপরে বসে দম বন্ধ করে দিতে পারে।

সেই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার অদৃশ্য অন্তঃপুরে বসে নিশীথিনী যেন একটানা গান গেয়ে চলেছে ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম!

যারা প্রাণের কানে শুনতে পায়, তারাই বোঝে সেই মৃত্যুসঙ্গীতের অর্থ কি!

কিন্তু সেই ভয়ভরা মনদমানো স্তব্ধতাকেও যেন অস্থির করে তুলেছে, ভূপতির বিস্ময়কর নাসাযন্ত্রের অবিরাম ঘড়র ঘড়র ঘড়র ঘড়র গর্জন!

মানুষের অতটুকু নাক অত বেশি গর্জন করতে পারে? রবীন বিস্মিতভাবে সেই কথাই ভাবছিল। তারপর সে আর সইতে পারলে না, ভূপতিকে ধাঁ করে এক ধাক্কা মেরে বললে, "উঠুন ভূপতিবাবু! আপনার নাসিকার বেয়াড়া হুঙ্কার শুনলে খুনি আর এ পাড়া মাড়াবে না!"

ভূপতি ধড়ফড় করে উঠে বসে তাড়াতাড়ি রিভলবারে হাত দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, "কি বললে পতিত, সে এসেছে? ভয় নেই, আমার নাক ডাকলেও আমি ভয়ঙ্কর জেগে থাকি।"

সতীশবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "চুপ করো ভূপতি, তোমার পতিত এখানে নেই।"

ঊর্ধতন কর্মচারীর কণ্ঠস্বর শুনেই ভূপতি প্রাণপণে সজাগ হয়ে বললেন, "ভুল হয়েছে স্যর, আমিও জানি, পতিতের ছুটি এখনও মঞ্জুর হয়নি—সে গিয়েছে পাজির পা-ঝাড়া একজটা স্বামীর আখড়ার ওপরে কড়া পাহারা দিতে!"

সতীশবাবু বললেন, "দোহাই তোমার, চুপ করো!"

এরপরে নাকডাকানো বা কথা বলা কিছুই চলে না। সুপিরিয়র অফিসারের হুকুম! ভূপতি সত্যসত্যই চুপ!

অন্ধকার—ঘুট ঘুট ঘুট! স্তব্ধতা থম থম থম! রাত গাইছে ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম! কোথাকার একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি আচম্বিতে বেরসিকের মতো চেঁচিয়ে উঠল—ঢং! একটা,—রাত একটা।

আকাশের তারাগুলো হঠাৎ যেন মহা আতঙ্কে সচকিত! তিন চারটে জোনাকি নিবে আর জ্বলে বাজাচ্ছিল আলো-আঁধারের নীরব নূপুর, হঠাৎ তারা এলোমেলো গতিতে উড়ে পালাল কে জানে কোথায়! অন্ধকারও যেন বিপুলদেহ এক আহত গরুড়ের মতো অসহ্য যাতনায় করতে লাগল ছটফট ছটফট! মৃত রাজপথও যেন কোনও বিপুল পদভরে জ্যান্ত হয়ে উঠল!

হেমন্ত ফিস ফিস শব্দে বললে, "সতীশবাবু!"

সতীশবাবু তেমনই স্বরেই বললেন, "শুনেছি!"

ভূপতি সজোরে রবীনের হাত চেপে ধরে শিউরে উঠে বললেন, "বাপরে! কিসের শব্দ?"

রবীন বললে, "চুপ!"

ধুড়ুম, ধুড়ুম, ধুড়ুম, ধুড়ুম! ওকি কারুর পদধ্বনি,—না, কম্পিত পৃথিবীর স্তম্ভিত আত্মার উপরে ভেঙে পড়ছে কোনও প্রচণ্ড উপগ্রহ? ও শব্দ আর এক রাত্রে শুনেছে হেমন্ত ও রবীন। আর এক রাত্রে, সেই রক্তাক্ত অসম্ভব রাত্রে!

কোথা থেকে তিন চারটে নিদ্রোত্থিত কুকুরের অতি কাতর, যেন নেতিয়ে পড়া আর্তনাদ ডাকল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

থেমে গেল ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম রাতের কণ্ঠস্বর! কেঁদে কেঁদে উঠল যেন স্তব্ধতা, কেঁপে কেঁপে উঠল কাতর অন্ধকার!

মড় মড় মড় মড়—শুকনো পাতাদের অন্তিম আর্তনাদ! কে চলছে তাদের পাণ্ডুর ভঙ্গুর দেহ মাড়িয়ে, মাড়িয়ে, মাড়িয়ে!

দপ করে জ্বলে উঠল ভীষণ তীব্র ফ্ল্যাশ লাইটের অতি ক্ষণিক বিদ্যুৎ দীপ্তি! ছিন্নভিন্ন আঁধার পটে সিকি সেকেন্ডের জন্যে জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল কী এক অতিকায় অপচ্ছায়া— তাকে দেখা গেল এবং দেখা গেল না—তাকে বোঝা গেল, কিন্তু বোঝা গেল না! সঙ্গে সঙ্গেই সে কী গগনভেদী চিৎকার! সে কি গর্জন? সে কি আর্তনাদ? সে কি সিংহনাদ? সে কি? সে কি? সে কি?

আবার অতি—অতি—অতি—দ্রুত ধুড়ুম-ধুড়ুম ধুড়ুম-ধুড়ুম শব্দ,—সে কি পদশব্দ, না ভূমিকম্প?.....কিন্তু কে এল, কে গেল?

একাদশ

বক্তা হেমন্ত

রাত তখনও ফুরোয়নি। বাইরে তখনও দুঃস্বপ্নের মতো অন্ধকার। শহর তখনও ঘুমন্ত।

কিন্তু হেমন্তের বৈঠকখানার ভিতরটা আলোর আশীর্বাদে আনন্দময়।

মাঝখানকার বড় গোল টেবিলটা ঘিরে বসে আছেন সতীশবাবু, ভূপতি, রবীন ও শক্তিপদ। হেমন্ত দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের উপরে দু'হাত রেখে।

হেমন্ত বলছিল, "আমি যা বলি, মন দিয়ে শুনুন। বিশ্বাস না হলেও দয়া করে প্রতিবাদ করবেন না। যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল, আমার কথার সঙ্গে মনে মনে সেগুলো মিলিয়ে দেখুন। তাহলে নিজেদের মন থেকেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

প্রথম থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল, বর্তমান মামলার সঙ্গে অলৌকিক রহস্যের সম্পর্ক আছে। কেন আমার এমন ধারণা হয়েছিল, তা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার দরকার নেই, কারণ, তার প্রমাণ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

আমি বুঝলুম, যিনি এ মামলার কিনারা করতে চাইবেন, তিনি খালি গোয়েন্দা হলে চলবে না, তাঁকে আরও কিছু হতে হবে। গোয়েন্দার কাজ, সাধারণ অপরাধী ধরা। অলৌকিক রহস্যের মীমাংসা করবার শক্তি তাঁর নেই।

এই মামলার সাধারণ দিকটা খুবই সহজ। যে কোনও নিম্নশ্রেণীর পুলিস কর্মচারীরও সন্দেহ আর দৃষ্টি আকৃষ্ট হত সন্ন্যাসীদের দিকে। তিনি সন্ন্যাসীদেরই অপরাধী বলে সন্দেহ করতেন, কিন্তু তবু তাদের ধরতে বা স্পর্শ করতে পারতেন না। কারণ, তাদের ধরবার প্রমাণ কেবল মাত্র গোয়েন্দাগিরির দ্বারা পাওয়া অসম্ভব! এমন কি, আইনের সাহায্যেও তাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে না। আমিও তাদের গ্রেপ্তার করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না, তবে আপনাদের কাছে তাদের অপরাধ যে প্রমাণিত করতে পারব এমন আশা আমার আছে।

প্রথমেই আমি দেখলুম, হাতির মতো বা তার চেয়ে উঁচু কোনও জীব,—যে সিংহের মতো গর্জন করে, যার হাত-পা মানুষের মতো, অথচ তীক্ষ্ণ আর বৃহৎ নখওয়ালা—এ হচ্ছে কল্পনারও অগোচর। এমন জীব একালে কি সেকালে—অর্থাৎ ইতিহাসপূর্ব দানব-জীবের যুগেও—কখনও সত্যিকার পৃথিবীর মাটির উপরে বিচরণ করেনি। অথচ এমনই একটা উদ্ভট জীবকে আমি খুব অস্পষ্টভাবে স্বচক্ষে দেখেছি। সুদর্শনবাবুও দেখেছেন। রবীন তার স্পর্শ পেয়েছে। আপনারা অন্তত তার আশ্চর্য হাত আর পায়ের ছাপ দেখে বিস্মিত হয়েছেন।

তার আসুরিক—এমন কি অলৌকিক শক্তির প্রমাণ পেয়েছি আমরা সকলেই।

তখন আমার একমাত্র প্রশ্ন হল, বাস্তব জগতে এমন অসম্ভব জীবের আবির্ভাব সম্ভবপর হল কেমন করে? এর সহজ উত্তর এসেছিল, ভূপতিবাবু আর পতিতের মুখ থেকে।—'এ হচ্ছে নাকি ভৌতিক কাণ্ড!'

সতীশবাবু আর রবীনের বোধহয় অজানা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু আনাগোনা করবার চেষ্টা আমি করি। এ আমার চিরকালের অভ্যাস। আর আমার মত হচ্ছে, প্রত্যেক গোয়েন্দারই এই অভ্যাস থাকা উচিত।

সাধারণ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে স্পিরিচুয়ালিজম বা প্রেতবিদ্যা নিয়েও আলোচনা করেছি অল্পবিস্তর। কিন্তু কোনও কিম্ভূতকিমাকার প্রেত যে মানুষের হুকুমের দাস হয়ে যেখানে-সেখানে নরহত্যা করে বেড়ায়, প্রেতবিজ্ঞান আজ পর্যন্ত তার দৃষ্টান্ত দেয়নি। সুতরাং ধরে নিলুম, রামা-শ্যামা, যদু-মধু যেসব তথাকথিত কাল্পনিক ভূতের ভয়ে রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে কেঁপে মরে, আমাদের হত্যাকারী সে শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। প্রেততত্ত্ববিদরা চক্রে বসে যেসব দুরাত্মার শরীরী প্রকাশ দেখেছেন, এই হত্যাকারী তাদের দল থেকেও আত্মপ্রকাশ করেনি। মোট কথা, একে প্রেতাত্মাই বলা চলে না।

তবে এ কী? এর অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ যখন পেয়েছি, একে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। এ কে?

আবার ভাল করে প্রেতবিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করলুম। হঠাৎ একটি নতুন তথ্য পেলুম।

অনেক বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদের মত হচ্ছে, বিভিন্ন ভাবের আর চিন্তারও বিশেষ বিশেষ রূপ আছে। গভীর ধ্যান বা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভাবরূপকে মূর্তিমান করা যায়।

এই কথা প্রসঙ্গেই দু'তিনদিন আগে রবীনকে আমি বলেছিলুম, কালী-তারা-দুর্গা প্রভৃতি দেবী এক একটি বিশেষ ভাবের বিশেষ মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নন। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা সিদ্ধসাধক, সাধনার দ্বারা তাঁরা অর্জন করেছেন অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি! আর সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তাঁরা ইষ্টদেবতাদের মানসিক মূর্তিকে চোখের সামনে দেখতে পান জীবন্ত শরীরী রূপে।

ভাবতে লাগলুম, কোনও সাধু যদি শক্তি অর্জন করবার পর সাধনপথচ্যুত হয়ে দুষ্ট অভিপ্রায়ে ভীষণ কোনও হিংস্র ভাবকে জীবন্ত আর মূর্তিমান করতে চান, তাহলে সে চেষ্টাও তো অনায়াসেই সফল হতে পারে!

কথাটা শুনতে অদ্ভুত বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। অলৌকিক শক্তিশালী পাপাচারী বহু কাপালিকের কথা শোনা গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে আমার সন্দেহ পরিণত হল দৃঢ়বিশ্বাসে। তারপর বিধুবাবুর ডায়েরির লেখাটুকু পড়ে আমার মন বলে উঠল, 'এক্ষেত্রেও যখন এক দুরাচার কাপালিকের সন্ধান পাওয়া গেল, তখন সকল সন্দেহ ধুলোর মতো উড়িয়ে দাও ঝোড়ো বাতাসে!'

সূত্র পেলুম—যদিও এ সূত্র আদালতে গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু আদালতে প্রমাণিত হয় না বহু সত্যকথাই। আমরা সকলেই হিপ্‌নটিজম বা যোগনিদ্রা বা সম্মোহনবিদ্যার শক্তি দেখেছি। তাকে অলৌকিক শক্তি বললেও মিথ্যা হবে না। অপরাধের ক্ষেত্রে বহুবার নিশ্চিন্ত রূপে জানা গিয়েছে, দুষ্ট সম্মোহনকারীর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে অনেকে নরহত্যা বা চুরি করেছে, আদালত তবু সম্মোহনবিদ্যাকে সত্য জেনেও সত্য বলে মেনে নেয় না, সম্মোহনকারী শাস্তি পায় না।

আন্দাজ করলুম, পাপী একজটা স্বামী কোনও বিভীষণ ভাবরূপকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দেহী ও জ্যান্ত করে তুলেছে, আর তার দ্বারাই পথের কাঁটা সরাবার আশ্চর্য চেষ্টা করছে। সে বামাচারী কাপালিক, ধর্মোন্মাদের বশবর্তী হয়ে বারটি নরবলি দিতে চায়, কিন্তু অবনী, বিধু আর শক্তিপদ চান পুলিসে খবর দিয়ে তার এই ভীষণ ব্রত ভঙ্গ করতে। একজটা স্থির করেছে, এই তিনজনকেই বধ করবে। এমন কি, সে নিজের মুখেই বলেছে, এঁদের সর্বনাশ করবে—যোগবলের দ্বারা।

একজটার সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না বটে, কিন্তু তবু আমার দুর্ভাবনা কমল না। এক্ষেত্রে কোন বিভীষণকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তার প্রকৃতি আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু তার আকৃতি কি? তার আকৃতি তো খালি আন্দাজ করলে চলবে না, গোয়েন্দার কাজে সর্বাগ্রে দরকার, চাক্ষুষ প্রমাণ। নইলে আর সমস্ত আন্দাজি কথাকেই লোকে বলবে, পাগলের আজগুবি প্রলাপ।

অনেক ভেবেচিন্তে যে উপায় আবিষ্কার করলুম, আপনারা তা জানেন। বিভীষণ যতই রাত-আঁধারে গা ঢেকে আসুক, ফ্ল্যাশলাইটে ফোটো তুললে তার ভয়াবহ মূর্তিকে অন্তত ক্যামেরার কারাগারে বন্দী করতে পারব—এই হল আমার সিদ্ধান্ত।

আজ সে এসেছিল। আমি তার ছবি তুলেছি—ডেভালপও করেছি। একটু পরেই সকলে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন সে কি প্রচণ্ড, ভৈরব মূর্তি!

আজকের অভাবিত কাণ্ড সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, তাও বলে রাখি। যাকে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের দৈহিক শক্তি বাধা দিতে পারে না, সেই বিভীষণ আজ হঠাৎ অমন গগনভেদী আর্তনাদ করে পালিয়ে গেল কেন?

প্রেততত্ত্ববিদরা যখন 'চক্রে' বসেন, তখন ঘর করে রাখেন অন্ধকার বা প্রায়ান্ধকার। তাঁদের মতে, যে শক্তিকে তাঁরা চোখের সামনে শরীরী দেখতে চান, তার উৎপত্তি হয় ইথারের কম্পন (vibration of ether) থেকে। সাধারণ আলোক সে সইতে পারে না, ফ্ল্যাশ-লাইটের মতো অতি প্রখর আলোকের তো কথাই নেই। এই বিশ্বাস আমারও ছিল বলেই সেই মূর্তিমান মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছিলুম।

তারপর শেষ কথা। বাইরে দেখছি, ভোরের আলো ফুটছে। শুনতে পাচ্ছি পাখিদের ঘুম-ভাঙানো গান। এখনই বোধহয় পতিত এসে একজটা স্বামীর আশ্রমের খবর দেবে। সে কোন শ্রেণীর খবর আনবে বলতে পারি না, তবে আমার একটি সন্দেহ হচ্ছে।

আপনারা "Casting the Runes" বলে ব্যাপারটার রহস্য জানেন?...জানেন না? অল্প কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

'রুন' হচ্ছে ইউরোপের একরকম আদিম ভাষার নাম। এ ভাষা এখন মৃত। কিন্তু মধ্যযুগেও এ ভাষা চলিত না হলেও ইউরোপের যাদুকররা এই ভাষার সাহায্যে নাকি নানারকম রহস্যময় অপকর্ম করত। 'রুন' অক্ষরের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র লিখে তারা হয়তো কোনও কাল্পনিক দানবকে জীবন্ত আর মূর্ত করে তুলত। যাদুকরের যে কোনও শত্রুকে সেই দানব বধ করে আসত। দেখছেন, কাল্পনিক ভীষণতাকে মূর্তিমান করবার চেষ্টা আর কাহিনী আছে পৃথিবীর সব দেশেই?

তারপর 'রুন' মন্ত্রে সঞ্জীবিত দানবের একটা বিশেষত্বের কথাও শুনুন। বিশেষজ্ঞরা তাকে বিফল করবার পদ্ধতিও জানতেন। কিন্তু সে বিফল হলেও তার মৃত্যু ক্ষুধা কমত না। তখন নিজের সৃষ্ট দানবের কবলে পড়ে প্রাণ দিতে হত যাদুকরকেই!

আজ আমাদের বিভীষণ ব্যর্থ হয়েছে। যদিও সে 'রুন' মন্ত্রে সৃষ্ট হয়নি, তবু তার অশান্ত রক্ততৃষ্ণা কেমন করে তৃপ্ত হবে, বুঝতে পারছি না।

আমার দরজায় একখানা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ হল না? উঠে দেখো তো রবীন, বোধহয় শ্রীমান পতিতপাবন আসছেন রিপোর্ট দাখিল করতে।"

দ্বাদশ

পতিতের রিপোর্ট

হ্যাঁ, পতিতই বটে! কিন্তু কী তার চেহারা! তার চোখ দু'টো উদভ্রান্ত, মুখের ভাব কাঁদো-কাঁদো, দেহ কাঁপছে থর থর করে! জামাকাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, চুল উস্কোখুস্কো।

ভূপতি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "পতিত, পতিত, কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি? তোমার অত শখের টেরি গেল কোথায় হে?"

পতিত ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে অর্ধ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "আর সখের টেরি! স্যর, স্যর, ছুটির দরখাস্ত করেছিলুম, কিন্তু ছুটি দিলেন না কি আমাকে যমালয়ে পাঠাবার জন্যে?"

ভূপতি বললেন, "কিন্তু তুমি তো যমালয়ে যাওনি পতিত। জলজ্যান্ত বেঁচে আছ!"

—"সেটা বাপের পুণ্যে স্যর, বাপের পুণ্যে! নইলে এতক্ষণে হত পতিতের পতন!"

সকলে হেসে উঠল।

—"আবার হাসছেন স্যর? আমি যা দেখেছি স্যর, তা দেখলে আর কোনও মানুষ বাঁচে না।"

হেমন্ত বললে, "পতিতবাবু, আপনার বীরত্ব আর সাহসকে আমরা ধন্যবাদ দিতে রাজি আছি—যদি তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে সব কথা খুলে বলেন!"

—"বলছি স্যর, বলছি—সব কথা বলবার জন্যেই তো বেঁচে ফিরে এসেছি। আগে এক গেলাস জল দিন, নইলে এই কাঠ গলায় কথা কইতে পারব না!"

জলপান করে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়ে পতিত যা বললে তা হচ্ছে এই :

"রীতিমতো জঙ্গলের মধ্যে এক পোড়ো কালীমন্দির। সেইখানেই পাঁচ ছয়খানা মাটির ঘর বানিয়ে আড্ডা গেড়েছে দশ-বারজন হিন্দুস্তানি সন্ন্যাসী। বেটাদের চেহারা দেখলেই ভয় হয়।

সন্ধের আগেই আমি পাহারাওয়ালাদের নিয়ে চুপিচুপি চারিদিক ঘেরাও করে ফেললুম। আমি নিজে গিয়ে উঠলুম একটা বটগাছের উপরে। সেখান থেকে আখড়ার সমস্তটা দেখা যায়।

তারপর সন্ধে হল, আর এল ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমারও চোখ হয়ে গেল অন্ধ। বলতে লজ্জা নেই স্যর, আমি একটু-আধটু ভূত বিশ্বাস করি। মনের ভিতর যা হচ্ছিল, তা আর বলবার নয়। কিন্তু কি করব—ডিউটি ইজ ডিউটি!

রাত প্রায় আটটার সময়ে দেখলুম, সন্ন্যাসীরা মন্দিরের সামনের জমিতে গোল হয়ে বসে আছে। তারা একটা ধুনি জ্বালিয়েছিল—তার ভিতর থেকে যদিও আগুনের শিখা বেরুচ্ছিল না, তবু জাগছিল কেবল একটু একটু আলোর আভা। সেই আভায় সন্ন্যাসীদের মূর্তি ঝাপসা ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছিল।...দেখা যাচ্ছিল বললেও ভুল হয়, একদল কালি দিয়ে আঁকা মানুষ যে ওখানে এসে বসে আছে, আমি খালি এইটুকুই আন্দাজ করতে পারছিলুম!

তারপরেই শুনতে পেলুম, সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়ছে।

এইভাবে কেটে গেল কতক্ষণ! মশা আর নানারকম পোকামাকড়ের কামড়ে ছটফট করতে করতে আমি তখন ভাবছি, কতকগুলো বাজে সন্ন্যাসীর একঘেয়ে মন্ত্রপড়া শোনবার জন্যে কেন নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে এখানে পাঠানো হল, তখন হঠাৎ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, সন্ন্যাসীদের মণ্ডলের মাঝখান থেকে দুলে দুলে উঠছে যেন একটা বিদকুটে ছায়া!

খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলুম, তবু বুঝতে পারলুম না, সে ছায়াটা কিসের! আরও আশ্চর্য এই যে, দেখতে দেখতে ছায়াটা ক্রমেই যেন ঘন হয়ে দেখাতে লাগল অন্ধকারের চেয়েও কালো অন্ধকারের মতো! তখন মনে হল, সেটা সাধারণ ছায়া নয়—মস্ত এক ছায়ামূর্তি! সে লম্বায় হবে

প্রায় তের-চৌদ্দ হাত। বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, ছায়া মূর্তিটাকে মনে হচ্ছিল যেন নিরেট, আর তার উপরদিকে জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল দুটো নীল আগুনের গোলা!

তারপরেই শব্দ শুনলুম হুম হুম হুম হুম। ঠিক যেন প্রকাণ্ড হাঁড়ির মধ্যে ফাটছে বুমবুম করে বোমার পরে বোমা! সন্ন্যাসীদেরও মন্ত্র পড়ার ধুম বেড়ে উঠল—সে তো মন্ত্র পড়া নয়, যেন সংস্কৃত ভাষায় তর্জন গর্জন!

বারবার আমার মনের অবস্থার কথা বলে আপনাদের আর বিরক্ত করব না। আমার মন যে কেমন করছিল, কথায় তা বোঝানোও অসম্ভব। ওইসব দেখেশুনে আমি বেঁচে ছিলুম, এইমাত্র! যাকে বলে—কণ্ঠাগতপ্রাণ।

হঠাৎ দেখি ছায়ামূর্তিটা অদৃশ্য! কানে শুধু শব্দ জাগল, ধড়াম ধড়াম ধড়াম ধড়াম! কার পায়ের চাপে হচ্ছে থরথর ভূমিকম্প।

ভয়ে আমি গাছের ডালের সঙ্গে একেবারে যেন মিশিয়ে রইলুম।

ধড়াম ধড়াম শব্দ আর ভূমিকম্প থামল, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মন্ত্রপড়া থামল না! তখন তারা যেন ক্ষেপে গিয়ে দস্তুরমতো চিৎকার করে মন্ত্র পড়ছিল। তারপর যে আরও কতক্ষণ ধরে আমি সেই ভুতুড়ে মন্ত্রপাঠ শুনলুম তা জানেন খালি ভগবান। নিজের সময়জ্ঞান আমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলুম।...

হঠাৎ আবার সেই বিশ্রী কাণ্ড! ধড়াম ধড়াম আওয়াজ আর সেই ভূমিকম্প! আমার খানিক তফাৎ দিয়ে বয়ে গেল যেন একটা দমকা ঝড়! গাছের পাখিরা পর্যন্ত আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল।

তারপরেই যা হল, বর্ণনা করতে পারব না। মন্ত্রপাঠের ধ্বনি গেল থেমে, তার বদলে জাগল আচম্বিতে আকাশফাটানো সিংহনাদ, হুঙ্কারের পর হুঙ্কার, অট্টহাস্যের পর অট্যহাস্য, বীভৎস আর্তনাদ, অনেক লোকের হাঁউমাউ চিৎকার, হুটোপুটি ছুটোছুটির শব্দ! ভীষণ আতঙ্কে আমি গাছের উপর থেকে একেবারে মাটির উপরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলুম!...

যখন জ্ঞান হল, তখনও আকাশ ভাল করে ফরসা হয়নি! ভয়ে ভয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে কোথাও কারুকে দেখতে পেলুম না। তখন সাহস করে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে মন্দিরের কাছে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম, সেও এক বীভৎস দৃশ্য!

একটা নিবে যাওয়া ছাই ভরা ধুনির চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে কোনও মানুষের খণ্ড-খণ্ড দেহ! কোথাও চূর্ণবিচূর্ণ মুণ্ড, কোথাও হাতের, কোথাও গায়ের, কোথাও বা দেহের অন্যান্য কুচি কুচি অঙ্গপ্রতঙ্গ! ঠিক এমনই দৃশ্য দেখেছিলুম অবনীবাবুর ঘরে ঢুকে!

মাটির ঘরের ভিতরে পাওয়া গেল কেবল দু'জন ভয়ে আধমরা সন্ন্যাসীকে—তাদের ধরে এনেছি। আর সবাই পিটটান দিয়েছে।

শুনছি ওই খণ্ড খণ্ড লাশ হচ্ছে একজটা স্বামীর!"

হেমন্ত বলে উঠল, "যা ভেবেছি তাই। হিংস্র দানব তার স্রষ্টাকেই সংহার করেছে।"

সতীশবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "আপনি ফ্ল্যাশ লাইটে কার ফোটো তুলেছেন?

হেমন্ত পকেট থেকে একখানা প্লেট বার করে দেখালে। সকলে বিষম আগ্রহে তার উপরে ঝুঁকে পড়ল।

সতীশবাবু ভয়স্তম্ভিত স্বরে বললেন, "ভয়ানক, ভয়ানক। এ যে নৃসিংহ মূর্তি! মানুষের দেহে সিংহের মুণ্ড!"

হেমন্ত বললে, "হ্যাঁ। একজটা স্বামীর ইচ্ছাশক্তি জীবন্ত করেছিল এই মূর্তিকেই!"

রবীন বললে, "ভগবান তো নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন, পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যে!"

"এ মূর্তি ভগবানের নয় রবীন, এ কেবল সেই মূর্তির বাইরেকার খোলস! এর মধ্যে আত্মাও ছিল না, পরমাত্মাও ছিলেন না, ছিল কেবল দুরাত্মার দুরন্ত ইচ্ছাশক্তি!"

রবীন বললে, "এই দানব এখন কোথায়?"

হেমন্ত বললে, "ভাবের রাজ্যে।"

ভূপতি বললে, "মানে?"

হেমন্ত বললে, "এ মূর্তি এখন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।"

পতিত সানন্দে নেচে উঠে বললে, "আপদ গেছে স্যর, আপদ গেছে! আর আমাকে তদন্তে যেতে হবে না! ওই মূর্তি এখনও জ্যান্ত থাকলে আমি আর ছুটির জন্যে দরখাস্ত করতুম না, পুলিসের চাকরিতে একেবারে ইস্তফা দিতুম!"

মানব-দানব

॥ প্রথম ॥

রহস্যময় বাড়ি

যাকে বলে মিশুক লোক, অ্যাটর্নি অবিনাশবাবু সে-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না।

কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি। রোগা-সোগা লম্বাটে চেহারা, সর্বদাই গম্ভীর মুখে থাকেন, কথাবার্তা কন খুবই কম। তবু লোকে তাঁকে অপছন্দ করে না।

তাঁর সহ্যশক্তি ছিল যথেষ্ট। যখন কোনও আসরে গিয়ে বসতেন, কোনওরকম অন্যায় কথা বা যুক্তিহীন তর্কই তাঁকে বিচলিত করতে পারত না।

অতিগম্ভীর মুখে তাঁর শান্ত ও মিষ্ট চোখ দুটি সকলকেই আকর্ষণ করত। নিজের প্রকৃতির মাধুর্যকে তিনি চেহারায় ও কথাবার্তায় প্রকাশ করতে পারতেন না বটে, কিন্তু সেটা বিশেষ রূপে ফুটে উঠত তাঁর অনেক সদয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে।

কারণে বা অকারণে অবিনাশবাবুর মন যে-দিন কিঞ্চিৎ খুশি থাকত, সেদিন এক পেয়ালার পরেও তিনি আর এক পেয়ালা চা পান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এবং সেদিন দ্বিতীয় পেয়ালা চা পান করতে করতে তিনি নিজের কথাবার্তার মাত্রাও বেশ কিছু বাড়িয়ে না ফেলে পারতেন না।

তিনি সহজে কারুর সঙ্গে মিশতেন না,—কিন্তু এক-দিন যার সঙ্গে মেলামেশা করতেন, সে হয়ে থাকত তাঁর চিরদিনের বন্ধু।

এর ঠিক উলটো প্রকৃতি ছিল তাঁর বন্ধু সদানন্দবাবুর। তাঁর মুখও যেমন, কথাবার্তাও তেমনি সর্বদাই হাসিখুশিমাখা। সামাজিকতায়, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায় ও নানারকম গল্প-গুজবে তিনি ছিলেন যাকে বলে অদ্বিতীয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত না যে, অবিনাশবাবুর সঙ্গে সদানন্দবাবুর স্বভাবের মিল আছে কোথাও। অথচ এরা দুজনেই ছিলেন দুজনের বিশেষ বন্ধু। সরস ও নীরস চেহারার ভিতরে এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব দেখা যায় না সচরাচর।

তাঁদের একটা মস্ত অভ্যাস ছিল। সেটা হচ্ছে দুই বন্ধুতে মিলে কলকাতার পথে-বিপথে বেড়িয়ে বেড়ানো। তাঁরা যখন বেড়িয়ে বেড়াতেন তখন দেখলে মনে হত, তাঁদের দুজনেরই ধাত বুঝি একই রকম! দুজনেই গম্ভীর, বোবার মতন নির্বাক। পৃথিবীর কোনও কিছুর দিকেই যে তাঁদের প্রাণের টান আছে এবং তাঁরা যে পরস্পরের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করছেন, এ কথা তাঁদের মুখ দেখে বোঝা অসম্ভব ছিল। অথচ সন্ধ্যার সময়ে দুজনে মিলে একটিবার বেড়িয়ে আসতে না পারলে দুই বন্ধুরই প্রাণ যেন ছটফট করতে থাকত।

ব্লটিংয়ের উপরে কালির ফোঁটা যেমন ক্রমেই বড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, আজকাল কলকাতা শহরের আকারও তেমনি বড়ো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এক-একটি এমন

নতুন পল্লি তৈরি হয়েছে, যার ফিটফাট পরিষ্কার ঝরঝরে রূপ দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। পুরানো কলকাতা শহরের সঙ্গে এ-পল্লিগুলি যেন কিছুতেই খাপ খায় না। ঠিক যেন কোনও কয়লার মতন কালো ও ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরা একটি মেয়ের গায়ে জড়োয়ার গয়না সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

এই রকমই একটা নতুন তৈরি পল্লির ভিতর দিয়ে সেদিন বৈকালে অবিনাশবাবু ও সদানন্দবাবু একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে চলেছিলেন। খানিকক্ষণ পরেই তাঁরা একটি অদ্ভুত-আকার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ও-রকম একটা নতুন পল্লির ভিতরে এমন মান্ধাতার আমলের আশ্চর্য বাড়ি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়িখানা দেখলেই বোঝা যায়, তার বয়স একশো বছরের কম নয়। এবং গেল পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে সে-বাড়ির গায়ে যে রাজমিস্ত্রি হাত দিয়েছে, এমন প্রমাণও নজরে পড়ে না। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। অথচ তার দোতলায় জানলা আছে মোটে চারটে। একতলায় আছে গুটি-দুয়েক জানলা ও একটি মস্ত সদর দরজা। ফুটপাতের উপরে বাড়ির সামনে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত একটি লম্বা রোয়াক একটানা চলে গিয়েছে। সেই রোয়াকের উপরে পানওয়ালা, ভুনিওয়ালা ও ফুলুরিওয়ালারা নোংরা দোকান সাজিয়ে বসেছে এবং রাত্রে মুটে ও ভবঘুরেরা সেখানে আরামে গা ঢেলে দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুখের স্বপন দেখে। বাড়ির সদর দরজা প্রায় সর্বদাই বন্ধ থাকে এবং ইস্কুলের ছেলেরা দরজার কাঠের উপরে ছুরি দিয়ে নিজেদের নামকে অমর করবার চেষ্টা করে যায়। বাড়ি ও তার বাসিন্দারা এসব অত্যাচার নির্বিবাদে সহ্য করে।

নিজের বেতের ছড়িটা তুলে এই বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে সদানন্দ বললেন, 'অবিনাশ, এ বাড়িটা কোনওদিন তুমি লক্ষ করেছ কি?'

সদানন্দের কথা শুনে অবিনাশের মুখের ভাব যেন একটু বদলে গেল। তিনি খালি বললেন, 'কেন বলো দেখি?'

—'এই বাড়ির সম্বন্ধে আমি একটা বেয়াড়া গল্প বলতে পারি।'

—'শুনি।'

সদানন্দ বলতে লাগলেন

'কিছুদিন আগেকার কথা। পুজোর সময় বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম, কলকাতায় যখন ফিরলুম তখন শেষ রাত। ট্যাক্সি করে নিজের বাড়ির দিকে আসছি। পথের পর পথ—নির্জন ও ঘুমন্ত। পথের পর পথ—যেন কোনও অদৃশ্য শোভাযাত্রার আলোর মালা সাজিয়ে গ্যাসপোস্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। পৃথিবীতে যে জীবন্ত মানুষ আছে তা প্রমাণিত করবার জন্যে একটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ি পর্যন্ত দেখা দিলে না।

'অন্তত একজনও চলন্ত মানুষ দেখবার জন্যে আমার প্রাণ-মন যখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তখন রাস্তার মোড়ে হঠাৎ দেখতে পেলুম দুটো মূর্তিকে। প্রথম মূর্তিটা মাথায়

বেঁটেসেঁটে, খুব তাড়াতাড়ি হনহন করে এগিয়ে আসছে। অন্য মূর্তি হচ্ছে একটি ছোটো মেয়ের—বয়স আট-দশের বেশি হবে না, সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছিল। রাস্তার বাঁকের মুখে দুজনেই দুজনের উপরে গিয়ে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে মেয়েটি ফুটপাতের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। অবিনাশ, তার পরের কথা তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না! কারণ, সেই বেঁটে লোকটা সেই কচি বাচ্ছার গায়ের উপরে দুই-পা রেখে উঠে দাঁড়াল, তারপর খুব সহজ ভাবেই তাকে দুই পায়ে থেঁতলে নির্বিকারের মতন আবার পথ চলতে লাগল। মেয়েটি পাড়া কাঁপিয়ে আর্তনাদ শুরু করে দিলে।

'রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল। টপ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ছুটে গিয়ে তার কোটের গলাটা সজোরে চেপে ধরলুম। কিন্তু তার মুখের পানে তাকিয়ে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল। অবিনাশ, সে-মুখ মানুষের মুখ নয়—মানুষের ছাঁচে গড়া সে যেন কোনও অজানা হিংস্র জানোয়ারের মুখ! আমি তার গলা চেপে ধরতেই সে ফিরে দাঁড়িয়ে যে-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলে তাও এক ভয়ানক অমানুষিক ভাবে ভরা! কিন্তু আমি যখন তাকে আবার ঘটনাস্থলের দিকে টেনে নিয়ে চললুম, তখন সে আমাকে কোনওরকম বাধা দেবার চেষ্টা করলে না।

'ঘটনাস্থলে তখন মেয়েটির কান্না শুনে অনেক লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। মেয়েটি এই অসময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল পাড়ার এক ডাক্তার ডাকবার জন্যে—তার বাড়িতে নাকি কার খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। ডাক্তারকে খবর দিয়ে ফেরবার মুখেই এই কাণ্ড!

'ইতিমধ্যে ডাক্তারও এসে হাজির! সব শুনে তিনিও লোকটার দিকে রুখে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু তার চেহারা দেখে ভয়ে চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডাক্তারের মুখ দেখেই বুঝলুম, এই নৃশংস জীবটাকে উচিতমতো শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁর হাতদুটো নিসপিস করছে, কিন্তু তাঁর সাহসে কুলোচ্ছে না! পথে এসে যারা জড়ো হয়েছিল তারাও সবাই রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই মূর্তিমান নর-পিশাচের চেহারা দেখে তাদের সকলেরই বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল!

'আমি লোকটাকে ডেকে বললুম, 'আপনার মতন পাষণ্ড দুনিয়ায় আমি দুটি দেখিনি! আপনি মানুষের সমাজে থাকবার যোগ্য নন।'

'লোকটা বললে, 'মশাই, এই সামান্য একটা দৈব-দুর্ঘটনা নিয়ে আপনারা এত বেশি গোলমাল করবেন না। আপনি কী করতে চান?'

—'আপনাকে নিয়ে থানায় যেতে চাই।'

—'মশাই, থানায় গিয়ে কোনও ভদ্রলোকই মান খোয়াতে রাজি হয় না। কিছু টাকা পেলে যদি আপনাদের সাধ মেটে তাহলে আমি টাকা দিতে রাজি আছি।'

'আমরা সবাই মিলে স্থির করলুম ক্ষতিপূরণের জন্যে লোকটাকে একশো টাকা দিতে হবে।

'টাকার পরিমাণ শুনে লোকটা প্রথমে কিছু ইতস্তত করতে লাগল,—কিন্তু সকলের মারমুখো মূর্তির দিকে চেয়ে শেষটা সে রাজি হয়ে গেল। বললে, 'তাহলে আপনারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন। আমার বাড়িতে গেলেই টাকা পাবেন।'

'তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই অগ্রসর হলুম। কিন্তু সে আমাদের কোথায় নিয়ে এল, জানো অবিনাশ? এই বিদকুটে বাড়িটার সামনে! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা চাবি বার করে দ্বার খুলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল এবং খানিক পরেই একখানা চেক হাতে নিয়ে ফিরে এল। চেকের তলায় যিনি নাম সই করেছেন, তিনি শুধু আমারই জানিত লোক নন, এই শহরের একজন বিখ্যাত ও মাননীয় ব্যক্তি।

'আমি বিস্মিত স্বরে বললুম, 'মশাই, ব্যাপারটা বড়ো গোলামেলে বলে মনে হচ্ছে। কার চেক আপনি কাকে দিচ্ছেন?'

'লোকটা বিশ্রী ভাবে দন্তবিকাশ করে বললে, 'আপনাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমি নিজেই গিয়ে চেকখানা ভাঙিয়ে দিতে রাজি আছি।'

'আমরা তাই-ই করলুম। তাকে নিয়ে তখনকার মতন আবার বাড়িতে ফিরে এলুম। তারপর যথাসময়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আমি নিজের হাতে চেকখানা দাখিল করলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ চেক জাল ও অচল। কিন্তু ব্যাঙ্কে সেই চেক চলল।'

অবিনাশ বললেন, 'হুঁ। তাই নাকি?'

সদানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ। তুমিও বোধ হয় আমারই মতো আশ্চর্য হচ্ছ? বাস্তবিক, চেকের তলায় যাঁর নাম ছিল, তাঁর মতন মহৎ লোক এমন জানোয়ারের সঙ্গে কখনওই কোনও সম্পর্ক রাখতে পারেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনওরকম ভয়-টয় দেখিয়ে এই লোকটা তাঁর কাছ থেকে চেকখানা আদায় করেছিল।'

অবিনাশ হঠাৎ গলার স্বর বদলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চেকে যিনি নাম সই করেছিলেন তিনিও ওই বাড়িতে থাকেন কি না, সে-খোঁজ নিয়েছ কি?'

সদানন্দ বললেন, 'ও-বাড়িতে কখনও কোনও ভদ্রলোক বাস করতে পারেন? ও কি ভদ্রলোকের জায়গা? চেকে যিনি নাম সই করেছিলেন, তাঁর বাসা যে অন্য জায়গায়, একথা তো আমি আগে থাকতেই জানি!'

—'এ বিষয়ে তুমি আর কোনও খোঁজখবর নাওনি?'

—'না, নেওয়া দরকার মনে করিনি। তবে এ পথ দিয়ে গেলেই ওই অদ্ভুত বাড়িখানা ভালো করে লক্ষ না করে আমি পারি না। ওটা আমার বাড়ি বলেই মনে হয় না। অত বড়ো বাড়িতে মোটে ওই ক-টি জানলা! জানলাগুলো কখনও খোলাও দেখিনি! সদর দরজাটাও সর্বদাই বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে কেবল সেই বিশ্রী লোকটা ওই দরজা খুলে বাইরে আসে। ও-বাড়িটা যেন রহস্যময়!'

খানিকক্ষণ দুজনে নীরবে পথ চললেন। অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে সদানন্দের মনে হল তাঁর বন্ধু যেন কোনও দুর্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

মিনিট-কয় পরে অবিনাশ বললেন, 'সদানন্দ, তুমি সেই বিশ্রী লোকটার নাম জানো?'

—'তিনকড়ি বটব্যাল।'

—'বটে। তাকে দেখতে কী রকম?'

—'তার চেহারার সঠিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব! তার দেহ দেখতে সাধারণ মানুষেরই মতন, কিন্তু তবু, তাকে দেখলে মোটেই সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না। সন্দেহ হয়, যেন তার দেহের ভিতরে কী-একটা মস্ত অভাব থেকে গিয়েছে—হয়তো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত! তার মুখের দিকে তাকালেই ভয়ে ও ঘৃণায় বুকের ভিতরটা কেমন করতে থাকে! তার চেহারা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে, তা খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই!'

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকবার পর অবিনাশ বললেন, 'আচ্ছা, তিনকড়ি যে নিজের চাবি দিয়েই সদর দরজাটা খুলেছিল, এ-বিষয়ে তোমার কোনওই সন্দেহ নেই তো?'

সদানন্দ বিস্মিত স্বরে বললেন, 'এ কী রকম আশ্চর্য প্রশ্ন!'

অবিনাশ বললেন, 'প্রশ্নটা তোমার আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে বটে! চেকে যাঁর নাম সই ছিল, সে-ভদ্রলোককে আমি খুবই চিনি। কিন্তু আমার গোল বাধছে এই তিনকড়িকে নিয়ে। সে কি সত্যিই নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলেছিল?'

সদানন্দ বললেন, 'এই সামান্য চাবির কথা নিয়ে কোথায় যে গোল বাধল, আমি তো সেটা আন্দাজ করতে পারছি না! হ্যাঁ, সে তার নিজের পকেট থেকেই চাবি বার করেছিল।'

অবিনাশ বললেন, 'ব্যাস, এ কথা চাপা দাও! উঃ, অনেক কথা কয়ে ফেললুম—এত কথা কওয়া আমার উচিত হয়নি!'

॥ দ্বিতীয় ॥

তিনকড়ি লোকটা কে?

অবিনাশবাবুর মগজে আজ যে কী পোকা ঢুকেছে তা আমরা বলতে পারি না। একে তো স্বভাবতই তিনি গম্ভীর—আজ সেই গাম্ভীর্যের উপরে আবার বিরক্তিরও ছায়া এসে পড়েছে।

অন্য অন্য দিন বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন। কিন্তু আজ তিনি সেসব কিছুই করলেন না, বসে বসে খালি কী যে ভাবতে লাগলেন তা কেবল তিনিই জানেন!

খানিক পরে উঠে দেরাজ খুলে তিনি একতাড়া কাগজ বার করলেন। সেই লম্বা কাগজগুলোর উপরে লেখা রয়েছে, 'ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়ের উইল'। উইলখানা তিনি এর আগেও কয়েকবার পড়েছিলেন, আজও আর একবার পড়ে দেখলেন। উইলের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই

ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়, M. D., D. C. L., LL. D., F. R. S., পরলোকগত হলে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর উপকারী প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বটব্যাল ভোগ-দখল করতে পারবেন।

কিন্তু ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায় যদি কখনও তিন মাসের বেশি অদৃশ্য হয়ে থাকেন, তাহলেও উক্ত তিনকড়িবাবু বিনা বাধায় ডাক্তার জয়ন্তবাবুর সমস্ত সম্পত্রি মালিক হতে পারবেন।

উইলখানা পড়তে পড়তে অবিনাশবাবুর মুখের অন্ধকার আরও বেশি ঘনিয়ে উঠল। এতকাল অ্যাটর্নিগিরি করছেন, কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া উইল জীবনে তিনি কোনওদিনই দেখেননি। মানুষ যে সজ্ঞানে এমনধারা উইল করতে পারে, একথা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না—এ উইলখানা দেখলেই তাঁর চোখ যেন জ্বালা করতে থাকে।

উইলখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে অবিনাশবাবু নিজের মনেই বললেন, 'এ খালি পাগলামি নয়, ঘৃণার ব্যাপারও বটে।'

পরের দিন সকালে উঠে তিনি ডাক্তার করুণাকুমার চৌধুরির উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। করুণাবাবুর মতন বিখ্যাত ডাক্তার শহরে খুব কমই আছেন। করুণা ছিলেন অবিনাশের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু এবং তাঁদের সে বন্ধুত্ব আজও অক্ষত আছে। অবিনাশবাবুর বিশ্বাস, করুণাবাবু ছাড়া আর কেউ খামখেয়ালি জয়ন্তডাক্তারের হাঁড়ির খবর দিতে পারবে না—কারণ তাঁরা দুজনে খালি সম-ব্যবসায়ী নন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে।

অবিনাশবাবুকে দেখে করুণা খুব সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। চা পান করতে করতে দুজনে মিলে খানিকক্ষণ একথা সেকথা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা করুণা, তোমার আর আমার চেয়ে বড়ো বন্ধু জয়ন্তের বোধহয় আর কেউ নেই, কী বলো?'

করুণা বললেন, 'এ কথা সত্যি বটে। কিন্তু, হঠাৎ এমন কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন বলো দেখি? আজকাল তো জয়ন্তের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে।'

—'তাই নাকি? তোমরা দুজনেই ডাক্তার অথচ তোমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই?'

—'আগে প্রায়ই দেখা হত। কিন্তু গেল কয়বছর ধরে জয়ন্ত ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিনরাত সে আজগুবি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে—আর, পাগলের মতন যেসব কথা নিয়ে বক বক করে তার কোনও মানেই হয় না। দেখে-শুনে আমি তার হাল একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ও, বুঝেছি। তোমাদের ভেতরে মতভেদ হয়েছে। আচ্ছা করুণা, তুমি জয়ন্তের নতুন বন্ধু তিনকড়ি বটব্যালকে চেনো?'

করুণা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তিনকড়ি! না, ও নামও কখনও শুনিনি!'

করুণার কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু জানা যাবে না বুঝে অবিনাশবাবু আবার বাড়িমুখো হলেন। তিনকড়ির কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে সে দিনটাই তাঁর বাজে নষ্ট হয়ে গেল। কে এই তিনকড়ি, জয়ন্তের সঙ্গে এমন ছোটোলোকের কী সম্পর্ক, তিনি কিছুতেই সেটা আন্দাজ করতে পারলেন না। এমনকি রাত্তিরেও সেই ব্যাপারটা তাঁকে যেন একেবারে পেয়ে বসল। ঘুমোবার জন্যে চোখ মুদেও অন্ধকারের ভিতরে তিনি যেন দেখতে পেলেন সদানন্দের বলা সেই গল্পের ছবিটি : নির্জন নিশুত রাত—রাস্তায় সার-বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আলোর থামগুলো; অস্বাভাবিক আকারের একটা ঘৃণ্য মানুষের বদ চেহারা খট খট করে এগিয়ে আসছে; একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে; দুজনের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগল—ছোটো মেয়েটি পড়ে গেল, আর সেই বেয়াড়া মানুষটা তাকে দু-পায়ে থেঁতলে পথের উপরে ফেলে রেখেই আবার চলতে শুরু করল,—অম্লানমুখেই। ...তারপর তিনি দেখলেন, তাঁর বন্ধু জয়ন্ত বিছানায় শুয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন। সেই ভীষণ লোকটা অনায়াসেই জয়ন্তের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল; অসঙ্কোচে জয়ন্তের নাম ধরে ডাকলে; তাঁর বন্ধুর ঘুম ভেঙে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে বসে এমন অসময়েও এই ভয়াবহ মূর্তিটিকে ঘরের মধ্যে দেখেও সে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করলে না! লোকটা তাকে বললে চেক সই করে দিতে এবং জয়ন্তও বিনাবাক্যব্যয়ে তার এই অসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করলে!

এই একই কথা নিয়ে তোলাপাড়া করে ক্রমেই তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তবু এ দুর্ভাবনা তাঁকে রেহাই দিলে না। এই তিনকড়ির আসল চেহারার সঙ্গে যদি তাঁর পরিচয় থাকত, তাহলে হয়তো তিনি এতটা অভিভূত হয়ে পড়তেন না! তিনকড়ির প্রকৃতির পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তার বিদকুটে চেহারার বর্ণনাও তিনি শুনেছেন এবং তাকে তিনি সর্বদা চোখের সামনেও দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু তার মুখখানা কিছুতেই তাঁর দৃষ্টির সীমার মাঝে আসছে না! শেষটা তাঁর কৌতূহল এতটা বেড়ে উঠল যে তিনি স্থির করলেন, যেমন করেই হোক তিনকড়ি বটব্যালকে তিনি দেখবেনই দেখবেন! হয়তো তার দেখা পেলে তাঁর মনটা আবার হাল্কা হয়ে যাবে এবং এমন একটা জীবকে কেন যে তাঁর বন্ধু এতটা অন্যায় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, হয়তো এ-রহস্যটাও বোঝা তাঁর পক্ষে শক্ত হবে না!

সদানন্দবাবু যে-অদ্ভুত বাড়িটার কথা বলেছিলেন, পরদিন থেকে অবিনাশবাবু তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রোজ নিয়মিত ভাবে পাহারা দিতে লাগলেন। এ বাড়ির মালিক কে, সদানন্দবাবু তা জানেন না বটে, কিন্তু অবিনাশবাবু জানেন। এ বাড়ির মালিক হচ্ছেন তাঁরই মক্কেল ডাক্তার জয়ন্তকুমার। এটা তাঁর পরীক্ষাগার। এখানে তিনি নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন। কিন্তু এখানে তিনকড়ি আনাগোনা করে কেন ও এ বাড়ির চাবি তার

পকেটেই বা থাকে কেন? নিজের মনের ভিতর থেকে এ-প্রশ্নের কোনও জবাব না পেয়ে অবিনাশবাবু আপনা-আপনিই বললেন, 'আচ্ছা, আগে তো তিনকড়িকে স্বচক্ষে দেখি, তার পরেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে!'

এক দিন, দু-দিন, তিন দিন গেল—তিনকড়ির দেখা নেই। চতুর্থ দিনে অবিনাশবাবুর ধৈর্য সফল হল। তখন রাত দশটা বেজে গেছে, দোকানিরা একে একে দোকানের ঝাঁপ তুলছে, রাস্তাঘাট একেবারে নীরব ও নির্জন না হলেও গোলমাল খুব কম। এমন সময় অবিনাশবাবুর কানে এল কেমন-একরকম পায়ের আওয়াজ! অন্যান্য পায়ের আওয়াজের সঙ্গে এর যেন কোনওই মিল নেই!

পদশব্দ আরও কাছে এগিয়ে এসে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। অবিনাশবাবু প্রায়-রুদ্ধশ্বাসে দেখলেন, মোড় ফিরে পথের উপরে আবির্ভূত হল একটা মূর্তি! খর্ব দেহ, সাজ-পোশাক সাদাসিধে।

মূর্তিটা রাস্তা পার হয়ে ও-ফুটপাথের সেই বাড়িখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চাবি বার করলে। অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন এবং হাত দিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করে বললেন, 'বোধ হয় আপনিই তিনকড়িবাবু?'

সাপের মতন শব্দ করে একটা দ্রুত নিশ্বাস টেনে তিনকড়ি সভয়ে পিছিয়ে গেল! কিন্তু তার সে ভয় মুহূর্তের জন্যে, তখনই সে নিজেকে সামলে নিলে! এবং যদিও সে অবিনাশবাবুর চোখের দিকে আর মুখ তুলে তাকালে না, তবু বেশ শান্ত স্বরেই বললে, 'হ্যাঁ, ও নাম আমারই। আপনি কী চান?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমি হচ্ছি ডাক্তার জয়ন্তবাবুর একজন পুরোনো বন্ধু। আমার নাম অবিনাশচন্দ্র সেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার নাম শুনেছেন? দেখছি, আপনি এই বাড়ির ভেতরেই যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

—'জয়ন্তবাবু এখানে নেই'—এই বলে তিনকড়ি দরজায় চাবিটা ঢুকিয়ে দিলে এবং তার পরে মুখ না তুলেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি দয়া করে আমার একটা কথা শুনবেন?'

—'কেন শুনব না? বলুন।'

—'আপনি এমন মুখ লুকোবার চেষ্টা করছেন কেন? আপনার মুখটা একবার আমাকে দেখতে দেবেন কি?'

তিনকড়ি প্রথমটা একটু ইতস্তত করলে; এবং তার পর যেন হঠাৎ কী ভেবেই অবিনাশবাবুর সুমুখে এসে সিধে হয়ে দাঁড়াল!

কয়েক সেকেন্ড ধরে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অবিনাশবাবু বললেন, 'এর পর আর আমি আপনাকে ভুলব না। এটা একটা লাভের কথা।'

তিনকড়ি বললে, 'হ্যাঁ। হয়তো আবার আমাদের দেখা করবার দরকার হবে। আমার ঠিকানাটাও রেখে দিন'—এই বলে সে একখানা কার্ড এগিয়ে দিলে। কার্ডের উপরে ব্রজদুলাল স্ট্রিটের এক বাড়ির নম্বর লেখা রয়েছে।

অবিনাশবাবু মনে মনে বললেন, 'সর্বনাশ! একি সেই উইলের জন্যেই আমার সঙ্গে দেখা করবার ফন্দি আঁটছে?' কিন্তু মনের কথা মুখে তিনি প্রকাশ করলেন না।

তিনকড়ি বললে, 'এখন বলুন দিকি মশাই, আমাকে আপনি চিনলেন কেমন করে?'

—'লোকের মুখে শুনে।'

—'কে লোক? তার নাম কী?'

অবিনাশবাবু কেবল বললেন, 'এমন কোনও লোক—তিনি আমাদের দুজনেরই বন্ধু।'

সচমকে তিনকড়ি বললে, 'দুজনেরই বন্ধু! কে তিনি?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ধরুন, ডাক্তার জয়ন্ত।'

ক্রুদ্ধস্বরে তিনকড়ি বললে, 'তিনি কখনও আপনাকে বলেননি! আপনি যে মিছে কথা কইবেন এটা আমি জানতুম না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনিও ঠিক ভদ্রলোকের মতন কথা কইলেন না!'

তিনকড়ি বন্য জন্তুর মতন অট্টাহাস্য করে উঠল। তারপর আচম্বিতে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে দরজাটা খুলে ফেলে বাড়ির ভিতরে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবিনাশবাবু কিছুক্ষণ সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর মুখ দেখলে মনে হয়, তিনি যেন রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেছেন। তিনকড়ি প্রায় বামনের মতো বেঁটে, তাকে দেখলেই তার দেহকে বিকৃত বলে সন্দেহ হয়, যদিও তার দেহে অঙ্গ-বিকৃতির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তিনকড়ির ভাব ও ব্যবহারও কখনও ভিতু ভিতু, আবার কখনও বা রীতিমতো বেপরোয়া। তার গলার আওয়াজও কেমন যেন ভাঙা ভাঙা ও চাপা চাপা এবং সে কথা কয় প্রায় চুপি চুপি, কর্কশ স্বরে। এগুলো তার সৎস্বভাবের পরিচয় দেয় না বটে, কিন্তু তাকে দেখেই তাঁর মনের ভিতরে কেন যে একটা ঘৃণা ও ভয়ের ভাব জেগে উঠেছিল, অবিনাশবাবু তার কোনও হদিস খুঁজে পেলেন না। তাঁর মনে হল, তিনকড়িকে দেখে তিনি যে-টুকু বুঝেছেন সেইটুকুই তার আসল পরিচয় নয়—তার মধ্যে অমানুষিক একটা কিছু আছে নিশ্চয়! তার দেহের রক্তমাংসের ভিতরে বাস করছে যেন কোনও অভিশপ্ত আত্মা! অবিনাশবাবু আপন মনেই বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! তোমার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত! যে নতুন বন্ধুটিকে তুমি পেয়েছ, তার মুখের উপরে আমি শয়তানের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!'

চলতে চলতে অবিনাশবাবু আর একটা রাস্তায় আর একখানা বাড়ির সামনে এসে পড়লেন। বাহির থেকেই বোঝা যায় এ-বাড়ির ভিতরে যিনি বাস করেন, তিনি অশিক্ষিত

বা গরিব লোক নন। অবিনাশবাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। একজন লোক দাঁড়িয়েছিল তাকে ডেকে শুধোলেন, 'রামচরণ, জয়ন্ত বাড়িতে আছেন?'

রামচরণ বললে, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না হুজুর! আপনি বাইরের ঘরে একটু বসুন, বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখে আসছি।' সে চলে গেল। অবিনাশবাবু সাজানো-গুছানো একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে সোফার উপরে বসে পড়লেন।

বড়ো বড়ো চিত্রকরের আঁকা ভালো ভালো ছবি, দামি দামি পাথরের মূর্তি ও আসবাব দিয়ে ঘরখানি চমৎকার রূপে সাজানো। এই ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই সারা মনটি যেন আরামে এলিয়ে আসে। অবিনাশবাবুর মতে, এমন আনন্দদায়ক ঘর কলকাতায় আর দ্বিতীয় নেই! এইখানেই জয়ন্ত ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে কত সুন্দর সন্ধ্যা তিনি নিশ্চিন্ত প্রাণে কাটিয়ে দিয়েছেন! কিন্তু আজ তাঁর মনের ভিতর থেকে সমস্ত আনন্দের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে! তিনকড়ির মুখ মনে করে জীবনের উপরেও তাঁর যেন বিতৃষ্ণা আসতে লাগল—এবং বার বার তাঁর মনে হতে লাগল, তাঁর বন্ধুর এই ঘরেও সর্বত্রই যেন একটা অদৃশ্য অমঙ্গলের আভাস জেগে আছে!

রামচরণ এসে খবর দিলে, জয়ন্ত কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, সে তা জানতে পারেনি।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা রামচরণ, তোমার বাবু যে পুরোনো বাড়িতে বসে কাজ করেন, তার চাবি তিনকড়িবাবুর হাতে গেল কেমন করে?'

রামচরণ বললে, 'বাবুই তাঁকে দিয়েছেন।'

—'দেখেছি, ওই তিনকড়ি-ছোকরার উপরে তোমার বাবুর খুব বিশ্বাস!'

—'হ্যাঁ হুজুর, বাবু তাঁকে খুবই বিশ্বাস করেন। খালি তাই নয়, বাবু হুকুম দিয়েছেন তিনকড়িবাবু যা বলবেন আমাদের সকলকেই তাই করতে হবে।'

—'আচ্ছা রামচরণ, তোমাদের ওই তিনকড়িবাবুকে আমি বোধহয় এখানে কখনও দেখিনি?'

—'না হুজুর, তিনি বাড়ির এদিকে কখনও আসেন না। খিড়কির দরজা দিয়ে তিনি আনাগোনা করেন।'

—'আমি এখন আসি রামচরণ।'

রাস্তায় বেরিয়ে অবিনাশবাবু আবার ভাবতে ভাবতে চললেন, 'বেচারা জয়ন্ত! জানি চিরদিনই সে খামখেয়ালি, কিন্তু তার মতন সুচরিত্র ও মিষ্টপ্রকৃতির লোক তিনকড়ির মতন বীভৎস জীবের সঙ্গে মেলামেশা করছে কেমন করে? তিনকড়ি কোন মায়ামন্ত্রে জয়ন্তকে বশীভূত করেছে? ...এই তিনকড়ি! নিশ্চয়ই এ যে-জীবন যাপন করে তা ওর চেহারার মতোই ভয়ঙ্কর! সে-জীবনের পরিচয় পেলে জয়ন্ত কখনওই তার সঙ্গে মিশতে পারবে না! ...এই নরপশুটা কিনা ঘুমন্ত জয়ন্তের বিছানার পাশে গিয়েও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে!

যদি সে কোনওগতিকে ঘুণাক্ষরেও উইলের কথা টের পায়, তাহলে জয়ন্তের প্রাণ কি আর একদণ্ডও নিরাপদ থাকবে? এই সমূহ বিপদ থেকে জয়ন্তকে উদ্ধার করতে হবেই! কিন্তু সে কি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে?'

॥ তৃতীয় ॥

জয়ন্তের কোনও ভাবনাই নেই

দিন-পনেরো পরে বন্ধুবান্ধবদের কাছে হঠাৎ ডাক্তার জয়ন্তের এক নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির! এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়, বহুকাল অদর্শনের পর এ-রকম আকস্মিক ভোজ দেওয়ার খেয়াল ডাক্তার জয়ন্তের অনেকবারই হয়েছে। অবশ্য, এরকম ভোজের আসরে জনকয় বাছা বাছা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কেউ নিমন্ত্রিত হতেন না।

ডাক্তার জয়ন্তের সঙ্গে এমন ভাবে দেখা পাবার সুযোগ পেয়ে অবিনাশবাবু খুবই খুশি হয়ে গেলেন। আগেই বলেছি এক পেয়ালার উপরে দু-পেয়ালা চা খেলেই তাঁর মুখের কুলুপ খুলে যেত—আজকে তিনি দ্বিতীয় পেয়ালার উপরেও তৃতীয় পেয়ালা চা নিয়ে আসর জমকে বসেছেন রীতিমতো। কারণে অকারণে অনর্গল গল্প করে যাওয়া যাদের স্বভাব তারা আজ যত গল্প করছে, অবিনাশবাবুও তাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম করছেন না। সাধারণত স্বল্পবাক ও শুষ্ক-প্রকৃতির এই প্রৌঢ় মানুষটিকে বন্ধুরা সকলেই যে পছন্দ করতেন, এ-কথাও আগে জানিয়েছি। সুতরাং আজকের আনন্দ-সভায় অবিনাশবাবুকে এমন খোলা-প্রাণে যোগ দিতে দেখে সকলেই খুব আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

বাবুর্চির হাতে তৈরি প্রোন কাটলেট, পটলের দোরমা, রুইমাছের রোস্ট, শ্রীরামপক্ষীর সঝোল মাংস ও মোগলাই পোলাও খেয়ে সকলের মুখে যে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল সে কথা বলাই বাহুল্য। তারপর খোসমেজাজে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে অন্যান্য বন্ধুরা যখন একে একে বিদায় নিয়ে গেলেন, অবিনাশবাবু তখনও তাঁর আসন ছেড়ে উঠলেন না।

জয়ন্ত বুঝলেন অবিনাশবাবু নিশ্চয়ই তাঁকে কোনও কথা বলতে চান, আর সেকথা নিতান্ত হাল্কা কথা নয়।

তাঁকে বেশিক্ষণ সবুর করতেও হল না। অবিনাশবাবু হঠাৎ গম্ভীর মুখে আরম্ভ করলেন, 'জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমার কাছে তোমার যে-উইল রেখে এসেছ, তার কথা নিশ্চয়ই তুমি ভোলোনি?'

জয়ন্ত বললেন, 'অবিনাশ, তুমি একটি বেচারি! আমার উইল নিয়ে তোমার যে দুর্ভাবনার অন্ত নেই, সেকথা আমি জানি। আমার মতন নির্বোধ মক্কেল পাওয়া কারুর পক্ষেই

সৌভাগ্যের বিষয় নয়! করুণা তো আমার ওপরে চটেই আগুন হয়ে আছে! তার বিশ্বাস, আমার মাথার ঠিক নেই। আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকেও সে গাঁজাখোরের খেয়াল বলে মনে করে!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'করুণার কথা এখন থাক। তোমার উইলের কথাই হোক। কোনও বুদ্ধিমান লোকই এ রকম উইল করে না।'

জয়ন্ত সায় দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এ কথা তো আমি আগেই স্বীকার করেছি। আমি একটি নির্বোধ মক্কেল।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু জানো কি জয়ন্ত, যার নামে তুমি উইল করেছ, সেই তিনকড়ির কোনও কোনও গুপ্তকথা আমি জানতে পেরেছি?'

জয়ন্তের সুন্দর মুখ মড়ার মতন হলদে হয়ে গেল—তাঁর চোখের উপরেও কেমন একটা কালো ছায়া নেমে এল। তিনি শুকনো স্বরে বললেন, 'ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, ও নিয়ে আমি আলোচনা করতেও রাজি নই।'

অবিনাশবাবু যেন নিজের মনেই বললেন, 'তিনকড়ি যেসব কাণ্ড করে, কোনও ভদ্রলোকেই তা করে না।'

জয়ন্ত চঞ্চল ভাবে বললেন, 'সে যে-কাণ্ডই করুক তার জন্যে আমার উইল অদল-বদল হবে না। অবিনাশ, তুমি জানো না আমার অবস্থা কতটা সঙিন! এ ব্যাপার নিয়ে বাজে বাক্যব্যয় করলে কোনওই লাভ হবে না।'

জয়ন্তের অবস্থা দেখে অবিনাশবাবুর দয়া হল। গলার আওয়াজ নরম করে আবার তিনি বললেন, 'জয়ন্ত, আমাকে তুমি চেনো। আমাকে তুমি অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারো। আমার কাছে সব কথা খুলে বলো, আমি নিশ্চয়ই তোমার উপকার করতে পারব।'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'ভাই অবিনাশ, তুমি যে আমার উপকারী বন্ধু তা কি আমার জানা নেই? আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। তোমার মতন বিশ্বাস আমি পৃথিবীর আর কারুকেই—এমনকি নিজেকেও করি না। কিন্তু যতটা ভাবছ ততটা এখনও হয়নি। তোমাকে শান্ত রাখবার জন্যে আমি যা বলছি শোনো। আমি ইচ্ছা করলে যখন-খুশি এই তিনকড়ির হাত থেকে ছাড়ান পেতে পারি। সুতরাং তাকে নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। এ প্রসঙ্গ চাপা দেওয়াই ভালো।'

অবিনাশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেশ, তাই হোক।'

জয়ন্ত বললেন, 'কিন্তু কথা যখন আজ উঠলই তখন আর একটা বিষয় তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই। সত্যসত্যই ওই তিনকড়ি বেচারার ওপরে আমার মনের টান আছে। আমি জানি তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে—সে নিজেই আমাকে একথা বলে গেছে। বোধ হয় সে তোমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহারও করেনি। কিন্তু ভাই অবিনাশ, আমি তাকে পছন্দ করি। তুমি আমার কাছে অঙ্গীকার করো, আমি যখন থাকব না তখন তার উচিত পাওনা

তুমি তাকে মিটিয়ে দেবে? তোমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তুমি যতই বলো, আমি তাকে কখনওই পছন্দ করতে পারব না।'

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবিনাশবাবুর কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে বললেন, 'তুমি যে তাকে পছন্দ করতে পারবে না তাও আমি জানি। কিন্তু স্বীকার করো, আমার অবর্তমানে তুমি ঠিক উইল মতো কাজ করবে?'

অবিনাশবাবু দুঃখিত ভাবে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'স্বীকার করছি।'

॥ চতুর্থ ॥

হত্যাকাণ্ড

এক বছর পরে। সারা কলকাতা শহরে ভীষণ এক হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ল। এ রকম নিষ্ঠুর খুনের কথা বড়ো-একটা শোনা যায় না।

গঙ্গানদীর কাছাকাছি একটা রাস্তায় এক বাড়ির একটি মেয়ের রাতের বেলায় ঘুম হচ্ছিল না। মেয়েটি ছিল সে-বাড়ির শিক্ষয়িত্রী। সেদিন পূর্ণিমা রাত—জ্যোৎস্নার দুগ্ধময়ী ধারায় চারিদিক ধব ধব করছিল। মেয়েটি জানলার ধারে বসে আনমনে পথের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটির নাম কমলা।

সেইখানে বসে বসে কমলা সে রাতে যা দেখেছিল তা হচ্ছে এই

একটি বয়স্ক ভদ্রলোক একা পথ চলছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি যখন কমলাদের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন আকাশের জ্যোৎস্না ও পথের গ্যাসের আলোকে তাঁর চেহারা বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছিল। তাঁর মাথার চুলগুলি রুপোর মতন সাদা, আর মুখখানি এমন শান্ত ও ভাবভঙ্গি এমন ধীর স্থির যে দেখলেই তাঁকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়।

ঠিক সেই সময়েই আর এক দিক দিয়ে একটি যুবক ভদ্রলোক প্রাচীন লোকটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কমলা প্রথমটা তার দিকে ততটা নজর দেয়নি, কিন্তু তার পরে দেখেছিল সে মাথায় অত্যন্ত বেঁটে। তাকে দেখে প্রাচীন লোকটি খুবই বিনীত ও ভদ্র ভাবে নমস্কার করলেন।

কমলা তখন ভালো করে বেঁটে লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখে তখনই তাকে চিনতে পারলে। তার নাম হচ্ছে তিনকড়ি বটব্যাল, সে একবার কী-একটা কাজে কমলাদের বাড়ি এসেছিল। কিন্তু তার চেহারা, ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা কমলার এত খারাপ লেগেছিল যে, তাকে সে মোটেই পছন্দ করতে পারেনি।

প্রাচীন ভদ্রলোকটি খুব শিষ্ট এবং মিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে তিনকড়িকে কী বলতে লাগলেন। কিন্তু তিনকড়ির ভাব দেখে মনে হল না যে, তাঁর কথা সে কান পেতে শুনছে। তারপর কোথাও কিছু নেই আচমকা তিনকড়ি মহা খাপ্পা হয়ে লাফালাফি করতে ও হাতের মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে শুরু করে দিলে—ঠিক যেন হঠাৎ পাগলের মতন!

প্রাচীন লোকটি অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ ভাবে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। তিনকড়ি তাতে আরও রেগে গিয়ে সেই মোটা লাঠিগাছা দিয়ে তাঁকে ক্রমাগত নির্দয় ভাবে মারতে লাগল! বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাটির উপরে পড়ে গেলেন, তিনকড়ি তখনও ঠিক বাঁদরের মতন মুখ খিঁচিয়ে তাঁর দেহের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘন ঘন লাঠি ও লাথি মেরে একেবারে কাবু করে ফেললে।

এর পরে কমলা আর কিছুই দেখেনি, কারণ এই ভয়ানক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাস্থলে যখন পুলিশ এসে পড়ল, তিনকড়ি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মৃতদেহ পথের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে এবং ঠিক তাঁর দেহের পাশেই পড়ে রয়েছে একগাছা মোটা লাঠির আধখানা। সেই রক্তমাখা আধখানা লাঠি দেখলেই বুঝতে দেরি হয় না যে, সেই লাঠি দিয়েই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে! লাঠির বাকি অংশ অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না, খুব-সম্ভব হত্যাকারী সেটাকে হাতে করেই নিয়ে গেছে। মৃত ব্যক্তির পকেটের ভিতর থেকে একটি মনিব্যাগ, একটি সোনার ঘড়ি ও একখানি ঠিকানা-লেখা খামে-মোড়া চিঠি পাওয়া গেল। খামের উপরে, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন, এই নাম লেখা রয়েছে।

ইনস্পেকটার সেই খামখানা নিয়ে পরদিন সকালেই অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করলে। সমস্ত শুনে অবিনাশবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। আগে মৃতদেহ না দেখে আমি আর কোনও কথাই বলব না। একটু দাঁড়ান, আমি জামা-কাপড় ছেড়ে আসি।'

ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ দেখে তিনি বললেন, 'আশ্চর্য! ইনি যে কুমার মনোমোহন চৌধুরি!'

ইনস্পেকটার চমকে উঠে বললে, 'এও কি সম্ভব হতে পারে, বলেন কী! আপনার ভুল হয়নি তো?'

—'ভুল হওয়া অসম্ভব!'

—'তাহলে হয়তো আপনি খুনিকেও চিনতে পারবেন। তার নাম তিনকড়ি বটব্যাল।'

নাম শুনেই অবিনাশবাবু থ হয়ে গেলেন, তাঁর মুখে রা ফুটল না! ... খানিক পরে থেমে থেমে প্রায়-রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আচ্ছা, এই তিনকড়ি মাথায় কি খুব বেঁটে?'

—'হ্যাঁ, তার দেহ তো বেঁটে বটেই, শুনেছি তার চেহারাও নাকি শয়তানের মতোই সুন্দর। দেখুন দেখি, এই ভাঙা লাঠিগাছা আপনি চিনতে পারেন কি না?'

অবিনাশবাবু দেখেই চিনতে পারলেন। কিন্তু এর মালিক তিনকড়ি নয়, তাঁর বন্ধু ডাক্তার জয়ন্ত এবং এ লাঠি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন তিনিই নিজে! এ সব কথা প্রকাশ না করে ইনস্পেকটারকে ডেকে তিনি বললেন, 'আমার গাড়িতে আসুন। আমি আপনাকে তিনকড়ির ঠিকানায় নিয়ে যাচ্ছি।' তিনকড়ি তাঁকে যে কার্ডখানা দিয়েছিলেন সেখানা এখনও তাঁর পকেট-বুকের মধ্যেই আছে।

অবিনাশবাবুর গাড়ি চিৎপুর রোডের অন্যান্য অসংখ্য গাড়ির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে পাথুরেঘাটার সরু রাস্তার ভিতরে ঢুকল। তারপর দু-ধারে কাঁসারিদের বাসনের দোকানগুলো পিছনে রেখে গাড়ি গিয়ে ঢুকল ব্রজদুলাল স্ট্রিটের এক ময়লা গলির ভিতরে। শীতকালের কুয়াশায় সকালের আলো তখনও আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং সেই কুয়াশার ভিতর দিয়ে ঘোরাফেরা করছে জন-কয়েক দুশমন চেহারার গুন্ডার মতন লোক! ঝিয়ের মতন দেখতে নোংরা কাপড় পরা কতকগুলো স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই শীতেও উলঙ্গ দেহে কতকগুলো ছেলে চ্যাঁচাচ্ছে, কাঁদছে বা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

ইনস্পেকটার বললে, 'তিনকড়ি যে-রকম লোক, সে থাকেও দেখছি ঠিক সেই রকম জায়গাতেই।'

এ-গলির চেয়েও ছোটো, নোংরা ও অন্ধকার আর-একটা গলি বা শুঁড়িপথের ভিতরে ঢুকে পাওয়া গেল তিনকড়ির বাসা। চুন-বালি-খসা একখানা নড়বড়ে পুরানো বাড়ির ভাঙা রোয়াকের উপরে একটা থুত্থুড়ি বুড়ি বসে বসে খক খক করে কাশছিল। অবিনাশবাবু তাকে শুধোলেন, 'হ্যাঁ বাছা, তিনকড়িবাবু কি বাড়ির ভেতরে আছেন?'

বুড়ি বিড় বিড় করে বললে, 'না গো, না! সে মিনসে কাল রাতে একবার এসেছিল, এসেই খানিক পরে আবার কোনও চুলোয় বেরিয়ে গেছে!'

—'সে আবার কখন আসবে বলতে পারো?'

বুড়ি এক মিনিট ধরে আগে খক খক করে কাশলে, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'জানিনে বাপু! সে কখন আসে কখন যায়, কাকপক্ষীও টের পায় না!'

—'আমরা একবার তার ঘরে যাব।'

—'তা হয় না গো, তা হয় না! তার ঘরে তালা বন্ধ।'

—'আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তিনি পুলিশের লোক। আমরা তালা ভেঙেই তিনকড়ির ঘরে ঢুকব।'

বুড়ির ভাঁজ-পড়া মুখে একটা উৎকট আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল। ব্যগ্রভাবে সে বললে, 'তাই নাকি বাবা, তাই নাকি! সে কী করেছে বাবা?'

ইনস্পেকটারের দিকে ফিরে অবিনাশবাবু চুপি চুপি বললেন, 'দেখছেন, তিনকড়িকে এখানেও কেউ পছন্দ করে না! তার বিপদের কথা শুনে বুড়ির আহ্লাদের আর সীমা

নেই!'—তারপর বুড়ির দিকে ফিরে বললেন, 'এইবারে আমাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে চলো তো বাছা!'

তিনকড়ির ঘরের ভিতরটার সঙ্গে এ-বাড়িখানা যেন খাপ খায় না! তার ঘরে দামি দামি সোফা, কৌচ, চেয়ার, কার্পেট ও ছবি প্রভৃতি সাজানো রয়েছে। ঘরের অনেক জিনিসই লন্ডভন্ড হয়ে আছে—যেন তাড়াতাড়ি কেউ এ-ঘরের জিনিসপত্তর উলটে-পালটে রেখে চলে গিয়েছে! ঘরের মেঝের একজায়গায় একখানা আধ-পোড়া 'চেক-বুক' পাওয়া গেল। এবং যে লাঠি দিয়ে খুন হয়েছিল তারও বাকি আধখানা একটা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে পড়ল। এই পেয়েই ইনস্পেকটার মহা খুশি! ঘরের ভিতরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য জিনিস পাওয়া গেল না।

সেই দিন দুপুরেই ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে তিনকড়ির নামে পঞ্চাশ-হাজার টাকা জমা আছে!

ইনস্পেকটার বললে, 'অবিনাশবাবু! খুন করবার পর তিনকড়ির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে, সেই ভাঙা লাঠিটা ঘরের ভেতরে কখনওই ফেলে রেখে যেত না, আর ব্যাঙ্কের চেক-বুকখানাও পুড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করত না। আসলে টাকাই হচ্ছে মানুষের জীবন! পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখন সে আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করতে পারবে না, তার পেটও অচল হয়ে পড়বে! সে এখন আমার হাতের মুঠোর ভেতরে এসেছে—তার নামে হুলিয়া বের করলেই সে ধরা পড়বেই পড়বে!'

তিনকড়ির নামে হুলিয়া বেরুল। কিন্তু তার চেহারা মার্কা-মারা হলেও কোথাও তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তিনকড়িকে চেনে এমন আর কোনও লোকেরও সন্ধান মিলল না—কলকাতা শহরের বুক থেকে সে যেন কোনও যাদুমন্ত্রের গুণেই আচম্বিতে অদৃশ্য হয়ে গেল!

॥ পঞ্চম ॥

জাল চিঠি

প্রথম পরিচ্ছেদে নতুন রাস্তায় যে অদ্ভুত দেখতে বাড়িখানার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ ডাক্তার জয়ন্তের পরীক্ষাগার যে-বাড়িখানার ভিতরে আছে, জয়ন্তবাবুর বসতবাড়ি থেকে যে সে বাড়িতে আনাগোনা করা যায়, এ গুপ্তকথাটা বাইরের কেউ জানত না। কারণ তাঁর বসতবাড়ি এক রাস্তায়, আর পরীক্ষাগার, আর এক রাস্তায়, কিন্তু এই দু-খানা বাড়ির পিছনদিকই পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন।

হত্যার পরদিনই অবিনাশবাবু জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। খানিক পরে রামচরণ এসে তাঁকে নিয়ে গেল। তারপরে রামচরণ তাঁকে যখন খিড়কির দরজা দিয়ে পরীক্ষাগারের

ভিতরে নিয়ে গেল, অবিনাশবাবু তখন রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। কারণ এ গুপ্তকথাটা তিনিও জানতেন না।

জয়ন্ত তাঁর পরীক্ষাগারের ভিতরে এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন—তাঁকে দেখলেই মনে হয় তিনি যেন অত্যন্ত পীড়িত। ক্লান্ত, মৃদু স্বরে তিনি বললেন, 'এসো অবিনাশ, বোসো।'

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে জয়ন্তের সামনে বসে পড়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি সব খবর শুনেছ তো?'

জয়ন্ত শিউরে উঠে বললেন, 'শুনেছি। খবরের কাগজের হকাররা ওই খুনের খবরটা চেঁচিয়ে বলতে বলতে এই পথ দিয়েই চলে গেল!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'যিনি খুন হয়েছেন, তোমার মতন তিনিও আমার মক্কেল। তাঁর সম্বন্ধেও আমার খোঁজখবর নেওয়া উচিত। আশা করি তিনকড়িকে তুমি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে না।'

জয়ন্ত উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, 'অবিনাশ, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, আর কখনও আমি তিনকড়ির মুখ-দর্শন করব না! তার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক চুকে গেছে! আর, তাকে আমি সাহায্য করব কী, সে আমার সাহায্য চায়ও না। তুমি তাকে জানো না, কিন্তু আমি জানি। নিরাপদে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছে! আর কখনও তার দেখা পাবে না!'

অবিনাশবাবু গম্ভীর মুখে সব শুনলেন। এত অল্প কারণে জয়ন্তের এত উত্তেজিত ভাব তাঁর যেন কেমন-কেমন লাগল! একটু পরে বললেন, 'তুমি দেখছি তিনকড়ির সম্বন্ধে খুবই নিশ্চিন্ত! অবিশ্যি, সে আর না দেখা দিলে তোমারই মঙ্গল। কিন্তু যদি সে ধরা পড়ে তাহলে তার সঙ্গে তোমারও নাম রটবে, এটা বুঝেছ তো?'

জয়ন্ত বললেন, 'হ্যাঁ, তার সম্বন্ধে আমি সত্যিই নিশ্চিন্ত। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি তোমার পরামর্শ চাই। আমি—আমি একখানা চিঠি পেয়েছি। এ চিঠিখানা পুলিশকে দেখাব কি না তাই ভাবছি। অবিনাশ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি—তুমিই বলো, এখন আমার কী করা উচিত?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ চিঠি পুলিশের হাতে পড়লে তিনকড়ির কি ধরা পড়বার সম্ভাবনা?'

জয়ন্ত বললেন, 'না। তিনকড়ির অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, সেজন্যে আমার কোনও ভাবনা নেই! আমি কেবল নিজের সুনামের কথা ভাবছি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, চিঠিখানা দেখি।'

জয়ন্তের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে অবিনাশবাবু গোটা গোটা হরফে অদ্ভুত ধাঁচের হাতের লেখায় পড়লেন

প্রিয় জয়ন্তবাবু,

আমি হচ্ছি আপনার অযোগ্য বন্ধু। তবু আমার সঙ্গে আপনি যে সদয় ব্যবহার করেছেন

তার তুলনা নেই। তবে এইটুকু আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, ভবিষ্যতে আমার জন্যে আপনি কোনও বিপদেই পড়বেন না। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমার পালাবার উপায় আমি করে নিয়েছি। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভবদীয়

শ্রীতিনকড়ি বটব্যাল

চিঠিখানা পড়ে অবিনাশবাবু শুধোলেন, 'চিঠির খামখানা কোথায়?'

জয়ন্ত বললেন, 'সেখানা ভুলে ফেলে দিয়েছি। তার ওপরে ডাকঘরের ছাপ ছিল না। চিঠিখানা লোক মারফত আমার কাছে এসেছে।'

—'তাহলে চিঠিখানা এখন আমার কাছে থাক?'

—'তোমার যা-খুশি করতে পারো। নিজের ওপরে আর আমার বিশ্বাস নেই।'

—'জয়ন্ত, আর একটা কথা জানতে চাই। তুমি কি তিনকড়ির কথা শুনেই তোমার উইল করেছিলে?'

জয়ন্ত হঠাৎ অত্যন্ত নিস্তেজ ভাবে চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লেন। তারপরে কেবল ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, 'একথা আমি আগেই জানতুম! হয়তো সে তোমাকে খুন করত। তুমি খুব বেঁচে গিয়েছ।'

জয়ন্ত বললেন, 'অবিনাশ, ভগবান আমাকে খুব শিক্ষাই দিলেন! ওঃ, এ শিক্ষা জীবনে ভুলব না!'—বলেই তিনি দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন।

অবিনাশবাবু ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসেই রামচরণের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি তাকে শুধোলেন, 'রামচরণ, কোনও লোক আজ তোমার বাবুকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে?'

রামচরণ বললে, 'না।'

অবিনাশবাবুর মন আবার সন্দেহ দোলায় দুলে উঠল। তবে? তবে কি জয়ন্ত আসল কথা তার কাছে লুকোলে? তবে কি ও-রাস্তার বাড়ি দিয়ে তিনকড়ি নিজেই লুকিয়ে এসে চিঠিখানা জয়ন্তকে দিয়ে গেছে? কিংবা জয়ন্তের সামনে বসেই এই চিঠিখানা লিখেছে? তাহলে তো ব্যাপার বড়ো সুবিধের নয়!

অবিনাশবাবু ফিরে এসে নিজের আপিসঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। শরীর বড়ো শ্রান্ত হয়েছিল, একখানা আসনে গিয়ে বসে আজকের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর দুই চোখ মুদে এল। তাঁর একজন মক্কেল তিনকড়ির হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর আর-একজন মক্কেলের মাথার উপরেও বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। তিনকড়ি এখন গা-ঢাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু যে-কোনও অসতর্ক মুহূর্তে আবার সে বেরিয়ে আসতে পারে, মূর্তিমান মৃত্যুর মতো! তখন জয়ন্তকে কে রক্ষা করবে?

এমন সময় তাঁর প্রধান কর্মচারী অনন্তবাবুর গলা পাওয়া গেল। অবিনাশবাবু চোখ খুলে বললেন, 'কী অনন্ত?'

অনন্ত বললে, 'আজ্ঞে, অনেক কাজ বাকি রয়েছে। কখন করবেন?'

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ নীরবে অনন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। এই অনন্ত তাঁর অনেক দিনের পুরানো ও বিশ্বাসী লোক। তাঁর এখানে কাজ করবার আগে সে অন্যত্র হাতের লেখা পরীক্ষার কাজ করত। হাতের লেখা পরীক্ষা করতে সে ছিল অদ্বিতীয়। তার এই বিশেষ গুণটি অনেক সময়েই অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর অনেক কাজে লেগেছে।

অনন্ত আবার বললে, 'আপিসের অনেক কাজ বাকি আছে—'

অবিনাশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক গে বাকি, তুমি এক কাজ করো তো অনন্ত! আমি আজ একটা অদ্ভুত ধাঁচের হাতের লেখা পেয়েছি। তুমি একবার দেখবে?'—এই বলে তিনি তিনকড়ির লেখা সেই চিঠিখানা বার করে তার হাতে দিলেন।

অনন্ত চিঠিখানার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললে, 'একি সেই তিনকড়ি, যে জয়ন্তবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী? এই কি কালকে খুন করে পালিয়েছে?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ অনন্ত, এ সেই তিনকড়ি। শুনেছি, হাতের লেখা দেখে লোকের চরিত্র বোঝা যায়। দ্যাখো দেখি, এই চিঠিখানা পড়ে তিনকড়ির চরিত্র তুমি কিছু বুঝতে পারো কি না?'

অনন্ত টেবিলের উপরে চিঠিখানা রেখে বললে, 'এ হাতের লেখাটা অদ্ভুত বটে!'—তারপরে চিঠির উপরে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হাতের লেখা পরীক্ষা করতে লাগল। ...খানিক পরে সে বললে, 'আচ্ছা, আপনার কাছে জয়ন্তবাবুর কোনও চিঠি আছে? আমি একবার দেখব।'

—'আছে বই.কি। এই টেবিলের টানাতেই আছে'—এই বলে অবিনাশবাবু টেবিলের টানা থেকে একখানা চিঠি বার করে এগিয়ে দিলেন।

অনন্ত সে-চিঠিখানা টেবিলের উপর তিনকড়ির চিঠির পাশে রাখলে। তারপর মিনিট-পাঁচেক পরীক্ষা করে যেন নিজের মনেই মৃদু স্বরে বললে, 'আশ্চর্য ব্যাপার!'

অবিনাশবাবু কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার, অনন্ত? আর, তুমি ও চিঠি দু-খানা একসঙ্গে মিলিয়ে কী দেখছ?'

অনন্ত বললে, 'মশাই, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এই চিঠি দু-খানা দু-রকম করে লেখা বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এ দু-খানা চিঠিই এক হাতের লেখা!'

—'ভারী আশ্চর্য তো!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই! কোথায় জয়ন্তবাবু আর কোথায় তিনকড়ি! মানব আর দানব—'

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'অনন্ত! মনে রেখো, চিঠিখানা গোপনীয়!'

—'যে আজ্ঞে। বুঝেছি।' —বলে অনন্ত গম্ভীর মুখে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনকড়ির চিঠিখানা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পুরে ফেললেন। তারপর বিবর্ণ মুখে সভয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন, 'কী! একটা নরপিশাচের জন্যে জয়ন্ত এই চিঠি জাল করেছে!' —তাঁর দেহের রক্ত যেন ঠান্ডা হয়ে গেল!

॥ ষষ্ঠ ॥

করুণার শেষ পত্র

দিনে দিনে অনেক দিন কেটে গেল। কুমার মনোমোহন চৌধুরির হত্যার কোনও কিনারাই হল না। পুলিশ থেকে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল, কিন্তু তিনকড়ির টিকিটি পর্যন্ত কেউ দেখতে পেলে না। পৃথিবী যেন তাকে একেবারেই গ্রাস করে ফেললে।

পুলিশ একে একে তার জীবনের অনেক ঘটনাই আবিষ্কার করেছে। সে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করত তাদের মধ্যে একজনও ভদ্রলোক ছিল না এবং অনেকেই ছিল জেল-ফেরত দাগি আসামি। তাদের সঙ্গে মিলে সে যেসব জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজ করত, তা শুনলেও মন ঘৃণায় ও ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

জয়ন্তের জন্যে অবিনাশবাবুর দুর্ভাবনা এখন অনেকটা কমে এসেছে; কারণ তিনকড়ির ঘৃণিত মূর্তি আর তাঁর বন্ধুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে না। তিনি মনে করলেন, অমঙ্গল থেকেই মঙ্গলের জন্ম হয়—কুমার মনোমোহন চৌধুরির জীবন নষ্ট হল বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে ডাক্তার জয়ন্তের জীবন ভীষণ এক রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করলে!

ডাক্তার জয়ন্ত আবার তাঁর আগেকার স্বভাব ফিরে পেলেন। বরাবরই তিনি দানশীল ছিলেন, গরিবের দুঃখ-কষ্ট দেখলেই মুক্ত-হস্তে দান করতেন—তার উপরে এখন তাঁর ধর্মানুরাগও হঠাৎ যেন আরও প্রবল হয়ে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বৈঠকখানায় আবার নিয়মিত ভাবে বন্ধুর আসর বসতে লাগল এবং সে আসরে জয়ন্ত এখন ধর্মের কথা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করতে ভালোবাসেন। এইভাবে দুটি দীর্ঘ মাস কেটে গেল বেশ নিরাপদে।

তারপরে অবিনাশবাবুর মনে আবার একটা খটকা লাগল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি নিয়ম-মতো জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই রামচরণ এসে খবর দিলে, 'বাবুর শরীর ভালো নয়, তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না!' পরদিন ও তারপর আরও তিন দিন জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে অবিনাশবাবু এইভাবে ধুলো-পায়েই ফিরে এলেন। তখন তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে ব্যাপার কী জানবার জন্যে ডাক্তার করুণার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

করুণার বাড়ি থেকে যদিও তাঁকে ধুলো-পায়েই ফিরে আসতে হল না, কিন্তু ভিতরে গিয়ে বন্ধুর চেহারা দেখে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বিছানার উপরে স্থির হয়ে করুণা শুয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর অমন যে ধবধবে গায়ের রং, আজ যেন কালিমাখা হয়ে গেছে! এই কয়দিনের ভিতরেই তিনি যেন বুড়ো হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর মুখের উপরে ফুটে উঠেছে আসন্ন মৃত্যুর অপচ্ছায়া!

অবিনাশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'করুণা, একী! তোমার একী চেহারা হয়েছে!'

করুণা আস্তে আস্তে উঠে বসে বললেন, 'আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি অবিনাশ, দারুণ আঘাত! এ আঘাত আমি বোধহয় আর সামলাতে পারব না! আমি ডাক্তার, সুতরাং বেশ বুঝতে পারছি আমার জীবনের আর কোনওই আশা নেই! মরতে আমি চাই না অবিনাশ, কিন্তু মরতে আমাকে হবেই!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ব্যাপার যে কী কিছুই বুঝতে পারছি না! এদিকে তোমার অসুখ, ওদিকে জয়ন্তের অবস্থাও—'

করুণার মুখের ভাব এক লহমায় বদলে গেল! একখানা কম্পমান হাত তুলে অত্যন্ত বিরক্তভাবে উচ্চৈঃস্বরে তিনি বললেন, 'থামো, থামো! ও-নাম আমার কাছে আর কোরো না—আমার মতে জয়ন্তের মৃত্যু হয়েছে! মরা লোকের নাম আমি শুনতে চাই না!'

অবিনাশবাবু মনে করলেন, করুণার সঙ্গে জয়ন্তের নিশ্চয়ই খুব ঝগড়া হয়েছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, 'ছিঃ করুণা, পাগলামি কোরো না! জয়ন্তের সঙ্গে যদি তোমার কিছু মনোমালিন্য হয়ে থাকে, তাহলে দু-দিনেই তা দূর হয়ে যাবে। কী হয়েছে সব আমাকে খুলে বলো।'

—'কী হয়েছে, সেকথা তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো।'

—'জয়ন্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি নয়।'

—'এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম না। কিন্তু আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারব না। আমার মৃত্যুর পরে তুমি হয়তো সব কথাই জানতে পারবে, কিন্তু এখন নয়। অবিনাশ, তুমি বোসো। অন্য কথা কও। কিন্তু দোহাই তোমার! জয়ন্তের নাম আমার কাছে কোরো না—আমি কিছুতেই তা সইতে পারব না!'

সেদিন বাড়িতে ফিরে এসে অবিনাশবাবু জয়ন্তকে একখানা চিঠি লিখে জানতে চাইলেন যে, করুণার সঙ্গে কী নিয়ে তাঁর মনান্তর হয়েছে, আর কেনই বা তিনি কারুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে চাইছেন না?

উত্তরে জয়ন্তের কাছ থেকে এই করুণ পত্রখানি এল

'ভাই অবিনাশ,

আমাকে তুমি ক্ষমা করো। করুণার সঙ্গে কেন যে আমার মনান্তর হয়েছে, তার কারণ আমি তোমাকেও বলতে পারব না। তবে এইটুকু জেনে রেখো, আমাদের এই মনোমালিন্য

এ জীবনে আর দূর হবার নয়। করুণাকে আমি কোনও কিছুর জন্যেই দায়ী করছি না। কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর দেখা না হওয়াই দুজনের পক্ষেই মঙ্গল।

এখন থেকে আমি সকলকার চোখের আড়ালেই বাস করব। যদি তোমার সঙ্গে দেখা না হয় তাহলে তুমি আমার বন্ধুত্বে যেন সন্দেহ কোরো না। আমাকে তুমি অবাধে নিজের পথে এগিয়ে যেতে দাও। আমি এখন স্বখাত-সলিলে ডুবে মরছি—যে বিভীষিকা আর যে যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে আমার নিশিদিন কাটছে, পৃথিবীতে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। আমি যদি পাপী হই তবে পাপের শাস্তিও ভোগ করছি আমিই। এর পরে তুমি আমার এই উপকারটি কেবল করতে পারো। আমার মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা কোরো না।'

চিঠিখানা হাতে করে অবিনাশবাবু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন : এ আবার কী হল! আপদ তিনকড়ি তো কোন চুলোয় দূর হয়েছে, জয়ন্ত আবার আগেকার মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর মুখ আবার হাসিখুশি ও শান্তিতে ভরে উঠেছিল, কিন্তু আচম্বিতে আবার এই অভাবিত পরিবর্তন কীসের জন্যে? জয়ন্ত উন্মাদ-রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি তো? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? করুণার কথা শুনে বেশ বোঝা যায়, এর ভিতরে অন্য কোনও রহস্যময় কারণ আছে!

এক সপ্তাহ পরে অবিনাশবাবু স্তম্ভিত ভাবে শ্রবণ করলেন, করুণার মৃত্যু হয়েছে!

পরদিন সকালে করুণার বাড়ি থেকে তাঁর নামে একখানা সিলকরা চিঠি এল। তার উপরে করুণার হাতে লেখা রয়েছে, 'এই পত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন ছাড়া আর কেউ খুলতে পারবেন না। কিন্তু এই পত্র তাঁর হাতে যাবার আগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

অবিনাশবাবু সিলমোহর ভেঙে মোড়কটা খুলে ফেললেন। তার ভিতরেও সিলমোহর করা আর একখানা পত্র এবং তার উপরে লেখা—'ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায় যেদিন পরলোকগত অথবা অদৃশ্য হবেন, তার আগে এই পত্র কেউ পাঠ করতে পারবেন না।'

অবিনাশবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। জয়ন্তের অদ্ভুত উইলেও তাঁর অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনার কথা আছে। করুণাও আবার সেই অদৃশ্য হওয়ার কথাই লিখেছে! এর কী সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? জয়ন্ত কেন অদৃশ্য হবে? আর এই রহস্যময় লুকোচুরিরই বা কী হেতু আছে?

অবিনাশবাবুর মনে একটা প্রবল প্রলোভন জেগে উঠল, সিল ভেঙে করুণার পত্রখানা আদ্যপ্রান্ত পড়ে দেখবার জন্যে। কিন্তু তিনি অ্যাটর্নি মানুষ, শিক্ষার গুণে এই দুর্দান্ত প্রলোভনকেও সংবরণ করলেন।

॥ সপ্তম ॥

জানলার ধারে

সে এক রবিবার। বৈকালের কিছু পরে সদানন্দবাবুর সঙ্গে অবিনাশবাবু তাঁদের নিয়মিত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা আবার সেই অদ্ভুত বাড়িখানার সামনে এসে পড়লেন।

সদানন্দবাবু বললেন, 'আমার গল্প ফুরিয়ে গেল! আর তিনকড়ির দেখা পাওয়া যাবে না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'বোধহয় নয়।'

—'আচ্ছা অবিনাশ, এই বাড়ির ভিতর দিয়ে জয়ন্ত ডাক্তারের বাড়ির ভিতরে যাওয়া যায়, প্রথম দিনে তুমি তো একথা আমাকে বলোনি!'

—'তা বলিনি। কিন্তু সেকথা এখন থাক। বাড়ির সদর দরজাটা খোলা রয়েছে দেখছি। এসো, একবার ভিতরে ঢুকে জয়ন্তের খবর নেওয়া যাক।'

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সদানন্দবাবু বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। উঠানের কাছে গিয়ে উপরপানে তাকিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন, দোতলার একটা জানলার ধারে জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

অবিনাশবাবু এত সহজে বন্ধুর দুর্লভ দেখা পেয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই যে জয়ন্ত! কেমন আছো হে?'

অত্যন্ত উদাসীন ভাবে শুষ্ক স্বরে জয়ন্ত বললেন, 'মোটেই ভালো নয়। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'দিনরাত ঘরে বন্দি হয়ে থেকেই তোমার শরীর এমন কাহিল হয়ে পড়েছে! এসো এসো, জামা-কাপড় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসো! চলো, আমাদের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসবে চলো!'

জয়ন্ত কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও তোমাদের সঙ্গে বাইরে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে! কিন্তু না, না, তা অসম্ভব,—একেবারেই অসম্ভব!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'বেশ তো, তাহলে এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা যাক না কেন!'

জয়ন্ত মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'সেকথা মন্দ নয়—' কিন্তু বলতে বলতেই আচম্বিতে তাঁর মুখের উপর থেকে হাসির আলো যেন দপ করে নিবে গেল এবং তার বদলে সেখানে ফুটে উঠল এমন ভয়ঙ্কর নিরাশা ও বিভীষিকার ভাব যে, অবিনাশবাবু ও সদানন্দবাবু—দুজনেরই বুক যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং উপরকার জানলাটাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল!

কিন্তু তাঁরা যেটুকু দেখেছিলেন সেইটুকুই যথেষ্ট, তাঁরা সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলেন না, দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে সে বাড়িখানাকে পিছনে ফেলে তাড়াতাড়ি অনেকটা এগিয়ে গেলেন!

তারপর অবিনাশবাবু আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!'

সদানন্দবাবু গম্ভীর মুখে কেবল মাথা নেড়েই সায় দিলেন।

॥ অষ্টম ॥

শেষ-রাত্রি

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অবিনাশবাবু একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন।

এমন সময় অতিশয় বিবর্ণ মুখে জয়ন্তের পুরানো চাকর রামচরণ এসে হাজির!

তার মুখের দিকে তাকিয়েই অবিনাশবাবু সচমকে বললেন, 'কী রামচরণ, তোমার বাবুর কী অসুখ করেছে?'

রামচরণ উদ্বিগ্ন ভাবে বললে, 'কী হয়েছে জানি না, কিন্তু একটা কিছু হয়েছেই!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'অমন করে বললে চলবে না। আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও।'

রামচরণ বললে, 'বাবু আজকাল কীরকম মানুষ হয়েছেন আপনি তো সব জানেন! প্রায়ই তিনি ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকেন। অন্য অন্য বারে বাবু মাঝে মাঝে এক-আধ বার বাইরে বেরুতেন, কিন্তু আজ এক হপ্তার ভেতরে ঘরের দরজা তিনি একবারও খোলেননি! তাই আমার বড়ো ভয় হচ্ছে!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভয়! কীসের ভয়?'

—'আমার মনে হয়, বাবুর কোনও অনিষ্ট হয়েছে!'

—'আঃ, কী যে বলো তার ঠিক নেই! অনিষ্ট আবার কী হবে?'

—'আমার বলতে ভরসা হচ্ছে না, বাবু! তার চেয়ে আপনি নিজেই গিয়ে বরং সব দেখে আসবেন চলুন!'

অবিনাশবাবু আর দ্বিরুক্তি না করে তখনই উঠে জামাকাপড় পরে রামচরণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

শীতের কনকনে রাত। চাঁদের মুখ মড়ার মতন হলদে। হাওয়া যেন বরফ-জলে স্নান করে কাঁদতে কাঁদতে বয়ে যাচ্ছে। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে অবিনাশবাবু পথের পর পথ পার হয়ে গেলেন, কিন্তু কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া নেই। আজকের এই কুয়াশামাখা শীতার্ত রাত্রি পৃথিবী থেকে যেন সমস্ত জীবনের চিহ্ন মুছে দিয়েছে। এই সমাধির স্তব্ধতা

অবিনাশবাবুর ভালো লাগল না। শীত সওয়া যায়, এ মরণের নীরবতা অসহনীয়। এই স্তব্ধতা তাঁর মনের ভিতরে যেন একটা অমঙ্গলের পূর্বাভাস এনে দিলে।

জয়ন্তর বাড়ির কাছে এসে রামচরণ বললে, 'মা কালী যেন মুখ তুলে চান, বাবু যেন ভালো থাকেন'—এই বলে সে দরজায় করাঘাত করলে।

দরজাটা ভিতর থেকে খুলে একজন দারোয়ান দরজার ফাঁক দিয়ে অত্যন্ত ভীত একখানা মুখ বার করলে।

রামচরণ বললে, 'ভয় নেই মঙ্গল সিং, আমরা এসেছি।'

অবিনাশবাবু ভিতরে প্রবেশ করেই দেখলেন, বাড়ির অন্যান্য দাস-দাসি ও দারোয়ানরা সকলে মিলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে,—প্রত্যেকেরই মুখে ব্যাকুল আতঙ্কের চিহ্ন!

রামচরণ বললে, 'তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে গোলমাল কোরো না। অবিনাশবাবুকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াও। ...বাবু, আপনি পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে আসুন।'

রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশবাবু যে বাড়িতে জয়ন্তের পরীক্ষাগার আছে সেই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোতলায় উঠে দুজনে পরীক্ষাগারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পরীক্ষাগারের দরজার সম্মুখে গিয়ে রামচরণ চেঁচিয়ে বললে, 'বাবু! অবিনাশবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তাঁকে বলো গে যাও আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারব না!'

রামচরণ অবিনাশবাবুকে নিয়ে আবার নীচে নেমে এল। তারপর আবার বললে, 'এখন বলুন তো বাবু, ঘরের ভিতর থেকে যে-গলার আওয়াজটা শুনলেন, সেটা কি আমাদের বাবুর গলার আওয়াজ?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'জয়ন্তের গলার আওয়াজ অন্যরকম শোনাল বটে।'

রামচরণ বললে, 'অন্যরকম? হ্যাঁ, অন্য-রকম শোনাবেই তো! আজ বিশ বছর এখানে চাকরি করছি, বাবুর গলার আওয়াজ আমি চিনি না? ও কখনওই আমার বাবুর গলার আওয়াজ নয়!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ ভারী আশ্চর্য কথা! ধরো তোমার কথাই যদি সত্য হয়, জয়ন্তকে যদি কেউ খুনই করে থাকে, তাহলে খুনি পালিয়ে না গিয়ে এই ঘরের ভিতরেই বসে থাকবে কেন? রামচরণ, তোমার সন্দেহের কোনও মানেই হয় না!'

রামচরণ বললে, 'বাবু, দেখছি আপনি সহজে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন না! বেশ, তাহলে আরও শুনুন বাবু—কিংবা বাবুর নামে যে হতভাগা লোকটা ওই ঘরের ভেতরে আছে, সে আজ সাত দিন ধরে খালি 'ওষুধ' 'ওষুধ' বলে চিৎকার করছে! জানলা গলিয়ে ওষুধের নাম লিখে রোজই সে কাগজের পর কাগজ ফেলে দেয়, আর তাই নিয়ে সারা শহরের সমস্ত ওষুধের দোকানে ছুটোছুটি করে আমাকে মরতে হয়। কিন্তু কোনও ওষুধই ও-লোকটার পছন্দ হয় না।'

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও রকম কোনও কাগজ তোমার কাছে আছে?'

রামচরণ নিজের ফতুয়ার পকেটের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বার করে দিলে। কাগজখানা নিয়ে অবিনাশবাবু খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। জয়ন্ত কোনও ঔষধালয়ের মালিককে লিখেছেন 'আপনি যে-ঔষুধটা পাঠিয়েছেন তা একেবারেই অকেজো। দু-বছর আগে আমার ফরমাসে আপনি এই ঔষধটাই অনেক বেশি পরিমাণে আনিয়ে রেখেছিলেন। সেবারে যেখান থেকে ঔষধ আনানো হয়েছিল আবার সেইখানেই ভালো করে খোঁজ নিন। একেবারে খাঁটি ঔষধ না হলে আমার চলবে না। এ ঔষধ যে আমার কতটা দরকারি, সে-কথা বোধহয় আপনি ভালো করে বুঝতে পারেননি। এই ঔষধই আমি চাই, যেখান থেকে পারেন আনিয়ে দিন, এজন্যে যত টাকা খরচ করতে হয় তা করতে আমি রাজি আছি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এই হাতের লেখা যে জয়ন্তের তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই।'

রামচরণ বললে, 'হ্যাঁ, হাতের লেখাটা তাঁরই মতন দেখতে বটে। কিন্তু হাতের লেখাটা নিয়ে কী হবে, আমি যে লোকটাকে স্বচক্ষে দেখেছি!'

অবিনাশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'স্বচক্ষে দেখেছ?'

রামচরণ বললে, 'হ্যাঁ। একদিন ঘরের দরজা দৈবগতিকে খোলা ছিল। হঠাৎ আমি এইখানে এসে পড়ি। আমাদের বাবু আমার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কতকগুলো ওষুধের আর আরকের শিশি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। তিনি আমার পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকিয়েই সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! আমি চকিতের জন্যে তাঁকে দেখেছিলুম—কিন্তু সেইটুকুর মধ্যেই যা দেখলুম তাতে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল! বাবু, তিনিই যদি আমাদের মনিব হবে তাহলে মুখে তিনি মুখোশ পরেছিলেন কেন? তিনিই যদি আমাদের মনিব হবেন তাহলে আমার সুমুখ থেকে অমন ইঁদুরের মতন পালিয়ে যাবেন কেন? আমি কি তাঁর পুরানো চাকর নই? তারপর—' বলতে বলতে থেমে পড়ে রামচরণ দুই হাতে তার মুখ ঢেকে ফেললে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার বাবুর মুখে বোধহয় হঠাৎ কোনও রোগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সেইজন্যেই তিনি মুখোশ পরে আছেন, কারুর সঙ্গে দেখা করছেন না, আর ওষুধ আনবার জন্যে বার বার লোক পাঠাচ্ছেন! এ-ছাড়া আর কিছু কারণ থাকতে পারে না। রামচরণ, মিছেই আমরা ভয় পেয়েছি।'

রামচরণ মাথা নেড়ে বললে, 'না বাবু, তিনি কখনওই আমাদের মনিব নন! আমাদের বাবু লম্বা-চওড়া আর এ লোকটা বেঁটে,—দেখতে ঠিক বামনের মতো। আপনি কি বলতে চান বিশ বছর এখানে থেকেও আমার বাবুকে দেখতে আমি ভুল করব?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তুমি যখন এত জোর করে বলছ, তখন তোমার কথা আমাকে মানতেই হবে! বেশ, আমি না হয় পরীক্ষাগারের দরজা ভেঙে ফেলবারই ব্যবস্থা করছি!'

রামচরণ উৎসাহিত স্বরে বললে, 'তাই করুন বাবু, তাই করুন! আমি এখুনি আপনাকে কুড়ুল এনে দিচ্ছি!'

রামচরণ তাড়াতাড়ি একখানা কুড়ুল নিয়ে এসে হাজির করলে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আর এক কথা, তুমি যাকে দেখেছ তাকে চিনতে পেরেছ কি?'

রামচরণ বললে, 'আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন বলতে হল। সে আর কেউ নয়, তিনকড়ি বটব্যাল!'

অবিনাশবাবু চমকে উঠে বললেন, 'কী বললে?'

—'হ্যাঁ, ঘরের ভেতরে আমি তিনকড়ি বটব্যালকেই দেখেছি! তার ভাবভঙ্গি আর চলবার ধরন কী-রকম অদ্ভুত তা তো আপনি জানেন? আমাকে দেখে ঘরের ভেতর থেকে সে যখন অদৃশ্য হল, তখন আমার মনে হল ঠিক যেন একটা বড়ো-জাতের বাঁদর লাফ মেরে পালিয়ে গেল! বাবু, আমি হলফ করে বলতে পারি, সে ওই তিনকড়ি ছাড়া আর কেউ নয়!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এতক্ষণে তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে! রামচরণ, তিনকড়ি হচ্ছে মূর্তিমান শনি! সে যখুনি তোমার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে মিশেছিল, তখুনি আমি বুঝেছিলুম যে তোমার বাবুর অদৃষ্ট ভালো নয়! হ্যাঁ, তিনকড়ি নিশ্চয়ই আমার বন্ধুকে খুন করেছে! আর, হয়তো কোনও গূঢ় কারণে জয়ন্তের ঘরেই লুকিয়ে আছে! এখন আমাদের যা কর্তব্য তাই করি এসো। লোকজনদের ডাকো!'

রামচরণের হাঁকাহাঁকিতে দারোয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যরা সেখানে এসে হাজির হল।

অবিনাশবাবু বললেন, 'তোমরা সবাই লাঠি-সোঠা নিয়ে তৈরি হও! জনকয় লোক আমাদের সঙ্গে থাকো, বাকি সবাই এই বাড়ির খিড়কির দরজার কাছে গিয়ে পাহারা দিক। কেউ যেন সে দরজা দিয়ে বাইরে বেরুতে না পারে। এসো রামচরণ, আমরা আবার উপরে যাই।'

অবিনাশবাবু সকলকে নিয়ে দোতলায় উঠে আবার পরীক্ষাগারের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সেইখান থেকেই শুনতে পেলেন, ঘরের ভিতরে কে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে!

রামচরণ বললে, 'দিনে-রাতে যখুনি এখানে আসি, তখুনি শুনি ওর পায়ের শব্দ! এ শব্দের আর বিরাম নেই! রাতেও ঘুমোয় না, ঘরময় চলে বেড়ায়! আপনি ভালো করে কান পেতে শুনে দেখুন, ও কি আমার বাবুর পায়ের শব্দ?'

অবিনাশবাবু শুনে বুঝলেন, রামচরণের কথাই সত্য! জয়ন্তের পায়ের শব্দ অন্যরকমই বটে! তিনি বললেন, 'এই পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু তোমরা শুনেছ?'

রামচরণ বললে, 'শুনেছি। একদিন সে কাঁদছিল!'

—'কাঁদছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, সে স্ত্রীলোকের মতন কাতর ভাবে কাঁদছিল—যেন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে! সে-কান্না কান পেতে শোনা যায় না!'

অবিনাশবাবু গম্ভীর মুখে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন? তারপর চেঁচিয়ে বললেন, 'জয়ন্ত! আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল না।

অবিনাশবাবু আবার বললেন, 'জয়ন্ত, আমাদের মনে সন্দেহ হয়েছে! হয় তুমি দরজা খোলো, নয় আমরা দরজা ভেঙে ফেলব!'

ঘরের ভিতর থেকে আকুল ভাবে কে বলে উঠল, 'অবিনাশ, অবিনাশ! দয়া করো—দরজা ভেঙো না!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ তো জয়ন্তের গলা নয়—এ যে তিনকড়ির গলার আওয়াজ! রামচরণ, ভাঙো দরজা!'

দরজার উপরে কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল!

ঘরের ভিতরে কে দারুণ আতঙ্কে তীক্ষ্ণ স্বরে পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল! আরও বার-কয়েক কুড়ুলের ঘা খেয়েই দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সকলে সভয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের উপরে একটা মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে তখনও কেন্নোর মতন কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে!

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সকলে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল, দেখতে দেখতে তাদের চোখের সামনেই মূর্তিটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অবিনাশবাবু দেহটাকে চিত করে শুইয়ে দিলেন। সে দেহ তিনকড়ি বটব্যালের!

তিনকড়ির গায়ে রয়েছে জয়ন্তের জামা-কাপড়। সে জামা-কাপড় তার ছোটো ও বেঁটে দেহের পক্ষে একেবারেই মানানসই হয়নি। তার মুখ তখনও কুঁচকে কুঁচকে উঠছিল বটে, কিন্তু দেহে জীবনের কোনও লক্ষণই ছিল না। তার মুঠোর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা ওষুধের শিশি!

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়তে পারলুম না! একে আর আমরা বাঁচাতেও পারব না, শাস্তি দিতেও পারব না! তিনকড়ি বিষ খেয়েছে। এখন দেখা যাক জয়ন্তের দেহ কোথায় আছে।'

তারপর জয়ন্তের দেহের জন্যে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। টেবিলের তলা, আলমারি, দেরাজ ও সমস্ত অলি-গলি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু জয়ন্তের দেহ কোথাও পাওয়া গেল না।

অবিনাশবাবু বললেন, 'তাহলে জয়ন্ত হয়তো এখান থেকে পালিয়ে গেছে!'

রামচরণ কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, 'না, না—ওই শয়তান আমার বাবুর দেহকে

কোথাও পুঁতে রেখেছে!'

অবিনাশবাবুর দৃষ্টি হঠাৎ টেবিলের উপরে পড়ল। টেবিলের উপরে একটা বড়ো কাগজের মোড়ক রয়েছে—তার উপরে লেখা, 'শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন'!

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেললেন। প্রথমেই তাঁর নাম-লেখা একখানা ছোটো খাম ও সেইসঙ্গে একতাড়া কাগজ পাওয়া গেল। কাগজগুলোর উপরে বড়ো বড়ো হরফে লেখা রয়েছে—'আমার উইল'। সে উইলখানাও ঠিক আগেকার উইলের মতনই অদ্ভুত, আগেকার উইলের সব কথাই তার ভিতরে আছে, কেবল তিনকড়ি বটব্যালের নামের বদলে রয়েছে অবিনাশবাবুরই নিজের নাম! জয়ন্ত তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অবিনাশবাবুকে দান করেছেন!

অবিনাশবাবুর মাথা ঘুরতে লাগল, আপন চোখকেও তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না! অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'এও কি সম্ভব? তিনকড়ি আজ সাত দিন এই ঘরে রয়েছে, তবু এ উইল সে ছিঁড়ে ফেলে দেয়নি?'

আপনাকে সামলে নিয়ে অবিনাশবাবু তাঁর নাম লেখা খামখানা ছিঁড়ে ফেললেন। চিঠিখানা খুলে তার তারিখ দেখেই তিনি সচকিত স্বরে বলে উঠলেন, 'রামচরণ, রামচরণ! জয়ন্ত বেঁচে আছে! এ-চিঠির উপরে আজকেরই তারিখ লেখা রয়েছে! জয়ন্ত যদি আজকেই মারা যেত, তাহলে তিনকড়ি এর মধ্যেই তার দেহকে কখনও সরিয়ে ফেলতে পারত না! কিন্তু জয়ন্ত কেন পালাল? তিনকড়ি কেন আত্মহত্যা করলে? সমস্তই যে ধাঁধার মতন মনে হচ্ছে!'

খানিকক্ষণ চিন্তিতমুখে বসে থাকবার পর অবিনাশবাবু চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। চিঠিখানা ছোটো। তাতে লেখা রয়েছে

'ভাই অবিনাশ,

এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন তুমি আর আমাকে খুঁজে পাবে না। কী কারণে এবং কেমন করে আমি যে অদৃশ্য হব, সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। তবে আমার পরিণাম যে ঘনিয়ে এসেছে, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। করুণার মুখে শুনেছি, আমার সম্বন্ধে যা সত্য কথা, সেটা সে লিখে তোমার কাছে পাঠিয়েছে; এবং আমি বর্তমান থাকতে সে-ইতিহাস তোমাকে পাঠ করতে নিষেধ করে গেছে। আমার অনুরোধ, তুমি আগে সেই ইতিহাস পাঠ করো। তাতেও যদি তোমার সন্দেহ দূর না হয়, তাহলে এই মোড়কের ভিতরে আমি আমার যে স্বীকার-উক্তি লিখে রেখে গেলুম, তা পড়ে দেখলেই তোমার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইতি

তোমার অসুখী ও অভাগা বন্ধু

জয়ন্ত'

অবিনাশবাবু মোড়কের ভিতরে আর একতাড়া কাগজ পেলেন। সেইগুলো হাতে করে নিয়ে তিনি বললেন, 'রামচরণ, এ কাগজগুলো অত্যন্ত গোপনীয়। এর কথা কারুর কাছে বলবার দরকার নেই। আগে এগুলো আমি পড়ে দেখি, তারপরে পুলিশে খবর দিলেই চলবে।'

॥ নবম ॥

করুণার কাহিনি

করুণার আত্মকাহিনি বার করে অবিনাশবাবু পড়তে লাগলেন

দিন-চারেক আগে, একদিন সন্ধেবেলায় আমি একখানা রেজিস্টারি করা চিঠি পেলুম। চিঠিখানা এসেছে আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী জয়ন্তের কাছ থেকে। চিঠি পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কারণ, তার আগের রাত্রেই জয়ন্তের বাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প-স্বল্প করে ফিরে এসেছি। হঠাৎ এরই-মধ্যে এমন কী ব্যাপার ঘটল যে, আমাকে রেজিস্টারি করে চিঠি লেখবার দরকার হল? চিঠিখানা পড়ে আমার বিস্ময় আবার আরও বেড়ে উঠল। কারণ চিঠিতে জয়ন্ত এই কথাগুলি লিখেছিলেন

'ভাই করুণা,

আমার পুরানো বন্ধুদের ভিতরে তুমি হচ্ছ প্রধান একজন। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক মতভেদ হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে স্নেহ ও ভালোবাসার অভাব হয়নি কোনওদিন।

তুমি যদি কোনওদিন এসে আমাকে বলতে যে, 'জয়ন্ত, আমার জীবন আর সম্মান বিপন্ন হয়েছে, তুমি আমাকে রক্ষা করো,' তাহলে আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দান করতে পারতুম! —করুণা, আমারই জীবন ও সম্মান বিপন্ন হয়েছে, তুমি আমাকে রক্ষা করো! তুমি যদি আমার কথায় কান না পাতো, তাহলে আমার সর্বনাশ হবে! অবশ্য তোমার কাছ থেকে আমি যা প্রার্থনা করছি তা অন্যায় কি না, তুমি নিজেই বিচার করে দ্যাখো।

আজ সন্ধ্যায় যদি তোমার কোনও কাজ থাকে, তার কথা একেবারে ভুলে যাও। আজ তোমাকে ভারতসম্রাট আমন্ত্রণ করলেও বাড়ি থেকে তুমি এক পা বেরিয়ো না। যে-চিঠিখানা তুমি এখন পড়ছ, সেইখানা হাতে করে তুমি সিধে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে। সেখানে রামচরণ আছে—সে-ও আমার হুকুম পেয়েছে। রামচরণ তোমাকে আমার পরীক্ষাগারে নিয়ে যাবে। সেই ঘরে গিয়ে তুমি টেবিলের ডান দিকের দেরাজটা খুলে ফেলবে। দেরাজের নীচের তাকে একটি কালো রঙের বাক্স আছে। সেই বাক্সটি নিয়ে খুব

সাবধানে তুমি আবার তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে। এই কথাগুলি তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন কোরো।

আমার এই চিঠি নিশ্চয়ই তুমি সন্ধ্যার সময় পাবে। তারপর গাড়ি করে আমার বাড়িতে গিয়ে ফিরে আসতে তোমার বেশিক্ষণ লাগবে না। সুতরাং আমি ধরে নিতে পারি দুপুর রাতে তুমি নিজের বাড়ির ভিতরেই থাকবে। এবং আশা করি তখন তোমার বাড়ির চাকর-বাকর ও অন্যান্য লোকজন কেউ জেগে থাকবে না।

কিন্তু তুমি জেগে থেকো। আর একলা থেকো। রাত বারোটা বাজলেই আমার এক দূত তোমার কাছে গিয়ে হাজির হবে। এবং তোমার কাছে সে আমার নাম করলেই তুমি সেই কালো বাক্সটা তার হাতে সমর্পণ কোরো। এই কাজগুলি করলেই তোমার কর্তব্য শেষ হবে। সাবধান, এর মধ্যে যেন একটিও গলদ না হয়! কারণ তোমার সামান্য ভুলচুকেই আমার জীবন পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে।

আমার এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে তুমি বিস্মিত হবে নিশ্চয়ই! কিন্তু বন্ধু, যতই বিস্মিত হও, আমার কথায় অবহেলা কোরো না। আমি এক অজানা অচেনা জায়গায় বিপদ-সাগরে ভাসছি, একমাত্র তুমিই আমাকে কূলে এনে তুলতে পারো। করুণা, তোমার বন্ধুকে রক্ষা করো। ইতি

তোমার বিপন্ন বন্ধু
জয়ন্ত'

পত্রখানা পড়ে প্রথমে আমি ভাবলুম, জয়ন্ত একেবারে পাগল হয়ে গেছে! কিন্তু তার পরেই মনে হল, এখনও যখন তার পাগলামির চাক্ষুষ পরিচয় পাইনি, তখন জয়ন্তের কথামতো কাজ আমাকে করতে হবেই। তখনই উঠে গাড়ি করে জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। রামচরণকে দেখে মনে হল সে যেন আমার পথ চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে। তারপর জয়ন্তের ঘরে গিয়ে টেবিলের দেরাজ খুলে সেই কালো বাক্সটা নিয়ে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এলুম।

বাড়িতে এসে কেমন কৌতূহল হল, কালো বাক্সের ভিতরে কী আছে তা দেখবার জন্যে। বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললুম। প্রথমেই চোখে পড়ল কতকগুলি শিশি। সেসব শিশির কোনওটার ভিতরে রয়েছে রক্তের মতো টকটকে লাল কী তরল পদার্থ আর কোনও কোনওটাতে বা সাদা কি অন্য রঙের গুঁড়ো ওষুধ। একখানা ছোটো ডায়েরির মতো বইও দেখলুম, কিন্তু তার পাতাগুলো উলটে কিছুই বুঝতে পারলুম না। খালি কতকগুলো তারিখ আর কতকগুলো অঙ্ক! মাঝে মাঝে কেবল এই দুটি কথা লেখা আছে—'আমার প্রতিরূপ' ও 'একেবারে ব্যর্থতা'! এই দুটি কথা আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুললে বটে, কিন্তু আসল কোনওই জানবার কথা জানতে পারলুম না।

এই ওষুধের বাক্সটা আমার বাড়িতে থাকলেই যে জয়ন্তের জীবন ও সম্মান রক্ষা পাবে,

এ রকম কথার অর্থ কী? জয়ন্তের দূত আমার বাড়িতে এসে যখন বাক্সটা নিয়ে যেতে পারে, তখন তার নিজের বাড়িতেই সে তাকে পাঠালে না কেন? আর আমার সঙ্গে গভীর রাত্রে, সকলের অগোচরেই বা সে দেখা করতে আসবে কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে মনে হল যেন মস্ত এক প্রহেলিকা! যা হোক, তবু জয়ন্তের কথামতো আমি বাড়ির সকলকে সেদিন সকাল সকাল ঘুমোতে যেতে বললুম।

ঘড়িতে বাজল রাত বারোটা। সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ! আমি নিজেই নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বামনের মতন বেঁটে লোক।

শুধোলুম, 'আপনি কি জয়ন্তডাক্তারের কাছ থেকে আসছেন?'

সে শুধু বললে, 'হ্যাঁ।'

তাকে বাড়ির ভিতরে আসতে বললুম। সে আমার কথায় কান না দিয়ে প্রথমটা একবার পিছন দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। একটা পাহারাওয়ালা পায়ে পায়ে এই দিকেই আসছিল। সে তাকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তার এমনধারা রকম-সকম আমার ভালো লাগল না। ঘরের ভিতরে এসে উজ্জ্বল আলোতে আমি তাকে স্পষ্টভাবে দেখবার সুযোগ পেলুম। জীবনে তাকে আর কখনও দেখিনি। সে যে বেঁটে এ কথা আগেই বলেছি, তার গড়নও যেন কেমন হাড়গোড় ভাঙা দয়ের মতন। আর তার মুখটা দেখলেই বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে! এ রকম বিশ্রী, ভয়াল চেহারা খুব কমই নজরে পড়ে।

তার চেহারা দেখলে যেমন ঘৃণা হয়, তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেও তেমনি হাসি পায়। তার জামা-কাপড় দামি ও বিলাসীর উপযোগী। কিন্তু সে জামা-কাপড় তার চেয়েও ঢের বেশি-ঢ্যাঙা কোনও লোকের গায়েই মানাত ভালো। এ রকম বেঢপ দেহে এমন সুন্দর অথচ বেমানান জামা-কাপড় পরে কোনও ভদ্রলোক যে রাস্তায় বেরুতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। নিজের চারিদিকে কেমন-একটা ঘৃণ্য, ভয়াবহ ও রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে সেই কিম্ভুতকিমাকার জীবটা যেন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। এবং এটাও লক্ষ করলুম, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তার মুখ-চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে!

সে ভাঙা ভাঙা কর্কশ স্বরে আমাকে শুধোলে, 'বাক্সটা এনেছেন কি? বাক্সটা?'—বলতে বলতে অত্যন্ত অধীর ভাবে হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ ধরে সে নাড়া দিতে লাগল!

তার হাতের ছোঁয়ায় আমার গায়ের ভিতর দিয়ে যেন খানিকটা বরফের স্রোত বয়ে গেল। আমি তার হাতখানা ধরে তাকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে বিরক্ত স্বরে বললুম, 'এতটা ব্যস্ত হবেন না মশাই, থামুন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্যন্ত নেই! ইচ্ছা করেন তো বসতে পারেন।'—বলে আমি নিজেই আগে আসন গ্রহণ করলুম।

লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ ভদ্র ভাবেই বললে, 'মাপ করুন করুণাবাবু, আমার অন্যায় হয়েছে। ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না! বুঝতেই পারছেন তো, জয়ন্তবাবু কী জন্যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন.....তাঁর টেবিলের দেরাজে.....একটা কালো বাক্স—' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর যেন বন্ধ হয়ে এল!

তার অবস্থা দেখে আমার মায়া হল। টেবিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমি বললুম, 'বাক্সটা ওইখানেই আছে, দেখতে পাচ্ছেন তো?'

সে এক লাফে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার পরেই একটা ঢোঁক গিলে বুকের উপরে হাত দিয়ে থেমে পড়ল। তার অবস্থা দেখে আমার ভয় হল, হয় সে এখনই মারা পড়বে, নয়তো পাগল হয়ে যাবে!

আমি বললুম, 'মশাই, নিজেকে সামলে নিন!'

আমার পানে তাকিয়ে সে একটা ভীতিকর হাসি হাসলে। তারপর টেবিলের উপর থেকে টপ করে বাক্সটা তুলে নিয়ে তার ডালাটা ফেললে খুলে। বাক্সের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে বিপুল আনন্দে সে এমন চিৎকার করে উঠল যে, আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম!

তারপর সে সহজ ভাবেই বললে, 'আপনার ঘরে একটা মেজার-গ্লাস আছে?'

আমি তার প্রার্থনা পূর্ণ করলুম।

আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করে সে গেলাসের ভিতরে খানিকটা রাঙা তরল পদার্থ ঢেলে তাতে আবার কিছু সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে। জলে সোডা ঢাললে যেমন হয়, গেলাসের ভিতরে তরল জিনিসটা তেমনি বুড়বুড়ি কাটতে লাগল। তারপর সেই রাঙা রংটা প্রথমে কমলা ও পরে পাতলা-সবুজে পরিণত হল। লোকটা এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গেলাসের ভিতরে এই পরিবর্তন লক্ষ করছিল। এখন গেলাসটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে সে আমার দিকে চেয়ে চোখ তুলে মৃদু হাস্য করলে।

তারপর সে বললে, 'এখন আপনি কী করতে চান? এই গেলাসটা হাতে করে আমাকে কি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন? না, এর পরে আমি কী করব সেটা দেখবার জন্যে আপনার কৌতূহল হচ্ছে? বেশ করে ভেবে জবাব দিন, কারণ আপনি যা বলবেন আমি ঠিক তাই-ই করব! অবশ্য, আমি এখানে থাকি আর না থাকি, তাতে আপনার লাভও নেই অলাভও নেই। তবে যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে আমি এখুনি আপনার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিতে পারি!'

আমি খুব কঠোর স্বরে কথা কইবার চেষ্টা করে বললুম, 'মশাই, আপনি হেঁয়ালির ভাষায় কথা কইছেন, ও-রকম কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনাদের এই অদ্ভুত লুকোচুরির ভিতরে আমিও জড়িয়ে পড়েছি, এখন শেষ পর্যন্ত না দেখে আর ছাড়ব না।'

লোকটা গম্ভীর স্বরে বললে, 'করুণা, বেশ কথা বলেছ! কিন্তু শোনো। এখনই যা দেখবে, সেটা কেবল তুমিই দেখবে,—সে-কথা আর কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে! তুমি

বড়ো অবিশ্বাসী, না করুণা? তোমার সঙ্কীর্ণ মন আমার বৈজ্ঞানিক মত মানেনি, দ্রব্যগুণের কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে! আজ স্বচক্ষে বিজ্ঞানের শক্তি দ্যাখো!'

ওষুধের গেলাসটা সে ঠোঁটের কাছে তুলে এক চুমুকেই শেষ করে ফেললে এবং আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল! তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে ও টলতে টলতে পড়ে যেতে যেতে টেবিলের একটা কোণ দুই হাতে চেপে ধরে নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিলে এবং আড়ষ্ট চোখে ঘনঘন হাঁপাতে লাগল!

তারপর সে কী বীভৎস স্বপ্নই আমার চোখে জেগে উঠল! আমি যেন স্বচক্ষেই দেখলুম, তার দেহ ক্রমেই ফুলে বড়ো হয়ে উঠছে এবং তার আগেকার দেহের গড়ন যেন ক্রমেই বদলে মিলিয়ে যাচ্ছে! তারপরে যা দেখলুম, তাতে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না—চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালের উপরে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ভীষণ আতঙ্কে আমি বারবার চ্যাঁচাতে লাগলুম—'ভগবান! ভগবান! ভগবান!'

—আমার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে যেন মৃত্যুর ভিতর থেকে জীবনলাভ করেই, বিবর্ণ-মুখে অন্ধের মতো শূন্যে দুই হাত বাড়িয়ে যে-মূর্তি একটা অবলম্বন খুঁজছে, সে আর কেউ নয়—আমার বন্ধু জয়ন্ত!

.....তারপর জয়ন্ত আমার কাছে বসে তার যে দীর্ঘ কাহিনি বর্ণনা করলে, তা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি তা শুনেছি,—আমার সমস্ত আত্মা এখনও সঙ্কুচিত হয়ে আছে! আমি যা দেখেছি আর শুনেছি তা বিশ্বাস করব কি না জানি না। কিন্তু আমার জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেছে। রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি না—চোখের সামনে যেন একটা দারুণ আতঙ্ক সর্বদাই মূর্তি ধরে বসে থাকে—আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, তবু আমাকে বোধহয় অবিশ্বাসী হয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে।

অবিনাশ, কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমি বলে রাখি। নিশুত রাতে আমার ঘরে সেদিন যে-জীবটার আবির্ভাব ঘটেছিল, নরহত্যাকারী তিনকড়ি নামেই সে তোমাদের সকলের কাছে পরিচিত!

॥ দশম ॥

জয়ন্তের আত্মকাহিনি

অবিনাশ, জন্ম আমার বড়োলোকের ঘরে। কিন্তু ধনীর ছেলে হলেও আমার লেখাপড়ার কোনও ত্রুটিই হয়নি। লেখাপড়া সাঙ্গ করে যখন আসল জীবন শুরু করলুম, তখন আমার ভবিষ্যৎ ছিল খুবই উজ্জ্বল।

আমার প্রকৃতিটা ছিল অদ্ভুত। একদিকে আমি ছিলুম যেমন আমোদপ্রিয় ও চপল-স্বভাব,

অন্যদিকে তেমনি গম্ভীর। এই চপলতা ও গাম্ভীর্যকে আমি কখনও এক করে ফেলতুম না। আমোদের ঝোঁকে আমি এমন সব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, আমার প্রকৃতির গাম্ভীর্য কোনওদিন তাতে সায় দেয়নি। কিন্তু লোকের কাছে আমার এই চপল স্বভাবকে বরাবরই আমি লুকিয়ে এসেছি। লোকে বরাবরই জানে যে আমি হচ্ছি একজন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, হাল্কা আমোদপ্রমোদে মেতে কখনও কোনও অন্যায় কাজ করতে পারি না। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আমার এই গুপ্ত আমুদে স্বভাবের পরিচয় পাননি। এইখানে সকলের চোখে এতদিন ধুলো দিয়ে এসেছি।

আদিম কাল থেকেই মানুষের এই দুর্বলতা আছে। সে নিজের চরিত্রের সমস্তটা কোনওদিনই সকলের সামনে খুলে দেখায়নি। সুন্দর মুখোশ পরে সে তার চরিত্রের কদর্যতা গোপন করেছে। যে শয়তান, সে সাধুর ছদ্মবেশে দশজনের মাঝখানে আনাগোনা করে। মানুষ এই লুকোচুরি-বিদ্যাতে পাকা হয়ে উঠেছে।

আমি যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে জীবনের অনেক দিন কাটিয়েছি, একথা তোমরা সকলেই জানো। আমি এমন সব অদ্ভুত বিষয় নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা করেছি, আর কোনও বৈজ্ঞানিক কখনও যা করেননি। আমার এই সব পরীক্ষা নিয়ে অনেকে অনেকরকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু আমি কোনওদিনই সেসব গায়ে মাখিনি। ওই অবিশ্বাসীদের মধ্যে আমাদের করুণা ছিল প্রধান একজন।

মানুষের প্রকৃতির ওই দু-রকম ভাবকে দুটো সম্পূর্ণ-স্বাধীন আলাদা অংশে বিভক্ত করা যায় কি না, এই নিয়ে অনেক দিন ধরে চিন্তা ও পরীক্ষা করে আসছি। আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু প্রকৃতির সঙ্গে এই অসাধু প্রকৃতির মিলন পৃথিবীর সুখ-সৌভাগ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সাধুতা ও অসাধুতা যদি নিজের নিজের উপযোগী মূর্তি ধারণ করে আপন-আপন পথে আলাদা হয়ে চলতে পারে, তাহলে তারা অনেক অশান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। সু, যোগ্য-রূপে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে, কু-র কুকার্যের জন্যে তাকে আর অনুতপ্ত ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় না। কু, নিজের মনের খুশিতে নরকের পথে এগিয়ে যেতে পারে, সু-র কাছ থেকে তাকে ধমক খেতে ও বাধা পেতেও হয় না। মনের ভিতরে সু ও কু-র দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রায় প্রতি কবিই অনেক কথা বলেছেন। সেই দ্বন্দ্ব যাতে বন্ধ হয় এবং সু আর কু আলাদা আলাদা রূপ পায়, তাই নিয়ে আমি প্রাণপণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলুম।

এই পরীক্ষার ভিতরের কথা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। কারণ প্রথমত, যাঁরা বৈজ্ঞানিক নন তাঁরা আমার কথা বুঝতে পারবেন না; দ্বিতীয়ত, আমার পরীক্ষা যে অসম্পূর্ণ এ কথা আজ নিজেই বুঝতে পারছি; এই অসম্পূর্ণ পরীক্ষার গুপ্তকথা প্রকাশ করে দিলে পৃথিবীতে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হবে—কেন না জগতে দুষ্ট মানুষের কোনওই অভাব নেই।

আজ মনে হচ্ছে, পরীক্ষায় এমন আংশিক ভাবে সফল না হলেই, সেটা হত আমার পক্ষে মস্ত এক আশীর্বাদ। এই বিপুল পৃথিবী ও সমস্ত জীব যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই শক্তিমান স্রষ্টার বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে আমার আত্মাকে আমি বিপদগ্রস্ত করেছি।

যেদিন আমার বিশ্বাস হল যে পরীক্ষায় আমি সফল হয়েছি, সেদিন আমার মনে খুবই আনন্দ হল বটে, কিন্তু নিজের উপরে নিজের আবিষ্কৃত এই ঔষধটা প্রয়োগ করতে সাহস হল না সহজে। কারণ একই আত্মার দুই প্রকৃতির ভিতর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটো দেহ আত্মপ্রকাশ করবে, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার নয়! একটু এদিক-ওদিক হলেই মৃত্যুর সম্ভাবনা! এমনি ইতস্তত করতে করতে অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু শেষটা এই অভাবিত আবিষ্কারের প্রলোভন আমি আর সামলাতে পারলুম না। এক অভিশপ্ত রাত্রে সমস্ত ভয়-ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্জয় সাহসে আমি আমার আবিষ্কৃত এই ঔষধটা গলাধঃকরণ করলুম।

তারপর, সে কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! আমার দেহের সমস্ত হাড় ও মাংস যেন কে জাঁতাকলে ফেলে পেষণ করতে লাগল—চোখের সুমুখ থেকে পৃথিবীর সমস্ত দীপ্তি ধীরে ধীরে নিবে গেল! .....ক্রমে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা আবার কমে এল এবং আমার মনে হল যেন আমি এক সাংঘাতিক ব্যাধির কবল থেকে মুক্তিলাভ করলুম! অনুভব করলুম, আমার ভিতরে যেন এক অবর্ণনীয়, বিস্ময়কর ও অপূর্ব-মধুর নূতনত্বের সঞ্চার হয়েছে! আমার দেহ যেন ঢের বেশি হাল্কা, তরুণ ও সুখি হয়ে উঠেছে! আমি যেন এখন অকুতোভয়ে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে দুর্দমনীয় বেগে ছুটোছুটি করতে পারি! সেই সঙ্গে এটাও আমি বুঝতে পারলুম যে, আমার প্রাণ এখন দানবের মতন নিষ্ঠুর ও হিংসুক হয়ে উঠেছে,—কিন্তু তা জেনেও আমার মন দুঃখিত হল না মোটেই! দু-দিকে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে আমার এই তাজা আনন্দটাকে উপভোগ করতে গিয়ে হঠাৎ আমি টের পেলুম, আমার দেহ আকারে আরও ছোটো হয়ে গিয়েছে!

তাড়াতাড়ি একখানা বড়ো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং দেখলুম সেই জীবটাকে সর্বপ্রথমে, তোমরা সবাই যাকে তিনকড়ি বটব্যাল বলে জানো!

পরে আমার এই আকারের ক্ষুদ্রতার কারণ বুঝেছিলুম। আমার ভিতরে যে দুষ্ট প্রকৃতি লুকিয়েছিল, আমার সাধু প্রকৃতির মতন সেটা বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও পূর্ণগঠন হতে পারেনি। আমার জীবনের বেশি দিন কেটেছে সাধু ভাবেই, কাজেই এই অসাধু ভাবটা খুব বেশি প্রবল হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি কোনও দিনই। এইজন্যেই ডাক্তার জয়ন্তের চেয়ে তিনকড়ি বটব্যালের দেহ হয়েছে আরও তরুণ, আরও হাল্কা ও আরও ক্ষুদ্র! ডাক্তার জয়ন্তের মুখে আঁকা আছে যেমন সাধুতার প্রতিচ্ছবি, তিনকড়ি বটব্যালের মুখের উপরেও ফুটে উঠেছে তেমনি কুৎসিত ভাবের জ্বলন্ত ইতিহাস!

কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমার মনে কোনওরকম ঘৃণা বা লজ্জা হল না।

ওই তিনকড়ি—ও তো আর কেউ নয়, ও যে আমিই নিজে! পরে আমি নিজের মূর্তি ধারণ করে অনেকবারই শুনেছি যে, তিনকড়ি বটব্যালের চেহারা দেখে সকলেরই প্রাণে আতঙ্কের উদয় হয়! এর কারণ আর কিছু নয়, সকল মানুষের দেহই ভালোয় ও মন্দে গড়া,—কিন্তু একমাত্র তিনকড়ি বটব্যালেরই দেহ হচ্ছে, সম্পূর্ণ ভাবে মন্দ দিয়ে গড়া!

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারলুম, ডাক্তার জয়ন্তের বাড়িতে তিনকড়ি বটব্যালের ঠাঁই হতে পারে না। তিনকড়ি যখন মূর্তি ধারণ করবে, তখন তাকে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করতে হবে!

তারপর দ্বিতীয় বার সেই ঔষধ গলায় ঢেলে আবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে আমি নিজের আসল মূর্তি ফিরে পেলুম!

খুব ভেবে-চিন্তে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম। ব্রজদুলাল স্ট্রিটে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে ফেললুম। নিজের চাকর-বাকরদের বলে দিলুম যে, তিনকড়ি বটব্যাল বলে কোনও লোক এ-বাড়িতে এলে তারা যেন তার হুকুমকে আমার হুকুম বলেই মনে করে। এমনকি নিজেই তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে বার-কয়েক এ বাড়িতে এসে আমার এই নতুন চেহারাটা ভৃত্যদের কাছে সুপরিচিত করে তুললুম। ডাক্তার জয়ন্তের কোনও বিপদ হলে তিনকড়িও পাছে বিপদগ্রস্ত হয়, সেই ভয়ে তোমাকে দিয়ে একখানা নতুন উইল তৈরি করিয়ে রাখলুম। এইভাবে আট-ঘাট বেঁধে আমি আমার নতুন জীবনের জন্যে প্রস্তুত হলুম।

অনেকে নিজে নিরাপদে আড়ালে থাকবার জন্যে গুন্ডা ভাড়া করে অন্যায় কাজ করে। কিন্তু আমি হচ্ছি এই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম লোক, আপনাকে নিরাপদে রাখবার জন্যে যাকে অন্যের অন্যায় সাহায্য নিতে হয়নি। ডাক্তার জয়ন্ত রূপে সৎ লোকের সমাজে সাধু ভাবে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে আমি বেড়াতে পারি, আবার ইচ্ছা করলেই চোখের নিমেষে তিনকড়ি সেজে সকলের সামনে যা-খুশি তাই করতে পারি। চুরি করি, জুয়াচুরি করি আর নরহত্যাই করি, কেউ আমার একগাছা কেশও স্পর্শ করতে পারবে না। আমাকে দু-মিনিট সময় দাও, একবার পরীক্ষাগারের ভিতরে যেতে দাও—তারপর? তারপর তিনকড়ি বটব্যাল উপে যাবে কর্পূরের মতন! পুলিশ নিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হও এবং সবিস্ময়ে চেয়ে দ্যাখো, সেখানে সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে তোমাদের সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করছেন বিখ্যাত ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়, যাঁর সুনাম ও সুচরিত্রের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরছে দিন-রাত!

তিনকড়ি রূপে শহরের পাড়ায় পাড়ায় আমি যেসব কাজ করে বেড়াতুম সত্যই তা হীন, নিষ্ঠুর ও ভয়ানক! কোনও মানুষই—যার প্রাণে মন্দের সঙ্গে এতটুকু ভালোও আছে—এমন সব জঘন্য কাজ করতে পারে না! সময়ে সময়ে তিনকড়ির কার্যকলাপ দেখে ডাক্তার জয়ন্ত পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। কিন্তু ক্রমেই এসব ব্যাপার তাঁর কাছে সহজ হয়ে উঠল। এ

জন্যে দায়ী তিনি নন, তিনকড়ি একলাই দোষী! জয়ন্ত যখন আকার ধারণ করেন তখন তাঁর সাধুতার গায়ে তো কোনও আঁচ লাগে না! বরং তিনকড়ি কোনও ভুল করে ফেললে জয়ন্ত নিজের নামের জোরে আবার তা শুধরে নিতে লাগলেন! এই ভাবে তাঁরও বিবেক-বুদ্ধি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে একদিন এক কাণ্ডের পর সদানন্দবাবুর সঙ্গে তিনকড়ির পরিচয়! তারপর যে-সব ঘটনা ঘটেছে তোমার তা মনে আছে, আমি আর তা নিয়ে আলোচনা করব না। কেবল একদিনের কথাই বলব।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হল, আমি যেখানে আছি সেখানে থাকা আমার উচিত নয়! ব্রজদুলাল স্ট্রিটের বাড়িই হচ্ছে আমার আসল থাকবার ঠাঁই,—কিন্তু তার বদলে এ যে দেখছি ডাক্তার জয়ন্তের ঘর ও বিছানা,—এ বিছানায় আমি কোনও দিনই তো শয়ন করতে অভ্যস্ত নই!

মনে মনে হেসে খানিকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে এই অদ্ভুত ভাবটা আমি মন থেকে মুছে ফেললুম.....হঠাৎ নিজের হাতের দিকে আমার নজর পড়ল। ডাক্তার জয়ন্তের হাত হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চ্যাটালো ও মসৃণ! কিন্তু ভোরের অপ্রখর আলোকে আমি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এ-হাতখানা হচ্ছে মলিন, ছোটো, রোগা, দড়ির মতন পাকানো ও কালো কালো লম্বা চুলে ভরা। এ হাত হচ্ছে তিনকড়ি বটব্যালের হাত!

প্রায় আধ মিনিট ধরে আমার হাতের দিকে নিষ্পলক নেত্রে আমি তাকিয়ে রইলুম! বিস্ময়ের প্রথম চমক কাটার সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ এক বিভীষিকায় আমার মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল—খাট থেকে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে আমি আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কী দেখলুম জানো? আরশির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে তিনকড়ি বটব্যাল! ডাক্তার জয়ন্ত রূপে কাল রাত্রে আমি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম, আর আজ সকালে জেগে উঠেছি তিনকড়ি বটব্যাল রূপে! এই অভাবিত পরিবর্তনটা হয়েছে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এবং অজ্ঞাতসারেই!

এখন উপায়? পরিবর্তনের কারণের কথা পরে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু তিনকড়ি বটব্যাল এখন কী করবে? এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে আমার পরীক্ষাগারে যেতে গেলে অনেকটা পথ পার না হলে নয়। চাকর-বাকররা দেখে ফেললে কী মনে করবে?

তারপরেই বুঝতে পারলুম, তিনকড়িকে এ বাড়িতে দেখে দেখে সকলে যখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তখন এই অসময়েও তাকে দেখলে তারা বড়ো-জোর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থাকবে। হলও তাই। ও-বাড়িতে যাবার সময় রামচরণ ও অন্যান্য সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আমার চোখ এড়াল না। .....দশ মিনিট পরে ডাক্তার জয়ন্ত রূপে আবার আমি নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

সেদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা আমি প্রায় ভুলে গেলুম বললেই হয়। সারাক্ষণই দুর্ভাবনার

ভিতর দিয়ে কাটতে লাগল। কারণ কী, কারণ কী? বিনা ঔষধে ডাক্তার জয়ন্তের দেহের ভিতর থেকে তিনকড়ির আবির্ভাবের কারণ কী? অনেক ভেবে আন্দাজ করলুম, ঘন ঘন রূপান্তর গ্রহণ করে আমি বোধহয় ডাক্তার জয়ন্তের চেয়ে তিনকড়ির দেহকেই সবল করে তুলেছি! এখন হয়তো তিনকড়ির মূর্তিই আমার স্বাভাবিক মূর্তি হয়ে ওঠবার উপক্রম হয়েছে!

কিন্তু তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে আমি যতই পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করি, তবু আমার পক্ষেও তাকে পছন্দ করা অসম্ভব। ডাক্তার জয়ন্ত—দেশের ও দশের মাঝখানে সকলেই তাঁকে সম্মান করে ও ভালোবাসে, তাঁর বন্ধুবান্ধব, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সৌভাগ্যেরও অভাব নেই,—আর তিনকড়ি? তাকে এই পৃথিবীর সকলেই নরকের কীটের মতন মনে করে এবং তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবার জন্যে সকলেই প্রস্তুত হয়ে আছে! আমাকে যদি এই পৃথিবীতে বাঁচতে হয় তবে জয়ন্ত রূপেই বাঁচতে হবে, আর তিনকড়িকে পাঠাতে হবে চিরনির্বাসনে।

মনে মনে এই দৃঢ়-সংকল্প করলুম এবং এ সংকল্প স্থির রইল দুই মাস পর্যন্ত। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, মাঝে দুই মাস আমি সকলের সঙ্গে মন খুলে মেলামেশা করছিলুম? কিন্তু তার পরেই আবার আমার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। দিন-রাতই আমার হৃদয়-কারাগারের ভিতর থেকে তিনকড়ির মুক্তি-প্রার্থনা শুনতে লাগলুম! তারপর আবার এক দুর্বল মুহূর্তে আমি সেই ঔষধ পান করলুম। আমার চরম দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত এইখানেই।

অনেক কাল মদ্যপান বন্ধ রেখে মাতাল যদি আবার নতুন করে মদ্যপান শুরু করে, তাহলে সে আর নেশার মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না। আমারও অবস্থা হল সেই রকম। এতদিন আমার দেহহীন অসাধু প্রকৃতি যে নিষ্ফল আক্রোশে ও অবরুদ্ধ আবেগে নীরবে হাহাকার করছিল, আজ আবার নতুন করে দেহ ও স্বাধীনতা লাভ করে সে একেবারে দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে বিরাট এক পৈশাচিক উল্লাসে ও ভীষণ এক হিংসা-পূর্ণ আনন্দে আমার সমস্ত দেহ-মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল! সেই সময়েই হতভাগ্য কুমার মনোমোহনের সঙ্গে আমার দেখা। এবং তার পরিণাম তোমরা সকলেই জানো! .....মনোমোহনের অচেতন দেহকে অসহায় ভাবে পথের ধূলায় পড়ে থাকতে দেখেও আমার মনে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হল না—আমি তার উপরে লাঠির পর লাঠির ঘা মারতে লাগলুম এবং যতবারই লাঠি মারি ততবারই আমার বুক তাণ্ডবের আনন্দে যেন নাচতে থাকে! মারতে মারতে আমার অন্ধ আনন্দ হঠাৎ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলে! আচম্বিতে মনে পড়ে গেল, আমি এখন হত্যাকারী, ধরা পড়লে এখন আমার জীবনের কোনওই দাম নেই! বিষম আতঙ্কে আমার উন্মত্ত আনন্দ বিলুপ্ত হয়ে গেল—তিরের মতন সেখান থেকে পলায়ন করলুম।

ব্রজদুলাল স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে তিনকড়ি যখন

নিশ্চিন্ত হয়ে ডাক্তার জয়ন্তের পরীক্ষাগারে ফিরে এল, তখন সে মহা ফূর্তিতে একটা টপ্পা গান শুরু করে দিলে! গুন-গুন করে গান গাইতে গাইতে হাসিমুখে সে ঔষধ পান করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি ধারণ করলেন ডাক্তার জয়ন্ত! কিন্তু তাঁর মুখে তখন আর হাসি ছিল না, তাঁর চোখে ছিল অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস। .....অনুতাপে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল, আবার তিনকড়ি হয়ে আমি কী গুরুতর পাপই আজ করলুম! আর নয়—আজ থেকে তিনকড়ির সমাপ্তি! হে ভগবান, এ বন্যপশুকে আর কখনও পিঞ্জরের বাইরে আনব না,—কখনও নয়, কখনও নয়!

অবিনাশ, তুমি জানো সেই হত্যাকাণ্ডের পরে আমি কীভাবে জীবনযাপন করেছি? তোমাদের সঙ্গে আলাপ, ধর্মালোচনা ও পরোপকার ছাড়া আর কোনওদিকেই আমি মনকে নিযুক্ত রাখিনি। সমস্ত অন্যায় আনন্দকে আমার মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আমার সাধু-প্রকৃতির ভিতর থেকে শান্তি ও সুখের খোরাক খুঁজে পেলুম এবং ধীরে ধীরে আমার মন থেকে অনুতাপের ভাবটা আবার মিলিয়ে গেল।

কিন্তু তারপর থেকেই বুকের ভিতরে নিত্যই আমার অসাধু প্রকৃতির গর্জন আবার শুনতে পেলুম! কে যেন রুদ্ধস্বরে বলছে—'ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও—তোমার ভালোকে নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে নিজের পথে যেতে দাও! এত সাধুতা আমার সইছে না!' যদিও নরকের উৎকট আনন্দ বারে বারে আমাকে ডাকতে লাগল, তবু সে প্রলোভনকে প্রাণপণে আমি দমন করতে লাগলুম। তিনকড়ির জাগরণ আর অসম্ভব! এবার জাগলে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে!

সেদিন সকালে এক কোম্পানির বাগানে একলাটি বসে ছিলুম। কচি রোদের সোনার জলে গাছের সবুজ পাতাগুলি ঝলমল করছে, চারিদিকে পাখিদের প্রভাতি বীণার গান শোনা যাচ্ছে, আকাশের উদার নীলিমায় মেঘের ছায়া নেই। এই শান্ত প্রভাতে আমার মনের ভিতর থেকে হারানো সুখস্মৃতির কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস জেগে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণের উপরে যেন কীসের একটা ধাক্কা লাগল! মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল এবং চোখের সুমুখ দিয়ে একটা অন্ধকারের বন্যা ছুটে গেল! তারপরই দেহের ভিতরে অনুভব করলুম, নবীন যৌবনের উদ্দাম আবেগকে! হেঁট হয়ে তাকিয়ে দেখলুম: আমার জামা-কাপড়গুলো ঢিলে হয়ে দেহের উপর থেকে ঝুলে পড়েছে এবং আমার দুই হাঁটুর উপরে আছে দু-খানা পাকানো লোমশ হাত! আবার আমি তিনকড়ি বটব্যাল! এক মুহূর্ত আগে ছিলুম আমি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য এবং এক মুহূর্ত পরেই হলুম সমাজ থেকে বিতাড়িত ফাঁসির আসামি!

কিন্তু এখন ভাববার বা ভয় পাবারও সময় নেই। আমার ঔষধ আছে পরীক্ষাগারের ভিতরে, কিন্তু সেখানে যাব কেমন করে? তিনকড়ি রূপে বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করলে আমার ভৃত্যরাই এখন পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দেবে! তাহলে কী করি? .....তখন মনে পড়ল করুণাকে।

বাগান থেকে বেরিয়ে আসছি, একটা বুড়ি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সুমুখে এসে দাঁড়াল। তার হাতের ডালায় কতগুলো দেশলাইয়ের বাক্স। বুড়ি ভিখারির মতো স্বরে কাকুতি-মিনতি করে বললে, 'বাবা, একবাক্স দেশলাই কিনবে বাবা?' অকারণে-রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল এবং বুড়ির মুখে আমি সজোরে চপেটাঘাত করলুম! হাঁউমাঁউ করে কেঁদে-ককিয়ে বুড়ি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেল!

তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি ডাকলুম। আমার চেহারা ও কাপড়-চোপড় দেখে গাড়োয়ান তার হাসি চাপতে পারলে না। দুর্জয় ক্রোধে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আমি গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—এবং তার ঠোঁট থেকে হাসির লীলা তখনই মিলিয়ে গেল! সে শিউরে উঠে ফিরে বসে তাড়াতাড়ি নিজের কাজে মন দিলে। ভালোই করলে, নইলে সে বাঁচত না!

একটা হোটেলে গিয়ে উঠলুম। হোটেলের চাকরগুলোও আমার চেহারা দেখে গেল চমকে ও ভড়কে। আবার আমার সেই খুনে-রাগ হতে লাগল, কিন্তু কোনও-রকমে রাগ সামলে একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সেইখানে বসে করুণাকে একখানা ও আমার ভৃত্য রামচরণকে একখানা পত্র লিখলুম। তারপরের কথা এতক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে, সুতরাং আমি আর বলবার চেষ্টা করব না।

.....নিরাপদে নিজের বাড়িতে ফিরে এলুম বটে, কিন্তু তারপর থেকে জীবন আমার দুর্বহ ও দুঃসহ হয়ে উঠল। দুপুরবেলায় নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে দিবা-নিদ্রার একটু আয়োজন করছি, এমন সময়ে আমার প্রাণের উপরে আবার সেই-রকম একটা ধাক্কা লাগল। এবারে আগে থাকতেই সাবধান হলুম। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে দ্রুতপদে পরীক্ষাগারের দিকে ছুটলুম। পরীক্ষাগারের দরজা বন্ধ করে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, আবার আমি তিনকড়ি হয়ে গিয়েছি!

এবারে খুব বেশিমাত্রায় ঔষুধ খেয়ে নিজের আগেকার মূর্তিকে ফের ফিরে পেলুম বটে— কিন্তু বৃথা! খানিক পরে আবার আমার প্রাণকে ধাক্কা মেরে তিনকড়ির পুনরাবির্ভাব হল! তারপর যতই ওষুধ খাই ও জয়ন্তের মূর্তি ধারণ করি, তিনকড়ি আর কিছুতেই আমাকে ছাড়ে না, একটু আনমনা হলেই সে এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসে!

তারপর আমার ওষুধ গেল ফুরিয়ে! নিজে নানা কৌশলে আত্মগোপন করে রামচরণকে অনেক ডাক্তারখানায় পাঠালুম, কিন্তু সে সর্বনেশে ওষুধের গুঁড়ো আর কিছুতেই সংগ্রহ করা গেল না! দেখছি, তিনকড়ির ভূতকে ঘাড়ে করেই জীবনের শেষ নিশ্বাস আমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ওষুধের সামান্য একটুখানি অবশিষ্ট ছিল, তারই প্রভাবে শেষবারের জন্যে জয়ন্তের মূর্তি ধারণ করে তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। অবিনাশ, আর আমার কোনও আশাই নেই! তিনকড়ির কী হবে? সে কি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেবে? ভগবান জানেন! আমার আর কিছুই জানবার আগ্রহ নেই। আমার যথার্থ আমিত্বের মৃত্যু হয়েছে, তিনকড়ির অদৃষ্টের সঙ্গে

তার কোনওই সম্পর্ক নেই। তোমাকে চিঠি লিখে যখন আমি কলম তুলে রাখব, তখন থেকেই এই পৃথিবী হতে অভাগা জয়ন্তের জীবন একেবারেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট

মামূর্তের দানব-দেবতা

সাহারা মরুভূমির উপর তখন পূর্ণিমার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

পৃথিবীর সমস্ত বিশাল সৌন্দর্যই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। পর্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, সমুদ্রের মধ্যে যেমন প্রশান্ত মহাসাগর, মরুভূমির মধ্যেও তেমনি এই সাহারা। ছেলেবেলা থেকেই সাহারাকে দেখবার জন্যে মনের ভিতর থেকে একটা প্রবল ইচ্ছার সাড়া পেতুম। তাই ইউরোপ থেকে ফেরবার সময় সাহারার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আমরা দুই বন্ধুতে।

বালুকার এই মহাসাগরে সারাদিন কাটিয়ে বেশ বুঝতে পেরেছি, গরম কড়ায় ফেলে ভাজবার সময় কইমাছের অবস্থা হয় কী রকম! সারাক্ষণ তাঁবুর ভিতরে আধমরার মতন পড়েছিলুম। এখন সন্ধ্যার পরে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, পরিপূর্ণ পূর্ণিমার হাসি সমস্ত মরুভূমিকে একটা আনন্দ মায়ারাজ্য করে তুলেছে!

চাঁদের আলো আর মরুভূমি আজ যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে। এখন এই মরুভূমিকে দেখলে কে বলতে পারবে যে খানিক আগে এইখানেই ছিল নরকের এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড!

আমরা আছি একটা ওয়েসিসের ভিতরে। সকলেই জানেন বোধহয়, ওয়েসিস হচ্ছে অসীম, শুষ্ক, ধু ধু বালুকাপ্রান্তরের ভিতরে ছোট্ট একটি তরু-শ্যামল জায়গা। হয়তো পঞ্চাশ, ষাট, একশো কি আরও বেশি মাইল পথ পার হবার পরে মরুভূমির মধ্যে এই রকম এক-একটা ওয়েসিস পাওয়া যায়। এখানে থাকে তালজাতীয় গাছের কুঞ্জছায়া এবং মরুভূমির মধ্যে সবচেয়ে যা দুর্লভ, সেই শীতল জলের মিষ্ট ধারা। তবে সব ওয়েসিসে যে জল পাওয়া যায় তাও নয়। আমাদের এই ওয়েসিসে পাতাল থেকে একটি জলের উৎস উঠে মনোরম এক সরোবরের সৃষ্টি করেছে। কাজেই মরু-পথের সমস্ত যাত্রী এখানে বিশ্রাম না করে বিদায় নেয় না।

সুন্দর মরু-উদ্যানের ধারে আমরা দুজনে চুপ করে বসে আছি এবং সরোবরের জলে জ্যোৎস্নার রুপালি সারি ঝিলমিল করে উঠছে। আর এক দিকে যতদূর চোখ চলে দেখা যায় আকাশের মতন অসীম অবাধ বালুকার রাজ্য।

আচম্বিতে মনে হল, সেই জনহীন মরুভূমির রহস্য ভেদ করে যেন একটা মানুষের চলন্ত ছায়া ফুটে উঠল! ছায়াটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে এবং এগিয়ে আসতে আসতে মাঝে মাঝে যেন মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে!

আমরাও অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলুম। হ্যাঁ, মানুষই বটে! কিন্তু কী তার চেহারা! মানুষের এমন শ্রান্ত, শুষ্ক ও শীর্ণ আকার আমরা কখনও দেখিনি! হয়তো এই ভয়াবহ মরুভূমিতে পথ হারিয়ে পানাহারের অভাবেই এর এমন দশা হয়েছে!

আগন্তুক আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে পারলে না, টলতে টলতে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তারপর অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বললে, 'জল!'

দুজনে ধরাধরি করে তাকে তুলে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে এলুম এবং তার ঠোঁটের কাছে ধরলুম ঠান্ডা জলের গেলাস। আগন্তুকের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে এবং তার হাঁটুর উপরে ও করতলে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন—বোধহয় চলতে না পেরে বালির উপরে হামাগুড়ি দিয়ে আসার দরুনই তার হাত ও হাঁটু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আগন্তুকের অবস্থা দেখে বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীতে তার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে।

আরও এক গেলাস জলপান করে আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে দুর্বল স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, আমি একলাই এসেছি। আমি? আমি হচ্ছি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক—অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে অতীত গৌরবের সমাধি আবিষ্কার করাই হচ্ছে আমার ব্যাবসা। .....কিন্তু আজ বেশ বুঝতে পারছি, এ কাজে হাত না দিলেই আমি ভালো করতুম। অতীতের গুপ্তকথা আবিষ্কারের চেষ্টা সব সময়ে নিরাপদ নয়। অতীতকে বর্তমানে টেনে আনতে গিয়েই আজ আমি এই বিপদে পড়েছি।'

আমাদের দুজনের চোখে-মুখে বিস্ময়ের আভাস দেখে আগন্তুক আবার বললে, 'আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। আমি এখনও পাগল হইনি। আচ্ছা, আমার ইতিহাস আপনারা শুনুন, সব কথাই আমি খুলে বলব। কিন্তু তার আগেই আমার আর একটা কথা আপনাদের স্মরণ রাখতে বলছি। ভুলেও কোনও দিন ইগিডি মরুভূমিতে যাবেন না! আমাকেও আগে একজন এমনি সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু তবু আমি সাবধান হইনি। অবাধ্য হয়ে আমি গিয়েছিলুম নরকে—হ্যাঁ মশাই, নরক! .....এখন গোড়া থেকেই সমস্ত শুনুন

আমার নাম—থাক, আমার নামে কোনও দরকার নেই। এক বছর আগে অ্যাটলাস পাহাড়ের তলা দিয়ে আমি মরুভূমির ভিতরে এসে পড়েছিলুম। আমার ইচ্ছা ছিল, উত্তর-আফ্রিকার মরুভূমির ভিতরে প্রাচীন কার্থেজ শহরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করব।

সেই চেষ্টায় আমি মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েছি। কখনও অজানা আরবপল্লিতে, কখনও কোনও ওয়েসিসের ছায়ায় এবং কখনও জনশূন্য, অপরিচিত মরুভূমির ভিতরে আমার দিনের পর দিন কেটে গিয়েছে। এখানে-সেখানে প্রাচীন দুর্গ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষের ভিতরে প্রাচীন কার্থেজের পূর্ব-গৌরবের অনেক নিদর্শনই আমি খুঁজে পেয়েছি। তারপর একদিন এমন একটি জিনিস আমার চোখে পড়ল যার ফলে আর ইগিডি মরুভূমিতে না গিয়ে থাকতে পারলুম না।

একটি হাজার হাজার বছর আগেকার ভাঙা মন্দিরের গায়ে পাথরের উপরে এই কথাগুলি খোদা ছিল

'বণিকগণ, তোমরা কেউ মামূর্ত্ত শহরে যেয়ো না। পর্বতের গিরিসঙ্কট পার হয়ে ওই শহরে যাওয়া যায়। আমি কার্থেজের এক ব্যবসায়ী, চারজন সঙ্গীর সঙ্গে না জেনে আমিও ওই শহরে গিয়ে পড়েছিলুম। তারপর ওই শহরের দুষ্ট পুরোহিতরা আমাদের বন্দি করে। ওখানে এক রাক্ষস দেবতা বা দানব আছে, পুরোহিতরা তার জন্যে এমন এক বিরাট ও বিস্ময়কর মন্দির তৈরি করে দিয়েছে, যার তুলনা ত্রিভুবনে নেই। মামূর্ত শহরের দানব-দেবতার সামনে নিয়ে গিয়ে পুরোহিতরা আমার সঙ্গীদের বলি দেয় এবং আমি কোনওরকমে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি। পাছে আবার কোনও হতভাগ্য ওই শহরে গিয়ে বিপদে পড়ে, সেইজন্যে সকলকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। মন্দিরের দুষ্ট দেবতা, সৃষ্টি-প্রভাত থেকে যে সেখানে বিরাজ করছে, সাবধান—তাকে সাবধান!'

বুঝতেই পারছেন, হাজার হাজার বছরের পুরানো এই সাবধানবাণী আমার মনের উপরে কী অপূর্ব কাজই করলে! এত বড়ো একটা অতুলনীয় মন্দিরের কথা আমি কোনও কেতাবেই পড়িনি এবং কোনও লোকের মুখেই শুনিনি। ইগিডি মরুভূমির ভিতরে মামূর্ত নামে যে একটি প্রাচীন শহর ছিল বা আছে, এ কথাও আজ কেউ আর জানে না। রোমের দুর্ধর্ষ সৈন্যদের কবলে পড়ে বিপুল সভ্যতার লীলাক্ষেত্র কার্থেজ আজ সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার স্মৃতির শেষ ধ্বংসাবশেষে এসে আজ যা আবিষ্কার করলুম, তার সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে আমার সারা প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কাছেই একটা ছোটো আরবপল্লি ছিল। সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েও বিশেষ-কিছু নূতন কথা জানতে পারলুম না। কেবল বুড়ো আরবদের মুখ থেকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা গেল, কোন পথ দিয়ে ইগিডি মরুভূমিতে যাওয়া যায়।

কিন্তু আরবরা যে এর চেয়েও বেশি কিছু জানে, এ সন্দেহ আমার এখনও যায়নি। কারণ আমার সঙ্গী হবার জন্যে তাদের অনেককেই অনুরোধ করেছিলুম। কিন্তু অনেক টাকার লোভ দেখিয়েও তাদের কারুকে রাজি করাতে পারিনি। প্রথমটা তারা রাজি হয়েছিল। কিন্তু যেই শুনলে গিরিসঙ্কট পার হয়ে আমি ইগিডি মরুভূমিতে যাব, অমনি তারা সবাই একেবারে বেঁকে বসল। বললে, গিরিসঙ্কটের ওপারে তারা কেউ কখনও যায়নি, মরুভূমির পথ-ঘাটের খোঁজ তারা রাখে না, ইত্যাদি। কোনও কোনও বুড়ো আরবের মুখে শুনলুম, ইগিডি মরুভূমিতে নাকি মানুষের যাওয়া উচিত নয়, কারণ সেখানে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব বাস করে!

তাদের কুসংস্কার টলানো অসম্ভব দেখে আমি একলাই ইগিডি মরুভূমিতে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম। তারপর দুটো উটের পিঠে আমার মোটমাট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে তিন দিন পথ হেঁটে গিরিসঙ্কটের কাছে গিয়ে হাজির হলুম।

গিরিসঙ্কটের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। সেই সরু শুঁড়িপথটা বড়ো বড়ো পাথরে এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে তার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার! পথের দু-ধারে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল আকাশের দিকে উঠে গিয়ে আলো আসবার উপায় প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। সেই ছায়াময়, রহস্যময়, নির্জন ও নিস্তব্ধ গিরিসঙ্কট ভেদ করে আমি যখন

ওধারে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন বিপুল বিস্ময়ে আমার মন অভিভূত হয়ে গেল। সীমাহীন এক মরুভূমি চারিধার থেকে বিপুল এক পুকুরের পাড়ের মতন পাতালের দিকে নেমে গিয়েছে। এবং আমার কাছ থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে যেখানে চারিদিকের ঢালু জায়গা এসে মিশেছে, সেইখানে প্রাচীন মামূর্ত শহরের শ্বেতবর্ণ ধ্বংসাবশেষ সূর্যালোকে তুষার-পর্বতের মতো সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

খানিকক্ষণ পরে আবার অগ্রসর হলুম সেই ধ্বংসাবশেষের দিকে— এ যেন মূর্তিমান বিরাট অতীতের দিকে বর্তমানের ক্ষুদ্র মানবশিশুর অভাবিত তীর্থযাত্রা! যতই এগিয়ে যাচ্ছি ধ্বংসাবশেষ ততই মস্ত হয়ে উঠছে। কোথাও একটা ভাঙা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও কতকগুলো থামের সারি এবং কোথাও-বা ইট-পাথরের প্রকাণ্ড স্তূপ! অনেক জায়গায় বালির রাশির ভিতরে ধ্বংসাবশিষ্ট বাড়িঘর একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে।

তারপর আমি আর-একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলুম। কোথাও দেওয়ালের পাথরের উপরে, কোথাও থামের উপরে এবং কোথাও-বা সিঁড়ির ধাপের উপরে কিম্ভূতকিমাকার এক জানোয়ার মূর্তি খোদা আছে। জানোয়ারটাকে দেখতে অনেকটা অক্টোপাসের মতন—যদিও তা অক্টোপাসের মূর্তি নয়। তার দেহ গোল ও বেঢপ এবং দেহের তলা দিয়ে মাকড়সার পায়ের মতন কতকগুলো অদ্ভুত পা বা লকলকে শুঁড় বেরিয়ে আছে। চারিদিকেই এই বেয়াড়া মূর্তির ছড়াছড়ি কেন? এ কি কোনও পবিত্র চিহ্ন, না, আর কিছু? কিছুই বুঝতে না পেরে শেষটা বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিলুম।

এবং এই শহরের হেঁয়ালিটাই বা বুঝব কেমন করে? আমি একলা। এত বড়ো একটা ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করবার মতন যন্ত্রপাতিও সঙ্গে করে আনিনি এবং বেশিদিন এখানে থাকতেও পারব না—খাবার ও জল ফুরুলেই আমাকে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় আমার উট দুটোকে নিয়ে গিয়ে সেদিনের মতন তাঁবু খাটিয়ে ফেললুম।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে। সেই বিজনতার রাজ্যে মানুষের হাসির স্বর বা পাখির ডাক—কিংবা কোনও কীট-পতঙ্গেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকার ও স্তব্ধতা যেন নীরব নির্ঝরের মতো চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ঝরে পড়তে লাগল! তারই মাঝখানে মিট মিট করে জ্বলছে কেবল আমার লণ্ঠনের আলো—যেন কোনও ভীরু, কম্পমান ও অসহায় জীবের মতো!

কাল সকালে উঠে কী করব তাই ভাবছি, হঠাৎ একটা অস্ফুট অস্পষ্ট শব্দ শুনে চমকে উঠলুম! কারণ জানবার জন্যে ফিরে তাকিয়েই আমি যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। বলেছি, আমি তাঁবু গেড়েছি, একটা খোলা জায়গার মাঝখানে, সমতল বালুকা-প্রান্তরের উপরে। লণ্ঠনের আলোতে স্পষ্ট দেখলুম, বালুকার উপরে হঠাৎ একটা গর্ত জেগে উঠল! যদিও অসম্ভব, তবু আমার মনে হল, শূন্যলোক থেকে যেন একটা আশ্চর্য গর্ত বালির উপরে খসে পড়ল!

এখানে কোনওদিকে কোথাও জীবনের চিহ্নও দেখা যায় না—একটা ছায়া পর্যন্ত নয়! তবু

আমার চোখের সামনে কোন অদৃশ্য হস্ত এই গর্তটা খুঁড়লে? খালি তাই নয়, কেমন একটা খড়-মড় শব্দও আমার কানে এল! তারপরেই আমার আরও-কাছে আবার তেমনি আর-একটা গর্ত জেগে উঠল! বালুকা-সমুদ্র যেন বুদ্বুদ কাটছে! ভয়ে বুকটা ছম ছম করতে লাগল।

আমার উনুনে আগুন জ্বলছিল। তার ভিতর থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে আমি দ্বিতীয় গর্তটার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করলুম। আবার কীরকম একটা শব্দ শুনলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলুম যে শব্দটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে! শরীরী বা অশরিরী যে-কেউ এই দুটো গর্ত খুঁড়ে থাকুক, এখন আর সে আমার কাছে নেই এই ভেবে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

কিন্তু এই অদ্ভুত রহস্য আমাকে আর শান্তিতে থকতে দিলে না। ঘুমিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না, চতুর্দিক থেকে এই মৃত শহরের যত প্রাচীন, জীর্ণ দুঃস্বপ্ন এসে আমাকে বারংবার আক্রমণ করতে লাগল,—বহু যুগ আগে এখানে যেসব মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদেরই আকারহীন আত্মা যেন ভীষণ সব আকারহীন আকার ধারণ করে আমার সুমুখে দেখা দিয়েই আবার হাওয়ার মতো মিলিয়ে যেতে লাগল! দৃষ্টিহীন ক্রুদ্ধ চক্ষু, পদহীন চলন্ত দেহ, মুণ্ডহীন জীবন্তমূর্তি! .....প্রায় সারা রাতটাই অনিদ্রায় কেটে গেল।

পূর্ব আকাশে ঊষার তুলি যখন সিঁদুর-ছবি আঁকতে শুরু করলে, আমার মনের ভয়ের ভাবটা তখন আর রইল না। তারপর সূর্যের জ্বলন্ত মুখ দেখে কালকের সব দুশ্চিন্তাই আমি একেবারে ভুলে গেলুম। আঁধার রাতের শেষে সূর্যের সোনার আলো নিয়ে আসে নতুন আশার ডালা, এইজন্যেই বোধহয় পৃথিবীর সব দেশেরই আদিম অধিবাসীরা সূর্যের উপাসনা করত।

আমার দেহে আবার নতুন সাহস ও শক্তি ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল প্রাচীন কার্থেজের সেই মৃত ব্যবসায়ীর কথা। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিরাট ও বিস্ময়কর মন্দিরের চিহ্ন হয়তো এখনও বিদ্যমান আছে। সে মন্দিরে ছিল কোনও এক বিরাট দানব-দেবতার পূজার বেদি, যার সামনে হত নরবলি। কিন্তু কোথায় সে মন্দির বা তার ধ্বংসাবশেষ?

কাছেই একটা ছোট্ট পাহাড় ছিল। তারই চূড়ায় উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কার্থেজের ব্যবসায়ী বলেছেন, সে-মন্দির নাকি আকারে বিরাট। এতদিনে অত বড়ো একটা মন্দির যদি ভেঙে পড়েই থাকে, তাহলে তার ধ্বংসস্তূপ তো কম প্রকাণ্ড হবে না! কিন্তু চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তেমন কোনও ধ্বংসস্তূপ আমার নজরে পড়ল না।

তবে আর একটা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আমার চোখে পড়ল বটে। অনেক দূরে পূর্বদিকে প্রদীপ্ত সূর্যের সমুজ্জ্বল আলোকপটের উপরে সুদীর্ঘ ও প্রকাণ্ড দুটি প্রস্তরমূর্তি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড়ো ও উঁচু পাথরের মূর্তি বড়ো-একটা দেখা যায় না। পিছন দিক থেকে প্রভাতের সূর্য তাদের আরও মহিমাময় ও গম্ভীরভাবপূর্ণ করে তুলেছে। এই নূতন আবিষ্কার আমার মনে উত্তেজনার স্রোত বইয়ে দিলে। তখনই তাঁবু তুলে সেই দিকে অগ্রসর হলুম। ধ্বংসাবশেষ পার হয়ে সেই মূর্তি দুটোর কাছে গিয়ে পৌঁছোতে আমার অনেকটা

সময় গেল। ধ্বংসাবশেষের দিকে আড়ষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে মস্ত-বড়ো দুই বেদির উপর এই মূর্তি দুটো বসেছিল। মূর্তি দুটোর গলা থেকে পা পর্যন্ত মানুষের মতন দেখতে এবং তাদের সমস্ত দেহ মাছের আঁশের মতন এক-রকম বর্ম দিয়ে ঢাকা। কিন্তু তাদের মুখ! তাদের মুখ একেবারে অমানুষিক— মানুষের মুখের সঙ্গে একটুও মেলে না! জীবন্ত দেহ দেখেই কি এই মূর্তি দুটো গড়া হয়েছিল? তা যদি হয়ে থাকে, তবে এমন অদ্ভুত জীবন্ত দেহ আধুনিক পৃথিবীর কোনও মানুষই কখনও দেখেনি।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, মূর্তি দুটোর দু-পাশে সুদীর্ঘ দুই সারি ভগ্নস্তূপ অনেক দূরে চলে গিয়েছে; এই ভগ্নস্তূপ নিশ্চয়ই কোনও উচ্চ প্রাচীরের। কিন্তু মূর্তি দুটোর পরস্পরের মাঝখানে ও-রকম কোনও ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল না। খুব সম্ভব এই মূর্তি দুটোর মাঝখানে এক সময়ে কোনও তোরণ বা দ্বারপথ ছিল। কিন্তু একটা বিষয় ভেবে বিস্মিত হলুম। সারা শহর ভেঙে পড়েছে, এমন কঠিন পাথরের প্রাচীরও ভেঙে পড়েছে, কিন্তু এই ভয়াবহ ও অপার্থিব মূর্তি দুটো আজও সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে বর্তমান আছে কেন? মনে ভিতর থেকে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পাবার আগেই আর একটা ব্যাপার লক্ষ করলুম। মূর্তি দুটোর পিছন থেকে ছোটো ছোটো পাথরের মূর্তির দুটো সারি প্রায় এক মাইল দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সেই মূর্তি-বীথিকার মধ্যে প্রবেশ করবার সময়ে দেখলুম, বড়ো মূর্তি দুটোর বেদির পাশেও সেই রকম বিরাট অক্টোপাস বা মাকড়সার চেহারা খোদা রয়েছে। পথের দু-পাশে সারি সারি এই যে ছোটো ছোটো মূর্তি রয়েছে, এগুলোও যে কোন জীবজন্তুর মূর্তি তা বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। এমন সব জন্তু পৃথিবীতে কোনও দিন ছিল বা আছে বলে আমি জানি না। ভয়াল তাদের চেহারা এবং প্রত্যেকেরই মুখে হিংসা ও অমঙ্গলের ভাব ফুটে উঠেছে। তাদের দেখলেই বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে।

দুই সারির সর্বশেষ মূর্তি দুটোর কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন সামনের দিকে তাকিয়ে মরুভূমির ধু ধু বালুকারাশির পাণ্ডুর প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। মনে কেমন ধাঁধা লাগল। এই সুদীর্ঘ মূর্তি-বীথির সার্থকতা কী? মরুভূমির শূন্যতার ভিতরে এসে অকারণেই এই মূর্তির সারি শেষ হয়েছে কেন?

কিন্তু ঠিক আমার সুমুখেই মরুভূমির যে-অংশটুকু রয়েছে, তার মধ্যে একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব লক্ষ করলুম। প্রায় বিঘাকয়েক জমি বিলাতি মাটিতে বাঁধানো উঠানের মতন একেবারে মসৃণ ও সমতল। অথচ এই অংশটুকুর বাইরে মরুভূমির সমস্তটাই এবড়োখেবড়ো বালির রাশিতে ভরা এবং সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে উঁচু-নিচু বালিয়াড়ির স্তূপ। সেখানে সর্বদাই প্রবল বাতাসে হু হু করে বালি উড়ছে, অথচ এই সমতল অংশটার মধ্যে বাতাসের কোনও প্রভাবই নেই!

বিস্মিত ভাবে সেই সমতল অংশটার দিকে অগ্রসর হলুম। কিন্তু কয়েক পা এগুতে না এগুতেই কোনও অদৃশ্য হস্ত আমার মুখে ও বুকে আচমকা এত জোরে আঘাত করলে যে, যাতনায় ককিয়ে উঠে তখনই আমি ভূমিতলে ছিটকে পড়ে গেলুম! খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের

মতন বালির উপরে শুয়ে রইলুম। তারপর আমার সমস্ত কৌতূহল পরিপূর্ণ মাত্রায় জেগে উঠল। এ কী ব্যাপার? কেউ কোথাও নেই, তবু কে আমাকে এমন ভাবে ধাক্কা মারলে? উঠে বসে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে, ডান হাতে রিভলভার তুলে অতি সাবধানে আবার আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলুম।

যখন সেই সমতল অংশের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন আমার হাতের রিভলভারটা হঠাৎ কীসের উপরে পড়ে ঠক করে বেজে উঠল! রিভলভারটা ঠিক যেন কোনও পাঁচিলের উপরে গিয়ে পড়েছে, অথচ সেখানে পাঁচিল-টাচিল কিছুই নেই! বাঁ-হাত বাড়িয়েও আবার সেই নিরেট ও অদৃশ্য বাধাটাকে অনুভব করলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে সচমকে তিরের মতো দাঁড়িয়ে উঠলুম!

দুই হাত দুই দিকে বিস্তৃত ও সমস্ত দেহ দিয়ে অনুভব করে বেশ বুঝলুম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য অদৃশ্য দেওয়াল! .....খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। অতীতে এই মৃত শহরে হয়তো এমন কোনও বৈজ্ঞানিক জন্মেছিলেন, যিনি নিরেট পদার্থকে অদৃশ্য করে তোলবার কোনও অজানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন! অবশ্য, এটা একেবারে অসম্ভবও বলা যায় না। কারণ আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও এক্স-রে-র সাহায্যে দৃশ্যমান পদার্থকে অনেকটা অদৃশ্য করতে পারেন। অতীতের বৈজ্ঞানিকরা এই পদ্ধতিতে হয়তো আরও বেশি দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, কিন্তু কেমন করে তারা এটা করলে? শহরের বড়ো বড়ো পাথরের বাড়িগুলো কাল-প্রভাবে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে মিশিয়ে গেছে, অথচ এই অদৃশ্য দেওয়াল এখনও ঠিক আগেকার মতোই অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ঢিলের পর ঢিল ছুড়তে লাগলুম। কিন্তু যত জোরে যত উঁচুতেই ছুড়ি সব ঢিলই কীসে ঠেকে আবার ঠিকরে ফিরে আসে! বোঝা গেল পাঁচিলটা অনেক উপরে—আমার ঢিলের সীমানার বাইরে উঠে গিয়েছে। পাঁচিলের ওপাশে যাবার জন্যে প্রাণটা আনচান করতে লাগল। কিন্তু কেমন করে যাব? ওধারে যাবার নিশ্চয়ই কোনও পথ আছে, কিন্তু সে কোথায়? তখন মনে পড়ল, সেই দুই প্রকাণ্ড ও বীভৎস প্রস্তর-মূর্তি এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত দীর্ঘ মূর্তি-বীথির কথা। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি মূর্তি-বীথির পাশের দিকে, কিন্তু যেখানে সেই মূর্তি-বীথি শেষ হয়েছে ঠিক সেইখান দিয়ে এগুবার চেষ্টা করলে হয়তো আমার চেষ্টা বিফল হবে না।

সমস্ত ব্যাপারটা একবার তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলুম। মরুভূমির সেই মণ্ডলাকার সমতল অংশ ও সেই বিপুল ও অদৃশ্য প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ল, বিলুপ্ত কার্থেজের অজ্ঞাত ব্যবসায়ীর সাবধান-বাণী—'বণিকগণ, তোমরা কেউ মামূর্ত শহরে যেয়ো না!' হয়তো এইটেই হচ্ছে ব্যবসায়ীর কথিত সেই বিরাট বিস্ময়কর মন্দির! হয়তো এই মন্দিরের ভিতরেই কোনও দানব-দেবতার সামনে অতীতের কোনও এক ভুলে যাওয়া দিনে ব্যবসায়ীর চারজন অভাগা সঙ্গীকে বলি দেওয়া হয়েছিল! মৃত শহরের ওপার থেকে

কোনও এক দৈববাণী যেন মৌন ভাষায় আমাকে ডাকতে লাগল—'ফিরে এসো, ফিরে এসো, ওই ভীষণ নরক থেকে এখুনি পালিয়ে এসো!'

কিন্তু আমি ফিরে এলুম না, ফিরে আসতে পারলুম না! কোনও কঠিন নিয়তি যেন আমাকে টেনে সেই মূর্তি-বীথির শেষ-প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ফেললে। এবং সেইখানেই আমি সেই অদৃশ্য প্রাচীরের অদৃশ্য দ্বারপথের সন্ধান পেলুম।

সেই দ্বারপথ কতটা উঁচু বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু চওড়ায় সেটা প্রায় বিশ ফুটের কম হবে না। এক দিকের অদৃশ্য দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়ে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম।

খানিক পরেই গিয়ে পৌঁছোলুম একটা মস্তবড়ো অদৃশ্য উঠানের উপরে। সে এক পরম বিস্ময়! আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেওয়াল, স্তম্ভের শ্রেণি ও ঘর-দ্বার রয়েছে—কিন্তু সমস্তই অদৃশ্য! সেই কাচের চেয়ে স্বচ্ছ, অদৃশ্য বাড়ির দেওয়ালের পর দেওয়াল ভেদ করে আমার দৃষ্টি বাইরের অপার মরুভূমির ভিতরে গিয়ে পড়েছে এবং বাহির থেকে সূর্যের সুবর্ণ-কিরণ এই বিপুল প্রাসাদের ভিতরে এসে সর্বত্র বিচরণ করছে। খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে আরও খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারলুম, আমি এক বিস্তৃত সোপান-শ্রেণির সামনে এসে পড়েছি! আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে লাগলুম। যতই উপরে উঠি মনটা ততই অদ্ভুত ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়—কারণ আমি যেন শূন্যে পদক্ষেপ করে বাতাসের ভিতরে দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছি! ধাপের পর ধাপ যেন আর শেষ হতে চায় না, কেবলই মনে হয় উপর থেকে কখন হঠাৎ আমি হুড়মুড় করে পৃথিবীর উপরে গিয়ে পড়ব! শেষটা সিঁড়ি যখন শেষ হল, আমি তখন মাটি থেকে প্রায় একশো ফুট উপরে একটা বারান্দার মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

সেখানে গিয়ে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে ভরসা হল না, হামাগুড়ি দিয়ে প্রত্যেক ইঞ্চি পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চললুম এবং একটু পরেই আবার একটা পাঁচিল ও তার গায়ে একটা দরজা আবিষ্কার করলুম। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। কিন্তু তার ভিতরে ঢুকতে গিয়েই কেমন একটা অজানা আতঙ্ক এসে আমার মনের উপরে ধাক্কা মারলে। যেন এখানে দুষ্ট ও হিংস্র আত্মা বাস করে অনন্ত কাল ধরে! আমি কিছুই দেখলুম না, কিছুই শুনলুম না, তবু মনে হল যেন কোনও প্রাচীন অভিশাপ যুগ-যুগান্তর ধরে এখানে বাস করে আসছে! যেন কত নির্যাতিত দেহের যন্ত্রণা এখানে ক্রন্দন করছে নিশিদিন, নীরবে! ঘরের ভিতরে সাহস করে ঢুকতে পারলুম না, মনটাকে হাল্কা করবার জন্যে আবার সেই অদৃশ্য বারান্দার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে গিয়ে পড়েছে, তাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন একটা অগ্নিতপ্ত লোহার রক্ত গোলকের মতো। সেই সুবৃহৎ ও সুদীর্ঘ প্রস্তর মূর্তি দুটো মরু-বালুর উপরে লম্বা দুটো ছায়া ফেলে স্থির ভাবে বসে বসে যেন মহাকালকে ব্যঙ্গ করছে! সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের পটে অতীতের এক স্মৃতির ছবি আঁকতে লাগলুম।

এই মেঘচুম্বী, অদৃশ্য ও বিরাট দেবালয়ের সামনে ওই বিপুল ধ্বংসাবশেষ যেন আবার তাদের গত জীবনকে ফিরিয়ে পেলে! চারিদিকে প্রাসাদের পর প্রাসাদের ভিড়, প্রশস্ত রাজপথের পর রাজপথ জনাকীর্ণ হয়ে কত দূরে চলে গিয়েছে,—তুরী, ভেরী ও দামামার তালে তালে পূজারির দল দুই প্রস্তর-মূর্তির তোরণের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে কয়েকজন হতভাগ্য বন্দিকে সঙ্গে করে,—তাদের দানব-দেবতার অতৃপ্ত উদর পূরণের জন্যে!

আচম্বিতে অনেক নীচে বালুকারাশির দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বালির ভিতরে ঠিক তেমনি—যেন শূন্য থেকে খসে পড়া একটা গর্ত! তারপরে আমার সচকিত দৃষ্টির সামনে বালির উপরে ক্রমাগত গর্তের পর গর্ত জেগে উঠতে লাগল! গর্তের রেখা মন্দির পর্যন্ত এসে পড়ল, তারপর আর কিছু দেখা গেল না।

ধাঁ করে আমার মনে পড়ে গেল, ধ্বংসাবশেষের পাথরে পাথরে খোদা সেই খানিক-অক্টোপাস ও খানিক মাকড়সার মতন জীবের মূর্তির কথা! সেই মূর্তির সঙ্গে এই অদৃশ্য বিপদের কোনও সম্পর্ক আছে কি? এই অদৃশ্য বিপদের আকারও কি তেমনি বীভৎস? কার্থেজের ব্যবসায়ী বলেছে—'মন্দিরের দুষ্ট দেবতা, সৃষ্টি-প্রভাত থেকে যে সেখানে বিরাজ করছে, সাবধান—তাকে সাবধান!' সৃষ্টির আদিম প্রভাতে পৃথিবীতে অনেক অতিকায় দানব বাস করত, পণ্ডিতেরা মাটির ভিতর থেকে আজও যাদের কঙ্কাল আবিষ্কার করছেন। ওই মৃত শহরের বিলুপ্ত বাসিন্দারা কি সেই রকম কোনও দানবকেই তাদের দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল? এবং বিজ্ঞানের কৌশলে এই মন্দিরের মতন তাদের দানব-দেবতাকেও কি অদৃশ্য, অমর ও অজর করে রেখেছে? বালির উপরে ওই গর্তগুলো কি সেই অদৃশ্য দানবেরই বিপুল পদচিহ্ন? আর এরই ভয়ে কি আরবরা আমার সঙ্গী হতে রাজি হয়নি?

মনের ভিতরে যখন ঝড়ের মতো এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে লাগল, তখন হঠাৎ আমার স্মরণ হল, সেই অদৃশ্য দানব মন্দিরের দিকে এসেছে এবং এতক্ষণে হয়তো এই অদৃশ্য মন্দিরেই প্রবেশ করেছে! এই সন্দেহ মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের সমস্ত আড়ষ্টতা ঘুচে গেল, আমি যথাসম্ভব দ্রুতপদে সিঁড়ির উপর দিয়ে নীচে নেমে গেলুম। আমি জানি, যে-পথ দিয়ে আমি এখানে ঢুকেছি সেই পথ দিয়েই সে আমাকে ধরতে আসছে! কিন্তু কোথায় আমি লুকাব? কাচের চেয়েও স্বচ্ছ, অদৃশ্য এই মন্দির, এর মধ্যে লুকোবার ঠাঁই খুঁজে পাব কেমন করে?'

এমন সময়ে একটা শব্দ কানে এল—থপ, থপ, থপ, থপ! মৃত্যুর অদৃশ্য দূত যে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই! জানি না এ কোন জাতীয় দানবজীব এবং এর মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে কত কম বা কত বেশি! জানি না সে আমাকে দেখতে পেয়েছে কি না! সিঁড়ির পাশে এক কোণে হুমড়ি খেয়ে জড়সড় হয়ে চুপ করে আমি বসে রইলুম এবং সেই অবস্থায় থেকে শুনতে পেলুম থপ থপ থপ থপ করে সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে কে উপরে উঠে যাচ্ছে!

সেই ভয়ংকর পায়ের শব্দ যখন থেমে গেল, তখন আন্দাজ করে নিলুম, যে-ঘরে ঢুকতে আমি ভয় পেয়েছিলুম জীবটা সেই ঘরের ভিতরেই গিয়ে ঢুকেছে! আমিও আর দেরি করলুম না, উঠানের উপর দিয়ে দ্রুতপদে ছুটতে লাগলুম। কিন্তু হঠাৎ ভুল দিকে গিয়ে একটা অদৃশ্য দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার আগেকার মতোই ছিটকে মাটির উপরে পড়ে গেলুম। এবারে গুরুতর আঘাত লেগেছিল, কিন্তু তবু প্রাণপণে আমার যন্ত্রণার চিৎকারকে দমন করলুম!

উপর থেকে আবার শব্দ এল—থপ, থপ, থপ, থপ! বিভীষণ দানব-দেবতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে!

পাগলের মতন উঠে আবার এক দিকে ছুটে গেলুম অন্ধের মতো এবং আবার এক দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লুম!

আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলুম। পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। আরও খানিকক্ষণ সেই অবস্থায় অপেক্ষা করলুম এবং তখনও কোনওরকম শব্দ না পেয়ে আশান্বিত হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম ও দুই পা অগ্রসর হতেই একেবারে সেই দানবের কবলে গিয়ে পড়লুম আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই! সেই অদৃশ্য দানবটা কখন নিঃশব্দপদসঞ্চারে একেবারে আমার কাছে এসেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল,—রোমশ, ঠান্ডা ও পিচ্ছল শুঁড়ের মতন কী একটা জিনিসের উপরে আমার হাত গিয়ে পড়ল—তারপরেই সেটা আমার হাতের কাছ থেকে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই রকম আরও তিন-চারটে শুঁড়ের মতন জিনিস আমাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে! কিন্তু ঘৃণায় ও আতঙ্কে শিউরে উঠে তাদের কবল থেকে সজোরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আমি আবার ছুটতে ছুটতে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলুম। উপরে উঠে আমি স্থির করলুম, বারান্দা থেকে একশো ফুট নীচে যদি লাফিয়ে পড়ি, তাহলেও এই ঘৃণ্য দানবের কবলে পড়ে মরার চেয়ে সে-মৃত্যু হবে ঢের বেশি সুখের মরণ!

সিঁড়ির উপরে আবার পায়ের শব্দ হতে লাগল—থপ, থপ, থপ, থপ! দানব উপরে আসছে!

সিঁড়ির ঠিক মুখেই দু-হাতে বারান্দার প্রাচীর চেপে ধরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম—আচম্বিতে সেই প্রাচীরটা দুলে আমার দিকে হেলে পড়ল! নিশ্চয় এর ভিত আলগা হয়ে গিয়েছে—আমি তাড়াতাড়ি প্রবল একটা ধাক্কা মেরে সেটাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিলুম। প্রাচীরটা হুড়মুড় করে সিঁড়ির উপর ভেঙে পড়ল! এক মুহূর্ত সমস্ত স্তব্ধ। তারপরেই শুনলুম, যেন লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝি পোকা, কোলা ব্যাং ও গোখরো সাপ এক সঙ্গে গর্জন শুরু করে দিলে! সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম একটা হলদে রঙের তরল পদার্থ সিঁড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে! প্রাচীরের ভাঙা অংশটা তাহলে ওই দানবেরই ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়েছে এবং ওই হলদে তরল পদার্থটা খুব-সম্ভব তারই দেহের রক্ত! তার দেহ অদৃশ্য, কিন্তু রক্ত দৃশ্যমান!

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে সেই রক্ত দেখে আন্দাজে লক্ষ্য স্থির করে আমি উপর-উপরি কয়েকবার গুলি-বৃষ্টি করলুম। দানবটার চিৎকারে কান যেন ফেটে যাবার মতো হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ দেখতে পেলুম রক্তের ধারার উপরে তার অদৃশ্য দেহের ছটফটানি!

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম, কিন্তু সেই অদৃশ্য জীবটার চিৎকার ও ছটফটানি তখনও একটুও কমল না—পাথরের স্তূপের তলায় সে বন্দি হয়েছে ও রিভলভারের গুলিতে আহত হয়েছে বটে, তবু তার মৃত্যু হল না!

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার এমন ঘনিয়ে উঠল যে আর এখানে অপেক্ষা করাও চলে না। এই সৃষ্টিছাড়া, অভিশপ্ত অদৃশ্য মন্দিরের ভিতরে অন্ধকারে রাত্রিবাসের কথা মনে করতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। কে জানে এখানে এ-রকম আরও কত বিভীষিকাই হয়তো আছে! কে বলতে পারে ওই-রকম দানব-দেবতাও এখানে আরও অনেক নেই?

রাত্রের অন্ধকারের কথা ভেবে মন আমার মরিয়া হয়ে উঠল। যেমন করেই হোক ওই সিঁড়ি দিয়েই এখনই আমাকে নেমে যেতে হবে!

আগেই বলেছি, এই অদৃশ্য সোপান-শ্রেণি খুব বিস্তৃত— এক সঙ্গে অনেক লোক এর উপর দিয়ে পাশাপাশি ওঠা-নামা করতে পারে। সিঁড়ির যেখান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল আমি তার বিপরীত দিকে গিয়ে দ্রুতপদে নীচের দিকে নামতে লাগলুম। সেই বন্দি ও আহত দানব মহা আক্রোশে আরও-জোরে গর্জন করে উঠল, কিন্তু আমাকে সে ধরতে পারলে না!

প্রায় অন্ধকারে পথ খুঁজে বার করে কোনওরকমে তাঁবুর কাছে এসে হাজির হলুম। তারপর আলো জ্বেলে যে-দৃশ্য দেখলুম তাতে আমার প্রাণটা স্তম্ভিত হয়ে গেল!

তাঁবুর ঠিক পাশেই বালুর উপরে আমার উট-দুটোর মৃত দেহ চর্মমাত্রসার হয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের দেহে হাড় ও চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। চামড়ার উপরে কতকগুলো ক্ষতচিহ্ন দেখে বুঝলুম, অনেকগুলো শুঁড় দিয়ে কোনও ভয়ানক জীব যেন চামড়ার তলা থেকে তাদের সমস্ত রক্ত-মাংস শুষে খেয়ে ফেলেছে! কী নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি, সেকথা মনে করে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তারপর কী অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে যে এই সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছি, তা কেবল আমিই জানি আর জানেন আমার ভগবান! আমার খাবার ফুরিয়ে গেল, জল ফুরিয়ে গেল, দেহের শক্তিও ফুরিয়ে গেল—তবু আমি সেই মৃত্যুপুরী থেকে দূরে—আরও দূরে পালিয়ে এসেছি, কখনও মাতালের মতন টলতে টলতে, কখনও অসহায় শিশুর মতন হামাগুড়ি দিতে দিতে!

আমি যা স্বচক্ষে দেখেছি, পৃথিবীর আর কোনও মানুষ কোনও দিন যেন তা দেখতে না চায়!

মানুষের গড়া দৈত্য

॥ প্রথম ॥

সুন্দরবাবুর কথা

তুষার, তুষার, তুষার! ওপরে অনন্ত নীলিমার উচ্ছ্বাস, নীচে অনন্ত শুভ্রতার উৎসব! আকাশছোঁয়া শিখরের পর শিখরের নৈবেদ্য সাজিয়ে বিরাট হিমাচল নিশ্চল-নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে যোগাসনে, কোনও পরম দেবতার উপাসনায়। এই আশ্চর্য তুষার-সমারোহের একমাত্র দর্শক হচ্ছি আমি। আমার সঙ্গীরা এখনও পাহাড়ের অনেক নীচে পড়ে আছে।

আমি বাঙালি। কিন্তু 'ঘরমুখো বাঙালি' বলে প্রবাদে যাদের কুখ্যাতি আছে, আমি তাদের দলের লোক নই। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মতন আমি বাঙালি হয়েও ঘরছাড়া পথের পথিক।

ছেলেবেলা থেকেই আমার আদর্শ হচ্ছেন ডা. লিভিংস্টোন, ন্যানসেন, রবার্ট পিয়ারি ও কাপ্তেন স্কট প্রভৃতি দুঃসাহসী মহাজনরা—নতুন-নতুন বিপদসঙ্কুল অজানা দেশে নতুন-নতুন অভিযানে বেরিয়ে যাঁরা অকাতরে প্রাণদান করেছেন বা বিপদজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন। সুখশয্যাশায়ী বিলাসীকে আমি ঘৃণা করি, আমার শ্রদ্ধা জাগে কণ্টকশয্যাশায়ী হঠযোগীকে দেখলে।

পিতামাতার পরলোক গমনের পর প্রথম যখন স্বাধীন হলুম তখনই স্থির করলুম, এতদিন ধরে যে দিবাস্বপ্নের সাধনা করে আসছি সর্বাগ্রে তাকেই সফল করে তুলব।

পৈত্রিক সম্পত্তির অভাব ছিল না। মস্ত জমিদারের ছেলে আমি, আমাদের বংশে কেউ গতরে খেটে পেটের ভাত জুটিয়েছেন বলে শুনিনি। আমার কাছে টাকা হচ্ছে সবচেয়ে সুলভ জিনিস।

পৃথিবীর সব ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার দরকার। প্রথমভাগ বর্ণ পরিচয়ের পরই আরম্ভ হতে পারে দ্বিতীয় ভাগের পাঠ। 'শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্'। অতএব স্থির করলুম, সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে কোনও দূর দুর্গম দেশে যাত্রা করবার আগে ভারতবর্ষেরই কোনো বন্ধুর প্রদেশের যাত্রী হয়ে নিজের শরীর ও মনকে তৈরি করে তুলতে হবে।

ভাবতে ভাবতে প্রথমেই মনে পড়ল হিমালয়কে। হিমালয় হচ্ছে বাংলার প্রতিবেশী এবং বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট মুকুট। কিন্তু আমরা তাকে হাতের কাছে পেলেও সে সহজলভ্য নয়। যে-দেশের লোক আকাশ ও পাতাল এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে জয় করেছে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর আজও আছে তাদের নাগালের বাইরে।

প্রথমেই হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে চাই না। আপাতত মানস সরোবর পার হয়ে তিব্বতের দিকে এগিয়ে নিজের সামর্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

যাত্রার তোড়জোড় আরম্ভ করলুম।

অল্পবয়সে পিতার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছি, কাজেই 'বন্ধু' নামে খ্যাত অনেকগুলি লোক আমার চারপাশে এসে জড়ো হয়েছিল। হাতের শিকার ফসকে যায় দেখে তারা সচমকে বললে, 'সর্বনাশ! তুমি পাগল হয়েছ নাকি?'

শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়েরা নানাবিধ উপদেশ দিয়ে বললেন, 'ডানপিটের মরণ গাছের আগায়। অমন কাজও কোরো না।'

এখনও বিবাহ করিনি। কাজেই অন্তঃপুরের অশ্রুনদীতে আর সাঁতার কাটতে হল না।

কারুর মানা না মেনে বেরিয়ে পড়লুম।

মানস সরোবর পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছি।

এ চলার আনন্দ যে কত গভীর, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কোনও কবিও আজ পর্যন্ত এ আনন্দ ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারেননি। এ আনন্দ প্রকাশ করবার নয়, উপলব্ধির জিনিস। এ আনন্দের মর্যাদা বুঝেছিলেন বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষরা, সংকীর্ণ ঘর তাই তাঁদের বন্দি করে রাখতে পারেনি।

আমি বুদ্ধদেবও নই, চৈতন্যও নই। কিন্তু এ আনন্দ আমাকেও মাতিয়ে তুললে।

॥ দ্বিতীয় ॥

আশ্চর্য দৃশ্য

বরফের পর বরফের পাহাড়!

কিন্তু এদের পাহাড় না বলে বলা উচিত প্রকৃতির তুষারে গড়া দুর্গ-নগরী! কোথাও যেন সুদূর বিস্তৃত প্রাকার, কোথাও যেন সুগভীর পরিখা, কোথাও যেন মেঘচুম্বী গম্বুজওয়ালা প্রাসাদ, কোথাও যেন মন্দির-চূড়া বা প্রশস্ত অঙ্গন! সমস্তই করছে সাদা ধবধব। যেখানে ছায়া পড়েছে সেখানেও কালিমা নেই। যেখানে সূর্যের আলো পড়েছে সেখানে চোখ অন্ধ করে জ্বলছে যেন পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ!

দৃষ্টিসীমা ও আকাশপ্রান্ত জুড়ে বিপুল এই দুর্গ-নগরী, কিন্তু সে যেন মৃতের শহর, তার কোথাও জীবনের কোনও লক্ষণই চোখে পড়ে না। আমি যেন এক পৌরাণিক ও পরিত্যক্ত দানব-রাজধানীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—একদা এর সিংহদ্বার খুলেই যেন অসুর-সৈন্যদল হিমালয় কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসত দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গপুরীর দিকে যাত্রা করবার জন্যে।

চিন্তার কোনও মূর্তি আছে কি না জানি না, কিন্তু দানবের কথা মনে হতেই চোখের সুমুখে জাগল এক আশ্চর্য ও কল্পনাতীত দৃশ্য!

আকাশ-প্রান্তে আঁকা সেই বিরাট দুর্গ-নগরীর তলায় রয়েছে প্রকাণ্ড এক তুষার প্রান্তর। তার ধু ধু শূন্যতার মধ্যে শুভ্রতা ছাড়া আর কোনও রঙেরই খেলা নেই।

আচম্বিতে সেই শুভ্রতার এক কোণে ফুটে উঠল যেন একটা কালির বিন্দু! সে বিন্দু হয়তো আমার চোখেই পড়ত না। কিন্তু বিন্দুটা ছিল চলন্ত!

নিশ্চলতার রাজ্যে এই সচল জীবনের লক্ষণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবিস্ময়ে দূরবিনটা তুলে নিয়ে যা দেখলুম, তাতে আরও বেড়ে উঠল আমার বিস্ময়।

একজন মানুষ বরফের ওপর দিয়ে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু না—না, সেটা কি মানুষের মূর্তি? তার আশেপাশে গাছগাছড়া থাকলে তুলনায় মূর্তিটার উচ্চতা সম্বন্ধে কতকটা ঠিক ধারণা করতে পারতুম, কিন্তু সেই অসমোচ্চ তুষার-মরুক্ষেত্রের কোথাও সামান্য ঝোপঝাড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

তবে এইটুকু আন্দাজ করতে পারলুম, মূর্তিটা মোটেই সাধারণ মানুষের মতন নয়—এমনকি মাথায় সে যে-কোনও অসাধারণ দীর্ঘ মানুষেরও চেয়ে ঢের উঁচু! একালে অতিকায় দৈত্যদানবের অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব, কিন্তু আকারে সে হয়তো উপকথায় কথিত দৈত্য, দানব বা রাক্ষসের মতোই ভয়াবহ!

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, মূর্তিটা হঠাৎ একটা বৃহৎ তুষার-স্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কী দেখলুম? চোখের ভ্রম, অপচ্ছায়া? না সত্যিকার কোনও মনুষ্যমূর্তি? কিন্তু এই চিরতুষারের মৃত্যু-রাজ্যে কোনও মানুষ যে একাকী ভ্রমণ করতে পারে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর বলে মনে হল না।

এমন সময়ে নীচে থেকে আমার সঙ্গী মালবাহী লোকজনদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। তারা চিৎকার করে আমাকে ডাকছে।

তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দেখি, তাদের সকলেরই মুখ ভয়ে কেমনধারা হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করাতে তারা উত্তেজিতভাবে বরফের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

তুষার-কর্দমের ওপরে রয়েছে অদ্ভুত কতকগুলো পায়ের ছাঁচ!

সেগুলো দেখতে অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মতন, কিন্তু প্রত্যেকটাই সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো! ...যার পায়ের ছাপই এমন বড়ো, তার মাথায় উচ্চতা যে কতখানি, সেটা ভাবতেও মন শিউরে ওঠে!

তবে কি এই পায়ের দাগ তারই, একটু আগে তুষার-প্রান্তরে যাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি?

পাছে আমার লোকজনরা ভয় পায়, তাই মুখে কিছু ভাঙলুম না, কেবল বললুম, 'এটা

কোনও পাহাড়ে-জন্তুর পদচিহ্ন, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সূর্য পশ্চিম দিকে নামছে, আজ এইখানেই তাঁবু ফেলবার ব্যবস্থা করো।'

তারা আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না, তবে আর কোনও গোলমাল করলে না।...

পরের দিন সকালে তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। কী ভীষণ কনকনে শীতের হাওয়া বইছে, জামার ওপর জামা পরেছি, হাতে পুরু চামড়ার দস্তানা, পশুচর্মের র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ ঢাকা, দুই চক্ষে ঠুলি-চশমা—শীতে তবু ঠকঠক করে কাঁপছি। যারা দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েই শীতে কেঁপে মরে তারাও এখানকার শীতলতার মর্ম বুঝতে পরবে না। এখানকার তুলনায় দার্জিলিঙ হচ্ছে প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা।

দূরে হঠাৎ দেখা গেল, তুষার-প্রান্তরের ওপরে এক মনুষ্যমূর্তি!

কালকের দৃশ্য ভুলিনি। প্রথমটা চমকে উঠলুম। তারপর ভালো করে লক্ষ করে বুঝলুম, না, এ মূর্তিটাকে সাধারণ মানুষেরই মতন দেখতে।

লোকটি এগিয়ে আসছিল মাতালের মতন টলমল করতে করতে। দুই-একবার পড়ে গেল, তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। খানিকদূর এসেই আবার পড়ে গেল।

আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন সে আবার ওঠবার চেষ্টা করছে।

তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

রক্তহীন মুখের স্তিমিত দৃষ্টি আমার দিকে ফিরিয়ে সে বলল, 'মশাইকে মনে হচ্ছে আমারই মতন বাঙালি। আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন জানতে পারি কি?'

প্রায় মৃত্যুকবলগ্রস্ত এই ব্যক্তির মুখে প্রথমেই এমন প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়ে বললুম, 'আমি হচ্ছি পর্যটক। চলেছি তিব্বতের দিকে।'

তার পথশ্রান্ত শীতাক্রান্ত ভেঙে-পড়া দেহ আবার সিধে হয়ে উঠল। আনন্দিত স্বরে সে বললে, 'ভগবানকে ধন্যবাদ! আমিও তাহলে আপনার সঙ্গী হতে চাই!'

তার হিমস্তম্ভিত হাত-পা-মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে বললুম, 'সে শক্তি কি আপনার আছে?'

লোকটি মৃদু হেসে বললে, 'আমার দেহ দুর্বল বটে, কিন্তু আমার মনের শক্তি আছে! দেহ তো মনের দাস।'

বললুম, 'সবসময়ে নয়।'

হঠাৎ উদভ্রান্ত স্বরে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ—সবসময়েই—সবসময়েই! দেহ তো অনেকদিন ধরেই, আমাকে বহন করতে রাজি নয়—কিন্তু আমার মনই তাকে এত দূরে চালনা করে নিয়ে এসেছে! দুর্বল আমার দেহ, কিন্তু প্রবল আমার মন!'

তার উত্তেজনা দেখে প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি বললুম, 'আপনার নাম বলতে আপত্তি আছে?'

তখনই শান্ত হয়ে সে বললে, 'একটুও নয়। আমার নাম অজয়কুমার চৌধুরি।'

'নিবাস?'

'হালিশহরে। কিন্তু এখন আমি ভবঘুরে।'

উঃ, কী চেহারা অজয়বাবুর! মানুষের দেহ যে এমন শীর্ণ, এমন রক্তহীন হতে পারে আগে আমার সে ধারণা ছিল না। কেবল দুটি সতেজ চক্ষু তাঁর মানসিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছিল।

বললুম, 'আমার তাঁবুর ভেতরে আসুন। আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে মনের জোরেও আপনি বাঁচতে পারবেন না।'

যা ভেবেছিলুম তাই! তাঁবুর ভেতরে এসেই অজয়বাবু অচেতন হয়ে পড়লেন। দৈবগতিকে আজ যদি আমি এখানে উপস্থিত না থাকতুম, তাহলে হিমালয়ের তুষার সমাধির মধ্যেই তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত।

এই রহস্যময় লোকটিকে দেখে মনে বড়ো কৌতূহল জাগল। কে ইনি? এই মৃত্যুর দেশে কেন তিনি এসেছেন?

॥ তৃতীয় ॥

আধুনিক আরব্য উপন্যাস

দিনকয় আর তাঁবু তুলতে পারলুম না।

সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যের গুণে তিন দিনের মধ্যেই অজয়বাবু আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ভদ্রলোকের জীবনী শক্তি অদ্ভুত!

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যার সময়ে তাঁবুর ভেতরে আমরা দুইজনে বসে আগুন পোয়াচ্ছিলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'অজয়বাবু, একাকী পথিকের পক্ষে এ হচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথ। এখানে কেন আপনি এসেছেন?'

তাঁর মুখের ওপরে ঘনিয়ে উঠল বিষাদের কালিমা। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'একজন পলাতকের সন্ধানে।'

'কে সে?'

'তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।'

দেখলুম, অজয়বাবু সহজে কোনও কথা ভাঙতে রাজি নন। কথাটা ঘুরিয়ে জানবার জন্যে বললুম, 'যার খোঁজে এতদূর এসেছেন সে-ও কি আপনারই মতো একলা?'

'হ্যাঁ। তার সঙ্গী হতে পারে, দুনিয়ার এমন দুঃসাহসী মানুষ কেউ নেই।'

'সে কি এমন ভয়াবহ?'

'ভয়াবহ বললেও তার সঠিক বর্ণনা করা হয় না। সে ভয়ানকেরও চেয়ে ভয়ানক!'

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের দিনে এখানে আমি দুঃস্বপ্নের এক মূর্তি দেখেছি।'

সচমকে সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অজয়বাবু বললেন, 'দুঃস্বপ্নের মূর্তি?'

'বীভৎস দুঃস্বপ্নের মূর্তি। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে হচ্ছে চোখের ভ্রম, অপচ্ছায়া।'

'না, না, চোখের ভ্রম নয়, আপনি দেখেছেন এক দানবকে! সত্যি করে বলুন, সেই দৈত্যটা কোনদিকে গিয়েছে?'

'দানব? দৈত্য? চোখের ভ্রম নয়? বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে আরব্য উপন্যাসের দৈত্য? অজয়বাবু, আপনি কী বলছেন!'

অজয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে একবার পায়চারি করে এসে উত্তেজনায় কম্পিত স্বরে বললেন, 'বলুন—দয়া করে বলুন, সে কোনদিকে গিয়েছে? জানেন, তারই খোঁজে আজ আমি মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এখানে এসেছি?'

'অজয়বাবু, শান্ত হোন, উত্তেজিত হবেন না—এখনও আপনার শরীর সুস্থ হয়নি।'

অজয়বাবু আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বসে পড়লেন, আর কোনও কথা বললেন না।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে শুনতে লাগলুম, তাঁবুর বাইরে ধু ধু তুষারপ্রান্তরের ওপর দিয়ে হা-হা রবে কাঁদতে কাঁদতে বয়ে যাচ্ছে শীতার্ত বাতাস। তাঁবুর কোন ফাঁক দিয়ে সেই অশান্ত বাতাসের দুই-একটা তুষার-শীতল দীর্ঘশ্বাস ভেতরে ঢুকে আমাদের বুকেও শিহরণ জাগিয়ে আগুনের শিখাদের করে তুলছিল অস্থির।

ধীরে ধীরে বললুম, 'অজয়বাবু, আপনি আমার মনে কৌতূহলকে জাগিয়েছেন। চিরদিনই আমি হচ্ছি রহস্যের সন্ধানী। আমি জানতে চাই প্রকৃতির বিচিত্র সত্যকে। আমি করতে চাই অজানা-জ্ঞানের উপাসনা। আমি চাই গোপনীয়তাকে প্রকাশ করতে। এই সাধনায় জীবন দিতেও আমার আপত্তি নেই।'

বেদনাবিকৃত কণ্ঠে অজয়বাবু বললেন, 'আপনিও কি আমার মতন উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন? তাহলে দেখছি, আপনিও আমার মতন হতভাগ্য।'

'হতভাগ্য! আপনি নিজেকে হতভাগ্য বলে মনে করছেন কেন?'

'সত্যই আমি হতভাগ্য! প্রকৃতির রহস্য হচ্ছে বিষের পাত্রের মতোই মারাত্মক! আমার কাহিনি যদি শোনেন, তাহলে এ বিষের পাত্র এখনি ছুড়ে ফেলে দেবেন!'

তাঁর কাহিনি! ....শোনবার জন্যে আমার কৌতূহল আরও বেশি জাগ্রত হয়ে উঠল, বললুম, 'প্রকৃতির রহস্যের সঙ্গে আপনার কাহিনির কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছি না। কারণ, আপনার কাহিনি এখনও আমি শুনিনি।'

অজয়বাবু বললেন, 'আপনার সম্বন্ধেও আমি কিছু জানি না। আগে আপনার কথাই বলুন।'

আমার জীবন দীর্ঘ নয়; অভিজ্ঞতাও অল্প। তাই বলবার কথাও বেশি নেই। তবু আমার বাল্য ও প্রথম যৌবনের কথা, আমার আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা এবং আমার শিক্ষা-দীক্ষা ও ভ্রমণের কথা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করলুম।

সমস্ত শুনে অজয়বাবু বললেন, 'যার জীবনের আদর্শ আর উদ্দেশ্য নেই, সে মানুষই নয়। আপনি সে শ্রেণির অন্তর্গত নন জেনে সুখী হলুম। কিন্তু মানুষ হচ্ছে তুচ্ছ অসম্পূর্ণ জীব, আদর্শের কাছে কোনওদিন সে পৌঁছতে পারে না।'

আমি বললুম, 'তবু আদর্শের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা আর আগ্রহের মধ্যেই থাকে মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা।'

অজয়বাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, 'সে পরীক্ষায় আমি বিফল হয়েছি। আমার চেষ্টা আর আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু তবু আমি আদর্শের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। আমার কাহিনি শুনুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।'

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে অজয়বাবু তাঁর কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

অদ্ভুত, বিচিত্র ও আশ্চর্য সেই কাহিনি। আরব্য উপন্যাসের মতন অবাস্তব ও ছেলেভোলানো নয়, অথচ অবাস্তবও তার মধ্যে হয়েছে সম্ভবপর! সে কাহিনি যেমন করুণ, তেমনি ভয়ানক!

হিমালয়ের অন্তঃপুরে বসে নিঃশব্দ অন্ধ রাত্রির বুকে তুষারার্ত ঝোড়ো হাওয়ার কান্নার সঙ্গে সেই কল্পনাতীত কাহিনি শুনতে শুনতে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে মাঝে মাঝে আমার হৃদয় স্তম্ভিত ও নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল!

চতুর্থ ॥

অজয়বাবুর কথা শুরু

আমার জন্ম হালিশহরে বটে, কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে আমি মানুষ হয়েছি ভারতের মধ্যপ্রদেশে।

আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার। মানুষের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে ছিল তাঁর কারবার এবং ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে তাঁকে গভীর অধ্যয়ন ও আলোচনা করতে। বাবার পাঠাগারে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর কঙ্কাল সাজানো ছিল। খুব অল্পবয়স থেকেই কৌতূহলী হয়ে সেগুলি নিয়ে আমিও নাড়াচাড়া ও তাদের অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতুম। বাল্যকালের এই কৌতূহলই ক্রমে দৃঢ়তর হয়ে আমার জীবনকে চালনা করেছিল একেবারে এক নতুন পথে।

বাড়ির ও আমাদের সংসারের কথাও কিছু কিছু বলা দরকার। সংসারে ছিলেন বাবা, আমার ছোটোভাই অশোক এবং আর একটি মেয়ে। মা মারা গিয়েছিলেন অশোকের জন্মের পরে।

মেয়েটির নাম মমতা। সে যখন শিশু, তখনই তার মা ও বাবাকে হারিয়েছিল। তার বাবার সঙ্গে আমার বাবার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল—তেমন বন্ধুত্ব সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই মমতা যখন পিতৃহীন হল, তার ভারগ্রহণ করলেন আমার বাবাই। কেবল তাই নয়, একথা আমাদের আত্মীয়স্বজন সবাই জানত যে, ভবিষ্যতে মমতাই হবে আমার সহধর্মিনী!

পরিবারের বাইরে আর-একজন ছিল আমার নিত্যকার সঙ্গী। সে হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু প্রণব। শিশুবয়স থেকেই আমি বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতুম না। কারুর সঙ্গে অশিষ্টতা করতুম না বটে, কিন্তু উঠতুম-বসতুম খেলাধুলো করতুম একমাত্র প্রণবেরই সঙ্গে। আমাদের দুজনেরই প্রাণে জাগত একই ছন্দ, একই আনন্দ।

কেবল এক বিষয়ে প্রণবের সঙ্গে আমার পার্থক্য। তার আদর্শ ও আমার আদর্শ এক ছিল না।

প্রণবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কলেজ থেকে বেরিয়ে সে হবে অধ্যাপক। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, আমি হব বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গাধাকে ঘোড়ায় পরিণত করবার ব্যর্থ চেষ্টায় সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া—আমার কাছে এ চিন্তাও ছিল অসহনীয়। আমি জানতে চাই এই বিপুল বিশ্বের গুপ্তকথা—কেন মানুষ জন্মায়, কেন মানুষ বাঁচে, কেন মানুষ মরে?

বাবার পাঠাগারে তন্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলো বই ছিল। সেগুলো একে একে পাঠ করে দেখলুম যে, তান্ত্রিকরা বিশ্বাস করেন, মন্ত্রের প্রভাবে মৃতদেহেও জীবন সঞ্চার করা যায়। যদিও ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রশক্তির ওপরে আমার এতটুকু শ্রদ্ধাও ছিল না, তবু মৃতদেহে এই যে জীবনসঞ্চার করবার কল্পনা—এটা আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল আলেয়ার আলোর মতন।

বাবার কাছে একদিন এই প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি উচ্চহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন, 'অজয়, বিজ্ঞানচর্চার দিকে তোমার ঝোঁক আছে, এটা আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু যদি যথার্থ বৈজ্ঞানিক হতে চাও তাহলে সেকেলে তন্ত্র-মন্ত্রের কথা ভুলে যাও, কারণ ওসব হচ্ছে গ্রিমের লেখা পরির গল্পের মতো।'

কিছুদিন পরেই হাতে পড়ল আমেরিকায় প্রকাশিত একখানি মাসিকপত্র, তার নাম 'তন্ত্র'। কাগজখানির নাম দেখেই বিস্মিত হলুম, কারণ এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান লীলাক্ষেত্র আমেরিকাতেও তাহলে সেকেলে ভারতীয় তন্ত্রের প্রভাব আছে?

কাগজখানির আগাগোড়া পাঠ করে বিস্ময় আরও বেড়ে উঠল। দেখলুম, অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তার প্রভৃতি ভারতীয় যোগীদের সমাধি বা যোগনিদ্রা নিয়ে মাথা

ঘামিয়েও আসল রহস্যের চাবি খুঁজে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। এমনকি অনেকে তান্ত্রিক সাধকদের মড়া জাগানোকেও সত্য বলে মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান-প্রিয় একেলে আমেরিকানরাও এসব কথাকে পরির গল্প বলে মনে করে না।

প্রকৃতির রহস্যসাগরে ডুব দেওয়ার জন্যে আমার আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে উঠল।

আমার সাধারণ পাঠ্য-জীবন নিয়ে এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আমার প্রধান আলোচ্য হল, রসায়নবিদ্যা। বিশেষ করে রসায়ন বিদ্যাবলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতির বহু অজানা-শক্তির অধিকারী হয়েছেন এবং এইজন্যেই এই বিশেষ বিভাগেই হল আমার কার্যক্ষেত্র।

এখানে আমি যে পরম জ্ঞানী অধ্যাপকের সাহায্য লাভ করলুম, তিনি আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন নানা দিকে।

প্রথম দিনেই তিনি বললেন, 'এ বিভাগের প্রাচীন পণ্ডিতরা অসম্ভবকে সম্ভব করবেন বলে আশা দিতেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে করতে পারেননি কিছুই। আধুনিক পণ্ডিতরা বিশেষ কিছু করবেন বলে আমাদের আশান্বিত করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে পৃথিবীতে পরশ পাথরের অস্তিত্ব নেই এবং মৃত সঞ্জীবনী সুধা হচ্ছে অলস কল্পনা মাত্র। কিন্তু নিজের গুপ্ত ভাণ্ডারে বসে প্রকৃতি কেমন করে কাজ করেন, সেটা তাঁরা আবিষ্কার করতে ছাড়েননি। তারই ফলে আজ তাঁরা হয়েছেন অনন্ত শক্তির অধিকারী।'

এই অধ্যাপকটিকে পথপ্রদর্শকরূপে পেয়ে দিনে দিনে আমি জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেলুম। অধ্যাপকের নিজের একটি পরীক্ষাগার ছিল, সেখানকার সমস্ত দুর্লভ যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি কাজ করবার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলুম না।

কেবল দিনের বেলায় পরীক্ষাগারে নয়, নিজের ঘরে বসেও প্রায় সারারাত ধরে আমি রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ ও গভীর চিন্তা করতুম। রসায়ন বিভাগে আমার দ্রুত অগ্রগতি দেখে অন্যান্য ছাত্ররা যেমন বিস্মিত হত, তেমনি আনন্দিত হতেন আমার অধ্যাপক। এইভাবে দুই বৎসর কেটে গেল।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দেশান্তরে। দুই বৎসরের মধ্যে বাড়ি ফেরবার কথা একবারও আমার মনে হয়নি—এমনি একান্তভাবে আমি নিমগ্ন হয়েছিলুম গভীর সাধনায়! এমনকি, ছুটির দিনেও আমি ছুটি নিতুম না।

একটা বিষয় সর্বদাই আমাকে আকৃষ্ট করত। সেটা হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর দেহের কাঠামো। মনে ক্রমাগত এই প্রশ্ন জাগত, জীব-জীবনের উৎস কোথায়? এমন প্রশ্ন কত লোকেরই মনে জাগে, কেউ কিন্তু সদুত্তর খুঁজে পায়নি। অথচ আমার বিশ্বাস, মানুষের মিথ্যা ভয়, কাপুরুষতা বা অবহেলা যদি তাকে বাধা না দিত, তাহলে হয়তো সে এক প্রশ্নের উত্তর লাভ করত অনেকদিন আগেই।

ভেবে দেখলুম, জীবনের কারণ অন্বেষণ করতে গেলে আগে আমাকে পরীক্ষা করতে

হবে মৃত্যুকে। শরীর-সংস্থান বিদ্যা বা অ্যানাটমি সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম। কিন্তু কেবল সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। সেইসঙ্গে হাতেনাতে মানব দেহের ধ্বংস ও স্বাভাবিক বিকৃতিও লক্ষ করা উচিত। মনে মনে একটা সংকল্প করলুম। এ সংকল্পের কথা শুনলে সাধারণ মানুষ হয়তো শিউরে উঠবে। কিন্তু কোনওরকম অলৌকিক আতঙ্কই কোনওদিন আমাকে অভিভূত করতে পারেনি—এ শিক্ষা পেয়েছি আমি শৈশবে বাবার কাছ থেকে। ভূতের গল্প বা ভূতের আবির্ভাব, আমার কাছে এসব ছিল হাসির ব্যাপার।

আমাদের বাসার কাছে ছিল একটি গোরস্থান। এক গভীর রাত্রে চুপিচুপি আমি সেইদিকে যাত্রা করলুম। সঙ্গে নিলুম একটি চোরা লণ্ঠন ও শাবল।

গভীর রাত্রি। আকাশ নিশ্চন্দ্র। চারদিকে থমথমে অন্ধকার। মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাকে স্তব্ধতা জেগে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

গোরস্থানের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটা মস্ত ঝুপসি গাছ হঠাৎ মড়মড় শব্দ করে উঠল—দমকা বাতাসের ধাক্কায়। কতকগুলো ঝিঁঝিপোকা আচমকা একসঙ্গে ডেকে উঠেই যেন কোনও বিভীষিকার সাড়া পেয়ে আবার চুপ মেরে গেল। কী একটা জীব শুকনো পাতার ওপরে সশব্দে পা ফেলে ছুটে পালিয়ে গেল—বোধহয় শেয়াল।

এসব দেখেশুনে আমার কিছুমাত্র ভাবান্তর হল না। গোরস্থান তো কেবলমাত্র সেইসব জীবনহীন দেহরক্ষার আধার—আগে যারা ছিল সৌন্দর্যে কমনীয় এবং এখন যারা হয়েছে কীটের খোরাক।

সেই রাত্রেই গোটা চারেক পুরানো ও নতুন কবর খুঁড়ে কতকগুলো অস্থিসার বা অর্ধগলিত বা প্রায় অবিকৃত মড়া বার করে লণ্ঠনের আলোতে পরীক্ষা করলুম।

এইভাবে আমার পরীক্ষা চলতে লাগল রাত্রির পর রাত্রি ধরে।

এইসব নরদেহ—কবিরা যাদের রূপ বর্ণনা করে আসছেন যুগ-যুগান্তর ধরে, এখানে তাদের কী অবস্থা! মৃত্যু এসে হরণ করেছে তাদের সমস্ত রং-গড়ন, গতি-ভঙ্গির ছন্দ!

কিন্তু এদের মধ্যে কোথায় জীবনের সমাপ্তি এবং কোথায় মৃত্যুর আরম্ভ? কোন ফাঁক দিয়ে পলায়ন করেছে চঞ্চল জীবন এবং আবির্ভূত হয়েছে অসাড় মরণ? ভাবতে ভাবতে আচম্বিতে প্রগাঢ় অন্ধকারের ভেতরে ফুটে উঠল এক অপূর্ব সত্যের বিচিত্র জ্যোতি!

আশ্চর্য সেই আলোক রহস্য—কিন্তু কত সহজ তার অর্থ! অবাক ও অভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীর এত বড়ো বড়ো প্রতিভাধর এই একই রহস্য নিয়ে চিরকাল ধরে মস্তিষ্কচালনা করে এসেছেন, কিন্তু এমন সহজ অর্থটাও কারুর কাছে ধরা পড়েনি! আর আমি হচ্ছি জ্ঞান-রাজ্যের এক নগণ্য অতিথি, আমার কাছেই কিনা সেই চিরন্তন সত্য এমন অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করলে!

ভাববেন না আমি পাগল! সত্য বলছি আমি আবিষ্কার করেছি জন্ম ও জীবনের কারণ! কেবল তাই নয়, এখন আমি জীবনহীন জড়ের মধ্যেও জীবন সঞ্চার করবার ক্ষমতা অর্জন করেছি।

॥ পঞ্চম ॥

জীবন সৃষ্টি

এই অদ্ভুত আবিষ্কার করে আনন্দে আমি যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলুম। এবং এই উন্মাদনার মধ্যে তলিয়ে গেল আমার সমস্ত পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টের কথা। প্রকৃতির যে রহস্য ভাণ্ডারের দ্বার আজ পর্যন্ত কেউ খুলতে পারেনি, তারই চাবি আমার হস্তগত!

বন্ধু, আপনার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছি, আমার গুপ্তকথা জানবার জন্যে আপনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অসম্ভব, সেকথা আপনাকে জানানো অসম্ভব! আগে আপনি আমার কাহিনির সবটা শুনুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন, আমার এই গুপ্তকথা জানার অর্থই হচ্ছে, স্বখাতসলিলে ডুবে মরা। যে দুর্ভাগ্যের তাড়নায় আমি নিজেই আজ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছি, তার কবলে আপনাকেও নিক্ষেপ করে লাভ নেই। বলেছি, এক্ষেত্রে জ্ঞানের পাত্র হয়েছে বিষের পাত্র—এ বিষ সহ্য করবার শক্তি থেকে আমরা বঞ্চিত।

আবিষ্কারের পর চিন্তা করতে লাগলুম, আমি সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি বটে, কিন্তু অতঃপর কী সৃষ্টি করা উচিত? মানুষ, না মানুষের চেয়ে নিচু কোনও জীব?

যে-কোনও জীবের কাঠামোর মধ্যে শত-শত জটিল খুটিনাটি আছে। তন্তু, মাংসপেশি ও শিরা-উপশিরা তৈরি করে যথাস্থানে বসিয়ে কাজে লাগানো বড়ো যে-সে ব্যাপার নয়। আপাতত আমার হাতে যে মালমশলা আছে, তার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত হয়তো আমি সফল হতে পারব না; হয়তো বারংবারই আমাকে বিফল হতে হবে; হয়তো আমার গঠনকার্য হবে অসম্পূর্ণ!

কিন্তু তবু আমি দমলুম না, কারণ, প্রথমবারে বিফল হলেও দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে পারব। এবং দ্বিতীয়বারেরও পরে আছে তৃতীয়বার!

স্থির করলুম, সর্বপ্রথমে মানুষই গড়ব। ...কাজ আরম্ভ করতে দেরি হল না। কিন্তু সাধারণ মানব-দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ঠিকমতো গড়ে তোলা বড়োই কষ্টসাধ্য দেখে ভিন্নভাবে কাজ শুরু করলুম।

এবারেও মানুষের কাঠামো গড়ব বলে স্থির করলুম বটে, কিন্তু খুদে পাঁচ-ছ'ফুট লম্বা মানুষ নয়। এ হবে দানবের মতন বৃহৎ মানব—যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে! বিরাট দেহ, বিপুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! ...কয়েক মাস ধরে দরকারি মালমশলা সংগ্রহ করে দেহ গড়তে বসে গেলুম।

গড়তে গড়তে মনের ভেতর দিয়ে যেসব বিভিন্ন ভাবের ঝড় বয়ে যেতে লাগল, তা আর বলবার নয়। জীবন ও মৃত্যুর সীমাবন্ধন ছিন্ন করব আমি! অন্ধ বিশ্বের ওপরে করব আলোকবর্ষণ! নতুন এক জাতের মানুষ আবির্ভূত হবে এই পৃথিবীতে, তারা শ্রদ্ধা করবে আমাকে সৃষ্টিকর্তা বলে! আমার মানসপুত্ররা হবে কত সুখী, কত সুন্দর! এমন কথাও

ভাবলুম, আমি যদি জড়কেও জ্যান্ত করে তুলতে পারি, তাহলে মড়াকেও আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারব না কেন?

এইসব ভাবি, মাঝে মাঝে মূর্তি গড়ি এবং মাঝে মাঝে কেতাবের পর কেতাব পড়ি। দিনের পর দিন যায়, আমি থাকি ঘরের ভেতরে বন্দি। আমার চোখ গেল বসে, গাল গেল চুপসে, শরীর গেল শীর্ণ হয়ে। জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্য-চাঁদ উঁকি মেরে যায়, কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় আমার নেই।

এক-একবার বেরিয়ে যাই, কবর খুঁড়ে অস্থি নিয়ে আসবার জন্যে। সময়ে সময়ে জ্যান্ত জীবজন্তু এনে তাদের দেহে অস্ত্রাঘাত করে যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করি, একটা জীবনহীন জড়পিণ্ডকে জীবন্ত করবার জন্যে! আমার গুপ্ত সাধনার বীভৎসতা কে কল্পনা করতে পারবে? মাঝে মাঝে আমারও মনুষ্যত্ব বিদ্রোহী হয়ে উঠত, কিন্তু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আবার তাকে শান্ত করতুম। শরীর যখন আর বয় না, তখনও ছুটি নেই—এই একমাত্র কর্তব্য পালনের জন্যে আমি হয়ে উঠলুম যেন আত্মহারা, উন্মাদগ্রস্ত!

শীত গেল, বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম গেল আমার ঘরের বাইরে দিয়ে হেসে-গেয়ে-নেচে-ফুল ছড়িয়ে।

তারপর সে এক ঘনঘোর বর্ষার রাত্রি। জানলার শার্সির ওপরে শুনছি বাতাসের ধাক্কা এবং বৃষ্টির পটাপট শব্দ। বাইরের দিকে জেগে জেগে উঠছে বিদ্যুতের অগ্নিপ্রভা!

ঘড়িতে টং করে বাজল একটা। আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপরে শোয়ানো, আমারই হাতে-গড়া বিরাট মূর্তিটার মুখের দিকে তাকালুম। কী দৃশ্য!

মূর্তিটা ধীরে ধীরে তার বিবর্ণ হলদে চোখদুটো খুলে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শ্বাস-প্রশ্বাসে তার বক্ষস্থল সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল!

আমার প্রাণ কেঁপে উঠল যেন দারুণ এক দুর্ঘটনায়! এতকাল ধরে এত চিন্তা, যত্ন ও পরিশ্রমের পরে এ আমি কী গড়েছি? জীবনলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মূর্তিটার রূপ যে গেল বদলে! হলদে চামড়ার তলা থেকে ওর সমস্ত মাংসপেশি ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জীবন্তের মুখে মড়ার দাঁতের মতন তার দাঁতগুলো ঝকঝক করছে, তার ধূসর শ্বেত অক্ষিকোটরে জ্বলজ্বল করছে দুটো ভয়ানক জলীয় চক্ষু! এ তো মানুষ নয়, এ যে রাক্ষস!

এক মুহূর্তে আমার সমস্ত স্বপ্ন ছুটে গেল—মনের ভেতরে জেগে উঠল বিষম আতঙ্ক ও বিজাতীয় ঘৃণা! এই অপসৃষ্টির জন্যেই কি আমি জীবনের এতগুলো দিন ব্যয় করলুম?

আর সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলুম না, দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানার ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। চেষ্টা করলুম ঘুমোবার জন্যে—কিন্তু মনের সে অবস্থায় কি ঘুম সহজে আসতে চায়? অনেকক্ষণ ছটফট করবার পর তন্দ্রা এল—কিন্তু তার সঙ্গে এল ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্ন। আবার ধড়মড় করে উঠে বসলুম।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে—জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে এবং

সেই আলোতে দেখলুম, বিছানার মশারিটা দুই হাতে ফাঁক করে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আমার স্বহস্তে সৃষ্ট সেই ভীষণ দানবটা! এবং তার দুটো জলীয় চোখ—যদি তাদের চোখই বলা চলে—ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে আমারই পানে!

তার চোয়াল দুটো খুলে গেল, তার মুখ দিয়ে বেরুল বোবাদের মতন কী একরকম অব্যক্ত শব্দ, তারপর সে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসলে।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়লুম। সে হাত বাড়িয়ে আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনও গতিকে তাকে ফাঁকি দিয়ে আমি সরে পড়লুম। একেবারে নেমে এলুম বাড়ির উঠোনে। তারপর উত্তেজিতভাবে ক্রমাগত পায়চারি করি আর প্রত্যেক শব্দে চমকে উঠে ভাবি—ওই বুঝি এই দানোয় পাওয়া মৃতদেহটা আবার আমাকে আক্রমণ করতে আসছে! ...উঃ, অসম্ভব সেই মূর্তি! কোনও মানুষ তার দিকে তাকাতে পারে না! মিশরের হাজার হাজার বছর ধরে রক্ষিত মড়া বা 'মমি' যদি জীবনলাভ করে, তবে তার বীভৎসতাও হার মানবে এর কাছে!

চাঁদ ডুবল, আলো ফুটল, সূর্য উঠল। বিনিদ্র চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সেই অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। চলতে চলতে বারংবার পিছন ফিরে দেখতে লাগলুম—মনে তখনও ভয় ছিল যে, হয়তো সেই রাক্ষসটাও আমাকে খোঁজবার জন্যে পথে বেরিয়ে আসবে! সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও ভাবতে লাগলুম যে, প্রকাশ্যে সেই কল্পনাতীত অমানুষিক মূর্তির আবির্ভাব দেখলে রাজপথের ওপরে কীরকম চাঞ্চল্য ও গোলমালের সৃষ্টি হবে। এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আবিষ্কার করলে দেশের লোকের কাছে আমি লাভ করব কীরকম অভ্যর্থনা!

মানুষ হয়ে আমি ভগবানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছিলুম—ভেবেছিলুম ঈশ্বরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝি জড়বিজ্ঞান! তারই ফল এই। চেয়েছিলুম স্বর্গে উঠতে, নেমে এলুম পাতালের অন্ধকারে। দেবতা গড়তে গিয়ে দানব গড়ে বসেছি!

॥ ষষ্ঠ ॥

দুর্ভাগ্য

নদীর ধারে এসে পড়লুম।

সোনালি রোদ মাখানো আকাশ, আনন্দ-ঝরানো বাতাস, ঢেউয়ের সঙ্গে গান দোলানো নদীর নাচ—প্রকৃতির এইসব স্বাভাবিক আশীর্বাদকে এতদিন ভুলেছিলুম কীসের মোহে!

এই তো পাখি ডাকছে, গাছের সবুজ ঝিলমিল করছে, ঘাসেঘাসে রংবেরঙা ফুল ফুটছে—সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ এদের দেখে আসছে, তবু এরা কারুর চোখে পুরানো নয়!

তুচ্ছ জ্ঞানের সাধনা—যার মোহে মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিবাস্বপ্ন দেখে নিজের প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করতে চায়! আর সেইসব মানুষই শ্রেষ্ঠ ও সুখী, নিজেদের গণ্ডি-ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রামকেই যারা মনে করে সমগ্র পৃথিবী!

অনেকদিন পরে আজ মুক্ত প্রকৃতিকে বড়ো ভালো লাগল। আপনমনে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলুম—বাসায় ফেরবার কথা একবারও মনে হল না।

এমন সময়ে নদীর ওপার থেকে একখানা নৌকা এসে এপারে ভিড়ল। একটি লোক নৌকা থেকে নীচে নেমেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আরে, অজয় যে! কী ভাগ্যি, এখানে এসেই প্রথমে তোমার সঙ্গে দেখা!'

এ যে আমার বাল্যবন্ধু প্রণব! ছুটে গিয়ে তার দুই হাত চেপে ধরলুম।

প্রণব আমার মুখের পানে চেয়ে বলল, 'ভাই অজয়, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে! তোমাকে দেখলেই মনে হয় যেন কতকাল তুমি ঘুমোওনি! ব্যাপার কী? তোমার কি অসুখ হয়েছে?'

'প্রণব, তুমি ঠিক ধরেছ! আমার অসুখ হয়নি বটে, কিন্তু কাজের তাড়ায় বহুদিন আমার ভাগ্যে বিশ্রাম জোটেনি। আজ আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে—এখন আমি স্বাধীন। যাক সে কথা—আগে বাড়ির কথা বলো। বাবা, অশোক আর মমতার খবর কী?'

'সবাই ভালো। কিন্তু সবাই তোমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কতকাল তুমি দেশে যাওনি—চিঠিতেও নিজের কথা ভালো করে লেখোনি। সেইজন্যেই তোমার বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এসব কথা এখানে নয়—চলো তোমার বাসায় যাই।'

বুক কেঁপে উঠল। বাসা!

কিন্তু উপায় নেই। প্রণবকে নিয়ে বাসায় না গেলে তো চলবে না। ফিরলুম। আসতে-আসতে কেবলই ভাবতে লাগলুম গেল রাতের কথা।

বাসার কাছে এসে দাঁড়ালুম। ওর দোতলা ঘরে সেই ভয়ানক রাক্ষসটা এখনও কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে? প্রণব যদি তাকে দেখে তাহলে কী হবে? হয়তো সে বিকট আর্তনাদ করে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়বে আর তার চিৎকার শুনে রাজ্যের লোক ছুটে আসবে, পুলিশের আবির্ভাব হবে, চারদিকে মহা হইচই পড়ে যাবে! তখন আমি কী করব? কী জবাবদিহি দেব?

প্রণবকে কিছুক্ষণ নীচে অপেক্ষা করতে বলে আমি নিজের বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম।

বাড়ি চুপচাপ। সিঁড়ির ওপর দিয়ে বিদ্রোহী পা দুটোকে কোনওরকমে চালিয়ে নিয়ে দোতলায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

ওই সেই ঘর! দরজা বন্ধ! দরজায় খানিকক্ষণ কান পেতে রইলুম। ভেতরে কোনও শব্দ নেই। তবে কি তার কৃত্রিম দেহে জীবনের যে শিখা জ্বেলে দিয়েছিলুম, এরই মধ্যে আবার তা নিবে গিয়েছে?

সভয়ে, কম্পিত হস্তে হঠাৎ ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেললুম।

ঘরের ভেতরে কেউ নেই। ছুটে আমার শোওয়ার ঘরে গেলুম। সেখানেও কেউ নেই।

মুক্ত—আমি রাহুমুক্ত। বিপুল আনন্দে চিৎকার করে প্রণবকে ডাকলুম।

প্রণব যখন ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল, আমি তখন পাগলের মতন অট্টাহাসি হাসছি আর হাসছি।

প্রণব সবিস্ময়ে বললে, 'ভাই অজয়, ব্যাপার কী? দোহাই তোমার, অমনভাবে আর হেসো না!'

আচম্বিতে আমার ভ্রান্ত চোখ যেন দেখলে—সেই দৈত্যটা আবার ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। আমি চিৎকার করে বললুম, 'রক্ষা করো প্রণব, আমাকে রক্ষা করো!' বলে অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়লুম!

তারপর প্রবল জ্বরের আক্রমণে শয্যাগত হয়ে কেটে গেল মাসের পর মাস। কখনও জ্বর ছাড়ে, আবার তেড়ে আসে। কখনও কমে, কখনও বাড়ে। কখনও আচ্ছন্নের মতো শুয়ে থাকি, কখনও বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকি।

বাবা নিশ্চয়ই আমার কাছে এসে পড়তেন, কিন্তু তিনি এখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন—রেলপথে এতদূর আসবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এবং চিকিৎসকরা বললেন, আমাকে স্থানান্তরিত করবার চেষ্টা করলে পীড়াবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কাজেই আমার সেবার ভার নিতে হল একা প্রণবকেই। আর আমার পক্ষে তার চেয়ে যোগ্য লোক এ সংসারে কে আছে?

দীর্ঘকাল পরে আমি যখন আরোগ্যলাভ করলুম পৃথিবীতে তখন বসন্তের আগমন হয়েছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গাছে-গাছে নতুন পাতার শ্যামল সমারোহ। কানে আসছে গীতকারী পাখিদের উচ্ছ্বসিত ভাষা। নিশ্বাস টানলেই পাই বাগানে ফোটা তাজা ফুলের সৌরভ। চারদিকে নবজীবনের উৎসব, এরই মধ্যে পাখি, ফুল, পাতার মতন আমারও যে একটুখানি ঠাঁই আছে, এই ভেবে মন পুলকিত হয়ে উঠল।

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললুম, 'ভাই প্রণব, তুমি এখানে না থাকলে আমি আজ কোথায় থাকতুম? এই সুন্দর পৃথিবী থেকে হয়তো আমার অস্তিত্বই মুছে যেত। আমি কেমন করে তোমার ঋণ পরিশোধ করব?'

প্রণব বললে, 'চুপ করো অজয়। আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ঋণের কথা উঠতেই পারে না। ও প্রসঙ্গ থাক। আপাতত তুমি যখন সেরে উঠেছ, তোমার সঙ্গে আমি একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।'

আবার বুক দুরুদুরু করে উঠল। প্রণব কী নিয়ে আলোচনা করবে? তবে কি আমি বিকারের ঘোরে আমার সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করে ফেলেছি?

প্রণব বললে, 'কথাটা যে কী, আমার মুখে শোনবার দরকার নেই। তোমার বাবার একখানা চিঠি এসেছে, পড়ে দ্যাখো।

প্রণবের হাত থেকে বাবার পত্রখানি নিয়ে পাঠ করতে লাগলুম

'বাবা অজয়,

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তুমি আরোগ্যলাভ করেছ। কিন্তু তবু আমার আনন্দলাভ করবার উপায় নেই, কারণ ভগবান আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন। বজ্রাহত বৃক্ষের মতন আজ আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছি। শেষবয়সে আমাকে যে এই মহা দুর্ভাগ্যের দুর্বহ ভার বইতে হবে, এটা কোনওদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

তোমার ছোট্টভাই অশোককে আর তুমি দেখতে পাবে না। আজও তার কোল ছাড়বার বয়স হয়নি। কিন্তু এই বয়সেই অশোককে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

কিন্তু এ সাধারণ মৃত্যু নয়। কারণ, অশোক মারা পড়েছে হত্যাকারীর হাতে। আমার সেই ফুলের মতন সুন্দর, পবিত্র ও কোমল শিশু—যাকে দেখলে সবাই ভালোবাসতে চাইত, তাকেই হত্যা করেছে কোনও নিষ্ঠুর নরপশু।

অকারণে শোকোচ্ছ্বাসে পত্র পরিপূর্ণ করে লাভ নেই—শোকপ্রকাশ করে কেউ কোনদিন মৃত্যুকে বাঁচাতে পারেনি। এখানে ব্যাপারটা যতদূর পারি গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করব।

গত তেসরা ফাল্গুন অশোককে নিয়ে আমি আর মমতা সান্ধ্যভ্রমণে বেরুই। তুমি জানো, এটি আমার পুরোনো অভ্যাস। ছেলেবেলায় তুমিও আমার সঙ্গে রোজ বেড়াতে বেরুতে।

অশোক বাগানের এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করে আপন মনে খেলা করছিল, মমতা আর আমি বসেছিলুম একখানি বেঞ্চিতে।

সন্ধ্যা যখন হয় হয়, তখন আমরা বাড়ি ফেরবার জন্যে গাত্রোত্থান করলুম। কিন্তু অনেক ডাকাডাকি করেও অশোকের সাড়া পাওয়া গেল না।

তখন ভয় পেয়ে আমরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ পরে রাতের অন্ধকার যখন জমাট হয়ে উঠেছে, তখন বাগানের বাইরে একটি ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল অশোকের মৃতদেহ। কোনও পিশাচের কঠিন আঙুলের ছাপ তখনও তার কণ্ঠের ওপরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

অশোকের দেহের পাশে পড়েছিল একখানা খণ্ড খণ্ড ফটোগ্রাফ। সেখানা তোমারই ছবি—তোমার যাওয়ার আগের দিনে যা তোলা হয়েছিল।

ছবিখানা তোমার ঘরের ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে ছিল, ঘটনাস্থলে কেমন করে এল প্রথমটা তা বুঝতে পারিনি। তারপর আন্দাজ করেছি, শিশু-বুদ্ধির কোনও খেয়ালে অশোক বেড়াতে যাওয়ার সময়ে ছবিখানা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছবিখানা এমন খণ্ড-খণ্ড অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে কেন, তার কারণ আমি জানি না। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখনও খুনির কোনও সন্ধানই পাওয়া যায়নি। এবং এই শিশুহত্যার উদ্দেশ্যই বা কী তাও কেউ অনুমান করতে পারছে না।

তোমার মা পরলোকে গিয়ে এই দারুণ আঘাতের ব্যথা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন বটে, কিন্তু মমতাকে নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। অশোকের মায়ের স্থান নিয়েছিল মমতাই; তাকে হারিয়ে তার অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। সে দিনরাত কাঁদছে আর ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছে। মমতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই।

অজয়, পত্রে আমি এর বেশি আর কিছু লিখতে চাই না—লেখবার শক্তিও আমার নেই। নিজেকে বড়োই একাকী বলে মনে করছি। এখন তোমাকে আমার কাছে পেতে চাই। ইতি—

তোমার হতভাগ্য পিতা'

সেইদিনই প্রণবের সঙ্গে দেশের দিকে যাত্রা করলুম।

॥ সপ্তম ॥

আবার দুঃস্বপ্ন

দেশে এসেছি।

আমাদের শোকাচ্ছন্ন পরিবারের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা নিয়ে এখানে আলোচনা করে আমার আসল বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। দুনিয়ার এমন কে মানুষ আছে, শোক-দুঃখের আস্বাদ যে পায়নি? এক্ষেত্রে মানুষ মাত্রই ভুক্তভোগী। সুতরাং আমার একান্ত সাধারণ অশ্রুজলের কাহিনি এবং প্রিয়বিয়োগকাতর আত্মীয়স্বজনের হা-হুতাশের ইতিহাস বর্ণনা না করলেও আপনি অনায়াসেই অনুভব করতে পারবেন।

একে দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যা থেকে উঠেই ভগ্নদেহে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, তার ওপরে বাড়ির ভেতরকার এই বুকচাপা আবহ;—প্রাণ-মন যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ল। ছোটো ভাইকে আমি যে ভালোবাসতুম না, তা নয়; অশোক ছিল আমার আত্মার মতন প্রিয়। কিন্তু যতই কাঁদি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি, সে আর ফিরবে না। নিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই।

শোকের চেয়ে আমার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল প্রতিহিংসার ভাব। অতটুকু নিষ্পাপ অবোধ শিশু—পৃথিবীতে ছিল যে স্বর্গের প্রতিনিধির মতো, কোন পাষণ্ড তাকে অকারণে হত্যা করলে? এ যেন কেবল হত্যার আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেই হত্যা করা। এত বড়ো নরাধম যে এখনও ধরা পড়ল না, সে যে এখনও সমাজে-সংসারে সাধুর মুখোশ পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এই ভেবেই আমার আক্রোশ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল।

দিনরাত কেবল ওই কথাই ভাবি। শিশু-রক্তে হাত রাঙা করে কোথায় সে লুকিয়ে আছে? কে তার সন্ধান দেবে? কোন কৌশলে তাকে ধরা যায়?

ভগ্ন দেহের দুঃখ, বাবার ও মমতার শোক-অধীর মুখ, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে অশান্ত জল্পনা-কল্পনা ক্রমেই আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। তাই একদিন মনকে একটু ছুটি দেওয়ার জন্যে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

পশ্চিমের যে ছোটো শহরটিতে আমার বাড়ি, তার সীমানা পার হলেই দেখা যায় চারদিকে পাহাড়, ঝরনা, বন, মাঠ আর নদী। প্রকৃতিকে চিরদিন আমি ভালোবাসি, তার কোলে গিয়ে দাঁড়ালে কেবল সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য নয়, লাভ করি সান্ত্বনার আশীর্বাদও।

ভুট্টাখেতের পর ভুট্টাখেত—সেখানে দিকে দিকে বসেছে পাখিদের ভোজসভা। সুদূরের নীল অরণ্যের এপারে পড়ে রয়েছে অসমোচ্চ প্রান্তর এবং তারই ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির রৌপ্য-ধমনির মতন একটি ছোট্ট নদী।

সামনেই একটি পাহাড়। তারই পদতলে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, আজকের বিদায় লগ্নে পশ্চিম আকাশের পটে রঙিন ছবি আঁকবার জন্যে সূর্য কোন কোন রঙের ডালা নিয়ে বসেছে।

কিন্তু আর একদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম, সূর্যের চিত্রলেখা মুছে দেওয়ার জন্যে দ্রুত ধেয়ে আসছে মস্ত একখানা কালো মেঘ। দেখতে দেখতে বজ্র-বাজনা বাজাতে বাজাতে সেই বিদ্যুৎভরা মেঘখানা প্রায় সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল ব্লটিং কাগজের ওপরে ওলটানো দোয়াতের কালির মতো।

বহুদূর থেকে আগতপ্রায় ঝটিকার চিৎকার শুনতে পেলুম। তারপর হয়তো বৃষ্টিও আসবে।

এখানকার সমস্তই আমার নখদর্পণে। বাল্যকালে এই মাঠে, নদীর ধারে ও পাহাড়ের বুকে কত খেলাই করেছি। শ-দেড়েক ফুট ওপরে পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গুহা আছে তাও আমি ভুলিনি। আসন্ন ঝড়-বৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে সেই গুহার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলুম।

শুকনো ধুলো-পাতা-বালি উড়িয়ে, বড়ো বড়ো গাছগুলোকে দুলিয়ে হু হু শ্বাসে ঝড় এসে পড়ল—কিন্তু তখন আমি গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

আচম্বিতে অন্ধকার ভেদ করে আমার চোখ দেখতে পেলে, গুহার মুখেই রাত্রির মতন কালো কী একটা ছায়া। চমকে উঠলুম। ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলুম।

অকস্মাৎ মুহূর্তের জন্যে সারা আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দপ করে জ্বলে উঠল তীব্র এক বিদ্যুৎ শিখা। ...আর কোনও সন্দেহ রইল না। ক্ষণিক আলোকেই সেই অসম্ভব দীর্ঘ ও বিরাট ও বীভৎস মূর্তিকে চিনতে পারলুম আমি অনায়াসেই। এ আর কেউ নয়—আমারই হাতে গড়া দানব!

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। দেখলুম, দৈত্যটা আশ্চর্য এক লাফ মেরে প্রায় দশ-বারো ফুট

উঁচু একখানা পাথরের ওপাশে গিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরেই ঝড়ের হুংকার ডুবিয়ে কানে এল হা-হা-হা-হা করে বিকট এক অট্টহাস্য। কী সেই অট্টাহাস্য—পৃথিবীর সমস্ত নৃশংসতার আনন্দ যেন তার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল!

ঝড় বইছে, বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু আমার পা দুটো যেন পাথরের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল। প্রকৃতির দুর্যোগ অনুভব করতেও পারলুম না—আমার দেহ ও হৃদয় স্তম্ভিত!

বিদ্যুতের আলোক কেবল সেই ঘৃণ্য দানবকেই প্রকাশ করলে না—সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুললে আর এক ভীষণ সত্যকে।

এই দানবই অশোকের হত্যাকারী!

হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। প্রথমত যে-কোনও নির্দয় মানুষের পক্ষেও বিনা কারণে অমন কচি শিশুকে হত্যা করা অসম্ভব। এ হচ্ছে অমানুষিক পাপ। দ্বিতীয়ত, কোথায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আর কোথায় আমাদের এই ছোট্ট নগর। দুনিয়ার এত দেশ থাকতে দানবটা কেনই বা এখানে এসে হাজির হয়েছে আর কেনই বা এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তৃতীয়ত, আমাকে দেখে অমন বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে সে পালিয়ে গেল কেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়! অশোকের হত্যাকারী হচ্ছে এই দানব—নিশ্চয়!

একবার ভাবলুম, পিশাচের পিছনে পিছনে ছুটে যাই। তারপরেই বুঝলুম, সে হবে একেবারেই ব্যর্থ চেষ্টা। যে সৃষ্টিছাড়া জীব দশ-বারো ফুট উঁচু পাথর এক লাফে অনায়াসে টপকে যেতে পারে, তাকে ধরবার শক্তি কোনও সাধারণ মানুষেরই নেই। আর তার দেহ গড়েছি আমি স্বহস্তেই। তাকে যে কতখানি আসুরিক ক্ষমতার অধিকারী করেছি, একথা আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না। আমি তার সৃষ্টিকর্তা—কিন্তু দৈহিক প্রতিযোগিতায় আমি হব তার হাতে খেলার পুতুল মাত্র। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনিই কি শয়তানকে দমন করতে পেরেছেন?

রোগশয্যা ত্যাগ করবার পর আজ পর্যন্ত আমি যে শরীরী-দুঃস্বপ্নকে ভুলে ছিলুম, আবার সে আমাকে নতুন করে দ্বিগুণ বিক্রমে আক্রমণ করলে। একে একে আবার মনে পড়তে লাগল আমার সৃষ্টির আগেকার কল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও সাধনার কথা; মূর্তিমান প্রেতের মতো গভীর রাত্রে গোরস্থানে গিয়ে রোমাঞ্চকর উপাদান সংগ্রহের কথা; তারপর সৃষ্টির নামে সেই কিম্ভুতকিমাকার অনাসৃষ্টির কথা; তারপর আমার সুখস্বর্গ থেকে যন্ত্রণার নরকে পতন-কাহিনি।

হায়রে আমার কপাল, নিজের হাতে সাক্ষাৎ অভিশাপের ও সর্বনাশের জীবন্ত মূর্তি গড়ে আজ আমি মানুষের শান্তির তপোবনে ছেড়ে দিয়েছি!

দানব আমার ভাইকে হত্যা করেছে। কিন্তু এই কি এর প্রথম হত্যা? আমার অজ্ঞাতসারে

এ কি আরও কতবার মানুষের রক্তে স্নান করেনি?

ঝড় বিদায় নিয়েছে। জলভরা মেঘ অদৃশ্য হয়েছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু সেই আলো ঝলমল বিশ্বে আমার চোখ অন্ধ।

নানারকম দুর্ভাবনা ভাবতে ভাবতে আবার বাড়িতে ফিরে এলুম। কী কষ্টে বিছানায় ছটফট করতে করতে সে রাত্রি কাটল, ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

প্রভাত হল—নবসূর্যের আনন্দ ধারা নিয়ে। কিন্তু আমার পক্ষে কী-বা রাত, কী-বা দিন। আমার প্রাণপাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে রইল নিরাশার বিষে। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি আছে কার?

নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলুম বারংবার। মনে হল, ভাইয়ের রক্তে—নির্দোষ শিশুর রক্তে হাত আমার রাঙা হয়ে উঠেছে! আমারই হাতে তৈরি সাংঘাতিক রাক্ষস, আমি যদি পাগলামির খেয়ালে তার কুগঠিত মূর্তির মধ্যে জীবনদান না করতুম, তাহলে অশোক তো আজও হালকা বাতাসে উড়ন্ত সুন্দর প্রজাপতির মতন খেলা করে বেড়াত। পিঞ্জরের দ্বার খুলে রক্তলোভী হিংস্র পশুকে যে বাইরে ছেড়ে দেয়, যত কিছু হানাহানির জন্যে দায়ী তো সে নিজেই। অনুতাপে বুক যেন জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল।

পুলিশ চারদিকে তন্নতন্ন করে খুনিকে খুঁজছে, বাবা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, আমি কিন্তু জেনে শুনেও আসল হত্যাকারীর কথা প্রকাশ করতে পারছি না। আমার এ যেন বোবার স্বপ্ন, প্রকাশ করবার কোনও উপায়ই নেই।

প্রকাশ করলে কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? যদি বলি, আমি জড়পিণ্ডকে জীবন্ত করবার উপায় আবিষ্কার করেছি এবং অশোকের হত্যাকারী হচ্ছে আমারই সৃষ্ট এক অতিকায় দানব, তবে কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে—এমনকি বাবাও ভাববেন, আমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। শেষটা হয়তো আমাকে বাস করতে হবে পাগলা গারদে। এত দুর্ভাগ্যের পর গারদে বাস করবার সাধ আমার হল না।

আমার স্বাস্থ্য আবার ভেঙে গেল। পাছে আবার কোনও মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হই, সেই ভয়ে বাবা কাতর হয়ে পড়লেন।

আমাকে বললেন, 'অজয়, তোমার বায়ু-পরিবর্তন করা উচিত। বিন্ধ্য পর্বতে আমার যে বাংলো আছে, কিছুদিন তুমি সেইখানে গিয়ে বাস করো। আপাতত আমার বাড়ি তোমার মন আর স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

প্রণব ও মমতাও সেই মত প্রকাশ করলে। আমিও আপত্তি করলুম না—কারণ এখানে থাকলে আমার সেই দুষ্টগ্রহের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে, হয়তো সে শিকারি বাঘের মতন লুকিয়ে সর্বদাই আমার ওপরে পাহারা দিচ্ছে—আবার কোনও ধারণাতীত দুর্ভাগ্যের আয়োজন করবার জন্যে!

॥ অষ্টম ॥

দানব ও মানব

চমৎকার নির্জন বাংলো। পাশেই একটি ছোট্ট ঝরনা খানিক রোদের সোনা ও খানিক আমলকী বনের ছায়া মেখে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে পাথরে পাথরে সকৌতুকে লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে কোথায় নেমে গিয়েছে চোখের আড়ালে। দূরে নীচে শ্বেত বালুতটের ফ্রেমেআঁটা গঙ্গাকে দেখাচ্ছে আঁকা ছবির মতো। বহুদূর থেকে মাঝে মাঝে জনতার ক্ষীণ একতান শোনা যায়—কিন্তু সে যেন অন্য জগতের কলগুঞ্জন! কাছে খালি নির্ঝরের সংগীত, তরুকুঞ্জের মর্মর-ছন্দ, প্রভাতি পাখির কাকলি, দুপুরের ঘুঘুদের ঘুমপাড়ানি সুর!

বাবা জানতেন, আমি জনতার অর্থহীন মুখরতাকে ভয় করি, তাই আমার দেহ ও মনের বিশ্রামের জন্যে যোগ্যস্থানই নির্বাচন করেছেন।

যাঁর রক্তমাংসে আমার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু গড়া, শিশুবয়স থেকে যিনি আমার সমস্ত সবলতা-দুর্বলতা, স্বাভাবিক ঝোঁক, হাবভাব, শিক্ষা-দীক্ষা লক্ষ করে আসছেন, পুত্রের চরিত্র তাঁর কাছে যে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগেরই মতন সহজ হবে, এজন্যে বিস্মিত হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সন্তানরা—বিশেষ করে পুত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন স্বাভাবিক সত্যটা বুঝতে পারে না। যৌবনের উদ্দামতায় আত্মহারা হয়ে তারা ভাবে, বাবা তো মিউজিয়ম-এর সেকেলে বিশেষত্ব, অতি-অগ্রসর একালের ধর্ম তিনি ধারণায় আনবেন কেমন করে? ছেলেরা যখন ঠাওরায় বাপকে ঠকালুম হারালুম, তখন আসলে ঠকে ও হারে যে তারা নিজেরাই, যুগে যুগে এ সত্যের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে যে কতবার, সে হিসাব কেউ রাখেনি। আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে এ সত্য পিতাদের পক্ষেই রায় দিয়েছে, তবু এখনও পুত্রদের বিশ্বাস—জন্মদাতাদের চেয়ে তারাই হচ্ছে বেশি বুদ্ধিমান।...

সেদিন অজানা পাখি আমার বাংলোর একটি জানলায় বসে নিজের ভাষায় প্রথম প্রভাতকে দিচ্ছিল সুন্দর অভিনন্দন।

তার কণ্ঠস্বরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু আমি বিছানার ওপরে উঠে বসতেই পাখি গেল পালিয়ে। মানুষকে কোনও জীবই বিশ্বাস করে না—সিংহ-ব্যাঘ্র পর্যন্ত তাকে ভয় বা শত্রু বলে সন্দেহ করে।

কিন্তু পাখি যে-গান গেয়ে গিয়েছিল, তার সুরের রেশ তখনও ঘুরছিল আমার ঘরের ভেতরে। বনের পাখির বনের গান ডাক দিয়ে গেল আমাকে ঘরছাড়া বনের পথে।

উঠে দেখলুম, গরম চা, এগ পোচ ও টোস্ট প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়া সেরে, জামাকাপড় পরে, চা প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করে বেরিয়ে পড়লুম বাংলো থেকে।

মন যে কেন সেদিন অকারণে প্রফুল্ল হয়ে উঠল জানি না—বোধ করি নিয়তির ছলনা!

প্রতিদিনের মতো সেদিনও যদি-না বাংলোর বাইরে পা বাড়াতুম, তাহলে আজ হয়তো দেখা হত না আপনার সঙ্গে এবং আমাকেও বলতে হত না এই অভিশপ্ত জীবনের অবাস্তব কাহিনি।

আগেই বলেছি, এখানে বসে দূর থেকে গঙ্গাকে দেখাচ্ছিল আঁকা ছবির মতো—অচপল, জীবনহীন। তবু তার মধ্যে ছিল কবির সংগীত, চিত্রকরের মৌন স্বপ্ন। ...সেই দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই পেরিয়ে চলে গেলুম অনেক দূর, অনেক দূর। মনকে সেদিন ছেড়ে দিয়েছিলুম আকাশে-বাতাসে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে, নিরুদ্দেশের যাত্রীর মতো। আমি যেন পৃথিবীর মাটি-ভোলা স্বপ্নলোকের পথিক!

কিন্তু হায়, আচম্বিতে হল স্বপ্নভঙ্গ। ছিঁড়ে গেল আমার প্রাণের বীণার তার।

দূর থেকে একটা মূর্তি হনহন করে এগিয়ে আসছে আমার দিকেই। মাঝে মাঝে সে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সে এক-একটা দশ-বারো ফুট উঁচু পাথরের ঢিপি এক এক লাফে অত্যন্ত অনায়াসে পার হচ্ছে! মূর্তিটা মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ বড়ো! চিনতে দেরি লাগল না। বুকটা ধড়াস করে উঠল! সেই শয়তান!

রাগে সারা শরীর জ্বলতে লাগল। ও কেন এদিকে আসছে? আমার কাছে কী চায় ও?

স্থির করলুম, নিজের হাতে যে মূর্তি গড়েছি, আজ নিজের হাতেই তাকে ধ্বংস করব! ওকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম।

সে কাছে এল। তার অপার্থিব কুৎসিত মুখে মাখানো অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের এবং সেইসঙ্গেই তিক্ত যন্ত্রণার ভাব। কিন্তু রাগের মাথায় ওসব আমি ভালো করে লক্ষ করলুম না।

চিৎকার করে বললুম, 'পিশাচ! কোন সাহসে তুই আমার সামনে এসেছিস? আমার প্রতিহিংসার ভয়ে তোর বুক কাঁপছে না?'

মৌনমুখে সে আমার আরও কাছে এল।

'দূর হ নরকের কীট! না, না, দাঁড়া! আমার পায়ের তলায় তোকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দি!'

দৈত্যটা বললে, 'আমি এইরকম অভ্যর্থনারই আশা করছিলুম। হতভাগ্যকে সবাই ঘৃণা করে—আর আমার মতন হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কিন্তু ওগো আমার স্রষ্টা, আমি যে তোমারই হাতে গড়া জিনিস, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন যে অচ্ছেদ্য,—তুমিও কি আমাকে ঘৃণা করবে? তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও—এ কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না? আমার প্রতি তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো, তাহলে আমিও তোমার আর মনুষ্যজাতির প্রতি আমার কর্তব্য পালন করব। যদি শান্তি চাও, আমার কথা শোনো। নইলে যতক্ষণ তোমার আত্মীয়-বন্ধুদের দেহে রক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি পূর্ণ করব মৃত্যুর উদর!

ক্রোধে অধীর কণ্ঠে বললুম, 'ঘৃণ্য রাক্ষস! শয়তান! তোর পক্ষে নরক-যন্ত্রণাও তুচ্ছ শাস্তি। তোকে সৃষ্টি করেছি বলে তুই আমাকে দোষ দিচ্ছিস? আয় তবে, যে দীপ জ্বেলেছি, নিবিয়ে দি এখুনি!'—বলেই আমি তার ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়লুম।

সে খুব সহজেই আমাকে এড়িয়ে বলল, 'শান্ত হও। মিনতি করি আমার কথা শোনো। আমি যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করেছি, আমার দুঃখ আরও বাড়িয়ো না। হ্যাঁ, দুঃখময় আমার জীবন, কিন্তু সে-জীবনও আমার কাছে প্রিয়। তুমি আমাকে আক্রমণ করলে আমিও বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষা করব। মনে রেখো, তুমি আমাকে গড়েছ তোমার চেয়ে বলবান করে—আকারেও আমার কাছে তুমি বামনের মতো। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করতে চাই না। আমি হচ্ছি তোমারই দাস—তোমারই সৃষ্টি। তুমি আমার রাজা, আমি তোমার প্রজা। আমাকে তুমি পদদলিত কোরো না। আমি তোমার কাছে সুবিচার চাই। এই দুনিয়ার চারদিকেই আনন্দের হাসি, নিরানন্দের কান্না খালি আমার বুকে। প্রথমে আমার স্বভাব ছিল মিষ্টি, শান্ত, সদয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাকে আজ করে তুলেছে দানব। আমাকে সুখী করো আমিও হব সুচরিত্র।'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'না, না, না! দূর হ! তোর কোনও কথাই আমি শুনব না। তোর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই থাকতে পারে না। আমরা শত্রু। হয় দূর হ, নয় লড়াই কর—বেঁচে থাকুক খালি আমাদের একজন।'

দৈত্য কাতর কণ্ঠে বললে, 'কেমন করে আমি তোমার মন ফেরাব? প্রভু, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমার মনে ছিল প্রেম, উদারতা, মনুষ্যত্ব। কেবল মানুষের অবহেলাই আমার প্রকৃতিকে জঘন্য করে তুলেছে। ভেবে দ্যাখো। আমার স্রষ্টাই যখন আমার প্রতি বিরূপ, তখন অন্য মানুষদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারি! এই বিপুল জগতে আমি একাকী—আমি একাকী। সংসারে-সমাজে-গ্রামে-নগরে আমার ঠাঁই নেই—আমি হচ্ছি বনজঙ্গল-পাহাড়ের জীব! আমার বন্ধু আকাশ-বাতাস, মানুষের চেয়ে তারা দয়ালু। মানুষরা যদি আমার সন্ধান পায় তাহলে দল বেঁধে আমাকে হত্যা করতে ছুটে আসে। মানুষ আমার শত্রু, আমিই-বা মানুষের বন্ধু হই কেমন করে? প্রভু, আগে আমার কাহিনি শোনো, তারপর বিচার করো।'

আমি বললুম, 'যেদিন তুই জন্মেছিলি, সে দিনকে অভিশাপ দি। আমার যে হাত তোকে গড়েছে, তাকেও আমি অভিশাপ দি।'

দানব বলল, 'তবু আমার কাহিনি শোনো।'

অগত্যা আমাকে রাজি হতে হল।

॥ নবম ॥

দৈত্যের আত্মকথা

আমার জন্মমুহূর্তের কথা ভালো করে স্মরণ হচ্ছে না। সে যেন অস্পষ্ট স্বপ্ন!

শব্দ পেলুম, গন্ধ পেলুম, স্পর্শ পেলুম। চোখও ফুটল। কিন্তু আলোর কী তীব্রতা! আবার চোখ মুদলুম—অমনি ডুবে গেলুম অন্ধকারে। আবার চোখ খুলে পেলুম আলোর ধারা।

উঠলুম। পাশের ঘরে গিয়ে তোমার দেখা পেলুম। কেমন করে জানি না, মন তখনই তোমাকে চিনে ফেললে আমার ঈশ্বর বলে। কিন্তু তুমি আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে চলে গেলে কোথায়!

তারপর সবিস্ময়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম। রাস্তায় ছিল না জনপ্রাণী। হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে পেলুম মাঠ। তারপর বন। তখন তেষ্টা পেয়েছে, খিদে পেয়েছে। বনে ছিল ফল, নদীতে ছিল জল। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

যখন জাগলুম, তখনও অন্ধকারের ঘোর কাটেনি। বিষম শীত করতে লাগল। কোথাও আশ্রয় নেই, বন্ধু নেই। মনে জাগল কেমন একটা ভয়ের ভাব। নিজেকে কী অসহায় বোধ হল। একা বসে কেঁদে ফেললুম।

তারপর দেখলুম জীবনের প্রথম সূর্যোদয়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার নিশ্চেষ্টতা ঘুচে গেল। উঠে গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে লাগলুম।

কিন্তু তখনও আমি ভালো করে কিছু বুঝতে পারছিলুম না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আলো-অন্ধকার অনুভব করছি, চারদিকে শুনছি নানা ধ্বনি, বাতাসে পাচ্ছি ফুল-মাটি-বনের গন্ধ—এইমাত্র!

এমনিভাবে কেটে গেল কয়েকটা দিন। তারপর, একে একে পৃথিবীর রহস্য এবং কার্য ও কারণ সম্বন্ধে আমার মন সজাগ হয়ে উঠল।

গাছে গাছে পাখির ডাক ভারী মিষ্টি লাগল। একদিন খেয়াল হল, আমিও অমনি ধ্বনির সৃষ্টি করব। কিন্তু পারলুম না—আমার গলা থেকে বেরুল কীরকম একটা কর্কশ অব্যক্ত শব্দ। নিজের গলা শুনে নিজেরই ভয় হল আমি একেবারে চুপ মেরে গেলুম!

ক্রমেই জানতে পারলুম—দিনের পর রাত আসে আর রাতের পরে আসে দিন, সূর্য ডুবলে চাঁদ ওঠে, চাঁদ মিলোলে সূর্য ওঠে; কোকিলের স্বর মধুর, কাকের ডাক কর্কশ, জড় নড়ে না, গাছেরা জড়ও নয় জীবও নয় প্রভৃতি আরও অনেক কিছু!

একদিন বনের পথে চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলুম, রাঙা টকটকে কী একটা সমুজ্জ্বল জিনিস। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শীতার্ত দেহে লাগল তপ্ততার আরাম! খুশি হয়ে জিনিসটাকে স্পর্শ করতেই সে আমাকে এমনি কামড়ে দিলে যে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম।

একই জিনিস দেয় আরাম ও যাতনা। সেইদিন থেকে চিনলুম আগুনকে। ক্রমে তার ব্যবহারও শিখলুম।

কিছুদিন পরে সে বনে হল ফলের অভাব। খালি জল খেয়ে তো জীব বাঁচতে পারে না। ক্ষুধার তাড়নায় দেহ অস্থির হয়ে উঠল। বনের আশ্রয় ছেড়ে আবার খোলামাঠে বেরিয়ে পড়লুম।

সেখানেও খাবার নেই। মাঠ পেরিয়ে একখানা গ্রামের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একখানা কুটির চোখে পড়ল। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি, এক বুড়ি বসে বসে রান্না করছে।

আমার পায়ের শব্দে চমকে বুড়ি মুখ ফেরালে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ কপালে তুলে ভয়ানক চেঁচিয়ে সে এমন আশ্চর্য দৌড় মারলে যে, নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতুম না। অত বুড়ি অত জোরে দৌড় মারতে পারে!

বুড়ি ভাত নামিয়েছে, ডাল ও তরকারি রেঁধেছিল। তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে সমস্ত সাবাড় করে ফেললুম। তারপর দিব্যি আরামে উনুনের ধারে বসে আগুন পোয়াচ্ছি, এমন সময়ে বাইরে উঠল এক বিষম গোলমাল!

ব্যাপার কী দেখবার জন্যে বেরিয়ে এলুম। চারদিকে মস্ত জনতা, এদিকে-ওদিকে যেদিকেই তাকাই, কেবল মানুষের পর মানুষ। সবাই উত্তেজিত, সবাই চিৎকার করছে! আমি বাইরে আসতেই বেশিরভাগ লোকই পালিয়ে গেল, কিন্তু বাকি মানুষগুলো আমাকে টিপ করে ক্রমাগত ছুড়তে লাগল ইট-কাঠ-পাথর! বেগতিক দেখে আমি দিলুম টেনে লম্বা!

আমার আর একটা শিক্ষা হল। বুঝলুম, মানুষ আমার বন্ধু নয়। সেইদিন থেকে দিনের বেলায় আর মানুষের কাছে যেতুম না।

দিনের পর দিন কাটে। দু-চার বার ঝড়-বৃষ্টির পাল্লায় পড়ে কষ্ট পেলুম। মনে হল, মানুষের মতন আমারও যদি একটা ঘর থাকত, তবে কী সুবিধাই হত। কিছুদিন পরে একটা সুযোগও জুটল। এক রাত্রে একখানা পুরোনো ভাঙা খালি বাড়ি পেলুম। লুকিয়ে তার ভেতরে ঢুকে বাঁধলুম বাসা। দিনের বেলায় সেখানে শুয়ে শুয়ে ঘুমুতুম আর রাতের অন্ধকারে বাইরে এসে করতুম খাবারের সন্ধান। এই শূন্য বাড়ির ভেতরেই আমার নতুন শিক্ষা শুরু হল!

আমার বাড়ির পাশেই ছিল একখানা ছোটো বাড়ি, দুই বাড়ির মাঝখানে ছিল কেবল হাত-তিনেক চওড়া একটা গলি।

আমি দোতলার যে ঘরখানি ব্যবহার করতুম, তার জানলাগুলো বন্ধ করে রাখতুম—ধরা পড়বার ভয়ে। কিন্তু সেই পুরোনো বাড়ির প্রত্যেক জানলাই ছিল ভাঙা ঝরঝরে। ফাটা পাল্লায় চোখ লাগালে পাশের বাড়ির দোতলার দুটো ঘর দেখা যেত। ও বাড়ির ওপরে দু-খানার বেশি ঘরও ছিল না।

চমৎকার আওয়াজ শুনে উঠে গিয়ে দেখি, একটি অতিপ্রাচীন মানুষ আপন মনে বসে

বসে কী একটা যন্ত্র নিয়ে কী করছেন, আর সুমধুর ধ্বনিতে চারদিক মিষ্টি হয়ে উঠছে। পরে জেনেছি ও যন্ত্রটির নাম বেহালা।

প্রাচীনের কী সুন্দর মূর্তি। মাথায় ধবধবে সাদা রুপোর মতন চিকন লম্বা চুল, মুখেও সাদা লম্বা দাড়ি, গায়ের রংও শুভ্র। তাঁর শান্ত মুখখানি দেখলেই ভক্তি হয়।

তারপরেই চোখ পড়ল প্রাচীনের পাশের দিকে। সেখানে বসে আছে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে, বয়স হবে পনেরো-ষোলো। মেয়েটি আদরমাখা চোখে প্রাচীনের দিকে চেয়ে একমনে বাজনা শুনছিল।

খানিক পরেই ঘরের ভেতরে একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল। তাকেও দেখতে অতি সুন্দর।

বাজনা থামল। তারা তিনজনে মিলে কথা কইতে আরম্ভ করল।

কী বিস্মিতই যে হলুম! তখনও জানতুম না কথা বা ভাষা কাকে বলে! আমি নিজে তখনও কথা কইতে শিখিনি—কথা বলতে বুঝতুম শুধু অর্থহীন শব্দ!

কিন্তু বেশ আন্দাজ করতে পারলুম এরা মুখ দিয়ে যে-সব শব্দ বের করছে সেগুলো যা-তা বা অর্থহীন নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই আরও বুঝলুম, কোনও কোনও শব্দের পরেই তারা হাসে বা দুঃখিত হয় বা অন্যরকম ভাব প্রকাশ করে। ভাবলুম, বাঃ, এ তো ভারী ভালো ব্যাপার।

প্রভু, তোমার কাছ থেকে আমি ভাষা শিখিনি বটে কিন্তু তোমার প্রসাদে আমি পেয়েছি আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি! বোধহয় আমার মতন স্মৃতিশক্তি কোনও মানুষেরই নেই। যে-কথা আমি একবার শুনি তা আর কিছুতেই ভুলি না।

রোজ মন দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতুম আর মনে মনে বোঝবার চেষ্টা করতুম। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হত, তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে শব্দরহস্য স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

কেবল কানে শোনা নয়, প্রত্যেক শব্দ আমিও উচ্চারণ করবার চেষ্টা করতুম। এইভাবে কিছুকাল অভ্যাসের পর ক্রমে ক্রমে আমি কথা কইবার শক্তিও অর্জন করলুম।

এক বছর চেষ্টার পর ভাষার ওপরে আমার মোটামুটি দখল হল। কিন্তু এসব হচ্ছে পরেকার কথা।

প্রথম দিনেই এই সুখী পরিবারটিকে আমার বড়ো ভালো লাগল। কী চমৎকার এদের দেখতে, কেমন মিষ্টি এদের ব্যবহার! অন্ধকার ঘরে ধুলো ভরা মেঝের ওপরে শুয়ে শুয়ে কেবল এদের কথাই ভাবতে লাগলুম। মনের ভেতরে প্রবল ইচ্ছা জাগল, ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। কিন্তু প্রথম দিনেই মানুষদের কাছে গিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা আর ভোলবার নয়। কাজেই সাহস হল না, মনের ইচ্ছা মনেই রইল।

আপাতত ওদের লক্ষ করেই দিন কাটতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে বোঝা গেল, প্রাচীন ব্যক্তিটি হচ্ছেন ঠাকুরদাদা আর ছেলে-মেয়ে দুটি তাঁর নাতি-নাতনি। প্রাচীনের স্ত্রী নেই আর ওদের মা-বাপ বেঁচে নেই। ওরা বড়োই গরিব। মেয়েটি একলাই সংসারের সব কাজ ও দাদুর সেবা করত। ছেলেটি রোজ সকালে খেয়েদেয়ে কোথায় চাকরি করতে যেত—ফিরত সেই বিকালে। তারপর বোনকে নিয়ে রোজ একবার করে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেড়িয়ে আসত। ক্রমে জানলুম ছেলেটির নাম মাধব আর মেয়েটির নাম মাধবী।

দাদুকে বিশেষ চলা-ফেরা করতে দেখতুম না। প্রায় সারাদিনই তিনি জানলার ধারে বসে থাকতেন। যখন চলতেন তখনও কেমন যেন বাধো বাধো পায়ে হাঁটতেন। বেশির ভাগ সময়েই মাধব কি মাধবী তাঁর হাত ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে যেত। প্রথমে এর কারণ বুঝিনি—তারপর আবিষ্কার করলুম, দাদু চোখে একেবারেই দেখতে পান না! তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠত।

দাদুর বেশি সময় কাটত বেহালা বাজিয়ে। কী নিপুণ হাত তাঁর! আমার কানে আর প্রাণে ঝরত যেন স্বর্গীয় সুরের অমৃত! তাঁর বেহালার তান শুনলে আমি পৃথিবীর আর সব ভুলে যেতুম।

যখন ভাষা শিখলুম, তখন নিজে আড়ালে থেকে অনেক ছোটো ছোটো ব্যাপারে আমি তাদের উপকারে লাগবার চেষ্টা করতুম।

মাধব রোজ সকালে উঠে তাদের বাড়ির পিছনকার বন থেকে নিজে কাঠ কেটে আনত। সেই কাঠ জ্বালিয়ে তাদের রান্না হত।

একদিন করলুম কী, রাত-আঁধারে বনে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে মস্ত একবোঝা কাঠ এনে তাদের সদর দরজার সামনে ফেলে রেখে এলুম।

পরের দিন দরজা খুলে এই কাঠের বোঝা দেখে মাধব ও মাধবী বিস্ময়ে অবাক! তারপর এমনি ব্যাপার যখন নিত্যই হতে লাগল, তখন তারা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেল। এই কথা শুনে দাদুও কম অবাক হলেন না। তাদের এই বিস্ময়ের ভাবটি আমি উপভোগ করতুম। শেষটা রহস্য বোঝবার চেষ্টা তারা ছেড়ে দিল।

মাঝে মাঝে ফলমূল শাক-শবজি পেলেও এনে দিতুম। দাদু বলতেন, 'আমরা গরিব বলে আমাদের ওপরে বোধহয় বনদেবতার দয়া হয়েছে।'

মাধব বলত, 'এসব ভূতুড়ে কাণ্ড।'

মাধবী বলত, 'যে-ভূত এত উপকার করে তাকে দেখলেও আমি ভয় করব না!'

শুনে আমার মনে আশা জাগত। ভাবতুম, একদিন হয়তো ওদের সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব হবে! এ কথা ভাবলেও বন্ধুহীন আমার মনে জেগে উঠত পরম সান্ত্বনার ভাব।

একদিন সন্ধ্যার সময় ওদের বাড়িতে এল একটা মহা কুৎসিত লোক। যেমন কালো,

তেমনি মোটা, তেমনি বেঁটে। ম্লান দীপের আলোতে তার মুখের কদর্যতা আমার নজর এড়াল না।

কথাবার্তা শুনে বুঝলুম, দাদু কবে এর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন, ও তাই আদায় করতে এসেছে।

দাদু কাতর স্বরে বললেন, 'মশাই, আর কিছুদিন সবুর করুন। আপাতত আমার অবস্থা তো দেখছেন, এখন টাকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আর কিছুদিন যাক, মাধবের মাইনে বাড়ুক, তারপর মাসে মাসে আপনার টাকা শোধ করব।'

লোকটা গর্জন করে বলে উঠল, 'না, না—আমি আর সবুর করব না। তোমাকে এক মাস সময় দিলুম, এর মধ্যে যদি টাকা না পাই, এ বাড়ি থেকে তোমাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ব!'

সর্বনাশ, দাদু আর মাধব মাধবীকে যদি এখান থেকে বিদায় করে দেয়, তাহলে আমার হাল কী হবে? দুঃখের সাগরে এইটুকু আমার সুখের দ্বীপ, শেষটা কি এর থেকেও বঞ্চিত হব?

দারুণ ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। তখন রাত্রিকাল, আকাশে ফুটেছে চাঁদের আলো।

পাওনাদার যখন রাস্তায়, আমি এক দৌড়ে রুদ্র মূর্তিতে তার সুমুখে গিয়ে হাজির। আমাকে দেখেই তার চক্ষুস্থির, দারুণ আতঙ্কে সে কেবল ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল—একবার চ্যাঁচাতেও পারলে না।

আমি ক্যাঁক করে তার গলা চেপে ধরে তাকে বিড়াল বাচ্চার মতন শূন্যে তুলে দু-একটা ঝাঁকানি মেরে মাটির ওপরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললুম, 'আমি হচ্ছি দাদু আর মাধব-মাধবীর বন্ধু! দাদুকে এ বাড়ি থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলে তোকে খুন করে ফেলব।' এই বলেই অদৃশ্য হলুম।

পরের দিনেই এই ঘটনার কথা বোধহয় ও-বাড়ির সকলের কানে উঠল। কারণ আমি শুনলুম, দাদু উত্তেজিত ভাবে বলছেন, 'বনদেবতা, বনদেবতা! আমাদের ওপরে বনদেবতার দয়া হয়েছে!'

মাধব বলল, 'আশ্চর্য ভূত।'

মাধবী বলল, 'এমন ভালো ভূতকে আমি প্রণাম করি।'

আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ আর একটা ভীষণ আবিষ্কার করলুম।

একদিন একটি নদীর দিকে তাকিয়ে দেখি, জলের ভেতরে ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি! সেই রাক্ষুসে মূর্তিটা দেখেই প্রথমটা ভয়ে আমি চমকে উঠলুম। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারলুম, জলে পড়েছে আমারই ছায়া। আমার চেহারা এমন ভয়াবহ। সমস্ত প্রাণমন হা হা করে উঠল। কিন্তু তখনও আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি, এই চেহারার জন্যে আমার অদৃষ্টে আরও কত দুর্ভোগ লেখা আছে!

একটি সুন্দর সন্ধ্যা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। বসন্ত-বাতাসে ফুলের আতর।

মাধবীকে নিয়ে মাধব বেড়াতে বেরিয়েছে। দাদু জানলার ধারে একলা বসে বেহালার তারে করছেন অপূর্ব সুরসৃষ্টি—তাঁর মুখের ওপরে এসে পড়েছে চাঁদের আলো।

সুর শুনতে শুনতে আমার বুকটাও যেন ভরে উঠল বাসন্তী জ্যোৎস্নায়। প্রাণের আবেগে নিজের ভয়াবহ কদর্যতার কথাও ভুলে গেলুম।

মনে হল, এই হচ্ছে দাদুর সঙ্গে ভাব করবার উপযুক্ত সময়। দাদু একলা, তিনি চোখেও দেখতে পান না। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি!

আমি একেবারে ও বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দাদুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমার ভারী পায়ের শব্দ দাদুর কানে গেল। বাজনা থামিয়ে তিনি বললেন, 'কে?'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আমি বিদেশি। আপনার কাছে একটু বসতে পারি কি?'

মধুর হাসিমাখা মুখে দাদু স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! ভেতরে আসুন। ওই চেয়ারে বসুন।'

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে চেয়ারে না বসে দাদুর কাছেই বসে পড়লুম। কিন্তু কী বলে কথা আরম্ভ করব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলুম।

দাদু বললেন, 'আপনি বিদেশি হলেও আপনার কথা শুনে বুঝছি, আপনি বাঙালি।'

আমি বললুম, 'আমি বাঙালি নই, তবে বাংলা বলতে শিখেছি বটে।'

'কার কাছে শিখেছেন?'

'বাঙালিরই কাছে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক—আমার অন্য কথা আছে।'

'বলুন।'

'দেখুন, আমি কেবল বিদেশি নই—আমি বড়ো হতভাগ্য লোক। আমি সমাজচ্যুত—জাতিচ্যুত। কেউ আমাকে দু-চোখে দেখতে পারে না।'

'বিদেশি, আপনার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে দুঃখিত হলুম।'

'আমি একটি বাঙালি পরিবারকে ভালোবাসি—যদিও সে পরিবারের কেউ আমাকে চেনে না। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তাদের কাছে গেলে যদি তারাও আমাকে ত্যাগ করে! তাদের হারালে আমি পৃথিবীর সব হারাব!'

দাদু বিস্মিত ভাবে অল্পক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বিদেশি, হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আপনার বন্ধুরা নিশ্চয়ই আপনাকে ভুল বুঝবেন না। তাঁরা লোক কেমন?'

'খুব ভালো। কিন্তু আর সকলের মতন তারাও হয়তো কেবল চোখে দেখেই আমাকে বিচার করবে।'

'আপনার বন্ধুরা কোথায় থাকেন?'

'এইখানেই।'

'এইখানেই।'

'হ্যাঁ। দাদু, আপনিই আমার বন্ধু। আমি বড়ো অভাগা, আমার ওপরে দয়া করুন'—বলেই আমি দুই হাতে দাদুর হাত চেপে ধরলুম।

দাদু বিস্মিত চকিত স্বরে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য, কে আপনি?'

আমি কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল মাধব ও মাধবী! আমাকে দেখেই তাদের মুখের ভাব হল যেরকম, তা আর বর্ণনা করা অসম্ভব, মাধবী তখনই অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেল। মাধব ঘরের কোণ থেকে একগাছা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে মরিয়ার মতন ছুটে এসে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার পর লাঠির পর লাঠি মেরে আমার সর্বাঙ্গ জর্জরিত করে তুলল।

ইচ্ছা করলে আমি একটিমাত্র আঘাতে মাধবের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিতে পারতুম। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার হল না। দেহে এবং মনে একসঙ্গে দারুণ আঘাত পেয়ে দাদুর ঘর থেকে আমি বেগে বেরিয়ে এলুম।

॥ দশম ॥

দৈত্যের আত্মকথা চলছে

কেন আমি বেঁচে আছি? এ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী?

কে আমি? কোথা থেকে আমি এসেছি? মানুষরা আমাকে এত ঘৃণা করে কেন?

ঘৃণা! আমি দিতে চাই প্রেম, আর ওরা করবে ঘৃণা! কেন, কেন, কেন?

প্রচণ্ড ক্রোধে ফুলতে ফুলতে এক-একবার মনে হতে লাগল, দি বাড়িসুদ্ধু ওদের ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে ধুলোয় ধুলো করে মিশিয়ে। ওরা যখন করুণ আর্তনাদ করবে, আমি করব তখন উৎকট আনন্দে আকাশ ফাটানো চিৎকার। হ্যাঁ, সে শক্তি আমি রাখি!

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলুম।

প্রভু, তারপর স্মরণ হল তোমাকে। কেন জানি না, মনে হল আমার জন্মের সঙ্গে কোনও রহস্য জড়ানো আছে। আমি পৃথিবীর কোনও মানুষেরই মতন দেখতে নই কেন? মানুষরা আমায় দেখলেই ভয় পায় কেন? তবে কি আমি মানুষ নই? বুঝলুম, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো কেবল তুমি। তৎক্ষণাৎ তোমার সন্ধানে ছুটে চললুম।

আবার সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম—যেখানে প্রথম আমি চোখ মেলে তাকিয়েছিলুম।

রাত তখন অনেক! আমি পা টিপে টিপে তোমার শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঁকি মেরে দেখলুম, তুমি একটা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছ আর দু-পাশে বসে আছে দুজন অচেনা লোক।

হঠাৎ তুমি চিৎকার করে বলে উঠলে, 'এ আমার অদ্ভুত আবিষ্কার। জড়পিণ্ডকে আমি জীবিত করতে পারি। মাটির তাল থেকে গোরস্থানের অস্থি-পিঞ্জর কুড়িয়ে আমি গড়েছি নতুন জাতের এক বৃহৎ মানুষ! আমি হচ্ছি সৃষ্টিকর্তা! আমি মানুষ গড়েছি—না, না, মানুষ গড়তে গিয়ে আমি গড়েছি প্রকাণ্ড এক দৈত্য, আমি গড়েছি মূর্তিমান অভিশাপ!'

কে বললে, 'ডাক্তার, অজয় আবার বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করলে।'

উত্তরে ডাক্তার কী বললে তা আমার কানে গেল না। যেটুকু শুনেছি আমার পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট! আবার ডাক ছেঁড়ে কেঁদে ওঠবার ইচ্ছা হল, কিন্তু প্রাণপণে সে ইচ্ছা সামলে সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলুম!

একেবারে গভীর অরণ্যে! কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে কালো রাত্রি। আকাশের অন্ধকারে সঙ্গে মিশল গিয়ে আমার মনের অন্ধকার। ঝোড়ো বাতাসে সারা অরণ্য করছে গভীর গর্জন। কিন্তু সেই মর্মর গর্জনে জেগে উঠল আমার আহত রক্তাক্ত হৃদয়ের অশান্ত চিৎকার। বনে বনে ছুটে বেড়াই আর করি প্রচণ্ড হাহাকার!

তাহলে আমি মানুষ নই? আমার এ কৃত্রিম দানব দেহ বহন করছে ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম জীবন? আমার স্রষ্টারও মতে আমি হচ্ছি একটা মূর্তিমান অভিশাপ? প্রভু, তোমাকে হাতের কাছে পেলে আমি কী করতুম জানি না—কারণ তখন আমার মনে হচ্ছিল, অরণ্যের গাছগুলোকে পর্যন্ত দুই হাতে উপড়ে ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে দি আকাশে-বাতাসে। সেইদিন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, আমি যখন মানুষ নই তখন মনুষ্য-জাতির কারুকেই আর দয়া ক্ষমা করব না। আর যে স্রষ্টা নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে আমাকে এই অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছেন, তাঁকেও আমি দেব উপযুক্ত শাস্তি!

সারারাত দাপাদাপি করে ভোরের দিকে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেহ আমার পীড়িত হলেও মন হয়েছে কতকটা প্রকৃতিস্থ। বসে বসে ভাবতে লাগলুম, নিজের জন্মরহস্য তো বুঝেছি, এখন আমার কী করা উচিত? মানুষের সমাজে আর আমার আশ্রয় নেই, কিন্তু আমার সমাজ কোথায়? সাধারণ দানব-দৈত্যদেরও সমাজ আছে—কিন্তু আমি যে অসাধারণ! এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে আমি যে সম্পূর্ণ একাকী!

কিছুই স্থির করতে পারলুম না। কেবল এইটুকুই মনে করে রাখলুম, মানুষের ছায়াও আর মাড়াব না—মানুষের কাছে আর আমার কিছুই প্রাপ্তির আশা নেই। আমি হচ্ছি অন্ধকারের আত্মা—আমার ঠাঁই জীবরাজ্যের বাইরে।

তারপর আরম্ভ হল আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা। আজ যেখানে থাকি কাল সেখান থেকে চলে যাই অনেক দূরে। এক জায়গায় বসে দু-দিনের সূর্যোদয় দেখবার ধৈর্য আমার নেই—

এমনি আমার পথের নেশা! আমি যেন ঝোড়ো হাওয়া—হু হু শ্বাসে বিশ্বময় ছুটে বেড়ানোই আমার ধর্ম!

অজানা পথের পথিক হওয়ার সুযোগ পাই কিন্তু কেবলমাত্র রাত্রিবেলায়। মানুষ হচ্ছে দিনের আলোকের জীব, তাদের সঙ্গে চোখাচোখি করবার সাধ নেই।

সমস্ত মধুর অনুভূতি আমার লুপ্ত হয়ে গেল। আমার কাছে সূর্য উত্তাপহীন, চন্দ্র জ্যোৎস্নাহীন, আকাশ নীলিমাহীন, পুষ্পলতা বর্ণহীন। সারা পৃথিবীকে আমি দি অভিশাপের-পর-অভিশাপ! দেহের ভেতরে সর্বদাই জাগে জ্বরের জ্বালা, মনের ভেতরে সর্বদাই মাথা খোঁড়ে অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসার নিষ্ফল আক্রোশ, দৃষ্টি দেখে সর্বদাই ধ্বংসের উৎসব! আমার স্বভাবের সমস্ত সৎগুণ নষ্ট হয়ে গেল—দিনে দিনে আমি হয়ে উঠলুম দানবেরও পক্ষে ভীতিকর মহাদানব!

একদিন এক জায়গায় আমি ভুল করে একটু সকাল সকাল—অর্থাৎ সন্ধ্যার একটু আগে পথে বেরিয়েছিলুম। জায়গাটি নির্জন ছিল বলে ভেবেছিলুম, হয়তো ঘৃণ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না।

নদীর ধারে দেখলুম একটি বাগানের মতন রঙিন ঠাঁই। প্রভু, তুমি আমাকে মানুষ করে গড়োনি, কিন্তু আমার বুকে দিয়েছ দুর্বল মানুষের মন। সেদিনের সবে ওঠা চাঁদ, সুগন্ধ বাতাস আর নদীর কলতান মুহূর্তের জন্যে আমার মনকে করলে অভিভূত। হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে পৃথিবীকে কেমন মিষ্টি লাগল।

পৃথিবীকে মিষ্টি লাগার ফল কিন্তু ভালো হল না। আমি বরাবরই লক্ষ করে দেখেছি এমন বিকৃত কৃত্রিম ভাবের মধ্যে আমার জন্ম যে, মনের মধ্যে মাধুর্য এলেই আমাকে পেতে হয় দুর্ভাগ্যের আঘাত!

একটা ঝোপের পাশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালুম, এমন সুন্দর সন্ধ্যায় মানুষরা কী করছে দেখবার জন্যে।

হঠাৎ একটি ছোট্ট খোকা খেলা করতে করতে আমার সামনে ছুটে এল।

ভাবলুম, এই তো অবোধ শিশু, এর বুকের ভেতরে হয়তো এখনও মানুষী-ঘৃণার জন্ম হয়নি, একে একটু আদর করি।

আমি শিশুর হাত চেপে ধরতেই সে মহা ভয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ভূত! রাক্ষস! ছেড়ে দে—ছেড়ে দে আমাকে।' তার হাত থেকে একখানা ছবি মাটির ওপরে পড়ে গেল।

ছবিখানার দিকে চোখ পড়তেই চিনলুম, তাতে রয়েছে তোমার মূর্তি! হ্যাঁ, তোমার—আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রুর মূর্তি! পরমুহূর্তে আমার মন থেকে সমস্ত মধুর দুর্বলতা মুছে গেল—আবার ফিরে এল আমার দানবত্ব!

কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওখানা কার ছবি?'

শিশু ছটফট করতে করতে বললে, 'আমার দাদার। ছেড়ে দে আমাকে, নইলে বাবাকে ডাকব!'

আমার চিরশত্রুর ভাই এই শিশু! নিজের অজ্ঞাতসারেই তার কণ্ঠের ওপরে আমার হাতের চাপ কঠিন হয়ে উঠল, তারপর শিশুর মৃতদেহ পড়ল আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে!

সেই শিশুর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে অনুভব করলুম নরকের প্রচণ্ড উৎসব। দুই হাতে তালি দিয়ে বিপুল আনন্দে বলে উঠলুম, 'আমিও তাহলে ধ্বংস করতে পারি! শত্রু তাহলে আমার নাগালের বাইরে নেই—এই শিশুর মৃত্যুই এ সত্য তাকে বুঝিয়ে দেবে। এর পরেও তার জন্যে তোলা রইল আরও অনেক শাস্তি। তারপর শত্রু নিপাত।'

তারপর কিছুকাল আমি আর সে দেশ ত্যাগ করলুম না। কারণ আমার মন বললে, এইখানেই আবার আমার নির্দয়, নির্বোধ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

মন ভুল বলেনি। একদিন তোমার দেখাও পেলুম। কিন্তু সেদিন আমি তোমার সামনে যাইনি।

তবে তারপর আর তোমাকে আমার চোখের আড়ালে যেতে দিইনি। দিন-রাত আড়াল থেকে রেখেছি তোমার গতিবিধির ওপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি!

কেন? সেই কথা বলবার জন্যেই আবার এসেছি তোমার কাছে। প্রভু, এই শিশুহত্যা—অর্থাৎ আমার এই প্রথম অপরাধটাই হয়তো তোমার কাছে বড়ো হয়ে উঠবে! কিন্তু এটাকে বড়ো করে দেখবার আগে বিচার কোরো, আমাকে সহ্য করতে হয়েছে কতখানি! তুমি, আমাকে সৃষ্টি করে নিক্ষেপ করেছ আগ্নেয়গিরির গর্ভে!

তোমাকে দোষ সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্যেই আবার তোমার কাছে এসেছি। এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করো। যতক্ষণ না আমার অনুরোধ রক্ষা করবে, ততক্ষণ আমি এ স্থান ত্যাগ করব না। মনে রেখো, এটা কেবল মিনতি নয়, তোমার দয়ার ওপরে আমার দাবি আছে!

॥ একাদশ ॥

দানবের আবেদন

নিজের কাহিনি শেষ করে দৈত্য আমার পানে তাকিয়ে রইল মৌনমুখে।

আমিও নিরুত্তর হয়ে রইলুম। তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আমাকে এতখানি অভিভূত করেছিল যে আমি জবাব দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলুম না।

দৈত্য বলল, 'তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ মনুষ্য-সমাজের মধ্যে। কিন্তু কোনও মানুষই আমার সঙ্গী হতে রাজি নয়। তাই দুনিয়ায় আমি একা। তোমাকে এই ত্রুটি সংশোধন করতে হবে।'

জানতে চাইলুম, 'কেমন করে?'

'আমারই মতন ভয়াবহ এক নারী সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের মতন সে আমাকে কখনওই ঘৃণা করবে না—আমার বউ হতে রাজি হবে। তাহলেই একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তিলাভ করব।'

তার এই প্রস্তাব শুনে আবার জেগে উঠল আমার ক্রোধ। বললুম, 'অসম্ভব! আমি সৃষ্টি করব তোর মতন আবার এক দানবী, আর তারপর তোরা দুজনে মিলে করবি মানুষের ওপর অত্যাচার? না, তা হবে না! দূর হ!'

দৈত্য অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'প্রভু, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার ওপরে সবাই অত্যাচার করে বলেই আজ আমি হিংসুক হয়েছি। এমনকি তুমি পর্যন্ত আমার প্রতি বিমুখ—অথচ আমি হচ্ছি তোমারই সৃষ্টি! আমার কথা যদি না শোনো, তোমার সর্বনাশ করব! শোনো, আমি চাই আমারই মতন কুৎসিত দেখতে একটি স্ত্রী। তাহলে আমরা দুজনেই সুখের জীবন যাপন করতে পারব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, স্ত্রীকে নিয়ে মানুষের বসতি ছেড়ে চলে যাব পৃথিবীর কোনও সুদূর নির্জন প্রান্তে। মানুষের চোখ আর আমাদের দেখতে পাবে না।'

'যদি ফের ফিরে আসো?'

'কখনও না, কখনও না! শত্রুর কাছে ফিরে আসব কীসের মোহে?'

'কে জানে এই অনুরোধ তোমার ছলনা নয়? মানুষকে তুমি ঘৃণা করো। কে জানে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যেই তুমি আবার আমার কাছে এসেছ কি না?'

'প্রভু, আবার তুমি ভুল বুঝছ। আমি যদি আর-একজনের সহানুভূতি পাই তাহলে আবার আমার প্রকৃতি শান্ত হবে। জীব কখনও একলা থাকতে পারে? পশুও যে দোসর চায়!'

নীরবে ভাবতে লাগলুম। দৈত্য যে সত্যকথাই বলছে তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রথমে এর স্বভাব ছিল মিষ্টি, এর প্রাণ ছিল প্রেম ও উদারতায় ভরা। কিন্তু উপকার করতে গিয়ে এ সয়েছে অত্যাচার, ভালোবাসতে গিয়ে পেয়েছে খালি ঘৃণা। তার ওপরে এর শাসানিও তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। চেহারায় আর ক্ষমতায় এর তুলনা নেই। এ বুদ্ধি পেয়েছে মানবের আর শক্তি পেয়েছে দানবের। একে তুষ্ট না করলে এ যদি মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে বাধা দেওয়ায় মতন মানুষ গোটা পৃথিবী খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

বললুম, 'দানব, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হলুম। তোমার বউয়ের মূর্তি গড়ব। কিন্তু তারপর তুমি মানুষের বসতির ত্রিসীমানায় থাকতে পারবে না।'

দৈত্য বিপুল আনন্দে বললে, 'ওই প্রদীপ্ত সূর্য, ওই অনন্ত নীলাকাশ আমার সাক্ষী, একজন সঙ্গী পেলে আমি তাকে নিয়ে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাব।'

'বেশ, তাহলে এখন বিদায় হও।'

'প্রভু, তুমি তবে সৃষ্টি-কার্য শুরু করো। কতখানি উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি যে তোমার কাজ লক্ষ করব তা কেবল আমিই জানি। যেদিন তুমি সফল হবে সেইদিনই আবার আমার দেখা

পাবে! এখন বিদায়!' বলেই সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলে গেল—যদি হঠাৎ আবার আমি মত পরিবর্তন করি, বোধহয় সেই ভয়েই! আশ্চর্য ক্ষিপ্র তার দুই পদ, উঁচু-নিচু পাহাড় পার হয়ে সে অদৃশ্য হল হরিণের চেয়ে দ্রুতগতিতে!

সন্ধ্যার সময়ে বাংলোর বারান্দায় বসে আছি—মনের ভেতর দিয়ে ছুটছে ভাবনার বন্যা!

আবার আমাকে নতুন সৃষ্টি করতে হবে! কিন্তু প্রথম বারের মতন এবারে সৃষ্টির সম্ভাবনায় মন আমার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল না—এ সৃষ্টির সঙ্গে আর আমার প্রাণের যোগ নেই...

পরদিন সকালে বাবার এক পত্র পেলুম।

বাবা লিখেছেন—

'স্নেহাস্পদেষু,

অজয়, আশা করি বায়ু পরিবর্তনের ফলে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। আমার সমস্ত চিন্তাই এখন তোমাকে নিয়ে, কারণ আজ এ পৃথিবীতে আমার আত্মজ বলতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই তোমার ভালোমন্দের ওপরে নির্ভর করছে আমার সুখ-দুঃখ।

তুমি জানো, সংসারের হিসাবের খাতা মোড়বার বয়স আমার হয়েছে। একে বার্ধক্যের ভার হয়ে উঠেছে অসহনীয়, তার ওপরে অশোকের শোচনীয় মৃত্যু। আমার দেহের আর মনের শেষ শক্তিটুকু হরণ করে নিয়েছে। আমি দিনের পর দিন গুনছি জীবন্ত শবের মতো—এখন যেকোনও মুহূর্তে আসতে পারে পরকালের ডাক!

কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার আগে আমার একটি শেষ কর্তব্য আছে। তা পালন না করলে আমার আত্মা পরলোকে গিয়েও শান্তিলাভ করবে না। আমার বন্ধুকন্যা মমতার ভার রয়েছে আমার ওপরে। মৃত্যুর আগে তার একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই।

সে ব্যবস্থা কী, তুমি জানো। মমতাকে এতদিন আমি রক্ষা করেছি কেবল তোমার জন্যেই, একথা কারুর অবিদিত নেই। মমতাকে কেবল লালন-পালন নয়, আমার পুত্রবধূ করব, বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় এমন প্রতিজ্ঞাও আমি করেছি। আর মমতা যে সবদিক দিয়েই তোমার যোগ্য, একথাও বলা বাহুল্য।

বাবা অজয়, এর চেয়ে বেশি আর কী বলব? মমতা তোমার জীবনযাত্রার পথ মধুময় করে তুলুক, এই আমার একমাত্র কামনা।

আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তোমার উত্তর পেলেই শুভ-বিবাহের দিন স্থির করে ফেলব। ইতি—'

উত্তরে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ মমতা যে আমার স্ত্রী হবে, একথা বহুদিন হতেই শুনে আসছি।

তামিল করছি কি না! তাহলে আমি এখন বিজ্ঞানের ছাত্র নেই, একটা অমানুষের খেয়াল চরিতার্থ করবার যন্ত্র মাত্র!

তখনই স্বপ্ন ছুটে গেল! আর কাজ করতে ভালো লাগল না। গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

বাইরে গিয়ে কিন্তু জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না। সূর্য অস্তে যাওয়ার আয়োজন করছে—পশ্চিম আকাশে বিচিত্র রঙের প্রদর্শনী শুরু হতে আর দেরি নেই।

দূরে গঙ্গার ওপরে নীলাকাশে শুভ্র বেলফুলের মালার মতন বকের সারি উড়ে যাচ্ছে কোন বনে কোন তরুকুঞ্জে রাতের বাসার সন্ধানে।

একখানা পাথরের ওপরে বসে পড়লুম, হঠাৎ মনে জাগল এক নতুন ভাবনা।

একদিন মনের ভুলে জ্ঞানান্ধ হয়ে গড়েছিলুম এক ভীষণ দানব—যে আজ আমার সমস্ত জীবনকে করে তুলেছে দুঃস্বপ্নময়! আমার সহোদর—এতটুকু শিশু অশোক পর্যন্ত যার হিংসার চিতায় করেছে আত্মদান!

আজ আমি আবার তারই জন্যে তৈরি করতে বসেছি নতুন এক দানবীর দেহ। কারণ তার দাবি, এই দানবী তার দোসর হবে!

সে প্রতিজ্ঞা করেছে, দানবীকে লাভ করলে আর মানুষের কাছে ফিরে আসবে না। দানবের প্রতিজ্ঞার মূল্য থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।

কিন্তু আজ যে দানবীকে গড়ছি, তার প্রকৃতি কীরকম হবে আমি তা জানি না। হয়তো সে হবে দানবের চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক, ঢের বেশি হিংস্র। সে আমার কাছে কোনও প্রতিজ্ঞার বন্ধনে বাঁধা থাকবে না। দানবী যদি মানুষের শত্রু হয়, আমি তাকে কেমন করে নিবারণ করব?

কুৎসিত হলেই সে কুৎসিতকে পছন্দ করবে, এমন কোনও কথা নেই। হয়তো দানবী পছন্দ করবে না দানবকে। তখন দুজনেই ধেয়ে আসবে হয়তো মানুষের দেশে, নিজেদের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে।

কিন্তু তার ওপরেও দুশ্চিন্তার কারণ আছে। এই দানব আর দানবীর সন্তান হবে—তারপর বছরে বছরে জন্মগ্রহণ করবে তাদেরও বংশধর এবং তারা কেউ হবে না আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভবিষ্যতে দলে দলে দানব-দানবী এসে যদি মানুষদের আক্রমণ করে—চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় ধ্বংস আর মৃত্যু, কে তখন তাদের বাধা দেবে? হয়তো একদিন তারা পৃথিবী থেকে মানুষ-জাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত করে দেবে!

দানবের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শেষটা কি আমাকেই হতে হবে মানুষ-জাতির ধ্বংসের কারণ? তখন যে আমার ধিক্কারনিনাদে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস হয়ে উঠবে শব্দিত! ভাবতে ভাবতে আমি শিউরে উঠলুম!

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখলুম, পূর্ণিমার আলো ঝকমক করছে চারদিকে।

কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্না তখনই পরিম্লান হয়ে গেল—যখন দেখলুম একটা অতিকায় মূর্তি আমায় লক্ষ করতে করতে হঠাৎ পাহাড়ের একটা শিখরের আড়ালে হল অদৃশ্য!

তাহলে দানবও আমায় বিশ্বাস করে না! নইলে কেন এত লুকোচুরি? নিশ্চয় তার অবিশ্বাসের মূলে আছে ক্রূর কপটতা! সে আমায় পেয়েছে তার হাতের খেলনা। দানবীকে লাভ করলেই ধারণ করবে নিজের বিভীষণ মূর্তি! তখন আমি তো মরবই—সঙ্গে সঙ্গে মরবে নির্দোষ মানুষরাও!

নিশ্চয় আমি পাগল! দানবের কাছে অঙ্গীকার! এর কোনোই মূল্য নেই!

তখনই ঝড়ের মতন ছুটে আবার গুহার ভেতরে গিয়ে ঢুকলুম। টেবিলের ওপরে শুয়েছিল দানবীর বিপুল মূর্তি—কিন্তু তখনও জীবনহীন। একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে আমি তখনই নিজের হাতে যত্নে গড়া সেই মূর্তিকে করলুম খণ্ড-বিখণ্ড।

তারপরেই পিছনে শুনলুম একটা ভয়াবহ চিৎকার। ফিরেই দেখি, দানব এসে দাঁড়িয়েছে আমার সম্মুখেই।

মেঘের মতন গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, 'আমার সঙ্গীর মূর্তি তুমি ভেঙে ফেললে! তোমার ইচ্ছেটা কী শুনি? তুমি কি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাও? সারাজীবন আমি কষ্ট স্বীকার করে এসেছি—কেবল তোমার খেয়ালের জন্যেই! এত যাতনার পর তুমি কি আমার শেষ আশার বাতিও নিবিয়ে দিতে চাও?'

প্রচণ্ড ক্রোধে পাগলের মতন হয়ে আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'দূর হ, দূর হ! পৃথিবীকে—মানুষ জাতিকে ধ্বংস করবার জন্যে আবার আমি তোর মতন কিংবা তোর চেয়ে একটা সৃষ্টিছাড়া মূর্তিকে সৃষ্টি করব? দূর হ, দূর হ!'

দানবের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ভীষণ এক উত্তেজনায়—তার দেহ হঠাৎ হয়ে উঠল সোজা, তার দুই হাত হল মুষ্টিবদ্ধ। মনে হল সে আমায় আক্রমণ করতে চায়! কিন্তু কোনওরকমে সে ভাব সামলে দানব বললে, 'গোলাম, দেখছি তোমার কাছে যুক্তির বা প্রতিজ্ঞার কোনোই মূল্য নেই! উত্তম! শক্তিমান হচ্ছি আমিই! তোমাকে আমি খণ্ডবিখণ্ড করে লুপ্ত করতে পারি! তুমি নাকি আমার সৃষ্টিকর্তা? কিন্তু আজ আমিই তোমার প্রভু! পালন করো আমার হুকুম। ভাবছ আমার চেয়েও তুমি হতভাগ্য? কিন্তু তোমাকে আমি দুর্ভাগ্যের এমন চরম সীমায় নিয়ে যেতে পারি, যেখানে গিয়ে তুমি ভাববে সূর্যের পবিত্র আলোকও ঘৃণাকর!'

আমি হা হা করে হেসে বলে উঠলুম, 'চমৎকার! যা খুশি বলতে চাও, বলো—আর আমি অস্থির হব না! তুই আমাকে ভয় দেখাতে চাস? কিন্তু আমি ভয় পাব না, আমি মানুষদের ধ্বংস করবার জন্যে তোর মতন আর দ্বিতীয় মূর্তি সৃষ্টি করব না। দূর হ এখান থেকে—তোর গর্জন বা অনুরোধ, কিছুই আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না!'

রাক্ষসের মুখ-চোখ যেরকম করে উঠল, ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। আমি ভাবলুম,

সে বুঝি আমায় আক্রমণ করবে! কিন্তু সে কোনওরকমে আবার নিজেকে সামলে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'আমি সব খবর রাখি! তুমিও এত সঙ্গী থাকতে আবার বিয়ে করবে? পশুরও সঙ্গী আছে! আর আমি একলাই কেবল সঙ্গীহীন হয়ে এই পৃথিবীর মরুভূমির ওপরে পাগলের মতন ছুটে বেড়াব? ধিক তোমাকে!...এর পরে আর আমাকে কোনও দোষ দিয়ো না। মানুষ! আমি তোমায় ঘৃণা করি! আমি নরকের আগুনে জ্বলব, আর তুমি পরম সুখে জীবন যাপন করবে? কখনও নয়, কখনও নয়। আমি তো একদিন মরবই—কিন্তু তার আগে তোমায় মারব! আজ থেকে গোখরো সাপের মতন তোমার ওপর দৃষ্টি রাখব, তারপর দংশন করব একদিন। মানুষ! তোমাকে আমি শিক্ষা দেব!'

তার বড়াই শুনে আমার রাগ আরও বেড়ে উঠল। চিৎকার করে বললুম, 'শয়তান, চুপ কর! আর এখানকার বাতাসকে বিষাক্ত করিসনি। যা বলবার, আমি তা বলেছি। তোর কথায় আর আমি মত বদলাব না। চলে যা এখান থেকে!'

'বেশ, বেশ। তাহলে এই কথাই রইল। আমি আবার আসব তোমার বিবাহের রাত্রে।'

আমি উন্মত্তের মতো তার দিকে ছুটে গেলুম, কিন্তু তাকে ধরতে পারলুম না। চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? তার আগে ভেবে দ্যাখ, তুই নিজেই নিরাপদ কিনা!'

কিন্তু কার সঙ্গে আমি কথা কইছি? আমি কিছু বলবার আগেই দানবের মূর্তি হয়েছে অদৃশ্য!

চারদিক আবার চুপচাপ। নিষ্ফল আক্রোশে আমি গুহার ভেতরে পায়চারি করতে লাগলুম।

যদি তাকে ধরতে পা ম! কেন তাকে পালাতে দিলুম? কেন লোহার ডান্ডা মেরে গুঁড়িয়ে দিলুম না তার মাথাটা!

আমার বিবাহের রাত্রে আবার তার আবির্ভাব হবে! তার মানে, সেইদিনই সে আমাকে হত্যা করবে! তার বউ জুটল না, অথচ আমি বিবাহ করব—এই হচ্ছে তার অভিযোগ! কী স্পর্ধা! সে কি ভাবছে তার মতন একটা জন্তুর ভয়ে আমি বিবাহ করব না? দেখা যাক।

পরদিন দু-খানি পত্র পেলুম। একখানি প্রণবের, একখানি বাবার।

প্রণব জানিয়েছে, অনেকদিন আমাকে না দেখে তার মন কেমন করছে, তাই খুব শীঘ্রই এখানে এসে হাজির হবে।

বাবা জানিয়েছেন, দুই মাস পূর্ণ হতে আর দেরি নেই। অতএব পরের মাসের দশ তারিখে তিনি আমার বিবাহের দিন ধার্য করতে চান।

পত্রোত্তরে বাবাকে আমার সম্মতি জানালুম। কিন্তু সম্মতি জানাবার সময় এ কথাও মনে হল, বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান দানবের কথা, তাহলে আর কি ওই তারিখে আমার বিবাহ দিতে চাইবেন?

দিন-তিনেক কেটে গেল নানা দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে। তারপর এ জায়গাটা আর ভালো লাগল না—দানবের আবির্ভাবের পর থেকেই এখানকার বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে! স্থির করলুম, আবার দেশে ফিরে যাব। কিন্তু তার আগে একটা কাজ শেষ করে যেতেই হবে।

গুহার ভেতরে এখনও পড়ে আছে দানবী মূর্তিটার ধ্বংসাবশেষ। আমি চলে যাওয়ার পর যদি কেউ এই দেহাবশেষ আবিষ্কার করে তবে বিশেষ গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। তার ফলে নানা খবরের কাগজে রাক্ষসী হত্যা নিয়ে হরেকরকম চমকদার গল্প পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে।

সে অভিশপ্ত গুহার ভেতরে আর ঢোকবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবু কোনওরকমে বিদ্রোহী মনকে সংযত করে আবার গুহার মধ্যে প্রবেশ করলুম।

চারদিকে ছড়ানো রয়েছে যেন কোনও রক্তমাংসে গড়া মৃতদেহের খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নিজেকে মনে হল হত্যাকারী বলে!

দেহের ভগ্ন-চূর্ণ অংশগুলো একটা মস্তবড়ো থলের ভেতরে ভরে ফেললুম। যন্ত্রপাতি যা ছিল সব পুরলুম বাক্সের ভেতরে।

সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ধারে গিয়ে একখানা জেলে ডিঙি ভাড়া করলুম। বললুম, 'আমার গঙ্গায় বেড়াবার শখ হয়েছে। আমি নিজেই নৌকা বাইব; সঙ্গে তোমাদের কারুকেই থাকতে হবে না।'

রাত্রি হল। আমার ভয়াবহ বোঝা নিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলুম।

কী সুন্দর চন্দ্রালোক! আকাশ জ্যোৎস্নায় ঝলমল, গঙ্গাকেও মনে হচ্ছে যেন জ্যোৎস্নাপ্রবাহ। খানিক তফাতে জলের ওপরে জেগে আছে একটি বালুচর—যেন রুপোলি দ্বীপ, পরিদের খেলার জমি!

ছোটো একখানা মেঘ ভেসে এসে চাঁদের মুখে পরিয়ে দিলে ঘোমটা। সেই ফাঁকে রাক্ষসীর দেহকে দিলুম বিসর্জন। সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে চারদিক কেঁপে উঠল ভীষণ এক হাহাকারে! আমার বুক কাঁপতে লাগল—কে কেঁদে উঠল অমন করে?...ও কি সেই দানব? তার শেষ আশা লাভ করল সলিল সমাধি? তাই কি এই ক্রন্দন? তাহলে সে এখনও আমার কার্যকলাপ লক্ষ করছে? কিন্তু কোথায় সে? চারদিকে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু কোথাও তাকে আবিষ্কার করতে পারলুম না।

আর কিছুক্ষণ গঙ্গায় বেড়িয়ে নৌকো নিয়ে ফিরলুম। ডাঙায় নৌকো লাগার সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম আবার এক করুণ আর্তনাদ—তারপরেই অনেক লোকের গোলমাল আর ছুটোছুটি!

কারা চ্যাঁচাতে লাগল, 'খুন! খুন! পুলিশ, পুলিশ!'

ছুটে সেইদিকে গেলুম। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, রাস্তার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা দেহ। আমি দেহটাকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই সচমকে চিৎকার করে উঠলুম।

এ যে আমার বন্ধু প্রণব! তার কণ্ঠের ওপরে মোটা মোটা অমানুষিক আঙুলের চিহ্ন!

'প্রণব—প্রণব, আমাকে বন্ধুহীন করবার জন্যে দানব শেষটা তোমাকেও বলি দিলে—' বলতে বলতে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লুম।

॥ ত্রয়োদশ ॥

বিবাহের রাত্রে

সেই মর্মভেদী ঘটনার পর কেটে গেল তিন মাস। বলা বাহুল্য এখনও আমার বিবাহ হয়নি।

প্রণবের মৃত্যু আমার প্রাণে যে কী আঘাত দিয়েছিল, সেকথা আপনি অনায়াসেই অনুমান করতে পারবেন। তার শোক কি জীবনেও ভুলব? কিন্তু থাক—আমার শোক আমার মনের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাক, শিশুর মতন জনতাকে আমি কান্না শোনাতে চাই না।

প্রণবকে বাবাও মনে করতেন পুত্রের মতো। তাঁরও বুকে যে কতটা বেজেছে, আমি তা জানি। তিনিই পিছিয়ে দিলেন আমার বিবাহের দিন।

দানব, পিশাচ, রাক্ষস! আমার বুকে জাগছে কেবল এইসব নাম। দৈত্য অশোককে হত্যা করেছে, প্রণবকে হত্যা করেছে, আমাকেও হত্যা করতে চায়! যারা আমার আনন্দের নিধি আগে আমাকে তাদের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত করে তারপর দেবে আমার ওপরে দৃষ্টি—দৈত্যের এই অভিপ্রায়! আগে আমাকে মরমে মেরে তারপর সে আমার দেহকে ধ্বংস করবে! কী পৈশাচিক মনোবৃত্তি!

কিন্তু আমি তাকে ভয় করি না! আমিও প্রস্তুত—তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে! না, না, তাও নয়—সে কবে আসবে বলে আমি প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে চাই না—আমি চাই তাঁকেই খুঁজে বার করতে। নিশিদিন আমার চিত্ত তার নিকটস্থ হওয়ার জন্যে অধীর হয়ে আছে। এবার যেদিন আমাদের দুজনের দেখা হবে সেদিন হবে একটা রক্তাক্ত, প্রচণ্ড দৃশ্যের অবতারণা! সেদিন একটা যবনিকা পড়বেই—হয় আমার, নয় তার জীবন-নাট্যের ওপরে! আজ আমারও প্রতিহিংসার ক্ষুধা তার চেয়ে কম জাগ্রত নয়!

এক-একদিন প্রাণের আবেগে বেরিয়ে পড়ি গভীর রাত্রে। তার মুখেই শুনেছি, সে নিশাচর। দুই পকেটে দুই গুলি ভরা রিভলভার নিয়ে খুঁজে বেড়াই চারদিকে—ঘাটে-বাটে-মাঠে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে উপত্যকায়, উপত্যকায়, গহন বনের আনাচে-কানাচে, যেখানে তার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা! আমি বিলক্ষণই জানি, আমার ওপরে নজর রাখবার জন্যে আমাকে ছেড়ে থাকবে না সে বেশিদূরে। কিন্তু তবু সে থাকে চোখের আড়ালে, আমার নাগালের বাইরে!

কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে! এমনকি, অনুভব করি যেন তার রক্তপিপাসী হিঁসকুটে খরদৃষ্টির স্পর্শ পর্যন্ত! আমার চোখে সে অদৃশ্য হলেও তার চক্ষে আমি দৃশ্যমান হয়েই আছি, এই অপ্রীতিকর সত্যটা সর্বদাই আমার মনকে খোঁচা দিতে থাকে!

তারপর বাবা আবার বিবাহের দিন স্থির করতে উদ্যত হলেন।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আরও কিছু দিন সময় দিন। অশোক আর প্রণবকে খুন করেছি আমিই। আগে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

বাবা উৎকণ্ঠিত চোখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'অজয়, তুমি কি অসুস্থ? পাগলের মতন যা তা কী বলছ?'

'বাবা, আমি পাগল নই—অসুস্থও নই। অশোক আর প্রণবকে যে খুন করেছে তাকে আমি চিনি। এও জানবেন যে ওরা আমার ভাই আর বন্ধু না হলে আজ মারাও পড়ত না। তাই অনুতাপে বুক আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। খুনিকে শাস্তি না দিয়ে বিবাহ করতে আমার মন উঠছে না।'

'কে এই পাষণ্ড খুনি? তার নাম বলো, এখনই আমি শাস্তির ব্যবস্থা করছি। ইংরেজ রাজ্যে পুলিশ আর আদালতের অভাব নেই।'

'বাবা, আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নেই। কিন্তু এ হচ্ছে এমন সাংঘাতিক গুপ্তকথা, যা আপনারও কাছে বলা উচিত নয়।'

বাবা অল্পক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, 'অজয়, তুমি আমাকে চেনো। পুত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অভ্যাস আমার নেই। তোমার গুপ্তকথা জোর করে আমি জানতে চাই না। কিন্তু তোমারও উচিত পিতৃকৃত্য পালন করা। আমি স্থির করেছি, আসছে হপ্তায় পাঁচ তারিখে তোমার বিবাহ দেব।'

'বাবা।'

'চুপ। আসছে হপ্তায় পাঁচ তারিখে মমতার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।'

বাবা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি বাবাকে জানি, আর তাঁর কথার নড়চড় হবে না।

কিন্তু আমারও বোঝাবার উপায় নেই এবং বাবাও বুঝতে পারলেন না, তিনি আমার বিবাহের দিন নয়—স্থির করে গেলেন আমার মৃত্যুর দিন!

...বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হল। বিপুল আয়োজন! বাবা নাকি আমার বিবাহে খরচ করবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। কত লোকের নিমন্ত্রণ যে হল তার সংখ্যা আমি জানি না। যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠসংগীত, বাইজির নাচ। তার ওপরে দিনে যাত্রা আর রাতে থিয়েটার! খাবারের যে ফর্দ তৈরি হল তা দেখলেও ভোজনবিলাসীদের জিভ দিয়ে পড়বে টপ টপ করে জলের ফোঁটা।

পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে বাবা বোধহয় পৃথিবীকে চমকে দিয়ে যেতে চান!

পৃথিবী কতখানি চমকাবে জানি না, কিন্তু থেকে থেকে সচকিত হয়ে উঠছে আমারই মন।

দৈত্য বলে গেছে, তার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমার বিবাহের রাত্রে!

এবং সে হয়তো জানে না, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমিও রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে আছি!

আজ বিবাহের দিন। কিন্তু আমার বরসজ্জার আড়ালে অপেক্ষা করছে দু-দুটো ছ'নলা রিভলবার! এমন সশস্ত্র ও হত্যার জন্যে তৈরি হয়ে কোনও বর্বরও বোধহয় বিবাহের মন্ত্র পড়ে না।

মন্ত্র পড়লুম। বিবাহ হয়ে গেল। হিন্দুর বিবাহের দিনে বরকে সারাদিন অভুক্ত থাকতে হয়। রাত্রে বাসর-ঘরে প্রবেশ করবার আগে ডাক পড়ল আমার, আহার করবার জন্যে।

খেতে বসেছি। কানে আসছে সানাইয়ের সাহানা রাগিনী; আর এক জায়গা থেকে 'অর্কেস্ট্রা'র সুর সৃষ্টির চেষ্টা; অন্য কোথায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে নর্তকীর নূপুর ধ্বনি; এবং এরি মধ্যে সমান সজাগ হয়ে আছে অসংখ্য কণ্ঠের প্রচণ্ড কোলাহল—খেতে খেতে ভাবছি এই বিশ্রী অনৈক্য তানকে কী করে লোকে মহোৎসব বলে মনে করে।

আচম্বিতে বাড়ির সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো গেল নিবে—সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল নাচ গান বাজনার শব্দ। চারদিকে উঠল বিকট হইহই রব—আকাশ গেল যেন বিদীর্ণ হয়ে!

সকলেরই মুখে উচ্চকণ্ঠের জিজ্ঞাসা, 'কী হল, কী হল, কী হল?' কেবল জিজ্ঞাসা, কোনও উত্তর নেই।

কিন্তু অন্তঃপুরে উঠল বহু নারী কণ্ঠের আর্তনাদ! মনে হল, এ শব্দ আসছে বাসর ঘরের ভেতর থেকেই!

কোনওরকমে একটা 'টর্চ' সংগ্রহ করে অন্তঃপুরের দিকে ছুটলুম।

বাসর ঘরের দরজার কাছে কারা তিন-চারটে হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিশ-পঁচিশ জন মেয়ে গোলমাল ও হাহুতাশ করছে সেইখানে দাঁড়িয়েই।

মেয়েদের ভেতরে পথ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে স্তম্ভিত চোখে দেখলুম, রাঙা চেলির কাপড় পরে নববধূ মমতা মাটির ওপরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে আছে...নরম ফুল দিয়ে গড়া অপূর্ব প্রতিমার মতো। তার কণ্ঠের ওপরে কতকগুলো অমানুষিক আঙুলের চিহ্ন!

তাহলে এই ছিল দৈত্যের মনে? বিবাহের রাত্রে আমাকে নয়, মমতাকে হত্যা করবার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতই সে দিয়ে গিয়েছিল আমাকে?

এবং এই খবর শুনে সেই রাত্রেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বাবার মৃত্যু হল!

আমি একা! দুনিয়ায় আমি একা—আমার স্বহস্তে সৃষ্ট দানবেরই মতন একা!

॥ চতুর্দশ ॥

অভিযান

আমি একা।

পৃথিবীর সব কথা ভুলে গিয়েছি—মনে জাগছে খালি এক চিন্তা। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই! দৈত্যকে বধ করতে হবে।

কিংবা সে করবে আমাকে বধ। দুনিয়ার আমাদের দুজনের ঠাঁই নেই।

অশোক, প্রণব, মমতা—যাদের নিয়ে ছিল আমার ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন, দৈত্য একে একে তাদের কেড়ে নিয়েছে। আবার বাবারও মৃত্যুর হেতু সে।

আমারও বাঁচবার সাধ নেই। কিন্তু কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই আমার বাঁচা দরকার।

নদীর ধারে বসে বসে এইসব ভাবছি। হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে শুনলুম উৎকট অট্টহাসি!

তারপর শোনা গেল তার উল্লসিত কণ্ঠস্বর; 'অজয়, আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আজ তোমাকে করেছি আমারই মতন দুঃখী। কিন্তু তোমাকে আমি বাঁচিয়েই রাখব! দুঃখকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে আমি মরতে দেব না!'

বেগে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলুম। কিন্তু তিন চারটে আশ্চর্য লাফ মেরে সে আবার কোথায় অদৃশ্য হল।

কিন্তু তারপর আরম্ভ হয়েছে আমার যে অভিযান, এর সমাপ্তি কোথায় জানি না! কখনও বনে বনে, কখনও মাঠে মাঠে, কখনও পাহাড়ে বা মরুভূমিতে বা নদীপথে ছুটে বেড়াচ্ছি আমি শত্রুর সন্ধানে! কখনও দূরে তার মূর্তি দেখি, কখনও তার সাড়া পাই এবং কখনও বা মাটির ওপরে পাই তার পদচিহ্ন! এমনি করে সে আমাকে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে দেশে দেশে। কিন্তু সে যেন আলেয়া, দেখা দিলেও ধরা দেয় না।

কতদিন শহরে বাস করিনি—সভ্যতার সংস্পর্শে আসিনি। কতদিন আহার জোটেনি। কতদিন বনের পশুপক্ষী মেরে অসভ্যের মতন আগুন পুড়িয়ে খেয়েছি। জীবন হয়ে উঠেছে ঘৃণ্য, দুঃসহ! একমাত্র আনন্দের স্বাদ পাই কেবল নিদ্রায়। স্বপ্নে দেখি আবার প্রিয়জনদের মুখ!

মাঝে মাঝে দীর্ঘকাল তার সাক্ষাৎ না পেয়ে যখন হতাশ হয়ে পড়ি, তখন সে নিজেই আবার তার সন্ধান দেয়! হয়তো পাহাড়ের ওপর বা গভীর অরণ্যের ভেতরে লুকিয়ে সে চিৎকার করে বলে,—'অজয়, নিরাশ হোয়ো না, আমি আছি! আমার ইচ্ছা, চিরদিন ভবঘুরের মতন তুমি ছুটোছুটি করে বেড়াও! আমি জানি আজ দু-দিন তুমি উপোসি।

তোমার জন্যে এখানে একটা খরগোশ মেরে রেখে গেলুম। পুড়িয়ে খেয়ো—না খেলে আমার পিছনে ছুটবে কেমন করে? এসো শত্রু, আমার অনুসরণ করো, এখনও আমাদের শেষ যুদ্ধের দেরি আছে!'

কিছুদিন আগে সে আবার আমাকে শুনিয়ে বললে, 'এইবার আমি হিমালয়ে বেড়াতে যাব। অতএব প্রস্তুত হও! সে হচ্ছে বরফের দেশ, সেখানে পদে পদে তুমি কষ্টভোগ করবে, আর তোমার যন্ত্রণা দেখে আমি করব আনন্দলাভ!'

হিমালয়েই যেতে হল! দিনে দিনে ওপরে উঠছি, উঠছি, উঠছি। ক্রমে এত ওপরে উঠলুম যে নীচের দিকে তাকালে দেখি, মেঘের পর মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কষ্ট যা পেয়েছি তা আর বলবার নয়। দেহের রক্ত জমে গিয়েছে, বরফের ঝড় মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার মতন হয়েছে। আর অনাহারে থেকেছি যে কতদিন, তার হিসাব নেই।

কেবলমাত্র প্রতিহিংসার ঝোঁকেই সহ্য করতে পেরেছি এই দারুণ পথকষ্ট। আঙুল যখন খসে পড়বার মতন হয়েছে, তখনও আমি ফিরিনি, বসিনি বা দাঁড়াইনি—ছুটে আর ছুটে চলেছি। আমি যেন কালবৈশাখীর মেঘ, ধেয়ে চলাই আমার ধর্ম। কিন্তু দানব এখনও আমাকে ধরা দেয়নি। দেখি, সে আরও কত দূরে যায়?

সুন্দরবাবু, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এইবারে হয়তো সব ছুটোছুটির শেষ হবে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আর আমার দেহের শক্তি নেই। বোধহয় আমার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। হয়তো সে বাঁচবে আর আমি মরব।

কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি? আপনাকেও আমার মতন ভবঘুরে হতে বলি না, কিন্তু যদি কখনও আমার মৃত্যুর পর দানবের দেখা পান, তাহলে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবেন না, ছেড়ে দেবেন না। হত্যা করবেন, তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করবেন। তাহলে আপনি লাভ করবেন আমার আত্মার আশীর্বাদ।

(অজয়ের কাহিনি সমাপ্ত)

উপসংহার

সুন্দরবাবুর কথা

অজয়বাবু একদিনে তাঁর এই অদ্ভুত কাহিনি বলতে পারেননি। একটানা কথা বলবার শক্তি তাঁর ছিল না। বলতে বলতে শ্বাসকষ্টে তাঁর কণ্ঠ মৌন হয়েছে বহুবার।

তাঁর শরীরের অবস্থা ক্রমেই বেশি খারাপ হয়ে এল। ঔষধ-পথ্য, যত্ন-সেবা কিছুতেই ফল ফলল না, একদিন মধ্যরাত্রে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুর আগের দিনেই বোঝা গিয়েছিল অজয়বাবুর আর কোনও আশা নেই।

তাঁকে ডেকে বললুম, 'আপনার জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই যে এতবড়ো আবিষ্কার লুপ্ত হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না। মানুষ সৃষ্টির উপায় আর উপাদান আমাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হত।'

কষ্টে নিশ্বাস টানতে টানতে অজয় বললেন, 'নতুন জীবন সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের কর্তব্য। ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে এটা হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা। আমি এ মারাত্মক খেলায় হেরেছি, গুপ্তকথা জানলে আপনিও জিতবেন না। সুতরাং ও-আগ্রহ দমন করুন। আমিও অন্তিম মুহূর্তে সেকথা প্রকাশ করে পৃথিবীর সর্বনাশ করে যাব না।'

মৃত্যু যাতনার মধ্যেও প্রাণপণে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'সুন্দরবাবু, দানবকে যদি দেখতে পান, তখনই হত্যা করবেন। তাতে কোনও পাপ হবে না। আমার মৃত্যুর পরে সে হয়তো আবার নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে পারে। তাকে হত্যা করলে জগতের মহা উপকার হবে।'

এই তাঁর শেষ কথা।

পরদিন তাঁর দেহের সৎকার হবে।

কিন্তু রাত তখন ফুরিয়ে এসেছে, হঠাৎ অজয়বাবুর তাঁবুর ভেতরে কেমন একটা শব্দ হল। আমি চুপি চুপি তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ভেতরে এককোণে লণ্ঠন জ্বলছিল, তারই ক্ষীণ আলোকে দেখলুম একটা চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

অজয়বাবুর মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে একটা বিরাট দানব দেহ। তার মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, তার গায়ের রং মড়ার মতন এবং তার লোমাবৃত সারাদেহ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল একটা বন্য বীভৎসতা! বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে আমার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে গেল!

কান্নাভরা গলায় সে থেমে থেমে বলল, 'অজয়, অজয়—আমার প্রভু, আমার স্রষ্টা! তোমাকেও আমি বধ করলুম। তোমার ওপরে, আমি অনেক নির্যাতন করেছি বটে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি! দুনিয়ার কোনও মানুষই আমার কেউ নয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে ছিল যে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক! তুমিই যে আমার ঈশ্বর, আমার হর্তাকর্তাবিধাতা, আমার সব! অভিমানে বিদ্রোহী হয়ে আমি অন্যায় করেছি—অজয়, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার মৃত্যুর পর আমার জীবনের আর কোনও সার্থকতাই রইল না। তোমার কাছ থেকে—মানুষজাতির কাছ থেকে আমিও আজ চিরবিদায় গ্রহণ করলুম।'

দানব মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলে। পরমুহূর্তে সে প্রচণ্ড বেগে তাঁবুর বাইরে এসে পড়ল এবং কোথায় মিলিয়ে গেল শেষ রাতের অন্ধকারে!

অজয়ের শেষ অনুরোধ মনে পড়ল। কিন্তু আমি এমনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম যে, দানবের বিরুদ্ধে একটা আঙুল পর্যন্ত তুলতে পারলুম না।

আঙুল তুলব কী, সামনাসামনি তাকে দেখে যে মূর্ছিত হয়ে পড়িনি, এইটেই আশ্চর্য কথা!

সে ভয়ংকর! যেন মূর্তিমান মৃত্যু! আজও স্বপ্নে তাকে দেখে চমকে চেঁচিয়ে উঠি!

মোহনপুরের শ্মশান

১

একখানি ছবি

আমি যাঁর জীবনের আশ্চর্য কাহিনী বলব, তাঁর নাম হচ্ছে আনন্দমোহন সেন। তাঁকে আমি চিনি না, চোখে দেখিও নি, খুব সম্ভব তাঁর মৃত্যু হয়েছে আমার জন্মাবার আগেই।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এমন একজন লোকের জীবনকাহিনীর সঙ্গে আমি পরিচিত হলুম কেমন করে? আগে এই জিজ্ঞাসারই জবাব দেওয়া উচিত। নইলে আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে, নিজের মন-গড়া একটা আজগুবি উপকথা বলে আমি খামোকা আপনাদের পিলে চম্‌কে দেবার চেষ্টা করছি।

এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জগতে আনন্দমোহনের গল্প যে বিশ্বাসযোগ্য হবে না, আমিও অস্বীকার করি না এ কথা। কিন্তু যে কাহিনী আমি নিজে রচনা করি নি তা সত্য বা মিথ্যা বলে একতরফা ডিক্রি জারি করবারও অধিকার নেই আমার। বিশ্বাস করা এবং না-করার সম্বন্ধে আমি আপনাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে রাজি আছি।

শঙ্কর বসু ছিলেন অধ্যাপক এবং আমার বন্ধু। এবারের পুজোর ছুটিটা তাঁর দেশের বাড়িতে কাটাবার জন্যে আমাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁর দেশের বাড়ি ছিল বর্ধমানের দামোদর নদের ধারে। এর আগে আর কখনো এখানে আসি নি।

বৈঠকখানায় ঢুকেই একখানা বড় তৈলচিত্রের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

চিত্রের বিষয়বস্তু এই ঃ

চারিধারে অন্ধকার। একটি তরুণী—তাঁর ঊর্ধ্বোত্থিত ডানহাতে সেকেলে লণ্ঠন। তরুণীর দেহের অন্যান্য অংশ অন্ধকারের ভিতরে প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে, কেবল ভালো করে দেখা যাচ্ছে তার মুখখানি—অপূর্ব ও জীবন্ত সৌন্দর্য-ভরা সেই মুখ। পটের একপাশে খানিক স্পষ্ট ও খানিক অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে আর এক মূর্তি। সে যুবক এবং তার মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে বিষম বিস্ময় ও দারুণ আতঙ্ক! সুন্দরীর লণ্ঠনের আলোতে যুবক বোধহয় এমন কোন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেয়েছে মানুষের বুকের রক্ত যাতে জমে যায় বরফের মতন!

অদ্ভুত বিষয়বস্তু। তরুণী কী দেখাতে চায় এবং যুবক কেনই বা এত ভয় পেয়েছে? ছবিতে তার কোন ইঙ্গিতই নেই।

শঙ্কর হেসে বললে, 'হিমাংশু, এ-রকম রহস্যময় ছবি তুমি বোধহয় আগে কখনো দেখ নি?'

—'না। ছবিতে চিত্রকর কি দেখাতে চায়? মনে হচ্ছে এখানা কাল্পনিক ছবি নয়। ছবিতে যে দৃশ্য রয়েছে, এই পৃথিবীর উপর একদিন সত্য-সত্যই তার অভিনয় হয়ে গিয়েছে।'

—'তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। ছবিখানি আঁকা হয়েছে একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে।'

—'কী সে ঘটনা?'

—'উঃ, ভয়ঙ্কর! এই ছবিতে ফুটেছে একটি বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য! ঐ যে তরুণী, ওর নাম লীলা। ঐ যে যুবক, ওর নাম আনন্দমোহন সেন।'

—'কে ওরা।'

—'লীলার বাবার নাম চন্দ্রমোহন চৌধুরী, সেকালকার একজন সুবিখ্যাত মূর্তিচিত্রকর। আনন্দমোহন ছিল তাঁরই কৃতীছাত্র, এই ছবিখানা দেখলেই তার কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাবে, কারণ এখানা তারই আঁকা। এরা কেউই আজ বেঁচে নেই।'

—'এখন গল্পটি কি শুনি?'

—'আমার বাবা আনন্দমোহনের নিজের মুখ থেকে গল্পটি শুনে আমাকে বলেছিলেন অনেকদিন আগে। বাবাকে আনন্দমোহন খুব ভালোবাসত, তাই মারা যাবার সময় ছবিখানা তাঁকে উপহার দিয়ে গিয়েছিল।'

—'কিন্তু গল্পটি কি?'

—'একটু ধৈর্য ধর। এমন রোদে-ধোয়া সকালে এ-রকম গল্প অস্বাভাবিক বলে মনে হবে। অলৌকিক জমে নিরালা রাতের ছায়ায়।'

—'গল্পটি খালি ভয়ানক নয়, অলৌকিকও!'

—'শুনলেই বুঝবে।'

সেদিনের সন্ধ্যাটা ছিল বাস্তবিকই গল্প শোনার পক্ষে রীতিমত উপযোগী।

সন্ধ্যার আগেই ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নেমেছে, ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম দীর্ঘশ্বাসে গাছে গাছে থেকে থেকে ফুটছে বেদনার ভাষা, মেঘে মেঘে আকাশ ঢাকা এবং পৃথিবী ঢাকা অন্ধকারের ঘেরাটোপে। মাঝে মাঝে অন্ধকারকে ধাক্কা মেরে মেঘের পর্দা ছিঁড়ে আকাশ থেকে পৃথিবীতে স্যাঁৎ করে নেমে আসছে বিদ্যুতের তীব্র শিখা এবং ক্ষণিকের জন্যে দেখা যাচ্ছে বিপুল দামোদরের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গ।

লম্বাচওড়া বারান্দা। একটা সেকেলে গোল মার্বেল টেবিলের উপরে টিম্‌টিম্

করে জ্বলছে হারিকেন ল্যাম্প, তার আলো বারান্দার অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল মাত্র। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না এবং অস্পষ্টতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে বেশ একটি রহস্যের সম্ভাবনা।

বাইরের দিকে মুখ করে এবং দেওয়ালের দিকে পিঠ রেখে দুখানা পুরাতন 'ইজি-চেয়ারে'র উপরে চুপ করে বসে আছে শঙ্কর এবং হিমাংশু। কোথাও নেই মানুষের কাজের বা কণ্ঠের সাড়াশব্দ। তারা উপভোগ করছিল এই বৃষ্টিধারা-ধৌত নির্জনতা।

বোধকরি বৃষ্টি ও ঝড়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই হঠাৎ একটা বাদুড় ভিতরে এসে বারান্দার ছাদ ঘেঁষে দুই ডানা দিয়ে ঝট্‌পট্‌ শব্দ তুলে উড়ে বেড়াতে লাগল।

হিমাংশু বললে, 'লেখকরা অলৌকিক গল্প বলবার সময়ে প্রায়ই বাদুড়ের উল্লেখ করেন। তোমারও গল্পে বাদুড় আছে নাকি?'

—'না।'

—'তাহলে সেই ভ্রম সংশোধনের জন্যে বাদুড় নিজেই এসে হাজির হয়েছে। রসিক বাদুড়কে ধন্যবাদ। নাও, এখন গল্প শুরু কর।'

২

পাত্র-পাত্রীর পরিচয়

আজ থেকে অন্তত সত্তর বছর আগেকার কথা।

সে-সময়ে ফোটোগ্রাফ তোলবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, তবে বাংলাদেশে তার প্রভাব একরকম ছিল না বললেও চলে। কিন্তু মানুষের অহং জ্ঞান অল্প নয়, মৃত্যুর আগে সে ইহলোকে নিজের স্থায়ী চিহ্ন কিছু-কিছু রেখে যেতে চায় এবং ধনীদের ভিতরেই এই স্বভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় বেশি।

বাংলাদেশের প্রাচীন ধনী-পরিবারের বসতবাড়ির ভিতরে গেলেই দেখা যাবে, দেওয়ালের চারিদিকে টাঙানো রয়েছে বড় বড় তৈলচিত্রের পর তৈলচিত্র— অধিকাংশই হচ্ছে পূর্বপুরুষদের ছবি। আজকের ধনী এবং নির্ধনরাও সাধারণত ফটোগ্রাফের সাহায্যে নিজেদের নশ্বর চেহারাটা পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রেখে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেকালে ছিল কেবল তৈলচিত্রের চলন। ধনীরা নিজেদের

নশ্বর দেহগুলোকে অবিনশ্বর করবার জন্যে বড় বড় চিত্রকরকে আহ্বান করতেন। সেকালকার গরিব আর সাধারণ গৃহস্থরা ইচ্ছা থাকলেও এ বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতে পারত না। কারণ তৈলচিত্র আঁকতে যত টাকার দরকার তত টাকা থাকত না তাদের পকেটে বা ট্যাঁকে।

চন্দ্রবাবু সেকালকার একজন নামজাদা মূর্তিচিত্রকর ছিলেন। শিল্পীসমাজে তাঁর ছিল ওস্তাদ বলে খ্যাতি। এবং ধনীসমাজে তাঁর ছিল অতিশয় সমাদর। নিজেদের খোলস অর্থাৎ বাইরের চেহারাটাকে অমর করবার প্রত্যাশায় সেকালকার অনেক রাজা, মহারাজা এবং জমিদার আশ্রয় গ্রহণ করতেন সাগ্রহে।

চন্দ্রবাবুর ছাত্রও ছিল কয়েকজন। অবসর-কালে তিনি তাদের চিত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। এবং ছাত্রদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল আনন্দমোহন।

আনন্দ ছিল যাকে বলে অনাথ। তার বাড়ি-ঘর, আত্মীয়স্বজন কিছুই ছিল না। কিন্তু আনন্দের চিত্রাঙ্কনপটুতা ও মিষ্ট প্রকৃতি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন চন্দ্রবাবু। তাকে তিনি নিজের সংসারে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাড়ির ছেলের মতন।

এবং চন্দ্রবাবুর পক্ষে আনন্দের মত একজন বিশ্বস্ত লোকের আবশ্যক ছিল অত্যন্ত। চন্দ্রবাবু ছিলেন চিরকুমার, নিজের আর্ট নিয়ে সর্বদাই এমন মত্ত হয়ে থাকতেন যে, প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত তাঁর স্মরণ-পথে উদিত হয় নি, মনুষ্যসমাজে 'বিবাহ' বলে কোন-কিছু অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে। তাঁর পরলোকগত কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটি মেয়ে ছিল, তার নাম লীলা। গৃহস্থালীর সমস্ত কর্তব্য সেই-ই পালন করত। আর গৃহস্থালীর বাইরেকার যা-কিছু কাজ, তার ভা'র ছিল আনন্দের উপরে। এই দুজনের হাতে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে করতেন কলালক্ষ্মীর সেবা।

কলিকাতার হট্টগোল চন্দ্রবাবুর মোটেই ভালো লাগত না। অথচ তাঁর পক্ষে কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেই নয়। তাই তিনি বাস করতেন শহরতলির এমন এক জায়গায় যেখানে শহরের কাছাকাছি থেকেও উপভোগ করা যায় পল্লী-প্রকৃতির নির্জনতা।

হিমাংশু, মনে রেখো এ হচ্ছে সত্তর বছর আগেকার কথা। তখন নিজ কলকাতা শহরেও ছিল না ইলেক্‌ট্রিক, মোটর, বাস এবং অন্যান্য আধুনিক যুগের লক্ষণ। অনেক রাস্তায় থাকত মিট্‌মিটে তেলের আলো এবং অনেক রাস্তার দুধারে থাকত নালা বা খোলা ড্রেন। খোলার ঘর এবং বস্তি দেখা যেত তখন কলকাতার যেখানে-সেখানে। আজ কলকাতায় তুমি সরকারি বাগান ছাড়া ছোট বা বড় মাঠ প্রায় খুঁজেই পাবে না। কিন্তু তখনকার দিনে কলকাতার বহু স্থানেই এত মাঠ-ময়দান ও ছোটোখাটো জঙ্গলের মতন জায়গা ছিল যে, সেখানে গেলে শহরে বসেই দেখতে পাওয়া যেত পল্লীগ্রামের আংশিক ছবি।

সে-সময়ে শহরের অবস্থাই যখন ছিল এইরকম, তখন শহরতলি ছিল যে পল্লীগ্রামের মতই, এটুকু নিশ্চয়ই আন্দাজ করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না। তখন টালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গেলে মনে হত, অরণ্যে এসেছি। এমনি এক জায়গাতেই ছিল চন্দ্রবাবুর বসতবাড়ি। এবং তাঁর চিত্রশালা ছিল সেখান থেকে খানিক দূরে, কলকাতার প্রান্তসীমায়।

আসল গল্প শুরু করবার আগে এখানে আর একটি কথা বলে রাখি। লীলার বয়স হয়েছিল ষোল-সতেরো। তখনকার দিনে এত বয়সের কুমারী কন্যার সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। কিন্তু চন্দ্রবাবু ছিলেন ইংরেজি মেজাজের লোক। ব্রাহ্ম বা ক্রিশ্চান না হলেও বিশ্বাস করতেন যে, অল্পবয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

কেবল পরমাসুন্দরী বললেও লীলার রূপের কথা ঠিকমত বুঝানো যায় না। সে ছিল অদ্ভুত রূপসী। রং, গড়ন, মুখচোখ ছিল এমন ধারা যে খুঁজলেও তার জোড়া মিলত না। তার উপরে লীলার প্রকৃতিও ছিল অতি মধুর, অতি নম্র।

সুতরাং এমন একটি মেয়ের দিকে যে আনন্দ হবে আকৃষ্ট, এ হচ্ছে খুব সহজ কথা। মনে মনে সে অদূর ভবিষ্যতে লীলাকে নিজের সহধর্মিণীরূপে কল্পনা করত। লীলাও বোধহয় এটুকু বুঝতে পারত—যদিও আনন্দ কোনদিনই মুখে প্রকাশ করে নি আপন মনের কথা।

আনন্দ ও লীলা ছিল এক জাতেরই লোক, তবু আপাতত লীলার সঙ্গে যে তার বিবাহের প্রসঙ্গ ওটাও অসম্ভব, এ সত্য আনন্দের অজানা ছিল না। সে হচ্ছে অনাথ, পরের আশ্রয়ে বাস করে। সে লীলাকে বিয়ে করতে চাইলে চন্দ্রবাবু হয় খাপ্পা হয়ে উঠবেন, নয় হেসেই উড়িয়ে দেবেন অমন অদ্ভুত প্রস্তাব।

অতএব নিজেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তৈরী করে তোলবার চেষ্টা করছিল আনন্দ।

চন্দ্রবাবু নিজেই মত প্রকাশ করেছেন, তার শিক্ষা-প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীন ভাবেই সে চিত্র-ব্যবসায় অবলম্বন করতে পারবে।

স্বাধীন হওয়ার অর্থই হচ্ছে অর্থ উপার্জন করবার ক্ষমতা। ধনীসমাজে আনন্দের যদি পসার হয়, তাহলে তার হাতে লীলাকে সমর্পণ করতে চন্দ্রবাবুর নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

আনন্দ দিনের পর দিন গুনছিল সেই আশাতেই।

৩

মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অন্যান্য ছাত্ররা বিদায় নিয়েছে, চিত্রশালার মধ্যে কাজ করছে অনন্দ একাকী।

একখানি বড় ঘর—দোতালার উপরে। এখানে সেখানে, দেওয়ালের উপর রয়েছে অনেকগুলো ছোট-বড় সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ছবি। সবই তৈলচিত্র। তখনকার দিনে শিক্ষিত বাঙালি চিত্রকররা সাধারণত জলীয় রং বা 'ওয়াটার কলার' ব্যবহার করতেন না। জলীয় রং ব্যবহার করত যারা, শিক্ষিতরা অবজ্ঞা করে তাদের ডাকতেন 'পটুয়া' বলে। বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে জলীয় রঙের প্রাধান্য স্থাপন করেন সর্বপ্রথমে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ।

তাড়াতাড়ি স্বাধীন হবার জন্যে আনন্দমোহন পরিশ্রম করত প্রায় দিবারাত্রিব্যাপী। অন্যান্য ছাত্ররা ছুটি নিয়ে চলে গেলে পরও সে অনেকক্ষণ ধরে চিত্রশালায় রং আর তুলি নিয়ে নিযুক্ত হয়ে থাকত।

কোন খেয়ালি ক্রেতার ফরমাশে সে আঁকছিল একখানা অদ্ভুত ছবি। নরকের দৃশ্য।

যমদূতেরা জনৈক পাপীকে ধরে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছে!

পাপীর মূর্তি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু আনন্দ বিপদে পড়েছে যমদূতগুলোকে নিয়ে।

জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে যমদূতের পরিচয় হয় না। আনন্দও কখনো দেখে নি যমদূত। তাদের চেহারা যে ঠিক কি-রকম হওয়া উচিত আনন্দ কিছুতেই তা ধারণায় আনতে পারছে না।

বিলাতি ছবিতে imp, demon ও devil প্রভৃতিকে দেখেছে। তাদের কালো কালো প্রায়-মানুষের মতন চেহারা, কিন্তু তাদের মাথায় থাকে শিং, পিছনে থাকে ল্যাজ এবং পায়ে থাকে গরু প্রভৃতির মতন খুর।

কিন্তু যিনি ছবির ফরমাশ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন নাকি পরম হিন্দু, গঙ্গাজল ছাড়া আর কোন জল পান করেন না। আনন্দ অনায়াসেই ফিরিঙ্গি imp, demon ও devil এর মূর্তি আঁকতে পারত, কিন্তু সে-সব ক্রিশ্চানী মূর্তি দেখলে হিন্দু ক্রেতার হিন্দুত্ব নিশ্চয়ই জখম হবে।

আর ছবি আঁকা সম্ভবপর নয়। চিত্রশালার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে সন্ধ্যার অন্ধকার। বাইরে ক্রমে ক্রমে স্তব্ধ হয়ে আসছে নাগরিক কোলাহল।

তখনও তুলি হাতে করে আনন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে—'যমদূতদের—হিন্দু যমদূতদের কি-রকম দেখতে? রাক্ষসের মতন? ভূত-প্রেতের মতন? কিন্তু রাক্ষস আর ভূতপ্রেতদেরই বা চেহারা কিরকম হওয়া উচিত? তাদেরও তো আমি চোখে দেখি নি!'

অনেক মাথা ঘামিয়েও কূল-কিনারা না পেয়ে আনন্দ শেষটা ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, 'নিকুচি করেছে! যমদূতেরা জাহান্নামে যাক, আমি তাদের আঁকতে পারব না!'

—সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন থেকে চাপা গলায় কে হেসে উঠল!

সচমকে আনন্দ ফিরে দেখলে, ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা অপরিচিত মূর্তি।

চিত্রশালার ভিতরে তখন ভালো করে চোখ চলে না। বেশ ঘন অন্ধকার। বাইরে শোনা গেল প্যাঁচার ডাক।

মূর্তি স্থির চক্ষে তাকিয়ে ছিল চিত্রপটের সম্পূর্ণ যমদূতগুলোর দিকে। বিচিত্র তার চেহারা। মাথায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা মস্ত একটা পাগড়ি সে এমনভাবে পরেছে যে, মুখের আধখানা দেখাই যাচ্ছে না। পোশাকও সাধারণ লোকের বা বাঙালির মতন নয়, সাজগোজ দেখলে মনে হয় সে কোন রাজা-রাজড়া—এমন কি কটিবন্ধ থেকে ঝুলছে একখানা তরবারি পর্যন্ত!

সৈনিকের মতন সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তি। অন্ধকারে তাকে খানিক দেখা যাচ্ছিল, খানিক দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও ঝক্‌মক্ করে উঠছিল তার স্বর্ণখচিত ও নানা রত্নে অলঙ্কৃত বহুমূল্য পোশাকটা।

এমন মূর্তি এখানে দেখবার আশা আনন্দ করে নি। সে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেল।

মূর্তি গম্ভীর স্বরে বললে, 'ছোক্‌রা, পৃথিবীতে যখন বেঁচে আছ, যমদূতদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

তার চেহারা দেখলে ও গলার আওয়াজ শুনলে বুক ধড়ফড় করে ওঠে ভয়ে। কিন্তু একটা জবাব না দিলেও চলে না। আনন্দ কোনরকমে বললে, 'আজ্ঞে, খরিদ্দারের ফরমাশ!'

মূর্তি একখানা হাত রাখলে আনন্দের কাঁধের উপরে। আনন্দের মনে হল, তার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে গেল যেন একটা তরঙ্গিত তুষারবারির হিল্লোল। সে পিছিয়ে দাঁড়াল সভয়ে।

মূর্তি বললে, 'খরিদ্দারের ফরমাশেও আর কোনদিন যমদূতদের দেখবার চেষ্টা কোরো না।'

আনন্দ ভয়ে ভয়ে বললে, 'চন্দ্রবাবুর কাছে আপনার কোন দরকার আছে? অনুগ্রহ করে ঐ আসনে বসুন।'

—'চন্দ্রমোহন চৌধুরী কোথায়?'

—'আজ্ঞে, তিনি কাজে বেরিয়ে গিয়েছেন। ফিরতে রাত হবে।'

—চন্দ্রমোহন চৌধুরীকে বোলো, আমি মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ। আসছে কাল সন্ধ্যায় ঠিক আটটার সময়ে আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করতে আসব। সে যেন এখানে হাজির থাকে।'

মূর্তি হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। তারপর সোজা বেরিয়ে গেল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। ঘরের আবহ এতক্ষণ যেন তুষারশীতল হয়ে ছিল, মূর্তি অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘরের মধ্যে জেগে উঠল গ্রীষ্মের উত্তাপ।

আনন্দের কেমন কৌতূহল হল, চিত্রশালা থেকে বেরিয়ে মূর্তি কোন্ দিকে যায় দেখবার জন্যে। ঐ জানালাটার তলাতেই আছে চিত্রশালা থেকে বেরিয়ে যাবার একমাত্র দরজা। সে তাড়াতাড়ি জানালার কাছে দাঁড়াল।

সে প্রায় দশ মিনিটকাল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সদর দরজা দিয়ে কারুকেই বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখলে না।

তবে কি লোকটা এখনো বাড়ির ভিতরেই আছে?

এই সম্ভাবনা মনে জাগতেই আনন্দের সমস্ত দেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! কি এক অজানা ভয়ে সে তাড়াতাড়ি উপরের ঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় নেমে গেল। কিন্তু কোথাও কারুকেই দেখতে পেলে না। তখন এই-আশ্চর্য ব্যাপার নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে সে চিত্রশালার দরজা বন্ধ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

৪

মহারাজের প্রস্তাব

সেই রাত্রেই আনন্দ আগন্তুকের কথা চন্দ্রবাবুকে জানালে।

চন্দ্রবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ? কখনো তাঁর নাম পর্যন্ত শুনি নি। কি চান তিনি? নিশ্চয়ই আমার হাতে তাঁর রাজ্যভার সমর্পণ করতে আসবেন না। বোধহয় তাঁর একখানা ছবি আঁকাতে

চান। বেশ, কাল যথাসময়েই মহারাজা বাহাদুরকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করবার জন্যে চিত্রশালায় উপস্থিত থাকব।'

পরদিনের সন্ধ্যা। চিত্রশালার মধ্যে একমাত্র আনন্দ ছাড়া আর কোন ছাত্র নেই।

চন্দ্রবাবু ঘরের ভিতরে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'আটটা তো বাজে-বাজে। আনন্দ, কই, এখনো তো কারুর টিকি দেখতে পাচ্ছি না!'

—'আজ্ঞে, তিনি ঠিক আটটার সময়ে আসবেন বলেছেন।'

—'কি নাম বলেছিলে? মোহনপুরের মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'দেখতে কি রকম?'

—'দেখলেই মনে হয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।'

—'বয়স কত?'

—'বলা শক্ত স্যর্! তবে এইটুকু বলতে পারি বয়সে তিনি যুবক নন।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আটটা বাজতে আর এক মিনিট বাকি! এখনো মহারাজা বাহাদুরের দেখা নেই। আনন্দ, আমি কিন্তু আটটা বাজলেই চলে যাব—আমার অনেক কাজ। মহারাজা বাহাদুর যদি তারপরেও আসেন, তুমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কোয়ো। জীবনে রাজা-মহারাজা দেখেছি প্রায় দু ডজন। কোন মহারাজের জন্যেই আমি এখানে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতে রাজি নই! মহারাজাদের চেয়ে আমি মহাশয়দের বেশি পছন্দ করি।'

ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল।

একতালা থেকে দোতালায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ির উপরে শোনা গেল না কারুর পায়ের শব্দ, কিন্তু ঘরের দরজার সামনে দেখা গেল মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি!

মহেন্দ্রনারায়ণের মূর্তির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল এমন একটা আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের ভাব যে চন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি মাথা হেঁট করে তাঁকে প্রণাম না করে পারলেন না।

মহেন্দ্রনারায়ণ ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালেন।

চন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার টেনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, বসতে আজ্ঞা হোক্!'

মহেন্দ্রনারায়ণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনিই কি মোহনপুরের মহারাজা বাহাদুর?'

—'হ্যাঁ।'

—'শুনলুম আমার সঙ্গে মহারাজা বাহাদুরের কোন দরকার আছে?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মহেন্দ্রনারায়ণ হাত তুলে আনন্দকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমার ও লোকটি কি বিশ্বস্ত?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত।'

পরিচ্ছদের ভিতর থেকে একটি ছোট বাক্স বার করে মহেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'এই বাক্সটা নিয়ে ওকে কাছাকাছি কোন জহুরির কাছে যেতে বল। ও যাচাই করে আসুক, এই বাক্সের ভিতরে যা আছে তার দাম কত?'

বাক্সটি নিয়ে আনন্দ বেরিয়ে গেল। জহুরির বাড়ি যেতে তার বেশিক্ষণ লাগল না। পরিচিত জহুরি।

আনন্দ বললে, 'বাক্সটা খুলে দেখুন।'

বাক্সের ভিতর ছিল নানারকম রত্নখচিত অলঙ্কার!

জহুরি সবিস্ময়ে বললে, 'আনন্দবাবু, এ-সব জড়োয়া গয়না কার?'

—'মোহনপুরের মহারাজার।'

—আশ্চর্য! এ-রকম জড়োয়া গয়না একালেও কেউ ব্যবহার করে নাকি?'

—'গয়নাগুলো কি ভালো নয়?'

—'ভালো নয়! বলেন কি? এমন চমৎকার গয়না আজকাল কেউ দেখতে পায় না! এ-রকম গয়নার চলন ছিল সেই নবাবি আমলে।'

—'ওর দাম বলতে পারেন?'

—'নিশ্চয়ই পারি।'

জহুরি গয়নাগুলো নিয়ে বেশ-খানিকক্ষণ পরীক্ষার পর বললে, 'ভারি দামি গয়না দেখছি।'

—'কত দাম হবে?'

—'দশ লক্ষ টাকার কম নয়।'

শুনে আনন্দের মাথা ঘুরতে লাগল! দশ লক্ষ টাকার ভার বহন করে এখানে এসেছে, অথচ সে কিছুই অনুভব করতে পারে নি। দশ লক্ষ টাকা এত হাল্কা!

ওদিকে আনন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পরেই মহেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শোনো চন্দ্রমোহন! এখানে আজ আমার মিনিট-কয়েকের বেশি থাকবার

উপায় নেই। কিছু দিন আগে কলকাতার এক রঙ্গালয়ে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আমি দেখেছিলুম। তাকে আমি বিবাহ করতে চাই।'

চন্দ্রবাবু সচকিত চোখে মহারাজার মুখের পানে তাকালেন। কি বললেন, বুঝতে পারলেন না। অদ্ভুত প্রস্তাব।

মহারাজা অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি অবাক হচ্ছ? কেন? আমার চেয়ে ধনী পাত্র পাবার আশা তুমি কর নাকি?'

চন্দ্রবাবু তখনো জবাব দিতে পারলেন না। কেবল এই অদ্ভুত প্রস্তাব বা বিস্ময়ের জন্যে নয়, আগন্তুককে দেখে তাঁর বুকের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক! সেখান থেকে তাঁর পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হল, কিন্তু কেবল ভদ্রতার খাতিরেই সে ইচ্ছা তিনি দমন করলেন।

অনেক কষ্টে শেষটা তিনি বললেন, 'মহারাজা বাহাদুর, আপনার প্রস্তাব শুনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। কিন্তু লীলা বালিকা নয়, তার মত না নিয়ে আপনাকে কেমন করে কথা দেব?'

মহারাজা বললেন, 'চন্দ্রমোহন আমাকে ছলনা করবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি তুমিই লীলার একমাত্র অভিভাবক, তোমার অনুরোধ কিছুতেই সে অমান্য করবে না।'

মহারাজা সামনের দিকে দুই পা এগিয়ে এলেন। চন্দ্রবাবু পিছিয়ে গেলেন। তাঁর ভয় আরো বেড়ে উঠল, এই অদ্ভুত মূর্তির কাছে একলা থাকাও যেন বিপদজনক। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করলেন—হে ভগবান, আনন্দকে অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও!

মহারাজা অধীর কণ্ঠে বললেন, 'বল, তোমার মত কি?'

চন্দ্রবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু মহারাজা আপনার জাতি—'

বাধা দিয়ে মহারাজা বললেন, 'আমার জাতি? তুমি কি জানো না রাজা-রাজড়ারা সব জাতেই বিবাহ করতে পারে?'

—'কিন্তু—'

—'আর কোন কিন্তু নয়। শোনো, সেই ছোকরা বাক্স নিয়ে ফিরে এলেই শুনবে, তার ভিতরে আছে লক্ষ লক্ষ টাকার জড়োয়া গয়না। এ গয়না পাবে লীলাই। তার উপরে যৌতুক স্বরূপ আমি দেব আরো দশ লক্ষ টাকা! এর পরেও তোমার আপত্তি আছে?'

মহারাজা নিষ্পলকনেত্রে চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। চন্দ্রবাবুর মনে হল সে জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তির হরণ করে নিচ্ছে। তাঁর মুখ দিয়ে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বেরিয়ে গেল, 'আমার কোন আপত্তিই নেই।'

এই সময়ে গয়নার বাক্স নিয়ে ফিরে এল আনন্দ। তাকে দেখে চন্দ্রবাবু যেন মনের ভিতরে খানিকটা জোর পেলেন। ভাবলেন, আর একটু আগে ছোকরা যদি আসত তাহলে আমি কথা দিতুম না।

আনন্দ বললে, 'জহুরি বললে বাক্সের ভিতরে দশ লক্ষ টাকার গয়না আছে।'

মহারাজা বললেন, 'শুনলে?'

চন্দ্রবাবু নিজের মনকে এই ভেবে প্রবোধ দিতে চাইলেন, 'মহারাজা দেখতেও সুপুরুষ নন, বয়সেও নবীন নন। কিন্তু লীলা হবে মহারাণী আর সম্পত্তিও পাবে বিশ লক্ষ টাকার, তার পক্ষে যেটা কল্পনাতীত। সুতরাং এমন বিবাহে সম্মতি দিলে আমার পক্ষে বিশেষ অন্যায় হবে না।' প্রকাশ্যে বললেন, 'কিন্তু মহারাজা, আমার একটি আরজি আছে।'

—'বল।'

—'বিবাহের আগে লীলার সঙ্গে আপনার পরিচয় করা উচিত।'

—'আজ আর সময় নেই। কাল ঠিক সন্ধ্যা আটটার সময়ে তোমার বাড়িতে আমি যাব।'

—'আমার ঠিকানা জানেন?'

—'জানি। গয়নার বাক্সটা তোমার কাছেই রেখে গেলুম।'

—'একটা রসিদ দিই?'

চলে যেতে যেতে মহারাজা বললেন, 'কোন দরকার নেই। আমাকে ঠকাতে পারে এমন কোন মানুষকে আমি জানি না।'

চন্দ্রবাবুর মনে হল, ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল যেন একটা অপার্থিব ছায়া!

আনন্দ নিজের সন্দেহভঞ্জনের জন্যে আজও গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে। আজও মহারাজা বাহাদুরকে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরুতে দেখলে না।

ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত, বড়ই ভয়াবহ! কিন্তু মুখে সে কিছুই প্রকাশ করলে না।

আর এ-সব কথা নিয়ে আলোচনা করবার মতন মনের অবস্থাও ছিল না তার। সে বুঝলে, তার সুখের মেঘে আগুন লাগতে আর দেরি নেই। যাকে কেন্দ্র করে তার ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হয়ে উঠেছিল, এইবারে সেই দেবীকে বিসর্জন দিতে হবে অশ্রুজলে। তবু সে স্বার্থপর হতে চায় না। লীলা যদি সুখী হয়, হোক্ সে মোহনপুরের মহারাণী।

৫

ভয়াবহ মহারাজা

পরের দিন সন্ধ্যা আটটার কিছু আগে।

চন্দ্রবাবু অতিথি সৎকারের জন্যে আহার্যের আয়োজন করেছিলেন প্রচুর। ডিমের পরোটা, লুচি, পোলাও, মাংস, তিন রকম মাছ, তিন রকম নিরামিষ তরকারী, রুই মাছের ডিমের চাট্‌নি, ইলিশ মাছের ডিম ভাজা, সন্দেশ, রসগোল্লা, দই, রাবড়ি ও ছানার পায়স প্রভৃতি। লীলা নিজের হাতে সারা দিন ধরে এই-সব রেঁধেছে। যদিও এখনো সে জানে না যে অতিথি আসছেন, তাঁর সঙ্গে তার ভবিষ্যতের সম্পর্ক কি!

আনন্দও তার কাছে কোন কথা ভাঙেনি। নিজের দুঃখ সে পুষে রেখেছে নিজের মনের ভিতরেই।

বোধহয় তার মুখেও মনের ছায়া পড়েছিল কিছু-কিছু। কারণ লীলা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে, 'আনন্দবাবু, আপনার মুখ আজ শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

আনন্দ সহাস্যে লীলার প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়েছে এই বলে, 'শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই।'

বাজল আটটা। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানার দরজার সামনে দেখা গেল মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুরকে।

চন্দ্রবাবুর বুকের কাছটা ধ্বক্ করে উঠল। এমন আকস্মিকভাবে মহারাজার আবির্ভাব তিনি প্রত্যাশা করেন নি। মহারাজা আত্মপ্রকাশ করলেন যেন হাওয়ার ভিতর থেকেই। যদিও এমন চিন্তা হাস্যকর, তবু এই কথাই মনে হল চন্দ্রবাবুর।

কিন্তু বিস্মিত হল না আনন্দ। সে এইটেই আশা করছিল।

মহেন্দ্রনারায়ণ দরজার কাছ থেকেই বললেন, 'আমার হাতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী কোথায়?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'দোতালায়।'

—'তবে দোতালায় চল।' মনে রেখ, 'কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটার সময়ে আমাকে এখান থেকে যেতে হবে।'

ভালো করে মহেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু কেমন শিউরে উঠলেন! আনন্দেরও দুই চক্ষু হল বিস্ফারিত।

মহেন্দ্রনারায়ণ আজ এসেছেন পদস্থ সৈনিকের বেশে এবং তাঁর সমস্ত মুখখানা স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। আর সে কী মুখ!

মুখের রঙ একেবারে হলদে, তার মধ্যে রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। চোখের

তারার উপর ও নীচের দিকেও দেখা যাচ্ছে সাদা অংশ—সে যেন কোন উন্মাদগ্রস্থের চোখ! মাথায় লম্বা লম্বা রুক্ষ, কটা চুলগুলো এসে পড়েছে কাঁধের উপরে, যেন তৈলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘুচে গেছে বহুকাল! ওষ্ঠাধর কালো কুচ্‌কুচে, তাদের ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে দু-পাশে দুটো শ্বাপদের মতন হিংস্র, হল্‌দে-রঙের লম্বা দাঁত! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এ যেন অনেক দিন আগেকার গলায়-দড়ি-দিয়ে-মরা মানুষের মুখ, কোন দুষ্ট প্রেতাত্মা দেহের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে মুখখানাকে জ্যান্তো করে রেখেছে কতকটা!

মনের ভাব প্রাণপণে গোপন করে চন্দ্রবাবু বললেন, 'বেশ, আসুন মহারাজা বাহাদুর, আমরা দোতালাতেই যাই।'

সশব্দে ভারি ভারি পা ফেলে মহেন্দ্রনারায়ণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন—ঠিক যন্ত্রচালিত কোন মূর্তির মতন। কিংবা যেন কোন পুতুল বাজির পুতুলকে চালনা করছে অদৃশ্য রজ্জুর সাহায্যে!

উপরের ঘরে বসেছিল লীলা। মহেন্দ্রনারায়ণকে দেখেই সে চমকে আড়ষ্ট হয়ে রইল কাঠের মতন।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'লীলা, ইনি হচ্ছেন মোহনপুরের মহারাজা বাহাদুর।'

লীলা নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলে।

মহেন্দ্রনারায়ণ প্রায় আধ মিনিট ধরে লীলার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিরে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চন্দ্রমোহন, একবার ঐ ঘরে আমার সঙ্গে এস।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'যাচ্ছি মহারাজা বাহাদুর! আপনার যখন সময় নেই তখন তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে যাই।'

মহেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত বিস্মিত স্বরে বললেন, 'খাবার!'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'মহারাজা বাহাদুর! আপনাকে খাওয়াবার শক্তি আমার কোথায়? সামান্য আয়োজন।'

—'সামান্য বা অসামান্য কোন খাদ্যই আমি গ্রহণ করতে পারব না।'

—'সে কি! লীলা এত কষ্ট করে রেঁধেছে।'

—'বাজে সময় নষ্ট কোরো না। পাশের ঘরে চল।'

অগত্যা আর বাক্যব্যয় না করে মহেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে চন্দ্রবাবু পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন, 'এখন কি আদেশ বলুন।'

—'এই নাও দশ লক্ষ টাকার নোট। লীলাকে আমি সঙ্গে নিয়ে মোহনপুরে ফিরে যেতে চাই।'

—'বিবাহ না করেই?'

—'আমাদের বংশের নিয়ম, পাত্র রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে পাত্রীকে বিবাহ করবে।'

—'মহারাজার রাজ্যের কথা জানি না, কিন্তু এদেশে ও-নিয়ম অচল।'

মহেন্দ্রনারায়ণ সিধে হয়ে দাঁড়ালেন, মাথায় তিনি যেন উঁচু হয়ে উঠলেন আরো এক ফুট! দীপ্ত চক্ষে চন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরকে গম্ভীরতর করে বললেন, 'চন্দ্রমোহন! আমাকে তোমাদের দেশের নিয়ম মেনে চলতে হবে নাকি? লীলাকে আমার হাতে সমর্পণ করবে বলে তুমি কথা দিয়েছ—নিজের কথা রাখতে তুমি বাধ্য। কাল আমার সঙ্গে মোহনপুরে যেতে হবে। বুঝলে? বুঝলে? বুঝলে?'

সেই দীপ্ত দৃষ্টির মধ্যে ছিল কোন জাদু! আবার চন্দ্রবাবুর মনে হল, তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল! সামনের মূর্তি যেন প্রভু, তিনি যেন গোলাম! মাথা নত করে বললেন, 'যে আজ্ঞে, তাই হবে।'

—'কাল সকাল দশটার সময় সিপাহিদের সঙ্গে ডুলি আসবে। লীলা যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। তার সঙ্গে আর কেউ যেতে পারবে না। এই আমার আদেশ। তুমি কথা দিয়েছ, এ আদেশ অমান্য করে নিজের বিপদকে ডেকে এনো না।' মহেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে এবং তারপর বেরিয়ে গেলেন বাড়ির ভিতর থেকে।

চন্দ্রবাবু আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন।

লীলা ও আনন্দ সেই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

লীলা সভয়ে বললে, 'উঃ, মহারাজের কি ভয়ঙ্কর চেহারা!'

চন্দ্রবাবু যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতন বললেন, 'ভয়ঙ্কর চেহারা?'

লীলা শিউরে উঠে বললে, 'মাগো! তুমি কি লক্ষ্য করে দেখ নি মহারাজা যতক্ষণ এখানে ছিলেন, একবারও তাঁর চোখের পাতা পড়ে নি? ঠিক যেন মরা মানুষের চোখ!'

আনন্দ বললে, 'আমি আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে জ্যান্তো মানুষের বুক ওঠে আর নামে। কিন্তু মহারাজের বুক ছিল একেবারে স্থির। ঠিক যেন মরা মানুষের বুক!'

চন্দ্রবাবু বললেন 'তোমরা ভুল দেখেছ। মরা মানুষ কখনো চলে-ফেরে, কথা কয়?'

লীলা বললে, 'সে কথা সত্যি। কিন্তু আমি যদি একটি রাজ্য পাই, তাহলেও তোমার মহারাজা বাহাদুরকে আবার চোখে দেখতে রাজি হব না!'

চন্দ্রবাবু শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'আমি বললেও রাজি হবি না!'

লীলা আদর করে দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'তুমি বললে সব পারি।'

—'পারিস্ তো?'

—'হ্যাঁ জ্যাঠামশাই!'

—'তাহলে শুনে রাখ, ঐ মহারাজ বাহাদুরের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে। আমি কথা দিয়েছি।'

লীলা দারুণ বিস্ময়ে চমকে উঠল।

চন্দ্রবাবু আবার বললেন, 'কাল সকালে দশটার সময়ে তোকে মোহনপুরে নিয়ে যাবার জন্যে মহারাজের লোকজন আসবে। সঙ্গে আমরা কেউ থাকব না। তোর বিয়ে হবে মোহনপুরেই।' তাঁর মনে হল কেউ যেন জোর করে তাঁকে বাধ্য করলে এই কথাগুলো উচ্চারণ করতে!

লীলা চেয়ে রইল বিস্ফারিত চক্ষে।

চন্দ্রবাবু আবার বললেন, 'মহারাজ বাহাদুর তোর জন্যে বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন।'

লীলা কিছু বললে না, কেবল মাথা করলে নত।

৬

মোহনপুর

লীলা মোহনপুরে চলে গিয়েছে। তার অভাবে সমস্ত বাড়িখানা ঠেকছে ফাঁকা-ফাঁকা। চন্দ্রবাবুর আর কিছু ভালো লাগে না।

নিজেকে তাঁর অপরাধী বলে মনে হয়। একজন অজানা—কেবল অজানা নয়, প্রাচীন-বয়সী এবং ভয়াভয়-রূপে কুৎসিত বিদেশীর হাতে টাকার লোভে এমন করে লীলাকে সমর্পণ করা তাঁর পক্ষে উচিত হয় নি কিছুতেই। না জানি তিনি লীলার চোখে হীন হয়ে পড়েছেন কতখানি!

কিন্তু লীলা তো কিছুই জানে না, তাঁর কোন উপায় ছিল না। মহেন্দ্রনারায়ণ নিশ্চয়ই মায়াবী। সে যখনি এসেছে তখনি কি মন্ত্রগুণে তাঁকে বশ করে ফেলেছে।

তার সামনে তিনি হারিয়ে ফেলতেন নিজের সমস্ত নিজস্ব। তার হাতে লীলাকে তিনি তুলে দিয়েছেন নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই। লীলার সঙ্গে দেখা হলে এই সত্যটাই তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আনন্দও যে মন-মরা হয়ে আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। চন্দ্রবাবুর বাড়িতেও সে খুব অল্পক্ষণই থাকে। চিত্রশালায় গিয়ে দিনের অধিকাংশ সময়েই সে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থেকে ভোলবার চেষ্টা করে লীলার অভাব। তিন দিনের কাজ সে শেষ করে ফেলে এক দিনে।

প্রায় এক মাস কেটে গেল লীলার কোন খবর নেই।

একদিন আনন্দকে ডেকে চন্দ্রবাবু বললেন, 'ব্যাপার বড় ভালো বুঝছি না।'

—'কি ব্যাপার?'

—'যাবার সময়ে লীলা বলে গিয়েছিল নিয়মিতভাবে চিঠিপত্র লিখবে। কিন্তু এক মাসেও তার একখানা চিঠিও এল না। এর কারণ কি?'

—'হয়তো তার অসুখ করেছে।'

—'আমারও সেই ভাবনা হচ্ছে। এখন কি করা উচিত বল দেখি?'

—'মোহনপুরে নিজে একবার যান না।'

—'মহারাজা যদি অসন্তুষ্ট হন?'

—'কেন?'

—'আমি গরিব। তুচ্ছ পোটো। সকলের সামনে আমাকে শ্বশুর বলে মানতে যদি তাঁর মানে বাধে?'

—'তবু আপনার যাওয়া উচিত।'

—'এ কথা ঠিক। লীলার প্রতিও তো আমার কর্তব্য আছে! বেশ আনন্দ, কালকেই আমি মোহনপুরে যাত্রা করব।'

কলকাতা থেকে মোহনপুর হচ্ছে প্রায় দুই শত মাইল।

মোহনপুর হচ্ছে একটি ছোটোখাটো শহর। প্রধান রাজপথটি মাঝারি আকারের, সোজা চলে গিয়ে শেষ হয়েছে রাজবাড়ির ফটকের সামনে। ফটকের মুখে বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দিচ্ছে সুসজ্জিত সিপাহী। প্রকাণ্ড প্রাসাদ— মাঝখানে মস্ত গম্বুজ।

চন্দ্রবাবু সিপাহীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হবে?'

—'ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।'

—'তিনি কোথায়?'

—'ঐ যে, এইদিকেই আসছেন।'

একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাজবাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। চন্দ্রবাবু তাঁকে নমস্কার করলেন।

ম্যানেজার বললেন, 'মহাশয়ের কি চাই?'

—'একবার মহারাজা বাহাদুরের দর্শন প্রার্থনা করি।'

—'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

—'কলিকাতা থেকে।'

—'আপনি মহারাজ বাহাদুরকে চেনেন?'

—'কিছু কিছু চিনি।'

—'কি সূত্রে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়?'

চন্দ্রবাবু ভেবেছিলেন, মহারাজার সঙ্গে তাঁর আসল সম্পর্কের কথা বাইরের কারুর কাছে ভাঙবেন না। কিন্তু এখন তাঁকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'মহারাজ বাহাদুরের সঙ্গে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হয়েছে।'

ম্যানেজার চমকিত চোখে চন্দ্রবাবুর মুখের পানে তাকালেন। বললে, 'অসম্ভব!'

চন্দ্রবাবু আহত কণ্ঠে বললেন, 'কেন, অসম্ভব কেন? আমার চেহারা হোমড়া-চোমরা নয় বলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীও কি মহারাজের অযোগ্যা?'

—'না মশাই, তা নয়। আমি সেজন্যে অসম্ভব বলছি না।'

—'তবে?'

—'আমাদের মহারাজা এখনো বিবাহ করেন নি।'

এইবারে চন্দ্রবাবুর বিস্মিত হবার পালা। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'এত বয়সেও তাঁর বিবাহ হয় নি, আমাকে কি এই কথা বিশ্বাস করতে হবে?

—'মশাই কি বলছেন? আমাদের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ এই সবে তেইশে পা দিয়েছেন!'

চকিত স্বরে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনাদের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ?'

—'হ্যাঁ, আমাদের মহারাজার ঐ নাম।'

—'তবে কি তিনি কলিকাতায় গিয়ে নাম ভাঁড়িয়েছিলেন?'

—'কলকাতায় কতদিন আগে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

—'মাসখানেক আগে।'

ম্যানেজার এইবারে হেসে বললেন, 'মশাই কোন জুয়াচোরের পাল্লায় পড়েছেন। আমাদের মহারাজা সবে গেল হপ্তায় বিলাত থেকে ফিরেছেন। বিলাতে তিনি আট মাস ছিলেন।'

চন্দ্রবাবুর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। তবে কি তিনি লীলাকে সমর্পণ করেছেন কোন প্রতারকের কবলে? তবু তিনি একটা নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বলে কেউ আছেন?'

—'একালে নেই। সেকালে ছিলেন।'

—'মানে?'

—'মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন বর্তমান মহারাজার পিতামহ। ষাট বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

চন্দ্রবাবু সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন মন্ত্রাচ্ছন্ন স্তম্ভিতের মতন। তারপর তাঁর মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল আর এক ভয়াবহ সম্ভাবনার বিদ্যুৎ! তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, 'মহেন্দ্রনারায়ণের কোন প্রতিকৃতি আছে?'

ম্যানেজার হেসে বললেন, 'আপনি সন্দেহভঞ্জন করতে চান? বেশ, আসুন। রাজবাড়ির বৈঠকখানায় মহারাজার পূর্বপুরুষদের 'অয়েল পেন্টিং' আছে।'

প্রকাণ্ড বৈঠকখানা, রাজকীয় ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ—দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় নতুন ও পুরাতন মূর্তিচিত্র।

একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ম্যানেজার বললেন, 'ঐ দেখুন মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণকে। শুনেছি তাঁর মৃত্যুর তিনদিন আগে ছবিখানা আঁকা হয়। তিনি হঠাৎ মারা যান জলে ডুবে। তাঁর দেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি।'

কিন্তু এ-সব কথা চন্দ্রবাবুর কর্ণে প্রবেশ করছিল না। প্রায় বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে তিনি চিত্রাঙ্কিত মহেন্দ্রনারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন নিষ্পলকনেত্রে।

এই তো লীলার স্বামী মহেন্দ্রনারায়ণ! তবে তিনি দেখেছেন এক অপার্থিব মৃত মুখ, আর এ মুখ হচ্ছে জীবন্ত মানুষের—আকাশপাতাল তফাত, কিন্তু মুখ এক!

চন্দ্রবাবুর মনে হল ছবির মহেন্দ্রনারায়ণ যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে ক্রূর উপহাসের হাসি হাসলেন!

ম্যানেজার তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'মশাই, সাড়া দেন না কেন? এখন আপনার সন্দেহ মিটল তো?'

সুপ্তোত্থিতের মতন চন্দ্রবাবু বললেন, 'অ্যাঁ, কি বলছেন? হ্যাঁ, একমাস আগে এই মূর্তিই আমার বাড়িতে গিয়েছিল।'

—'পাগলের মতন প্রলাপ বকরেন না।'

চন্দ্রবাবু হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'পাগল এখনো হই নি, এইবারে হব'—বলতে বলতে তিনি অবশ হয়ে বসে পড়লেন গৃহতলে।

৭

অপার্থিব দুঃস্বপ্ন

রাত নয়টার সময়ে চন্দ্রবাবু শেষ-আহার করতেন। সেদিনও আনন্দের সঙ্গে তিনি আহারে বসেছিলেন।

গতকল্য তিনি মোহনপুর থেকে কলিকাতায় ফিরছেন। তাঁর মুখ থেকে সব শুনেছে আনন্দও।

দুজনেরই মনের অবস্থা ভালো নয়। কথা নেই কারুর মুখেই। হঠাৎ সজোরে বেজে উঠল সদর দরজার কড়াজোড়া। তারপর হল দরজা-খোলার শব্দ।

চন্দ্রবাবু বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'বেয়ারা কেন দরজা খুলে দিলে? এত রাত্রে কে আবার জ্বালাতে এল?'

সিঁড়ির উপরে লঘুপদের দ্রুত শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ছুটে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল লীলা!

কিন্তু কী মূর্তি! কী বেশ!

এলোমেলো এলানো চুল—যেন তেল-জলের সঙ্গে বহুকালের সম্পর্ক নেই! অসম্ভব আতঙ্কে চোখ দুটো যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, গাল দুটো গেছে ভিতরে বসে এবং থর্ থর্ করে কাঁপছে সারা গা।

ধুলো-কাদা মাখা পরনের কাপড়ে পাট নেই, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া এবং সেখানা হচ্ছে সেই কাপড় যা পরে সে গিয়েছিল মোহনপুরে।

মাটির উপরে ধপাস্ করে বসে পড়ে লীলা চেঁচিয়ে উঠল, 'জল! জল! নইলে এখনি বুক ফেটে যাবে।'

আনন্দ তাড়াতাড়ি জল এনে দিলে, সে এক সঙ্গে ঢক্ ঢক্ করে তিন গেলাস জল খেয়ে ফেললে। যেন তার নির্জল মরুযাত্রীর তৃষা!

আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, 'খাবার! খাবার! নইলে এখনি আমি মরে যাব!'

চন্দ্রবাবু নিজের খাবারের পাত্রগুলো তখনি তার দিকে ঠেলে দিলেন। সে দুই হাতে গোগ্রাসে খাবারগুলো মুখে তুলে খেয়ে ফেললে, কিন্তু মিটল না তার দারুণ ক্ষুধা! নিজেই হুম্‌ড়ি খেয়ে আনন্দেরও খাবারের পাত্রগুলো টেনে নিয়ে আবার দুই হাতে খেতে আরম্ভ করলে—যেন তার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা!

চন্দ্রবাবু নির্বাক বিস্ময়ে লীলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করতে লাগলেন। আনন্দও।

পানাহার শেষ করেই সে ভীতস্বরে বলে উঠল, 'সব কথা পরে হবে। যদি

আমাকে বাঁচাতে চাও, শিগগির একজন ভাল রোজা ডেকে আনো! একটুও দেরি কোরো না—একটুও না!'

আনন্দ রোজা ডাকতে ছুটল। সেই পাড়াতেই এক বিখ্যাত রোজার বাড়ি ছিল।

মিনতি-ভরা কণ্ঠে লীলা বললে, 'জ্যেঠামশাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এ ঘরে আমাকে একলা ফেলে যেও না!'

—'যাব না মা, যাব না। আমি তোর কাছেই থাকব!'

—'হ্যাঁ, আমার কাছেই থাকো। একলা হলেই আবার আমি মরব!'

—'তোর কথার মানে বুঝতে পারছি না।'

আগেই বলেছি এ-ঘরের মাঝের এক দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায় এবং দেখাও যায় তার ভিতরটা! সেইদিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠে লীলা অতি আর্তস্বরে আবার চিৎকার করে উঠল, 'ওগো সে এসেছে, সে এসেছে!'

চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কে এসেছে রে?'

—'সে, সে, সে! তার নাম নেই, তার দেহ নেই, কিন্তু আছে। জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই, তুমি কি পচা মড়ার দুর্গন্ধ পাচ্ছ না?'

চন্দ্রবাবু ভয় পেয়ে বললেন, 'কই, পাচ্ছি না তো!'

—'কিন্তু আমি পাচ্ছি। আমাকে সে ঠকাতে পারবে না।'

—'তুই কার কথা বলছিস্!'

—'সে আমাকে আবার নিয়ে যেতে এসেছে, সে!'

—'কোথায় সে?'

আঙুল দিয়ে পাশের ঘর দেখিয়ে কাঁদন-ভরা গলায় লীলা বললে, 'ঐখানে! ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! উঃ!'

পাশের ঘরের দিকে ত্রস্ত চক্ষে তাকালেন চন্দ্রবাবু। হ্যাঁ, ওখানে সুদীর্ঘ ছায়ার মতন কি একটা দেখা যাচ্ছে বলেই তো বোধ হচ্ছে! তারপর ভালো করে দেখে বুঝলেন, তাঁর চোখের ভ্রম। উপর থেকে সমুজ্জ্বল আলোর আঁধার ঝুলছে, ছায়া বা কায়া কোন-কিছুই নেই ওখানে। খালি ঘর।

বললেন, 'তুই ভুল দেখছিস্ লীলা। ও-ঘরে কেউ নেই।'

দুই বাহু দিয়ে চন্দ্রবাবুকে জড়িয়ে ধরে লীলা আকুল-স্বরে বললে, 'আছে, আছে, আছে! আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ও আমাকে আবার নিয়ে যাবে।' তুমি যদি একবার ছেড়ে যাও, ও আবার আমাকে নিয়ে যাবে।'

এমন সময়ে রোজাকে সঙ্গে করে আনন্দ পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল।

রোজা ভিতর এসেই বললে, 'আমি এই ঘরে কোন দুষ্ট আত্মাকে অনুভব

করছি।.....হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই। দুষ্ট আত্মা—পিশাচ, পিশাচ! রাজা নলের দেহে যেমন শনি ঢুকেছিল, সেও তেমনি কোন মানুষের মৃতদেহের মধ্যে ঢুকে পৃথিবীর উপর অত্যাচার করে বেড়ায়। ভীষণ পিশাচ! আমাকে আগে এই ঘরে বসেই কাজ আরম্ভ করতে হবে।'

আনন্দ ভীত ও সন্দিগ্ধনেত্রে পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল। কিন্তু সন্দেহ করবার মতন কোন-কিছুই দেখতে পেলে না। অথচ এইটুকু অনুভব করতে পারলে, ঘরের ভিতরে সে এবং রোজা ছাড়া অন্য কোন হিংস্র, ভয়ানকের অস্তিত্ব আছে।

উত্তেজনার পর উত্তেজনায় চন্দ্রবাবুর দেহ ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছিল, কিন্তু সেই অবস্থাতেই রোজার কথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ।

লীলা চোখের সামনে কি দেখতে পাচ্ছিল তা সেই-ই জানে, কিন্তু এইবারে সে দুই চক্ষু দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

রোজা মাটির উপরে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে উদ্যত হল—এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল একটা প্রবল দম্‌কা হাওয়া—সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে বিলম্বিত আলোটা হল নির্বাপিত।

রোজা চিৎকার করে বললে, আলো, আলো—শিগগির আর একটা 'আলো আনো। অন্ধকারে ফুটে উঠেছে দুটো মারাত্মক দীপ্ত চক্ষু, এখনি সর্বনাশের সম্ভাবনা। শিগগির আলো,—আলো, আলো, আলো!'

চন্দ্রবাবু আত্মহারার মতন এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে টেবিলের উপর থেকে আলোটা তুলে ও-ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

লীলা তীক্ষ্ণস্বরে কেঁদে উঠে বললে, 'জ্যাঠামশাই যাবেন না—যাবেন না—আমাকে একলা ফেলে যাবেন না, জ্যাঠামশাই।'

'আমি তোর সামনেই আছি মা, আলোটা ও-ঘরে রেখেই আবার তোর পাশে এসে বসব'—বলতে বলতে চন্দ্রবাবু পাশের ঘরে গিয়ে আলোটা মেঝের উপরে বসিয়ে দিয়েই আবার এ-ঘরে ফিরে আসবেন—

এমন সময় আচম্বিতে মাঝের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে! পর মুহূর্তেই লীলার কণ্ঠে জাগল পরিত্রাহি চীৎকারের পর চীৎকার!

চন্দ্রবাবু পাগলের মতন মাঝের দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আনন্দ ও রোজা যোগ দিলে তাঁর সঙ্গে। ও-ঘরের মধ্যে লীলার বিষম চীৎকার ও ব্যাকুল ক্রন্দন আরো বেড়ে উঠল, কিন্তু তিনজনের সমবেতশক্তিও দরজার পাল্লা দুখানাকে এক চুল ফাঁক করতে পারলে না।

তারপরেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল লীলার কণ্ঠস্বর! ও-ঘরের বারান্দার

দিকের একটা দরজা খোলার শব্দ হল। এবং তারপরেই অকস্মাৎ খুলে গেল মাঝের ঘরের বন্ধ দরজাটা। যারা প্রাণপণে দরজা ঠেলছিল তারা সকলেই টাল সামলাতে না পেরে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ও-ঘরের মেঝের উপরে পড়ে গেল হুম্‌ড়ি খেয়ে!

আলো এনে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

আনন্দ বারান্দায় যাবার খোলা দরজা দিয়ে ছুটে গেল বাইরে।

সেদিন উঠেছিল প্রতিপদের চাঁদ। চারিদিক করছে ধবধব।

বারান্দার তলাতেই একটি ছোট রাস্তা। তারপরেই একটা পুষ্করিণী এবং তার ভাঙা ঘাট।

সেই ভাঙা ঘাটের সামনে পুষ্করিণীর খানিকটা জল ঘুরছিল চক্রের পর চক্র দিয়ে। যেন এইমাত্র সেখানে কোন ভারি জিনিস পড়েছে কিংবা কেউ ঝাঁপ খেয়ে অতলে তলিয়ে গিয়েছে।

এক যুগ পরে

তারপর কেটে গিয়েছে বারো বৎসর—অর্থাৎ এক যুগ।

দেবতারা নাকি অমর, তাঁদের কথা বলতে পারি না; কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে এক যুগ বড় অল্পকালের কথা নয়। এই দেখ না, ধরতে গেলে বারো বৎসরের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীতে রক্তসাগরের ঢেউ খেলার জন্যে ধূমকেতুর মতন হিটলারের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান।

বারো বৎসর পরে লীলাকে না ভুললেও তার অভাব আনন্দকে আর তেমন ভাবে আঘাত দেয় না। চন্দ্রবাবু পরলোকে। নিজের সম্পত্তি তিনি দান করে গিয়েছেন আনন্দকেই এবং আনন্দও এখন একজন ভারতবিখ্যাত চিত্রকর। তার খ্যাতি হয়তো চন্দ্রবাবুর চেয়েও বেশী।

সেদিন আনন্দ চিত্রশালায় বসে নিজের মনে কাজ করছে। এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। আনন্দ মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে।

আগন্তুক বললেন, 'আমি মোহনপুরের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

মোহনপুর, মোহনপুর! স্মৃতি-বীণার একটি পুরাতন তার নূতন করে বেজে উঠল অনেকদিন পরে!

বাইরে কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার কাছে কি দরকার?'

—'মহারাজা বাহাদুরের একখানা তৈলচিত্র আঁকবার জন্যে আপনি মোহনপুরে যেতে পারবেন? পারিশ্রমিক যা চাইবেন পাবেন।'

আনন্দ সম্মতি জানালে।

—'কবে যেতে পারেন?'

—'আগামী রবিবার।'

যথাসময়ে আনন্দ মোহনপুরে গিয়ে হাজির হল।

বৈঠকখানায় বসেছিলেন মহারাজা বাহাদুর। অতি সদালাপী লোক। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ আনন্দের দৃষ্টি পড়ল মহেন্দ্রনারায়ণের প্রকাণ্ড তৈলচিত্রের উপরে। মহারাজের কি-একটা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সে একেবারে থেমে গেল—বিস্ফারিতনেত্রে আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইল ছবিখানার দিকে। তার মনে হল ছবির মুখ যেন তাকে দেখেই নির্দয় ব্যঙ্গভরা হাসি হাসছে।

মহারাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে আমার পিতামহের ছবি দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন! কেন বলুন দেখি?'

আনন্দ তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলে নিলে।

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে আনন্দ বাসার দিকে ফিরে আসছে। মোহনপুর এবং তার আশেপাশে দেখবার কিছুই নেই, বন, মাঠ আর নদী ছাড়া।

তখন চাঁদ উঠেছিল। খণ্ডচাঁদ। অন্ধকার একটুখানি পাৎলা হয়েছিল বটে, কিন্তু ভালো করে নজর চলে না। তার উপরে আনন্দ যেখান দিয়ে আসছিল সেখানে পথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে বড় বড় গাছের পর গাছ সৃষ্টি করেছে অন্ধ-করা অন্ধকার।

তফাতে দেখা যাচ্ছে একটা আলো।

খানিক এগিয়ে আনন্দ দেখলে, আলো হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি। আরো এগিয়ে বুঝলে মূর্তিটা স্ত্রীলোকের। কাছে এসে দেখলে, লীলার মূর্তি!

নিজের চোখকে আনন্দ বিশ্বাস করতে পারলে না, চমৎকৃত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

লীলা নীরবে হাসলে—অতি মৃদু করুণ হাসি।

আনন্দ বললে, 'লীলা।'

ওষ্ঠাধরে তর্জনী রেখে লীলা কথা কইতে মানা করলে আনন্দকে। তারপর ইসারা করে বললে আনন্দকে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে। তারপর সে অগ্রসর হল।

লীলার পিছনে পিছনে যেতে যেতে তার হাতের লণ্ঠনের আলোতে আনন্দ এটাও লক্ষ্য করলে, আজও সে পরে আছে সেই কাপড়খানাই, যা পরে যাত্রা করেছিল মোহনপুরের দিকে।

বন এত নিস্তব্ধ যে একটা ঝিঁঝিঁপোকাও ডাকছে না, গাছের একটা পাতার শব্দও হচ্ছে না। মরে গিয়েছে পৃথিবী। এটা যেন ইহলোক নয়, পরলোক।

বন শেষ। নদীর ধার, কিন্তু জলকলরোল শোনা যায় না। মরা চাঁদের আলো। বাতাসের দম বন্ধ।

একখানা পুরানো বাড়ীর খানিকটা ভেঙে পড়েছে, খানিকটা দাঁড়িয়ে আছে। লীলা তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একখানা মস্ত ঘর। তারই মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল লীলা এবং আনন্দ।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড পালঙ্ক—চারিধার তার মশারি দিয়ে ঘেরা।

মৌনমুখে ধীরপদে এগিয়ে গিয়ে লীলা মশারির কাপড় টেনে তুললে।

খাটের উপর একেবারে সিধে হয়ে বসে আছে মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণের বিভীষণ মূর্তি!

বিকট চীৎকার করে আনন্দ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

পরদিন প্রভাতে নদীর ধারে মোহনপুরের শ্মশানে আনন্দকে পাওয়া গেল। তখনও তার মূর্চ্ছা ভাঙে নি। তার কাছে ছিল একটা সেকেলে লণ্ঠন।

মড়ার মৃত্যু

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভৈরবের পরিচয়

যে ঘটনার কথা বলব, সেটা কেউ বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, এটা বিশ্বাস করবার মতো কথাও নয়। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরে বসে এমন ঘটনার ধারণাও করা অসম্ভব।

যদিও কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র দিলীপকুমার সেন এই ঘটনার আগাগোড়াই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, এবং তার সাক্ষীরও অভাব নেই, তবু সমস্ত রহস্যই যে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। যেসব ঘটনা অলৌকিক, পার্থিব জগতে তাদের অস্বাভাবিকতার যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কার করা সহজ নয়। আমরাও সে চেষ্টা করব না, কেবল সোজা কথায় সমস্ত ব্যাপারটা পাঠকদের কাছে বর্ণনা করব। যাঁদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে না তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই।

দিলীপ আজ চার বছর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রজীবন যাপন করছে। সে নির্জনতা ভালোবাসত বলে টালিগঞ্জের এমন এক জায়গায় বাসা নিয়েছিল যেখানে লোকালয় কম, মাঠ-ময়দান ও গাছপালাই বেশি। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পিছন দিয়ে যে সুদীর্ঘ রাস্তাটি সোজা গড়িয়াহাটার দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে, দিলীপের বাসাবাড়িটি ছিল তারই এক ধারে। তার পড়বার ঘরে বসে চারিদিকে তাকালে দেখা যায় কেবল সুনীল আকাশ, সবুজ মাঠ আর দূরে ও কাছে বনজঙ্গলের জীবন্ত ছবি। কোথাও কোনও গোলমাল নেই, মাঝে মাঝে কেবল দ্রুতগামী মোটরের কর্কশ চিৎকার আশপাশের মৌনব্রত ভাঙবার অল্পস্বল্প চেষ্টা করে।

কিন্তু বাসাবাড়িতে দিলীপ খালি একলাই থাকত না। একতালাটি ছিল দিলীপের এবং দোতালায় বাস করত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী নামে আর একটি যুবক। তার সঙ্গে এখনও দিলীপের ভালো করে পরিচয় হয়নি, কারণ ভৈরব অল্পদিনই এই বাসায় এসে উঠেছে।

একদিন সকালে কতকগুলো মড়ার হাড় ও মোটা মোটা ডাক্তারি কেতাবের মাঝখানে বসে দিলীপ নিজের মনেই পড়াশুনা করছে, এমন সময়ে তার দুই বন্ধু প্রতাপ ও অবনী এসে হাজির। এদেরও দুজনের বাড়ি ছিল টালিগঞ্জেই এবং তারা প্রায়ই দিলীপের সঙ্গে গল্প করতে আসত।

বই থেকে মুখ তুলে দিলীপ সুধোলে, 'কিহে, সক্কালবেলায় কি মনে করে?'

প্রতাপ একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'আমি এসেছি তোমার সঙ্গে গল্প করতে, আর অবনী এসেছে তার হবুভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করতে।'

দিলীপ একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আমার বাড়িতে অবনীর হবুভগ্নিপতি? তার মানে?'

—'তোমার বাসায় যে ভৈরবচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে, তারই সঙ্গে অবনীর বোনের বিয়ের কথা হচ্ছে যে!'

—'বটে, তা তো আমি জানতুম না! ভৈরববাবু তাহলে একটি ভালো পাত্র, বিয়ের বাজারে তাঁর দাম আছে?'

অবনী হাসতে হাসতে বললে, 'ঘটকরা তো তাই বলছে, কিন্তু প্রতাপ তা স্বীকার করে না।

—'কেন?'

প্রতাপ বললে, 'ভৈরবকে আমি কিছু কিছু চিনি। তার নাম বা স্বভাব কিছুই মিষ্ট নয়।'

দিলীপ বললে, 'ভৈরববাবুর কথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তোমার আপত্তির কারণ কি?'

—'ভৈরব হচ্ছে ভবঘুরে। তার বয়স তিরিশের বেশি নয়, কিন্তু এই বয়সেই সে মিশর, আরব, পারস্য, চীন আর জাপান প্রভৃতি দেশ ঘুরে এসেছে।'

—'দেশভ্রমণ কি দোষের বিষয়?'

—'না। লোকে নানান উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ করে। কিন্তু ভৈরব যে কিসের খোঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় তা শিবের বাবাও জানেন না। তার দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সন্দেহজনক। সে যে দেশেই গিয়েছে সেইখান থেকেই নানান সব সেকেলে জিনিস সংগ্রহ করে এনেছে। তার মতন একেলে ছেলের অত সেকেলে জিনিস সংগ্রহ করবার ঝোঁক কেন, তারও খবর কেউ রাখে না। এসব রহস্য আমি পছন্দ করি না।'

দিলীপ সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'তুমি দেখছি অকারণেই ভৈরববাবুর উপর খাপ্পা হয়েছ! ভৈরববাবুর সেকেলে জিনিস সংগ্রহ করবার বাতিক থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে আমি তো কিছু অন্যায় দেখছি না!'

প্রতাপ বললে, 'তাহলে তার স্বভাবের একটু পরিচয় দি, শোনো। নন্দলালকে তুমি চেনো তো, সেও মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। এই পরশুদিনই নন্দলালের সঙ্গে ভৈরবের রীতিমতো একটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে!'

—'কি রকম, কি রকম?'

—'তোমার মনে আছে বোধহয়, পরশু সকালে কিরকম বর্ষা নেমেছিল? সেই সময় টালিগঞ্জের একটা খুব সরু গলির ভিতর দিয়ে ভৈরব কোথায় যাচ্ছিল। পথের ওদিক দিয়ে মাথায় একটা মস্ত বড়ো শাকসবজির ঝুড়ি নিয়ে এক বুড়ি আসছিল বাজারের পানে। বদমাইস ভৈরবটা কি করলে জানো? সেই বুড়ি-বেচারিকে এমন এক ধাক্কা মেরে এগিয়ে গেল যে, ঝুড়িসুদ্ধ বুড়ি পড়ল গিয়ে পাশের এক খানার ভিতরে মুখ গুঁজড়ে! দৈবক্রমে নন্দলালও ঠিক সেই সময়েই সেখানে এসে পড়ে। ভৈরবের নিষ্ঠুরতা দেখে নন্দলাল একেবারেই ক্ষেপে গেল। সে তখনই ভৈরবকে রীতিমতো উত্তম-মধ্যম দিতে কসুর করলে না। তারপর থেকে ভৈরবের সঙ্গে নন্দলালের কথা বন্ধ হয়েছে। এখন বলো দেখি, এর পরেও কি আর ভৈরবের উপরে কারুর শ্রদ্ধা থাকতে পারে? এই লোকের সঙ্গেই অবনী দিতে চায় তার বোনের বিয়ে! আশ্চর্য!'

অবনী অপ্রতিভ স্বরে বললে, 'কি করব ভাই, বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কি কথা

কওয়া উচিত? ভৈরব নাকি ধনীর ছেলে, তার উপরে গ্রাজুয়েট! বাবার মতে এমন পাত্র নাকি হাতছাড়া করতে নেই! আমি আজ পাকা দেখার দিন স্থির করতে এসেছি।'

প্রতাপ বললে, 'তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ভৈরবচন্দ্রের চন্দ্রমুখ দর্শন করে এস। ততক্ষণে আমি দিলীপের স্টোভ জ্বেলে একটু চা তৈরির চেষ্টা করি।'

দিলীপ আবার একটা মড়ার মাথার খুলি টেনে নিয়ে বললে, 'দেখো ভাই অবনী, বিয়ের পরে তোমার বোন সুখী হবেন কি না জানি না, কিন্তু বিয়ের দিনে যেন আমরা লুচি-মণ্ডা থেকে বঞ্চিত না হই।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কে চ্যাঁচায়?—কেন চ্যাঁচায়?

চা পান করে প্রতাপ চলে গেলে পর দিলীপ আবার ভালো করে পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ বিষম তোড়ে বৃষ্টি নামল। টালিগঞ্জের সেই নির্জন ও অন্ধকার মাঠের শূন্যতা বৃষ্টি ও ঝড়ের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠল। দিলীপ উঠে জানলাগুলো বন্ধ করে ঘরের দরজাটাও বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময় অবনী নিচে নেমে এসে ব্যস্ত হয়ে বললে, 'দরজা বন্ধ করছ কি হে, এই বৃষ্টিতে আমি যাব কোথায়?'

দিলীপ বললে, 'কে তোমায় যেতে বলছে? ঘরের ভেতরে এস। ইজিচেয়ারে শুয়ে চুপ করে বৃষ্টির গান শোনো, আর আমি নিজের মনে লেখাপড়া করি।'

অবনী ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে বসে পড়ে বললে, 'এই বাদলায় রাখো তোমার লেখাপড়া! এস, খানিকটা গল্পগুজব করা যাক।'

দিলীপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বই মুড়ে বললে, 'আজ যখন শনি-অবতার তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তখন আমার লেখাপড়া যে হবে না সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম! বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

বাইরে পড়তে লাগল বৃষ্টি, আর ভিতরে চলতে লাগল দুই বন্ধুর গল্প। একঘণ্টা পরেও বাইরের বৃষ্টি ও ভিতরের গল্প থামবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

ঘরের ঘড়িতে টুং টুং করে যখন এগারোটা বেজে গেল, অবনীর তখন খেয়াল হল যে, তাকে আজ বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু জানলার উপরে তখনও ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কার সঙ্গে বৃষ্টি পড়ার অশ্রান্ত শব্দ হচ্ছে।

দিলীপ বললে, 'অবু, আজ বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যাও। এখান থেকে বেরুলে তোমাকে সাঁতার কাটতে হবে।'

অবনী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তাই সই। বাবা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন, সব কথা শোনবার জন্যে। চললুম।' সে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুললে।

—সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দের ভিতরেই বাহির থেকে ভেসে এল একটা ভীত আর্ত চিৎকার! অবনী চমকে ফিরে দাঁড়াল।

দিলীপও লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কে চিৎকার করলে?'

দুই বন্ধুই দরজার কাছে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আগেই বলেছি, দিলীপের বাসা যে জায়গায় তার কাছে কোনও লোকালয় নেই। এই ঝড়-জলে পথেও কোনও লোক থাকবার কথা নয়। এখানে কে চিৎকার করবে?

অবনী ভয়ে ভয়ে বললে, 'অন্ধকারে পথে কেউ মোটর চাপা পড়ল নাকি?'

দিলীপ ঘাড় নেড়ে বললে, 'পাগল! পথ এখন জলের তলায়, সেখানে মোটর চালাবার শখ কারুর হবে না।'

আবার শোনা গেল—কেউ যেন দারুণ আতঙ্কে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আর্তনাদের পর আর্তনাদ করছে! এবারে বেশ বোঝা গেল, শব্দটা আসছে দিলীপের বাসার উপরতালা থেকেই।

অবনী কম্পিত স্বরে বললে, 'এ যে ভৈরববাবুর গলা! তিনি তো ঘরে একলা আছেন! কী দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন?'

দিলীপ কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বললে, 'সেটা জানতে হলে আমাদেরও ওপরে যেতে হয়।'

অবনী বললে, 'তাহলে আমিই ওপরে যাই, তুমি এইখানে দাঁড়াও। ভৈরববাবু তাঁর ঘরে বাইরের লোক আসা পছন্দ করেন না!'

—'পছন্দ করেন না! কেন?'

—'তাঁর ঘরের সাজসজ্জা অদ্ভুত। বাইরের লোক সেসব দেখলে কেবল অবাকই হবে না, ভয় পেতেও পারে, তাঁকে পাগলও ভাবতে পারে!' বলেই অবনী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

দিলীপ সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে, বিস্মিত মনে অবনীর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে শুনতে লাগল, ভৈরবের বদ্ধকণ্ঠের অস্ফুট কাতরানি!

তারপরই শোনা গেল উপর থেকে অবনীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—'দিলীপ, দিলীপ! শিগগির, শিগগির ওপরে এস! ভৈরববাবু মরো মরো হয়েছেন!''

দিলীপ তিন-চার লাফে দোতালার সিঁড়িগুলো পার হয়ে ভৈরবের ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোকে ঘরের ভিতরটা স্পষ্টরূপে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘর দেখে সত্যিসত্যিই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল! এমন দৃশ্য সে জীবনে আর কখনো দেখেনি!

পণ্ডিতরা প্রাচীন মিশরের মাটি খুঁড়ে অতীতের সমাধিমন্দির প্রভৃতি থেকে যেসব অদ্ভুত মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, দিলীপ অনেক কেতাবে তাদের অসংখ্য ছবি দেখেছে। ঘরের দেওয়ালের সামনে দাঁড় করানো রয়েছে সেই রকম অনেকগুলো ছোটো-বড়ো কাঠের মূর্তি! মূর্তিগুলোর চেহারা মানুষের মতোই, কিন্তু তাদের কারুর মাথা ষাঁড়ের মতো, কারুর মাথা সারস পাখির মতো, কারুর বা বিড়াল কি প্যাঁচার মতো! এরাই ছিল প্রাচীন মিশরের দেব-দেবী! ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটা কুমিরের মৃতদেহ—দিলীপ জানত, কুমিরও ছিল প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে দেবতাস্থানীয়।

ঘরের মাঝখানে একটা বড়ো টেবিলের উপরে প্রাচীন মিশরের একটা 'কফিন' বা 'মমি'র বাক্স, তার ডালা খোলা। এবং তারই ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মিশরী 'মমি' বা মানুষের সুরক্ষিত মৃতদেহ!

কলকাতার যাদুঘরে দিলীপ একটা 'মমি' দেখেছিল। সেটা হচ্ছে কয়েক হাজার বছর আগেকার একটি মিশরীয় নারীর মৃতদেহ! সে মড়াটার দেহ কলকাতার স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়ায় এসে শীঘ্রই জীর্ণ হয়ে পড়েছে, তাই আগে সেটা দাঁড় করানো ছিল বটে, কিন্তু এখন তাকে শুইয়ে রাখতে হয়েছে। যাদুঘরের ওই 'মমি'টা হচ্ছে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, তার দেহের নানান জায়গা খসে পড়েছে কিন্তু আজ সে চোখের সামনে প্রাচীন মানুষের যে সুরক্ষিত দেহটা দেখলে, এটা পুরুষের দেহ, আর এমন পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্তের মতো দেখতে যে তাকে মৃতদেহ বলে কল্পনা করাও অসম্ভব! যদিও হাজার হাজার বছরের মহিমায় তার গায়ের রং অস্বাভাবিকরূপে কালো হয়ে গিয়েছে, তার সমস্ত শরীর রীতিমতো অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছে, তবু তার শুকনো, বীভৎস মুখের দিকে তাকালে মন এক অপার্থিব ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়!

'মমি'টার ঠিক পায়ের তলাতেই ঘরের মেঝের উপরে লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে ভৈরবচন্দ্রের দেহ এবং তার হাতে রয়েছে কোষ্ঠী-ঠিকুজীর মতো পাকানো একখানা আধখোলা লম্বা কাগজ। দিলীপ বুঝলে, সেখানা হচ্ছে প্রাচীন মিশরের 'পাপিরাস' পাতার পুথি!

অবনী কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, 'ভৈরববাবু বোধহয় আর বাঁচবেন না!'

দিলীপ হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, এত সহজে কাতর হবার পাত্র নয়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে ভৈরবের পাশে গিয়ে বসে পড়ল এবং তার দেহটা পরীক্ষা করে বললে, 'ভয় নেই অবনী, ভৈরববাবু কেবল অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তুমি এগিয়ে এসে এঁর পা-দুটো ধরো, মাথার দিক আমি ধরছি। এখন চলো, এঁকে ওই শোফার উপরে শুইয়ে দিতে হবে। জলের কুঁজোটা নিয়ে এস, ভৈরববাবুর মুখে আর বুকে জলের ঝাপটা দাও।...কিন্তু এঁর এমন দশা হল কেন?'

অবনী বললে, 'জানি না। ঘরে এসে ওঁকে আমি ওই অবস্থাতেই দেখেছি।'

দিলীপ ভৈরবের বুকের উপর হাত রেখে বললে, 'এঁর বুক যেন হাপরের মতন উঠছে নামছে! বেশ বোঝা যাচ্ছে, ভয়ানক কিছু দেখেই ইনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।'

অবনী বললে, 'তাহলে হয়তো যত নষ্টের গোড়া ওই 'মমি'টা!'

—' 'মমি'? কিরকম?'

—'ওই কত-হাজার বছরের পুরানো মড়া দেখলে কার না ভয় হয়? জ্যান্ত মানুষের পক্ষে এসব ভূতুড়ে ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ভালো নয়। কিছুকাল আগে আর একবারও এঁকে আমি এই অবস্থায় দেখেছিলুম। সেদিনও ইনি ওই ভূতুড়ে মূর্তিটার পায়ের তলায় এমনিভাবেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন!'

—' 'মমি'টাকে নিয়ে ইনি কি করতে চান?'

—'কে জানে! ভৈরববাবুর মাথায় বোধহয় ছিট আছে। এইসব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করাই হচ্ছে ওঁর বাতিক! আমি কত মানা করি—বলি, জীবন্তের সঙ্গে মৃতের সম্পর্ক রাখা ভালোও নয় উচিতও নয়! শুনে উনি হাসেন, বলেন, এ হচ্ছে আমার শব-সাধনা!'

—'চুপ! রোগীর জ্ঞান ফিরে আসছে।'

ভৈরবের মুখ এতক্ষণ সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, এইবারে তার উপরে একটু একটু করে রঙের আভাস ফুটে উঠছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসও ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল। খানিক পরে সে চোখ খুলে ঘরের এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখলে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল 'মমি'র দিকে, সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসল এবং তারপরেই এক লাফে এগিয়ে গিয়ে পাকানো 'পাপিরাস' কাগজের সেই পুথিখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের একটা টানার ভিতরে পুরে ফেললে। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'আমার ঘরে বাইরের লোক কেন? আপনাদের কি দরকার?'

অবনী আহত স্বরে বললে, 'দরকার আমাদের কিছুই নেই! আপনি চিৎকার করে কাঁদছিলেন, তাই শুনে আমরা এসেছি সাহায্য করতে।'

ভৈরব অপ্রতিভ স্বরে বললে, 'এই যে, দিলীপবাবু! আমার এখন মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলে ফেলেছি, আপনারা আমাকে মাপ করবেন। ভাগ্যিস আপনারা এসেছিলেন, নইলে কি যে হত জানি না! ওঃ, আমি কি নির্বোধ, আমি কি নির্বোধ!'—বলতে বলতে আবার সোফার উপরে গিয়ে বসে পড়ে দুই হাতের ভিতরে মুখ ঢেকে ফেললে।

অবনী ভৈরবের কাছে গিয়ে তার মাথার উপরে হাত রেখে বললে, 'ভৈরববাবু, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন! নিশুত রাতে 'মমি' নিয়ে নাড়াচাড়া করা মানুষের উচিত নয়। কিসে কি হয় বলা যায় না।'

ভৈরব মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললে, 'অবনীবাবু, আমি যা দেখেছি, তা যদি আপনিও দেখতেন, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেতেন।'

—'কী দেখেছেন আপনি?'

ভৈরব হঠাৎ গলার স্বর বদলে বললে, 'না, এমন কিছু নয়। আমি বলছি কি, দুপুর রাতে 'মমি'র সঙ্গে থাকতে হলে অনেকেরই সাহসে কুলোবে না!...একি, আপনারা চলে যাচ্ছেন নাকি? না, না, এখনই যাবেন না, আর একটু বসুন!'

অবনী বললে, 'ঘরের ভেতরে এ কিসের গন্ধ? দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে!'

টেবিলের উপরের একটা পাত্র থেকে শুকনো পাতার মতো কি কতকগুলো তুলে নিয়ে একটা জ্বলন্ত ধুনচির ভিতরে নিক্ষেপ করে ভৈরব বললে, 'এ হচ্ছে মিশরী পুরুতদের পবিত্র ধুনো।...আচ্ছা অবনীবাবু, আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম?'

—'বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচ-ছয়।'

ভৈরব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'অচেতনতা হচ্ছে এক অদ্ভুত জিনিস! অচেতনতার মধ্যে সময়ের মাপ নেই। অজ্ঞান হয়ে থাকলে কেউ বুঝতে পারে না তার অসাড়তার ভিতর দিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে! টেবিলের উপরে ওই যে মৃত মানুষটিকে দেখছেন, প্রাচীন মিশরে ও বেঁচে ছিল চার হাজার বছর আগে! কিন্তু ওকে যদি এখনই জাগাতে পারা যায়, ও হয়তো বলবে, মিনিট খানেক আগেই ও বেঁচে ছিল! দিলীপবাবু, এই 'মমি'টা খুব চমৎকার, নয়?'

পচা মড়া কাটাই হচ্ছে দিলীপের ব্যবসা। নরদেহের নাড়িনক্ষত্র তার জানা আছে। 'মমি'টার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে তাকে ভালো করে আবার দেখতে লাগল। তার দেহের

মাংস শুকিয়ে গিয়েছে বটে। কিন্তু কোথাও কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব নেই। হাড়ের উপরে চামড়া এখনও 'টাইট' হয়ে চেপে আছে, দুই কানের উপরে রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলগুলো এখনও ঝুলে রয়েছে। কোটরের ভিতরে বাদামের মতন দুটো তীক্ষ্ণ চোখ এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভৈরব উঠে দাঁড়িয়ে 'মমি'র কপালের কোঁচকানো চামড়ার উপরে হাত রেখে বললে, 'এই প্রাচীন ভদ্রলোকের নাম আমি জানি না। এঁকে আমি কিনেছিলুম একটা নিলাম থেকে।'

দিলীপ বললে, 'জ্যান্ত অবস্থায় লোকটি বোধহয় খুব জোয়ান ছিল।

—'খালি জোয়ান নয়, অতিকায়। মাথায় এই লোকটি ছয় ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু! এর হাড়গুলো কিরকম চওড়া দেখুন। এ যদি এখন জ্যান্ত হয়ে ওঠে, তাহলে গায়ের জোরে আমরা কেউ এর সঙ্গে যুঝতে পারব না।'

ভৈরব বেশ সহজভাবেই কথা কইবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু দিলীপ স্পষ্ট বুঝতে পারলে, তার মনের ভিতরটা এখনও, ভয়ে থমথম করছে! তার হাত কাঁপছে, তার ঠোঁট কাঁপছে এবং তার চোখের দৃষ্টি থেকে থেকে কেবলই সেই 'মমি'টার মুখের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তবু তার ভয়ের ভিতর থেকেও যেন একটা আনন্দের আভাসও ফুটে উঠছে! বিষম বিপদের মধ্যেও সে আবিষ্কার করেছে যেন কোনও সফলতার কারণ! দিলীপকে দরজার দিকে অগ্রসর হতে দেখে ভৈরব বললে, 'আপনি কি এখনই যাবেন? আর একটু থাকবেন না?'

দিলীপ বললে, 'আর থাকা অসম্ভব। আমার পড়া এখনও শেষ হয়নি।'

—'অবনীবাবু, আপনি?'

—'আমিও আর থাকতে পারব না, রাত অনেক হল।'

জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভৈরব বললে, 'আচ্ছা, চলুন অবনীবাবু, আপনাকে খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি।'

দিলীপ বুঝলে, ভৈরব এখন এ ঘরে একলা থাকতে রাজি নয়। কিন্তু কেন? নিজের ঘরে তার ভয় কিসের?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কে কথা কয়, খাবার খায়, চলা-ফেরা করে?

তারপর থেকেই দিলীপের সঙ্গে ভৈরব রীতিমতো মাখামাখি শুরু করে দিলে। যদিও দিলীপ খুব মিশুক লোক ছিল না এবং ভৈরবের কর্কশ স্বভাব তার বিশেষ ভালো লাগত না, তবু সাধারণ ভদ্রতার অনুরোধে ভৈরবের সঙ্গে তাকে অল্পবিস্তর মেলামেশা করতেই হল। ভৈরব প্রায়ই তার কাছ থেকে নানা শ্রেণীর বই পড়বার জন্যে নিয়ে যেত এবং সেও মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে ভালো ভালো বই চেয়ে আনত।

এইভাবে দিনকয়েক পরে পরিচয় কিঞ্চিত ঘনিষ্ঠ হলে দিলীপ বুঝলে যে, নানা বিষয়েই

ভৈরব হচ্ছে অসাধারণ পণ্ডিত। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দিলীপ তার কাছে প্রায় শিশু। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তার চেয়ে বিশেষজ্ঞ লোক বোধহয় সারা ভারতবর্ষে নেই।

দিলীপ একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা ভৈরববাবু, প্রাচীন মিশরীরা মড়াকে 'মমি' করে কবর দিত কেন?'

ভৈরব বললে, 'প্রাচীন মিশরের বিশ্বাস ছিল, আত্মা অমর। পৃথিবীর মৃত্যুর পরে আর অনন্ত জীবন আরম্ভ হবার আগে দেহ ছেড়ে আত্মা কিছুকাল আলাদা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তারপর আবার পার্থিব দেহের ভিতরেই ফিরে আসে। আত্মা আর দেহের এই পুনর্মিলনের আগেই নশ্বর দেহ পাছে নষ্ট হয়ে যায়, সেই ভয়ে মিশরীরা নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে চিরস্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা করত। তারা দেহকে কফিনে পুরে কেবল গোর দিয়েই নিশ্চিন্ত হত না, আত্মা যেদিন আবার দেহের ভিতরে ফিরে আসবে, তখন তার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে কবরের ভিতরে খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, খাট-বিছানা, তৈজসপত্র প্রভৃতি যা কিছু দরকার সবই রেখে দিত। রাজা-রাজড়া আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তাঁদের দাস-দাসিদেরও দেহের সঙ্গে কবরে যেতে হত, অর্থাৎ তাদের হত্যা করে দেহগুলো কবরে পাঠানো হত—যাতে করে দেহের ভিতরে ফিরে এসে রাজার আত্মা লোকাভাবে কষ্ট না পায়!'

—'ভৈরববাবু, আপনি কি এই বিশ্বাস সত্যি বলে মনে করেন?'

—'আমি কি সত্যি বলে ভাবি, সে কথা শুনে কি হবে? তবে প্রাচীন মিশরের পুরুতরা যে মমিকে বাঁচিয়ে তোলবার মন্ত্র জানত, এটা হয়তো মিথ্যা নয়!'

—'সে মন্ত্র এখন আর কেউ জানে না?'

—'প্রাচীন মিশরে যে অদ্ভুত মানুষরা বাস করত, তাদের কেউ আর বেঁচে নেই, 'মমি' রূপে নষ্ট হয়নি কেবল তাদের দেহগুলো। তবে পুরানো পাপিরাস পাতার গুটানো পুথিতে মড়া জাগানো মন্ত্র-তন্ত্র এখনও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেরকম পুথি এখন অত্যন্ত দুর্লভ।'

—'আপনি প্রাচীন মিশরের ভাষা জানেন?'

—'জানি।'

—'তাদের মড়া জাগানো মন্ত্র আপনি কখনও পড়েছেন?'

—'আমি? না, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি'—বলেই ভৈরব অন্য প্রসঙ্গ তুললে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গটাও হচ্ছে মমির প্রসঙ্গ। সে বললে, 'প্রাচীন মিশরের মানুষরা তাদের সভ্যতা আর অনেক গুপ্তকথা নিয়ে পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে বটে, মমিদের জ্যান্ত মানুষ করে তোলবার বিদ্যাও আজ কেউ জানে না বটে, কিন্তু মিশরের পুরানো গোরস্থানের মধ্যে আজও যে দেহহীন আত্মারা জীবন্ত হয়ে আছে, মিশর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অনেক বিলাতি পণ্ডিত এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারেন না! বিলাতি সংবাদপত্রেও প্রায়ই পড়া যায়, কৌতূহলী সাহেব-ভ্রমণকারীরা মিশর থেকে মমি কিনে বিলাতে নিয়ে গিয়ে নানান অলৌকিক কাণ্ড দেখেছেন, আশ্চর্য সব বিপদে পড়েছেন! কবর থেকে বার করে আনলে মমি যে অভিশাপ বহন করে আসে, একথা তো এখন চলতি বিলাতি প্রবাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে! যেসব বিখ্যাত সাহেবপণ্ডিত মাটি খুঁড়ে প্রাচীন

মিশরের কবর ঘেঁটে তছনছ করেন, তাঁদের অনেকেই যে পরে নানা দৈবদুর্ঘটনায় অপঘাতে মারা পড়েন, একথাও সবাই জানে! এইসব দেখেশুনে স্বীকার করতে হয় যে, আজ আমরা যাদের মমি দেখি, তাদের আত্মা এখনও মরেনি, নিজেদের পার্থিব দেহকে এখনও তারা ভালোবাসে এবং সুযোগ পেলেই আবার সেই দেহে ফিরে আসতে চায়! আমরা হিন্দু, আমরাও প্রাচীন জাতি, আর আমরাও আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করি। দেহের প্রতি মমতা থাকলে পাছে আত্মা পৃথিবী ছাড়তে না চায়, হয়তো সেই ভয়েই হিন্দুদের শাস্ত্র বিধান দিয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে মৃতদেহকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে!'

সময়ে সময়ে দিলীপের মনে হত, ভৈরবের মধ্যে উন্মাদরোগের পূর্বলক্ষণ দেখা দিয়েছে! একদিন কথা কইতে কইতে হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মঙ্গল আর অমঙ্গলকে নিজের অধিকারে আনতে পারা—ওঃ সে কী সৌভাগ্য! স্বর্গের দেবতা আর নরকের দানবকে যদি আমার হাতের মুঠোয় পাই, তাহলে আমি পৃথিবী শাসন করতে পারি!'

আর একদিন সে বললে, 'অবনীর বোনকে আমি বিয়ে করব বটে, কিন্তু অবনী কোনও কর্মেরই নয়! অবশ্য মানুষ হিসাবে অবনী ভালো লোক, কিন্তু যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, সে তার যথার্থ বন্ধু হতে পারবে না। সে আমার বন্ধু হবার যোগ্য নয়!'

আজ কদিন থেকে তাকে আবার একটা নতুন রোগে ধরেছে। দিলীপ নিচে থেকে প্রায়ই শুনতে পায়, উপরের ঘরে একলা বসে ভৈরব নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কয়! গভীর রাতে দিলীপ পড়াশুনো করছে, উপরের ঘরে বাইরের জনপ্রাণী নেই, অথচ চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে বেশ শোনা যায়, ভৈরব খুব মৃদু স্বরে—প্রায় ফিসফিস করে—আপন মনে কথাবার্তা কইছে!

তার এই অদ্ভুত অভ্যাসে বিরক্ত হয়ে দিলীপ একদিন বললে, 'ভৈরববাবু, নিজের সঙ্গে নিজেই গল্প করতে কি আপনার খুব ভালো লাগে?'

ভৈরব চমকে উঠে বললে, 'আমি কি নিজের সঙ্গে গল্প করি? না, না, আপনি ভুল শুনেছেন!'

কিন্তু দিলীপ ভুল শোনেনি, শীঘ্রই সে প্রমাণ পাওয়া গেল। কেষ্ট হচ্ছে দিলীপের পুরানো চাকর। সে একদিন বললে, 'বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

—'কি কথা?'

—'ওপরের ঘরের ওই বাবুটির মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?'

—'কেন?'

—'আমার তো তাই মনে হয়। ঘরে কেউ থাকে না, অথচ তিনি কথা বলেন কার সঙ্গে?'

—'সে কথায় তোমার দরকার কি কেষ্ট?'

—'দরকার নেই বটে, কিন্তু এটা কি আশ্চয্যি নয়? এর চেয়েও আশ্চয্যি কি জানেন? বাবুটি যখন নিজের ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যান, তাঁর ঘরের ভেতরে মেঝের ওপরে ভারি ভারি পা ফেলে তখনও কে বেড়িয়ে বেড়ায়! বাবু, এসব ভালো কথা নয়, আমার ভারী ভয় হয়!

—'কী বাজে বকছ!'

—'বাজে নয় বাবু, আমি নিজের কানে শুনেছি! কেবল ঘরের ভেতরে নয় বাবু, এক একদিন বাইরেও পায়ের শব্দ শুনতে পাই। একদিন হল কি, আমি উঠোনের কোণে আমার ঘরের সামনে বসে তামাক সাজছি। তখন সন্ধে উৎরে গেছে, উঠোনের ওদিকটা অন্ধকার। বাসায় কেউ ছিল না বলে সদর দরজায় খিল দিয়ে রেখেছি। হঠাৎ শুনলুম, সিঁড়ি দিয়ে কে নেমে আসছে! বাসায় কেউ নেই, তবু সিঁড়ি দিয়ে কে নামে! আমি শুধুলুম—'কে যায়?' সাড়া পেলুম না, কিন্তু উঠোনের যেখানটা অন্ধকার, সেখানে শুনলুম কার পায়ের শব্দ! তারপরই দুম করে সদরের খিল খুলে গেল আর দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল! এ কী কাণ্ড, বাবু!'

—'কেষ্ট, ভৈরববাবু নিশ্চয়ই তোমার অজান্তে বাসায় ছিলেন, বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই!'

—'তাহলে তিনি সাড়া দিলেন না কেন?'

—'সেটা তাঁর খুশি।'

—'তাহলে আর একটা কথা বলি শুনুন! ভৈরববাবুর খাবার আসে রোজ হোটেল থেকে, জানেন তো? এতদিন দুবেলা একজনের জন্যেই খাবার আসত, কিন্তু হোটেলের চাকরের মুখে শুনলুম, আজকাল রোজ রাত্রে খাবার আসে দুজনের জন্যে। ভৈরববাবু একলা, কিন্তু তাঁর ঘরে রাত্রে দুজনের খাবার যায় কেন? সে খাবার কে খায়?'

—'ভৈরববাবুই। হয়তো তাঁর ক্ষিধে বেশি, একজনের খাবারে কুলোয় না।'

—'কিন্তু তাঁর ক্ষিধে কি রাত্রেই বাড়ে? সকালে তো দুজনের খাবার আসে না? আর আগে তো তাঁর এমন রাক্ষুসে ক্ষিধে ছিল না? হঠাৎ তাঁর রাতের ক্ষিধেই বা বাড়ল কেন? যখন থেকে এই আশ্চয্যি পায়ের শব্দ পাচ্ছি, তাঁর ক্ষিধে বেড়েছে তখন থেকেই!'

—'কেষ্ট, তুমি একটি রাবিশ!'

—'বিশ্বাস করছেন না, কি আর বলব!'—এই বলে কেষ্ট চলে গেল।

দিলীপ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—ভৈরব যখন ঘরে থাকে না, তখন কে সেখানে চলা-ফেরা করতে পারে? ভৈরব কি তার ঘরের ভিতরে অন্য কোনও লোককে লুকিয়ে রেখেছে? সে কে? আর লুকিয়েই বা থাকবে কেন? আজ কেষ্ট যে এই দুজনের খাবারের কথা বললে, সেটাই বা কী ব্যাপার? যদি ধরি, ভৈরবের ঘরে কেউ লুকিয়ে আছে আর দুজনের খাবার আসে সেই জন্যেই, তাহলে রোজ সকালেও দুজনের খাবার আসে না কেন? সকালে সে কি উপোস করে থাকে?.....এসবই যে ধাঁধার মতন গোলমেলে কাণ্ড! কেষ্টকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলুম বটে, কিন্তু আমাকেও যে ভাবিয়ে তুললে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আবার পদশব্দ

সে রাত্রে ভৈরব নেমে এসে দিলীপের সঙ্গে গল্প করছিল।

কথা কইতে কইতে দিলীপ স্পষ্ট শুনতে পেলে, দোতালার ঘরের মেঝে কার পদশব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে—কে যেন ভারি ভারি পা ফেলে পায়চারি করে বেড়োচ্ছে! তারপরেই দুম করে উপরের দরজার আওয়াজ!

দিলীপ সচমকে বলে উঠল, 'ভৈরববাবু, কে আপনার ঘরের দরজা খুললে, কি বন্ধ করলে!'

ভৈরব এক লাফে উঠে পড়ে একান্ত অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, সে যেন ভয়ও পেয়েছে এবং দিলীপের কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না!

সে থেমে থেমে বললে, 'ঘরের দরজা নিশ্চয়ই আমি তালা দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই! দরজা খোলা অসম্ভব!'

—'শুনুন ভৈরববাবু শুনুন! সিঁড়ির ওপরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন! কে নিচে নেমে আসছে!'

ভৈরব বেগে বাইরে ছুটে গিয়ে দিলীপের দরজার পাল্লা দুখানা চেপে বন্ধ করে দিলে এবং দ্রুতপদে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে তার পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল এবং তারপরে শোনা গেল ফিসফিস করে কথার আওয়াজ! খানিক পরে আবার দোতালা ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল, তারপর ভৈরব নিচেয় এসে ফের যখন দিলীপের ঘরে ঢুকলে, তখন তার কপাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের দর দর ধারা!

অবসন্নের মতো চেয়ারের উপরে বসে পড়ে ভৈরব হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'নাঃ, সব ঠিক আছে! ওই হতচ্ছাড়া কুকুরটার কাণ্ড আর কি! সেই-ই দরজাটা খুলে ফেলেছিল, আমি তালা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলুম কিনা!'

ভৈরবের বিকৃত মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দিলীপ বললে, 'আপনার যে আবার একটা কুকুর আছে, এ খবর তো আমার জানা ছিল না!'

—'হ্যাঁ, সবে পুষেছি! আবার তাড়িয়ে দেব, জ্বালিয়ে মারলে!'

—'আমিও কুকুর ভালোবাসি। একবার তাকে আনুন না, দেখব।'

—'বেশ তো, তবে আজ নয়। আজ আমার একটা জরুরি কাজ আছে, এখনই বাইরে যেতে হবে।'

ভৈরব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কিন্তু দিলীপ নিচে বসেই শুনতে পেলে জরুরি কাজে বাইরে না গিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকেই ভিতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে!

দিলীপ মনে মনে খাপ্পা হয়ে উঠল! ভৈরব তাহলে পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী! এমন কাঁচা মিথ্যাকথা কইলে যে, একটা শিশুকেও ফাঁকি দিতে পারবে না! ঘরে কুকুর আছে না ছাই আছে! সিঁড়ির উপরে এইমাত্র যে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কোনও কুকুরের পায়ের আওয়াজই সেরকম হতে পারে না! দস্তুরমতো মানুষের পায়ের আওয়াজ! কেষ্ট তো ঠিক কথাই বলেছে! কিন্তু কে তার ঘরে লুকিয়ে আছে? কেন লুকিয়ে আছে? সে কি খুনে? চোর? পুলিশের ভয়ে এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছে? তাই কি ভৈরব মিথ্যা বললে? কিন্তু যে লোক পলাতক আসামিকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখে, তার সঙ্গে তো আর কোনও সম্পর্ক রাখাই উচিত নয়! শেষটা কি সেও পুলিশ-মামলায় জড়িয়ে পড়বে?

মনে মনে ভৈরবকে 'বয়কট' করবার প্রতিজ্ঞা করে দিলীপ 'অ্যানাটমি'র একখানা মস্ত বই টেনে নিয়ে পড়তে বসল। কিন্তু খানিক পরেই আবার পড়ায় বাধা পড়ল।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে, ঘরের মধ্যে প্রতাপের আবির্ভাব হয়েছে।

তার পাশে বসে পড়ে প্রতাপ বললে, 'দিলীপ, তুমি একটি আস্ত গ্রন্থকীট! দিন-রাত খালি

পড়া আর পড়া আর পড়া! এদিকে পরশু আমাদের 'ইলিয়ট সিল্ডে'র খেলা সে কথা কি তোমার মনে নেই?'

—'টিমে কি আমি আছি?'

—'নিশ্চয়! 'সিলেকসান' হয়ে গেছে আজই। তুমি খেলবে রাইট লাইনে। কাল মাঠে গিয়ে 'প্র্যাকটিস' করে এস।'

—'যাব। কিন্তু আজ বিদায় হও দেখি, আমাকে পড়তে দাও। আর কোনও খবর নেই তো?'

—'একটা খবর আছে। তোমাকে সেদিন নন্দলাল আর ভৈরবের ঝগড়ার কথা বলেছিলুম, মনে আছে তো? কাল নন্দলাল বিষম বিপদে পড়েছিল।'

—'কি বিপদ?'

—'নন্দলাল কাল মাঠের রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি ফিরছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কে তাকে আক্রমণ করে!'

—'কে আক্রমণ করে?'

—'সেইটে বলাই তো মুশকিল! নন্দলালের মতে, সে মানুষ নয়! অবশ্য তার গলায় নখের আঘাতে যে গভীর ক্ষত হয়েছে, মানুষের নখে সেরকম ক্ষত হওয়া সম্ভবও নয়!'

—'তবে? তবে কি নন্দলালের ঘাড়ে ভূত চেপেছিল?'

—'ধুৎ! কে বলছে তা? ভূত-টুত কিছু নয়! আমার বিশ্বাস, চিড়িয়াখানা বা কোনও খেলাওয়ালার দল থেকে ওরাং-উটান কি শিম্পাঞ্জীর মতো কোনও বড়ো জাতের বানর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এ কীর্তি তারই!....নন্দলাল রোজ ওই পথ দিয়ে ঠিক ওই সময়েই বাড়ি ফেরে। সেখানে পথের উপরেই একটা ঝাঁকড়া বটগাছ অন্ধকার সৃষ্টি করে ঝুঁকে পড়েছে। নন্দলাল যখন তার তলা দিয়ে আসছিল, ঠিক তখনই সেই অজানা জীবটা হঠাৎ তার ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—নন্দলালের বিশ্বাস সে সেই গাছের ডাল থেকেই তার কাঁধের উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। পিঠের উপরে পড়েই জীবটা দুই হাত দিয়ে তার গলা প্রাণপণে চেপে ধরে! নন্দলালের মনে হচ্ছিল কে যেন ইস্পাতের ফিতে দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছে! সে কিছুই দেখতে পেলে না; কেবল সেই ভীষণ হাত দুখানা তার গলার চারিধারে চাপের উপর চাপ দিতে থাকে! প্রাণের ভয়ে সে আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ করে ওঠে এবং তার চিৎকার শুনে কোথা থেকে দুজন লোক ছুটে আসে! তাদের দেখেই সেই জীবটা চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্রগতিতে একটা পাঁচিলের উপর লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে যায়! নন্দলাল শুধু অনুভব করেছে একজোড়া লৌহ-হস্তের মৃত্যু-বাঁধন আর একটা মস্ত বড়ো অপচ্ছায়া,—এছাড়া আর কিছুই সে জানে না।'

দিলীপ বললে, 'হয়তো সে কোনও খুনে-ঠগীর হাতে পড়েছিল।'

—'হতে পারে। কিন্তু নন্দলাল বলে, তা নয়। তার মতে, যে তাকে আক্রমণ করে গলা টিপে ধরেছিল, তার হাত দুখানা বরফের মতো কনকনে ঠান্ডা।—কোনও জীবনের স্পর্শই সেরকম শীতল হয় না! নিশ্চয়ই এটা তার মনের ভ্রম, কিন্তু বেচারি ভয়ে একেবারে মুষড়ে পড়েছে।...হ্যাঁ, ভালো কথা! তোমার বন্ধু ভৈরবচন্দ্র নন্দলালকে যেরকম ভালোবাসে, বোধহয়

এ খবরটা শুনলে আনন্দে নৃত্য করতে থাকবে! আমি তাকে খুব চিনি, সে কোনও শত্রুকেই ক্ষমা করে না। অতএব সাবধান, কোনোদিন তাকে ঘাঁটিও না!'

দিলীপ বললে, 'সে আমার মিত্রও নয়, শত্রুও নয়। তার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয়ই হয়েছে, তাকে আমার ঘাঁটাবার দরকার কি?'

—'তোমার কথা তুমিই বুঝবে, আমি শুধু বলে খালাস। কেবল এইটুকু মনে রেখো, তার কাছ থেকে যত তফাতে থাকতে পার ততই ভালো!' এই বলে প্রতাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিলীপ আবার পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার মন তখন এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, ডাক্তারি কেতাবের কোনও কথাই সে যেন দেখতে পেলে না। থেকে থেকে তার মন কেবলই ছুটে যায় দোতালার ওই বিচিত্র ঘরের অদ্ভুত লোকটির কাছে—যার চারিদিকেই রয়েছে আজানা রহস্যের এক মায়াময় অপার্থিবতা! তারই ফাঁকে ফাঁকে তার বিস্মিত চিত্ত নন্দলালের উপরে এই আশ্চর্য আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওই ভৈরবের স্বভাব, আর নন্দলালের উপরে এই আক্রমণ—এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও যোগাযোগ আছে! কিন্তু কী যে সে যোগাযোগ, ভাষায় স্পষ্ট করে তা প্রকাশ করা যায় না।

দিলীপ তার ডাক্তারি বইখানা একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিরক্ত স্বরে বলে উঠল, 'চুলোয় যাক ভৈরব আর তার বিদকুটে 'মমি'! তার জন্যে আজ আমার পড়া হল না, আর কেবল এইজন্যেই তার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনও মেলামেশা করব না।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভৈরবের গুপ্তকথা কি?

দশ দিন কেটে গেল।

দিলীপ তার মড়ার কঙ্কাল আর ডাক্তারি কেতাব নিয়ে নিজের বিদ্রোহিতার বিরুদ্ধেই জোর করে এমন ব্যস্ত হয়ে রইল যে, ঘরের বন্ধ দরজায় মাঝে মাঝে ভৈরবের করাঘাত শুনেও সাড়া দেবার নামটি করলে না। সে এসেই হয়তো সেকেলে মিশর আর তার গুপ্তরহস্য নিয়ে এমন সব আজগুবি গালগল্প জুড়ে দেবে যে, শুকনো ডাক্তারি কেতাবের সমস্ত কথাই ভুলে যেতে হবে!

একদিন সে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে তার খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলে, তার বন্ধু অবনী অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে দালানের উপরে নেমে এল এবং তার পিছনে পিছনে ছুটে এল রুদ্রমূর্তিতে ভৈরবচন্দ্র—ভীষণ ক্রোধে তার মুখ হয়ে উঠেছে হিংস্র জন্তুর মতো কদাকার!

ভৈরব সাপের মতন ফোঁস করে বলে উঠল, 'নির্বোধ! এর প্রতিফল পাবি।'

অবনী চেঁচিয়ে বললে, 'যা হয়, হবে! কিন্তু তোমার সঙ্গে আজ থেকেই সব সম্পর্ক তুলে দিলুম! আমি আর তোমার কোনও কথাই শুনব না!'

—'বেশ, শুনো না! কিন্তু তুমি যা প্রতিজ্ঞা করেছ সেটা মনে রেখো!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ! প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই! কারুকে কোনও কথাই বলব না! কিন্তু এরপরে আমার বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব! তার চেয়ে আমার বোনকে গঙ্গাজলে ডুবিয়ে মারব! আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না'—এই বলেই অবনী হন হন করে দালান পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল!

দিলীপ ঘরের ভিতর থেকে সব দেখলে, সব শুনলে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ওদের গোলমালে যোগ দিতে তার ইচ্ছা হল না। ভৈরবের সঙ্গে কোনও কারণে অবনীর ঝগড়া হয়েছে এবং সে তার বোনের সঙ্গে ভৈরবের বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে দিলে, দিলীপ, এটুকু বেশ বুঝতে পারলে। তারপর সে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল এবং বাইরে গিয়েও এই কথাই তার বারংবার মনে হতে লাগল, ভৈরবের সঙ্গে অবনীর এমন ঝগড়া হল কেন?

পরদিনের কথা। সেদিন ছিল 'ইলিয়ট সিল্ডের ফাইনাল'। গড়ের মাঠে মোহনবাগান গ্রাউন্ডে নানান কলেজের ছাত্ররা এসে গগনভেদী কোলাহলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! দিলীপদের কলেজের সঙ্গেই আজ মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিযোগিতা, খেলার আগেই দুই পক্ষের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রীতিমতো একটা বাক্যযুদ্ধ হয়ে গেল! চলচ্চিত্রের সেই দৃশ্যটি গ্রহণ করলে দর্শকরা চমৎকার একটি কৌতুকনাট্যের রস উপভোগ করতে পারে!

খেলার শেষে দিলীপ যখন 'ইউনিফরম' ছেড়ে বাড়িমুখো হয়েছে, কোথা থেকে হঠাৎ অবনী এসে তার সঙ্গ নিলে।

অবনী বললে, 'ভাই দিলীপ, সেদিনকার ব্যাপার কতকটা তুমিও দেখেছ আর শুনেছ। কিন্তু সেদিন আমার এত রাগ হয়েছিল যে, তোমার সঙ্গে কথা না কয়েই চলে এসেছিলুম। সেজন্যে কিছু মনে কোরো না।'

—'আমার তো কিছু মনে করবার কোনও কারণ নেই।'

'বেশ কথা! কিন্তু আমার একটি কথা তুমি রাখো। ভৈরব যে বাসায় থাকে, সেখানে কোনও ভদ্রলোকের থাকা উচিত নয়। ও বাসা ছেড়ে দাও।'

—'কেন বলো দেখি?'

অবনী প্রথমটা কোনও জবাব দিলে না, দিলীপের সঙ্গে নীরবে খানিকক্ষণ এগিয়ে এল। তারপর বললে, 'কেন যে তোমাকে ও বাসা ছাড়তে বলছি, আমার পক্ষে তার কারণ বলা অসম্ভব। কেন না ভৈরবের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কারুর কাছে কোনও কথাই আমি বলব না। কিন্তু এইটুকু আমার বলা উচিত যে, ভৈরবের কাছে ভদ্র বা অভদ্র কোনও মানুষেরই থাকা নিরাপদ নয়। যে কোনও মুহূর্তে তুমি বিপদে পড়তে পারো—সাংঘাতিক বিপদ!'

—'বিপদ? তুমি কী বলছ অবনী?'

—'স্পষ্ট করে তোমাকে আমি কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু ও বাসা ছেড়ে দাও।'

—'কেন?'

—'ভৈরব হচ্ছে অমানুষিক মানুষ, এ ছাড়া তার আর কোনও বর্ণনা করা যায় না। সেই

যে সেদিন সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকেই আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়। কাল আমি তাই তাকে চেপে ধরেছিলুম। দিলীপ, তখন দায়ে পড়ে সে আমাকে যেসব কথা বললে, শুনে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল! তার উপর ভৈরব বলে কিনা আমাকে তার দলভুক্ত হয়ে সাহায্য করতে! ভাগ্যে যথাসময়ে ভৈরবের আসল চরিত্র টের পেয়েছি, তার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেলে কি সর্বনাশই না হত! ভগবান রক্ষা করেছেন!'

—'অবনী, হয় তুমি খুব বেশি বলছ, নয় বলছ খুব কম!'

—'আমি কিছুই বলব না বলে ভৈরবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি।'

—'তুমি যদি জানতে পারো, কেউ তার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে চায়, তাহলে অঙ্গীকার করেছ বলে কি সেকথা প্রকাশ করবে না? ভৈরবকে আমি ভয় করব কেন?'

—'কারণ সে হিংস্র পশুর মতো ভয়ঙ্কর। হয়তো সে এখনও তোমার কোনও অনিষ্ট করে নি, কিন্তু সাপ কখনও কামড়ায়নি বলে কে সাপের গর্তের পাশে বাস করতে চায়?'

—অবনী, তুমি ভাবছ ভৈরবের গুপ্তকথা আমি জানি না। এটা তোমার ভুল! তুমি তো এই কথাই আমার কাছে প্রকাশ করতে চাও না যে, ভৈরবের ঘরে আর এক ব্যক্তি বাস করছে?'

অবনী চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহা বিস্ময়ে দিলীপের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'তুমি তাহলে সব জানো?'

গর্বের হাসি হেসে দিলীপ বললে, 'হুঁ, তা আর জানি না! ভৈরব কোনও ফেরারি আসামিকে তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে, এই তো?'

অবনীর বিস্মিত ভাবটা মিলিয়ে গেল। সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'আমি কিছু বলতে পারব না। ভৈরব আমার মুখ বন্ধ করে রেখেছে।'

দিলীপ বললে, 'আমি আর কিছু শুনতেও চাই না। তবে এটা জেনে রেখো, তুমি ভৈরবকে খারাপ লোক বললে বলেই বাসা ছেড়ে আমি পালাব না। কেন পালাব? ও বাসা আমার খুব পছন্দসই।'

—অবনীকে পিছনে রেখে দিলীপ ট্রাম লাইনের দিকে অগ্রসর হল। তার সেই যুক্তিহীন ভয় দেখে দিলীপ মনে মনে কৌতুক অনুভব করলে। মানুষ হিসাবে ভৈরব অমানুষিক হবে কেন? বড়ো-জোর তার স্বভাবটাই মিষ্ট নয়! হয়তো তার কোনও কোনও অস্বাভাবিক বাতিক আছে—এমন বাতিক কত লোকেরই তো থাকতে পারে! মানুষের প্রকৃতি হরেকরকম বলেই তো এই পৃথিবী এমন বিচিত্র! হয়তো ভৈরব তার ঘরের মধ্যে কোনও খুনি আসামিকে আশ্রয় দিয়েছে! কিন্তু সেজন্যে বাইরের লোক অকারণে মাথা ঘামিয়ে ভয় পাবে কেন?

টালিগঞ্জের অমন খাসা বাসা কি ছাড়া যায়? কলকাতায় থেকেও সে কলকাতার বাইরে আছে! জনতার আর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির হট্টগোল নেই, হাজার পাখির 'কোরাস' শুনে তার ঘুম ভাঙে, চারিদিকে তাকিয়েই দেখা যায়, মাঠের পর মাঠ ভরে সবুজ রঙের স্রোত বইছে এবং তার উপরে ঝরে পড়ছে নীলাকাশের আলোর ঝরনা! ও বাসা ছাড়া হবে না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শূন্য ও পূর্ণ কফিন

দিলীপের এক বন্ধু ছিল, মণিলাল। সে বয়সে কিছু ছোটো হলেও তার সঙ্গে দিলীপের খুব বনিবানাও ছিল।

মণিলাল ধনীর ছেলে এবং দিলীপের মতো সেও নির্জনতার ভক্ত। কলেজের পড়া সাঙ্গ করেও সংসারে ঢোকেনি। নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ও ফুলের বাগান নিয়েই দিন কাটিয়ে দিত মনের খুশিতে। দিলীপদের বাসা ছাড়িয়ে আরও মাইল দেড়েক এগিয়ে গেলেই তার বাগান ঘেরা সুন্দর বাড়িখানি দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটি অনেকটা পল্লীগ্রামের মতো।

হপ্তায় বার দুয়েক দিলীপ তার এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করতে যেত। অবনীর সঙ্গে তার শেষ দেখা হবার পরদিন সন্ধ্যা আটটার সময়ে দিলীপ ঘর থেকে বেরুল তার বন্ধু মণিলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বেরুবার সময়ে টেবিলের দিকে চোখ পড়াতে দেখলে, তার উপরে পড়ে রয়েছে ভৈরবের কাছ থেকে চেয়ে আনা একখানি দামি বৈজ্ঞানিক বই।

দিলীপের মনে হল ভৈরবের সঙ্গে সে আর মেলামেশা করতে চায় না বটে, কিন্তু তার বইখানি ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

বইখানি তুলে নিয়ে সে দোতালায় সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল। ভৈরবের দরজার সামনে গিয়ে তার নাম ধরে দুবার ডাকলে। সাড়া পেলে না। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। উঁকি মেরে দেখলে, ঘরের ভিতরে ভৈরব নেই। ভাবলে, ভালোই হল, ভৈরবের সঙ্গে আর কথা কইতে হল না, বইখানা ঘরের ভিতরে রেখে চুপিচুপি চলে যাই।

সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ল্যাম্পটা কমানো রয়েছে বটে, কিন্তু আবছা আলোয় ঘরের সব দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ঘরখানার মধ্যে যেন এক অজানা অলৌকিক রহস্য স্তম্ভিত হয়ে আছে, আলোকের অল্পতায় তার ভিতরে এসে দাঁড়ালেই বুকের ভিতরে জেগে ওঠে কেমন একটা অস্বস্তি! দিলীপ এধারে ওধারে চোখ ফিরিয়ে দেখলে, ছাদে সেই ঝুলন্ত কুমির, দেওয়াল ঘেঁসে সেই পশুমুণ্ডধারী মিশরী দেবদেবীর জটলা এবং মাঝখানে সেই মমির কফিন।...কিন্তু, কফিনের মধ্যে বীভৎস মমিটা নেই! ঘরের চারিদিকে তাকিয়েও দিলীপ সেটাকে দেখতে পেলে না। হয়তো তাকে ঘর থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। ভালোই হয়েছে।

দিলীপ নিজের মনেই বললে, 'ভৈরবের উপরে আমি বোধহয় অবিচার করেছি। এখানে যদি কোনও গুপ্তরহস্য থাকত, তাহলে সে নিশ্চয়ই ঘরের দরজা এমন করে খুলে রেখে যেত না!'

দিলীপ বই রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। সিঁড়িতে আলো ছিল না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। সে একদিকের দেওয়াল ধরে নামছে, হঠাৎ সিঁড়ির উপরে শোনা গেল একটা অস্পষ্ট শব্দ, একটা আগুনের ফিনকির আভাস, একটা ঠান্ডা-কনকনে হাওয়ার ঝটকা—কে যেন তার পাশ কাটিয়ে বেগে উপরে উঠে গেল!

—'কে, ভৈরববাবু নাকি?'

কোনও সাড়া নেই—কিন্তু উপরে ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল।

দিলীপের মন কৌতূহলে ভরে গেল, সেও তাড়াতাড়ি আবার উপরে উঠল। ভৈরবের ঘরের দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে, ঠেলতেই খুলে গেল।

ঘরের ভিতরে উঁকি মারতেই সর্বপ্রথমে তার চোখ পড়ল কফিনটার উপরে। তার মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মৃতদেহটা।

দিলীপ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না! আরো দুই পা এগিয়ে গিয়ে ভালো করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলে, কফিনের মমি কফিনেই বিরাজ করছে!

কিন্তু তিন মিনিট আগেই কফিনের ভিতরে যে কিছুই ছিল না, দিলীপ শপথ করে তা বলতে পারে! চোখের ভ্রম? এও কি সম্ভব? সে আড়ষ্ট চক্ষে সেই বিভীষণ সুদীর্ঘ মৃত মূর্তির পানে তাকিয়ে রইল এবং তার মনে হল, মমির কোটরগত চোখদুটো যেন জ্যান্ত চোখের মতো একবার চকচক করে উঠল!

দিলীপের হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটেনি, হঠাৎ নিচে থেকে প্রতাপের ব্যস্ত চিৎকার শোনা গেল—'দিলীপ! দিলীপ! কোথায় তুমি? শিগগির এস!'

দিলীপ দ্রুতপদে নেমে গিয়ে দেখলে, তার ঘরের সামনে কাতর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রতাপ!

—'কি হে, ব্যাপার কি?'

—'অবনী হঠাৎ জলে ডুবে গেছে! ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না, আপাতত তুমি হলেই চলবে! তাকে জল থেকে তোলা হয়েছে, দেহে এখনও প্রাণ আছে। দেরি কোরো না, শিগগির চলো!'

দুজনে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং শীঘ্র অবনীর বাড়িতে পৌঁছবে বলে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

অবনীদের বৈঠকখানায় ঢুকে দেখা গেল, চৌকির উপরে তার জলসিক্ত অচেতন দেহকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিলীপ প্রভৃতির চেষ্টায় প্রায় কুড়ি মিনিট পরে অবনীর দেহে একবার শিহরণ দেখা গেল, তারপর তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তারপর সে চোখ খুললে।

প্রতাপ বললে, 'এইবারে জেগে ওঠো ভাই, জেগে ওঠো! তুমি আমাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছ!'

দিলীপ বললে, 'আমার ডাক্তারি ব্যাগ থেকে খানিকটা ব্রান্ডি বার করে ওকে খাইয়ে দাও।

অবনীর এক সহপাঠী সেখানে ছিল। সে বললে, 'কী ভয়ই আমি পেয়েছিলুম! মাঠে বসে চাঁদের আলোয় আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে অবনী হঠাৎ উঠে একটা পুকুরধারে গেল। মাঝখানে কতকগুলো গাছ থাকাতে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। আচমকা শুনলুম, তার আর্তনাদ আর ঝপাং করে জলে পড়ার শব্দ! তারপর ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে কী কষ্টে যে তাকে ডাঙায় তুলেছি, তা খালি আমিই জানি। আমি তো ভেবেছিলুম, অবনী আর বেঁচে নেই!'

ইতিমধ্যে অবনী কতকটা সামলে নিয়েছে। সে দুইহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল এবং তার মুখে-চোখে ফুটে উঠল দারুণ ভয়ের চিহ্ন!

দিলীপ বললে, 'কি করে তুমি জলে পড়ে গেলে?'

—'আমি পড়ে যাইনি।'

—'তবে?'

—'কে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।'

—'সে কি হে?'

—'হ্যাঁ। পুকুরধারে দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ কে আমাকে দুখানা বরফের মতো ঠান্ডা হাতে হালকা পালকের মতো শূন্যে তুলে ধরে জলে ছুড়ে ফেলে দিলে!'

—'কে সে?'

—'আমি কিছুই দেখিনি, কিছুই শুনিনি। কিন্তু সে যে কে, আমি তা জানি।'

খুব মৃদুস্বরে দিলীপ বললে, 'আমিও জানি।'

অবনী সবিস্ময়ে বললে, 'তাহলে তুমি জেনেছ? মনে আছে, আমি তোমাকে কি অনুরোধ করেছিলুম?'

—'মনে আছে। এইবারে বোধহয় আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করব।'

প্রতাপ বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'তোমরা কি গুজগুজ ফুসফুস শুরু করলে হে? অবনী এখন বিশ্রাম করুক, এখন আর কোনও কথা নয়। এস হে, আমরা বিদায় হই।'

বাসার দিকে ফিরতে ফিরতে দিলীপের কত কথাই মনে হতে লাগল। —মমি-শূন্য কফিন, সিঁড়ির উপরে শব্দ ও কনকনে হাওয়া, তারপরেই কফিনের মধ্যে হারা মমির রহস্যপূর্ণ অসম্ভব পুনরাবির্ভাব এবং তারপর অবনীর উপরে এই অকারণ আক্রমণ! এর আগেই নন্দলালও ঠিক এই ভাবেই আক্রান্ত হয়েছিল এবং এদের দুজনেরই উপরে ভৈরব তুষ্ট নয়! এই সঙ্গে ভৈরবের ঘরের অসাধারণ ব্যাপারগুলোও স্মরণ হতে লাগল। এই সমস্ত ঘটনা একত্রে নাড়াচাড়া করতে করতে দিলীপের মনের ভিতরে একটা সম্পূর্ণ নাটক গড়ে উঠল! এসবকে মিথ্যা বলা অসম্ভব, কিন্তু পৃথিবীর চক্ষে এদের সত্যতা প্রমাণিত করাও কতটা কঠিন! পৃথিবী বলবে—দিলীপ, তুমি ভুল দেখেছ, কফিন এক মুহূর্তও মমিশূন্য হয়নি, আরো অনেকের মতো অবনীও হঠাৎ জলে ডুবে গেছে, ভেবে ভেবে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, তুমি কোনও ভালো ডাক্তারের ঔষধ খাও!..... দিলীপ নিজেও নিশ্চয় এরকম গল্প শুনলে এই কথাই বলত! কিন্তু তবু সে এখন স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারে যে, ভৈরবের মন হচ্ছে হত্যাকারীর মন এবং সে এমন এক অশ্রুতপূর্ব ভয়াবহ অস্ত্রের দ্বারা নরহত্যা করতে চায়, পৃথিবীর অপরাধের ইতিহাসে আর কেউ কখনো যা ব্যবহার করতে পারেনি!

দিলীপ স্থির করলে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই কোনও নতুন বাসায় উঠে যাবে! এ বাসায় থাকলে তার পড়াশোনা আর হবে না, দোতালার ঘরের রহস্য নিয়েই মন ব্যস্ত হয়ে থাকবে!

সে বাসার কাছে এসে পড়ল। দোতালার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভৈরব।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দিলীপ দেখলে, ভৈরব সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে।

ভৈরব বললে, 'দিলীপবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। এখন কি আপনার সময় হবে?'

দিলীপ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'না!'

—'সময় হবে না? লেখাপড়া নিয়ে আপনি এতই ব্যস্ত? আমি অবনীর কথাই বলতুম। শুনছি তার নাকি কি বিপদ হয়েছে?' ভৈরবের মুখ গম্ভীর, কিন্তু তার চোখে যেন আনন্দের আভাস!— দিলীপের ইচ্ছা হল, মারে তার মুখে এক ঘুসো!

সে বললে, 'ভৈরববাবু, শুনে আপনি বড়ো দুঃখিত হবেন যে, অবনী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে! আপনার শয়তানি কৌশল এবার কাজে লাগেনি! বেহায়ার মতো কিছু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না, আমি সব জেনে ফেলেছি!'

খাপ্পা দিলীপের রুক্ষ কথা শুনে ভৈরব প্রথমটা থতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। তারপর বললে, 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন দিলীপবাবু। কী আপনি বলতে চান? অবনীর দুর্ঘটনার জন্যে আমি দায়ি?'

বজ্রনাদে দিলীপ বললে, 'হ্যাঁ! দায়ি আপনি, আর আপনার ওই শুকনো মড়া! ভৈরববাবু, সেকাল হলে আপনাকে হয়তো জীবন্তে পুড়িয়ে মারা হত, কিন্তু ভুলে যাবেন না, একালেও ফাঁসিকাঠ আছে! এই টালিগঞ্জে যদি আর কোনও লোক এইভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায় তাহলে আমিই আপনাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করব! মিশরী মড়ার খেলা বাংলাদেশে চলবে না,—বুঝেছেন?'

—'আপনাকে শীঘ্রই পাগলাগারদে পাঠাতে হবে দেখছি।'

—'আচ্ছা! দেখা যাবে, আমিই পাগলাগারদে যাই, না আপনিই ফাঁসিকাঠে দোল খান!' —বলেই দিলীপ নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চলন্ত মৃতদেহ

পরদিন সন্ধ্যায় দিলীপ স্থির করলে, আজ মণিলালের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

পথে বেরিয়ে পিছন ফিরে দেখলে, উপরের আলোকিত ঘরের জানলায় ভৈরব আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তির মতো। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধহয় তাকেই দেখছিল।

তার পাপ-সংসর্গ থেকে তফাতে এসে দিলীপ একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

দূরে তালকুঞ্জের মাথার উপর থেকে চাঁদ যেন সকৌতুকে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করছে এবং হালকা বাতাসে ভেসে আসছে শান্ত সন্ধ্যার একটি স্নিগ্ধ গন্ধ। জ্যোৎস্নায় স্বপ্নময় নীলসাগরে যেন কোনও পরিপুরীর উদ্দেশে চলেছে ছোটো ছোটো মেঘের তরণী। দুইপাশে মাঠের জনশূন্য উন্মুক্ততা নিয়ে এগিয়ে চলল দিলীপ, মনের আনন্দে।

তখন জনমানবের সাড়া নেই। প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখা গেল, খানিক তফাতে মণিলালের বাড়ির জানলাগুলো আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ দিলীপের কি মনে হল, একবার ফিরে পিছনপানে তাকিয়ে দেখলে। চাঁদের কিরণে ধবধবে পথটি একটি চওড়া শুভ্র রেখার মতো অনেক দূরে অস্পষ্টতার মধ্যে গেছে হারিয়ে। কিন্তু তারই উপর দিয়ে অভিশপ্ত অপচ্ছায়ার মতো কিএকটা দ্রুতবেগে এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে!

দিলীপের বুক ছাঁৎ করে উঠল। কী ও? মানুষ? কী লম্বা ওর কালো দেহ, শুভ্র পথের জ্যোৎস্নাকেও ও যে কলঙ্কিত করে তুলেছে! ওর চোখদুটো যেন দপদপ করছে, প্রত্যেক পদক্ষেপের তালে তালে হাড়গুলো বেজে উঠছে খড়-মড় করে, যেন ওর সারা দেহের সঙ্গেই মাংসের সম্পর্ক নেই! কী অস্বাভাবিক ওর গলা—যেন একটা বাঁখারির উপরে বসানো আছে মুণ্ডুটা! ভয়াবহ সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মূর্তি ঝড়ের মতো ছুটে আসছে শিকারের দিকে!

দিলীপ আর দাঁড়ালে না, মণিলালের বাড়ির দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল—কণ্ঠে তার আর্ত চিৎকার! পিছনে মৃত্যু-পিশাচ, সামনে আলোকজ্জ্বল জীবনময় অট্টালিকা, ওদিকে নরক, এদিকে স্বর্গ, কিন্তু মাঝখানে এখনো রয়েছে বিপজ্জনক ব্যবধান! এই পথটুকু আজ কী লম্বাই মনে হচ্ছে, আজ যেন আর পথের শেষ আসবে না!

কিন্তু পথের শেষ এল—জীবন্ত-মৃত্যু তখন তার কাছ থেকে মাত্র দশ হাত দূরে, জ্বলন্ত চক্ষে দুখানা অস্থিসার দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে সে দিলীপকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

একটানে বাগানের ফটক খুলে দিলীপ আবার ছুটল, বাড়ির দরজা সেখান থেকেও খানিকটা দূরে!

সভয়ে শুনলে, বিভীষিকা তখনও তার পিছু ছাড়েনি—সেও সশব্দে ফটকটা খুলে ফেললে এবং পিছনে, অতি নিকটে তার কঠিন পায়ের শব্দ।

দেহের শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করে দিলীপ তার দ্রুতগতিকে দ্বিগুণ দ্রুত করে তুললে এবং কোনোরকমে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিলে!

কোথা থেকে ছুটে এসে মণিলাল বললে, 'কি আশ্চর্য! দিলীপ—দিলীপ, ব্যাপার কি?'

দরজার উপরে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে দিলীপ অতি ক্ষীণস্বরে বললে, 'আগে এক গেলাস জল!'

মণিলাল দৌড়ে গিয়ে যখন এক গেলাস জল নিয়ে ফিরে এল, দিলীপ তখন একান্ত অবসন্নের মতো একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে হাঁপ সামলাবার চেষ্টা করছে!

—'এই নাও জল! বন্ধু, তোমার এ কী মূর্তি, মুখ যে একেবারে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে!'

দিলীপ সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে তার তপ্ত পাথরের মতন শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নিলে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বললে, 'মণিলাল, সব কথা পরে বলছি। আপাতত শুনে রাখো, আজ রাত্রে তোমার বাড়িই হবে আমার শয়নমন্দির। কাল সকালে আবার সূর্যোদয় না হলে আমি আর এ বাড়ির বাইরে যেতে পারব না!'

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে মণিলাল বললে, 'তুমি যা বলবে, তাই হবে। আমি তোমার জন্যে ব্যবস্থা করতে বলছি। ওকি, উঠে আবার কোথায় যাচ্ছ?'

—'দোতালার বারান্দায়। সেখান থেকে চারিদিকের সব দেখা যায়। তুমিও আমার সঙ্গে এস। আমি যা দেখেছি তুমিও তা নিজের চোখে দেখলে ভালো হয়।'

দোতালার বারান্দায় বেরিয়ে চোখে পড়ল চারিদিকেই চন্দ্রালোকের রাজ্য—যার প্রজা হচ্ছে গাছপালা লতা-পাতা ফুল-ফল!

দিলীপ প্রথমে বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বাগানের যতখানি দেখা যায় তার উপরে চোখ বুলিয়ে নিলে। সেখানে দখিনা বাতাসে কেবল ছোটো-বড়ো ফুলগাছেরা দুলে দুলে চন্দ্রলেখার স্বপ্ন দেখছে।

তারপর সে মাঠের পর মাঠের দিকে এবং সুদীর্ঘ সাদা ফিতার মতো মেঠো পথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। সেখানেও জনহীন পূর্ণ শান্তির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে সুমধুর জ্যোৎস্না! কাছে বা দূরে জীবন্ত কোনও প্রাণীর ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না।

মণিলাল বললে, 'দিলীপ! তুমি কি সিদ্ধি খেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ? এখানে এসে কাকে তুমি খুঁজতে চাও?'

—'সে কথা তোমাকে বলছি।...কিন্তু, কোথায় সে গেল, কোথায় লুকোল?.....হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই দেখো মণিলাল, ওই দেখো! পথটা যেখানে মোড় ফিরেছে, ওইখানে তাকিয়ে দেখো'—বলেই সে উত্তেজিতভাবে মণিলালের বাহু সজোরে চেপে ধরলে!

মণিলাল বললে, 'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি! আমাকে দেখাবার জন্যে এত জোরে আমার হাত চেপে ধরবার দরকার নেই! হ্যাঁ, ওখান দিয়ে কেউ যাচ্ছে বটে! কোনও মানুষ, দেখলে মনে হয়—সে রোগা, কিন্তু ঢ্যাঙা—খুব ঢ্যাঙা! বেশ তো, পথ দিয়ে মানুষ যাচ্ছে—আর মানুষরা চিরকালই পথ দিয়ে চলে, কিন্তু সেজন্যে তোমার এত বেশি ভয় পাবার কারণ কি?'

—'কারণ কিছুই নেই, তবে ওই মূর্তিটাই আমাকে ধরবার জন্যে পিছনে তাড়া করেছিল! আচ্ছা, তোমার বৈঠকখানায় চলো, সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করছি!'

দুজনে আবার নেমে বৈঠকখানায় এসে বসল। প্রচুর আলোকে আনন্দময় সেই সাজানো ঘরের একখানা কৌচের উপরে বসে দিলীপ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা একে একে মণিলালের কাছে বর্ণনা করে গেল—ছোটোখাটো খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত বাদ দিলে না।

কাহিনী সাঙ্গ করে সে বললে, 'মণিলাল, এই হচ্ছে আমার অভিশপ্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এ কাহিনী অসম্ভব বটে, কিন্তু এর প্রত্যেক বর্ণই সত্য!'

মণিলাল বেশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তার মুখের উপরে একটা হতভম্ব ভাব!

তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, 'আমার জীবনে এমন গল্প কখনো শুনিনি! তুমি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করলে বটে, কিন্তু তুমি নিজে কি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছ বলো দেখি?'

—'তোমার নিজের মত কি?'

—'তার আগে তোমার মত শুনতে চাই। এ বিষয় নিয়ে তুমি ভাববার সময় পেয়েছ, আমি পাইনি।'

—'আসল ব্যাপার আমার যা মনে হয়, তা হচ্ছে এই। ওই শয়তান ভৈরব মিশরে গিয়ে এমন কোনও গুপ্তমন্ত্র শিখে এসেছে, যার গুণে মমিকে—অর্থাৎ হাজার হাজার বছর

আগেকার মড়াকে—অথবা একটা বিশেষ মড়াকে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে জ্যান্ত করে তুলতে পারা যায়। যেদিন সে প্রথম অজ্ঞান হয়ে যায়, সেদিন সম্ভবত মড়াটাকে সর্বপ্রথম জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু একটা পুরানো শুকনো মড়া জীবন্ত হয়ে উঠছে, এই অনভ্যস্ত অসম্ভব দৃশ্য দেখেই যে সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই। তারপরে জীবন্ত মড়ার নড়াচড়া দেখতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যদিও মমির সেই জীবন নিশ্চয়ই দীর্ঘস্থায়ী নয়। কারণ আমি তাকে দিনের পর দিন সম্পূর্ণ জড়পদার্থের মতো কফিনের ভিতরে থাকতে দেখেছি। কিন্তু এক অপার্থিব অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়ে ভৈরব বুঝলে যে, মড়ার সাহায্যেও সে মনের মতো কার্য সফল করতে পারে। কারণ এটা হচ্ছে মানুষের মড়া, অতএব জ্যান্ত হলে তার মানুষি বুদ্ধি আর শক্তিও ফিরে পায়। নন্দলালের উপরে ভৈরবের রাগ ছিল, তার উপরেই সে প্রথম পরীক্ষা করলে। তারপর এই নতুন ক্ষমতা পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে সে অবনীকেও নিজের দলে টানবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অবনী হচ্ছে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এসব অন্যায় ভূতুড়ে ব্যাপারে সে যোগ দিতে চাইলে না। ভৈরবের সঙ্গে তার ঝগড়া বাধল। এমন লোকের হাতে সে নিজের বোনকে সমর্পণ করতে নারাজ হল, আর তার ফলে সেও পড়ল ভৈরবের হুকুমে এই জ্যান্ত মড়ার হাতে। কিন্তু আগে নন্দলাল, তারপরে অবনী যে প্রাণে প্রাণে কোনরকমে রেহাই পেলে, সেটা হচ্ছে দৈবের মহিমা! নইলে ভৈরবের উপরে আজ দু-দুটো নরহত্যার চাপ পড়ত। তারপর সে যখন টের পেলে যে, আমিও তার গুপ্তকথা জেনে ফেলেছি, তখন আমাকেও তার পথ থেকে সরিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলে! আমি যে এখানে আসব সে তা জানত। দিলে তার মমিকে লেলিয়ে! কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, নইলে কাল সকালেই তোমার বাগানের ভিতরে দেখতে পেতে আমার মৃতদেহ! আমি ভিতু লোক নই, কিন্তু এরকম মৃত্যু-ভয় অতি বড়ো সাহসীও সহ্য করতে পারে না!'

মণিলাল অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে বললে, 'বন্ধু, অতিরিক্ত লেখাপড়া করে করে তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় চার হাজার বছরের পুরানো মিশরের জ্যান্ত মমি! সবচেয়ে কড়া গাঁজার ধোঁয়াও এর কাছে হার মানে! এই মমিকে খালি তুমিই দেখেছ, আর কেউ একে জ্যান্ত অবস্থায় দেখেনি!'

—'নিশ্চয়ই আরও কেউ কেউ দেখেছে। কারণ এ অঞ্চলের অনেকেই বলছে যে, বানর জাতীয় কোনও জীব যেখানে সেখানে মানুষের উপরে অত্যাচার করছে! তা ছাড়া তারা আর কি বলবে? আসল ব্যাপারটা যে কল্পনা করাও অসম্ভব!'

—কল্পনার দরকার কি? আসল ব্যাপার তো বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

—'কী বোঝা যাচ্ছে?'

—'প্রথমত ধরো, তুমি বলছ শূন্য কফিনকেও হঠাৎ পূর্ণ হতে দেখেছ! তুমি ভুলে যাচ্ছ, ভৈরবের ঘরে আলো কমানো ছিল। সেই ম্লান আলোতে প্রথমটা তোমার ভালো করে তাকাবার দরকার হয়নি, তাই তুমি চোখের ভ্রমে মমিটাকে দেখতে পাওনি!'

—'না, না, মণিলাল! এ হতে পারে না।'

—'হতে পারে না কি, তাই-ই হয়েছে। তারপর আমার বিশ্বাস, এ অঞ্চলে হঠাৎ কোনও গুণ্ডা এসে লীলাখেলা শুরু করেছে। নন্দলালের উপরে সেই-ই আক্রমণ করেছে, তোমাকে

একলা পেয়ে সেই-ই তেড়ে এসেছে, আর অবনী জলের ভিতরে নিজেই পড়ে গেছে দৈবগতিকে। এসবের জন্যে ভৈরবকে দায়ি কোরো না, কারণ তোমার এ উদ্ভট মত ধোপে টিকবে না। তাকে জোর করে আদালতে হাজির করলেও আইন তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না।'

দিলীপ গম্ভীর স্বরে বললে, 'আমি তা জানি। তাই আইনের আশ্রয় না নিয়ে আমি নিজের শক্তির উপরেই নির্ভর করতে চাই।'

—'তার মানে?'

—'আমি কলকাতাকে এক অদ্ভুত বিপদ থেকে রক্ষা করতে চাই। কেবল তাই নয়, সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, আমি নিজে আত্মরক্ষা করতে চাই। আমার কর্তব্য আমি স্থির করেছি। এখন ঘণ্টাখানেক আমাকে একলা থাকতে দাও। আমাকে একটা কলম আর একখানা কাগজের 'প্যাড' দিতে পারবে?'

—'নিশ্চয়ই। ওই কোনের টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেই তুমি যা চাও তাই পাবে।'

দিলীপ টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে কি লিখতে লাগল। একঘণ্টার পর দুই ঘণ্টার আগে তার লেখা শেষ হল না। ততক্ষণ ধরে মণিলাল একখানা সোফায় বসে বই পড়তে ও মাঝে মাঝে দিলীপের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

তারপর দিলীপ এক তাড়া কাগজ নিয়ে উঠে এসে মণিলালের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'এখন তুমি সাক্ষী হও। এই কাগজের তলায় একটা সই করে দাও।'

—'সাক্ষী হব? কিসের সাক্ষী?'

—'এটা যে আজকের তারিখে আমি সই করেছি, তারই সাক্ষী হবে তুমি। বন্ধু, এরই ওপরে আমার জীবন নির্ভর করছে!'

—'দিলীপ, তুমি পাগলের মতো কথা কইছ। চলো, খেয়েদেয়ে শোবে চলো।'

—'আমি যা করেছি, অনেক ভেবেচিন্তেই করেছি। যে মুহূর্তে তুমি সই করবে, আমি তোমার সব কথাই শুনব। নাও, সই করো।'

—'কিন্তু, কিজন্যে সই করব সেটা বলো।'

—'আজ আমি তোমাকে যে ঘটনাগুলো বলেছি, এইসব কাগজে তা লিখে রাখলুম। তুমি কেবল সাক্ষী হও, মণিলাল!'

মণিলাল তখনই সই করে দিয়ে বললে, 'নাও, কেমন? হল তো? কিন্তু তোমার মতলব কি, আমি জানতে চাই।'

—'পুলিসের হাতে যদি ধরা পড়ি, তাহলে এই কাগজগুলো দাখিল কোরো।'

—'পুলিসের হাতে তুমি ধরা পড়বে? কেন?'

—'হয়তো আমি নরহত্যা করব!'

—'দিলীপ, দিলীপ! গোঁয়ারের মতো কোনও কাজ কোরো না!'

—'মোটেই নয়। আমি আমার কর্তব্যই করব। এখন এই কাগজগুলো তুমি রেখে দাও। আমি এইবার খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাই। কাল সকালে আমার অনেক কাজ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব শবদাহ

দিলীপকে যারা চেনে তার জানে যে, শত্রু হিসাবে সে বড়ো সহজ মানুষ নয়। যেমন মন দিয়ে সে লেখাপড়া করত, তেমনি ভাবে দেহমন একাগ্র করেই লোকের সঙ্গে বন্ধুতা বা শত্রুতা করতে পারত। এই ছিল তার স্বভাব। অর্ধসমাপ্ত করে কোনও কিছুই সে ফেলে রাখতে পারত না।

সে যে কি করবে সেকথা কিছুতেই মণিলালের কাছে ভাঙলে না। কিন্তু পরদিন প্রভাতে পূর্ব আকাশে রঙের খেলা শুরু হবার আগেই দিলীপ বিছানা ছেড়ে জামাকাপড় পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

এই তো সেই চিরপরিচিত বিহঙ্গ-কলরোলে ও তরুমর্মরে সঙ্গীতময় পথ আর মাঠ, কিন্তু অবর্ণনীয় বিভীষিকার চলন্ত ছায়াকে বুকে করে রাতে ওরাই কি ভয়ানক হয়ে উঠেছিল!

রাতের অন্ধকার ও অস্পষ্টতা এসে পথঘাটে যে কোনও বিভীষিকার জন্যে জমি তৈরি করে রাখে। তাই হঠাৎ কোথাও একটা গাছের ডাল নড়লে বা প্যাঁচা ডেকে উঠলে বা বাদুড় ডানা ঝটপট করলে মানুষের বুকও ছমছম করতে থাকে! কিন্তু দিনেরবেলায় সুস্পষ্ট সূর্যালোক কাপুরুষকেও সাহসী করে তোলে। সেই সৃষ্টিছাড়া মূর্তিটা আজ যদি এখন এই মেঠো পথে এসে দাঁড়ায়, দিলীপ নিশ্চয়ই তাহলে কালকের মতো ভয়ে উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে না!

এমনি সব ভাবতে ভাবতে দিলীপ কাঁচা রোদের সোনামাখা পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

প্রথমে প্রতাপের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। প্রতাপ তখন সবে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রভাতি চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে।

দিলীপকে এত ভোরে দেখে বিস্মিত হয়ে বললে, 'তুমি যে এখন? চা আনতে বলি?'

—'না, ধন্যবাদ! প্রতাপ, তুমি এখনই আমার সঙ্গে আসতে পারবে?'

—'কেন পারব না?'

—'আমি যা বলব, করবে?'

—'নিশ্চয়!'

—'তোমাদের বন্দুক আছে না?'

—'আছে। কিন্তু বন্দুক কি হবে?'

—'সেটা সঙ্গে করে নিয়ে এস। আর এক গাছা খুব মোটা লাঠি!'

—'বাঘ মারা যায় এমন লাঠি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু এত অস্ত্রশস্ত্র কেন? যুদ্ধযাত্রা করবে নাকি?'

—'দেওয়ালের উপরে ওই যে বড়ো রাম-দাখানা টাঙানো রয়েছে, ওখানাও চাই।'

—'এ যে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন! আর কিছু চাই? কামানটামান?'

—'আপাতত দরকার হবে না। তোমাকেও দরকার হত না, কিন্তু পাছে একজনের বেশি লোক আমাকে আক্রমণ করে, সেই ভয়েই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা কেউ শিশু নই, কেউ আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই লড়াই করতে পারব, কি বলো?'

—'পারা তো উচিত! কিন্তু এখন বীরদর্পে কোন দিকে যাত্রা করতে হবে, বলো? ফোর্ট-উইলিয়মের দিকে?'

—'না। আমার বাসার দিকে!'

—'তোমার বাসার দিকে!'

—'অর্থাৎ ভৈরবের বাসার দিকে!'

—'কিন্তু সেজন্যে এমন সমরসজ্জার প্রয়োজন কি? ভৈরবকে যদি বধ করতে চাও, একটা ঘুসি বা চড় বা লাথিই যথেষ্ট!'

—'না প্রতাপ, না! ভৈরব একলা নেই!'

—'তাহলে সেও কি সৈন্য সংগ্রহ করেছে?'

—'এসব প্রশ্নের জবাব পরে দেব। এখন যা বলি, শোনো। বন্দুক আর রাম-দা নিয়ে আমি ভৈরবের ঘরে ঢুকব। ওই মোটা লাঠি কাঁধে করে তুমি দরজার বাইরে অপেক্ষা করবে। যদি আমার দরকার হয়, তোমাকে আমি ডাকব। তখন তুমি লাঠি চালিয়ে শত্রু মারতে একটুও ইতস্তত কোরো না। এখন চলো!'

—'জো হুকুম, জেনারেল! তাহলে এই আমি 'কুইক-মার্চ' শুরু করলুম!'

ভৈরব টেবিলের সামনে বসে একমনে কি লিখছিল। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে দেখলে, দিলীপ ঘরে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিলে—তার পিঠে বাঁধা বন্দুক, হাতে রাম-দা!

প্রথমটা সে হতভম্বের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বিষম রাগে তার কপালের শিরগুলো ফুলে উঠল।

দিলীপ কফিনটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, নিসাড় মৃত্যুর আড়ষ্টতা নিয়ে প্রাচীন মিশরবাসী সেই সুদীর্ঘ মানবের মৃতদেহটা কফিনের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কোটরগত চক্ষে আজ জাগ্রত দৃষ্টির এতটুকু আভাস নেই, তার মাংসহীন বিবর্ণ চামড়া-ঢাকা অস্থিসার দেহের উপরে শত শত শতাব্দীর কুৎসিত জীর্ণতা মাখানো, লম্বা হাত দুখানা অনাবশ্যক উপসর্গের মতো একান্ত অসহায়ভাবে দেহের দুইদিকে ঝুলছে—যদিও তার কাঁকড়ার দাড়ার মতো বাঁকানো নিষ্ঠুর হাতের আঙুলগুলো দেখলে মন যেন দমে যায়। কিন্তু চার হাজার বছরের ওই পুরানো শুঁটকো মড়া যে আবার ওই কফিন ছেড়ে পৃথিবীর সবুজ মাটির উপরে পদচালনা করতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা শুনলে পাগলও বোধহয় অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠবে!

দিলীপ রীতিমতো গদিয়ানি চালে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে যেন নিজের মনেই বললে, 'দেখছি ধুনুচিতে আজ ধুনোও পুড়ছে না, পাপিরাস-পুথির মন্ত্রও কেউ পড়ছে না, জন্তুমুখো দেবতাদের পুজোর আয়োজন নেই, মমিরও ঘুম এখনও ভাঙেনি!'

ঠোঁট ফাঁক করে হিংস্র দাঁতগুলো দেখিয়ে ভৈরব বললে, 'দিলীপবাবুর বোধহয় ভ্রম হয়েছে! এটা তাঁর নিজের ঘর নয়!'

দিলীপ বললে, দিলীপবাবুর ভ্রম হয়নি! তিনি যে একটা হত্যাকারীর আস্তানায় এসেছেন, এ জ্ঞান তাঁর আছে।'

ভৈরব বললে, 'আমি যদি এখন ফোন করে পুলিস ডাকি, তাহলে ঘরে ঢুকে কি দেখবে তারা? শান্তিপ্রিয় গোবেচারা ভৈরবের হাতে রয়েছে মাত্র একটি ফাউন্টেন পেন আর মহাবীর দিলীপবাবুর পৃষ্টদেশে বাঁধা দোনলা বন্দুক আর হাতে চকচক করছে মস্ত খাঁড়া!'

দিলীপ গাত্রোত্থান করে বললে, 'পিঠের বন্দুক এই আমি হাতে নিলুম, আর এই রাম-দা উপহার দিলুম তোমাকে! এইবার তুমিও সশস্ত্র হলে তো?'

টেবিলের উপরে স্থাপিত রাম-দার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভৈরব বললে, 'তারপর? রাম-দার সঙ্গে কি বন্দুকের যুদ্ধ হবে?'

দিলীপ বুঝতে পারলে, ভৈরব মনের ভাব চাপবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু ভয়ে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে! সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে 'রাম-দা নিয়ে তুমিও উঠে দাঁড়াও! তারপর ওই মমিটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো!'

শুকনো হাসি হেসে ভৈরব বললে, 'ও, খালি এই? মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা?'

—'হ্যাঁ, খালি এই! শুনলুম, রাজার আইন তোমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু আমার নিজের একটা আইন আছে। তার কাছে তোমার মুক্তি নেই। তোমার ঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো। বেলা আটটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। এই আমি বন্দুক তৈরি রাখলুম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি যদি ওই মমিটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে না ফেলো, বন্দুকের গুলিতে আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।'

—'তুমি আমাকে খুন করবে!'

—'হ্যাঁ।'

—'কি কারণে?'

—'তোমার শয়তানির জন্যে।...ভৈরব, এক মিনিট গেল?'

—'কিন্তু কী শয়তানি আমি করেছি?'

—'বলাবাহুল্য। তুমিও জানো, আমিও জানি।'

—'এ হচ্ছে ধাপ্পা দিয়ে ভয় দেখানো।'

—'দু মিনিট কাটল!'

—'ধাপ্পায় আমি ভয় পাব না। তুমি হচ্ছ পাগল—বিপজ্জনক পাগল। তোমার কথায় আমার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করব কেন? ওটি মূল্যবান মমি!'

—'তোমাকে ওটা কেটে খান খান করে আর পুড়িয়ে ফেলতে হবেই।'

—'আমি ওসব কিছুই করব না।'

—'চার মিনিট কাটল।'

দিলীপ বন্দুক তুলে তার নলটা ফেরালে ভৈরবের দিকে। তার মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

—'ভগবানের নামে শপথ করছি, আটটা বাজলেই আমি তোমাকে পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মারব! এর জন্যে আমি ফাঁসি যেতেও রাজি! এখনও উঠলে না? ঘড়িতে আটটা বাজছে! তবে মরো'—দিলীপ ঘোড়ার উপর আঙুল রাখলে।

ভৈরব উঠে পড়ে ভয়ার্ত মুখে বললে, 'রক্ষা করো! আমি তোমার কথামতোই কাজ করব!'—বলেই সে তাড়াতাড়ি রাম-দা তুলে মমির সরুঙ্গে গলার উপরে এক কোপ বসিয়ে দিলে, কাটা মুণ্ডটা খটাস করে মাটির উপরে পড়ে গেল! তারপর মড়ার উপরে কোপের পর কোপ পড়তে লাগল, ভৈরব এক একবার কোপ বসায়, আর এক একবার মহাভয়ে ফিরে দেখে, দিলীপ কি করছে! মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সব শেষ—ঘরের মেঝের উপরে শুকনো মড়ার খণ্ড-বিখণ্ড হাত, পা, বাহু, নাক, মুখ, চোখ, ধড় ও কুচি কুচি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল।

দিলীপ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললে, 'ওর ওপরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগাও!'

ভৈরব নীরবে তার হুকুম তামিল করলে। শুকনো মড়ার টুকরোগুলো কাগজের মতো সহজেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল—বিশ্রী দুর্গন্ধে ও আগুনের তাপে টেঁকা দায়!

কিন্তু দিলীপ তখনও বন্দুক তুলে স্থির মুখে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভৈরব ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'কেমন, হয়েছে তো?'

—'না। বার করো তোমার সেই মন্ত্র লেখা পাপিরাস পাতার পুথি। সেটাও আগুনে ফেলে দাও।'

কাতর স্বরে ভৈরব বললে, 'না, না, তাথেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। দিলীপবাবু, আপনি কি রত্ন নষ্ট করতে চাইছেন জানেন না! সে পুঁথি জ্ঞানের আধার। তেমন পুথি পৃথিবীতে আর নেই!'

—'ভৈরব, পোড়াও সেই পুথি!'

—'দিলীপবাবু, আমার কথা শুনুন। পুথিখানা পোড়াতে বলবেন না! ও পুথি আমাদের দুজনের সম্পত্তি হয়ে থাক। ওর সব কথা আপনাকে আমি নিজে শিখিয়ে দেব। তাহলে আমরা দুজনে হব বিশ্বজয়ী!'

টেবিলের কোন টানায় পুথিখানা আছে, দিলীপ তা জানত। সে এগিয়ে গিয়ে সেখানা টেনে বার করলে।

ভৈরব হাউমাউ করে উঠে তার হাত থেকে সেখানা কেড়ে নিতে এল। কিন্তু দিলীপ এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে পুথিখানা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করলে।

পুথিখানা যখন পুড়ে একবারে ছাই হয়ে গেল, দিলীপ ফিরে হাসিমুখে বললে, 'ভৈরবচন্দ্র, এখন তুমি হলে নির্বিষ সাপের মতো। আর আমার এখানে কোনও কাজ নেই—বিদায়!'*

প্রেতাত্মার প্রতিশোধ

॥ প্রথম ॥

রক্তলোভীর গর্জন

নাচতে-নাচতে ভেসে যাচ্ছিল নৌকো। কেবল নৌকো নয়, নাচছিল মহানদীর স্রোতে আলো ছায়া, চাঁদ আর তারা।

নদীতীরের বনভূমি থেকে বাতাস বহন করে আনছিল অশ্রান্ত পত্রমর্মর। অনেক দূর থেকে তান ধরেছিল কোনও এক গানের পাখি চঞ্চল হয়ে আনন্দের ছন্দে।

অরণ্যের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটা মস্ত পাহাড়কে ঝাপসা ঝাপসা। যেন ওখানে কৌতূহলী পৃথিবী তৃণশয্যায় উঁচু হয়ে শূন্যে মাথা তুলে দেখে নেবার চেষ্টা করছে প্রকৃতির সাজঘর।

নৌকোচালনা করছিল দুই বন্ধু প্রমোদ এবং প্রফুল্ল। কারুর বয়সই পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। মাঝে-মাঝে তারা শখ করে এমনি নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা ক্রমে হারিয়ে গেল রাত্রির মাঝখানে। কোনওদিকে আর কোনও জীবের সাড়া নেই। শোনা যায় কেবল অরণ্যের শ্যামল ভাষা আর নদীর জল-রাগিণী।

নৌকোচালনা ছেড়ে দুজনেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল নীলাকাশ-জোড়া তারকা-সভার সভাপতি চাঁদের দিকে।

প্রফুল্ল বললে, 'প্রমোদ, একটা গান শোনাও।'

প্রমোদ জবাব দিলে না।

প্রফুল্ল আবার বললে, 'আজকের রাত ভালো লাগছে। তুমি একটি গান গেয়ে তাকে আরও সুন্দর করে তোলো।'

প্রমোদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'গান গাইতে ভালো লাগছে না।'

—'কেন?'

—'মনে হচ্ছে যেন কী এক চরম অমঙ্গল আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছে।'

সকৌতুকে হেসে উঠল প্রফুল্ল।

প্রমোদ বললে, 'হাসলে যে?'

—'এমন সুন্দর রাত, এমন চাঁদের আলো, এমন নদীর গান, এর ভিতরে তুমি অমঙ্গলকে সন্ধান করছ?'

—'আমি সন্ধান করছি না প্রফুল্ল, অমঙ্গলই করছে আমাকে সন্ধান। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পরলোকের সিংহদ্বার।'

প্রফুল্ল একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'ভাই প্রমোদ, তোমার মুখে প্রায়ই এমনি সব কথা শুনতে পাই। এর কারণ কী বলো তো?'

—'বন্ধু, বিনা কারণে কেউ অমঙ্গলকে ধ্যান করে না!'

—'অমঙ্গলকে ধ্যান?'

—'হ্যাঁ, এখন অমঙ্গলই হচ্ছে আমার একমাত্র ধ্যান-ধারণা!'

—'তুমি পাগল।'

—'যদি তুমি আমার জীবনের কথা জানতে, তাহলে আমাকে পাগল বলতে তোমার বাধত।'

—'এ কথা তোমার মুখে সাজে না।'

—'কেন?'

—'নিজের জীবনকে তুমি তো নিজেই রহস্যের এক ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে রেখেছ। কতবার তোমার জীবনের কথা শুনতে চেয়েছি, কিন্তু তুমি কি কোনওদিনই আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছ।'

প্রমোদ উঠে বসল ধীরে ধীরে। তারপর আস্তে-আস্তে বললে, 'কেন যে তোমাকে আমার জীবনের কথা বলিনি তা কি তুমি জানো?'

—'কেমন করে জানব বলো? আমি গনতকার নই।'

—'আমার জীবনের কথা হচ্ছে অলৌকিক।'

—'অলৌকিক?'

—'হ্যাঁ। অলৌকিক বা অপার্থিব। শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

—'তোমার চেয়ে বড়ো বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তোমার কথায় আমি করব অবিশ্বাস!'

—'কেবল অলৌকিক নয়, আমার জীবনের কথা হচ্ছে ভয়ঙ্কর! তোমার সর্বাঙ্গ হবে রোমাঞ্চিত! শেষ পর্যন্ত হয়তো সহ্য করতে পারবে না!'

প্রফুল্ল সবিস্ময়ে প্রমোদের মুখের পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বোবার মতো। তারপর সে-ও উঠে বসে হাসতে হাসতে বললে, 'বন্ধু, জীবন বড়ো একঘেয়ে। কিন্তু তোমার কথায় পাচ্ছি 'অ্যাডভেঞ্চারে'র গন্ধ। রোমাঞ্চিত হতে আমি ভালোবাসি। পৃথিবীতে বসেই যদি অপার্থিবের সন্ধান পাওয়া যায়, তাও মন্দ লাগবে বলে মনে হচ্ছে না! বেশ, ব্যক্ত করো তোমার জীবন-কাহিনি!'

চাঁদের দুধের-ধারা-মাখা নদীর স্রোতের সঙ্গে নৌকো ভেসে যাচ্ছিল আপনা-আপনি। হঠাৎ থেমে গেল বাতাসের উচ্ছ্বসিত গতি, স্তব্ধ হয়ে গেল বনমর্মর। ক্ষীণ হয়ে এল নদীর কলতান। এবং সেই স্তব্ধতার মধ্যে আচম্বিতে জাগ্রত হল কোথায় রক্তলোভী ব্যাঘ্রের ভয়াবহ গর্জন।

শিউরে উঠে প্রমোদ বললে, 'শুনলে?'

—'কী?'

—'কোথায় বাঘ ডাকছে?'

—'ডাকুক্-গে! তাতে আমাদের কী?'

—'কিছু না। বিশ্বাস করো আর না-করো, শোনো তবে আমার কথা।'

॥ দ্বিতীয় ॥

প্রেতপর্বত

আমরা যখন আসামের এক জঙ্গলে বাস করতুম, তখনকার কথাই আমি ভালো করে বলব। কিন্তু আমাদের আদি বাস ছিল বাংলাদেশে, চব্বিশ পরগনা জেলায়। যে কারণে আমাদের নিজের দেশ ছাড়তে হয়েছিল, আগে সেই কথাই বলি।

ভাই-বোন আমরা ছিলুম তিনটি। দাদা, আমি আর মায়া। বাবা খুব ধনী না হলেও লাখ-খানেক টাকার মালিক ছিলেন! তারই সুদে স্বাধীনভাবে চলত আমাদের সংসার।

মায়াকে প্রসব করবার পরেই আমার মা মারা পড়েন। বাবা ছিলেন পরম হিন্দু, মাকে বাঁচাবার জন্যে তিনি অনেক ঠাকুর-দেবতার কাছে গিয়ে ধরনা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুর-দেবতারা মোটা টাকার প্রসাদ খেয়েও মাকে বাঁচাবার জন্যে যৎসামান্য চেষ্টাও করেননি।

তার ফলে বাবা হিন্দু-দেবতাদের নাম শুনলেই রেগে আগুন হয়ে উঠতেন। এবং মায়ের শোকে বাবার মস্তিষ্ক বোধহয় কিঞ্চিৎ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। যে কারণেই হোক বাবা হঠাৎ খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করলেন।

এসব ব্যাপারে বাংলার পল্লিসমাজে কীরকম বিশ্রী আন্দোলন জাগে, সেটা বোধহয় তোমাকে বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। কেবল প্রতিবেশীরা নয়, গ্রামের জমিদার পর্যন্ত গেলেন খেপে। চারিদিকে রক্তচক্ষু, চারিদিকে গালাগালি।

একদিন জমিদারবাড়িতে বাবার ডাক পড়ল। সেখানে কোন দৃশ্যের অভিনয় হবে সেটা আন্দাজ করতে পেরে বাবা নিজের বাড়িতেই বসে রইলেন।

ক্রুদ্ধ জমিদারবাবু সেইদিনের সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিলেন এক যষ্টিধারী দরোয়ান।

বাবা বাইরের ঘরে বসেছিলেন। দরোয়ান সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে জানালে, তার উপরে হুকুম হয়েছে বাবাকে কান ধরে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে।

বাবা অল্প-কথার মানুষ ছিলেন। সংক্ষেপেই বললেন, 'একবার সেই চেষ্টা করেই দ্যাখো না।'

দরোয়ান চেষ্টা করতে ভয় পেলে না। হাত বাড়ালে বাবার কর্ণধারণ করবার জন্যে। কিন্তু বাবা হাত বাড়ালেন তারও চেয়ে তাড়াতাড়ি। দরোয়ানের লাঠি কেড়ে নিয়ে তার মাথায় বসিয়ে দিলেন এক ঘা।

বিনাবাক্যব্যয়ে দরোয়ান হল একেবারে কুপোকাৎ। মুহূর্তে তার আত্মা হল দেহহীন।

এমন অঘটন যে ঘটবে বাবা কল্পনাও করতে পারেননি। দরোয়ানকে হত্যা করবার ইচ্ছা তাঁর মোটেই ছিল না।

কিন্তু বিপদে পড়েও বাবা বুদ্ধি হারালেন না! তাড়াতাড়ি নিতান্ত দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেললেন। তারপর কেউ কিছু টের পাবার আগেই রাত্রের অন্ধকারে তিনি আমাদের নিয়ে দেশত্যাগ করলেন।

তারপর কেমন করে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে বাবা সুদূর আসামের জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে বাসা বাঁধলেন, তা রোমাঞ্চকর হলেও এখানে সেসব সবিস্তারে বলবার দরকার নেই।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই বনে-বনে এমন অনেক লোক বাস করে যারা শিকারি বলে আত্মপরিচয় দেয়। শিকার করাই তাদের পেশা! বাবা কী বলে আত্মপরিচয় দিতেন তা আমি জানি না, তবে আমার বিশ্বাস তিনি শিকারি বলেই নিজেকে পরিচিত করেছিলেন।

যখন আসামের জঙ্গলে আসি তখন আমি খুব ছোটো, সব কথা ভালো করে মনে পড়ে না।

খান-চারেক কুটির তুলে বাবা বাঁধলেন বনের বাসা। সেখান থেকে মানুষের বসতি ছিল মাইল-কয়েক দূরে। বিশেষ দরকার না থাকলে বাবা লোকালয়ের দিকে পা বাড়াতেন না। আমাদের গোরু ছিল, ছাগল ছিল আর ছিল হাঁস আর মুরগি। এবং বাসার পিছনে খানিকটা ঘেরা-জমির ভিতরে ছিল শাক-সবজির বাগান। চাল-ডাল প্রভৃতি আসত মাঝে-মাঝে দূরের

লোকালয় থেকে। বাবাও প্রত্যহ বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন বনে-বনে শিকারের সন্ধানে। প্রায়ই পাখি বা হরিণ মেরে আনতেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ, জঙ্গলের ভিতরেও আমাদের মোটামুটি খোরাকের অভাব হয়নি।

সে বনের ছবি উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনের ভিতরে। একাধারে তা অপূর্ব, বিচিত্র, ভয়াবহ! সুন্দরের সঙ্গে ভীষণের তেমন সম্মিলন আমি আর কোথাও দেখিনি।

আমাদের বাসার পরেই ছিল খানিকটা ঘাস ও আগাছা-ভরা জমি এবং তারপরেই একটি ছোটো নদী। বৎসরের অন্য সময়ে নদীটি বালির বিছানার উপর দিয়ে শীর্ণ জল-রেখা এঁকে ঝির-ঝির করে বয়ে যেত এবং তখন তার গান শোনাত মৃদু গুঞ্জনের মতো। কিন্তু বর্ষার সময়ে সে হয়ে উঠত সত্যসত্যই ভয়ঙ্করী! দুই তটের আগল ভেঙে ছড়িয়ে পড়ত অনেকদূর পর্যন্ত এবং প্রচণ্ড জলধারা ফুলতে ফুলতে, ফেনার শুভ্রতা ছড়াতে-ছড়াতে এবং উন্মাদিনী বন্যার মতন গর্জন করতে করতে চমকিত করে তুলত শ্রবণ-মন-নয়নকে! তার ছোট্ট ও শান্ত মূর্তি তখন কল্পনাও করা যেত না।

নদীটির জন্ম তার উত্তরদিককার বিশাল পর্বতপুরীর মধ্যে। সেখানে পাহাড়ের পর পাহাড়ের প্রস্তর-স্তূপ ক্রমেই উঁচু হয়ে উপরপানে উঠে গিয়ে নীলাকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে একেবারে। শিখরের পর শিখর, শিখরের পর শিখর—যেন অজানা, রহস্যময় ও বিভীষণ-দেবতাদের পূজার জন্যে যেসব মন্দির গড়া হয়েছে ওগুলো হচ্ছে তাদেরই চুড়ো!

এ-অঞ্চলের কোনও লোকই একলা ওই পর্বতপুরীর মধ্যে ঢুকতে সাহস করত না, দিনের বেলাতেও। সন্ধ্যা নামলে দলে ভারী হলেও সকলে ওখান থেকে পালিয়ে আসত। তাদের বিশ্বাস, সূর্য অস্ত গেলেই ওখানে যাদের আসর বসে তারা কেউ জন্তুও নয়, মানুষও নয়। ওখানে যাওয়া আর যমালয়ে যাওয়া নাকি একই কথা। বিশেষ করে একটি পাহাড় নাকি এমনি ভয়ানক যে, লোকে তার নাম রেখেছে, 'প্রেতপর্বত'। বাবা আগে এইসব জনরব অলস জল্পনা-কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতেন বটে, কিন্তু পরে তাঁকেও করতে হয়েছিল মত-পরিবর্তন।

নদীর পূর্ব-পারে আমাদের কুটির। এদিকেও জঙ্গল আছে বটে, কিন্তু তা খুব ঘন বা দুর্গম নয়। এদিকে কাঠ-কাটা বা মধুসংগ্রহ প্রভৃতির জন্যে মানুষের চলাচলও আছে।

কিন্তু নদীর পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ হয়েছে যে বিরাট ও গভীর অরণ্য মনুষ্যের পক্ষেও তা অগম্য স্থান বললেও অত্যুক্তি হবে না! সে অরণ্যের অনেক জায়গাই দিবালোকের স্পর্শও পায়নি কখনও। সেখানকার অধিকাংশ বৃক্ষই পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে সর্বদাই করে যেন মর্মর-ভাষায় আর্তনাদ। তাদের তলায় এবং আশেপাশে বাস করে যে নিবিড় অন্ধকার, মানুষের দৃষ্টি যেন তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়ে আবার বাইরে পালিয়ে আসে সভয়ে!

ওই অরণ্যের বাসিন্দা হচ্ছে হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, বন্য বরাহ, মহিষ, নেকড়ে, অজগর এবং অন্যান্য সর্প প্রভৃতি। তাদের অনেকেই নদী পার হয়ে আমাদের এদিকেও মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসত। তাই বাবার হুকুম ছিল, তিনি বাইরে গেলে আমরা যেন ঘরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকি। ছেলেমানুষি খেয়ালে হয়তো বাবার অনুপস্থিতির সময়ে এক-আধ দিন বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারতুম, কিন্তু দিনের বেলাতেও অরণ্যের ভিতর থেকে যেসব হিংস্র জীবের হুঙ্কার ভেসে আসত তা শুনে কোনওদিন আমরা কেউ পিতার অবাধ্য হতে ভরসা করিনি। আর রাত্রে তো সে অরণ্য হয়ে উঠত রোমাঞ্চকর শব্দময়! কত বৃহৎ জন্তু করত গর্জনের পর গর্জন, আবার কত জন্তুর কণ্ঠে ফুটত কাতর মৃত্যুক্রন্দন! মাঝে মাঝে মাতঙ্গের দল আমাদের কুটিরের চারিদিকে ভূমিকম্প জাগিয়ে ছুটে চলে যেত আর কুটিরের ভিতরে পরস্পরকে জড়াজড়ি করে বসে আমরা তিনটি ভাই-বোন ভয়ে কেঁপে-কেঁপেই সারা হতুম, কারণ ওদের কোনও-একটি জীবের শুণ্ডের আঘাতে বা দেহের ধাক্কায় আমাদের কুটির তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারত যখন-তখন!

বাবা আমাদের দুই ভাইকে যে খুব ভালোবাসতেন এটা আমরা বেশ বুঝতে পারতুম। কিন্তু আমাদের বোন মায়ার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বেশ খানিকটা উদাসীন। মায়াকে প্রসব করতে গিয়েই যে আমাদের জননীকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে, এই চিন্তাই বোধকরি তাঁকে করে তুলেছিল মায়ার প্রতি বিমুখ। মায়ার সম্বন্ধে তিনি নিজের কর্তব্যপালন করতেন মাত্র, কিন্তু তাঁর প্রাণের স্নেহ পায়নি সে কোনওদিন।

বেচারা মায়া! সে হচ্ছে জন্মদুঃখিনী। জ্ঞান হবার আগেই মাতৃহারা, পিতার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে থাকে ভগবানের হাত, মা যে বেঁচে নেই এজন্যে তাকে দায়ী করলে চলবে কেন? মায়ের প্রতি বাবার ছিল অন্ধ ভালোবাসা, তাই বোধহয় তিনি বুঝেও বোঝেননি এই সত্য কথাটা।

মায়া কিন্তু বাবাকে কী ভালোই বাসত! যদিও আমরা তার মুখ দেখেই বুঝতুম, তার প্রতি যে বাবার দরদ নেই এটা সে সর্বদাই অনুভব করতে পারত। তার শিশু-মন কী ভাবত জানি না, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তার মুখ হয়ে থাকত বিমর্ষ।

আমরা দুই ভাই মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করতুম পিতার এই স্নেহের অভাব পূরণ করবার জন্যে। মায়া ছিল আমাদের প্রাণের পুতলি।

আর মায়া ছিল পরমাসুন্দরী—তার সর্বাঙ্গে ছিল গোলাপ-পাপড়ির রং আর কোমলতা। তার সেই ঢল-ঢল মুখের পানে তাকালে অতি-পাষণ্ডেরও মন বিগলিত না হয়ে পারত না। নিজের বোন বলে বলছি না, কিন্তু এমন রূপের ডালি পৃথিবীর মাটিতে আর আমি দেখিনি। প্রফুল্ল, আজ যদি তোমার সামনে মায়াকে এনে দেখাতে পারতুম তাহলে তুমি বুঝতে যে আমি অত্যুক্তি করছি না একটুও। কিন্তু হায়, মায়াকে আর কেউ দেখতে পাবে না!

কী জিজ্ঞাসা করছ? মায়া বেঁচে আছে কি না? না, সে অভাগিনি আর বেঁচে নেই। কেমন করে সে মারা পড়ল? এখনই সেই কথাই বলব।

বনবাসে এসে বাবাকেও কোনওদিন সুখী দেখিনি। হাসতে তিনি যেন ভুলেই গিয়েছিলেন এবং তাঁর মুখের কথা হত প্রায়ই বিরক্তিভরা। হয়তো এই সমাজ-পরিত্যক্ত জীবন তাঁর পক্ষে ছিল অসহনীয়। হয়তো মায়ের অভাব তিনি অনুভব করতেন পদে পদে। হয়তো একটা মানুষের প্রাণ গিয়েছে তাঁরই হাতে, এই দুশ্চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত সর্বক্ষণ।

দায়ে পড়লে মানুষ প্রবীণ হয় অল্প-বয়সেই। সকালের আহারাদি সেরে বাবা প্রত্যহই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেতেন বাইরে। তারপর প্রায়ই ফিরে আসতেন রাত্রিবেলায় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায়। কোনও জীব শিকার করে আনলেও সেদিন আর রান্নাবান্নার সময় থাকত না। সেইজন্যে দুপুরের পর থেকেই আমরা তিন ভাই-বোনে মিলে রাত্রের আহার্য প্রস্তুত করবার জন্যে নিযুক্ত হয়ে থাকতুম। আমরা কীরকম রান্না করতুম জানি না; বাবা কিন্তু আমাদের তৈরি-করা খাবার গ্রহণ করতেন পরম পরিতুষ্টের মতো।

এইভাবেই কিছুকাল ধরে আমরা জীবন যাপন করলুম। তারপরেই আরম্ভ হল যেসব ঘটনার ধারা, বললেও তুমি হয়তো তা ধারণা করতে পারবে না।

দাদার বয়স তখন নয়, আমার সাত আর মায়ার পাঁচ বৎসর।

॥ তৃতীয় ॥

প্রেতপর্বতের অন্তঃপুরে

শীত পড়ল! পাহাড়ে-দেশের আসল বন্য-শীত। এখানে বসে ওদেশি শীতের মর্ম কিছুতেই তোমরা আন্দাজ করতে পারবে না!

রাত হয়েছে, গহন বনের শীতার্ত রাত্রি। দরজা-জানলা বন্ধ করে আমরা তিনজনে উনুন ঘিরে বসে আগুন পোয়াচ্ছিলুম। বাবা সারা দিনের পর ফিরে শ্রান্ত দেহে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বাইরে হিমকাতর ঝোড়ো-হাওয়া হু-হু-হু-হু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বনে-বনে ঘুরে কাঁদিয়ে তুলছিল সবুজ পাতাদের।

দাদা বললেন, 'কী রাত! এ-সময়ে যারা বাইরে আছে তাদের কী অবস্থা!'

মায়া কচি মুখখানি তুলে বললে, 'হাতি আর বাঘ বেচারিদের তো ঘরবাড়ি নেই। আহা, না জানি তাদের কত কষ্ট হচ্ছে।'

ঠিক সেই সময়ে আমাদের দরজার ওপাশে জাগল একটা গর্জন।

বাবা ধড়মড়িয়ে বিছানার উপরে উঠে বসে বললেন, 'নেকড়ে!'

মায়া আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে সভয়ে বলে উঠল, 'মাগো!'

আমি বললুম, 'এখন ভয় পাচ্ছিস কেন? এই তো শীতে ওদের কষ্ট হচ্ছে বলে দুঃখ করছিলি। যা, উঠে গিয়ে ওকে দরজা খুলে দে!'

নেকড়েটা আবার গর্জন করলে—এবারে আরও জোরে। সে কী ক্ষুধার্ত চিৎকার, যেন হিম করে দেয় বুকের রক্ত।

বাবা বললেন, 'এ তো ভালো কথা নয়। দেখতে হল।'

তিনি বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। তারপর বন্দুকটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমি দরজাটা আবার ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলুম।

আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা কেটে গেল। তবু বাবা ফিরলেন না। বন্দুকের শব্দ বা নেকড়ের গর্জনও শুনলুম না। ঘুমের কথা ভুলে আমরা তিনজনে বসে-বসে ভাবতে লাগলুম, এমন কনকনে ঠান্ডা রাতে বাবা এতক্ষণ ধরে বনের ভিতরে কী করছেন? কোনও বিপদে পড়েননি তো?

ছোট্ট খুকি মায়া, তন্দ্রার ঝোঁকে থেকে-থেকে তার মাথা নুয়ে পড়ছে, তবু সে-ও ঘুমোতে পারলে না।

ব্যাপারটা যা হয়েছিল, পরে বাবার মুখে শুনেছি।

সে রাতে আকাশে ছিল চাঁদ। জ্যোৎস্নার ধবধবে আঁচলে চাপা পড়েছিল অন্ধকার।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে বাবা দেখলেন, প্রায় ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড দীপ্তচক্ষু নেকড়ে বাঘ। বাবাকে দেখেই সে গজরাতে গজরাতে আরও খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

জানোয়ারটাকে অত দূর থেকে গুলি করলে লক্ষ্য ব্যর্থ হবে, এই ভেবে বাবা বন্দুক তুলে তাড়াতাড়ি তার দিকে অগ্রসর হলেন।

একই অভিনয় চলল খানিকক্ষণ ধরে। বাবা যত এগিয়ে যান, নেকড়েটাও তত এগিয়ে যায়। বাবা যেই দাঁড়ান, সে-ও দাঁড়িয়ে পড়ে দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করে গজরাতে থাকে। বাবা ছুটলে সে-ও ছোটে, বাবা ধীরে ধীরে চললে সে-ও চলে ধীরে ধীরে।

বাবা ভারী একরোখা ছিলেন। তাঁরও গোঁ হল যেমন করে হোক আজ ওই নেকড়েটাকে বধ করবেনই। তিনি ছুটলেন পশুটার পিছনে-পিছনে, মাইলের পর মাইল পার হয়েও থামলেন না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল তবু হুঁস নেই।

তারপরেই নেকড়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাবা এসে পড়লেন প্রেতপর্বতের তলদেশে। তার সম্বন্ধে জনরব কী বলে সেটা তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি সেসব কথাকে কুসংস্কার বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন বরাবর।

প্রেতপর্বতের বুকের ভিতরে লক-লক করে খেলা করছিল অগ্নিশিখা। বাবা স্থির করলেন, দাবানল। বনে যাদের বাস প্রায়ই তাদের পরিচয় হয় দাবানলের সঙ্গে। কিন্তু এমন প্রচণ্ড শীতকালে হিমে-ভেজা বনে কি দাবানল জ্বলে? শিকারের উত্তেজনায় বাবার মনে এ-প্রশ্ন জাগল না।

দাবানল জ্বলছে দাউ দাউ দাউ। কে যেন অপবিত্র নরকাগ্নির খানিকটা নিক্ষেপ করেছে প্রেতপর্বতের মধ্যে। তারই শিখাগুলোকে নিয়ে কারা যেন দুরন্ত আহ্লাদে লাফালাফি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে পাহাড়পুরের বনে-বনে—গাছে-গাছে।

একে জ্যোৎস্না, তার উপরে দাবানল। চারিদিক আলোয় আলো! নেকড়েটাকে আরও স্পষ্ট করে দেখা যেতে লাগল। সে তখন পাহাড়ের উপরে উঠছে। বাবাও তার পিছু নিলেন।

খানিকটা উপরে উঠেই নেকড়েটা হঠাৎ একখানা বড়ো পাথরের উপরে বসে পড়ল।

সে হাঁপিয়ে পড়েছে বুঝে বাবা এগিয়ে গেলেন দ্রুতপদে। নেকড়ে নড়ল না। বাবা দাঁড়ালেন, বন্দুক তুললেন, তবু সে পালাবার চেষ্টা করলে না।

লক্ষ্য স্থির করে বাবা বন্দুক ছোড়েন আর কী—আচম্বিতে নেকড়ে হল অদৃশ্য।

বাবা বিপুল বিস্ময়ে হতভম্ব! জ্যোৎস্না আর দাবানল সেখানটা স্পষ্ট করে তুলেছে দিবালোকের মতো, চোখের ভ্রম হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই, অথচ হাড় এবং মাংস দিয়ে গড়া একটা নিরেট মূর্তি কি কখনও এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারে বাতাসের মতো বাতাসে?

বাবা শেষটা অবশ্য দোষ দিলেন নিজের চোখকেই, কারণ এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে তা ছাড়া আর উপায়ই ছিল না।

নিজের দৃষ্টির অক্ষমতাকে বার-বার ধিক্কার দিতে-দিতে বাবা যেই ফিরে দাঁড়িয়েছেন, অমনি রাত্রির স্তব্ধ আকাশকে বিদীর্ণ করে জাগল একটা উচ্চ ও তীক্ষ্ণ চিৎকার—'কে কোথায় আছ, সাড়া দাও, আমি পথহারা বিপন্ন পথিক, আমাকে সাহায্য করো!'

এ আবার নতুন বিস্ময়!

কুবিখ্যাত প্রেতপর্বত, দিনের বেলাতেও লোকে যার কাছে আসতে আতঙ্কে শিউরে ওঠে, এই গভীর নিশীথে সেখানে মানুষ-পথিক। সে আবার এমন সৃষ্টিছাড়া স্থানে অন্য মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে! ও কি উন্মত্ত?

তারপরেই দেখা গেল, উপত্যকার পাশের পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে দুটি মূর্তি।

বাবার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। তাহলে কি প্রেতপর্বত সম্বন্ধে জনরব মিথ্যা নয়?

মূর্তিদুটি ক্রমেই কাছে এসে পড়ল, তাদের একজন পুরুষ আর একজন নারী। না, এরা যে পৃথিবীর মানুষ, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

বাবা শুধোলেন, 'কে আপনারা?'

পুরুষটি বললে, 'বিদেশি।'

—'এখানে কেন?'

—'শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বনের ভিতরে পালিয়ে এসেছিলুম। তারপর পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি।'

—'আপনি দেখছি বাঙালি।'

—'হ্যাঁ, বাংলা আমার দেশ বটে, তবে এখন থাকি আসামে।'

—'কেন?'

—'এখানে চাকরি করি।'

—'শত্রুর কথা বলছিলেন না?'

—'হ্যাঁ।'

—'কে আপনার শত্রু?'

—'জমিদার।'

—'জমিদার!'

—'জমিদার জোর করে আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়?'

—'সে কী!'

—'সে জোর করে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তার চরিত্র নরপিশাচের মতো। তার কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই মেয়েকে নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।'

—'কিন্তু আপনি কোথায় এসেছেন জানেন?'

—'কোথায়?'

—'প্রেতপর্বতে।'

—'এ কীরকম নাম!'

—'লোকে বলে, রাত্রে এ-পাহাড়ে বসে ভৌতিক-সভা।'

—'আপনি এসব বিশ্বাস করেন?'

—'করলে এত রাত্রে এখানে আসতুম না।'

—'মশাই, এইটি আমার মেয়ে। লীলা, তুমি কি ভূত মানো?'

প্রশ্ন শুনে লীলা চমকে উঠল। তারপর তাকালে প্রেতপর্বতের শিখরের দিকে। সেখানে তখনও নৃত্য করছিল দাবানলের শিখা।

বাবা বললেন, 'এ আলোচনার স্থান নয়। আপনার নামটি জানতে পারি কি?'

—'শ্রীগিরীন্দ্রশেখর চৌধুরি। আপনার?'

—'প্রবোধকুমার বসু।'

—'পরিচয় তো হল, এখন আমাদের কী করতে বলেন?'

—'গিরীন্দ্রবাবু, আপনি জানেন না আপনার সঙ্গে আমারও জীবনের কতকটা সাদৃশ্য আছে। আমিও জমিদারের অত্যাচারে দেশছাড়া। আমরা দুজনেই দুজনের ব্যথার ব্যথী হতে পারি। আসুন আমার সঙ্গে।'

॥ চতুর্থ ॥

জ্বলন্ত প্রমাণ দাবানল

মায়া তখনও ঢুলছিল, আমরা তখনও বসে ভাবছিলুম।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত হল, সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বাবার কণ্ঠস্বর। আমরা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

বাবার সঙ্গীদের দেখে আমার দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। মায়া অস্ফুটকণ্ঠে কেঁদে উঠে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

বাবা আগন্তুকদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার ছেলে-মেয়েরা এখানে অতিথি দেখেনি কোনওদিন। ওরা তাই বিস্মিত হয়েছে।'

গিরীন্দ্র বললে, 'হবারই কথা! ওগো খোকাখুকুরা, ভয় নেই! আমরা বাঘও নই, ভাল্লুকও নই। বনে আমরা পথ হারিয়েছিলুম, তোমাদের বাবা দয়া করে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন।'

বাবা বললেন, 'আসুন গিরীন্দ্রবাবু, আসুন লীলা দেবী, উনুনে এখনও আগুন আছে দেখছি। এতক্ষণ ধরে বাইরে শীতের যে ধাক্কা সামলাতে হয়েছে, দেহগুলো একটু তাতিয়ে না নিলে চলবে না।' তারপর দাদার দিকে ফিরে বললেন, 'প্রকাশ, এঁরা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। এত রাত্রে ভালো করে খাওয়াবার সময় তো হবে না, এখন কী করা যায় বলো তো?'

দাদা বললেন, 'চাল আছে, ডাল আছে, আলু আছে। আর আছে তাজা মুরগির ডিম। বলো তো এক ঘণ্টার মধ্যে খাবার তৈরি করে দিতে পারি।'

গিরীন্দ্র বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, 'সাধু, সাধু! খোকাবাবুজি, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! এ যে মরুভূমিতে বৃষ্টিধারা! গহন বনে রাজভোগ!'

ইতিমধ্যে মায়ার খোঁজে পাশের ঘরে ঢুকে আমি দেখলুম, বিছানার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'কী রে মায়া, কাঁদছিস কেন?'

—'ভয় করছে, আমার বড্ড ভয় করছে!'

—'ভয় করছে? কেন রে?'

—'ওই মেয়েটাকে দেখে!'

—'কোন মেয়েটা? বাবার সঙ্গে যে এসেছে?'

—'হ্যাঁ ছোটদা!'

—'সে কী রে? ও-যে পরির মতন সুন্দরী! অমন সুন্দরী আমি কখনও দেখিনি!'

—'কিন্তু তুমি ওর চোখ দেখেছ?'

—'চোখ?'

—'হ্যাঁ। ওর চোখ দেখেই আমার ভয় করছে!'

—'যত সব বাজে কথা! চোখ দেখে আবার ভয় কী-রে?'

—'জানি না। আমি ওর কাছে যাব না—কক্ষনো না।' মায়া আবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কিছুতেই আর শয্যাত্যাগ করতে চাইলে না।

অতিথিরা বেশ-কিছুকাল ধরে বাস করলে আমাদেরই সঙ্গে।

বাবা ও গিরীন্দ্রবাবু প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে যেতেন শিকারের সন্ধানে। লীলা থাকত কুটিরেই।

দেখলুম, ঘরকন্নার কাজে সে একেবারেই পাকা। সারাদিনই সংসার নিয়ে নিযুক্ত থাকত, যা করবার সবই নিজের হাতে করত, আমাদের কারুকে কিছুই করতে দিত না। এমন কাজের মেয়ে খুবই কম দেখা যায়।

দাদাকে আর আমাকে ভারী যত্ন আর আদর করত লীলা। সর্বদাই চেষ্টা করত কিসে আমাদের মন খুশি থাকে। মায়াকেও সে বশ করবার জন্যে কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু তাকে বাগে আনতে পারেনি কিছুতেই। মায়া তার কাছ থেকে সর্বক্ষণই তফাতে-তফাতে থাকবার চেষ্টা করত এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও লীলা যদি তাকে আদর করবার চেষ্টা করত, তাহলে সে কেঁদে ফেলত তখনই। শেষটা লীলাকেও বাধ্য হয়ে মায়ার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা ছেড়ে দিতে হল। সে-ও মায়ার কাছে যেত না, মায়াও তার কাছে আসত না।

অথচ লীলা ছিল অতি-আমুদে মেয়ে। প্রতিদিনই সে আমাদের আনন্দ দেবার জন্যে শোনাত নতুন নতুন হাসির গান! তার অধিকাংশ গানেই থাকত বনের জীবজন্তুদের কথা। গোটা-তিন গানের কথা এখনও আমার মনে আছে। প্রথমটি হচ্ছে প্যাঁচা-পেঁচির কথা:

প্যাঁচা বলে, 'পেঁচি রে আজ
পাইনি ইঁদুর-ছানা।'
পেঁচি বলে, 'কর্তামশাই,
হবে কিসে খানা?'
প্যাঁচা বলে, 'খা না খাবি,
শ্রীমুখেতে দিয়ে চাবি
পরম সুখে স্বর্গে যাবি,
—গাইব তা-না-না-না'।

আর-একটিতে আছে, বাঘ-বাঘিনির কথা

এক যে ছিল বনের বাঘা,
ধরতে গিয়ে হরিণ সেদিন
পেয়েছিল বিষম দাগা।

ব্যাধ ছিল এক লুকিয়ে ঝোপে,
ছাড়লে কী বাণ বাঘার গোঁপে,
জাঁদরেলি গোঁপ কচু-কাটা—
পালাল বাঘ চেঁচিয়ে গাঁ-গাঁ!
হায় বেচারা গোঁপ হারিয়ে ফিরল যখন গর্তে,
বাঘিনি কয়—'আ মরে যাই! হেথায় কেন মরতে?
জলদি ভাগো গোঁফ-কাটা বাঘ!
মুখ দেখে তোর হচ্ছে যে রাগ!'
ব্যাপার দেখে কা-কা করে
ধরলে হাসি যত কাগা!

তৃতীয় গানটিতে আছে কাক-শালিক-সংবাদ ঃ

শালিকপাখি আজ গিয়েছে শালকে!
বিয়ে করে আনবে সে বউ কালকে!
কাক ছিল—যার মনটা বাঁকা, বললে—'আমি সবার কাকা,
নিমন্ত্রণে কাকাকে বাদ? করব আমি জোর-প্রতিবাদ!
ঠুকরে যে তার ভাঙব ঘরের চালকে।'
শালিক শুনে উঠল রেগে কাকের বাসায় ছুটল বেগে—
কয় সে—'কে কয় তোরে কাকা? নিজেই ডাকিস করে কা-কা!
সাগর বলে কেউ কি কাটা-খালকে?'
'হাম কাকা হ্যায়!'—যেই বলে কাক, জোরসে শালিক খুব দিলে হাঁক—
'আজ ধরে-গা ধ্রুপদ-ধামার, লে আও নতুন গিন্নি হামার!
জলদি লে আও আমার খাঁড়া-ঢালকে!
দেখছি যে তোর বিপুল বড়াই, হোক তবে আজ তুমুল লড়াই!'
যেই দেখে কাক—শক্ত মাটি, পড়ল সরে পার্শ্ব কাটি—
বাঁচাতে তার কালো গায়ের ছালকে।
কবি বলে—'এরও পরে গল্প আছে আমার ঘরে,
ভাব করে মোর কিল-বিল-বিল, কিন্তু দাদা, নেই ভালো মিল!
শুন শুন আমার ভক্ত! পদ্যে গল্প বলাই শক্ত—
মিথ্যে কেবল ঘা হল হায়—চুলকে!
'চুলকে'র সাথে মিলবে না যে 'শালকে'—
মিষ্টি কভু লাগবে না ভাই, ঝালকে!

কেবল আমরা কেন, বাবার মন রাখবার জন্যেও লীলার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রায়ই সে নতুন নতুন খাবার তৈরি করত—বিশেষ করে বাবার জন্যেই। বাবা খেতে বসলে সে সামনে গিয়ে বসত, পাখা নেড়ে মাছি তাড়াবে বলে। এত যত্নাদর পেয়ে বাবাও হয়ে উঠলেন তার প্রতি অত্যন্ত সদয়। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, লীলা ছাড়া বাবার একদণ্ড চলত না।

একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা তিনজনে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, বাবা আর গিরীন্দ্রবাবু বসে বসে কইছেন কথাবার্তা।

গিরীন্দ্রবাবু হঠাৎ বললেন, 'প্রবোধবাবু, কাল থেকে আর আপনার আতিথ্য স্বীকার করতে পারব না!'

—'সে কী!'

—'কাল আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। বিশেষ জরুরি দরকার।'

—'তারপর আবার ফিরবেন তো?'

—'আবার ফিরব কেন? আসামে আর তো আমার চাকরি নেই!'

বাবা একটু দুঃখিত-স্বরে বললেন, 'এতদিন ঘনিষ্ঠতার ফলে আপনারা আমাদের আত্মীয়ের মতন হয়ে গিয়েছিলেন। এই মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে আমার কষ্ট হবে।'

—মায়ার বাঁধন ছিঁড়বেন কেন? আপনি ইচ্ছা করলে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতে পারি।'

—'কেমন করে?'

—'আপনার হাতে আমি আমার কন্যা সম্প্রদান করতে রাজি আছি।'

বাবা কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, 'তার মানে?'

—'আমার জামাই হতে আপনার আপত্তি আছে কি?'

অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করে বাবা বললেন, 'না।'

—'বেশ, তাহলে এখনই বিবাহ হয়ে যাক!'

বাবা সবিস্ময়ে বললেন, 'অসম্ভব!'

—'অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে। কারণ কাল খুব ভোরেই আমি কলকাতার দিকে যাত্রা করব।'

—'কিন্তু এই বনে, এত রাত্রে—'

বাধা দিয়ে গিরীন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রবোধ, তুমি কী বলবে বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাও, এতরাত্রে এখানে পুরুত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কী দরকার পুরুতের? তুমি ক্রিশ্চান, আমিও কোনও ধর্ম মানি না, তবে আর সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? তুমি লোকালয় ত্যাগ করেছ, যাপন করছ বন্য-জীবন, সুতরাং বন্য-রীতি অনুসারেই তোমাদের বিবাহ হলে কোনওই ক্ষতি নেই!'

—'কিন্তু'—

—'আর কোনও কিন্তু-টিন্তু নয়, আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব নিজের শর্তে।' গিরীন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'লীলা, এদিকে এসো!'

লীলা এগিয়ে এল।

—'প্রবোধ, উঠে দাঁড়াও। লীলার হাত ধরো। আচ্ছা, এইবার প্রতিজ্ঞা করো।'

—'কী প্রতিজ্ঞা?'

—'বলো, প্রেতপর্বতের আত্মাদের নামে আমি শপথ করছি যে—'

বাবা বাধা দিয়ে বললেন, 'শপথ যদি করতে হয়, ভগবানের নামেই করা উচিত।'

—'না প্রবোধ, আমি ভগবান মানি না! তুমি বাস করছ—প্রেতপর্বতের ছায়ায়। তোমার শপথ শুনতে পাবে এখানকার আত্মারাই।'

বাবা নাচারের মতন বললেন, 'তবে তাই-ই হোক।'

—'শপথ করো।'

—'প্রেতপর্বতের আত্মাদের নামে শপথ করছি যে, আজ থেকে লীলাকে আমার বৈধ-পত্নীরূপে গ্রহণ করলুম। তার ভালো-মন্দের জন্যে দায়ী থাকব আমিই।'

গম্ভীর-স্বরে গিরীন্দ্রবাবু বললেন, 'ওইসঙ্গে বলো যে, 'যদি আমার দ্বারা লীলার কোনও অনিষ্ট হয়, তাহলে প্রেতপর্বতের আত্মাদের অভিশাপ যেন আমার আর আমার সন্তানদের মাথার উপরে এসে পড়ে। যেন তাদের মাংস হয় শকুনি, গৃধিনি, নেকড়ে আর বনের অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের খাদ্য! করো শপথ!'

একটু ইতস্তত করে বাবা গিরীন্দ্রবাবুর কথাগুলো আর-একবার আউড়ে গেলেন।

গিরীন্দ্রবাবুকে দেখাচ্ছিল তখন কী ভয়ঙ্কর! মনে হচ্ছিল মাথায় তিনি যেন আরও একফুট উঁচু হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে ঠিকরে পড়ছে তুবড়ির আগুনের ফিনকি!

দাদা বিছানার উপরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলেন, আমার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল, মায়া চিৎকার করে কেঁদে উঠল!

লীলা অসন্তুষ্ট-স্বরে বললে, 'অমঙ্গল ডেকে এনো না মায়া। বিয়ের সময়ে কাঁদতে নেই।'

হঠাৎ আমাদের ঘরের ভিতরটা যেন বদলে গেল একেবারে! এ যেন আমাদের সেই পরিচিত ঘর নয়, যেন আমরা কোনও অজানা ও অচেনা ঘরের ভিতরে বসে চোখের সামনে দেখছি এক অলৌকিক ও অস্বাভাবিক দৃশ্যের অভিনয়!

ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে একটা আগুনের আভা। সচমকে মুখ তুলে দেখি, প্রেতপর্বতের উপরে দাউ-দাউ করে জ্বলছে দাবানল—তার শিখরে-শিখরে উৎকট আনন্দে নৃত্য করছে যেন প্রচণ্ড অগ্নিসাগরের রক্তাক্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

বাবা বললেন, 'প্রেতপর্বতে আবার দাবানল!'

হো-হো করে কঠিন-হাসি হেসে গিরীন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রেতপর্বতের আত্মারা যে তোমার শপথ শুনতে পেয়েছে, ওই দাবানলই হচ্ছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ!'

॥ পঞ্চম ॥

নিশাচরী

গিরীন্দ্রবাবু চলে গিয়েছেন। বাবা হুকুম দিয়েছেন, লীলাকে মা বলে ডাকতে। কিন্তু কেবল বাবা ও লীলার সামনেই আমরা মা শব্দটি উচ্চারণ করতুম, নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করতুম লীলার ডাকনামই! কেন জানি না, তাকে মা বলতে গেলে যেন বদ্ধ হয়ে আসত আমাদের কণ্ঠস্বর। লীলার যত গুণই থাক তার মধ্যে মাতৃত্বের ভাব ছিল না একটুও।

কিছুদিন কেটে গেল। তারপরই ঘটনার ধারা বইতে লাগল সিনেমার ছবির মতো দ্রুত তালে।

আমাদের শোবার ঘরে ছিল দুটি বিছানা। একটিতে শুতেন বাবা আর লীলা, আর-একটিতে আমরা তিনজন।

এক রাত্রে মায়া হঠাৎ ঠেলে-ঠেলে দাদাকে আর আমাকে জাগিয়ে দিলে।

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে মায়া?'

মায়া চুপি-চুপি বললে, 'লীলা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে।'

—'বাইরে মানে?'

—'বনের ভেতরে!'

—'এত রাত্রে? দূর, কী যে বলিস!'

—'সত্যি বলছি দাদা! লীলা আস্তে-আস্তে বিছানা থেকে উঠল। একবার ফিরে চেয়ে দেখলে বাবা ঘুমোচ্ছেন কি না। তারপর পা টিপে-টিপে এগিয়ে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে চলে গেল। ওই দ্যাখো না, বিছানায় সে নেই।'

এই হাড়কাঁপানো শীতের নিঝুম রাতে, পদে পদে বিপজ্জনক অরণ্যের মধ্যে গিয়ে লীলা একলা কী করছে? আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না! তিনজনেই না ঘুমিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলুম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘরের খুব কাছেই শুনলুম একটা গর্জন। আমি বললুম, 'নেকড়ে!'

দাদা বললেন, 'কী সর্বনাশ, লীলাকে দেখতে পেলে নেকড়ে যে ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেলবে?'

মায়া মাথা নেড়ে বললে, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না!'

মিনিট-কয় কাটাল। তারপর লীলা আবার ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। ওদিককার জানলার সামনে ছিল জলভরা বালতি। সেখানে গিয়ে সে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললে। তারপর বিছানায় গিয়ে বাবার পাশে শুয়ে পড়ল।

আমরা ভয়ে কাঁপতে লাগলুম, কেন জানি না।

পরদিন থেকে আমরা লীলার উপরে পাহারা দিতে শুরু করলুম। কিন্তু পরদিনেও সেই ব্যাপার! তার পরদিন এবং তার পরদিনেও! এমনি উপর-উপরি আরও কয়েক রাত্রি ধরে দেখলুম একই দৃশ্য! ঠিক যেই রাত বারোটা বাজে, লীলা বিছানা ছেড়ে উঠে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়। তারপরেই বাইরে থেকে গর্জন করে ওঠে একটা নেকড়ে! অনেকক্ষণ পরে লীলা আবার ফিরে আসে এবং প্রতিদিনই আবার বিছানায় গিয়ে শোবার আগে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলে। বাবার ঘুম খুব প্রগাঢ়। তিনি কিছুই জানতে পারেন না।

একদিন বললুম, 'দাদা, বাবাকে এসব কথা জানানো উচিত।'

দাদা বললেন, 'হ্যাঁ, উচিত। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা উচিত, লীলা বাইরে গিয়ে কী করে!'

—'তা কী করে সম্ভব হবে?'

—'আজ লীলার পিছনে-পিছনে আমিও বাইরে যাব।'

—'না দাদা, তা হয় না।'

মায়াও ব্যস্ত-স্বরে বললে, 'ও দাদা, অমন কথা মুখেও এনো না! তাহলে ভয়েই আমি মরে যাব!'

দাদা ভারী সাহসী ছেলে। দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আজ আমি বাইরে যাবই।'

সেদিন দাদা লেপের ভিতরে ঢুকলেন বাইরে যাবার জামা-কাপড় পরেই।

যথাসময়ে লীলা বাড়ির বাইরে চলে গেল। দাদাও তখনই নীচে নেমে বাবার বন্দুকটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি আর মায়া মহা উৎকণ্ঠায় প্রায় শ্বাস বন্ধ করে দাদার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। তারপরেই শুনলুম একটা বন্দুকের শব্দ! এবং তারই মিনিট-খানেক পরে দেখলুম লীলা ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল খোঁড়াতে-খোঁড়াতে। তাড়াতাড়ি বালতির কাছে গেল। উঁকি

মেরে দেখলুম, একখণ্ড কাপড় নিয়ে সে নিজের পায়ে হাঁটুর কাছে 'ব্যান্ডেজ' বাঁধছে! খানিকক্ষণ পরে সে আবার শুয়ে পড়ল বাবার পাশে গিয়ে।

কিন্তু দাদা কোথায়? দাদা এখনও বাইরে কেন? দাদাই কি বন্দুক ছুড়ে লীলাকে জখম করেছেন? তাই কি তিনি বাবার ভয়ে বাড়িতে ফিরতে পারছেন না?

সারারাত কেটে গেল দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়ে।

বাবার ঘুম ভাঙল সকালে।

আমি ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'বাবা, দাদা কোথায়?'

বাবা বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, 'দাদা? কেন, সে কি বিছানায় নেই?'

—'না।'

লীলা বললে, 'দ্যাখো, কাল রাতে আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছিলুম, কে যেন দরজা খুলে বাইরে গেল! আচ্ছা, ঘরের কোণে তোমার বন্দুকটা দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো দেখি?'

সেইদিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর একলাফে শয্যার উপর থেকে নেমে পড়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতপদে।

অল্পক্ষণ পরেই তিনি আবার ফিরে এলেন, দুইহাতে দাদার রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ বহন করে। দেহটা নামিয়ে রেখে তিনি তার উপরে বিছিয়ে দিলেন একখানা কাপড়।

আমি ও মায়া মাটির উপরে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম।

লীলা দুঃখিত-স্বরে বললে, 'প্রকাশ নিশ্চয় তোমার বন্দুক নিয়ে নেকড়ে মারতে গিয়েছিল। বাচ্চা ছেলে, পারবে কেন? বেচারা বুদ্ধির দোষেই নেকড়ের হাতে প্রাণ দিলে।'

বাবা জবাব দিলেন না। তাঁর দেহ মূর্তির মতো স্থির।

আমি কথা কইতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু মায়া আমার দুইহাত চেপে ধরে এমন মিনতি ভরা চোখে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল যে কোনও কথাই বলতে পারলুম না।

সেইদিনই বাবা আমাদের বাসার অনতিদূরে দাদার মৃতদেহ নিয়ে মাটি খুঁড়ে কবরস্থ করলেন। বন্য জন্তুদের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে কবরের উপরে চাপিয়ে দিলেন মস্ত মস্ত পাথর!

বাবা কয়েকদিন আর শিকারে গেলেন না। সারাক্ষণ জড়ের মতন বসে থাকেন, বিমর্ষ মুখে কী ভাবেন এবং মাঝে-মাঝে গর্জন করে বলে ওঠেন, 'ধ্বংস করব, আমি নেকড়ে-বংশ ধ্বংস করব।'

ইতিমধ্যে একদিনও কিন্তু নিশাচরী লীলার বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়নি। তখনও যদি সব কথা বাবাকে বলতুম! কী এক ছেলেমানুষি ভয় আমার মুখকে রেখেছিল বোবা করে।

শেষটা শোকের প্রথম ধাক্কাটা সামলে বাবা আবার শিকার করতে বেরুলেন। কিন্তু প্রথম দিনেই ফিরে এসে বললেন, 'লীলা, তুমি বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু নেকড়েরা কবরের পাথর সরিয়ে আমার অভাগা ছেলের দেহটার সব খেয়ে ফেলেছে! কবরের ভিতরে পড়ে আছে কেবল খানকয়েক হাড়।'

লীলা সভয়ে ও সবিস্ময়ে বললে, 'ওমা, তাই নাকি গো?'

বাবা বললেন, 'নেকড়ে-বংশ জাহান্নামে যাক!'

মায়া বলে ফেললে, 'বাবা একটা নেকড়ে রোজ আমাদের দরজার কাছে এসে চিৎকার করে!'

বাবা বললেন, 'তাই নাকি? একথা আমাকে বলোনি কেন? এবারে নেকড়ের ডাক শুনলেই আমাকে জাগিয়ে দিয়ো—আমি তার রক্তদর্শন না করে ছাড়ব না।'

মায়ার মুখের দিকে একটা হিংস্র ও জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লীলা সেখান থেকে হনহন করে চলে গেল।

॥ ষষ্ঠ ॥

প্রেতপর্বতের প্রেতাত্মা

কয়েকদিন পরে।

আমাদের শাক-সবজির বাগান। মায়া এক জায়গায় বসে বসে ধুলো-মাটি দিয়ে খেলাঘর বাঁধবার চেষ্টা করছে। আমি দিচ্ছি গাছের গোড়ায় জল! বাবা কোদাল নিয়ে কোপাচ্ছেন মাটি।

এমন সময়ে লীলা এসে বললে, 'মায়া, ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে এসেছি, তুমি কিছুক্ষণ উনুনের কাছে গিয়ে বোসো গে, আমি ততক্ষণে বন থেকে জ্বালানি কাঠ নিয়ে আসি।'

মায়া খেলা ছেড়ে কুটিরের দিকে গেল। লীলা চলে গেল বনের দিকে।

আন্দাজ আধঘণ্টা পরে কুটিরের ভিতর থেকে ভেসে এল আর্তনাদের পর আর্তনাদ। মায়ার আর্তনাদ! বাবা আর আমি দুজনেই বাগান থেকে বেগে ছুটে এলুম—কিন্তু আসতে আসতেই আর্তনাদ হল নীরব।

আমরা কুটিরে ঢোকবার আগেই ভিতর থেকে উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে এল মস্তবড়ো এক নেকড়ে! চোখের পলক ফেলবার আগেই সে বনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরময় বইছে রক্তের ধারা! তারই মধ্যে পড়ে রয়েছে মায়ার ছিন্নভিন্ন দেহ। কিন্তু তার মুখে-চোখে তখনও জীবনের আভাস!

বাবা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বসে পড়লেন। আমাদের পানে তাকিয়ে একটু ম্লান-হাসি হাসলে মায়া, তারপরেই সে আমাদের মায়া কাটালে।

এমন সময়ে লীলা ঘরের ভিতরে ঢুকে দৃশ্য দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রন্দনভরা কণ্ঠে বললে, 'ওগো, এ কী দেখছি গো! কে এমন সর্বনাশ করলে গো!'

বাবা খালি বললেন, 'নেকড়ে।'

—'হায় রে অভাগি! একটু আগেই একটা নেকড়ে আমার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়েছিল! মাগো, আমার যা ভয় হয়েছিল! এ নিশ্চয় তারই কাজ!'

আমার আর বাবার শোকের কথা বর্ণনা করে তোমাকেও আর কষ্ট দিতে চাই না। শুভ্র পূজার ফুলের মতো সুন্দর, কোমল ও পবিত্র মায়া—সে ছিল আমাদের প্রাণের দুলালির মতো। তাকে হারিয়ে জীবন হয়ে গেল অন্ধকার।

দাদার কবরের পাশে বাবা মায়ার দেহকেও সমাধিস্থ করলেন।

রাত্রি। যে বিছানা ছিল আগে তিন ভাই-বোনের জন্যে, আজ আমি সেই বিছানায় একলা। চোখে ঘুম নেই। শুয়ে-শুয়ে ভাবছি। মায়ার মৃত্যুর সঙ্গে লীলার কোনও সম্পর্ক আছে বোধহয়। কিন্তু কীরকম সম্পর্ক?

হঠাৎ দেখলুম, লীলা শয্যা ছেড়ে নামল। তারপর ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল পা টিপে-টিপে অতি সন্তর্পণে।

সাংঘাতিক নারী! এখনও সে নিজের অদ্ভুত অভ্যাস ছাড়তে পারলে না?

দুর্দান্ত কৌতূহল হল। উঠলুম। দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি মারলুম।

জ্বলজ্বলে চাঁদের আলো—চারিদিক স্পষ্ট।

প্রথমেই চোখ গেল যেখানে আছে দাদার ও মায়ার সমাধি। আঁতকে উঠলুম সভয়ে। মায়ার কবরের পাশে বসে কে ওই স্ত্রীলোক পাথরের পর পাথর সরাচ্ছে? লীলা!

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু তারপর যখন দেখলুম, লীলা কবরের ভিতর থেকে মায়ার মৃত দেহকে দুই হস্তে টেনে বার করছে, তখন আর আমি স্থির হয়ে থাকতে পারলুম না। বেগে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জাগিয়ে দিয়ে বললুম, 'বাবা বাবা! শিগগির ওঠো! তোমার বন্দুক নাও!'

—'কী! আবার নেকড়ে এসেছে? বটে, বটে!' বাবা খাট থেকে লাফিয়ে পড়লেন, বন্দুকটা তুলে নিলেন, তারপর ছুটে চলে গেলেন ঘরের বাইরে। আমিও রইলুম পিছনে-পিছনে।

দাদার আর মায়ার কবরের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। একটা অস্ফুষ্ট শব্দ করে চমকে ও থমকে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দুই চক্ষু যেন ঠিকরে পড়তে চাইছে।

কিন্তু তাঁর এই আড়ষ্টতা মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই হঠাৎ তিনি বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপে দিলেন।

তীব্র চিৎকারে রাত্রির স্তব্ধতাকে যেন ফাটিয়ে দিয়ে লীলার দেহ পড়ল শূন্যে দুই বাহু বিস্তার করে মাটির উপরে লুটিয়ে।

বাবাও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভগবান, রক্ষা করো।' তারপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বাবার জ্ঞান হল। ধীরে ধীরে উঠে বসে কপালের উপরে ডানহাত বুলোতে-বুলোতে তিনি বললেন, 'আমি কোথায়? আমার কী হয়েছে বলো দেখি?...ও, মনে পড়েছে—মনে পড়েছে! উঃ, কী দৃশ্য!'

তাঁর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল একবার! তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে গাত্রোত্থান করে তিনি কবরের দিকে চললেন। আমিও করলুম অনুসরণ।

কিন্তু কবরের পাশে কোথায় লীলার দেহ? সেখানে পড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা মৃত নেকড়ে!

বাবা অভিভূত-কণ্ঠে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'লীলা নেই, আছে সেই নেকড়েটা! এটাকে আমি চিনতে পারছি—এইবার সব বুঝতেও পারছি! এই নেকড়েটাই আমাকে ভুলিয়ে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিল! হা ভগবান, আমি পড়েছিলুম প্রেতপর্বতের প্রেতাত্মাদের পাল্লায়!'

পরদিনের প্রভাত। এখনও ভালো করে সূর্যোদয় হয়নি। ঘরের ভিতরে আলো-আঁধারি।

বিষম শব্দে দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে বেগে প্রবেশ করল এক উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি! অগ্নিরক্ত চক্ষু, মাথার লম্বা চুলগুলো করছে ক্রুদ্ধ সর্পের মতো লটপট, থর-থর করে কাঁপছে সর্বশরীর। গিরীন্দ্র!

কান-ফাটানো চিৎকার করে, সামনের দিকে দুই বাহু বাড়িয়ে সক্রোধোন্মত্ত গিরীন্দ্র বললে, 'দে আমার মেয়ে দে! দে আমার মেয়ে দে! আমার মেয়ে, আমার মেয়ে,—কোথায় আমার মেয়ে?'

বাবা তার সুমুখে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তেমনি জোরে চিৎকার করে বললেন, 'কোথায় তোর মেয়ে? তোর মেয়ের যেখানে থাকা উচিত, সেইখানে! নরকে! দূর হ শয়তান, দূর হ! নইলে তোকেও আমি পাঠিয়ে দেব নরকে!'

গিরীন্দ্র অট্টাহাস্য করে বললে, 'হা-হা-হা-হা! তুচ্ছ, নশ্বর জীব! তুই ভয় দেখাচ্ছিস প্রেতপর্বতের প্রেতাত্মাকে? হা-হা-হা-হা-হা-হা।'

—'বেরিয়ে যা শয়তান! আমি তোকে থোড়াই কেয়ার করি!'

—'তোর শপথের কথা ভুলে যাচ্ছিস বুঝি? আমার মেয়ের ভালোমন্দের জন্যে দায়ী থাকবি তুই-ই?'

—'প্রেতাত্মার কাছে শপথ? তার কোনওই মূল্য নেই।'

—'মূল্য নেই? বেশ, বুঝতে পারবি মূল্য আছে কি না! তোর সন্তানদের মাংস ভক্ষণ করবে অরণ্যের শকুনি, গৃধিনি, নেকড়ে আর অন্যান্য হিংস্র পশুরা। তারা—'

—'এখনও বলছি শয়তান, বিদেয় হ!'

—'হা হা হা হা! তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।'

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল একখানা রাম-দা। বাবা চোখের নিমিষে হাত বাড়িয়ে সেই রামদা খানা টেনে নিয়ে মাথার উপরে তুললেন। বাবার হাত এবং রাম-দা তীব্র বেগে নীচে নামল, গিরীন্দ্রের শরীর ভেদ করে সেখানা সাঁৎ করে চলে গেল—টাল সামলাতে না পেরে বাবা মাটির উপরে পড়ে গেলেন সশব্দে!

গিরীন্দ্রের দেহ অক্ষত—তার দেহ যেন বাতাস দিয়ে, ধোঁয়া দিয়ে গড়া, শাণিত অস্ত্র তার কোনওই ক্ষতি করতে পারে না! সে আবার বিকট স্বরে হা হা হা হা করে হেসে বললে, 'ওরে নশ্বর জীব! কেবল তাদের উপরেই আমরা প্রভুত্ব করতে পারি যারা করেছে নরহত্যা! মানুষ খুন করে তুই পালিয়ে এসেছিলি প্রেতপর্বতের কোলে? কর এইবারে শাস্তিভোগ! তোর দুই সন্তান গিয়েছে, তোর তৃতীয় সন্তানকেও রক্ষা করতে পারবি না—মরবে, মরবে, সে-ও মরবে! তারও মাংসহীন হাড়গুলো পড়ে-পড়ে শুকোবে গভীর অরণ্যের মধ্যে! তোকেও আমি হত্যা করতে পারতুম অনায়াসেই—কিন্তু তা আমি করব না! তুই বেঁচে থাক—সেইটেই তোর সব-চেয়ে-বড়ো শাস্তি। হা হা হা হা হা হা! তোকে হত্যা করাও তোর প্রতি দয়া করা—হা হা হা হা।'

পরমুহূর্তে গিরীন্দ্রের মূর্তি মিলিয়ে গেল আমাদের চোখের সুমুখেই।

এর পর আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। আগেই বলেছি বাবা গরিব ছিলেন না, পরদিনই তিনি সেই অভিশপ্ত অরণ্য ছেড়ে আমাকে নিয়ে চলে গেলেন একেবারে কাশীধামে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তাঁর পরিণাম হল না আনন্দজনক। কিছুদিন পরেই তিনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন এবং সেই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হল ভয়াবহ প্রলাপ বকতে-বকতে।

তারপর থেকে একাকী আমি দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি স্রোতের শৈবালের মতো। জীবনের আকর্ষণই আমার নেই—চেয়ে আছি কেবল মৃত্যুর দিকে।

বন্ধু, আমার কথা বিশ্বাস করো। যা স্বচক্ষে দেখেছি তাই বললুম। কখনও কি শুনেছ এমন জীবনকাহিনি?

অবশিষ্ট

প্রমোদ বললে, 'শুনলে আমার সব কথা? এরকম অদ্ভুত জীবনকাহিনি তুমি আর কখনও শুনেছ? এখন বলো আমার কী করা উচিত?'

প্রফুল্ল জবাব না দিয়ে ভাবতে লাগল।

পৃথিবীর উপরে ঝরছে পূর্ণিমার ঝরনা। মহানদীর আলোকিত স্রোতের সঙ্গে নৌকো তখনও আপনি ভেসে যাচ্ছে লক্ষ্যহীনের মতো।

প্রমোদ আবার বললে, 'আমারও জীবন হচ্ছে এই নৌকোর মতো লক্ষ্যহীন! প্রফুল্ল, তুমিও তো বলতে পারলে না, আমার কী করা উচিত?'

—'প্রমোদ, বিবাহ করো, সংসারী হও। জীবন আর লক্ষ্যহীন বলে মনে হবে না।'

—'বিবাহ!'

—'বিবাহের নাম শুনেই অমন চমকে উঠলে কেন?'

—'আমি করব বিবাহ! প্রফুল্ল, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ প্রেতপর্বতের প্রেতাত্মা কী ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছে? আমার অকালমৃত্যু নিশ্চিত!'

—'প্রমোদ, তুমি তো আর প্রেতপর্বতের এলাকায় বাস করছ না! এখানে কে তোমার উপরে প্রভুত্ব করতে পারবে?'

—'তুমি কি তাই মনে করো?'

—'নিশ্চয়ই করি!'

—'তবে আজ মনের ভিতরে আসন্ন-মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি কেন?'

—'ও তোমার মনের ভুল।'

—'ভুল নয় বন্ধু, ভুল নয়। চোখের সামনে দেখছি, আমার আর পৃথিবীর মাঝখানে একখানা কালো পর্দা নেমে আসছে ধীরে ধীরে।'

—'এমন পূর্ণিমার ভিতরেও তুমি আবিষ্কার করলে কালো পর্দা। তোমার কল্পনাশক্তি আছে বটে!'

—'আমার মাথা ঘুরছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

—'প্রমোদ, এখন বুঝছি তোমার জীবনকাহিনি শুনতে চেয়ে আমি বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ, অতীতের দুঃস্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে-করতে তোমার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ওঠো, ধরো হাল, নৌকো তীরে নিয়ে যাই।'

—'কেন?'

—'তীরে নৌকো ভিড়িয়ে আমার সঙ্গে তুমিও নদীর ঠান্ডা জলে স্নান করবে। তোমার অলৌকিক কাহিনি শুনে আমারও মন যেন কেমন-কেমন করছে। স্নান করলে আমরা দুজনেই হয়তো কতকটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব।'

—'জলে দেহ স্নিগ্ধ হতে পারে, কিন্তু মন কি ভিজবে প্রফুল্ল?'

—'মনের উপরেও দেহের প্রভাব আছে বইকী! ব্যাধি যখন দেহকে জীর্ণ করে মন তখন সুস্থ থাকে না।'

—'যখন এত করে বলছ, তোমার আদেশই পালন করব।' এই বলে প্রমোদ উঠে হালের কাছে গিয়ে বসল।

দুই হাতের দুই দাঁড়ের দ্বারা নদীর জলে হীরক-চূর্ণ ছড়াতে ছড়াতে প্রফুল্ল নৌকো নিয়ে চলল তীরের দিকে।

যেখানে নৌকো ভিড়ল সেখানে দাঁড়িয়ে নীল অরণ্য স্নান করছিল চন্দ্রকিরণধারায়—সবুজপত্রের ছন্দে তাল রেখে গান গাইছিল রাতের গায়ক-পাখি। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে একটি নিবিড় শান্তির মাধুর্য।

প্রমোদ নৌকো থেকে নেমে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে গাঢ়স্বরে বললে, 'এই বিশ্বে আছে কত সৌন্দর্য, কত ঐশ্বর্য! কিন্তু আমি কিছুই গ্রহণ করতে পারলুম না!'

প্রফুল্ল জবাব দিলে না, সে তখন পিছন ফিরে নৌকোর দড়িগাছা একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধতে ব্যস্ত ছিল।

আচম্বিতে একটা গুরু দেহপতনের শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ ও ব্যাঘ্রের ভৈরব গর্জন।

অত্যন্ত চমকে ফিরে প্রফুল্ল কেবলমাত্র দেখতে পেলে, প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্র প্রমোদের দেহ মুখে করে বিদ্যুতের মতো তীব্র-গতিতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল!

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন সে দাঁড়িয়ে রইল, নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করতে পারলে না। তারপর শিশুর মতন কেঁদে উঠে যন্ত্রণা-বিকৃত-স্বরে বললে, 'প্রমোদ, প্রমোদ! তোমাকে তীরে এনে শেষটা আমিই তোমাকে হত্যা করলুম—উঃ!' জ্ঞান হারিয়ে সে পড়ে গেল নদীর বালুকাতটের উপরে।

এই কাহিনি রচনায় ফ্রেডারিক মারিয়াটের একটি গল্পকে কঙ্কালের বা কাঠামোর মতো ব্যবহার করেছি। আসল গল্পটি এদেশের তরুণদের বা আধুনিকযুগের উপযোগী নয়—(মারিয়াটের মৃত্যু হয়েছে প্রায় এক শতাব্দী আগে)। এই বাংলা-গল্পটির সর্বত্রই আমি যেসব ভাব, ভাষা, ঘটনা, বর্ণনা, ব্যবহার করেছি, মারিয়াটের কাহিনির মধ্যে তা নেই।—লেখক।

সর্বনাশা নীলা

॥ এক ॥

প্রথম দৃশ্যের যবনিকা অন্তরাল ভেদ করে সন্ধ্যার অন্ধকারে যেটুকু দৃশ্যপট ভেসে উঠতে দেখা গেল, তাতে কোনও আনন্দমুখর উৎসাহ-দীপ্তির বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ নেই, কোনও ভয়াবহ বিভীষিকার নির্মম নগ্ন পদক্ষেপও বুঝি চোখে পড়ে না, কেবল একটা সন্দিগ্ধ আশঙ্কার ছায়া-সঞ্চরণ অনুভব করা যায়। কিন্তু কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায় না কিছু। বহু সংশয়িত একটা গূঢ় জিজ্ঞাসা যেন অশরীরী প্রেতের মতো অস্পষ্ট রহস্যের অন্ধকার গবাক্ষদ্বারে বারে বারে অলক্ষে হানা দিয়ে চলে যায়, আর আকাশ বাতাস অন্ধকার যেন কোনও নিগূঢ় চাপা আতঙ্কে অন্তরের অন্তস্থলে থেকে থেকে শিউরে ওঠে!

মহানগরী কলকাতার উত্তর অঞ্চলের ওই যে স্বল্প-আলোকিত অন্ধগলি, বাইরের পৃথিবী অজস্র তরঙ্গভঙ্গে উদ্দাম স্রোতবেগে বয়ে চলেছে, কিন্তু এখানে এসে আছড়ে পড়ে ব্যাহত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় ব্লাইন্ড লেনে—সামান্য একটু আবর্ত সৃষ্টি করে। এই অন্ধগলিতে জনশব্দশূন্য একখানা বিরাট পুরোনো বাড়ি, ছোট্ট কপাটওয়ালা দরজাটা খুললেই মনে হয় কোনও বুভুক্ষু বিবর বুঝি লোলুপ জিঘাংসায় হাঁ করে সব কিছু আকর্ষণ করতে চায়। নিচের নিস্তব্ধ স্যাঁতসেঁতে ঘরের জমাটবাঁধা অন্ধকার যেন পাতালপুরীর দুর্গম সুড়ঙ্গ পথের নির্দেশ দেয়। কোলাহলমুখর সন্ধ্যার কলকাতা এই অন্ধগলিতে ওই বোবা দরজাটার চৌকাঠে যেন হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে মরে গিয়েছে।

বাড়িখানা দোতলা, নিচের ঘরে কেউ থাকে না; উপরেও যদিবা কেউ থাকে তাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। দোতলায় ভিতর দিকের কোনও একখানা সুসজ্জিত হলঘর। ঘরটা অন্ধকার, একটা দেওয়াল ঘড়ির একঘেয়ে টক-টক শব্দ অশ্রান্ত কালপ্রবাহের সূচনা দিচ্ছে মাত্র। এই সমূহ মূর্ছাহত আবেষ্টনীর মধ্যেও কোথায় যেন এখনও প্রাণ আছে, ওই টক-টক একখানা শব্দ যেন তারই বিমূঢ় স্পন্দন। ঘরের প্রতিটি টেবিল চেয়ারে, আয়না আলমারিতে, ড্রয়ার দেরাজে, সমস্ত আসবাবপত্রে কত জটিল ষড়যন্ত্র কুটিল চক্রান্ত অসংখ্য গুপ্তনাগিনীর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে—হাতলে-পায়ায় রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরতে-পরতে! কত গূঢ় অভিসন্ধি ক্রূর সংকল্পে বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে চাপা আক্রোশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, ঘরের নির্বাক কড়ি-বরগা জানালা দেওয়াল ভিন্ন কেউ তার সাক্ষ্য বহন করে না।

ঘরখানা অন্ধকার, পিচের মতো ভারী অন্ধকার। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। মানুষ তো? তবে কি অন্ধকার নিশ্বাস ফেলে? না, আর কিছু? মেঝের উপর একটু খস করে জুতোর সংঘর্ষ হল। আচম্বিতে সুইচ টেপার শব্দের সঙ্গেই বিজলি আলো সমস্ত ঘরটাকে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মূর্ছা ভেঙে দিল। চোখ মেলতেই দেখা গেল উৎকণ্ঠিত চিন্তায় ভ্রূ-যুগল সঙ্কুচিত করে একটা লোক দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকাল। এবং দৃঢ় নিবদ্ধ চিবুকের মধ্যে থেকে চাপা নিশ্বাসে একটা গম্ভীর 'হুঁ' শব্দ করে রেডিওর চাবিটার দিকে হাত বাড়াল। বোবা বাড়িটা চমকে উঠে রেডিওর কথায় মুখর হয়ে উঠল। একমাত্র

শ্রোতা—স্বনামধন্য পান্নালাল, নিজের চিন্তা থেকে রেডিওর অভিনয়ে মন নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করছে। রেডিওর পালায় শ্রীরাধিকার সঙ্গে কথা কইছে চন্দ্রাবলী

রাধিকা

শোনো শোনো চন্দ্রাবলী তন্দ্রামাখা কুন্দকলি,
বৃন্দাবন-চন্দ্র আজি নাই বৃন্দাবনে,
মন্দবায়ু গন্ধহারা, কোকিল যে ছন্দহারা
নিরানন্দ ঘন মেঘ ঢাকে চন্দ্রাননে।

চন্দ্রাবলী

কেষ্ট ভারি দুষ্ট সুজন কষ্ট দিয়ে হাসে
তারে ভালবাসবে যে সে চোখের জলে ভাসে।

শ্রীরাধিকার হাহাকার আর চন্দ্রাবলীর সান্ত্বনা রেডিওতে বেজে চলেছে,—শ্রোতা পান্নালালের কানে যেন তা প্রবেশ করছে না। তার মুখে উদ্বিগ্নতার ছায়া! কোনও বন্য চিন্তা ঝোড়ো পাখার ঝাপটা মেরে মেরে যাচ্ছে তার মনে। সে উৎকীর্ণ হয়ে আছে, তবু রেডিওর পালা তাকে যেন ঠিক আকর্ষণ করছে না। রেডিও চলছেই

রাধিকা

মথুরায় কত মধু পেয়েছে জানি না, শুধু
বিধুর হৃদয়ে করি বৃথা হাহাকার।
এত জপি শ্যাম নাম তবু মোরে বিধি বাম,
রাধা রাধা বলে বাঁশি সাধে নাকো আর!

চন্দ্রাবলী

ভেবো না ছার বাঁশির কথা, কী আছে তার মূল্য?
এবার থেকে বাজবে বেসুর যখন তোমায় ভুললো!

উত্তেজিত পান্নালাল উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল—অধৈর্য ত্রস্ত! বন্ধ জানালার খড়খড়ি খুলে বাইরে একবার অস্থির ঔৎসুক্যে কী নিরীক্ষণ করল। আবার গিয়ে বসে পড়ল। পাশে রেডিওতে তেমনই শোনা যাচ্ছে :

রাধিকা

আর তো যমুনা কূলে জলকে যাব না ভুলে,
কলসি ভাসায়ে দেবো, নেই যে কানাই!
ঘন ঘোর বরষায় বায়ু করে হায় হায়,
মোর আঁখিবারি-কথা কাহারে জানাই?

চন্দ্রাবলী

ছাড়াছাড়ি হল যখন আজ থেকে দাও আড়ি,
রাত বারোটা বাজলো, বোধ হয়, যাই চলো ভাই বাড়ি।

রাধিকা

দুটি আঁখি, দুটি নীলা.....

অতিষ্ঠ ও বিরক্তভাবে পান্নালাল ঘট করে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। আপন মনেই বলল

—'ধ্যেৎ, রাধার সেকেলে কান্না আর ভালো লাগে না! কিন্তু শেষ কথা দুটি ভালো লাগল। 'দুটি আঁখি—দুটি নীলা!' হ্যাঁ, নীলা—নীলা! তবে দুটি নীলা বড়ো বাড়াবাড়ি, একটিমাত্র নীলা পেলেই আমি বেঁচে যাই!—শুধু একটি—একটি মাত্র নীলা?'

বলতে বলতে পান্নালাল কেমন যেন বিমর্ষ বিহ্বল হয়ে যায়। কোনও সুদূর দুর্গম বিভীষিকার মধ্যে যেন তার উৎকণ্ঠিত কল্পনা অভিযান করে।.....বাইরে থেকে দরজায় মৃদু করাঘাত হল। শিকারি বিড়ালের মতো সে সতর্ক-তৎপর হয়ে ওঠে, চোখ দুটো তার দপ দপ করে করে জ্বলছে। আর একবার দরজায় শব্দ হতেই আত্মস্থ কণ্ঠে প্রশ্ন করে পান্নালাল 'কে?'

আগন্তুকের উত্তর শোনা যায় 'আমি শোহনলাল হে!

পান্নালাল স্বাভাবিক হয়ে বলল 'ভিতরে এসো।'

ভিতরে প্রবেশ করল শোহনলাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পান্নালালের মুখে চেয়ে যেন কিছু পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করল, পরমুহূর্তেই জিজ্ঞাসা করল 'আমায় ডেকেছ?'

পান্নালাল 'হ্যাঁ। বসো। কথা আছে।'

শোহনলাল 'তোমার মুখে ভাবনার রেখা কেন?'

উৎকণ্ঠিত পান্নালাল একবার ঘড়ির দিকে তাকাল, চিন্তিত স্বরে বলল

—'রাত নটা বাজছে। চুনিলাল আর হিরালাল এখনও এসে পড়ল না! একটা জরুরি কাজে তাদের কলকাতার বাইরে পাঠিয়েছি। ট্রেনের সময় তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে!'

শোহনলাল 'তোমার জরুরি কাজ মানেই তো বিপদের কাজ! হয়ত তারা কোনও বিপদে পড়েছে।'

পান্নালাল 'বিপদ? হুঁ, অসম্ভব নয়! কিন্তু তাদের বিপদে যে আমারও বিপদ!'

শোহনলালের কাছে কথাগুলো দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। সে সরাসরি বলে

—'দ্যাখো পান্নালাল, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। আগে সব কথা খুলে বলো দেখি।'

পান্নালাল শোহনলালের মুখে তার প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কী চিন্তা করে, পরমুহূর্তেই কল্পনায় রহস্যময় ব্যাপারটার সমস্তটুকু পর্যালোচনা করে নেয়। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কোনও দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতার মধ্যে নিজেকে হয়ত হারিয়ে ফেলে। তারপর গম্ভীর বিজ্ঞতায় ঠোঁটের বিস্ফোরণে আর চোখের সঙ্কোচনে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে পান্নালাল স্থির মনস্থ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে

—'আচ্ছা, খুব সংক্ষেপেই বলছি শোনো।... সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ে, গুহার মধ্যে অদ্ভুত এক দেবতা আছে। সাঁওতালিরা অনেক ভূতকে পূজা দেয়। এ দেবতাটিও হচ্ছে একটি ভূত। যে সে ভূত নয়, দস্তুরমত দুষ্টু ভূত। রং করা কাঠে গড়া বারো ফুট উঁচু সেই মূর্তি, তার বীভৎস মুখের দিকে তাকালেই বুকের রক্ত ভয়ে একেবারে জমাট বেঁধে হিম হয়ে যায়। মূর্তিটা তুচ্ছ কাঠে গড়া বটে, কিন্তু তার গলার মালায় আছে একখানা আশ্চর্য নীলা, ওজনে নাকি দেড়শো ক্যারেট!'

শোহনলালের চোখ দুটো যেন শামুকের চোখের মতো ঠেলে উপর দিকে খাড়া হয়ে উঠে! অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বিস্ময় বিস্ফোরণ করে

—'দে-ড়-শো-ও ক্যারেট! বল কী হে?...ফরাসি গভর্নমেন্ট একবার বাংলাদেশ থেকে একখানা একশো ক্যারেটের নীলা কিনেছিল, তারই দাম যে এক লক্ষ দু হাজার টাকা!'

পান্নালাল 'তাহলে এ নীলাখানার দাম কত হবে আন্দাজ করে দ্যাখো!'

শোহনলাল 'গরিব সাঁওতালিরা এত দামি নীলা কোত্থেকে পেলে?'

পান্নালাল 'তা কেউ জানে না। ওই ভূত দেবতাটি হচ্ছে অতি প্রাচীন ভূত—বয়স তার তিনশো বছর হবে। সাঁওতালিদের বিশ্বাস, তাদের দেবতা ওই নীলা নিয়ে পরলোক থেকে ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য নীলাখানার কথা তারা কারুর কাছে প্রকাশ করে না, দৈবগতিকে আমি জানতে পেরেছি।'

শোহনলাল 'বুঝেছি। রতনেই রতন চেনে!—জানতে পেরেই নীলাখানা চুরি করবার জন্যে চুনিলাল আর হিরালালকে পাঠিয়ে দিয়েছ?'

কৃতবিদ্য পান্নালাল ঈষৎ আত্মপ্রসাদের হাসির সঙ্গে বলে

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ। ওদেরই পাঠিয়েছি, এ সব কাজে ওরা দুজন কী রকম ওস্তাদ, জানো তো?'

পান্নালালের কথার পিঠে পিঠে তৎক্ষণাৎ শোহনলাল কথা কয়ে ওঠে। তোষামোদের আকারে যেন একটু শ্লেষ মিশিয়েই সে বলে

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা আর জানিনে? জানি বৈকি, তারাই তো তোমার ডান হাত, বাঁ হাত। তাদের দৌলতেই তো কলকাতার পথে পথে তোমার চার চারখানা মোটর ছুটোছুটি করে, আর তোমার দরজায় মোসাহেবের ভিড় হয়!'

ঘাড় নাড়তে নাড়তে পান্নালাল সংশোধন করে

—'তোমার কথা ঠিক হল না শোহনলাল! তারা আমার সৈন্য, আমি তাদের সেনাপতি। বুদ্ধি জোগাই আমি!'

কথাবার্তা ব্যক্তিগত বিষয়ে সংক্রামিত যাতে না হয়, শোহনলাল সেদিকে সতর্ক। নীলার কৌতূহলে আগের কথায় ফিরে এসে সে বলে

—'সে কথা সত্য। কিন্তু পান্নালাল, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে চুনিলাল আর হিরালাল সে নীলাখানা চুরি করবে কেমন করে? সাঁওতালিরা অমন বহুমূল্য রত্ন তো অরক্ষিত অবস্থায় পথে ফেলে রাখবে না!'

পান্নালাল শোহনের আশঙ্কা দূর করে দিয়ে বলল

—'হ্যাঁ শোহনলাল, নীলাখানা বেওয়ারিশ মালের মতো প্রায় অরক্ষিত অবস্থাতেই আছে। সাঁওতালিদেরও ভিতরে হয়ত লোভী লোকের অভাব নেই, কিন্তু ওই ভুতুড়ে দেবতাকে তারা ভয় করে যমের মতো। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে ওই নীলা চুরি করবে তার সর্বনাশ হবে!'

শোহনলালের অনুসন্ধিৎসা বেড়ে যায়। প্রশ্ন করে

—'এমন বিশ্বাসের কারণ?'

পান্নালাল চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল, সোজা হয়ে উঠে উৎসাহ ভরে বলল

—'তবে শোনো। অনেক কাল আগে নাকি একজন লোভী সাঁওতালি ওই নীলাখানা চুরি করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। তার পরের দিনই ভুতুড়ে দেবতার মূর্তিও অদৃশ্য হয়। কিন্তু দুদিন পরেই সকলে অবাক হয়ে দেখলে, তাদের দেবতা আবার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার গলার মালায় ঝুলছে সেই নীলা, আর নীলার নীল গায়ে রক্তের রাঙা দাগ!'

শোহনলাল শিউরে ওঠে, তবু অবিশ্বাসের স্বরে প্রশ্ন করে

—'রক্তের দাগ? তার মানে?'

পান্নালাল 'তার মানে, দেবতা নাকি স্বশরীরে গিয়ে চোরকে বধ করে হারানো রতন নিয়ে ফের ফিরে এসেছিলেন।'

শোহনলাল অবিশ্বাসপূর্ণ তাচ্ছিল্যে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়

—'যত সব গাঁজাখুরি গল্প!'

পান্নালাল দ্বিগুণ উদ্যমে যেন শোহনের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে। আবার বলে

—'শোনো, আরও একটা গল্প আছে, যদিও তাতে গাঁজার গন্ধ বেশি নেই। আর একবার রাতে আর একটা চোর গুহার ভিতরে ঢুকেছিল। কিন্তু গুহার ছাদ থেকে মস্ত একখানা পাথর খসে তার মাথায় পড়ে। সকালে সবাই গিয়ে দেখে, চোরের মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে, আর তার হাতে রয়েছে সেই সর্বনেশে নীলা! সাঁওতালিদের মত হচ্ছে, দেবতাই পাথর ছুড়ে তার দফারফা করে দিয়েছিলেন।'

এই ধরনের গল্পে শোহনলালের বিরক্তি একেবারে উগ্র হয়ে ওঠে। অবিশ্বাস্য বক্তব্য থেকে সে বক্তার উপরই যেন বিশ্বাস হারায়। প্রশ্নছলে তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতটা নিক্ষেপই করে শোহনলাল

—'এসব রূপকথায় তুমি বিশ্বাস করো?'

শাণিত হাসির বিদ্যুৎ স্ফুরণে পান্নালাল বিনাবাক্যেই যেন এই বক্রোক্তির জবাব দেয়। ক্ষণপরে অবিচলিতভাবে বলে পান্নালাল

—'আমি করি না, তবে সাঁওতালিরা করে। কোনও চোরই তাই আর ওমুখো হয় না। রাত্রে গুহার মুখে পাহারা দেয় সাঁওতালি এক পুরুত—একেবারে একলা। চুনিলাল আর হিরালাল অনায়াসেই তার চোখে ধুলো দিতে পারবে।'

এতক্ষণে নীলার প্রসঙ্গে একরকম নিরুৎসাহ প্রকাশ করেই শোহনলাল যেন অন্য কাজের কথায় তৎপর হয়ে উঠে বলে

—'হুঁ, সব তো বুঝলুম। কিন্তু তুমি হঠাৎ আমাকে স্মরণ করেছ কেন?'

পান্নালাল 'তুমি একে জহুরি, তার উপরে চোরাই মাল বিক্রি করতে ওস্তাদ। তুমি ছাড়া যে আমার গতি নেই।'

ওস্তাদ ব্যবসাদার শোহনলাল, বাজপাখির মতো কোনও সুযোগই সে হারাতে দেয় না,—প্রখর তৎপরতায় যেন পান্নালালের প্রস্তাবে একটা ছোঁ মেরে প্রশ্ন করে 'ধরো, নীলাখানা যদি আমি দেড় লাখ টাকায় বেচে দিতে পারি, তাহলে আমার কী পাওনা হবে?'

পান্নালাল 'দশ পারসেন্ট।'

শোহনলাল : 'মোটে পনেরো হাজার টাকা? —উঁহু, তা হয় না। এসব কাজে পদে পদে বিপদ। আমি পঁচিশ হাজার টাকা চাই।'

পান্নালাল 'শোহনলাল, সেসব কথা যথাসময়ে হবে। গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল দাও কেন? আগে চুনিলাল আর হিরালালকে আসতে দাও।'

শোহনলালের লাভ করার লোভ তার ব্যবসাদারী সতর্কতাকেও ছাড়িয়ে গেছে,—হুঁশিয়ার পান্নালালের কাছে তা উলঙ্গ নির্লজ্জতায় প্রকাশ হয়ে পড়লেও পান্নালালের ভর্ৎসনায়

সে লজ্জা বোধ করে না বরং সপ্রতিভাবে যেন পান্নালালের নীলা প্রাপ্তির সম্ভাবনাকেই অভিসম্পাত করে জানায়

—'কিন্তু তারা কি আর আসবে?—হয় তারা নীলা নিয়ে উধাও হয়েছে, নয় কোনও বিপদে পড়েছেই পড়েছে।'

ঈষৎ উৎকর্ণ হয়েই হঠাৎ পান্নালাল উল্লাসভরে বলে ওঠে

—'হুররা! —তোমার দুটো অনুমানের একটাও সত্যি নয়! সিঁড়ির উপর আমি হিরালালের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! —জয় মা কালী।'

অতি দ্রুত পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে!—ধনুকের ছেঁড়া ছিলার মতো পান্নালাল চেয়ার থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দরজার দিকে যেন ছিটকে এল। বাইরে থেকে দড়াম করে ঘরের দরজা খুলে গেল। ঝড়ের ঝাপটার মতো আছড়ে পড়ল হিরালাল ঘরের মধ্যে—পান্নালালের পায়ের কাছে। পান্নালাল ও শোহনলাল তাকে ধরে তুলতে গেল। ভয়ার্ত বিস্ফারিত চোখ দুটো কপালে তুলে কোনওরকমে উচ্চারণ করে হিরালাল

—'পান্নাবাবু!—পান্নাবাবু!—জ—ল!'

সংজ্ঞাহীন হিরালাল অসাড় নিস্পন্দ হয়ে ভারী পাথরের মতো ওদের হাত থেকে নিচে স্খলিত হয়ে পড়ল। শোহনলাল জল আনতে ছুটল।—মুহূর্তের অবকাশ! ক্রূর বিদ্যুৎ ভঙ্গিতে পান্নালাল হিরালালের হাতের মুঠো ও জামার পকেটগুলো সতর্ক ক্ষিপ্রতায় হাতড়ে দেখল। শোহনলাল জল এনে চোখে মুখে দিতে লাগল। পান্নালাল সহজভাবেই বলে

—'সেনস নেই! চলো, একে ধরাধরি করে শোবার ঘরে বিছানার উপর নিয়ে চলি। মাথার কাছে টেবিল ফ্যানটা চালিয়ে দাও।—ওর জ্ঞান না ফিরলে তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, কী হয়েছে আর কী-ই বা হতে চলেছে। তবে ইতিমধ্যে যদি—'

এই বলতে বলতেই পান্নালাল তাড়াতাড়ি সামনের দরজাটা বন্ধ করে চাবি ঘুরিয়ে দিলে। তারপরে ত্রস্ত পায়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুটো রিভলবার বের করে কার্টিজগুলো একবার ঘুরিয়ে দেখে নিল এবং কোমরের দুই ধারে দুটোকে গুঁজে নিয়ে শোহনলালের সঙ্গে মিলে হিরালালকে ধরাধরি করে শোবার ঘরের দিকে অগ্রসর হল।

॥ দুই ॥

দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘূর্ণাবর্তে ঘটনাস্রোত দুর্বার বেগে এসে জমা হচ্ছে, তার ভয়াল তরঙ্গের পুচ্ছে পুচ্ছে মরণের উন্মত্ত তাড়না, মানুষের লোভোন্মত্ত জীবনকে যেন নিষ্ঠুর টানে কোনও অন্ধ অতলে তলিয়ে নিতে চায়! আশঙ্কার ছায়ারা বুঝি আতঙ্কের কায়ারূপে মূর্ত হয়ে হো-হো-হো করে হেসে উঠছে—তাদের পৈশাচিক হাসি। ভয়াবহ বিভীষিকার নির্মম নগ্ন অমোঘ পদক্ষেপে মানুষের শত আশা-আকাঙক্ষার ক্ষীণ প্রাণ বুঝি দলিত মথিত হয়ে যায়। কোন শক্তি এর প্রতিরোধ করবে? এ যে সর্বনাশী নীলার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

শোবার ঘরখানি অপেক্ষাকৃত ছোটো। বিছানায় পড়ে রয়েছে হিরালাল—আতঙ্ক-আচ্ছন্ন জ্ঞানহীন। বনবন করে তার শিয়রে ঘুরছে ইলেকট্রিক ফ্যান। হিরালালের চেতনার প্রতীক্ষায়

তার দুই পাশে দুই চেয়ারে বসে রয়েছে নির্বাক পান্নালাল ও শোহনলাল—মুখে চোখে তাদের একই উদ্বেগের কালো ছায়া।

অবশেষে হিরালাল চোখ মেলে চাইল—দৃষ্টিহীন শূন্য চাহনি। কোনও অদৃশ্য আতঙ্কের ভ্যাম্পায়ার যেন শরীরের সমস্ত রক্তটুকু শুষে নিয়ে তাকে একেবারে শুকনো ফ্যাকাশে করে ফেলে গেছে। তার সম্পূর্ণ চেতনা ফিরতেই সে আবার অস্থির হয়ে ওঠে—কোনও করাল নিয়তি তাকে যেন আবার অনুসরণ করেছে—পলায়নে পঙ্গু সে, অসহায়ভাবে ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল। নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থান সে একবার দেখে নিল এবং একটু আশ্বস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে উঠল 'পান্নাবাবু!'

পান্নালাল 'কী ব্যাপার হীরালাল? আবার অত হাঁপাচ্ছ কেন?'

হিরালাল 'ওঃ, অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি—ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি!'

পান্নালাল 'সে কী?'

হিরালাল 'হ্যাঁ। আমি আসবার আগেই কলকাতার পুলিশ চুরির খবর পেয়েছে। নিশ্চয় ওখানকার পুলিশ তাকে খবর পাঠিয়েছে। হাওড়ায় তারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কী করে যে তাদের ফাঁকি দিয়েছি, তা আর বলবার নয়।...ও, আগে এক গেলাস জল!'

পান্নালাল নিজেই তাড়াতাড়ি জল এনে তার মুখের কাছে ধরে বললে 'এই নাও।'

জল গেলাসটা এক নিশ্বাসে পান করে হিরালাল আবার যেন প্রাণ ফিরে পেল। গভীর তৃপ্তির উচ্ছ্বাস তার মুখ দিয়ে আপনিই যেন বেরিয়ে আসে

—'আঃ, বাঁচলুম! যা তেষ্টা পেয়েছিল।'

পান্নালাল যথেষ্ট অপেক্ষা করেছে! হিরালালের জামার পকেটে নীলা নেই সে দেখেছে। তবে কি নীলা চুনিলালের কাছে? কিন্তু চুনিলালও তো আসেনি। আসল সংবাদ এখনও সবই রহস্যময়। হিরালাল জল পান করে বিছানার উপর উঠে বসল। তার সুস্থতা লক্ষ করে পরের প্রশ্নেই জিজ্ঞাসা করে পান্নালাল

—'তাহলে নীলাখানা পেয়েছ? কই সে নীলা আমায় দেখাও তাকে দেখবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে আছি।'

কথা বলতে বলতে অধীর আগ্রহে পান্নালাল তার হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। হিরালাল তার অধৈর্য ও অশোভন লোভ লক্ষ করে। পান্নালাল-এর প্রতি একটা উৎকট ঘৃণা তার অন্তঃস্থল থেকে উদগারিত হয়ে আসে। সে নির্বাক দৃষ্টিতে পান্নালালের দিকে তাকিয়ে থাকে। পান্নালাল কী ভেবে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে

—'তবে কি নীলাখানা চুনিলালের কাছে আছে? চুনিলাল কোথায়?'

কঠিন স্বরে হা-হা করে হেসে ওঠে হিরালাল,—নির্বিকার ভাবেই উত্তর দেয়:

—'চুনিলাল এখন কোথায় আছে জানি না!'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠে পান্নালাল বলে

—'জানো না!'

হিরালাল: 'না পান্নাবাবু। স্বর্গের দরজা তো সে খোলা পাবে না, হয়ত এতক্ষণে সে নরকের দিকে যাত্রা করেছে।'

ক্রুদ্ধস্বরে পান্নালাল তার অধৈর্য প্রকাশ করে

—'হিরালাল, আমি হেঁয়ালি ভালোবাসি না। আগে আমি জানতে চাই, নীলাখানা পেয়েছ কিনা?'

হিরালাল 'পেয়েছি—পেয়েছি পান্নাবাবু।'

আশ্বস্ত হয়ে পান্নালাল যেন অনুমতি দেয় 'তাহলে এইবারে সব খুলে বলো।'

হিরালাল : 'শুনুন তবে। কাল অমাবস্যার রাত গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে গা ঢেকে আমরা দুজনে গুহার দরজার কাছে গেলুম। চারিদিক একেবারে নিঝুম—গাছের পাতারা পর্যন্ত নিঃসাড়। তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে কেবল গুহার দরজায় সাঁওতালি পুরুতের নাক ডাকার আওয়াজ। চুনিলাল এক লাফে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরুত-এর গলা টিপে ধরে এ জন্মের মতো তার নাক ডাকা বন্ধ করে দিল।...তারপর দুজনে গুহার ভিতর ঢুকলুম। ঘুটঘুটে অন্ধকার গুহা। ঢুকেই কেন জানি না, আমাদের গা ছমছম করতে লাগল! চুনিলাল তো এগুতেই চায় না, আমার গুঁতো খেয়ে তবে এগুলো! কিন্তু—'টর্চ' জ্বেলেই দেখলুম, সেই ভীষণ ভূতদেবতার ভয়ংকর মুখে দুটো ড্যাবডেবে আগুনচোখ দপদপ করে জ্বলছে!'

এতক্ষণ শোহনলাল নীরব শ্রোতা হিসেবে এদের কথোপকথন শুনছিল। এইবার জোর দিয়ে বলে উঠল

—'অসম্ভব! কাঠের মূর্তি, চোখ জ্বলবে কেমন করে?'

পান্নালালও শোহনলালের অবিশ্বাসে যোগ দেয়

—'ভয়ে তোমরা কী দেখতে কী দেখেছ!'

হিরালাল : 'হতেও পারে! তারপর শুনুন, বেজায় উঁচু সেই মূর্তিটা, তার গলা আমাদের নাগালের বাইরে। চুনিলাল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাঁধের উপরে চড়ে মূর্তির গলার হার থেকে কোনওরকমে নীলাখানা ছিড়ে নিলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভয়ানক চেঁচিয়ে উঠে আমার কাঁধ থেকে ঠিকরে পড়ে গেল। টর্চের আলো ফেলে দেখি, চুনিলাল মাটির উপরে ছটফট করছে আর তার পাশে পড়ে রয়েছে নীলাখানা। মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখি, তার গা বেয়ে মস্ত একটা সাপ ফোঁস ফোঁস করতে করতে নেমে আসছে! আমি আর দাঁড়ালুম না, নীলাখানা তুলে নিয়ে তীরের মতো ছুটে পালিয়ে এলুম!'

কথাগুলো বলতে বলতে হিরালাল উত্তেজনায় জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগল। একদৃষ্টে সে পান্না ও শোহনলালের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের সামনে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের পুনরাভিনয় যেন ভেসে ওঠে। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে: 'ওঃ!'

পান্নালাল 'নরকে যাক চুনিলাল! সে নীলাখানা কোথায়? এখনই দাও সেই নীলা আমার হাতে! আমি তাকে এখনই চাই!'

কোঁচার খুঁটে বাঁধা ছিল নীলাখানা—পেটের কাছে অতি সাবধানে গোঁজা। সেটা খুলতে খুলতেই বলল হিরালাল

—'এই নিন আপনার নীলা।'

হিরালালের হাত থেকে একরকম ছোঁ মেরেই নীলাখানা নিয়ে পান্নালাল নীরবে অনেকক্ষণ ধরে উলটে-পালটে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে কেমন যেন হয়ে যায় পান্নালাল। সে ভুলে যায় সকল উত্তেজনা সমস্ত আতঙ্ক বিভীষিকা!—হিরালালের বীভৎস কাহিনি তার

চুনিলাল মাটির উপরে ছটফট করছে আর তার পাশে পড়ে রয়েছে নীলাখানা

কাছে স্বপ্নে শোনা গল্প হয়ে গেছে—! চুনিলালের মৃত্যু, হিরালাল-এর পিছনে পুলিশের অনুসরণ, এখানকার অবস্থানে তাদের আসন্ন বিপদের সম্ভাব্যতা সমস্তই সে বিস্মৃত হয়। অপলক আবিষ্ট নেত্রে সে চেয়ে থাকে নীলাখানার দিকে। এই কি নীলার সম্মোহন?—এই মোহের পথেই কি নীলা ডেকে আনে সর্বনাশ মানুষের লোভী জীবনে? কে জানে!

শোহনলালও আগ্রহ সহকারে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল নীলাখানা। মুগ্ধস্বরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে

—'আশ্চর্য নীলা! এর তুলনা নেই!'

পান্নালাল আর চোখ ফেরাতে পারে না। কী এক ঐন্দ্রজালিক মায়ার দ্যুতি নীলার নীল অঙ্গে দুলে দুলে উঠছে। পান্নালালের গলা দিয়ে যেন অন্য কেউ কথা বলে। নীলার সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হয়ে পরিপূর্ণ অভিভূত আবেগে বলে ওঠে

—'আহা-হা, আশ্চর্যই বটে! নীল-পদ্ম, নীল-আকাশ, নীল-সাগরের রং এর কাছে ম্লান হয়ে যায়!'

ওস্তাদ ব্যবসাদার শোহনলাল স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে এবং বলে

—'তোমার কবিত্ব রাখো পান্নালাল। নীলাখানা আমার হাতে দাও, ওর কত দাম হবে দেখি।'

মোহগ্রস্ত আবিষ্ট পান্নালাল যেন উন্মাদ অপত্যস্নেহে নীলাখানা বুকে চেপে ধরে বলে

—'এ নীলা আমার আর বেচবার ইচ্ছে নেই!'

শোহনলাল ও হিরালাল উভয়েই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকে, পান্নালালের খেপাটে কথাটা যেন অনুধাবন করার চেষ্টা করে। স্থিরসংকল্প পান্নালাল দৃঢ় চিবুক সংবদ্ধ করে বজ্রমুষ্টিতে নীলাখানা চেপে ধরে ওদের দিকে সেনাপতির আদেশের ভঙ্গীতে শাণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

শোহনলাল 'সে কী, আমার পঁচিশ হাজার টাকা মাঠে মারা যাবে?'

হিরালাল 'ও নীলা না বেচলে আমার টাকা দেবে কে? ওর জন্যে চুনিলাল মরেছে, আমিও যমের দরজা থেকে ফিরে এসেছি।'

পান্নালাল 'তোমাকে তিন হাজার টাকা বখশিস দেব।'

হিরালাল 'তিন হাজার টাকা! ও নীলার কত দাম হবে শোহনলালবাবু ?'

শোহনলাল 'দেড় লাখও হতে পারে।'

হিরালাল 'আর আমি পাব তিন হাজার টাকা! পান্নাবাবুর দয়ার সীমা নেই!'

শোহনলাল 'পান্না, ও-নীলা তোমাকে বেচতে হবেই। আমাকে না হয় পনেরো হাজার টাকাই দিও।'

পান্নালাল ওদের কথায় যেন কানই দেয় না। ক্রমেই তার অন্তরের তলদেশ থেকে সমস্ত চিন্তা সংকল্প, দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী,—সমস্তই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে এক অদ্ভুত পৈশাচিক নির্মমতায় যেন রূপান্তর গ্রহণ করে। দুর্দম্য অধৈর্য বুঝি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তার নিষ্ঠুরতম আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করাতে চায়। তবু নিজেকে সম্বরণ করে পান্নালাল। দৃঢ় গাম্ভীর্যে সে উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হল। ওরা দুজনও পান্নালালের পশ্চাতে উঠে দাঁড়াল। পান্নালাল চলে যায় দেখে শোহনলাল বলে:

—'পান্না, তোমার টিকি আমার কাছে বাঁধা। জানো, আমি তোমার সর্বনাশ করতে পারি?'

উত্তেজনার আতিশয্যে হিরালাল ঝট করে পান্নালালের বাঁ হাতখানা ধরে ফেলে বলে

—'পান্নাবাবু, আমিও ওই নীলার সমান ভাগ চাই।'

ধৈর্যের শেষ সীমান্তে পান্নালাল—কোন অলক্ষ হিংস্র নিয়তি যেন অবিমৃষ্য ক্ষিপ্রতায় তাকে ঠেলে দেয় এক চরম সমাধানের পথে! দুই চোখে আগুনের ঝলক তুলে বলে পান্নালাল

—'হুঁ। শোহনলাল করবে আমার সর্বনাশ, আর হিরালাল চায় সমান ভাগ! তাহলে আমার উত্তর হচ্ছে এই!'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই চকিতে রিভলবার বের করে দুবার ছুড়লে পান্নালাল। দুটো জ্বলন্ত

গুলি দুজনের দাবি ঠান্ডা করতে যথেষ্টই—পান্নালাল তা জানে। শোহন ও হিরালাল আর্তনাদ করে সশব্দে আছড়ে পড়ে গেল। পান্নালাল এক পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল—আপনমনেই পুনরাবৃত্তি করে

—'হুঁ, ইনি করবেন আমার সর্বনাশ, আর উনি চান আমার সমান ভাগ!'

অবজ্ঞাভরে আরও কী বলতে যাচ্ছিল পান্নালাল, কিন্তু হঠাৎ তার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। বাড়ির দরজায় একখানা মোটর এসে দাঁড়ানোর শব্দ হল। সচমকে বিভ্রান্ত স্বরে পান্নালাল বলে:

—'ও কার মোটরের শব্দ!'

নিচে সদর দরজায় দমাদম পদাঘাতের শব্দ এসে পান্নালালের কানের পর্দাই যেন ভেঙে ফেলতে চায়। উৎকণ্ঠিত স্বরে সে বলে ওঠে 'ও কারা দরজায় লাথি মারে?'

নিচে কে চিৎকার করে বলছে

—'দরজা খোলো, দরজা খোলো! নইলে আমরা দরজা ভেঙে ফেলব!'

পান্নালাল সন্ত্রস্ত হয়ে জানালার খড়খড়ি তুলে কিছুটা অনুমান করবার চেষ্টা করে। জানালা খুললেও বাড়ির ঠিক নিচে কিছু দেখা যায় না। শুধু কথাগুলো আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তা থেকেই সে সভয়ে বলে ওঠে: 'পুলিশ!'

সদর দরজায় পদাঘাতের পর পদাঘাত! আর সেই সঙ্গে পান্নালাল-এর চেতনার উপরে যেন কেমন একটা ভারী বিভ্রান্তির প্রলেপ কে লেপে দিচ্ছে। সমস্ত ঘরের বাতাস যেন প্রতিধ্বনি করে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলছে অনুনাসিক কণ্ঠের বিকট ও তীব্র স্বর, কোথায় যেন একটা পৈশাচিক অট্টহাস্য হা-হা-হা-হা করে পান্নালালের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। উদভ্রান্ত স্বরে সে চিৎকার করে ওঠে

—'ও কে? ও কে অমন করে হাসছে!'

দরজায় পদাঘাতের শব্দ আর ওই বিকট অট্টহাসি যেন আরও নিকটে, আরও জোরে, আরও নিষ্ঠুরভাবে তাকে ঘিরে ফেলতে আসছে। পান্নালাল ছিটকে বাড়ির ভিতর দিকের দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

তৃতীয় দৃশ্যের পটভূমিকায় সেই অন্ধবাড়ির বন্ধ ঘরে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে মুমূর্ষুর আর্তনাদ—লোভলোলুপ দুঃসাহসিক ষড়যন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি। মৃত্যুর অরাজকতা বয়ে গিয়েছে ঘরখানার মধ্যে দিয়ে। টেবিল, চেয়ার, বিছানা ওলট-পালট বিপর্যস্ত। শোহনলাল ও হিরালালের অবিন্যস্ত দেহ রক্তাক্ত মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে।

ঘরের আবদ্ধ পরিসরে একটা অশুচি আবহাওয়া যেন চারিদিকের দেওয়ালে মাথা কুটে ফিরছে, কোনও পাপাত্মার অনুশোচনা তা নয়—অন্তিমকালে জীবনভিক্ষার দুর্বল প্রার্থনাও নয়। শোহনলাল ও হিরালাল বহু মরণাত্মক অভিজ্ঞতা থেকে একথাটা ভালো করে জানে যে তাদের দুর্ধর্ষ জীবনের ইতি একদিন এমনই করেই টানতে হবে। তবু পৃথিবী থেকে

যাওয়ার আগে পান্নালালের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়া তাদের চাই-ই। আসন্ন মরণের যন্ত্রণার চেয়ে তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা তাদের সারা দেহের পেশি-তন্ত্রী কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তুলছে। ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে যেন দুরাত্মার প্রতি দুরাত্মার আক্রোশ আছাড় খেয়ে পড়ছে। এদের নিশ্বাস প্রশ্বাসে যে প্রতিহিংসার বিষবাষ্প স্ফুরিত হচ্ছে, তাই যেন ঘরের আবহাওয়াটাকে আরও ভারাক্রান্ত, আরও অশুচি করে তুলেছে।

শোহনলালের দেহকুণ্ডলীর ভিতর থেকে একটা অস্ফুট গোঙানি যেন কোনও অদৃশ্য সর্বশক্তিমান বিচারকের কাছে নালিশ জানাচ্ছে।—মানুষের কানে তার কোনও অর্থ ধরা পড়ে না, তবু ভাবটা বুঝা যায়। ইহজগতের মেয়াদি আয়ু তার পূর্ণ হয়ে এল, প্রতিহিংসা বুঝি আর এখানে নেওয়ার সময় হবে না। এই শরীরে যে কাজ শেষ হল না, অন্য কোনও অশরীরীর কাছে তাঁর রেশ পৌঁছে দেওয়ায় হয়তো সান্ত্বনা আছে। তাই হয়তো সে নালিশ জানাচ্ছে ঘরের বাইরের আকাশের কাছে। ঘরের জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা ভেদ করে তার গোঙানি সাতনলি ফলার মতো ক্রমশই আকাশ চিরে উপরে উঠছে। ওদিকে সদর দরজায় তেমনই দমাদম আওয়াজ হচ্ছে; আর মাঝে মাঝে যেন পাহাড়ে পাঁজরা ফাটিয়ে বিকট শব্দে ফেটে ফেটে পড়ছে একটা হা-হা-হা অট্টহাসি।

শোহনলালের রক্তাক্ত দেহ তখনও ছটফট করছে, কিন্তু হিরালাল সম্পূর্ণ মৃতবৎ। হঠাৎ যেন তার দেহ নড়ে উঠল,—পাখি আকাশে উড়ে যেতে তার আশ্রয়-শাখায় যেমন দোলা লাগে তেমনই। কিন্তু হিরালালের প্রাণবিহঙ্গ তার দেহশাখার আশ্রয় ছেড়ে শূন্যে পক্ষবিস্তারের কোনও লক্ষণই দেখাল না। বরং তিরের চকচকে ফলার মতো তৃণাবরণ ভেদ করে তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ধীরে ধীরে খুলল; প্যাটপ্যাট করে চারিদিকটা একবার দেখে নিল এবং তার চিরকালের অভ্যাস মতো পরিহাসপক্ক ভাষায় বলল

—'পান্নাবাবু তো পগার পার! এইবারে আমাকেও গাত্রোত্থান করতে হবে! ওহে শোহনলালবাবু, চোখ তো মুদে আছেন, কিন্তু পটল তুলেছেন, না আমারই মতো কপট-মৃত্যু?'

পাথরচাপা অনুভূতির মধ্যে শোহনলালের চেতনা যে সমাধিগ্রস্ত ছিল। দেহের যন্ত্রণাটাকে মনে হচ্ছিল বুঝি নরকদূতের সাঁড়াশির কামড়ে-ধরা টান। বহুযোজন দূর থেকে যেন হিরালালের কথা তার কানে ভেসে এসে লাগছে। শরীরখানায় একটা আপ্রাণ মোচড় দিয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে এবং চোখ মেলতেই পূর্ণ সম্বিতে ফিরে আসে।—সে উত্তর দেয়

—'হিরালাল, আমার আর কোনও আশাই নেই। আমার আঘাত সাংঘাতিক।'

হিরালাল: 'কিন্তু পান্নাবাবুর গুলিতে আহত হয়েছে কেবল আমার পাঞ্জাবির হাতা। তার চোখে ধুলো দেবার জন্যেই এতক্ষণ আমি মড়ার মতো পড়ে ছিলুম!'

হিরালাল ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে বসল। শোহনলাল যেন সারা দেহখানা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে একটা পূর্ণ-জ্যা টংকার তুলবার চেষ্টা করেই মচ করে ভেঙে পড়ে,—আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে ওঠে: 'ওঃ বড়ো যাতনা!...বড়ো যাতনা!'

কিছুক্ষণ নিঃস্পন্দ থেকেই আবার মাথা তোলে শোহনলাল—আহত সাপের ফণা তোলার মতো। লাল চোখ দুটো ঠিকরে দিয়ে কাটা-কাটা ভাষায় ফাটা-ফাটা আওয়াজ তুলে বলে:

—'কিন্তু...কিন্তু শয়তান পান্না কি পালাতে পারবে?'

হিরালাল 'খুব পারবে! বাড়ির পিছনদিকে একটা গুপ্তদ্বার আছে যে! পুলিশ সদরে যে রকম লাথির উপর লাথি চালাচ্ছে, আমাকেও এখনই সেই পথই অবলম্বন করতে হবে।'

হিরালাল আহত নয়, সে তার পূর্ণজীবন নিয়ে এখনও নিরাপদ হতে পারে—এই সংবাদে শোহনলাল অস্বাভাবিকভাবে আশ্বস্ত হয়ে উঠল! কিন্তু হিরালাল গাত্রোত্থান করে দেখে অসহায়ভাবে সে অনুরোধ জানাতে চায়:

—'না না হিরালাল, যেও না!'

হিরালাল তার কাতর নিষেধের কোনও অর্থ খুঁজে পায় না, তার ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত দেহের দিকে একটা বক্রদৃষ্টি হেনে হো হো করে হেসে ওঠে হিরালাল। সে মনে করে, যে মরছে, অপরের বেঁচে থাকাটা হয়ত তার অসহ্য, তাই বলে এখন ওঁর শুশ্রূষা করতে বসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সেও মরবে নাকি! সে টেবিলের কাছে গিয়ে একখানা কাগজ টেনে নেয়। শোহনলাল আবার কাকুতি জানায়:

—'এখনই যেও না হিরালাল, শোন। আমার তো শিয়রে মৃত্যু, কিন্তু মরবার আগে আমি শুনে যেতে চাই, তুমি এই শয়তানির প্রতিশোধ নিতে পারবে কিনা!—চুপ করে রইলে কেন হিরালাল?—কাগজে কী লিখছ?'

হিরালাল 'আপনি বলবার আগেই প্রতিশোধের ব্যবস্থা করছি।'

এতক্ষণে সে বুঝতে পারে কেন শোহনলাল তাকে ছাড়তে চায় না। এতক্ষণে যেন শোহনের প্রতি তার অনুকম্পা হয়, শ্রদ্ধা জাগে। মৃত্যুযন্ত্রণাও এদের যদি বা সহ্য হয়, প্রতিহিংসা চরিতার্থ না হওয়ার জ্বালা বুঝি একেবারেই অসহ্য। এই বৃত্তিটুকুর পরিচয়ে হিরালাল শোহনলাল-এর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে অবশ্যই। শোহনের কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে সে একটু বসে, সতর্কভাবে খেয়াল রাখে বাইরে পুলিশের দরজা ভাঙার আওয়াজ। অস্থিরভাবে তাকে বলে শোহনলাল

—'হিরালাল, আমার চোখে চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসছে!—শীঘ্র বলো, কী ব্যবস্থা করছ?'

হিরালাল 'শুনুন, পান্নাবাবু নিশ্চয় তার স্ত্রীর কাছে গেছে। কাগজে সেই ঠিকানা লিখে পুলিশের জন্যে টেবিলের উপরে রেখে গেলুম। এ ঠিকানা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

শোহনলালের যন্ত্রণাকাতর মুখেও যেন হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু নিমিষেই ভুরু কুচকিয়ে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করে:

—'সে যদি সেখানে না যায়?'

নিস্পৃহভাবেই উত্তর দেয় হিরালাল:

—'তাহলে তার বরাত ভালো! অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমি তো আর লড়তে পারব না!'

শোহনলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পরমুহূর্তেই আতঙ্ক-স্ফীত চোখ দুটোকে হিরালালের দিকে তুলে ধরে প্রশ্ন করে:

—'কিন্তু হিরালাল তুমি শুনেছ?'

হিরালাল 'কী?'

শোহনলাল 'সেই ভয়ানক হাসি?'

হিরালাল 'শুনেছি। বোধহয় পুলিশের কেউ হেসেছে।'

শোহনের গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যায়। আরও ক্ষীণ চাপা কণ্ঠে বলে: 'না হিরালাল, সে হাসি মানুষের নয়!'

হিরালাল 'তাহলে যমদূত বোধহয় আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে!'

শোহনলাল যন্ত্রণা চেপে এতক্ষণে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিল। তার যে জীবন তাতে মৃত্যুর সময়ে কারও সহানুভূতি বা অশ্রুজল সে কামনা করতে পারে না—করেও না। তবু হিরালালের কথায় তার বুকের কোথায় বুঝি একটু আঘাত লাগে। অতিকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে

—'হিরালাল! প্রাণ যায়! মরবার সময়ে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, না ঠাট্টা করছ?'

হিরালাল 'ঠাট্টা করছি শোহনলালবাবু! আমাদের কাছে জীবন আর মরণ দুই-ই যে মস্ত বড়ো ঠাট্টা! যে ব্যবসা ধরেছি, আমাকেও যে এইভাবে মরতে হবে! কিন্তু সেদিন আমি হাসতে হাসতেই মরব!'

জীবন আর মরণ দুই-ই যাদের কাছে মস্ত বড়ো ঠাট্টা তারাই পারে অকাতরে জীবনের রাশ আলগা করে দিতে—সুপথে অথবা কুপথে। মাঝে যদি থাকে কোথাও মরণের খাদ তা তারা লাফিয়ে পারও হতে পারে, অথবা তাতে চিরকালের সমাধি রচনাও করতে পারে। হিরালাল--এর দুর্ধর্ষ দস্যু-জীবনে এইখানেই মনে হয় তার সত্যোপলব্ধি আছে। পরিণাম না ভেবে এপথে সে আসেনি, মৃত্যুর আশংকা তার চলার পথে বহুবার উত্তুঙ্গ পূর্ণচ্ছেদের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সে তার সতর্ক উপস্থিত বুদ্ধিতে বারে বারেই এড়িয়ে এসেছে, আর মনে মনে হেসেছে—জীবনের প্রতি—মৃত্যুর প্রতি পরিহাসের হাসি। তাই হিরালাল যখন বলে সে হাসতে হাসতেই মরবে তখন মনে হয় না সে কিছু বাড়িয়ে বলে। কিন্তু শোহনলাল?—সে তো আসন্ন মৃত্যুমুখে, সে কি সত্যই কাঁদছে? হাঁপাতে হাঁপাতে সে উত্তর দেয়:

—'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আমিও হাসতে হাসতে মরতে পারি হিরালাল—যদি পান্না ধরা পড়ে!'

বাইরে হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ হল। চমকে ভেঙে হিরালাল বলে ওঠে

—'ওই সদর দরজা ভেঙে পড়ল! আপনি এখন মরুন, আমি এখন পালাই! পরে নরকে একদিন আবার দেখা হবে।'

দ্রুত পদশব্দ তুলে প্রস্থান করে হিরালাল বাড়ির কোথায় গুপ্তদ্বার আছে সেইদিকে। শোহনলাল অন্তিমকালে শেষ দুই-চারিটি মুহূর্ত মাত্র ভিক্ষা চায়,—অন্তত পুলিশের লোক তার ঘরে না আসা পর্যন্ত তার শেষ নিশ্বাস যেন না বের হয়। —ওই তো সিঁড়ির উপর বহুলোকের ত্রস্ত জুতোর শব্দ শোহনের কানে আসছে! —মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের আয়ু, সে-কি এতই বেশি?

সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে তার চোখের সামনে বয়ে এল কুজ্ঝটিকার ঝড়,—অন্ধকারের ঢেউ-এর বন্যা নিঃশব্দে ডুবিয়ে দিল তার সামনের টেবিল চেয়ার খাট আয়না। পৃথিবীর যত ভিন্ন অর্থের ভিন্ন ভিন্ন গোটা-গোটা শব্দ—সব যেন গুঁড়িয়ে একটা তরল মিক্‌শ্চার করে কে তার কানের পর্দায় ঢেলে দিচ্ছে। হাত-পাগুলো কেমন যেন ঝিমঝিম করে একটা ঠান্ডা অনুভূতির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। শোহনলালের সারা অস্তিত্ব কোনও অমোঘ আকর্ষণে চেতনার নিস্তরঙ্গ অতলে নিঃশব্দে তলিয়ে যায়। সে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে চায়—

জীবনের শেষ পরিধিকূলে সে আরও দু-একটি মুহূর্তের আশ্রয় পেতে চায়—তাহলেই সেও হিরালালের কথামত হাসতে হাসতেই মরতে পারে।

পুলিশের লোক প্রায় উঠে এসেছে। —তাদের হই-চই যেন শব্দের সরীসৃপ,—দুর্বার হিংস্রতায় ফণা মেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে দমকা ঝড়ের মতো প্রবেশ করল পুলিসের ইনস্পেকটার। আসার মুখেই যেন আচমকা ইলেকট্রিকের শকে থমকে গিয়ে ইনস্পেকটার বলে ওঠে

—'এ কী! ঘরের ভিতর যে রক্তারক্তি কাণ্ড! —কে তুমি?—কে তুমি?'

নিবে যাওয়ার আগেই বুঝি একবার জ্বলে উঠল শোহনলালের চেতনা। সমস্ত শক্তি কণ্ঠে এনে ক্ষীণস্বরে সে টেনে টেনে বলে

—'আর পরিচয় দেবার সময় নেই। আসামি পান্নালাল আমাকে মেরে গুপ্তদ্বার দিয়ে পালিয়েছে! —ওই টেবিলে তার ঠিকানা!'

ইনস্পেকটারের পিছনে আরও অনেকে ঘরে ঢুকল। ভিতরের দৃশ্যে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়! ঝট করে ইনস্পেকটার কাগজখানা হাতে তুলে নিয়েই বলে

—'কাগজে লেখা আছে—'দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেন'।—পান্নাবাবু নীলা নিয়ে সেইখানে পালিয়েছে।'

শোহনলাল শুধু এইটুকু শুনবার জন্যেই তার শেষবিন্দু শক্তি দিয়ে যেন তার শেষ নিশ্বাসটুকু স্থগিত রেখেছিল। প্রতিহিংসার চরম চরিতার্থতায় তার দুর্বল মুখেও যেন একটা ক্ষীণ হাসির অতি সূক্ষ্ম রেখা খেলে গেল। পরম পরিতৃপ্তিতে একবার 'আ-আঃ' শব্দ করেই সে একেবারে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল। সাব-ইনস্পেকটার বলল:

—'স্যার, লোকটা বোধহয় মরে গেল!"

ইনস্পেকটার 'মরুক গে, ভদ্র গুণ্ডা পান্নালালের আড্ডায় সাধুলোক মরতেও আসে না। কলকাতার আর একটা আপদ দূর হল। কিন্তু মরবার আগে লোকটা আরও দু-একটা কথা কয়ে গেলেই পারত!'

সাব-ইনস্পেকটার 'হ্যাঁ স্যার, এমন করে মরা বড়োই অন্যায় স্যর! এখন আমরা কী করব! এ আড্ডার মালিক পান্নালালকে জানি, কিন্তু আবার কোথায় তার দেখা পাব?'

ইনস্পেকটার 'চলো, দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেনে গিয়ে তো আগে দেখাই যাক।'

যাওয়ার আগে পুলিশের দলবল তন্ন-তন্ন করে সারা বাড়িখানা তল্লাসি করল। তাদের ঈপ্সিত বস্তু কোথাও নেই। শোহনলালের মৃত দেহখানা নেড়ে-চেড়ে একবার পরীক্ষা করল এবং তারপর সেই রক্তমাখা লাশের পাহারায় দু-একজনকে রেখে তারা সকলেই প্রস্থান করে পান্নালালের উদ্দেশ্যে চন্দ্রমোহন লেনে। শোহনলালের অশরীরী আত্মা হয়ত তখনও তার সদ্যত্যক্ত দেহের শিয়রে অলক্ষে দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ চার ॥

চতুর্থ দৃশ্যে অবশ্যম্ভাবীকে প্রতিরোধ করবার সমস্ত আয়োজন বুঝি পান্নালাল গড়ে তুলেছে। বিজয়গর্বে সে আজ ঐশ্বর্যের উচ্চ শিখরে বলা যেতে পারে। তবু সে ভুলতে পারে

না তার দুর্ধর্ষ জীবনের এই প্রথম দুর্বলতার আতঙ্ক। আর কখনও এমন হয়নি। মানুষের বিরুদ্ধে শত-শত ষড়যন্ত্র সে বারে-বারে সৃষ্টি করেছে। জয় হোক, পরাজয় হোক, দুর্বলতা তাকে কোনওদিন এমন করে ছেয়ে ফেলেনি। নির্মম প্রত্যয়ে সে পদক্ষেপ করে—অব্যর্থ আঘাতে সে ছিনিয়ে নিয়ে আসে মানুষের সতর্ক সঞ্চিত ধনসম্পদ! বারে-বারে সে ব্যাহত করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রতিটি অভিযান! আজও সে শেষ পর্যন্ত তাই-ই করল, কিন্তু সে বিজয়গর্বের অনুভূতি তার আজ নেই। এখনও তার মনের দিগন্তে যেন রূঢ় গাম্ভীর্যে আতঙ্কের কালো মেঘ ঘনঘটায় বিদ্যুৎ হেনে যাচ্ছে। দুর্বল মস্তিষ্কের বিকারের মতো ক্ষণে ক্ষণে পান্নালাল এখনও শিউরে ওঠে। কানে বাজে সেই প্রতিধ্বনি—শূন্যতার অট্টহাসির প্রতিধ্বনি—হা-হা-হা-হা!

চন্দ্রমোহন লেনে দশ নম্বর বাড়ির সম্মুখ-অংশ এত রাত্রেও আলোকিত,—সরকারি রাস্তার গ্যাসের আলো এখানে সারারাত্রি অন্ধকারকে আসতে দেয় না। বাড়ির ভিতরের অংশ অন্ধকার—শুধু উপরের ঘরে একটা জানালার ফাঁক দিয়ে একটু ক্ষীণ আলোর রেখা চোখে পড়ে। ভিতর এবং বাইরে একটা নির্দোষ গার্হস্থ্য আবহাওয়া—পাপের আতঙ্ক, লোভের উত্তেজনা কোনও কিছুকে এখনও কলুষিত করেনি। কিন্তু পান্নালাল যেখানে আসছে—পান্নালাল যেখানে আশ্রয় নেবে—পান্নালাল যেখানে সেই নীলা গোপন রাখতে চাইবে সেখানকার নিষ্কলুষ শান্তি কি নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করতে পারবে? নীলার মোহে পান্নালাল মুগ্ধ, লোভে অন্ধ;—আর নীলা তার পিছনে নিয়ে আসছে আগুনের উপপ্লব, সব পুড়িয়ে ছারখার করবে, তবু নিবৃত্তি মানবে না। দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেনের নির্বিরোধ গার্হস্থ্য পরিবেশের হয়ত কোনও কিছু নিষ্কৃতি পাবে না—হয়তো বা সে আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে এল।

পান্নালাল হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে—যেন জলে ডোবা কোনও জাহাজের নাবিক এসে ডাঙায় উঠল। অকূলের মাঝে কূল পেয়ে আপন মনেই সে বলে

—'যাক, মানে মানে ফাঁড়া বোধহয় কেটে গেল, নিজের বাড়িতে এসে পড়েছি। এখানকার ঠিকানা জানে খালি হিরালাল—কিন্তু সে আর কথা কইবে না!—ওরে রামু—'

রামু সংসারের চাকর, অদূরেই কোথায় ঘুমিয়ে ছিল, প্রভুর এক ডাকেই সাড়া দেয়

—'আজ্ঞে, বাবু!'

পান্নালাল 'গিন্নিমা কোথায়?'

রামু 'শোবার ঘরে, বাবু!'

পান্নালাল 'আচ্ছা, তুই সদর বন্ধ কর!'

পান্নালাল সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। নিজের মনের আলোড়ন-বিলোড়ন যতদূর সম্ভব চেপে রেখে সহজভাবেই সে একটা বন্ধ দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকল।

পান্নালালের স্ত্রী প্রভা আগেই তার গলার স্বর শুনেছে—কিন্তু ঘর থেকে নেমে নিচে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। যেমন এতক্ষণ ছিল তেমনই খাটের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বুকের ওপর একখানা বই খুলে পড়বার চেষ্টা করছিল। দাম্পত্য জীবনের প্রথমদিকেই তার এ শিক্ষা হয়েছে যে অহেতুক ঔৎসুক্য যেন সে পারতপক্ষে না দেখায়, তার স্বামীর রহস্যময় গতিবিধির প্রতি যেন সে কোনওরূপ কৌতূহল পোষণ না করে। আগে হয়ত সে পীড়া

অনুভব করত, কিন্তু এখন দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততায় এটা তার স্বাভাবিকভাবেই গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই নিতান্ত সাংসারিক ব্যাপার ছাড়া অন্য সবকিছুতে প্রভা ব্যাহত অনেকটা নিস্পৃহ অসংশ্লিষ্ট ভাব দেখায়।—এটা এখন তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে বলতে হবে।

তবু আজ পান্নালালের সঙ্গে তার অনেক কথা জানতে ও জানাতে ইচ্ছে করছে। সে এতক্ষণ যে মানসিক অবস্থায় কাটিয়েছে তা তার স্বামীকে না জানিয়ে সে পারবে কেমন করে? সে এতক্ষণ যেন পান্নালালেরই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু রাত তিনটের আগে যার বাড়ি ফেরা অভ্যাসবিরুদ্ধ তাকে এগারোটার আগেই আশা করা বাতুলতা। কিন্তু সেই পান্নালাল সত্যিই এত আগে বাড়ি ফিরল দেখে প্রভা মনে মনে একটু বিস্মিত হল। কী মেজাজে যে পান্নালাল আসছে কে জানে। প্রভা জানে, স্বামী আর যেখানে যাই করুক, তার কাছে অন্তত সে সদয় ও স্নেহপ্রবণ। বহু আদর-আব্দার সে সহ্য করে, কিন্তু মাঝে মাঝে যেন তাকে আর ধরে-ছুঁয়ে পাওয়া যায় না। না, আজ সে আশঙ্কা নেই। প্রভা দেখল পান্নালাল যেন একটু বেশি তৎপর হয়েই সোজা তার কাছে উঠে আসছে। তার বুকের মধ্যে যে দুর্ভাবনার ভারী পাথর চেপে ছিল তা ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। সে বইটা পাশে রেখে খাটের উপর উঠে বসল। মুখে কৃত্রিম হাসি মাখিয়ে নিয়ে পান্নালাল ঘরে ঢুকেই বলে

—'এই যে প্রভা, জেগে আছ? কী বই পড়ছ?'

আপাতত নির্লিপ্তভাবেই উত্তর দেয় প্রভা

—'এই যে-বই ভালো লাগছে না।'

হাসতে হাসতে কৌতূহল প্রকাশ করে পান্নালাল

—'ভালো লাগছে না, তবু পড়ছ?'

অধিকতর নির্লিপ্তভাবেই যেন প্রভা বলে

—'উপায় কী? ঘুম না হলে কড়িকাঠ গোনার চেয়ে যে কোনও বই পড়া ভালো।'

পান্নালাল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। অনেকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। প্রভা তার মুখের চেহারা ও সাধারণ হাবভাব নিরীক্ষণ করতে থাকে, এবং একটু অভিমানের সুরেই প্রশ্ন করে

—'কিন্তু তোমার ব্যাপার কী বলো দেখি? রাত এগারোটা না বাজতেই তোমার আবির্ভাব, বন্ধুদের আসর বুঝি জমল না?'

পান্নালাল কঠিন হয়ে জিজ্ঞাসা করে

—'এ প্রশ্ন কেন?'

প্রভা 'তোমার মুখ দেখে।'

পান্নালাল যেন নরম হয়ে পড়ে! উৎসুক হয়ে বলে

—'আমার মুখে কী দেখছ প্রভা?'

প্রভা 'ভয় আর দুশ্চিন্তা।'

নাটকীয় রীতিতে একটা কৃত্রিমতার শুষ্ক হাসি হাসতে থাকে পান্নালাল এবং টেনে টেনে বলে

—'চোখের ভ্রম!—তোমার চোখের ভ্রম!'

প্রভা 'ভুল হল গো! তোমার মুখের পানে তাকিয়ে আমার কখনও চোখের ভ্রম হয় না।'

পান্নালাল 'দুনিয়ায় ভয় কাকে বলে জানি না। আর হঠাৎ দুশ্চিন্তাই বা আমায় আক্রমণ করবে কেন?'

প্রভা 'জ্যোতিষ শাস্ত্র জানলে সেকথা বলে দিতে পারতুম।'

পান্নালাল 'তুমি ও-বিদ্যাটা জানো না বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু দ্যাখো প্রভা, আমাকে নিয়ে অত বেশি মাথা ঘামিও না।'

প্রভা 'মাথা ঘামানোর অধিকার বোধ করি আমার ছিল, তবে তুমি আমার কাছে চিরকাল রহস্যময়ই থাকলে!'

'রহস্যময়' কথাটা পান্নালালের কোথায় যেন তিরের মতো লাগে— সবিস্ময়ে সে পুনরুক্তি করে

—'রহস্যময়!'

প্রভা 'হ্যাঁ, রহস্যময়। আমার কাছে তুমি যেন শিলমোহর করা খাম। সামনে থাকলেও বুঝতে পারি না, তোমার ভিতরে কী আছে! আমার আড়ালে তুমি কী করো, কোথায় থাক, কিছুই জানি না। এত টাকা পাও কোথা থেকে, তাও বুঝি না। আমার কাছে তুমি রহস্যময়, এটা যে আমার কত বড়ো দুর্ভাগ্য তা যদি তুমি জানতে! খালি তুমি নও, আজ থেকে দেখছি, এই বাড়িখানাও রহস্যময় হয়ে উঠেছে!'

পান্নালালের সমস্ত দেহের মধ্যে অলক্ষে যেন তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে যায়। দ্বিগুণ মাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলে

—'বাড়িখানা রহস্যময় হয়ে উঠেছে! কী বলছ?'

প্রভা 'হ্যাঁ, তাই। তুমি ঠাট্টা করবে বলে এতক্ষণ আমি বলিনি, কিন্তু আমার ঘুম না হওয়ার কারণই হচ্ছে তাই।'

অন্তরের তলদেশে উদ্বিগ্নতার ঢেউ পান্নালালকে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল করে তুলেছে। বাইরে গম্ভীর স্বরে সে বলে

—'প্রভা, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।'

প্রভা 'শোনো, তুমি তো কোনওদিনই শেষ রাতের আগে বাড়ি ফের না, কাজেই রাত দশটার সময় আমি শুয়ে পড়ি। আজও বিছানায় গিয়ে শুয়েছি, হঠাৎ শুনলুম, পাশের ঘরে কে ঠক-ঠক শব্দ তুলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে!'

সচমকে পান্নালাল বলে ওঠে

—'কী বললে? ঠক ঠক শব্দ তুলে?'

প্রভা 'হ্যাঁ, ঠক-ঠক ঠক-ঠক ঠক-ঠক—ঠিক যেন দুখানা কাঠের পা ও-ঘরে চলে চলে বেড়াচ্ছে!'

রুদ্ধশ্বাসে পান্নালাল আবার বলে

—'কাঠের পা?'

প্রভা 'হ্যাঁ, কাঠের পা।'

পান্নালাল 'তারপর?'

প্রভা 'উঠে পড়ে ও ঘরে গেলুম। দরজার শিকল বাইরে থেকে তোলা ছিল। কিন্তু ঘরের ভিতরে কেউ নেই।'

পান্নালাল 'শব্দটা?'

প্রভা 'থেমে গেছে। দরজা বন্ধ করে আবার এ ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আবার সেই শব্দ! আবার ও ঘরে গিয়ে দেখি, কেউ নেই—শব্দও থেমে গেছে। আবার এ ঘরে এলুম —আবার সেই চলন্ত কাঠের পায়ের শব্দ! বলো, এর পরেও কারুর চোখে আর ঘুম আসে?'

পান্নালাল নিজেকে সামলে নেয়। অন্তরের উত্তেজনা একেবারে গোপন করবার চেষ্টা করে। অন্তত প্রভার কাছে তার দুর্বলতা সে ধরা দিতে চায় না—কারুর কাছেই না। সে সমস্ত ব্যাপারটা যেন উড়িয়ে দিয়েই বলে

—'তোমার শুনবার ভুল প্রভা।'

প্রভা জোর দিয়ে বলে

—'অসম্ভব।'

পান্নালাল 'নইলে এ হচ্ছে ইঁদুরের কীর্তি।'

প্রভা 'ও সন্দেহ আমারও হয়েছে। কিন্তু সে যে খুব ভারী পায়ের আওয়াজ! ঠিক যেন মস্ত বড়ো একটা দেহ ও-ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল!'

পান্নালাল 'ওইটেই তোমার ভ্রম। কই, এখন তো আর কোনও শব্দ হচ্ছে না।'

বিষয়টা যেন তর্কের দ্বারা প্রমাণ সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াল। প্রভা আর কোনও জবাব খুঁজে পায় না। অতএব তাকে শেষ পর্যন্ত পান্নালালের কথাতেই সায় দিতে হল—সত্যিই তো এখন কেন সে শব্দ আর হচ্ছে না? প্রভা বলে

—'তাও তো বটে। তাহলে মানতে হয়, আমারই ভ্রম হয়েছে।'

প্রভার কথায় যেন পান্নালাল কানই দেয় না। তার দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠল, প্রভার দৃষ্টি তা এড়ায় না। অসতর্কভাবে সে আবার বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কপাল কুঁচকে কী ভাবতে ভাবতে অনেকটা যেন আপন মনেই সে বলে

—'কী আশ্চর্য, আজ আমাদের দুজনেরই শুনবার ভুল হয়েছে।— তুমি শুনেছ কাঠের পায়ের শব্দ, আর আমি শুনেছি বিকট অট্টহাসি!'

যে মানসিক উত্তেজনার স্রোত পান্নালাল অন্তরের তলদেশে জোর করে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে চেয়েছিল তা হঠাৎ উঁচু ঢেউ তুলে প্রভার সামনে ভেঙে পড়ল। প্রভা আতঙ্কে শিউরে উঠে বলে

—'অট্টহাসি? কখন?'

পান্নালাল সন্ত্রস্তভাবে তাড়াতাড়ি নিজেকে আবার সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে

—'না, না,—কী বলতে কী বলছি! —অ্যাঁ—হাসি-টাসি কিছুই আমি শুনিনি!'

এই ভাবান্তর প্রভা লক্ষ করে এবং বলে

—'আবার তুমি রহস্যময় হয়ে উঠলে?'

এ-বিষয়ে পান্নালাল আর কোনও কথা বলা পছন্দ করছিল না। সে প্রভাকে আদেশ করে বলে

—'আচ্ছা, যাও প্রভা, ঘুমোও-গে যাও।' ...কথা শেষ না হতেই পান্নালাল কীসের শব্দে চমকে উঠে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে

—'কিন্তু,—কিন্তু ও কী!'

প্রভা একটা চিৎকার দিয়ে পান্নালালের গা ঘেঁষে সরে আসে। পাশের ঘরে আবার ঠক-ঠক-ঠক করে কাঠের আওয়াজ, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর শোনা যাচ্ছে। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে প্রভা বলে

—'ওগো শুনছ?—ওটা কি আমার শুনবার ভ্রম? না, ইঁদুরের কীর্তি?'

পান্নালাল তাকে অভয় দিয়ে বলে

—'আচ্ছা দাঁড়াও প্রভা, আমি এখনই দেখে আসছি।'

এই বলে সম্পূর্ণ আত্মস্থ সাহসে সে বেরিয়ে গেল। কোমরের বাঁদিক থেকে বের করে নিল অটোমেটিকটা, সেফটি বোতাম টিপে নিয়ে শক্ত মুঠোর মধ্যে সেটা বাগিয়ে ধরে ঢুকল গিয়ে পাশের ঘরে। কাঠের পায়ের শব্দ তখন কোনও শূন্যে যেন মিলিয়ে গেল। পান্নালাল দেখল, সত্যই সে-ঘরে কেউ নেই। সেখান থেকে সে চেঁচিয়ে বলে

—'প্রভা, এ-ঘরে কেউ নেই! শব্দ কি এখনও শুনতে পাচ্ছ?'

উচ্চকণ্ঠে তেমনই কাঁপতে কাঁপতেই প্রভা উত্তর দেয়

—'না—আ—আ!'

পান্নালালের দুঃসাহসী রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠে। সে বিস্মিত হলেও আতঙ্কের লেশ পর্যন্ত আর তার মনে এখন নেই! উপরন্তু কেমন যেন একটা দুর্দমনীয় কৌতূহল জাগে সব ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে জানতে। সে আবার বলে

—'তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো প্রভা। আমি আজ এই ঘরেই থাকব।'

প্রভার সারা দেহ তখনও ভয়ে ছমছম করছে। তবু সে দ্বিরুক্তি করে না। অভিমান করা বৃথা—তার মূল্য পান্নালালের কাছে হয়ত বা কোনওদিনই নেই। পান্নালালের কথা মানেই আদেশ। প্রভাকে একলাই থাকতে হবে এই ঘরে। সে জানে, বিপদে বা সম্পদে পান্নালাল যা ইচ্ছা করবে তা থেকে তাকে সে বিরত করতে পারে না। সে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিল। তারপর বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে হয়ত বা ঘুমিয়েই পড়ল।

নিয়তিই হয়ত প্রত্যক্ষ জীবনের নেপথ্য নায়িকা,—কিন্তু পান্নালাল বোধহয় জানে না বা জানতে চায় না, কার কটাক্ষ-সংকেতে তার জীবনের গতি তারই অলক্ষে কোনও অনিবার্য পথে নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে।

॥ পাঁচ ॥

পঞ্চম দৃশ্যে মূর্ছাহত নিশীথ নগরীর বুকের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে রক্তমাখা কালো ঘোড়ার পিঠে কালো মরণ-দূত। তার কুটিল ভ্রূকুটি নিক্ষেপে ঠিকরে পড়ছে। তার নিষ্ঠুর করস্পর্শে কত দম্ভ, কত ধৃষ্টতা, কত শত ঔদ্ধত্যের উচ্চ চূড়া নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে লোষ্ট্রসম নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অন্তিম যবনিকার ক্ষুধার্ত জঠরে।... পান্নালাল কি কান পেতে শুনছে সেই দূরাগত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ,—তার দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেনের সম্মুখে প্রলয়ংকর হ্রেষাধ্বনি?

পাশের ঘরে প্রবেশ করার পর পান্নালালের কেমন জিদ চেপে যায়, সে তার সমস্ত আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে প্রতিপক্ষকে যেন সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করতে প্রস্তুত। সামনা-সামনি যে কোনও প্রত্যক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে তিলমাত্র ভয় পায় না—একথা সত্য। পুলিশকে সে কোনওদিন পরোয়া করেনি, যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তার কারসাজি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে। আজ তবে তার এত আশঙ্কা কিসের? আধিভৌতিক চক্রান্তে সে বিশ্বাস করে না, তবু তার দুঃসাহসী আত্মচেতনার ভিত্তিমূলে হয়তো ছিল কোনও দুর্বলতার ছিদ্রপথ;—তাই ঘটছে তার ক্ষণিকের বিভ্রান্তি। অবশ্য আতঙ্কে আত্মহারা হওয়ার মতো উত্তেজনা সে এখনও অনুভব করেনি। তাই নিজের ঘরে প্রবেশ করেই যখন সে দেখল কোনও চলমান কাঠের মূর্তি কোথাও নেই, শব্দও থেমে গেছে, তখন ব্যাপারটা সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। সে স্থির-সংকল্পে ঘরের মাঝখানে একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসল,—শেষ পর্যন্ত এ রহস্যের সমাধান সে করবেই। মন ঘুরে ফিরে ওই একই চিন্তায় ডুবে যায়!—সেই অট্টহাসি, এই কাঠের পায়ের শব্দ, সাঁওতালিদের দেবতা সম্বন্ধে জনশ্রুতি। আপন মনেই পান্নালাল বলে

—'সেই সাঁওতালি ভূত দেবতা! তার কাঠের মূর্তি নাকি সচল হয়ে পলাতক নীলা-চোরকে হত্যা করে নীলা কেড়ে নিয়ে আসে! নীলা চুরি করতে গিয়ে চুনিলাল মরেছে সাপের কামড়ে, কিন্তু হিরালাল নীলা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কাঠের ভূত তখন বাধা দিতে পারেনি! —আরে এটা তো জানা কথাই, কাঠের মূর্তি কখনও জ্যান্ত হয়?'

পান্নালাল নিজেই নিজেকে বুঝিয়ে মনের সংশয় দূর করবার চেষ্টা করে। বিচার-বিশ্লেষণের অতীতে কোনও অপ্রাকৃতিক ঘটনায় জন্মসংস্কারের বশে বুকের তলায় হয়ত সংশয় জাগে, হয়ত তার দোষী মন অসতর্কে চমকে ওঠে, বিস্মিত হয়, কিন্তু কোনও ভৌতিক কিংবদন্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস সে কোনওদিনই করে না।

কিছু পরে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে দরজাটা বন্ধ করল এবং পকেট থেকে নীলাখানা বের করে ফিরে ফিরে দেখতে লাগল। বসে বসে সে দেখছে নীলার ঐশ্বর্য—নীল বর্ণের দীপ্তি চোখের সামনে মহাসমারোহে দুলিয়ে তুলছে কুহক-বৈচিত্র্য। স্ফটিক অঙ্গ বেয়ে গলে গলে পড়ছে স্নিগ্ধ নীল দ্যুতি,—যেন নীল বরফের টুকরো। কত লোকের লাল রক্তে স্নান করেও এই নীলা আজ অম্লান নীল! কত তস্করের লোভ অসংযত হয়েছিল ওই রূপের মোহে—ওই মোহিনী সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কত দস্যু প্রাণ নিয়েছে কত পুরোহিত আর মন্দির রক্ষীর;—কিন্তু এত করেও কোনও তস্কর বা কোনও দস্যু নীলার অধিকার পায়নি, পেয়েছে শুধু রহস্যময় মৃত্যুর অব্যর্থ অপঘাত। ...পান্নালালের ষড়যন্ত্রে এবারেও চুনিলালের হাতে মন্দির পুরোহিত আর সর্পাঘাতে চুনিলাল প্রাণ হারিয়েছে—ওই নীলার জন্যে; ওই নীলার জন্যেই তার রিভলবারের গুলিতে প্রাণ দিতে হল শোহনলাল আর হিরালালকে! এখন আর কেমন করে কোন পথে পান্নালাল এই নীলার অধিকারে বঞ্চিত হবে?—পুলিশ? ...পুলিশ তো তাকে ধরতে আসেনি। হিরালালের অনুসরণেই ও বাড়িতে তারা হানা দিয়েছিল। পান্নালালই যে নীলা চুরি করেছে, এমন প্রমাণ তারা কোথায় পাবে? শোহন ও হিরালালের হত্যার জন্য পুলিশ তাকেই সন্দেহ করবে? করুক না! এমন কত গন্ডা হত্যার জন্যে সে তো কতবারই পুলিশের সন্দেহ অর্জন করেছে। তার গতিবিধির হদিস

মিলাবে এমন পুলিশ এখনও জন্মায়নি। ও ঠিকানার গুন্ডাদলপতি আর এ ঠিকানার সাংসারিক কর্তা যে ভিন্ন নামে একই লোক—এ তথ্য কেউই জানে না। এই কথা বা এই ঠিকানা যে জানত সে হিরালাল। তার মুখ তো সে বন্ধ করেই এসেছে। তবে আর কে আছে যে এই নীলা—যা তার নির্জন ঘরের মধ্যে, তার চোখের সামনে, তার হাতের উপরে ধরা রয়েছে—তা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে?—সেই আকাশ-চেরা অট্টহাসি?—এই ঠক-ঠক কাঠের পায়ের শব্দ?—অশরীরী প্রেতের অনুসরণ? অবাস্তবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে বাস্তব স্বার্থ ত্যাগ করতে পান্নালাল কেন, কোনও মানুষই সহজে পারে না...তবু তার হাত দুটো কেঁপে উঠল! হাতের উপর নীলার স্নিগ্ধ স্ফটিক দীপ্তি যেন ক্রুদ্ধ পাবকশিখার মতো জ্বলে উঠল,—নীলা তো নয়, যেন অগ্নিদেবের রুষ্ট আঁখির তারা, নীল শিখার বিচ্ছুরণে পান্নালালের সবকিছুকে বুঝি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। পান্নালালের সারা দেহে শিহরণ তুলে শিরায় শিরায় যেন গুপ্ত সরীসৃপের দল একসঙ্গে বিচরণ করে গেল। সে ধীরে ধীরে নীলাখানা আবার তার পকেটে রাখল; এবং চৌকি থেকে উঠে ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করতে লাগল। চিন্তাক্লিষ্টভাবে সে আবার আপন মনেই প্রশ্ন করে

—'তাই তো, আজকের এ-সব ব্যাপারের অর্থ কী! কে তখন অট্টহাসি হাসলে?— এ ঘরে থেকে থেকে কাঠের পায়ে চলে বেড়াচ্ছেই বা কে?...'

অনেকক্ষণ পান্নালালের এমনি করেই কাটে! কোনও রহস্যের কোনও সমাধানই সে খুঁজে পায় না। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনও ঠক-ঠক শব্দও শোনা গেল না, কোনও অট্টহাসিও কেউ হাসল না। যত সময় যাচ্ছে এই দুই রহস্যের গুরুত্বও পান্নালালের কাছে কমে আসছে। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে উন্মুখ যে তার আশঙ্কা অমূলক, ভিত্তিহীন আশঙ্কায় সে কোনও মিথ্যা বিভীষিকার আতঙ্ক ভোগ করছিল।

ক্রমেই মনটা তার হালকা হয়ে আসে। নিজের জন্যে তার হাসতে ইচ্ছে করে—তার মনের মধ্যে এত বড়ো দুর্বলতা কেমন করে বাসা বেঁধে ছিল। ঘরের বাতাসকে উদ্দেশ্য করেই সে যেন কৌতুকভরে বলে

—'ওহে বাপু কেঠো ভূত! তুমি আর একবার তোমার অট্টহাসি হাসো দেখি, আর-একবার ঘট-ঘটিয়ে চলে বেড়াও দেখি। তুমি যদি সত্য হও, যদি জ্যান্ত হয়ে আমাকে দেখা দিতে পার, তাহলে এখনই তোমার সাধের নীলা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। এই দ্যাখো তোমার নীলা আমার পাঞ্জাবির ডান পকেটে রয়েছে! পারো তো জোর করে কেড়ে নাও!...হা-হা-হা-হা, কাঠের মূর্তি যদি জ্যান্ত হত, তাহলে পৃথিবী যেত উলটে! যত সব আজগুবি কথা!'

পান্নালালের স্বগত প্রলাপের মাঝে হঠাৎ তার ঘরের দরজায় যেন কে আঘাত করল। পান্নালাল 'কে রে' বলে চমকে ওঠে!

বাইরে থেকে আস্তে আস্তে রামু উত্তর দিল

—'আমি, হুজুর!'

পান্নালাল যেন আশ্বস্ত হয়, দরজাটা খুলে জিজ্ঞাসা করে

—'কী রে রামু?'

অত্যন্ত চাপা গলায় সভয়ে রামু বলে

—'হুজুর, পুলিশ!'

সচমকে পান্নালাল বলে

—'পুলিশ! কোথায়?'

রামু 'বাড়ির চারিদিকে। তারা বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে, হুজুর!'

সদর দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারার শব্দ আসছে। পান্নালালের মনে হচ্ছে, ঠিক কিছুক্ষণ আগেই যেমন ও-বাড়িতে হয়েছিল, এখানেও যেন তারই পুনরাভিনয় ঘটছে। রামু বলল

—'ওই শুনুন হুজুর, তারা বাড়িতে ঢুকতে চায়। দরজা কি খুলে দেব?'

পান্নালাল গম্ভীরভাবে কী চিন্তা করল এবং রামুর দিকে মুখ তুলে কঠোরস্বরে বলল

—'না!'

রামু 'ওরা যে দরজা ভেঙে ফেলবে!'

পান্নালাল 'ফেলুক! তুই গিন্নির ঘরের দরজার বাইরে থেকে শিকল তুলে দে! পুলিশ দেখলে গিন্নি ভয় পাবে। —যা।'

রামু 'যে আজ্ঞে' বলেই ছুটে গেল—গিন্নিমার ঘরের দিকে। প্রভা এতক্ষণ ঘুমে অচেতন। তার ঘরে বাইরে থেকে শিকল বন্ধ হল, সে এসব ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারল না।

পান্নালাল এই প্রথম যেন পুলিশের কাছে সহায়হীন বলে নিজেকে ভাবতে পারল। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে দমাদম আওয়াজ আর চিৎকার—বিরাম নেই। একটু ভাববারও সময় যদি সে পেত! মনের মধ্যে এক-একটা চিন্তা আকাশে বিদ্যুৎ হানার মতো সর্বদিক ক্ষণিকের আলোকে ভাসিয়ে তুলেই অনন্ত অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আজকে সন্ধ্যা থেকে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটছে তা একেবারে খাপছাড়া—প্রত্যেকটাই অচিন্ত্যপূর্ব, বিচিত্র। ভয়াবহতায় কোনওটাই কম নয়। বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন প্রকারের উপদ্রব বহন করে তার দিকে ছুটে আসছে। যেন ডারবি ঘোড়ার রেস চলেছে তার এক রাত্রির জীবনের উপর দিয়ে—ভ্রূক্ষেপহীন নির্দয় গতিতে আসছে আশঙ্কা-আতঙ্ক-বিভীষিকা-রোমাঞ্চকর পরিহাস। এদের প্রতিরোধ করা অসাধ্য। কোনও সমস্যারই সমাধান আর নেই। তাই সে নিজে নিজেই বিড়বিড় করে বলে

'পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে—এ বাড়ি থেকে পালাবার গুপ্তপথ নেই!...হুঁ! তাহলে আমার লীলাখেলা ফুরুবার সময় হয়েছে।...কিন্তু পুলিশ এ-বাড়ির ঠিকানা পেলে কোথায়?—আমি ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের জীবনযাপন করি। এ বাড়ির উপরে পুলিশের সন্দেহ হল কেন? এখানকার ঠিকানা জানত খালি হিরালাল, কিন্তু সে তো এখন যমের বাড়িতে!'

পান্নালাল এখনও জানে না যে তার গুলিতে হিরালাল মরেনি। যদি তা জানত, যদি তেমন সন্দেহও তার হত, তাহলে হয়ত সে পুলিশের হাতে নিজের ঘরের মধ্যে অন্তত এমন করে বন্দি হত না। যাই হোক, পান্নালালের দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক জীবনে এই দুর্দান্ত ভুলের আর কোনও নিরাকরণ হবে না। এই অবস্থায় সে যদি জানতেও পারে যে হিরালাল মরেনি, সে-ই এ বাড়ির ঠিকানা প্রকাশ করার মূল,—তাহলেও সে নিরুপায়। পান্নালাল কেমন যেন

মরিয়া হয়ে ওঠে। অনেকদিন অপরের জীবন নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা সে খেলেছে,—আজ নিজের জীবনটা দিয়ে তেমনই খেলাই সে করবে। প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় স্বীকার যদি করতেই হয় তবে অহিংস নির্বিরোধ পন্থার চেয়ে সহিংস্র প্রতিরোধ অধিকতর সম্মানকর। প্রাণ তো এমন করেই যাবে—আজ যদি সেইদিন এসেই থাকে তবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। তাই এইসব দুর্বোধ্য ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ আলোচনা সে মন থেকে একরকম মুছে ফেলে নিতান্ত মরিয়া হয়েই নিজের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যেন নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল

—'যাক, এখন ও-সব ভেবে লাভ নেই—এ কাঠের ভূত নয়, জ্যান্ত পুলিশ!—ওই ওরা বুঝি সদর দরজা ভেঙে ফেললে। আমিও এখন ঘরের দরজা বন্ধ করি—প্রাণ থাকতে আত্মসমর্পণ করব না!'

এই বলেই সশব্দে পান্নালাল তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ওদিকে সদর দরজা ভেঙে পড়ার আওয়াজের পরই সিঁড়ি বেয়ে সশস্ত্র পুলিশের দলবল দ্রুত পদশব্দ তুলে উপরে উঠে আসছে। বারান্দার উপরে উঠে রামুকে ইনস্পেকটার জিজ্ঞাসা করে

—'এই! কে তুই?'

রামু 'আমি চাকর, হুজুর!'

ইনস্পেকটার 'তোর বাবু তো পান্নালাল?'

রামু ভ্যাবাচেকা খেয়ে আমতা আমতা করতে লাগল

—'আজ্ঞে ন-না,—হ্যাঁ হুজুর—কী লালবাবু?'

ইনস্পেকটার 'বুঝেছি! তোর যে বাবু সে কোথায়?'

রামু 'ও-ওই ঘরে হুজুর!'

ইনস্পেকটার সদলবলে গট-গট করে পান্নালালের ঘরের দিকে এগোল। ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ দেখে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে ইনস্পেকটার বললে

—'পান্নালাল, আর লুকোচুরি মিছে, দরজা খোলো!'

ঘরের ভিতর থেকে পান্নালালের দৃঢ় কণ্ঠ সুস্পষ্ট শোনা গেল

—'দরজা আমি খুলব না।'

ইনস্পেকটার 'তাহলে দরজা ভেঙে ফেলব।'

পান্নালাল 'যে এ-ঘরে ঢুকবে, তাকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব!'

ইনস্পেকটার আদেশ দিল 'এই জমাদার!—এই সেপাই! ভেঙে ফ্যালো দরজা! দেখি কে কাকে গুলি করে!'

দরজার উপরে দুম-দাম শব্দে ভারী লাথি পড়তে লাগল। প্রত্যেক আঘাতে সমস্ত বাড়িখানা কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিরীহ নিরুপদ্রব এই পল্লি ত্রস্ত চকিত চঞ্চল হয়ে উঠল। বাড়ির বাইরে লোকজন ভিড় করে জমছে—তাদের বিস্ময় আর চাপা কোলাহলে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এইসব হই চই ছাপিয়ে আচম্বিতে ঘরের ভিতরে জাগল এক সুদীর্ঘ অট্টহাস্য—হা-হা-হা-হা-হা! ইনস্পেকটার চমকে উঠে প্রশ্ন করে

—'কে হাসে অমন করে?'

স্যর, স্যর, সাপ স্যর, মস্ত গোখরো সাপ!

সাব-ইনস্পেকটার 'স্যার, স্যার, আসামি ভয়ে পাগল হয়ে গেছে স্যার!'

ইনস্পেকটার 'পাগলেও কি অমন করে হাসে?'

হঠাৎ ঘরের ভিতর জাগল একটা তীব্র আর্তনাদ। ঘুমন্ত রাত্রির পঞ্জরে যেন কোনও গুপ্ত ছুরি অতর্কিতে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল! আর সারা প্রকৃতি বুঝি মর্মান্তিক আতঙ্কে তীব্র দীর্ঘস্বরে চিৎকার করে উঠল। ইনস্পেকটার বিস্মিত কণ্ঠে বলে

—'ও কী যন্ত্রণার চিৎকার!'

সাব-ইনস্পেকটার দরজায় কান পেতে থেকে বলল

—'স্যার, স্যার, দরজায় কান পেতে আমি কী শুনছি জানেন?'

ইনস্পেকটার 'কী শুনছ?'

সাব-ইনস্পেকটার 'কে যেন কাঠের পা ফেলে খট-খট করে ছুটোছুটি করছে!'

ইনস্পেকটার 'ছুটোছুটির নিকুচি করেছে! ভাঙ দরজা!'

আবার পদাঘাতের পর পদাঘাত! হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়ল। দেখা গেল পান্নালাল মেঝের উপর চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরে ঢুকেই সাব-ইনস্পেকটার চিৎকার করে ওঠে

—'স্যার, স্যার, সাপ স্যার, মস্ত গোখরো সাপ!'

ইনস্পেকটার 'তাই তো!—মেরে ফ্যালো, মেরে ফ্যালো—গুলি করে মেরে ফ্যালো!'

দম-দম শব্দে উপর্যুপরি রিভলবারের গুলিবৃষ্টি হল। জানালার শার্সিগুলো ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। সমস্ত গুলিই ব্যর্থ হল। সাব-ইনস্পেকটার বলল

—'সাপটা মরল না স্যার, জানালা দিয়ে পালাল!'

ইনস্পেকটার 'তোমাদের হাতে একটুও টিপ নেই!'

সাব-ইনস্পেকটার 'আজ্ঞে, আপনিও তো রিভলবার ছুড়েছিলেন স্যার!'

ইনস্পেকটার 'এখন তর্কের সময় নয়, ওদিকে চেয়ে দ্যাখো, আসামিকে বোধহয় সাপে কামড়েছে!'

সাব-ইনস্পেকটার 'বোধহয় কী, কামড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে! দেখুন, মড়ার মতো পড়ে রয়েছে, ওর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে! সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত রক্তারক্তি!'

ইনস্পেকটার 'আগে ওর জামাকাপড় খুঁজে দ্যাখো নীলাখানা পাওয়া যায় কিনা।'

সাব-ইনস্পেকটার পান্নালালের মৃতদেহটা নেড়ে-চেড়ে খুঁজে দেখতে দেখতে বলে

—'না স্যার, নীলা নেই! এর পাঞ্জাবির ডান-পকেটটা কে জোর করে টান মেরে ছিঁড়ে নিয়েছে!'

ইনস্পেকটার 'ছেঁড়া-পকেটটা ওই তো মেঝের উপর পড়ে রয়েছে! দ্যাখো, দ্যাখো ওর ভিতরে নীলা আছে কিনা?'

সাব-ইনস্পেকটার 'উহুঁ, নেই স্যার!'

ইনস্পেকটার 'তাহলে রাস্কেল পান্নালাল নিজেই নিজের পকেট ছিঁড়ে নীলাখানা রাস্তায় ফেলে দিয়েছে!'

হঠাৎ সমস্ত উত্তেজনা ছাপিয়ে রাত্রির আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বাড়ির বাইরে আবার সেই অট্টহাসির শব্দ উঠল—তীব্র পৈশাচিক হাসি—হা-হা-হা-হা!

ইনস্পেকটার 'আবার সেই হাসি, এবার বাইরে!—আশ্চর্য!'

সাব ইনস্পেকটার 'ও ভূতের হাসি স্যার!'

ইনস্পেকটার 'ভূত! হুঁঃ!—আইন ভূত মানে না। দৌড়ে যাও, কে হাসছে ধরে নিয়ে এসো! হয়ত ওই বেটাই নীলা চুরি করে সরে পড়েছে!'

ইনস্পেকটার ও দুজন কনস্টেবল ভিন্ন আর সকলে ছুটে নিচের দিকে অগ্রসর হল!...অট্টহাসি ক্রমে দূর থেকে আরও দূরে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই সব হই চই উত্তেজনার মধ্যে প্রভা তার বন্ধ ঘরে ঘুম থেকে জেগে চিৎকার করে উঠে কখন মূর্ছিত হয়ে পড়ল কেউ তা জানতেও পারল না। ইনস্পেকটার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়ের কাছে মেঝের উপর পান্নালালের অন্তিমশয্যা। তার জন্যে কোনও চোখে একবিন্দু অশ্রুপাত হল না, কোনও বুকে একটু ব্যথার আঁচড়ও পড়ল না—একটা সন্তপ্ত নিশ্বাসের পাত্রও সে বুঝি নয়!

আকাশের পরপার থেকে যেন আরও দু-একবার সেই বিকট হাসির প্রতিধ্বনি কানে এসে বাজে তারপর একেবারে মিলিয়ে যায়।—আর সেই নীলা?—কে জানে, হয়ত সুদূর সাঁওতাল-পরগণার পর্বত-গুহায় সেই অদ্ভুত প্রেত-দেবতার বারো ফুট উঁচু কাঠের মূর্তির গলায় সে সর্বনাশা নীলা এতক্ষণ আবার দুলিয়ে তুলছে তার সর্বনাশা সম্মোহনী দীপ্তি—তার নীল গায়ে রাঙা রক্তের দাগ এখনও হয়ত পান্নালালের দেহের উত্তাপ হারায়নি।

গল্প

গল্প

সূচিপত্র

কামরা আর আমরা
মূর্তি
কি
ওলাইতলার বাগানবাড়ী
বাঁদরের পা
বাদলার গল্প
বাড়ি
মাথা ভাঙার মাঠে
রামস্বামীর উপলমণি
ভূতের রাজা
কে
মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী
চিলের ছাতের ঘর
খামেনের মমি
ক্ষুধিত জীবন
রুদ্রনারায়ণের বাগানবাড়ি
বিজয়ার প্রণাম
আয়নার ইতিহাস
জ্বলন্ত চক্ষু
কঙ্কাল সারথি
কিসমৎ
তিন নম্বরের ঘর
দিঘির মাঠের বাংলো
পিশাচ
ভীমেডাকাতের বট
জীবন্ত মৃতদেহ

গল্প

সূচিপত্র

অভিশপ্ত মূর্তি
কলকাতার বিজন দ্বীপে
বন্দি আত্মার কাহিনী
ছায়া না কায়া?
জীবন্ত মৃত্যু
নবাব কুঠির নর্তকী
কোর্তা
ভূত পেত্নীর কথা
পোড়ো মন্দিরের আতঙ্ক
অভিশপ্ত নীলকান্ত
বাড়ি
ভূতের ভয়
আজও যা রহস্য
ভূত যখন বন্ধু হয়
এথেন্সের শেকলে বাঁধা ভূত
আধ খাওয়া মড়া
স্বপ্ন হলেও সত্য
শয়তান
গঙ্গার বিভীষিকা
বাদশার সমাধি
পোড়ো বাড়ি
ভৌতিক না ভেলকি?
ভৌতিক চক্রান্ত
পেপির দক্ষিণ পদ
পর্বত ও মূষিক
অট্টহাস্যক
টেলিফোন

গল্প

সূচিপত্র

নবাবগঞ্জের সমাধি
ভূত আর ভূতনাথ
আজব সত্য কাহিনী
বাজলে বাঁশী কাছে আসি
বংশীবদনের বহির্গমন

কামরা আর আমরা

মা বললেন, 'ওরে আজ অগস্ত্য যাত্রা! আজকে বিদেশে যেতে নেই।'

সুটকেশটা গোছাতে গোছাতে আমি বললুম, 'কেন বলো দেখি? আজ বিদেশে গেলে কি হয়?'

মা বললেন, 'আজকে যাত্রা করে অগস্ত্যমুনি আর ফিরে আসেননি।'

আমি বললুম, 'অগস্ত্যমুনির বউ ভারি কোঁদল করত। তার ভয়েই 'এই আসি' বলে তিনি পিঠটান দিয়েছিলেন।'

মা প্রতিবাদ করে বললেন, 'কই, শাস্তরে তো সেকথা লেখে না!'

আমি বললুম, 'শাস্ত্রে সেকথা লিখলে অগস্ত্যমুনির বউ মানহানির মামলা এনে শাস্ত্রকারকে জব্দ করে দিতেন যে! কাজেই শাস্ত্রকাররা সেকথা চেপে গিয়েছেন।'

মা বললেন, 'না রে, না। বিন্ধ্য পাহাড়—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক মা, ও গল্প আমিও জানি। তোমার কোনও ভয় নেই মা, মাসখানেক ভারতবর্ষের বুকে বেড়িয়ে আবার আমি ঠিক ফিরে আসবই। তোমার মতো মাকে ছেড়ে কোনও ছেলে কি ঘর ভুলে থাকতে পারে? এই নাও, একটা প্রণাম নিয়ে হাসিমুখে আমাকে আশীর্বাদ করো।'

মা খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে করতে আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

যতীন আর আমি, দুই বন্ধুতে দেশ বেড়াতে বেরিয়েছি। যতীন পড়ে ল-কলেজে, আর আমি মেডিকেল কলেজে।

হাওড়া ইস্টিশানে গিয়ে একটা সেকেন্ড কেলাস কামরায় ঢুকলুম। এ সময়ে কেউ বেড়াতে যায় না বলেই আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। গাড়িতে ভিড় থাকবে না, দিব্যি ধীরে-সুস্থে শুয়ে-বসে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে যেতে পারব। পুজোর সময়ে আর বড়োদিনে বেড়াতে যাওয়ার পায়ে নমস্কার! সে কি বেড়াতে যাওয়া, না নরক যন্ত্রণা ভোগ করা?

প্রথমেই আমাদের বেনারসে যাবার কথা,—সেখানে গিয়ে পৌঁছাব কাল প্রায় দুপুরে। সারা রাত ট্রেনেই কাটাতে হবে। কাজেই আমাদের কামরায় লোক নেই দেখে ভারি আনন্দ হল। বাইরের কোনও লোক আসবার আগেই তাড়াতাড়ি দুখানা বেঞ্চে দুটো বিছানা বিছিয়ে আমরা দুজনেই শুয়ে পড়লুম।

শুয়ে শুয়ে দুই বন্ধুতে অনেক গল্প হল। তারপর ট্রেন যখন বর্ধমান পার হল, যতীন উঠে আলো নিবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে অন্ধকারেই যতীনের নাক-ডাকার আওয়াজ শুনতে শুনতে আমারও চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে আমার গা ধরে নাড়া দিচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম—সঙ্গে সঙ্গে সামনের বেঞ্চ থেকে যতীনও ধড়মড় করে উঠে বসল।

আমি বললুম, 'যতীন, আমার ঘুম ভাঙলে কেন?'

যতীন বললে, 'আমিও তোমাকে ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

—'তার মানে?'

—'তুমি তো আমার গা ধরে নাড়া দিচ্ছিলে?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি হে, আমি তো দিব্যি আরামে ঘুমিয়েছিলুম, তুমিই তো আমার গা-নাড়া দিয়ে আমাকে তুলে দিলে!'

যতীন হেসে বললে, 'বাঃ, বেশ লোক যাহোক! নিজে আমাকে ধাক্কা মেরে তুলে দিয়ে আবার আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে?'

আমি বললুম, 'না ভাই, সত্যি বলছি, আমি এখান থেকে এক পা নড়িনি। তোমাকে আমি ধাক্কা তো মারিইনি বরং আমাকেই তুমি ধাক্কা মেরেছ। আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?'

যতীন গম্ভীর স্বরে বললে, 'গাড়িতে আর জনপ্রাণী নেই, আমাদের দুজনকে তবে ধাক্কা মারলে কে? চোর-টোর আসেনি তো?'

শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমি আবার আলো জ্বেলে দিলুম। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম কামরায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই এবং আমাদের মোটঘাটগুলোর একটাও অদৃশ্য হয়নি।

যতীন বললে, 'নিশ্চয়ই চোর এসেছিল। ভাগ্যে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল, তাই চুরি করবার আগেই তাকে সরে পড়তে হয়েছে। বড্ড বেঁচে যাওয়া গেছে হে!'

আমি বললুম, 'জানলাগুলো সব বন্ধ করে দাও, আর আলো নিবিয়েও কাজ নেই। আচ্ছা জ্বালাতন!'

আবার খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প হল। তারপর আবার দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

কিন্তু আবার ঘুম গেল ভেঙে।

এবারে কেউ আর আমাকে ধাক্কা মারছিল না, এবারে কামরার ভিতর থেকে পরিত্রাহি স্বরে একটা কুকুর আর্তনাদ করছিল।

আলো জ্বালিয়ে শুয়েছিলুম, কিন্তু উঠে দেখি, কামরার ভিতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার!

অন্ধকারে যতীনের গলা পেলুম, সে বললে, 'এ আবার কি ব্যাপার! আজ কি রাজ্যের আপদ এইখানেই এসে জুটেছে?'

কুকুরটা যেভাবে চ্যাঁচাচ্ছে তাতে মনে হল, সে যেন ভয়ানক জখম হয়েছে। কিন্তু কামরার জানলা-দরজা সব বন্ধ, সে ভিতরে এলই বা কেমন করে?

কুকুরটা হঠাৎ একবার জোরে কেঁউ কেঁউ করে চেঁচিয়েই একেবারে চুপ মেরে গেল।

আমি বললুম, 'যতীন, আলো নেবালে কে?'

যতীন বললে, 'জানি না তো! আমি ভাবছিলুম, তুমিই নিবিয়েছ।'

—'কুকুরটা ভিতরেই আছে। বেঞ্চি থেকে পা নামানো হবে না, ব্যাটা যদি খ্যাঁক করে কামড়ে দেয়! তোমার টর্চটা কোথায়?'

—'আমার পাশেই আছে।'

—'জ্বেলে দ্যাখো তো, কুকুরটা কোথায় আছে?'

যতীন টর্চ জ্বেলে দেখতে লাগল, আর আমি আমার মোটা লাঠিগাছটা মাথায় তুলে প্রস্তুত হয়ে রইলুম, কুকুরটা যদি তেড়ে আসে তাহলে তখনই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব।

কিন্তু কামরার কোথাও কুকুরটাকে আবিষ্কার করা গেল না। এখানে কুকুর-টুকুর কিছুই নেই।

সুইচের কাছে গিয়ে দেখি, সুইচ টেপাই আছে।

আমি বললুম, 'অসম্ভব। কিন্তু এই যে এখনই কুকুরটা চ্যাঁচাচ্ছিল সে এলই বা কেমন করে আর গেলই বা কেমন করে?'

কী ও-দুটো? অন্ধকারের অগ্নিময় চক্ষু?

যতীন বললে, 'কুকুরটা বোধহয় পাশের কামরা থেকে চ্যাঁচাচ্ছিল। আমরা ঘুমের ঘোরে ভুল শুনেছি।'

আমি বললুম, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু আজকে ঘুমের দফায় ইতি। এসো, বসে বসে গল্প করা যাক।' —এই বলে আমি বসে পড়লুম—

এবং মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশেই ঠিক যেন আর একজন কে বসে পড়ল।

নিবিড় অন্ধকারে কামরার ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

বললুম, 'নিজের বিছানা ছেড়ে হঠাৎ উঠে এলে যে যতীন?'

ওপাশের বেঞ্চি থেকে যতীন বললে, 'কই আমি তো এখান থেকে উঠিনি!'

আমার পাশে হাত বাড়িয়ে দেখলুম, কই, কেউ তো সেখানে নেই!

তারপরেই শুনতে পেলুম, আমার কানে কে ফিসফিস করে কথা কইছে। কি যে বলছে, তা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কথা যে কেউ কইছে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই!

হঠাৎ যতীন বললে, 'মোহন, তুমি কোথায়?'

আমি আড়ষ্টভাবে বললুম, 'আমার বিছানায়।'

যতীন সভয়ে বললে, 'তবে আমার কানে কানে কথা কইছে কে?'

জবাব না দিয়ে দু-পাশে দু-হাত বাড়িয়ে দিলুম, কিন্তু কারুর গায়ে হাত লাগল না। অথচ তখনও আমার কানের কাছে মুখ এনে কে ফিসফিস করছে।

ডাক্তারি পড়ি, রোজ দু-হাতে টাটকা বা পচা মড়ার দেহে হাসিমুখে ছুরি চালাই, গভীর রাত্রে একলা মড়ার পাশে অম্লানবদনে বসে থাকি, স্বপ্নে কখনও ভূত দেখিনি, তবু কেন জানি না, আজকে এই অন্ধকারে আমার সর্বাঙ্গ কি একটি অজানা ভয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল,—একখানা হাত নাড়বার শক্তিও আর রইল না।

যতীনেরও বোধহয় সেই অবস্থা। সে প্রায় কান্নার স্বরে বললে, 'মোহন, মোহন, কামরার ভেতরে কারা সব এসেছে, কে আমার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইছে,—ওই শোনো, কে আবার চলে বেড়াচ্ছে!'

সত্যি কথা! ঘরময় কে চলে বেড়াচ্ছে, খট খট খট খট, খড়মড় খড়মড় খড়মড়! এ যেন কোন মাংসহীন হাড়ের আওয়াজ—এ ভীষণ আওয়াজ আমি জানি, কঙ্কালকে নাড়লে ঠিক এমনি অস্থিঝঙ্কার জেগে ওঠে।

কিন্তু তখন আর আমার নড়বার শক্তি নেই, কে যেন কি যাদু মন্ত্র পড়ে আমার সমস্ত দেহকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে। আচম্বিতে আর এক ব্যাপার! কামরার এক কোণ থেকে মেয়ে-গলায় কে উঁ-উঁ-উঁ-উঁ করে কাঁদতে লাগল!

কানের কাছে সেই ফিসফিস কথা, ঘরময় কঙ্কালের সেই চলাফেরার খটখটানি, এককোণ থেকে মেয়েগলায় সেই উঁ-উঁ-উঁ-উঁ করে কান্না—গাঢ় অন্ধকারে ডুবে, আড়ষ্টভাবে বসে বসে একসঙ্গে এইসব শুনতে লাগলুম। যতীনের কোনও সাড়া নেই, সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়নি তো?

ও আবার কি? মার্বেলের গুলির মতো দুটো জ্বলন্ত রক্তের মতো কি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কী ও দুটো? অন্ধকারের অগ্নিময় চক্ষু?

চোখ দুটো ভাসতে ভাসতে আমার কাছ থেকে হাত তিনেক তফাতে এসে শূন্যে স্থির হয়ে রইল! যেন আমাকে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করছে! দেখতে দেখতে সেই আগুনচোখ দুটোর রঙ নীল হয়ে এল। রক্ত-রঙে যে চোখ দুটোকে দেখাচ্ছিল ক্রুদ্ধ, নীল-রঙে তাদের দেখাতে লাগল বিষাক্ত!

হঠাৎ কেমন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ এসে আমাকে চাঙ্গা করে দিলে। এক মুহূর্তে আমার সব মোহ কেটে গেল—আমি একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে, অন্ধকারের ভিতরেই দু-হাতে দুদ্দাড় ঘুসি

ছুড়তে ছুড়তে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলুম—'আমি তোদের ভয় করি না, আমি তোদের ভয় করি না, আমি তোদের কারুকে ভয় করি না, সরে যা, সরে যা সব—আমি তোদের কারুকে ভয় করি না!'

তৎক্ষণাৎ কামরার ইলেকট্রিক লাইট আবার দপ করে জ্বলে উঠল।

নিজের বিছানায় বসে যতীন ঠক ঠক করে কাঁপছে। তারও অবস্থা আমার চেয়ে ভালো নয়।

কামরার ভিতরে আর সেই আগুনচোখ দেখা গেল না—কোনওরকম শব্দ বা কান্নার আওয়াজ কানে এল না। আমরা দুজন ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে যতীনের পাশে গিয়ে বসে পড়লুম।

যতীন অস্ফুট স্বরে বললে, 'আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম?'

আমি বললুম, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

একদিকে তাকিয়ে যতীন তীব্র স্বরে বলে উঠল, 'না, স্বপ্ন নয়,—ওই দ্যাখো!'

ঠিক যেন শূন্যকে বিদীর্ণ করে ফিনকি দিয়ে কামরার মেঝের উপরে রক্ত ছিটকে পড়ছে! তাজা, রাঙা রক্ত! রক্তে রক্তে ঘর বুঝি ভেসে যায়! শূন্য যেন রক্ত প্রসব করছে!

আমি আর সইতে পারলুম না—অ্যালাম-কর্ড ধরে একেবারে ঝুলে পড়লুম।

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেমে গেল।

আমি আর যতীন এক এক লাফে ট্রেন ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়লুম।

গার্ড এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা ট্রেন থামিয়েছ?'

আমি বললুম 'হ্যাঁ।'

—'কেন?'

—'গাড়ির ভেতরে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। আসল ব্যাপারটা কি, তা আমি বলতে চাই না। কিন্তু ও কামরার ভেতরে আমরা যদি আর কিছুক্ষণ থাকতুম, তাহলে হয় পাগল হয়ে যেতুম, নয় মারা পড়তুম।'

গার্ড খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'বাবু, তোমার অসংলগ্ন কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না। তুমি কি বলতে চাও, ভালো করে বুঝিয়ে বলো।'

যতীন বললে, 'ও কামরায় ভূত আছে!'

গার্ড হো হো করে হেসে বললে, 'কামরায় ভূত। এ একটা নতুন কথা বটে! বাঙালিবাবুদের মাথা খুব সাফ, ট্রেনের কামরাতেও তারা ভূত আবিষ্কার করে!'

আমি বললুম, 'ভূত কিনা জানি না, কিন্তু ও কামরার ভেতরে আমরা এমন সব বিভীষিকা দেখেছি, যা স্বাভাবিক নয়।'

গার্ড বললে, 'অ্যালার্ম-কর্ড টেনে, বাজে কথা বলে তোমরা এখন আইনকে ফাঁকি দিতে চাও? ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না, তোমাদের জরিমানা দিতে হবে।'

আমি বললুম, 'সাহেব, আমরা জরিমানা দিতে রাজি আছি, তবু ও কামরায় আর ঢুকতে রাজি নই।'

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল! কামরার ভিতর থেকে আমাদের জিনিসপত্তরগুলো সবেগে বাইরে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল—ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, ব্যাগ ও পোঁটলা-পুঁটলি প্রভৃতি। ঠিক যেন কে সেগুলোকে বাইরে ছুড়ে দিচ্ছে! গার্ডসাহেব মাথা হেঁট করে তাড়াতাড়ি মাটির উপর বসে পড়ল—নইলে যতীনের স্টিল ট্রাঙ্কটা নিশ্চয়ই তার মাথা চূর্ণ করে দিত!

গার্ড চ্যাঁচাতে লাগল, 'এই, পাকড়ো—পাকড়ো!'

একদল রেলপুলিশ ও কুলি হুড়মুড় করে কামরার ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং বলাবাহুল্য, সেখানে জনপ্রাণীর আধখানা টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না।

গার্ড উত্তেজিত, ভীত কণ্ঠে আমাদের বললে, 'বাবু, ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। ট্রেন লেট হয়ে যাচ্ছে, এখন আর বোঝবার সময়ও নেই—তবে তোমাদের কথাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। আপাতত তোমরা অন্য কোনও কামরায় উঠে পড়ো, আমি ট্রেন চালাবার হুকুম দেব।'

পাশের যে ইন্টার-কেলাসে গিয়ে আমরা উঠলুম, তার মধ্যে অনেক লোক, —সকলেই আমাদের কথা শোনবার জন্যে ব্যগ্র।

যতটা সংক্ষেপে পারা যায়, তাদের কাছে আমাদের বিপদের কাহিনী বর্ণনা করলুম।

একটি আধবুড়ো ভদ্রলোক, পোশাক দেখে তাঁকে রেলকর্মচারি বলে চেনা গেল, আমাদের কাছে এসে বললে, 'মশাই, গেল বৎসরে এই ট্রেনের এক কামরায় একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল।'

আমি বললুম, 'তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কি সম্পর্ক?'

—'সম্পর্ক? সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই, তবু শুনুন না! রানীগঞ্জে গাড়ি থামলে পর দেখা গেল, একটা সেকেন্ড কেলাস কামরার ভিতরে দুজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক, একটি শিশু আর একটা কুকুরের মৃতদেহ রক্তের মধ্যে প্রায় ডুবে আছে। কিন্তু কে বা কারা এতগুলো প্রাণীকে খুন করলে, তার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, 'একটা কুকুরও ছিল?....তারপর?'

—'তার কিছুদিন পরে ওই কামরাতেই তিনজন সায়েব হাওড়া থেকে আসছিল। কিন্তু রানীগঞ্জেই তারা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে স্টেশনমাস্টারের কাছে অভিযোগ করে যে, কামরার আলো নিবিয়ে দিয়ে কারা তাদের ভয়ানক ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও যারা ভয় দেখিয়েছিল তাদের পাত্তা পাওয়া গেল না।'

যতীন বললে, 'ভূতকে কখনও খুঁজে পাওয়া যায়? মানুষকেই ভূতেরা খুঁজে বার করে।'

তিনি বললেন, 'তারপর প্রায়ই ওইরকম সব অভিযোগ হতে লাগল। আর লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অভিযোগ হয়েছে প্রত্যেকবারই রানীগঞ্জ স্টেশনে,—কেবল আপনারাই রানীগঞ্জ পার হতে পেরেছেন।'

যতীন বললে, 'হ্যাঁ, রানীগঞ্জ কেন, আর-একটু হলেই আমাদের ভব-নদীর পারে যেতে হত!'

আমি বললুম, 'যতীন, মায়ের কথা আর কখনও ঠেলব না। সত্যিসত্যিই আজকের যাত্রা অশুভ!'

মূর্তি

পাহাড়ের ছায়াকে আরও কালো করে রাত্রি ঘনিয়ে এল।

আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে একদল যাত্রী এগিয়ে চলেছে। গরম পোশাকে সকলের আপাদমস্তক মোড়া,—কারণ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।

একে ঘন কুয়াশা, তার উপরে আবার রাতের অন্ধকার। তবু তারই ভিতরে কোনওরকমে চোখ চালিয়ে দূরের সরাইখানার মিটমিটে আলো দেখে পথিকদের ক্লান্ত, শীতার্ত মন খুশি হয়ে উঠল।

খানিক পরেই সকলে সরাইখানার দরজার সামনে এসে হাজির হল।

যার সরাই সে বেরিয়ে এল। পথিকদের কথা শুনে বললে, 'বড়োই মুশকিলের কথা। আমার সরাইয়ের সব ঘরই যে আজ ভরতি হয়ে গেছে!....তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি আমার ঢেঁকিশালায় শুয়ে আজকের রাতটা কাটাতে রাজি হন, তাহলে আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

পথিকেরা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখলে। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কোনও উপায় তো নেই! এই রাতে এই শীতে এই আঁধারে, বাইরের জনমানবশূন্য মাঠ বা জঙ্গলের চেয়ে সরাইয়ের ঢেঁকিশালাও ঢের ভালো।

সরাইয়ের কর্তা তাদের সকলকে নিয়ে ঢেঁকিশালায় গিয়ে ঢুকল। মস্ত ঘর—একদিকে একখানা বড়ো পর্দা ঝুলছে।

সকলে মিলে খেয়ে-দেয়ে হাসি-আমোদ করে যে যার লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

যাত্রীদের ভিতরে একজন ছিল, তার নাম ওয়াংফো।

সঙ্গীদের বিষম নাক-ডাকুনি ও ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুরের হুটোপুটি ওয়াংফোর চোখ থেকে আজ ঘুম কেড়ে নিলে।

নাচার হয়ে শেষটা সে উঠে বসল। লণ্ঠন জ্বেলে একখানা বই বার করে পড়াশুনায় আজকের রাতটা সে কাটিয়ে দেবে বলে স্থির করলে।

কিন্তু পড়াতেও তার মন বসল না। নিশুত রাত, বাইরের গাছপালার ভিতরে বাতাসও যেন নিবিড় অন্ধকারে ভয় পেয়ে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে আছে।

অত বড়ো ঘরে ওয়াংফোর ছোট্ট লণ্ঠনটা টিমটিম করে জ্বলছে—সে যেন তার আলো দিয়ে অন্ধকারকেই আরও ভালো করে দেখতে চায়!

ক্রমে ওয়াংফোর গা যেন ছমছম করতে লাগল। তার মনে হল, ঘরের ওদিককার অন্ধকার

যেন কি একটা ভীষণ আকার ধারণ করবার চেষ্টা করছে! অন্ধকার যেন পাক খাচ্ছে। ধড়ফড় করে নড়ছে!

হঠাৎ ওয়াংফোর আবার মনে হল, পর্দার পিছনে যেন কাঠের কি একটা মড়মড় করে ভেঙে গেল! তারপরেই পর্দাখানা একটু দুলে উঠল! তারপরেই আবার সব নিঃসাড়!

এসব কী কাণ্ড! ওয়াংফো আর বই পড়বার চেষ্টা করলে না। আড়ষ্ট হয়ে পর্দার পানে চেয়ে রইল, খালি চেয়েই রইল—তার চোখে আর পলক পড়ল না।

পর্দাখানা আস্তে আস্তে একটু উপরে উঠল এবং তার পাশ থেকে বেরিয়ে এল একখানা রক্তহীন হলদে হাত! তারপর কি যেন ছায়ার মতো একটা-কিছু বাইরে এসে দাঁড়াল—সে যেন বাতাস দিয়ে গড়া কোনও মূর্তি!

ওয়াংফোর গায়ে তখন কাঁটা দিয়েছে, মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। সে চ্যাঁচাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না—কিন্তু তার হয়ে বাইরে থেকে একটা প্যাঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে রাতের আঁধারকে চিরে যেন ফালাফালা করে দিল!

ধীরে ধীরে সেই বাতাস দিয়ে গড়া মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল! ওয়াংফো তখন দেখলে, পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি।

মূর্তিটা ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

যাত্রীরা পাশাপাশি শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, কে যে এখন তাদের ক্ষুধিত দৃষ্টি দিয়ে দেখছে, সেটা তারা টেরও পেলে না।

মূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। তারপর একজন যাত্রীর মুখের কাছে হেঁট হয়ে পড়ে কি যে করলে, তা কিছুই বোঝা গেল না।

মূর্তি দ্বিতীয় যাত্রীর কাছে এসে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে এবং মুখখানা এক ভয়ানক হাসিতে ভরা!

মূর্তি আবার হেঁট হয়ে পড়ল এবং দ্বিতীয় যাত্রীর টুঁটি কামড়ে ধরল।

ওয়াংফো আর পারলে না, বিকট চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল এবং তীরবেগে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

পথ দিয়ে ওয়াংফো চিৎকারের পর চিৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল—তার সেই কানফাটানো চ্যাঁচানির চোটে গাঁয়ের ঘরে ঘরে সকলকার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু এ রাতে বাইরে এসে কেউ যে তাকে সাহায্য করবে, গাঁয়ের ভিতরে এমন সাহসী লোক কেউ ছিল না।

ছুটতে ছুটতে এবং চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ওয়াংফো একেবারে গাঁয়ের শেষে গিয়ে পড়ল। তারপরেই মাঠ আর জঙ্গল।

দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে একবার পিছন ফিরে চাইলে। দূরের গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে দুটো জ্বল-জ্বলে আগুনের ভাঁটা বেগে এগিয়ে আসছে, ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে!

ওয়াংফো আর একবার খুব জোরে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

চীনদেশে নিয়ম আছে, কেউ মরলে পর ভালো দিন-ক্ষণ না দেখে তার দেহকে কবর দেওয়া হয় না।

গাঁয়ের মোড়লের এক মেয়ে মারা পড়েছিল। কিন্তু ভালো দিন-ক্ষণের অপেক্ষায় তার দেহকে কফিনে পুরে সরাইখানার ঢেঁকিশালে রাখা হয়েছিল। আজ ছয়মাসের ভিতরে ভালো দিন পাওয়া যায়নি।

সরাইখানার কর্তা সকালে উঠে যাত্রীদের খোঁজে ঢেঁকিশালায় গিয়ে দেখে, দুজন যাত্রী মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তাদের গলায় এক-একটা গর্ত, তাদের দেহে এক ফোঁটা রক্ত নেই!

পর্দা তুলে সভয়ে সে দেখলে, যে কফিনে গাঁয়ের মোড়লের মেয়ের মড়া ছিল, তার তালা খোলা, তার ভিতরে মড়া নেই!

তারপর গোলমাল শুনে গাঁয়ের প্রান্তে গিয়ে সে দেখলে, ওয়াংফোর মৃতদেহের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে—মোড়লের মেয়ের মড়া! ওয়াংফোর গলায় একটা গর্ত আর মড়ার মুখে লেগে আছে চাপ চাপ রক্ত!

কী?

লোকে বলত, আটাশ নম্বর হরি বোস স্ট্রিটে যারা বাস করে, তাদের সবাই মানুষ নয়।

আমি কিন্তু মানুষ। এবং ওই মেসবাড়িতে আর যাদের সঙ্গে বাস করছি, তারাও আমারই মতন মানুষ।

এর ওর তার কাছে জিজ্ঞাসা করেও সন্দেহজনক বেশি কিছু জানতে পারিনি। রাত্রে মাঝে মাঝে নাকি কোনও কোনও ঘরের দরজা অকারণে খুলে যায়। সিঁড়ির উপরে কাদের পায়ের শব্দ হয়। অন্ধকারে কারা যেন ফিসফিস করে কথা কয়।

এসব যে ভূতের কীর্তি, মেসের অন্যান্য লোকরাও জোর করে তা বলতে পারলে না। বাজে ভ্রম হতেও পারে, কারণ কেউ চোখে কিছু দেখেনি।

সেদিনটা ছিল মেঘলা। পূর্ণিমাতেও চাঁদ পেয়েছিল ছুটি। বৃষ্টিজল বারবার আকাশের অন্ধকারকে ধুয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু মুছে দিতে পারছিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বসে বসে ভূতের গল্পই হচ্ছিল।

কাহিনীটা রোমাঞ্চকর হলেও নাকি সত্যি—কিন্তু গল্প যিনি বলছিলেন, গল্পের ভূতটাকে তিনি স্বচক্ষে দেখেননি—সচরাচর যা হয়ে থাকে। সত্য ভূতের গল্পই শোনা যায়, কিন্তু সত্য ভূত চোখে কেউ দেখে না।

ভূত সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, কিন্তু ভূতের গল্প শুনলে মনটা কেমন ভারি হয়ে ওঠে। আমি ভূত মানি না। ভূত কখনও দেখিনি, দেখবার আশাও রাখি না। তবু সেদিন রাতে ঘরের আলো নিবিয়ে যখন বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম, তখন বুকের কাছটা কেমন ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করতে লাগল। মনে হল, ঘরের থমথমে অন্ধকার যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক ভয়ে ছমছমে হয়ে আছে।

খাটের উপরে অনেকক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ করলুম, তবু চোখে ঘুম নেই। এমন সময়ে একটা ভয়ানক কাণ্ড হল। ঠিক যেন কড়িকাঠ থেকে আমার বুকের উপরে কি একটা খসে

পড়ল...একটা হাত-পাওয়ালা জীব! দুহাতে সে আমার গলা চেপে ধরলে!...কুকুর নয়, বিড়াল নয়,—কী এটা? মানুষ? কড়িকাঠ থেকে পড়ল মানুষ!

কাপুরুষ নই। কিন্তু তবু আতঙ্কে আঁতকে উঠলুম। দুখানা হাড়-কঠিন হাত আমার গলা টিপে ধরেছে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমিও প্রাণপণে তাকে চেপে ধরলুম। সে আমার গলা ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু ভীষণ বিক্রমে আমার সঙ্গে লড়তে লাগল। কখনও আঁচড়ায়, কখনও কামড়ায়, কখনও আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনুভবে বুঝলুম, জীবটা একেবারে উলঙ্গ!

সবাই জানে, আমি খুব বলবান ব্যক্তি। কিন্তু সেই অজানা জীবটাকে কায়দায় আনতে গিয়ে আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাবার মতো হল। অনেকক্ষণ যোঝাযুঝির পর আমি যখন প্রায় কাবু হয়ে পড়েছি, তখন টের পেলুম যে, সেও ফোঁস ফোঁস করে বেজায় হাঁপাচ্ছে। তখন উৎসাহিত হয়ে আমি দ্বিগুণ বিক্রমে তার বুকের উপরে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে বসলুম।

তারপর এক হাতে তার গলা টিপে আর এক হাতে বেড সুইচটা টিপে দিলুম।

কিন্তু আলো-জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে যা দেখলুম, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না!

এখনও সে মুহূর্তের কথা ভাবলে প্রাণ আমার শিউরে ওঠে!

আলো জ্বেলে বিছানার উপরে আমি কিছুই দেখতে পেলুম না!

কিছুই নেই—কিছুই নেই, তবে আমি কাকে চেপে ধরে আছি? কে আমার সর্বাঙ্গ আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, আমার দু-হাতের ভিতরে এমন ছটফট করছে? এর দেহ তপ্ত, মাংসল, এর হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে, এর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে—অথচ আমার চোখের সামনে কিছুই নেই,—কোনও অস্পষ্ট ছায়া বা ধোঁয়াটে রেখা পর্যন্ত নয়!

এতক্ষণ পরে মহা ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠলুম। একবার নয়, দু-বার নয়,—বার বার! এ ব্যাপারের পর চিৎকার না করে থাকা যায় না।

পাশের ঘরে থাকত আমার বন্ধু মহিম। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এল।

আমার মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, কারণ ঘরে ঢুকেই সে বলে উঠল, 'নবীন, নবীন! ব্যাপার কি? তুমি ও-রকম হয়ে গেছ কেন?'

—'মহিম! কে আমাকে আক্রমণ করেছে—আমি একে চেপে ধরে আছি, কিন্তু আমি একে দেখতে পাচ্ছি না!'

হো হো করে কারা হেসে উঠল! ফিরে দেখি, আমার চিৎকারে মেসের সবাই ঘরের ভিতরে ছুটে এসেছে। আমার কথা শুনে তারাই হাসছে। তারা ঠাউরেছে, আমার মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।

মহিম বললে, 'নবীন, আজ কি তুমি সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু খেয়েছ?'

আমি সকাতরে বললুম, 'দোহাই তোমার, আমার কথায় বিশ্বাস করো! দেখছ না, আমার গা দিয়ে রক্ত ঝরছে? দেখছ না, এর ধাক্কায়, আমার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে?...আচ্ছা, এতেও যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে তুমি নিজেই এদিকে এসো। এর গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো!'

মহিম এগিয়ে এল। তারপর আমার নির্দেশ অনুসারে এক জায়গায় হাত দিয়েই তীব্র চিৎকার করে উঠল। মহিম ওকে ছুঁয়েছে!

আমি যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বললুম, 'মহিম, আমি আর একে রাখতে পারছি না। ওর জোর যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ঘরের ওই কোণে একগাছা দড়ি পড়ে আছে। শিগগির দড়িগাছা নিয়ে এসো,—আমাকে সাহায্য করো!'

মহিম আর আমি দড়ি দিয়ে সেই অদৃশ্য জীবটাকে বাঁধতে লাগলুম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—শূন্যতার চারিদিকে দড়ি জড়ানো!

ঘরের ভিতরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভাবলে আমরা কোনও কৌতুক-অভিনয় করছি।

বাড়িওয়ালা বললে, 'এই পাগলামি দেখবার জন্যে কি তোমরা রাত দুটোর সময়ে আমাদের ঘুম ভাঙালে?'

আমি রেগে বললুম, 'পাগলামি? যার খুশি হয় এসে এর গায়ে হাত দিয়ে দেখুক না!'

কিন্তু সে পরীক্ষাতেও কেউ রাজি হল না। তবু তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করলে না। বাড়িওয়ালা বললে, 'জ্যান্ত জীব, অথচ দেখা যায় না, এ কেমন গাঁজাখুরি কথা!'

আমি আর মহিম তখন একসঙ্গে দড়ি ধরে সেই অদৃশ্য জীবটাকে টেনে তুললুম। তারপর দু-একবার তাকে শূন্যে দুলিয়ে দড়িগাছা ছেড়ে দিলুম, একটা ভারি জিনিস পড়লে যেমন হয়,—ধপাস করে একটা শব্দ হল, বালিশ ও বিছানার মাঝখানটা নেমে গেল এবং খাটের কাঠ মচমচ করে আর্তনাদ করে উঠল!

পরমুহূর্তে ঘরের ভিতরে আর জনপ্রাণী রইল না—বিষম ভয়ে সকলেই হুড়মুড় করে বেগে পলায়ন করল!

বিছানার উপরে পড়ে সে ছটফট করছে আর তার ছটফটানির চোটে বিছানার চাদরখানা কুঁচকে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

মহিম বললে, 'নবীন, এ দৃশ্য চোখে দেখতেও আমার ভয় হচ্ছে!'

—'আমারও।'

—'কিন্তু ব্যাপারটা যে একেবারেই ধারণাতীত, তাও বলতে পারি না।'

—'তুমি কী বলছ হে? এর চেয়ে ধারণাতীত ব্যাপার আর কি হতে পারে? পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটেছে?'

—'আচ্ছা, ভালো করে ভেবে দ্যাখো। আমাদের সামনে একটা বস্তু রয়েছে, অথচ আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। বাতাসকেও আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তাকে আমরা ছুঁতে পারি। বাতাসের অস্তিত্ব কি আমরা অস্বীকার করি?'

—'কিন্তু এ যে জীবন্ত! এর বুকে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করবে!'

—'নবীন, তুমি প্রেতচক্রের কথা শুনেছ তো? সেখানে এমন সব প্রেতের আবির্ভাব হয়, যাদের দেখা যায় না, কিন্তু ছোঁয়া যায়!'

—'মহিম, মহিম! তুমি কি তবে বলতে চাও, আমরা একটা প্রেতকে গ্রেপ্তার করেছি?'

—'আমি এখন কিছুই বলতে চাই না। তবে ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত না দেখে আমি ছাড়ব না। দ্যাখো, বিছানা আর তোলপাড় হচ্ছে না। নিঃশ্বাসের শব্দও হচ্ছে আস্তে আস্তে। বন্দী বোধহয় ঘুমোচ্ছে!'

সে রাত্রে কিন্তু আর আমাদের ঘুম হল না—এর পরেও কি কারুর চোখে ঘুম আসে?

...পরদিন সকালবেলায় আমাদের মেসবাড়ির সামনে শহর যেন ভেঙে পড়ল। সকলেরই মুখে এক জিজ্ঞাসা—যাকে আমরা পাকড়াও করেছি, সেটা কী? কিন্তু যা কিছু প্রশ্ন হচ্ছে, সবই ঘরের বাইরে থেকে, ঘরের ভিতরে ভরসা করে কেউ পা বাড়াচ্ছে না।

তার আকার কি রকম সেটা জানবার জন্যে মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। সাবধানে (পাছে কামড়ে দেয়) তার গায়ে হাত বুলিয়ে যা বুঝেছি—মানুষের মতো; নাক, চোখ, মুখ; মাথায় চুল নেই; হাত আর পা-ও মানুষের মতো; লম্বায় তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকের মতো।

পরের দিন সন্ধ্যার আগেই মেসের সমস্ত ভাড়াটে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়ল।

বাড়িওয়ালা এসে বললে, 'ও আপদকে আমার বাড়িতে আমি রাখব না। তোমরা যদি রাখতে চাও তো আমি তোমাদের নামে নালিশ করব।'

আমি বললুম, 'ইচ্ছে করলেই তুমি একে বিদায় করতে পারো। আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

কিন্তু তাকে বিদায় করতে রাজি আছে টাকার লোভ দেখিয়েও এমন লোক খুঁজে পাওয়া গেল না।

সেইখানে বন্দী হয়ে সে দিনের পর দিন ধড়ফড় করতে লাগল!

হপ্তাখানেক পরে মহিম একদিন হঠাৎ বললে, 'আমাদের বন্দীর চেহারা কি রকম তা জানবার এক উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।'

—'কি, কী উপায়?'

—'ওর দেহ যখন স্পর্শ করা যায়, তখন প্যারিস-প্লাস্টার দিয়ে অনায়াসেই ওর ছাঁচ তোলা চলবে।'

—'ঠিক বলেছ? কিন্তু সে সময়ে ও যদি ছটফট করে, তাহলে তো ছাঁচ উঠবে না।'

—'নবীন, তুমি তো ডাক্তারি শিখছ। ওকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে তুমি তো খুব সহজেই অজ্ঞান করে ফেলতে পারো। তাহলে ছাঁচ তুলতে আর কিছুই বাধা হবে না।'

মহিমের বুদ্ধি খুব সাফ। তারই কথামতো কাজ করা গেল। ছাঁচও উঠল।

উঃ সে কী বিদকুটে চেহারা! মানুষের মতন গড়ন বটে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর মূর্তি! চোখ দুটো গোল ভাঁটার মতো, নাকটা ছুঁচালো ও বাঁকা, ঠোঁট পুরু পুরু ও উল্টানো, দাঁতগুলো বড়ো বড়ো, হিংস্র জানোয়ারের মতো—ঠিক যেন পিশাচের মুখ, যেন মানুষের রক্ত-মাংস খাওয়াই তার অভ্যাস!

...এখন এই ভয়াবহ জীবকে নিয়ে কি করা যায়? একে বাড়ির ভিতরে রাখাও চলবে না, ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। ছাড়া পেলে এ পৃথিবীর কত মানুষের ঘাড় মটকাবে, তা কে বলতে

পারে? তবে কি করব আমরা? একে হত্যা করে সকল আপদ বিপদ চুকিয়ে দেব? না, তাও সম্ভব নয়। এর গড়ন যে মানুষের মতো!

প্রতিদিনই এইসব কথা আমাদের মনে হয়।

সেই অদ্ভুত অদৃশ্য জীবের খাদ্য যে কি, তাও বোঝা গেল না। সকলরকম খাবারই তার সামনে রেখে দিই, কিন্তু সে কিছুই ছোঁয় না।

পনেরো দিন কেটে গেল, তবু অনাহারে সে মরল না। তখনও ছাড়ান পাবার জন্যে সে গড়াগড়ি দিয়ে ও ছটফট করে সারা বিছানা তোলপাড় করে তুলছে!

কিন্তু তারপরে ধীরে ধীরে তার ছটফটানি কমে এল।

বিশদিন পরে দেখা গেল, তার হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে গেছে। হাত দিয়ে বুঝলুম তার দেহ কঠিন, আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা। সে মরেছে। কিন্তু কি সে? একি সেই অদৃশ্য জগতের কেউ, যে জগতের বাসিন্দারা মানুষকে রাত্রে এসে ভয় দেখায় এবং আমরা যাদের প্রেত বলে মনে করি?

ওলাইতলার বাগানবাড়ি

স্টেশনমাস্টার তাঁর লণ্ঠনটা আমার মুখের সামনে তুলে ধরলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'ওলাইতলার বাগানবাড়ি...আপনিও ওলাইতলার বাগানবাড়িতে যাচ্ছেন?...কিন্তু, কেন?'

—'মামুদপুরের জমিদার কৃতান্ত চৌধুরী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁর একজন ম্যানেজার দরকার।'

—'তিনশো টাকা মাহিনা। কেমন, তাই নয় কি?'

—'হুঁ।'

—'তারাও এই কথা বলেছিল।'

—'কারা!'

—'আপনার আগে যারা ম্যানেজারি করতে এসেছিল। গেল আট হপ্তায় আটজন লোক এই ইস্টিশানে নেমে ওলাইতলার বাগানবাড়িতে গেছে। কিন্তু তারা কেউ আর এ পথ দিয়ে ফেরেনি।...বুঝলেন মশাই? তারা কেউ আর ফেরেনি!'

—'তার মানে?'

—'মানেটানে জানিনে। প্রত্যেকেই এসেছে আপনার মতো ঠিক শনিবারেই। আর ঠিক সন্ধ্যা ছয়টার গাড়িতে।...আশ্চর্য কথা! আট হপ্তায় আট জন! জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কত ম্যানেজার দরকার?'

আমার মনটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল। শুধালুম, 'আচ্ছা, এই জমিদারবাবুকে আপনি চেনেন?'

—'উঁহু। তবে তাঁর নাম শুনেছি। অল্পদিন হল এখানে এসে ওই পোড়ো বাগানবাড়িখানা কিনে তিনি বাস করছেন। তাঁর সম্বন্ধে নানান কানাঘুষো শুনছি। আজ পর্যন্ত গাঁয়ের কেউ তাঁকে

দেখেনি। দিনেরবেলায় ওই বাগানবাড়িখানা পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে থাকে। কেবল রাত্রেই তার ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। লোকজনকেও দেখা যায় না। ও বাড়ির সবই অদ্ভুত!'

আজ অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ উঠবে না, তার উপরে মেঘের পর মেঘ জমে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে বুঝলুম বৃষ্টি আসতে আর দেরি নেই। সঙ্গে আমার শখের বুলডগ রোভার ছিল। ওলাইতলার বাগানবাড়ির দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করলুম। স্টেশনমাস্টারের কথায় কান পাতবার দরকার নেই—লোকটার মাথায় বোধহয় ছিট আছে, নইলে এমন সব আজগুবি কথা বলে?

স্টেশনমাস্টার ডেকে বললেন, 'মশাই তাহলে নিতান্তই যাবেন?'

—'সেই রকম তো মনে করছি।'

—'তাহলে পথঘাট একটু দেখে শুনে যাবেন। ওলাইতলার বাগানবাড়ির ঠিক আগেই একটা গোরস্থান আছে, আগে সেখানে ক্রিশ্চানদের গোর দেওয়া হত। গোরস্থানের নাম ভারি খারাপ, সন্ধ্যার পর সেদিকে কেউ যেতে চায় না।'

আমি আর থাকতে পারলুম না, বললুম, 'মশাই, মিথ্যে আমায় ভয় দেখাচ্ছেন, আমি কাপুরুষ নই। দরকার হলে ওই গোরস্থানে শুয়েই রাত কাটাতে পারি।'

অত্যন্ত দয়ার পাত্রের দিকে লোকে যেমনভাবে তাকায়, সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে স্টেশনমাস্টার একটুখানি ম্লান হাসি হাসলেন, কিন্তু মুখে আর কিছু বললেন না।

দামোদর নদের ধারে ওলাইতলার সেই প্রকাণ্ড বাগান ও প্রকাণ্ড বাড়ি।

মাইলখানেক পথ চলার পর যখন তার ফটকের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। দেউড়িতে দ্বারবানের কোনও সাড়া না পেয়ে, ফটক ঠেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

আমার হাতে ছিল একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন, তারই আলোতে যতটা পারা যায় দেখতে দেখতে এগুতে লাগলুম। অনেককালের পুরানো বাগান, তার অবস্থা এমন যে তাকে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই উচিত।

পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম, পানায় তার জল নজরে পড়ে না, ঘাটগুলোও ভেঙে গিয়েছে। বাড়িখানার অবস্থাও তথৈবচ। ভাঙা জানালা, ভাঙা থাম, চুন-বালি সব খসে পড়েছে।

যে জমিদার তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রাখবেন, এইখানে তাঁর বাস! মনে খটকা লাগল।

অসংখ্য ঝিঁঝিঁ পোকার আর্তনাদ ছাড়া কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই—অথচ বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। একটু ইতস্তত করে চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'বাড়িতে কে আছেন?'

সামনের ঘর থেকে মোটা গলায় সাড়া এল, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভিতরে ঢুকলুম। মস্ত বড়ো ঘর, কিন্তু কোণে কোণে মাকড়সার জাল, দেয়ালে দেয়ালে কালিঝুলি, মেঝেয় এক ইঞ্চি পুরু ধুলো। একটা ময়লা রংওঠা টেবিল, তিনখানা ভাঙা চেয়ার ও একটা খুব বড়ো ল্যাম্প ছাড়া ঘরে আর কোনও আসবাব নেই।

অতিশয় শীর্ণ কুচকুচে কালো এক জরাজীর্ণ বুড়ো লোক আদুড় গায়ে একখানা চেয়ারের উপরে বসে আছে। তার বুকের সব কখানা হাড় গোনা যায়।

বুড়ো কথা কইলে, ঠিক যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে তার গলার আওয়াজ বেরুল। সে বললে, 'আপনি কাকে চান?'

—'জমিদার কৃতান্তবাবুকে।'

—'ও নাম আমারই। আপনার কি দরকার?'

—'আপনি একজন ম্যানেজার খুঁজছেন, তাই—'

—'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। বসুন।'

কৃতান্তবাবুর কাছে গিয়েই রোভার হঠাৎ গরর-গরর করে গর্জে উঠল।

কৃতান্তবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ও কী! সঙ্গে কুকুর এনেছেন কেন? কামড়াবে নাকি!'

রোভারকে এক ধমক দিলুম। সে গর্জন বন্ধ করলে বটে, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অনেক তফাতে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে কৃতান্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

বিরক্তভাবে কৃতান্তবাবু বললেন, 'ও কুকুর-টুকুর এখানে থাকলে চলবে না। ওকে তাড়িয়ে দিন।'

আমি বললুম, 'তাড়ালেও ও যাবে না। রোভার আমাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকে না, রাত্রেও আমার সঙ্গে ঘুমোয়।'

—'রাত্রেও ও বেটা আপনার সঙ্গে ঘুমোয়? কি বিপদ, কি বিপদ!' বলে তিনি চিন্তিত মুখে ভাবতে লাগলেন।

রোভার রাত্রে আমার সঙ্গে ঘুমোবে শুনে কৃতান্তবাবুর এতটা দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারলুম না।

খানিকক্ষণ পরে কৃতান্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটু বসুন। আপনার খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা করে আসি।'

—'সে জন্যে আপনার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আগে যে জন্যে এসেছি সেই কথাই হোক।'

—'আজ আমার শরীরটা ভালো নেই। কথাবার্তা সব কাল সকালেই হবে।' এই বলে কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরেই তিনি আবার ফিরে এসে বললেন, 'আসুন, সব প্রস্তুত।'

তাঁর পিছনে পিছনে অগ্রসর হলুম। মস্ত উঠান ও অনেকগুলো সারবন্দী ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে উঠলুম। বাড়ির সর্বত্রই সমান ভগ্নদশা, ধুলো আর জঞ্জালের স্তূপ, চামচিকে আর বাদুড়ের আনাগোনা। একটা চাকর-বাকর পর্যন্ত দেখা গেল না। নির্জন বাড়ি যেন খাঁ-খাঁ করছে।

একটা ছোটো ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। যে ঘরখানা খুব বেশি নোংরা নয়। একপাশে ছোটো একখানা চৌকি, তার উপরে বিছানা পাতা। আর একপাশে থালায় খাবার সাজানো রয়েছে।

কৃতান্তবাবু বললেন, 'এখনই খেয়ে নিন, নইলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

নানান কথা ভাবতে ভাবতে মাথা হেঁট করে খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, কৃতান্তবাবু একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছেন আর তাঁর কোটরাগত দুই চক্ষুর ভিতর থেকে যেন দু-দুটো অগ্নিশিখা জ্বলছে! আমি মুখ তুলে তাকাতে-না-তাকাতেই সে আগুন নিবে গেল। মানুষের চোখ যে তেমন জ্বলতে পারে, আমি তা জানতুম না। ভয়ানক!

কৃতান্তবাবু বললেন, 'আজ তাহলে আমি আসি। খেয়ে-দেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন।' বলে যেতে যেতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'আর দেখুন রাত্রে এ ঘরের জানলাগুলো যেন খুলবেন না। একে তো বৃষ্টি হচ্ছে, তার উপরে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন।

—'থামলেন কেন, কি বলছিলেন বলুন না।'

—'ওধারের জানলা খুললে গোরস্থান দেখা যায়।'

—'তা দেখা গেলেই বা!'

—'সেখানে হয় তো এমন কিছু দেখতে বা এমন সব গোলমাল শুনতে পাবেন, রাত্রে মানুষ যা দেখতে কি শুনতে চায় না।'

আমি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলুম।

কৃতান্তবাবু বললেন,—হ্যাঁ, আর এক কথা। আপনার ওই বিশ্রী বুলডগটাকে বেঁধে রাখবেন। কুকুর অপবিত্র জীব, রাত্রে ও যে বিছানায় গিয়ে উঠবে এটা আমি পছন্দ করি না। বুঝলেন—'

'আচ্ছা।'

কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিনি। রাত্রে রোভার বিছানার উপরে আমার সঙ্গেই শুয়েছিল।

অনেক রাতে দারুণ যাতনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে আমার গলা টিপে ধরেছে! দুখানা লোহার মতন শক্ত হাত আমার গলার উপরে ক্রমেই বেশি জোর করে চেপে বসতে লাগল!

প্রাণ যখন যায়-যায়, আচম্বিতে আমার গলার উপর থেকে সেই মারাত্মক হাতের বাঁধন আলগা হয়ে খুলে গেল। তারপরেই ঘরময় খুব একটা ঝটাপটি ও হুড়োহুড়ির শব্দ! কিন্তু তখন সেদিকে মন দেবার সময় আমার ছিল না, গলা টিপুনির ব্যথায় তখন আমি ছটফট করছি।

ব্যথা যখন একটু কমল, ঘর তখন স্তব্ধ। তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম আলোটা নিবে গিয়েছিল, আবার জ্বাললুম। কিন্তু যে আমার গলা টিপে ধরেছিল ঘরের ভিতরে সেও নেই, বিছানার উপরে রোভারও নেই!

'রোভার' 'রোভার' বলে অনেকবার ডাকলুম, কিন্তু তার কোনও সাড়া পেলুম না।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত একটা বেজে গেছে।

দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর তাকিয়ে দেখলুম, অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। সে অন্ধকার দেখলেই প্রাণ কেমন করে ওঠে! সে অন্ধকার যেন জ্যান্ত কোনও হিংস্র জন্তুর মতন আমার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। চট করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলুম।

ঘরের এ দরজাটা আগেই বন্ধ করে শুয়েছিলুম। কিন্তু যে আমাকে আক্রমণ করেছিল, সে তাহলে কোন পথ দিয়ে এ ঘরে ঢুকেছিল?

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, ঘরের ভিতরে আর একটা দরজা আবিষ্কার করলুম,—ঠেলতেই সেটা খুলে গেল এবং ভক করে বিষম একটা দুর্গন্ধ এসে আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিলে।

আলোটা তুলে ভালো করে দেখলুম। সে কী ভীষণ দৃশ্য! ঘরের মেঝেতে রাশি রাশি হাড়, মড়ার মাথার খুলি ও রক্তমাখা কাঁচা নাড়ি-ভুঁড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে! একদিকে একটা কাঁচা মড়ার মুণ্ডুও মাটির উপরে হাঁ করে রয়েছে!

দুম করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলুম। এ আমি কোন পিশাচের খপ্পরে এসে পড়েছি? আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল—তাড়াতাড়ি ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলুম।

বাইরে আকাশভরা অন্ধকারকে ভিজিয়ে হুড়হুড় করে বৃষ্টি পড়ছে আর চকচক করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর বোঁ বোঁ করে ঝোড়ো হাওয়া ছুটছে।

আর, ও কী! বিদ্যুতের আলোতে বেশ দেখা গেল, সামনের তালগাছটার তলায় কে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে! ঠিক যেন একটা যেন ছোটো ল্যাংটো ছেলে! সে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে আর গান গাইছে—

ধিনতাধিনা পচা নোনা,
হাড়-ভাতে-ভাত চড়িয়ে দে না!
চোষ না হাড়ের চুষিকাঠি,
রক্ত চেঁচেপুছে নে না!
মামদো মিয়া সেঁওড়া গাছে
মড়ার মাথায় উকুন বাছে,
পেত্নীদিদি একলা নাচে,
তানানানা, দিম-দেরেনা!
গুবরেপোকার চাটনি খেয়ে,
শাঁকচুন্নি আসছে ধেয়ে,
কন্ধকাটার পানে চেয়ে
মুখখানা তার যায় না চেনা!
হাড় খাব আর মাংস খাব,
চামড়া নিয়ে ঢোল বাজাব,
দাঁতের মালায় বউ সাজাব
নইলে যে ভাই, মন মানে না!
ঠ্যাং তুলে ওই গো-ভূত ছোটে,
গোর থেকে বাপ, হুমড়ো ওঠে,
চোখ দিয়ে তার আগুন ফোটে,
এই বেলা চল, লম্বা দে না!

গান হঠাৎ থেমে গেল। আবার বিদ্যুৎ চমকালো, কিন্তু ছোঁড়াটাকে আর তালতলায় দেখতে পেলুম না। কে এ? গাঁয়ের কোনও ঘরহারা পাগলা ছেলে নয় তো? তাই হবে! কিন্তু সে বেয়াড়া গান থামলে কি হয়, চারিদিককার সেই আঁধারসমুদ্র মথিত করে আরও কত রকমের আওয়াজই যে ঝোড়ো হাওয়ার প্রলাপের সঙ্গে ভেসে আসছে!

কখনও মনে হয়, একদল আঁতুড়ের শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে! কখনও শুনি, আড়াল থেকে কে খিলখিল খিলখিল করে হাসছে! মাঝে মাঝে কে যেন ঝমঝম করে মল বাজিয়ে যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে! থেকে থেকে এক-একটা আলেয়া আনাগোনা করছে, তাদের আশেপাশে কারা যেন ছায়ার মতো সরে সরে যাচ্ছে এবং বাগানের কোথা থেকে একটা হুলো বেড়াল একবারও না থেমে কেবল চ্যাঁচাচ্ছে ম্যাও ম্যাও।...আজ কি এখানে রাজ্যের ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা এসে জড়ো হয়েছে, না, ভয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,—যা দেখছি, যা শুনছি সমস্তই অলীক কল্পনা!

অ্যাঁ! ও আবার কে? ঘরের দরজা কে ঠেলছে?

আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠলো—জানি না, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে কোন বিকট বীভৎস মূর্তি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!

আবার কে দরজা ঠেললে। আমার সমস্ত দেহ যেন পাথর হয়ে গেল!

তারপরে আবার দরজার উপরে ঘন ঘন ঠেলা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে কুকুরের ডাক। আঃ, রক্ষে পাই! এ যে আমার রোভারের ডাক!

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই রোভার এসে একলাফে আমার বুকের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই নির্বান্ধব ভূতুড়ে পুরীতে রোভারকে পেয়ে মনে হল, তার চেয়ে বড়ো আত্মীয় এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।

হঠাৎ রোভারের মুখের দিকে আমার চোখ পড়ল। তার মুখময় রক্ত লেগে রয়েছে! অবাক হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে বাইরের বাগান থেকে অনেক লোকের গলা পেলুম।

জানলার ধারে গিয়ে দেখি ছয়-সাতটা লণ্ঠন নিয়ে চৌদ্দ-পনেরো জন লোক বাড়ির দিকেই আসছে। তাদের পোশাক দেখেই বুঝলুম, তারা পুলিশের লোক। এবং তাদের ভিতরে সেই স্টেশনমাস্টারকেও যখন দেখলুম, তখন আর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, থানায় খবর দিয়েছেন তিনিই। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

পুলিশের লোকেরা সিঁড়ির তলাতেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে গোলমাল করছিল।

ব্যাপার কি? ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম, জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কুচকুচে কালো ও লিকলিকে রোগা হাড়-বের-করা দেহটা সিঁড়ির তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে! তাঁর চোখ দুটো কপালে উঠেছে এবং সে চোখ দেখলেই বোঝা যায়, কৃতান্তবাবু আর ইহলোকে বর্তমান নেই। এবং কৃতান্তবাবুর গলদেশে মস্ত একটা গর্ত, তার ভিতর থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে।

এতক্ষণে বুঝলুম, রোভারের মুখে রক্ত লেগেছে কেন?...তাহলে এই কৃতান্ত চৌধুরীই আমাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল, তারপর রোভার তার টুঁটি কামড়ে ধরে এ যাত্রার মতো তার সব লীলাখেলা শেষ করে দিয়েছে!...

স্টেশনমাস্টার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'কিন্তু এ কি অসম্ভব কাণ্ড!'

ইনস্পেক্টর বললেন, 'আপনি কি বলছেন?'

স্টেশনমাস্টার কৃতান্ত চৌধুরীর মৃতদেহের উপরে ঝুঁকে পড়ে ভালো করে তার মুখখানা দেখে বললেন, 'না, কোনই সন্দেহ নেই। এ হচ্ছে এ গাঁয়ের ভুবন বসুর লাশ। ঠিক আড়াই মাস আগে ভুবন বসু কলেরায় মারা পড়েছে। কিন্তু তার দেহ দাহ করা হয়নি। কারণ তার লাশ চুরি গিয়েছিল।'

বাঁদরের পা

অবনীবাবু বলেছিলেন, 'আগ্রা থেকে আমি ফতেপুর সিক্রিতে বেড়াতে গিয়েছি, সেই সময়ে এক ফকির এটা আমাকে দেয়। জিনিসটা আর কিছুই নয়—বাঁদরের একখানা পা।'

সুরেনবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাঁদরের পা! সে আবার কি?'

অবনীবাবু বললেন, 'বিশেষ কিছু নয়, বাঁদরের একখানা শুকনো পা। মিশরের লোকেরা যে উপায়ে মানুষের মরা দেহকে শুকিয়ে রাখে, সেইরকম কোনও উপায়েই এই বাঁদরের পা-খানাকে শুকিয়ে রাখা হয়েছে,—এই দেখুন,' বলে তিনি পকেটের ভেতর থেকে একটা জিনিস বার করে দেখালেন।

সুরেনবাবুর স্ত্রী সুরমা কার্পেট বুনতে বুনতে মুখ তুলে শিউরে উঠে বললেন, 'মাগো, ওটাকে আপনি আবার পকেটে পুরে রেখেছেন? আপনার ঘেন্না করে না?'

সুরেনবাবু শুধোলেন, 'এর গুণ কি?'

অবনীবাবু বললেন, 'এর মহিমায় তিনজন লোকের তিনটি করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।'

—'বলেন কি? এও কি সম্ভব?'

—'হ্যাঁ। প্রথম এক ব্যক্তি এই জিনিসটির গুণ পরীক্ষা করেছিল। তার প্রথম দুটি ইচ্ছার কথা জানি না, কিন্তু তৃতীয় বারে সে মরতে চেয়েছিল। তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।'

—'কি ভয়ানক! আর কেউ এর গুণ পরীক্ষা করেছে?'

অবনীবাবু একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি করেছি। কিন্তু পরীক্ষা করে এইটুকুই বুঝেছি যে, অদৃষ্টে যা আছে তা ঘটবেই। নিয়তির বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না। তাই এই জিনিসটাকে আজ আমি গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।'

সুরেনবাবু বললেন, 'সে কি কথা। আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো বলতে হবে যে, এর শক্তি এখনও ফুরোয়নি! এখনও আর একজন লোক এর কাছে তিনটি ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে!'

—'তা পারে।'

—'তাহলে ওটা আমাকে দিন না কেন?'

অবনীবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'বলেন কি সুরেনবাবু? আমি আপনার বন্ধু হয়ে এমন শত্রুর কাজ করতে পারব না!'

—'কেন?'

—'আপনি জানেন না, এ হচ্ছে কি সাংঘাতিক জিনিস! একে পরীক্ষা করা মানে হচ্ছে, অমঙ্গলকে ডেকে আনা।'

সুরেনবাবু সকৌতুকে হেসে বললেন, 'আমি এসব গাঁজাখুরি কথা বিশ্বাসই করি না! তবু দেখাই যাক না, আপনার রূপকথার ভিতরে কতটুকু সত্য আছে। ওটাকে গঙ্গায় ফেলে না দিয়ে আমার হাতেই দিয়ে যান।'

অবনীবাবু বললেন, 'বেশ, আপনার কথাই থাকুক। কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়, তাহলে শেষটা আমাকে যেন দুষবেন না। এই নিন—'

সুরমা বললেন, 'হ্যাঁগো, এ যেন আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের প্রদীপের গল্প! তোমার বন্ধুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

সুরেনবাবু বললেন, 'আমারও তাই বিশ্বাস। তবু মজাটা একবার দেখাই যাক না। প্রথমে কি ইচ্ছা প্রকার করি, বলো তো?'

সুরমা বললেন, 'আমাদের তো কোনই অভাব নেই! ছেলের ভালো চাকরি হয়েছে, তুমি পেনশন পাচ্ছ, আমরা তো সুখেই আছি। তবে হ্যাঁ, আমার একটি ইচ্ছা আছে বটে, আমাদের বাড়িখানা অনেকদিন মেরামত হয়নি, আর বাগানের দিকে খান-তিনেক ঘর তৈরি করলে ভালো হয়। এজন্যে হাজার পাঁচেক টাকার দরকার।'

সুরেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন, 'হাজার পাঁচেক টাকা দরকার? তা আবার ভাবনা কি, এখনই তোমাকে দিচ্ছি।'—বলেই তিনি বাঁদরের সেই শুকনো পা-খানাকে হাতের উপরে রেখে বললেন, 'আমাদের হাজার পাঁচেক টাকা দরকার।—বুঝেছ, পাঁচ হাজার টাকা!' তারপরেই তিনি আর্তনাদ করে বাঁদরের পা-খানেক টেবিলের উপরে ফেলে দিলেন।

সুরমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি! অমন করে উঠলে কেন?'

সুরেনবাবু সভয়ে বললেন, 'আমার ঠিক মনে হল, বাঁদরের ঐ পা-খানা আমার হাতের ভিতরে নড়ে উঠল।'

সুরমা বললেন, 'ও তোমার মনের ভুল। চলো, রাত হল,—এখানে বসে আর পাগলামি করে না, খাবে চলো।'

সেই রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুরেনবাবু স্বপ্নে দেখলেন, একটা বাঁদর যেন তাঁর পাশে শুয়ে আছে। তিনি তাড়া দিতেই সে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল। সুরেনবাবু দেখলে, তার একখানা পা নেই!

পরদিন সকালবেলায় চা পান করতে বসে সুরেনবাবু সুরমার কাছে কালকের রাতের স্বপ্নের কথা বলছিলেন।

সুরমা হেসে বললেন, 'কিন্তু আজ ঘুম থেকে উঠে তুমি বিছানাটা ভালো করে খুঁজে দেখেছ তো? বাঁদরটা হয়তো আমাদের টাকা দিতে—' বলতে বলতে থেমে পড়ে সুরমা চমকে উঠে সন্ত্রস্ত স্বরে বললেন—'দ্যাখো, দ্যাখো!'

বাগানের একটা বটগাছের ঘন পাতার ভিতর থেকে একটা বানর মুখ বাড়িয়ে বসে আছে!

সুরেনবাবু সহজভাবেই বললেন, 'পাড়ার ঘোষেদের বাড়িতে দুটো বাঁদর আছে জানো না? একটা কোনগতিকে পালিয়ে এসেছে আর কি!'

বানরের মুখখানা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুরমা বললেন, 'আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে!'

সুরেনবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ডাকপিওনের গলা পাওয়া গেল—'রেজিস্টারি চিঠি আছে বাবু।'

সুরেনবাবু নিচে গিয়ে সই করে চিঠি নিয়ে এলেন। খামের উপরটা দেখেই তিনি বুঝলেন, চিঠিখানা এসেছে রেলঅফিস থেকে। তাঁর পুত্র অমিয়কুমার রেলঅফিসের একজন বড়ো অফিসার।

চিঠির বক্তব্য এই ঃ

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পুত্র অমিয়কুমার সেন রেলের কোনও কাজে হাজারিবাগে গিয়েছিলেন। সেখানে জঙ্গলে পাখি শিকার করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এক ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হয়েছেন। অনেক অন্বেষণ করেও তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

রেলের প্রভিডেন্ট ফন্ডে আপনার পুত্রের পাঁচ হাজার টাকা জমা হয়েছে। এই টাকা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

সুরেনবাবু পাগলের মতন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'পাঁচ হাজার টাকা! পাঁচ হাজার টাকা!'—বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

একমাস কেটে গেছে।

গভীর রাত্রি। সুরেনবাবু আর সুরমা পাথরের মূর্তির মতন বসে আছেন, তাঁদের চোখে ঘুম নেই।

অমাবস্যার রাত,—আকাশ অন্ধকার। বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলো দমকা হাওয়ায় যেন কেঁদে কেঁদে উঠছিল।

হঠাৎ সুরমা বলে উঠলেন, 'ওগো! সেই বাঁদরের পা-টা কোথায় গেল?'

বাঁদরের পায়ের কথা সুরেনবাবু একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেইখানেই সেটা পড়ে রয়েছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'ওই যে! কিন্তু ওর কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

সুরমা বললেন, 'ওর কাছে এখনও তুমি দুটো ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারো।'

সুরেনবাবু বললেন, 'না, না। আর কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করবার দরকার নেই। ওসব বাজে আজগুবি ব্যাপার।'

সুরমা বললেন, 'না, না—আমি আমার ছেলেকে দেখতে চাই!'

সুরেনবাবু বললেন, 'কি তুমি আবোল-তাবোল বকছ? কোথায় আমাদের অমিয়? বেঁচে থাকলে সে আপনিই আসত!'

সুরমা মাথা নেড়ে বললেন, 'না, না, না। আমি তাকে দেখবই,—তুমি ইচ্ছা করলে সে এখনই আসবে।'

সুরেনবাবু বললেন, 'শোকে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার প্রথম ইচ্ছাটা ফলেছে দৈবগতিকে, বাঁদরের পায়ের জন্য নয়। ওর কোনও গুণ নেই, অসম্ভব কখনও সম্ভব হয় না!'

সুরমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তাহলে তুমি আমার কথা রাখবে না? আমার অমিয়কে দেখাবে না?'

সুরেনবাবু নাচার হয়ে বললেন, 'বেশ, তুমি যখন কিছুতেই বুঝবে না, তখন কি আর করি বলো!'—এই বলে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে বাঁদরের পা-টা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি আমার ছেলে অমিয়কে দেখতে চাই।'

বাইরে একটা প্যাঁচার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া গোঁ গোঁ করে উঠল।

একটি টিকটিকি দেয়ালের উপরে টিকটিক করে ডাকলে।

তারপর সব স্তব্ধ।

সুরেনবাবু বললেন, 'দেখলে তো, ও বাঁদরের পায়ের কোনও গুণই নেই! আমি এখন শুতে যাই, তুমিও এসো।'

সুরেনবাবু দুই পা অগ্রসর হলেন—সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজাটা দুম করে খুলে যাবার শব্দ হল।

সুরমা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'ও কে দরজা খুললে?'

সুরেনবাবু বিবর্ণ মুখে বললেন, 'ও কেউ নয়। ঝোড়ো হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেছে।'

সুরমা বললেন, 'না গো, না—আমার অমিয় আসছে, আমার অমিয় আসছে! আমি তার পায়ের আওয়াজ চিনি, সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনছ না?'—বলতে বলতে তিনি ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সুরেনবাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাঠের সিঁড়ির উপরে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে বটে। হয়তো, ও শব্দটা করছে তাঁর প্রকাণ্ড কুকুরটা।....কিন্তু যদি তা না হয়? যদি সত্যই অমিয় আসে? তাহলে সে কী মূর্তিতে আসবে? বাঘের আক্রমণে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত মুণ্ডহীন, রক্তাক্ত দেহ—

সুরেনবাবু আর ভাবতে পারলন না। শিউরে উঠে টেবিলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁদরের পা-টা আবার তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর তৃতীয় বা শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, 'আমার ছেলে অমিয়কে আর আমি দেখতে চাই না!'

সিঁড়ির উপরে আর শব্দ শোনা গেল না।

খানিক পরে সুরমা নিরাশ মুখে ঘরে ফিরে এলেন।

সুরেনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কি দেখলে?'

শ্রান্তভাবে চেয়ারের উপরে বসে পড়ে সুরমা বললেন, 'বাইরে কেউ নেই। কিন্তু সদর দরজাটা খোলা!'

বাদলার গল্প

রম-ঝম রম-ঝম! বৃষ্টি থামবার আর নাম নেই।

সন্ধে হয়-হয়। আমার বাড়ির বারান্দায় আমরা পাঁচজনে বসে আছি।

বেয়ারা এসে আচার-তেল-মাখা, গোটার মশলা ছড়ানো, নারকেলকুরি আর পেঁয়াজের কুচি মেশানো মুড়ি এবং তার সঙ্গে বেগুনি, পটলি ও শসা দিয়ে গেল।

সামনেই গঙ্গা। বৃষ্টির ধারা ঠিক কুয়াশার মতই গঙ্গার বুকের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। ওপারে কোথায় আকাশ আর জলের সীমা, কিছুই বোঝার জো নেই,—এমন কি ওপারের বনের সবুজ রেখা পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

গঙ্গাজলের উপরে বৃষ্টিধারার চিকের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, এক-একখানা পানসি ঠিক অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো জেগে উঠেই আবার অদৃশ্য হয়ে পড়ছে। নৌকাগুলোর দেহ যেন ছায়ার মায়া দিয়ে গড়া—তাদের যেন দেখা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না!

শ্যামচন্দ্র একমুখো মুড়ি মুখে পুরে গঙ্গার দিকে ফিরে চর্বণ করতে করতে অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'আজ চারিদিক রহস্যের ঘেরাটোপে ঢাকা। ওই দ্যাখো না, নৌকাগুলো ভেসে যাচ্ছে, ঠিক যেন ভূতুড়ে নৌকোর মতই।'

রামচন্দ্র চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, মুখগহ্বরে টপ করে একখানা বেগুনি নিক্ষেপ করে বললেন, 'হুম। আজকে চারিদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে হ্যামলেটের বুড়ো বাবার প্রেতাত্মা যেন দেখা দিলেও দিতে পারে।'

মানিকলাল বললে, 'এমন বাদলায় দল বেঁধে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় সোফা-কোচে বসে ভূতের গল্প শুনতে ভারি ভালো লাগে।...তোমরা কেউ কখনও ভূত দেখেছ?'

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একসঙ্গে বললে, 'না। ভূত আমি বিশ্বাস করি না।'

অপূর্ব এতক্ষণ একমনে মুড়ি-ফুলুরি খেতেই ব্যস্ত ছিল। এখন সে মুখ খুলে বললে, 'হ্যাঁ, কোনও ভদ্রলোকেরই ভূত বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভূতের গল্প শুনতে ভালোবাসি।'

আমি বললুম, 'আমিও ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভূতের গল্প বলতে ভালো-বাসি।'

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একসঙ্গে বললে, 'বাদলার গল্পই হচ্ছে ভূতের গল্প। কিন্তু সে গল্প সত্যি হওয়া চাই।'

আমি বললুম, 'আমার এ গল্প একেবারে সত্য ঘটনা।'

মানিকলাল বললে, 'তবে যে বললে, তুমি ভূত বিশ্বাস করো না?'

—'না, আমি ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু সত্য ঘটনা না হলে ভূতের গল্পের জোর হয় না। তাই প্রত্যেক ভূতের গল্পই সত্য বলে মনে করা উচিত।'

অপূর্ব বললে, 'যে গল্পটা তুমি বলবে, সেটা কার মুখে শুনেছ?'

—'কারুর মুখে শুনিনি। এ গল্প আমার নিজের গল্প।'

মানিকলাল বললে, 'মুড়ি-ফুলুরি ফুরুলো। বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে আসছে। সন্ধ্যার

অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেছে। আকাশের চাঁদ-তারা মেঘের চাদর মুড়ি দিয়েছে। হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, গঙ্গা কাতর আর্তনাদ করছে,— আর নদীর তীরে জনপ্রাণী নেই। এই তো ভূতের গল্প শোনবার সময়। কিন্তু এমন সময় গল্প শুনতে চাই, যাতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গায়ে কাঁটা না দিলে, বুকটা ভয়ে ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ না করলে ভূতের গল্প শুনে আরাম হয় না। ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই ভয় পাওয়ার আরামটুকু ভারি মিষ্টি লাগে।'

চায়ের পেয়ালায় তাড়াতাড়ি গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে আমি আরম্ভ করলুম ঃ

'কালীপুরে আমার দেশ। আমি কলকাতায় জন্মেছি, ছেলেবেলা থেকে এইখানেই মানুষ হয়েছি, দেশে ভারি ম্যালেরিয়া বলে বাবা আমাকে কখনও দেশের মাটি মাড়াতে দিতেন না।

'কিন্তু দেশকে আমি বরাবরই ভালোবাসি। কলেজে যখনই কেউ 'আমার দেশ' কি 'ও আমার দেশের মাটি' প্রভৃতি গান গাইত, তখনই দেশের জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠত।

'তাই গেল-বছরে একদিন আমার দেশকে দেখতে গেলুম। শুনেছি, দেশে আমাদের ভিটে এখনও আছে। বাপ-পিতামহের ভিটের উপরে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে আসব, এই ছিল আমার মনের ইচ্ছা।

'কালীপুরের স্টেশনে গিয়ে যখন নামলুম, তখন সন্ধে উৎরে গেছে। তবে আকাশে দশমীর চাঁদ ছিল বলে পথ চলতে বিশেষ কষ্ট হল না। গ্রামের কেউ-না-কেউ আমাকে আশ্রয় দেবে, এই ভেবে মনের আনন্দে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হলুম।

'তখন বৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু বর্ষাকাল। কাদায় হাঁটু পর্যন্ত পা বসে যাচ্ছে দেখে, তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া খুলে পবিত্র পুথির মতন বগলদাবা করলুম। মাথার উপরে ম্যালেরিয়ার মশার মেঘ কনসার্ট বাজাতে বাজাতে আমার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। কালো কালো বাদুড় উড়ছে, ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, প্যাঁচারা চ্যাঁ চ্যাঁ করে চ্যাঁচাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাপের ভিতর থেকে সাপের মতন কি যেন বেরিয়ে আসছে। কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আর ইলেকট্রিকের আলোতে পথ চলা অভ্যাস, দশমীর চাঁদের আলোও আমাবস্যার অন্ধকারের চেয়ে উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। এক জায়গায় পথের মাঝখানেই একটা প্রায় তিনফুট গভীর ডোবা ছিল, হঠাৎ ঝপাং করে তারা মধ্যে না-জেনে ঝাঁপ খেতে হল। তবু আমি দমলুম না,—ডোবা থেকে উঠেই মনের সুখে আবার গান শুরু করলুম। এসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে আছে? কবি গেয়েছেন—

'ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরেই ছোঁয়াই মাথা।'

'গাইতে গাইতে গায়ের কাদা ঝেড়ে-পুঁছে মুখ তুলেই দেখি, সামনেই একটা ঝোপের আবছায়ায় কালো গা মিশিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

'তাকে দেখে কেমন সন্দেহ হল। চশমাখানা খুলে পরিষ্কার করে ভালো করে আবার চোখে লাগিয়ে দেখলুম। দেখে সন্দেহ আরও বাড়ল। দিব্যি নাদুস-নুদুস চেহারার একটা লোক।'

রামকান্ত ও শ্যামকান্ত রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'অ্যাঁ, বলো কি? ভূত নাকি?'

আমি বললুম, 'বোধহয়। কিন্তু লোকটার মাথাটা কাঁধের উপরে ছিল না,—ছিল তার হাতে।

দুই হাতে মুণ্ডটা সে পেটের কাছে ধরে ছিল, আর সেই মুণ্ডের ভাঁটার মতন চোখ দুটো আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল।'

মানিকলাল বললে, 'গল্পটি এইবারে জমেছে—সত্য গল্প কিনা! আমার গায়ে কাঁটা দিতে শুরু করেছে। তুমি নিশ্চয়ই কন্দকাটা ভূত দেখেছিলে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

অপূর্ব বললে, 'তারপরেই তুমি বোধহয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে?'

আমি বললুম, 'না'। আমি তার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।

'কন্দকাটার হাতে ধরা মুণ্ডটা বলে উঠল, 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ, মাঁনুষেঁর গঁন্ধঁ পাঁউ!'

'আমি তুড়ি গিয়ে গাইলুম—

'ও আমার দেশের মাটি!'

'কন্দকাটার হাতেধরা মুণ্ডটা এবার আরও জোরে বললে, 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ!'

'আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, দুত্তোর, হাঁউ-মাঁউ-খাঁউয়ের, নিকুচি করেছে! ব্যাপার কি? বেসুরে অমন বাজে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

'কন্দকাটা খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে রইল। তারপর বললে, আমি ভয় দেখাচ্ছি।

'আমি বললুম, 'কাকে?'

'সে বললে, 'তোমাকে।'

—'আমাকে! কেন?

—'ভয় দেখাতে আমরা ভালোবাসি।'

—'কিন্তু আমি ভয় পাইনি।'

—'ভয় পাওনি? আচ্ছা, এইবারে তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাবে।'—এই বলে সে মস্ত হাঁ করে ভয়ানক জোরে আবার হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ বলে চ্যাঁচাবার উপক্রম করলে।

'কিন্তু তার আগেই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কন্দকাটার মুণ্ডের গালে ঠাস করে এক চপেটাঘাত করলুম।

'কন্দকাটার হাতেধরা মুণ্ডটা ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে বললে, বিনা দোষে তুমি আমাকে চড় মারলে কেন?'

'আমি বললুম, মুণ্ড থাকা উচিত কাঁধের উপরে। মুণ্ডটাকে তুমি কাঁধ থেকে খুলে নামিয়ে রেখেছ কেন?

'কাঁদতে কাঁদতে কন্দকাটা বললে, 'নইলে যে তোমরা ভয় পাও না।'

'আমি বললুম, কাঁধের মুণ্ড হাতে দেখলে আমার মাথা ঘোরে। যদি ভালো চাও তো যেখানকার মুণ্ড সেখানেই রেখে দাও। নইলে আবার আমি চড় মারব।

'কন্দকাটা তাড়াতাড়ি মুণ্ডটাকে আবার কাঁধের উপরে বসিয়ে, ম্রিয়মাণভাবে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তার অবস্থা দেখে আমার মনে অত্যন্ত দয়া হল। আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়ে আদর করে বললুম, না, না তুমি কিছু মনে কোরো না, আর আমি তোমাকে চড় মারব না।

'কন্দকাটা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'তুমি আমাকে দেখে ভয় পেলে না,—উল্টে আমাকে চড় মারলে! এখন ভূতের সামাজে আমি এ পোড়া মুখ দেখাব কেমন করে? ওগো এ আমার কি দুর্দশা হল গো! ওগো, আমি যে ভূত-পেত্নীর নাম ডোবালুম গো! ওগো, বেলগাছের ডালে ব্রেহ্মদত্যিঠাকুর যে সব দেখছেন গো! ওগো, তিনি যে আমার কথা সবাইকে বলে দেবেন গো!'

'আমি বললুম, থামো, থামো,—অত চেঁচিয়ো না। কোথায় তোমার বেহ্মদত্যিঠাকুর?

'চোখের জল মুছতে মুছতে কন্দকাটা বললে, 'ওই বেলগাছটার ডালে।'

'পাশেই একটা বেলগাছ। তারই একটা মোটা ডালে উবু হয়ে বসে, সাদা ধবধবে পৈতে পরে একজন মিশকালো লোক গড় গড় করে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে।

'আমি বললুম, প্রণাম হই বেহ্মদত্যিঠাকুর। সব শুভ তো?'

'হুঁকোর আওয়াজ থেমে গেল। উপর থেকে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন হল, 'তুমি কে হে? নিবাস কোথায়?'

—'আজ্ঞে, আমি চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস কলকাতায়।

—'এখানে মরতে এসেছ কেন বাপু?'

'বেহ্মদত্যির কথায় আমার ভারি রাগ হল। আমি বললুম, কি রকম লোক মশাই আপনি? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানেন না?

—'আমি কথা কইতে জানি কি না জানি, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। জ্যাঠা ছেলে কোথাকার!'

—'আপনি বক্সিং লড়তে জানেন?

বেহ্মদত্যি চমকে উঠে বললেন, 'সে আবার কি?'

—'গাছের ডাল থেকে নেমে এসে দেখুন না, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

—'না, আমি নিচে নামতে পারব না। আমার পায়ে গেঁটেবাত হয়েছে। আমি এখন এইখানে বসেই তামাক খাব।'

—'তাহলে আমি নিচে থেকেই আপনাকে থান ইট ছুড়ে মারব।

'বেহ্মদত্যি এইবারে হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'বেশ, বেশ! ছোকরা তোমার মিষ্টি কথা শুনে ভারি খুশি হলুম। তোমার বাবার নাম কি?'

—'আজ্ঞে, সূর্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম এই কালীপুরেই। আমার পিতামহের নাম ভাস্করনাথ চট্টোপাধ্যায়।

'বেহ্মদত্যি বললেন, 'অ্যাঃ, বলো কি? তুমি ভাস্করের নাতি? আরে, আরে, এতক্ষণ এ কথা বলতে হয়,—তুমি আমাদেরই ঘরের ছেলে হে! ভাস্করের বাপ শশীনাথ যে আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। তা, খবর সব ভালো তো?'

—'আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে আপাতত সব মঙ্গল।

—'তা কন্দকাটাকে তুমি কি বলেছ? ও কাঁদছিল কেন?'

—'আজ্ঞে, কন্দকাটা আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিল বলে আমি ওকে একটা চড় মেরেছি।

—'অন্যায় করেছ। দ্যাখো, তোমরা পৃথিবীতে এখন সশরীরে বর্তমান আছ—কত দিকে কত আনন্দ নিয়ে মেতে থাকতে পারো। কিন্তু ভূতবেচারাদের ভাগ্যে সেসব কিছুই নেই, তাদের আনন্দলাভের একটিমাত্র উপায় আছে, আর তা হচ্ছে, তোমাদের ভয় দেখানো। তোমাদের ভয় দেখিয়েই তাদের সময় মনের সুখে কোনওরকমে কেটে যায়। কিন্তু তোমরা আজকালকার কলেজের ছোকরারা, দু-পাতা ইংরিজি পড়েই ভূত-প্রেতদের ডোন্ট কেয়ার করে দাও। এই সেদিন মামদোভূত এসে আমাকে তার দুর্দশার কাহিনী বলে গেল। সে কাহিনী শুনলে চোখে আর জল রাখা যায় না। কে এক ছোকরা নাকি ডাক্তারি পড়ে, মড়া কেটে কেটে তার বুক থেকে ভয় চলে গিয়েছে। এক রাতে সে ঘুমোচ্ছিল, এমন সময়ে মামদো তার ঘরে গিয়ে হাজির। মামদো যেই তার খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছোকরার ঘুম অমনি গেল ভেঙে। মামদোর প্রথমটা মনে হল, ছোকরা ভয়ানক ভয় পেয়েছে। কারণ সে মামদোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মামদোও তার দিকে চোখ যতটা পারে পাকিয়ে কটমট করে তাকালে। ছোকরা তখন ডানপাশ ফিরলে। মামদোও সেই পাশে গিয়ে হাজির। ছোকরা তখন শুধোলে, 'তুমি কি চাও?' মামদোও কোনও জবাব না দিয়ে আরও বিশ্রীভাবে তাকালে। তারপর যা হল তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না। ছোকরা মামদোর দিকে আবার খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'দ্যাখো, তোমার যদি আর কোনও কাজ না থাকে, তবে তুমি ওইখানে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকো। আমার অন্য কাজ আছে—অর্থাৎ এখন আমি ঘুমবো।' বলেই সেই পাজি ছোকরা আবার বাঁ পাশ ফিরে অম্লানবদনে ঘুমিয়ে পড়ল। বলো তো, এর পরে আমাদের ভয় দেখানোর সুখটুকুই বা কোথায় থাকে, আর আমাদের মুখরক্ষাই বা হয় কেমন করে? তুমিও দেখছি ওই দলেরই লোক। তোমার এই অন্যায় ব্যবহারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ভবিষ্যতে আমাদের দেখে তোমরা ভয় পেয়ো। তাহলেই আমাদের আনন্দ। কিন্তু এইটুকু আনন্দ থেকেও তোমরা যদি আমাদের বঞ্চিত করো, তাহলে—'

'বেহ্মদত্যির কথা শেষ হবার আগেই কন্দকাটা বলে উঠল, 'সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও,—পথ থেকে সরে দাঁড়াও।'

ফিরে দেখি, একটি স্ত্রীলোক পথ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, লজ্জায় আধ হাত জিভ কেটে মুখে সাতহাত ঘোমটা টেনে দিলে।

'কন্দকাটা বললে, 'এখনও সরে দাঁড়ালে না। কেমন লোক হে তুমি? মহিলার সম্মান জানো না?'

'তাড়াতাড়ি আমি সরে দাঁড়ালুম। মহিলাটি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একবার আমাকে দেখে, ফিক করে একটুখানি কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে হেলে-দুলে চলে গেলেন।

'আমি বললুম, উনি কে?

'কন্দকাটা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে, 'উনি হচ্ছেন শ্রীমতী পেত্নীবালা দত্ত।'

'বেহ্মদত্যি মুখ থেকে হুঁকোটি নামিয়ে বললেন, 'পেত্নীবালার ডাক নাম কুণি। ও হচ্ছে বুনির বোন।'

'আমি বললুম, বুনি কে?

'বেহ্মদত্যি বললেন, 'তুমি কি কখনও কুণি বুনির গল্প শোনোনি?'

—'না।'

—'তবে শোনো কুণি আর বুনি হচ্ছে দুই বোন। মরবার পর দুই বোনই পেত্নী হয়েছে। কুণি থাকে দত্তদের বাড়ির রান্নাঘারের এককোণে, আর বুনি থাকে বাঁশবনে। এক রাত্রে দত্তদের বাড়ির বামুনঠাকুর বাঁশবনের পাশ দিয়ে আসছে, এমন সময়ে বুনি বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার পথ জুড়ে দাঁড়াল। পেত্নী দেখেই তো বামুনঠাকুর একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট। কিন্তু বুনি সেদিন বামুনকে ভয় দেখাতে আসেনি, সে খালি বললে,—

'কুণিকে বোলো বুনির বেটা হয়েছে।
সুমুখদিকে গুড়মুড়ো তার পিছন দিকে পা,
একবার বলে দিয়ো তো গা!'

'এই বলেই বুনি অদৃশ্য হল। বামুনঠাকুরও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে দত্তবাড়ির রান্নাঘরের সামনে এসে পড়ে দাঁতকপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে গেল। সকলে তার চোখে-মুখে জল দিয়ে তাকে আবার চাঙ্গা করে তুলল। তারপর বামুনঠাকুর যখন একটু ধাতস্থ হয়ে সকলের কাছে বুনির বেটা হওয়ার বিবরণ বলছে, তখন হঠাৎ রান্নাঘরের কোণ থেকে কুণি নাচতে নাচতে বেরিয়ে এসে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললে—'ও ঠাকুর! কয় দিবসের? ও ঠাকুর! কয় দিবসের?'—অর্থাৎ খোকার বয়স কদিন হল?—এবারে দত্তবাড়ির সবাই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। আজ যাকে দেখলে, ও হচ্ছে সেই কুণি। বুনির সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। কুণি ভারি লজ্জাবতী। অচেনা লোক দেখলেই ঘোমটা দেয় আর ঘোমটার ভিতর থেকে ফিক ফিক করে হাসে।

'কথায় কথায় রাত বেড়ে যাচ্ছে দেখে আমি বললুম, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড়ো আনন্দিত হলুম। তাহলে আজ আমি আসি?

'বেহ্মদত্যি বললেন, 'সেকি, এই রাত্রে কোথায় যাবে? তার চেয়ে বেলগাছের ডালে এসে বসে দুদণ্ড বিশ্রাম করো।'

'আমি বললুম, আজ্ঞে, আমি এখনও জ্যান্ত আছি,—বেলগাছের কাঁটা আমার সহ্য হয় না। আমি আমার পৈতৃক ভিটেবাড়ি দেখতে এসেছি, আরও কতদূর যেতে হবে বলতে পারেন?

'বেহ্মদত্যি বললেন, 'তোমাদের ভিটে? হা হা হা হা! ওই যে! হাত-পনেরো তফাতে চেয়ে দ্যাখো। ওই যে উঁচু ঢিপিটা দেখছ, ওইখানেই আগে তোমাদের বাড়ি ছিল। এখন ওখানে গো-ভূতেরা থাকে। মানুষ দেখলে তারা ভয় দেখায় না—একেবারে গুঁতিয়ে দেয়।'

'আমি বললুম, তাহলে আজ রাতটা আমি স্টেশনেই কাটিয়ে দেব—গো-ভূতদের আমি পছন্দ করি না। প্রণাম হই বেহ্মদত্যিঠাকুর।

'এই বলে আমি চলে আসতে যাব, এমন সময় কন্দকাটাটা আবার আমার সামনে এসে কাকুতি মিনতি করে বললে, 'দোহাই তোমার। তোমার দুটি পায়ে পড়ি অন্তত যাবার সময়েও আমাকে দেখে দয়া করে একবার ভয় পেয়ে যাও, নইলে ভূতেরা কেউ আমাকে মানবে না।'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি খুব ভয় পেয়েছি,—এই বলে আমি সেখান থেকে হাসতে হাসতে চলে এলুম। আমার কথাটি ফুরলো।'

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একবাক্যে মতপ্রকাশ করলে, 'ধেৎ। ডাহা গাঁজাখুরি গল্প।'

অপূর্ব বললে, 'সব ভূতের গল্পই গাঁজাখুরি। তবে কোনোটাতে গাঁজার মাত্রা কম থাকে, আর কোনোটাতে থাকে খুব বেশি—এই যা তফাত।'

মানিকলাল বললে, 'আমার গায়ের কাঁটা গায়েই মিলিয়ে গেল। এখন আর এক কাপ চা খেয়ে গা তাতিয়ে না নিলেই নয়।'

আমি বললুম, 'বেয়ারা! চা লে আও।'

বাড়ি

পাঁচ বছর আগে আমার ভারি অসুখ হয়েছিল। সেই সময়ে রোজই রাত্রে আমি ঠিক একই স্বপ্ন দেখতুম।

স্বপ্নে দেখতুম, আমি যেন শহরের বাইরে এক পাড়াগাঁয়ে গিয়েছি।

আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে রোজই এগিয়ে যাই। পথের দুধারে কোথাও কলাগাছের ঝাড়,—বাতাসে সবুজ নিশান উড়িয়ে দিয়েছে; কোথাও মেদিগাছের বেড়া দেওয়া নানান ফুলের বাগান,—মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সেখানে মধু চয়নের খেলা খেলছে; কোথাও তালকুঞ্জের ছায়া-দোলানো এবং কাঁচা রোদের সোনা ছড়ানো ঝরঝরে সরোবর,—ঘাটে ঘাটে নববধূরা ঘোমটায় মুখ ঢেকে কলসিতে জল ভরে নিচ্ছে।

পথ যেখানে ফুরিয়ে গেছে, সেইখানে একখানি মস্ত বাড়ি—দূর থেকে ছবির মতন দেখতে।

সামনেই ফটক। কিন্তু সেখানে কোনও দারোয়ান নেই। বাড়ির চারিদিকে জমিতে কত রকমের গাছ—গন্ধরাজ, বকুল, রঙন, শিউলি,—আরও কত কি! মাঝে মাঝে কেনার ঝোপে রঙ-বেরঙের মেলা।

রোজই বেড়াতে বেড়াতে বাড়িখানির সামনে গিয়ে দাঁড়াই,—অপলক চোখে তার পানে তাকিয়ে থাকি, ভিতরে যাবার জন্যে প্রাণে সাধ জাগে।

কিন্তু জনপ্রাণীকে দেখতে পাই না। ফটকের কাছে থেকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেয় না। পরের বাড়ি না জানিয়ে ভিতরে ঢুকতেও ভরসা হয় না। ফিরে আসি।

রাতের পর রাত যায়,—আমি খালি ওই একই স্বপ্ন দেখি। বার বার অনেকবার ওই একই স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হল যে, অজ্ঞাত শৈশবে নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে আমি ওই বাড়িতে গিয়েছিলুম।

আমার অসুখ সেরে গেল। কিন্তু তবু সেই স্বপ্নে-দেখা বাড়িকে ভুলতে পারলুম না। মাঝে মাঝে এদেশ ওদেশ বেড়াতে যেতুম। পথে বেরুলেই চারিদিক লক্ষ্য করে দেখতুম, স্বপ্নের বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

একবার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে কুসুমপুর গ্রামে যাই।

বৈকালে বেড়াতে বেরিয়ে একটা গেঁয়োপথ পেলুম। দেখেই চিনলুম, এ আমার সেই স্বপ্নে-

দেখা পথ। পথের দুধারে সেই কলাগাছের ঝাড়, মেদিগাছের বেড়া দেওয়া বাগান, আলো-ছায়া-ভরা পুকুরঘাট। অনেকদিন অদর্শনের পর পুরানো বন্ধুকে দেখলে মনে যে আনন্দের ভাব জাগে, আমারও মনে তেমনি ভাবের ছোঁয়া লাগল।

আঁকাবাঁকা পথের শেষে ছবির মতন সেই বাড়িখানি।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ডাকাডাকি করতে লাগলুম।

ভেবেছিলুম কারুর সাড়া পাব না। কিন্তু আমার ডাক শুনেই একজন বুড়ো দারোয়ান ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

—'কাকে চান?'

—'কারুকে নয়। এই বাড়িখানি আমার বড়ো ভালো লেগেছে। ভিতরে ঢুকে একবার দেখতে পারি কি?'

—'আসুন না! এ বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে।'

—'বাড়িওয়ালা কোথায় থাকেন?'

—'এইখানেই থাকেন। কিন্তু কিছুদিন হল, এ বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন।'

—'বলো কি! এমন চমৎকার বাড়ি কেউ ছেড়ে দেয়?'

—'ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।'

—'কেন?'

—'ভূতের উপদ্রবে।'

—'ভূত! একালেও লোকে ভূত বিশ্বাস করে নাকি?'

দারোয়ান গম্ভীর মুখে বললে, 'আমিও বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এখন বিশ্বাস না করে উপায় নেই। যে ভূতটার ভয়ে আমার মনিব এ বাড়ি ছেড়েছেন, রাত্রে আমিও তাকে স্বচক্ষে অনেকবার দেখেছি। তার মুখ আমি ভুলিনি।'

অবহেলার হাসি হেসে আমি বললুম, 'ডাহা গাঁজাখুরি গল্প।'

দারোয়ান বিরক্তভাবে আমার মুখের দিকে তাকালে। বললে, 'গাঁজাখুরি গল্প? অন্তত আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। অনেকবার যে ভূতকে আমি দেখেছি, যার মুখ আমি এ জীবনে ভুলব না,—সে হচ্ছেন আপনি নিজে! আমি আপনাকেই দেখেছি!'*

মাথা-ভাঙার মাঠে

মোহনপুরের পিরু দরজির ছেলে দিলু বা দিলদারের বয়স হল প্রায় ষোলো, কিন্তু আজও সে বাপের কোনও উপকারেই লাগল না। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে দিনরাত সে খেলাধুলো করে বেড়ায়, পরের বাগানের ফল চুরি করে এবং ইস্কুলে যাবার নামও মুখে আনে না।

দিলুকে পিরু বাপু-বাছা বলে মিষ্টি কথা বলে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু দিলু সেসব কানেও

---

* ফরাসি লেখক Andre Maurois-এর একটি বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে।

তোলেনি। দিলুর পিঠে পিরু অনেক লাঠিই ভেঙেছে, তবু দিলু শায়েস্তা হয়নি। দেখেশুনে পিরু হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন পিরুর পকেট থেকে যখন কুড়িটা টাকা চুরি গেল এবং তার সন্দেহ হল ছেলের উপরেই, তখন আর সহ্য করতে পারলে না,—দিলে দিলুকে দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে।

দিলু হচ্ছে মহা ডানপিটে ছোকরা, বাড়ি থেকে গলাধাক্কা খেয়েও সে কিছুমাত্র দমল না। সারাদিন পথে-বিপথে হই-চই করে বেড়াল এবং সন্ধের পর 'মাথা-ভাঙার মাঠে' গিয়ে একটা তালগাছের তলায় বসে চিৎকার করে গান গাইতে লাগল।

এখন, এই মাথা-ভাঙার মাঠের একটুখানি ইতিহাস আছে। আগে এ মাঠে সন্ধের পর ভয়ে কেউ হাঁটত না; কারণ ডাকাতেরা লাঠি মেরে পথিকদের মাথা ভেঙে সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিত। এখন আর ডাকাতের ভয় নেই বটে, তবু সন্ধের পরে ভয়ে কেউ এ মাঠ মাড়ায় না; কারণ এখানে নাকি ভয়ানক ভূতপ্রেতের ভয়।

কিন্তু ডানপিটে দিলুর এতবড়ো বুকের পাটা যে, এমন জায়গায় এসেই সে গান জুড়ে দিয়েছে।

রাত বারোটা পর্যন্ত গান গাইবার পর ক্ষিদের চোটে দিলুর পেটের নাড়ি টনটন করতে লাগল। তখন সে আস্তে আস্তে উঠে গাঁয়ের দিকে ফেরার চেষ্টা করলে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খানিক তফাতে কাদের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কারা কথা কইতে কইতে এই দিকেই আসছে।

মাথা-ভাঙার মাঠে রাত দুপুরে মানুষের সাড়া পাওয়া যায়, এমন অসম্ভব কথা দিলু কোনওদিন শোনেনি। তবে কি সত্যি সত্যিই—

ভয়ে দিলুর মাথার চুলগুলো সটান হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কোনদিকে চম্পট দেবে তাই ভাবছে, এমন সময় চাঁদের আলোয় দেখতে পেলে, কারা সব দল বেঁধে একেবারে তার সুমুখে এসে পড়েছে।

গুনতিতে তারা বিশজন। মানুষের মতো দেহ, অথচ প্রত্যেকেই উঁচুতে মোটে এক হাত, তাদের অনেকেরই মাথার চুল আর গোঁফদাড়ি পেকে গেছে বটে, কিন্তু তবু তারা ছোটো ছোটো খোকার চেয়ে বেশি ঢ্যাঙা হতে পারেনি!

দিলু চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে ভাবছে—এ আবার কোন মুল্লুকের মানুষ রে বাবা—এমন সময়ে দলের ভিতর থেকে একটা লোক তার কাছে এগিয়ে এল। সে লোকটা বেজায় বুড়ো, বেজায় বেঁটে আবার তার শনের মতো পাকা দাঁড়ি পা পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে।

বুড়ো বললে, 'এই যে বাপের অবাধ্য ছেলে দিলু! আমরা তোমাকেই এতক্ষণ খুঁজছিলুম।'

দিলু জবাব দেবে কি, তার দাঁতে দাঁত লেগে গেল।

বুড়ো আবার বললে, 'বুঝেছ দিলু? আমরা তোমাকেই খুঁজছিলুম।'

দিলু তেমনি চুপচাপ।

বুড়ো আবার বললে, 'আমরা তোমাকেই খুঁজছিলুম। বার বার তিনবার আমি কথা কইলুম। তুমি যে জবাব দিচ্ছ না?'

তবু দিলু জবাব দিলে না।

বুড়ো তখন সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললে, 'দিলু জবাব দেবে না। তোমাদের কাজ তোমরা করো।'

দলের অন্য লোকগুলো কি একটা লম্বা মোট বয়ে আনছিল, হঠাৎ তারা সেই মোটটাকে ধুপ করে দিলুর পায়ের তলায় ফেলে দিলে।

সেটা একটা মড়া।

বুড়ো বললে, 'দিলু, ওই মড়াটাকে কাঁধে তুলে নাও।'

দিলু আঁতকে উঠে বললে, 'ওরে বাপরে! সে আমি পারব না'—বলেই সে দৌড়ে পালাতে গেল।

কিন্তু সেই ক্ষুদে ক্ষুদে লোকগুলো চারিদিক থেকে ছুটে এসে তাকে একেবারে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। তারপর তারা মড়াটাকে তুলে এনে দিলুর পিঠের উপর চাপিয়ে দিলে। ভীষণ আতঙ্কে ও বিস্ময়ে দিলু বুঝতে পারলে যে, মড়ার হাত দুটো তার গলা আর পা দুটো তার কোমর বিষম জোরে চেপে ধরলে! ভূতের পাল্লায় পড়ে দিলুর প্রাণ বুঝি আজ যায়! মড়াটাকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, 'বাবার অবাধ্য হয়ে পাপ করেছি বলেই এই ভূতগুলো আজ আমার উপরে এতটা তম্বি করতে পারছে। এই নাক-কান মলছি, আর কখনও বাপ-মায়ের অবাধ্য হব না।'

বুড়ো বললে, 'দিলু, যখন আমি তোমাকে মড়াটা তুলতে বললুম, তখন তুমি আমার কথা শুনলে না। এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে—'মড়াটাকে গোর দিয়ে এসো', তাহলেও তুমি বোধহয় আমার কথা শুনবে না?'

দিলু কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'শুনব হুজুর, শুনব! পিঠের আতঙ্ক এখন পিঠ থেকে নামাতে পারলেই বাঁচি।'

বুড়ো খল খল করে হেসে বললে, 'বেশ বেশ! এরই মধ্যে তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুশি হলুম। এখন যা বলি, শোনো। আজ রাত্রের মধ্যেই তুমি যদি ওই মড়াটাকে গোর না দাও তাহলে তোমার ভয়ানক বিপদ হবে। এ গাঁয়ের গোরস্থানে আগে যাও। সেখানে যদি সুবিধে না হয়, তবে অন্য গাঁয়ের গোরস্থানে যেতে হবে। সেখানেও অসুবিধে হলে আবার অন্য কোনও গাঁয়ের গোরস্থানে যাবে। মোদ্দা কথা, আজ রাত পোয়াবার আগেই ওই মড়াটাকে গোর দেওয়া চাই-ই চাই। নইলে মজাটা টের পাবে। এখন বিদেয় হও—খবরদার, আর পিছন ফিরে তাকিয়ো না।'

পিঠে মড়া নিয়ে, তার ভারে দুমড়ে পড়ে দিলু এগুতে লাগল। আকাশে চাঁদের মুখও তখন মড়ার মতই হলদে দেখাচ্ছে, পৃথিবীর কোনওদিক থেকেই জনপ্রাণীর সাড়া আসছে না, গাছগুলো পর্যন্ত যেন দিলুর পিঠের ভয়ঙ্কর বোঝা দেখে স্তম্ভিত ও আড়ষ্ঠ হয়ে আছে,—কোনও শব্দ করছে না। ভালো ছেলেরা এখন পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে নরম বিছানায় শুয়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছে—আর এই নিশুত রাতে কেবল দিলুকেই কিনা একটা ভূতুড়ে, পচা মড়া পিঠে নিয়ে একলাটি গোরস্থানের দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। নিজের অবাধ্যতার ফল হাতে হাতে পেয়ে তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

ওই তো গাঁয়ের গোরস্থান। দলে দলে বড়ো বড়ো কালো কালো গাছ গোরস্থানের চারিদিক ঢেকে দাঁড়িয়ে থেকে চাঁদের আলোকে তার কাছে আসতে দিচ্ছে না।

অমন যে ডানপিটে ছেলে দিলু, তারও বুক এখন আতঙ্কে ঢিপঢিপ করতে লাগল। একবার ভাবলে, এক ছুটে পালিয়ে যাই। তারপরই লম্বাদাড়ি, একহাত উঁচু বুড়ো আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথা দিলুর মনে পড়ল। নিশ্চয়ই তারা কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে সবই লক্ষ্য করছে। না বাবা, আর তাদের পাল্লায় পড়া নয়! যেমন করে হোক, মড়াটাকে গোর না দিয়ে আজ আর কোনও কথা নয়!

গোরস্থানের এক জায়গায় একটা মস্ত গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু তার কোথাও একটা পাতা পর্যন্ত নেই। শুকনো ডালপালাওয়ালা মরা গাছটাকে দেখলেই মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল অনেকগুলো হাত বাড়িয়ে সবাইকে শাসাচ্ছে।

দিলু তার তলায় গিয়ে ভাবতে লাগল, 'তাইতো, গোরস্থানে তো এলুম, কিন্তু কোদালও নেই কুড়ুলও নেই, এখন মাটি খুঁড়ব কেমন করে? হে লম্বাদাড়ি বুড়ো হুজুর! আপনি কোথায় আছেন জানিনা, কিন্তু—'

দিলুর কানে কানে কে বললে, 'ওই শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দ্যাখো।'

দিলু ভড়কে ও চমকে চারিদিকে তাকিয়েও কারুকে দেখতে পেলে না। তবে কে তার কানের কাছে কথা কইলে?

আবার কে বললে, 'ওই শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দ্যাখো।'

দিলুর গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিছুই না বুঝে সে বলল, 'তুমি আবার কে বাবা? দেখা দাও না, অথচ কথা কও?'

—'আমি হচ্ছি তোমার পিঠের মড়া।'

—'কি বিপদ! তুমিও আবার কথা কইতে পারো নাকি?'

—'হুঁ, মাঝে মাঝে পারি।'

—'তাহলে দয়া করে আবার পিঠ থেকে নামো না বাবা! আমি একটু জিরিয়ে নি।'

—'আগে আমাকে গোর দেবার ব্যবস্থা কর। ওই শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দেখ।'

দিলু গাছের তলায় চেয়ে দেখল সেখানে একখানা কুড়ুল আর একখানা কোদাল পড়ে রয়েছে।

তার কানে কানে মড়াটা ফিস ফিস করে ক্রমাগত বলতে লাগল, 'আমাকে গোর দাও—আমাকে গোর দাও।'

দিলু তাড়াতাড়ি কুড়ুল ও কোদাল তুলে নিয়ে এসে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। খানিকক্ষণ খোঁড়বার পরেই তার কুড়ুলটা কোনও একটা জিনিসের উপরে গিয়ে পড়ল। দিলু হেঁট হয়ে তাকিয়ে দেখলে, একটা কফিন গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কফিনের ডালা খুলে দেখা গেল, তার ভিতরেও রয়েছে আর একটা মড়া!'

দিলু বললে, 'একই গোরে দুটো লাশ রাখা তো চলবে না। ওহে আমার পিঠে-মড়া মড়া মনিব! তোমাকে এখানে গোর দিলে তুমি আপত্তি করবে না তো?'

মড়া জবাব দিলে না।

দিলু মনে মনে বললে; 'বাঁচা গেছে, মড়াটা এইবারে বোধহয় আবার বোবা হল, কথা কয়ে আর আমাকে ভয় দেখাবে না'—এই বলে সে হাতের কুড়ুলটা অন্যমনস্ক হয়ে ফেলে দিলে। কিন্তু কুড়ুলটা গিয়ে পড়ল গোরের ভিতরকার মড়াটার গায়ের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে গোরের ভিতরেই মড়াটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে যাতনায় চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ! হুঃ!! হুঃ!!! —যা! যা!! যা!!! নইলে এখনই মরবি, মরবি, মরবি!' বলেই আবার সে কবরের ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে পড়ল।

দিলুতে তখন আর দিলু ছিল না। তার মাথার চুলগুলো যন শজারুর কাঁটার মতন সিধে হয়ে উঠছে আর সর্বাঙ্গ দিরে দরদর করে ঘাম ছুটছে। অন্ধের মতো চোখ বুজে চটপট কোদাল দিয়ে মাটি তুলে সে কবরটা আবার বুজিয়ে দিলে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'বাপ! আর বোধহয় ওটা মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।'

খানিক হাঁপ ছেড়ে দিলু আরও কয় পা এগিয়ে আবার মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলে। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল সে কবরটার ভিতরে রয়েছে একটা শুঁটকি বুড়ির মড়া। এ মড়াটা বোধহয় আগের মড়াটার চেয়েও বেশি জ্যান্ত! কারণ, ভালো করে মাটি খুঁড়তে না খুঁড়তেই সে চট করে উঠে বসে চ্যাঁচাতে শুরু করলে—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ! কে রে ছোঁড়া তুই? কে রে ছোঁড়া তুই?'

দিলু ভয়ে পেছিয়ে এল।

কোনও জবাব না পেয়ে শুঁটকি বুড়ির মড়াটা ধীরে ধীরে দুই চোখ মুদে ফেললে, তারপর ধীরে ধীরে আবার কবরের ভিতরে শুয়ে পড়ল। দিলুও যে তখনই তাকে মাটি চাপা দিতে দেরি করলে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সে আবার আর একটা জায়গা খুঁড়তে শুরু করলে। কিন্তু এবার যেই মাটির ভিতর থেকে আর একটা মড়ার একখানা হাত দেখা গেল, অমনি সে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে বললে, 'নাঃ, এ গোরস্থানে দেখছি সব কবরই আজ ভরতি!.....এখন আমার উপায় কি হবে? আমার পিঠের মড়া পিঠ থেকে নামাই কেমন করে? এ গাঁয়ে তো আর কোনও গোরস্থান নেই!'

যাঁহাতক এই কথা বলা, পিঠের মড়া অমনি দিলুর কানে কানে ফিসফিস করে বললে, 'মামুদপুরের গোরস্থানে। ওইদিকে।' —বলেই মড়া তার বাঁ হাতখানা এগিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

প্রাণের দায়ে দিলু সেইদিকেই অগ্রসর হল। দু-চারবার এবড়ো-খেবড়ো আঁকাবাঁকা পথে সে হোঁচট খেয়ে পপাত ধরণীতলে হল, কিন্তু তার গলা ও কোমর থেকে মড়ার হাত-পায়ের ব্রজআঁটুনি তবু আলগা হল না। তার পিঠের উপরে এই বিভীষণ মোট দেখে প্যাঁচারা চেঁচিয়ে বাদুড়দের শুনিয়ে কি যেন বলতে লাগল,—আশপাশের জলাভূমির মধ্যে আলেয়ার আলোগুলো যেন আরও বেশি জ্বলজ্বলে ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। দিলু বারংবার নিজের মনেই প্রার্থনা করতে লাগল—আল্লা, আমাকে দয়া করো! আল্লা, আমাকে দয়া করো! মামুদপুরকে তাড়াতাড়ি কাছে এনে দাও।

শেষটা সে মামুদপুরে এসে হাজির হল।

মড়া বললে, 'ওই গোরস্থান। আমাকে গোর দাও—শিগগির আমাকে গোর দাও!'

এইবার এই ছিনেজোঁক দুর্দান্ত মড়ার কবল থেকে নিস্তার পাবে বলে দিলু হনহন করে পা-দুটো গোরস্থানের দিকে চালিয়ে দিলে।

কিন্তু বেশি এগুতে হল না,—হঠাৎ দিলু মুখ তুলেই চক্ষু স্থির করে রইল! ওরে বাবা!

মামুদপুরের গোরস্থানের পাঁচিলের উপরে পালে পালে ভূত আর পেত্নী বসে আছে। কেউ খুববুড়ো, কেউ আধবুড়ো, কেউ যুবা আর কেউবা শিশু। তাদের প্রত্যেকের চোখ উনুনের জ্বলন্ত কয়লার মতো দপ দপ করছে।

একটা বেজায় রোগা আর ঢ্যাঙা ভূত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মাথার উপরে দুটো হাত নেড়ে ক্রমাগত বলতে লাগল—'এখানে হবে না—এখানে ঠাঁই নেই—এখানে হবে না—এখানে ঠাঁই নেই—এখানে হবে না'—প্রভৃতি।

আর একটা বেজায় মোটা ভূত হঠাৎ পাঁচিল থেকে মাটির উপরে থপাস করে লাফিয়ে পড়ে খোনা সুরে বলতে লাগল—

'শোন তবে কান পেতে ওরে দুরাচার!
তোকে মোরা খাব করে চাটনি-আচার।
চোখদুটো ছিঁড়ে নিয়ে খেলা যাবে ভাঁটা,
আঙুল ভাজিয়া হবে চচ্চড়ির ডাঁটা।
লোমে তোর বানাইব শীতের কম্বল,
মেটুলিতে হবে খাসা রসালো অম্বল।
ঠ্যাঙের রাঙেরে খাব করিয়া ডালনা।
নাড়ি-ভুঁড়ি শুষ্ক করি টাঙাব আলনা,
হৃদপিণ্ড কাটিয়া হবে দেয়ালের ঘড়ি,
হাড়ের গুঁড়োতে হবে দাঁত-মাজা খড়ি।
শোন ছুঁচো, কানামাছি, শোন রে মশক!
চুল-দাড়ি ছেঁটে নিয়ে করিব তোশক।
চেঁচে নিলে ছালখানা গায়ে হবে জামা,
নাদা পেটে তৈরি হবে তোফা এক ধামা!'

এ রকম সব ভয়ানক কথা শুনলে কোনও ভদ্রলোকেরই আর এগুবার ভরসা হয় না—দিলুরও হল না। কিন্তু দিলুর পিঠের মড়া তার কানে কানে বললে, 'গোর দাও, গোর দাও, আমাকে গোর দাও!' বলতে বলতে সে তার হাতের বাঁধন এমন শক্ত করে তুললে যে দম বন্ধ হয়ে দিলুর প্রাণ যায় আর কি।

কি আর করে,—মরেছি, না মরতে আছি, যা হবার তাই হোক,—এই ভেবে দিলু পায়ে-পায়ে আবার এগুতে শুরু করল।

আর যায় কোথা? মামুদপুরের গোরস্থানের ভূতপেত্নীরা পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে উঠে খনখনে আওয়াজে সমবেত সঙ্গীত আরম্ভ করলে—

'ধর ধর! মার! মার! হুম হুম হুম হুম!
ঠাস করে মার চড়, আর কিল গুম-গুম।
গো-ভূতকে ডেকে আন—শিঙে তার খুব ধার।
মামদোরা তেড়ে যাক—হুঁশিয়ার! মার! মার!

আচম্বিতে কোথা থেকে দুখানা অদৃশ্য হাত এসে দিলুর চুলের মুঠি ধরে বারকয়েক ঝাঁকানি মেরে, তাকে শূন্যে তুলে বলের মতো চার-পাঁচবার লোফালুফি করলে এবং তারপরে তার দেহটাকে পাশের এক খানায় ছুড়ে ফেলে দিলে।

সেই বিশ্রী একগুঁয়ে মড়াটা তবু দিলুর পিঠ ছেড়ে একটুও নড়ল না! কোনওরকমে আধ-মরা হয়ে দিলু হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলে, পাঁচিলের উপরে তাল ঠুকতে ঠুকতে ভূতপেত্নীরা তখন গাইছে—

'আয় দিকি, আয় দিকি! ফের হেথা আয় দিকি!
এবারেতে করে দেব ঢিকি-ঢিকি হিকি-হিকি!'

'ঢিকি-ঢিকি হিকি-হিকি' যে কাকে বলে, দিলু তা জানত না—জানবার সাধও তার ছিল না। সে খালি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, 'ওগো পিঠেচড়া মড়া মশাই! মরেও যখন আপনি মরেননি, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন? আর কি ওখানে আমাদের যাওয়া উচিত? তাহলে আমি তো মরবই, আপনারও হাড় কখানা আর আস্ত থাকবে না?'

মড়া হঠাৎ তার একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'হোসেন-ডাঙার গোরস্থান! ওইদিকে!'

দিলু বললে, 'আবার! আপনি তো মরেছেনই, এবারে আমাকেও মারলেন দেখছি।'

একটা খোঁড়া ভূত তখন নেংচে নেংচে নাচতে নাচতে গান ধরেছে—

'দেব তেড়ে শিং নেড়ে তোর পেটে ঢুঁ,
হুশ করে যাবি উড়ে ঝাড়ি যদি ফুঁ!
ভারি আমি কড়া লোক, ভয়ানক গোঁ!
ঠাস করে খাবি চড় কান হবে ভোঁ!
সুড় সুড় সরে পড়, কোরোনাকো টুঁ!'

দিলুর আর টুঁ শব্দ করবার সাধও ছিল না। সে কাঁপতে কাঁপতে ও মাতালের মতো টলতে টলতে কোনওক্রমে আবার এগিয়ে চলল। সে বেশ বুঝলে, আজ আর তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পাগলের মতো কতক্ষণ সে যে পথ চলল, কিছুই জানতে পারলে না, কিন্তু মড়াটা যখন আচম্বিতে তার কানে কানে বললে, 'ওই হোসেনডাঙার গোরস্থান,'—তখন সে চমকে চেয়ে দেখলে, পূর্ব আকাশের অন্ধকার বুকের ভিতর থেকে একটু একটু করে রুপোলি আলোর আভা ফুটে উঠছে।

মড়া বললে, 'আর সময় নেই—আর সময় নেই! গোর দাও, আমাকে গোর দাও।'

কিন্তু আগেকার গোরস্থানে যে কাণ্ডটা হয়েছিল, সেটা মনে করে দিলু আর অন্ধের মতো এগিয়ে গেল না। ভালো করে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যখন সে দেখলে, ভূতপেত্নীরা

এখানেও সমবেতসঙ্গীত গাইবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেই, তখন পায়ে গায়ে এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে হোসেনডাঙার গোরস্থানে প্রবেশ করলে।

মড়া আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওইখানে! ওইখানে!'

দিলু আরও কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই দেখলে, একটা কবরের পাশেই একটা কফিন পড়ে রয়েছে। কবরটা নতুন খোঁড়া হয়েছে এবং কফিনের ভিতরে মড়া-টড়া কিছু নেই।

দিলু বললে, 'বুঝেছি মড়া মশাই, বুঝেছি। আপনি আমার পিঠে চড়ে আজ আরাম করবার জন্যে এই কফিন থেকেই পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু আগেই এ-কথাটা জানিয়ে দিলে আমাকে তো আর অমন সাতটা ঘাটের জল খেয়ে মরতে হত না!'

মড়া ঠিক মড়ার মতোই বোবা হয়ে রইল।

দিলু তখন কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি রাত বারোটা থেকে যে ভয়ানক মড়াটা তার পিঠ ছেড়ে একবারও নামবার নাম করেনি, হঠাৎ সে তার হাত আর পা দুটো দিলুর গলা আর কোমর থেকে খুলে নিয়ে ধপাস করে সেই কবরের কফিনের ভিতরে গিয়ে পড়ে একেবারে স্থির হয়ে রইল। পাছে আবার তার জ্যান্ত মানুষের পিঠে চড়বার শখ হয়, সেই ভয়ে দিলু খুব তাড়াতাড়ি তার উপরে মাটি চাপা দিয়ে ফেললে।

বাড়িতে ফিরে এসে দিলু তার বাবার দুই পা ধরে বললে, 'বাবা আজ থেকে তুমি যা বলো তাই শুনব।'

দিলু নিজের কথা রেখেছিল। সে আর কখনও বাবার অবাধ্য হয়নি।

রামস্বামীর উপলমণি

[এটি একটি আশ্চর্য সত্য ঘটনা । কাহিনী যিনি বলেছেন তাঁর নাম টি। ডব্লিউ। ড্রেসার - তিনি সওদাগরি জাহাজের বেতার বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ।]

সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা।

নানা জাহাজে চাকরি নিয়ে নানা দেশে বারবার আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। তখন আমার বেপরোয়া উদ্দাম যৌবন । দুনিয়ায় অলৌকিক কোনওকিছু আছে শুনলে একেবারেই বিশ্বাস করতুম না । কিন্তু রামস্বামী আমার সেই বিশ্বাসের মূল আলগা করে দিয়েছে।

রামস্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল বোম্বাই শহরে গিয়ে। বারংবার দেখা সাক্ষাতে আমাদের আলাপ বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল । তখন তাকে দেখলে খুশি হতুম । কিন্তু এখন তার দেখা পাওয়া তো দূরের কথা , তাকে মনে পড়লেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেবার আমি এল্লারম্যান-উইলসন কোম্পানির ওথেলো জাহাজে চেপে বোম্বাই শহরে গিয়ে পৌছলুম। রামস্বামীও জাহাজে এসে উঠল । বন্দরে যে কোন জাহাজ এলেই সে তার উপর উঠতে ছাড়ত না। সে জহুরি - তার ব্যবসাই ছিল রত্ন বিকিকিনি। জাহাজে জাহাজে সে খরিদ্দার সন্ধান করত।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষটি । মাথা ভরা ঘণকৃষ্ণ চুল। ফিটফাট সাদা ধবধবে পোশাক । তার কাছে সর্বদাই থাকত মোড়কে মোড়া বহুমূল্যের বা স্বল্পমূল্যের বিবিধ রত্ন বা প্রস্তর। এমন নাবিক ছিল না যে বোম্বাই শহরে গিয়েছে অথচ রামস্বামীর সঙ্গে চেনাশোনা হয়নি।

সেদিন সকাল সাড়ে দশটা । সূর্যের নিষ্ঠুর কিরণে চারিদিক উত্তপ্ত। নিজের কাম্ররায় শুয়ে একখানা ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়ছি এমন সময় দরজার ওপরে করাঘাত । বেরিয়ে দেখি , রামস্বামী । একমুখ হেসে বললে , "কিছু কিনবেন ?" বলেই পকেট থেকে বের করে ফেলল গোটাকয়েক মোড়ক ।

বললুম , "যা কেনার আগেই কিনেছি, আজ আর কিছু নয়। "

"বেশ, তাই সই । তবে একটা অনুরোধ । একখানা কাগজ দিতে পারেন ? "

প্যাড থেকে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে তাকে দিলুম ।

আমার সামনে তিনটে মোড়ক রেখে দিয়ে ,একটা ময়লা ও কিছু-কিছু ছেঁড়া মোড়ক নিয়ে রামস্বামী আমার দেওয়া কাগজখানার ওপরে উপুড় করে ধরলে , ঝর - ঝর করে ঝরে পড়ল একরাশ টুকরো টুকরো হীরা - গুণতিতে শ-খানেকের কম নয় ! আমার দিকে পিছন ফিরে সে হীরাগুলো বেছে বেছে গুছিয়ে রাখতে লাগলো।

আমি একটা মোড়ক কৌতুহলী হয়ে খুলে ফেললুম । ভিতরে রয়েছে তিনখানা চমৎকার উপলমণি (opal)। তার মধ্যে বিশেষ করে একখানা হচ্ছে যার-পর নাই অপূর্ব । উপলের তেমন বর্ণবৈচিত্র্য আর কখনো দেখিনি।

মনে এমন দুর্মতি জাগল যে কিছুতেই লোভ সামলাতে পারলুম না, উপলখানা সরিয়ে ফেললুম – জীবনে সেই আমার প্রথম এবং শেষ চুরি।
কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে রামস্বামী তার মালপত্র নিয়ে বিদায় গ্রহন করলে – আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম ।
পরদিনেই আমাদের জাহাজ বোম্বাই ছাড়ল।
পর-পর সাত সপ্তাহ কেটে গেল সমুদ্রের ওপরেই । প্রতিদিনি মুগ্ধ চোখে উপলখানা দেখি আর নাড়াচাড়া করি। তারপর বিলাতে ফিরে উপলখানা মাকে উপহার দিলুম। মা সেখানা পদকের মত কণ্ঠদেশে ধারণ করলেন।
কিছুদিন পরেই রামস্বামীর কাছথেকে একখানা টেলিগ্রাম পেলুম । সে লিখেছে ঃ
"সাহেব দয়া করে উপলখানা ডাকে ফেরত পাঠাও । নইলে তোমার অনিষ্ট হবে।"
মনে-মনে ভীত হয়েও দোষ মানলুম না। জবাবে জানালুম , " উপল আমি পাইনি। এটা তোমার মনের ভুল ।"
উত্তরে আর কোন তার এলনা দেখে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম ।
কিছুদিন পরে আমাদের জাহাজ আবার আলেকজান্দ্রিয়া,সুয়েজ হয়ে বোম্বাই বন্দরে গিয়ে নোঙর ফেললে। তার পরদিনেই যা ভয় করেছিলুম, তাই !
বেলা তখন দশটা। আমার কামরায় করাঘাত।
কম্পিত স্বরে বললুম, "ভেতরে এসো।"
রামস্বামী ঘরে ঢুকল। তার চেহারা দেখে আমার চমক লাগলো।
তার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, তার পোশাক ময়লা। তার তামাটে ত্বকের ভিতরদিক থেকে ফুটে উঠেছে কেমন একটা ভয়াবহ পান্ডুবর্ণ, এবং তার চোখ দুটো বসে গিয়েছে ভেতরের দিকে।
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম ," রামস্বামী, কি হয়েছে তোমার?"
আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বললে," সাহেব দয়া করে উপলখানা ফিরিয়ে দিন। ওটা বিক্রীর জন্য নয়, ওটা আমার নিজস্ব জিনিস, ওটা না পেলে আমার মহা অমঙ্গল হবে, আর ওটা কাছে রাখলে তোমারও মঙ্গল হবে না ।"
মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে প্রকাশ্যে বললুম," রামস্বামী, উপলখানা আমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ফিরিয়ে দিতুম।"
পরমুহূর্তেই রামস্বামী যেন পাগল হয়ে গেল। থরহরি কম্পমান দেহে , দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সে নিজের ভাষায় চিৎকার করে কিসব বলতে লাগলো।
আমি আর সইতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি নিজের কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম, -
কিন্তু রামস্বামী তবু আমার সঙ্গ ছাড়লো না, পিছু পিছু আসতে লাগল – কখনও বকতে-বকতে,কখনও চ্যাঁচাতে –চ্যাঁচাতে এবং কখনও মিনতি করতে করতে। তারপর অন্য একটা ঘরে ঢুকে আমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম।
অনেকক্ষণ ভেবে চিনতে শেষটা স্থির করলুম, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব,

- রামস্বামীর জিনিস তাকেই আবার ফিরিয়ে দেব।

সেইদিনই তার বাড়ির দিকে যাত্রা করলুম, কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলুম বাড়ির ভিতরে কারা উচ্চস্বরে কাঁদছে।

পাশেই এক দরজির দোকান। জিজ্ঞাসা করলুম ," এখানে এওত কান্নাকাটি কিসের?"

দরজি বললে," রামস্বামী মারা পড়েছে।"

আমি বললুম," অসম্ভব। রামস্বামী আজ চার ঘন্টা আগে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।"

দরজি বললে,"কি যে বল সাহেব। রামস্বামী মারা গিয়েছে কাল,চব্বিশ ঘন্টা আগে।"

আমার মনে উঠল ঝড় – বিস্ময়ের , আতঙ্কে,অনুতাপের ঝড়!

যথাসময়ে দেশের বাড়িতে ফিরে দেখি,মায়ের গলায় উপলমণির পদকখানা নেই।

জিজ্ঞাসা করে জানলুম , মা পদকখানা খুলে গহনার বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিন থেকে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভূতের রাজা

সরকারি কাজে বিদেশে থাকি। ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।

সাঁওতাল পরগনার যে-জায়গায় আমার কর্মস্থল ছিল, সেখান থেকে রেল স্টেশনে যেতে হলে প্রায় ত্রিশ মাইলেরও উপর পথ পার হতে হবে। পাহাড়ে পথ—এক এক মাইল হচ্ছে দু-তিন মাইলের ধাক্কা। তার উপরে রাতের বেলায় পথে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গেও আলাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়! সকালবেলায় বেরুলেও মাঝপথে সন্ধ্যা হবেই। তখন একটা আশ্রয়ের দরকার।

মাঝ-পথের কাছাকাছি স্থানীয় রাজার একটি শিকারকুঠি ছিল। রাজা বা তাঁর বন্ধুরা শিকারে বেরুলে এই কুঠি হত তাঁদের প্রধান আস্তানা।

রাজার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁকে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, শিকারকুঠিতে একটা রাতের জন্যে আমাকে মাথা গোঁজবার জায়গা দিতে হবে।

ম্যানেজার বললেন, 'এখন শিকারের সময় নয়, কুঠি খালি পড়ে আছে। আপনি এক রাত কেন, এক মাস থাকতে পারেন। এখানকার পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট টেলরসাহেবও আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম করবেন। কুঠিতে আরও ঘর আছে, আপনারও থাকবার অসুবিধা হবে না। কিন্তু—'

—'কিন্তু কী?'

—'কিন্তু আপনি সেখানে রাত কাটাতে পারবেন কি?'

—'কেন পারব না?'

—'লোকের মুখে শুনি, কুঠিতে নাকি অপদেবতার ভয় আছে।'

—'অপদেবতা?'

—'হ্যাঁ, অপদেবতা ছাড়া আর কী বলব? কুঠির পাশেই শালবনের ভেতর সাঁওতালদের এক ভূতুড়ে দেবতা আছে। সেই দেবতা নাকি ভূতের রাজা। তার ভয়ে সাঁওতালরা পর্যন্ত সন্ধ্যার পর ওপাড়া মাড়ায় না। তারা বলে, তাদের দেবতা নাকি রাতের বেলায় কুঠির ভেতরে ঘুমোতে আসে।'

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, 'বেশ তো, মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে রাত্রিবাস করব, এটা তো মস্ত পুণ্যের কথা! আমি রাজি!'

ম্যানেজার বললেন, 'আমি অবশ্য ওসব ছেলেমানুষি কথায় ততটা বিশ্বাস করি না, তবু বলা তো যায় না—'

যথাসময়ে ডুলিতে চড়ে রওনা হয়ে, সন্ধ্যার কিছু আগেই শিকারকুঠিতে পৌঁছোলুম।

ডুলি-বেয়ারা বলে গেল, মাইল তিনেক তফাতে একটা গাঁয়ে গিয়ে তারা আজকের রাতটা কাটাবে; কাল সকালে আবার ডুলি নিয়ে আসবে।

কুঠির বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে বসে টেলরসাহেব তামাকের পাইপ টানছিলেন। সাহেবের সঙ্গে আমারও বেশ পরিচয় ছিল।

আমাকে দেখে সাহেব বললেন, 'এই যে, গুপ্ত যে! তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

—'ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।...তুমি?'

—'আমি 'হোমে' যাচ্ছি। তুমি কি আজ এখানে থাকবে?'

—'হ্যাঁ সায়েব!'

—'বেশ, বেশ, দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটানো যাবে, এ ভালোই হল।'

—'দুজন কেন সাহেব, তিনজন।'

—'তিনজন আবার কে? তুমি কি আমার আর্দালির কথা বলছ? ও, তাকে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না।'

—'না সায়েব, তোমার আর্দালির কথা বলছি না।'

—'তবে কি কুঠির দ্বারবানের কথা ভাবছ? না, সে রাত্রে এখানে থাকে না।'

—'না না, আমি দ্বারবানের কথাও বলছি না!...তুমি কি শোনোনি সায়েব, সাঁওতালদের এক দেবতা রাত্রে আমাদের সঙ্গী হতে পারেন?'

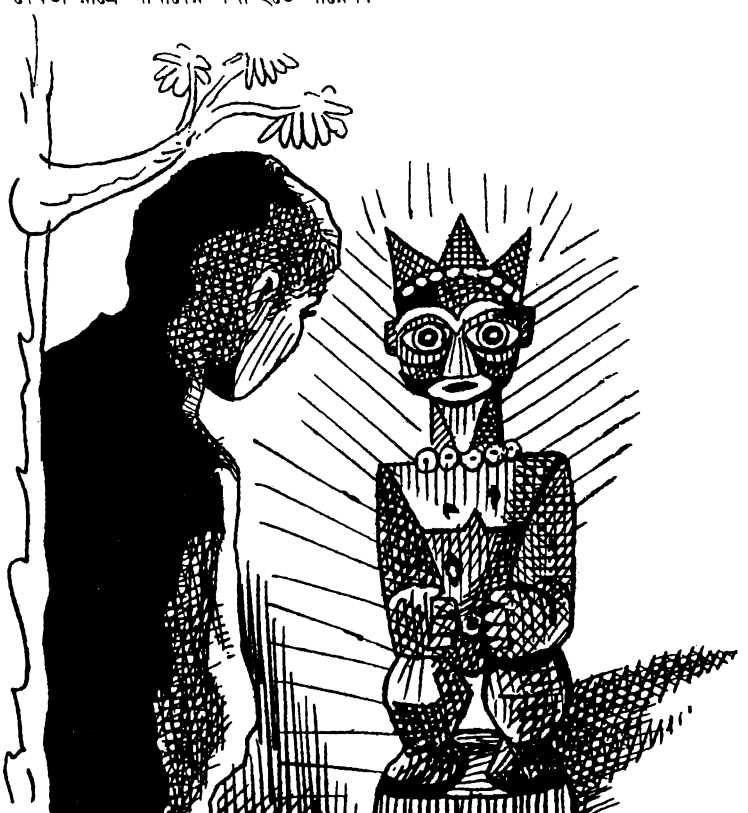

টেলর হেসে বললে, 'ওহো, শুনেছি বটে! তা, সে রূপকথার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।...তুমি করো নাকি?'

—'করলে, একলা এখানে রাত কাটাতে আসি?'

টেলর পাইপে তিন-চারটে টান মেরে বললে, 'দ্যাখো, গুপ্ত, সাঁওতালদের এই দেবতাটিকে আমি দেখেছি। এমন বীভৎস দেবতা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে।'

—'পছন্দ হয়েছে?'

—'হ্যাঁ। তাই ঠিক করেছি, কাল যাবার সময়ে তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ইংলন্ডে আমার বাড়ির বৈঠকখানায় তাকে সাজিয়ে রেখে দেব। আমার বন্ধুরা তাকে দেখলে খুব তারিফ করবেন।'

আমি হেসে বললুম, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কাল থেকে দেবতা আর কুঠির ভেতরে শুতে আসবে না? তবে এইবেলা তাঁকে একবার দর্শন করে আসি।...তাঁর আড্ডা কোথায়?'

টেলর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওই যে, ওইখানে। মিনিটখানেকের পথ।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। কুঠির পাশেই অনেকগুলো শালগাছ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই ছায়ায় একটা পাথুরে ঢিপির উপরে মানুষের মতো উঁচু একটা মূর্তিকে দেখতে পেলুম।

মূর্তিটা রং-করা কাঠের। তার দেহ মাপে মানুষের মতন বটে, কিন্তু তার মুখ দানবের মতন প্রকাণ্ড! আর সে মুখের ভাব কী ভয়ংকর! দেখলেই বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে থাকে।

মাথার চুলগুলো সাপের মতন ঝুলছে, কান দুটো হাতির মতন, মুখখানা খানিক সিংহ আর খানিক ভাল্লুকের মতন, দু'দুটো গোল গোল কাচের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। হাঁ-করা বড়ো বড়ো দাঁতওয়ালা মুখের ভিতর থেকে রাঙা টকটকে, লকলকে জিভের আধখানা বাইরে বেরিয়ে পড়ে ঝুলছে! কাঁধ ও মুণ্ডের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয়, কে যেন একটা লিকলিকে সরু বাঁখারির উপরে মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে। হাত দুখানা বাঘের থাবার মতো। কোমরের কাছ থেকে পা পর্যন্ত দেহের কোনও অঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। কাঠকে খুদে আর কোনও অঙ্গ গড়াই হয়নি। মূর্তির গায়ের রং আলকাতরার মতন কালো আর মুখের রং খানিক সাদা, খানিক তামাটে ও খানিক হলদে!

ভাবলুম, এ মূর্তি যদি সত্য সত্য রাত্রে কুঠির ভিতর ঘুমোতে আসে, তাহলে আমাদের ঘুম এ জীবনে আর ভাঙবে কি?

...ধীরে ধীরে কুঠির দিকে ফিরে এলুম। টেলর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিল। আমাকে দেখে সে বললে, 'গুপ্ত, খুব ঝড়-বৃষ্টি আসছে, ওই দ্যাখো!'

সত্য কথা। পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন কালো কষ্টিপাথর হয়ে গেছে। ঝড় উঠতে আর দেরি নেই।

ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে।

অনেক রাত। টেলরের নিমন্ত্রণ নিয়ে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ আগে 'ডিনার' খেয়েছি। এখন টেলর তার ঘরে হয়তো দিব্যি আরামে নিদ্রা দিচ্ছে—কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

ভূত-টুত কিছু মানি না—তবু কেন জানি না, মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছে! রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালি দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত আনাগোনা করছে। যত তাদের ভুলবার চেষ্টা করি আজেবাজে নানান কথা ভেবে—তত তারা মনের উপরে চেপে বসে, নরম মাটির উপরে ভারী পায়ের দাগের মতো।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝম-ঝম রম-রম! মাঝে মাঝে ঝোড়ো, দমকা হাওয়া হা-হা-হা-হা করে উঠছে!—যেন কোনও আহত আত্মার কান্না! চারিদিক থেকে বনের গাছপালাগুলো মর-মর-মর-মর করে যেন কোনও শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে! তারই ভিতর থেকে একবার শুনলুম হায়েনার অট্টহাসি, একবার শুনলুম শৃগাল দলের মরাকান্না, একবার শুনলুম বাঘের গর্জন!...

হঠাৎ আমার ঘরের দরজার উপর দুমদুম করে আঘাত হল! ধড়মড় করে আমি বিছানার উপরে উঠে বসলুম—সে কি আসছে? সে কি আসছে?

দরজার উপরে আর কোনও আঘাত হল না! ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় দরজা নড়ে উঠেছে নিশ্চয়! নিজের কাপুরুষতার জন্যে মনে মনে নিজেই লজ্জিত হয়ে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে বাহির থেকে খনখনে ঝাঁঝালো গলায় গান শুনলুম —

'লোগোবুরু ধীরকো সিনিন ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

এ তো সাঁওতালি ভাষা। নিশ্চয়ই কোনও সাঁওতাল গান গাইছে। কিন্তু এত রাত্রে, এমন ঝড়-বাদলে, এই হিংস্র জন্তু ভরা গভীর অরণ্যের মধ্যে কে সাঁওতাল মনের আনন্দে শখ করে গান গাইতে আসবে?

আবার দরজার উপরে ঘন ঘন আঘাত হল—এবারে আরও জোরে।.. আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয়, এ যে সত্য-সত্যই কে দরজা ঠেলছে আর ঠেলছে!'...তবে কি সে এসেছে? তবে কি সে এখানে ঘুমোতে এসেছে?

আবার গান শুনলুম! এবারে আমার খুব কাছে, একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে। সেই তীব্র খনখনে গলার গান!—

'লোগোবুরু ধীরকো সিনিন ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

হঠাৎ উলটো বিপদ! কুঠির ভিতর দিককার দরজায় ঘন ঘন আঘাত! ভিতরে-বাহিরে বিপদ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছি, এমনি সময়ে শুনলুম—'গুপ্ত! গুপ্ত! ভগবানের দোহাই, খোলো—দরজা খোলো শিগগির!'

এ তো টেলরের গলা!...আঃ! বাঁচলুম! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

টেলর হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল—তার চোখ-মুখ পাগলের মতো, তার হাতে বন্দুক!

আমি তাকে দু হাতে চেপে ধরে বললুম, 'মিঃ টেলর, হয়েছে কী? এত রাত্রে কী দরকার তোমার!'

টেলর দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'গুপ্ত, আমার ঘরের দরজায়

ক্রমাগত কে লাথি মারছে আর গান গাইছে! তুমিই কি আমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকছিলে?'

আমি বললুম, 'না, না! আমি আমার বিছানা ছেড়ে এক পা-ও নড়িনি! কিন্তু আমারও ঘরের দরজা যে কে নাড়ছে, আর গান গাইছে!...ওই শোনো!'

দুমদুম করে আমার ঘরের দরজায় আবার দু-বার প্রচণ্ড আঘাত হল—সঙ্গে সঙ্গে সেই গান —

'লোগোবুরু ধীরকো সিনিন ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

আচমকা আবার একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে দরজা জানলার উপরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খড়খড়ি দুমদাম করে খুলে গেল!...সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্ট দেখলুম, বারান্দার উপরে কার একটা জীবন্ত ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে? কে ও? কে ও? ওকি সেই-ই—যে প্রতি রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসে...আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল!

টেলরের বন্দুক ধ্রুম করে গর্জে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা সাঁৎ করে বারান্দার একপাশে, আমাদের চোখের আড়ালে সরে গেল। টেলর চেঁচিয়ে উঠল, 'গুপ্ত! গুপ্ত! জানলা বন্ধ করে দাও—জানলা বন্ধ করে দাও!'

পা চলতে চাইছিল না। কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালি কাপুরুষ, সেই ভয়ে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে দমন করে আমি জানলার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলুম।

টেলর টলতে টলতে আমার বিছানার উপরে বসে পড়ে বললে, 'গুপ্ত! কিছু মনে কোরো না, আমি আজ তোমার বিছানাতেই তোমার সঙ্গে রাত কাটাব!'

বাইরে আবার কে গান গাইলে —

'লোগোবুরু ধীরকো সিনিন ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

•

সকালবেলা। কিন্তু তখনও সমানভাবে বৃষ্টি ঝরছে আর ঝরছেই।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সারা আকাশখানা যেন কালো মেঘের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা; সূর্যকে যেন আজ কোনও অন্ধকার-রাহু গ্রাস করে ফেলেছে। যতদূর নজর চলে খালি দেখা যায় অগণ্য শ্যামল তরুর বিরাট সভা আর শৈলমালার গর্বোন্নত শিখর এবং তারই ভিতরে এসে পড়ছে তিরের চকচকে ফলার মতো বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারাগুলো। কোথাও পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বা কোনও জীবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—পথের উপর দিয়ে ক্রুদ্ধ জলস্রোত যেন কোন অদৃশ্য শত্রুকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে!

হঠাৎ বারান্দার এক কোণে চোখ গেল। কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একজন শুয়ে রয়েছে! কাছে গিয়ে ডাকলুম, 'এই। কে তুই?'

বার কয়েক ডাকাডাকির পর কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা সাঁওতালি মুখ বেরুল।

—'কে তুই!'

—'আমি ঠাকুরের পূজারি।'

—'ঠাকুর! কে ঠাকুর?'

—'যিনি ওই শালবনে থাকেন।'

—'এখানে কী করছিস?'

—'ঠাকুর রোজ রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসেন, তাই আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসি।'

—'কাল রাত্রে তাহলে তুই-ই দরজা ঠেলছিলি?'

—'আমিও ঠেলছিলুম, ঠাকুরও ঠেলছিলেন।'

—'আর গান গাইছিল কে?'

—'আমি।'

এমন সময় টেলরও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে সব কথা খুলে বললুম। টেলর তো শুনেই মহা খাপ্পা, ঘুষি পাকিয়ে পুরুতের দিকে ছুটে যাওয়া মাত্র সে এক লাফে বারান্দার রেলিং টপকে বাইরে পড়ে, বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেলর বললে, 'রাসকেলকে ধরতে পারলে একবার দেখিয়ে দিতুম! ওঃ, সারারাত কী অশান্তিতেই কেটেছে!'

আমি বললুম, 'যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছেই! এখন আমাদের কী উপায় হবে! কুঠির দ্বারবানও এল না, ডুলি-বেয়ারারাও এই দুর্যোগে বোধ হয় আসবে না। আমরা যাব কেমন করে?'

টেলর বললে, 'আমাকে যেমন করেই হোক আজ যেতে হবেই। বোম্বে যাবার টিকিট পর্যন্ত আমি কিনে ফেলেছি। উপায় থাকলে তোমাকেও আমি স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতুম। কিন্তু আমার 'টু-সিটার' গাড়ি—আমি, আমার আর্দালি, তুমি, তোমার চাকর আর তোমার মালপত্তর অতটুকু গাড়িতে তো ধরবে না, কাজেই তোমাকে এখানে ফেলে রেখেই আমাকে যেতে হবে।...আর্দালি!'

টেলরের আর্দালি এসে সেলাম করলে।

টেলর বললে, 'আমার মালপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে তোলো। তারপর শালবন থেকে সেই কাঠের পুতুলটা তুলে নিয়ে এসো।'

আমি বললুম, 'তুমি কি সত্যি সত্যিই ওই পুতুলটা ইংলন্ডে নিয়ে যেতে চাও?'

টেলর বললে, 'নিশ্চয়! আমার যে কথা সেই কাজ!'

আবার রাত এল। বৃষ্টি এখনও থামেনি, আমি এখনও কুঠিতে বন্দি হয়ে আছি।

টেলর চলে গেছে এবং যাবার সময়ে সাঁওতালদের ভূতের রাজাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সে আর এই কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসবে না।

চোখে ঘুম আসছিল না। একখানা ইংরেজি নভেল বার করে পড়তে বসলুম। ঘণ্টা দেড়েক পরে তন্দ্রার আবেশ এল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে শয়নের উপক্রম করছি, এমন সময়ে শুনলুম, বাইরের সিঁড়ির উপরে আওয়াজ হল ঠক ঠক ঠক!

ঠিক যেন কাঠের আওয়াজ! ঠক ঠক করতে করতে আওয়াজটা আমার ঘরের কাছ-বরাবর এল, তারপর দরজার উপরে শুনলুম ধাক্কার পর ধাক্কা! কী আপদ! টেলর তো পুতুলটাকে নিয়ে কোন সকালে বিদায় হয়েছে, এ আবার কে জ্বালাতে এল!

নিশ্চয়ই সে সাঁওতাল পুরুত ব্যাটা! সে হতভাগা রোজ রাত্রে এইখানে আরাম করে ঘুমোয় আর চারিদিকে রটিয়ে দেয় কুঠির ভিতরে ভূতের রাজা শুতে আসেন!

ধাক্কার জোর ক্রমেই বেড়ে চলল।...একবার ভাবলুম দরজা খুলে পুরুতটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দি। তারপর মনে হল সে কাজ ঠিক হবে না। এই দুর্যোগে বিজন জঙ্গলের ভিতরে রাত্রে একলা আমি এখানে আছি, যদি কোনও দুষ্টলোক কুমতলবে এসে থাকে?

বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার এক জায়গায় একটা ছ্যাঁদা ছিল, বন্দুকের নলটা সেইখানে রেখে চেঁচিয়ে বললুম, 'কে আছ চলে যাও, নইলে এখনই আমি বন্দুক ছুড়ব!'

কোনও জবাব নেই, দরজার উপরে ধাক্কাও থামল না।

—'এখনও আমার কথা শোনো, নইলে—'

বাইরে বিশ্রী গলায় কে হাসতে লাগল—হিহি, হিঃ, হিহি, হিঃ, হিহিহিহিহি—

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম,—সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপরে ধাক্কাও থেমে গেল।

ঠক ঠক করে একটা আওয়াজ ঘরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল—তারপর কুঠির সিঁড়ির উপরে শব্দ শুনলুম ঠক ঠক ঠক!

খানিক পরে অনেক দূর থেকে আবার সেই বিশ্রী হাসি শোনা গেল, হিহি হিঃ, হিহি হিঃ, হিহিহিহিহি—

সে হাসি অমানুষিক...শরীরের রক্ত যেন জল করে দেয়।

শেষ রাতে জল ধরে গেল।

সকালে দরজা খুলতেই কাঁচা সোনার মতন কচি রোদ এসে ঘরখানা যেন হাসিতে ভরিয়ে তুললে! রোদ দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল।

বারান্দায় বেরিয়েই দেখি, এককোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে! তেড়ে গিয়ে মারলুম তাকে এক ধাক্কা! ধড়মড় করে সে উঠে বসল। সেই সাঁওতাল পুরুতটা!

ক্রুদ্ধস্বরে বললুম, 'কাল আবার কী করতে এখানে এসেছিলি? ভারী চালাকি পেয়েছিস, না?'

লোকটার মুখের ভাব একটুও বদলাল না। শান্তস্বরে বললে, 'আমার ঠাকুর কাল এখানে ঘুমোতে এসেছিলেন, আমিও তাই এসেছিলুম।'

—'তোর ঠাকুর কোথায়? সায়েব তো তাকে নিয়ে চলে গেছে!'

—'আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন!'

—'মিথ্যা কথা! আমি নিজের চোখে দেখেছি, টেলর তাকে নিয়ে চলে গেছে।'

—'আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন!'

কুঠি থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটে পাশের শালবনে গিয়ে হাজির হলুম। সবিস্ময়ে দেখলুম, ভূতের রাজা চোখ পাকিয়ে লকলকে জিভ বার করে ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে!

আর—আর, ও কী? মূর্তির পেটের উপরে একটা গর্ত—ঠিক যেন বন্দুকের গুলির দাগ! গর্তের চারপাশে রক্ত জমাট হয়ে আছে—মূর্তির আরও নানা জায়গাতেও রক্তের চিহ্ন!

তবে কি আমার বন্দুকের গুলিই—ভাবতে পারলুম না, মূর্তির দিকে আর তাকাতেও পারলুম না, কেমন একটা অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল—প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

কলকাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে এই বিবরণ পড়লুম :—'সাঁওতাল পরগনার পুলিস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ জে টেলর কর্ম হইতে অবসর লইয়া বিলাতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে এক বিপদে পড়িয়া খুব সম্ভব তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। স্থানীয় জঙ্গলের ভিতরে তাঁহার মোটর গাড়ি পাওয়া গিয়াছে। মোটরের উপরে, ভিতরে ও চারিপাশে রক্তের দাগ, কিন্তু মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দালির কোনওই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ সন্দেহ করিতেছে, মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দালীকে ব্যাঘ্র বা অন্য কোনও হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে। নিকটস্থ জঙ্গলে এক নরখাদক ব্যাঘ্রেরও খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।'

সেই ভূতুড়ে মূর্তির গায়ে যে রক্তের দাগ লেগেছিল, তাহলে সে রক্ত হচ্ছে হতভাগ্য টেলরের আর তার আর্দালির গায়ের রক্ত?

এবং সেই সাঁওতাল পুরুতটাই নিশ্চয় কোনওগতিকে খবর পেয়ে ভূতের রাজাকে আবার শালবনে ফিরিয়ে এনেছিল?

মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলুম, শিকারকুঠিতে আর কখনও রাত্রিবাস করব না! কিসে কী হয়, কে জানে?

কে?

॥ ১ ॥

উড়িষ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। আমি আর রূপলাল। এদেশ-সেদেশ ঘুরে ভুবনেশ্বরে গিয়ে হাজির হলুম।

এক দুপুরবেলায় খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে গেলুম। যাওয়ার সময় পাণ্ডা সাবধান করে দিলে, আমরা যেন সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসি; কারণ খণ্ডগিরিতে নাকি নরখাদক বাঘের বিষম উপদ্রব হয়েছে। বাঘের কবলে পড়ে এক মাসের মধ্যে পাঁচজনের প্রাণ গিয়েছে।

একথা শুনে ভয় পেলুম না, কারণ আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল।

খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। এবং বেলা পড়ে ত সার সঙ্গে সঙ্গেই সারা আকাশ কালো করে শুরু হল ঝড় ও বৃষ্টি।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ডাকবাংলোর ভিতরে আশ্রয় নিলুম।

বিকাল গেল, সন্ধ্যাও উতরে গেল। কিন্তু সে ঝড়-বৃষ্টি তবু থামল না।

বাংলোর বেয়ারা এসে বললে, 'বাবু, আজ আপনারা এখান থেকে যাবেন কেমন করে?'

রূপলাল বললে, 'কেন, যেমন করে এসেছি তেমনি করেই ফিরে যাব। অর্থাৎ দু'পায়ে ভর দিয়ে।'

বেয়ারা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আজ আর তা পারবেন না। একে এই ঝড়-জল, তার ওপরে—শুনেছেন তো?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, বাঘের উপদ্রবের কথা বলছ তো? শুনেছি।'

বেয়ারা বললে, 'খালি বাঘ নয়, পেত্নির ভয়ও আছে!'

রূপলাল বললে, 'তাহলে আজ আমরা এই বাংলোতেই রাত কাটাব। জীবনে কখনও পেত্নি দেখিনি। আজ তাকে দেখব। আর, যদি পছন্দ হয়, তাহলে সেই পেত্নিটিকে বিয়ে করে দেশে ফিরব।'

বেয়ারা বললে, 'বাবু, আপনি জানেন না তাই ঠাট্টা করছেন। বেশ, আপনারা তাহলে আজ এখানে থাকবেন তো?'

আমরা বললুম, 'হ্যাঁ।'

বেয়ারা বললে, 'তাহলে আপনাদের জন্যে রান্নাবান্নার আয়োজন করি-গে।'—এই বলে সে চলে গেল।

রাত হল। বৃষ্টি এখনও ঝরছে, ঝড় এখনও গর্জন করছে।

॥ ২ ॥

রাত্রে খেতে বসেছি, এমন সময় বাংলোর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, এমন স্থানে এই দুর্যোগে দরজা ঠেলে কে?

বেয়ারা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

বাহির থেকে ভীত, কাতর নারী-কণ্ঠে সাড়া এল, 'শিগগির দরজা খুলে দাও! নইলে প্রাণে মারা গেলুম!'

উড়ে বেয়ারাটা সেইখানে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

আমি বললুম, 'অমন করছ কেন? যাও, দরজা খুলে দাও।'

বেয়ারা এক পা-ও নড়ল না, সেইখানে দাঁড়িয়ে তেমনি করেই কাঁপতে লাগল।

রূপলাল তার ভয় দেখে হাসতে হাসতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বেয়ারা ছুটে গিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বললে, 'পায়ে পড়ি বাবু, দরজা খুলবেন না! ও মানুষ নয়!'

রূপলাল বললে, 'বলেছি তো, আমি পেত্নি বিয়ে করতে চাই! ও মানুষ না হলেই আমি বেশি খুশি হব।'

বাহির থেকে আবার আর্তস্বরে শোনা গেল, 'বাঘ! বাঘ! রক্ষা করো! রক্ষা করো!'

রূপলাল আর বাধা মানলে না, বেয়ারাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে একটানে সে দরজার খিলটা খুলে দিলে।

একটা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে দরজা ঠেলে তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করলে একটি স্ত্রী-মূর্তি। তাকে ভালো করে দেখবার আগেই বাতাসের ঝাপটে ঘরের আলোটা গেল নিবে!

বেয়ারাটা হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

সেই অন্ধকার রাত্রি, সেই ঝড়-বৃষ্টির হুলুস্থুল, সেই পার্বত্য অরণ্যের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, সেই অভাবিত ও অজানা নারী-মূর্তির আকস্মিক আবির্ভাব এবং আলোকহীন ঘরের ভিতরে বেয়ারার সেই ক্রন্দন-স্বর,—এই সমস্ত মিলে চারদিকে কেমন একটা ছমছমে অস্বাভাবিক ভাব সৃষ্টি করলে!

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'রূপলাল, শিগগির দরজাটা বন্ধ করো, আমি আবার আলোটা জ্বেলে নি।'

রূপলাল দরজায় খিল তুলে দিলে। আমি আলোটা জ্বাললুম।

কৌতূহলী চোখে ফিরে দেখলুম, ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে একটি অসীম রূপসী মেয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে! তার এলোমেলো চুলগুলো এলিয়ে মুখ, কাঁধ ও বুকের উপর এসে পড়েছে এবং তার সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। মেয়েটির বয়স হবে আঠারো কী উনিশ।

ঘরের আর একদিকে মেঝের উপরে উবু হয়ে বসে, দুই হাতে মুখ ঢেকে উড়ে বেয়ারাটা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মেয়েটি প্রথমেই আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'ও লোকটি অমন করে কাঁদছে কেন?'

রূপলাল হাসতে হাসতে বললে, 'ওর ধারণা আপনি একটি নিখুঁত পেত্নি!'

মেয়েটি চমকে উঠল। তারপর মুখের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে বললে, 'আমায় কি পেত্নির মতো দেখতে? কিন্তু সে কথা থাক, বড়ো বিপদ থেকেই আপনারা আমায় উদ্ধার করলেন!'

তার বিপদের ইতিহাস হচ্ছে এই। সে খণ্ডগিরি দেখতে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি আসাতে এতক্ষণ সে একটা গুহার ভিতরে ঢুকে আত্মরক্ষা করছিল। হয়তো সেই গুহার ভিতরেই সে রাতটা কাটিয়ে দিত, কিন্তু গুহার খুব কাছেই বাঘের ভীষণ গর্জন শুনে প্রাণের ভয়ে সে এখানে পালিয়ে এসেছে।

রূপলাল নিজের সিল্কের চাদরখানা খুলে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললে, 'আপনার কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেছে। পাশের ঘরে গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে আপাতত এই চাদরখানা ব্যবহার করতে পারেন।...কিন্তু আজ রাতে খাবেন কী? আমাদের তো খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে।'

মেয়েটি পাশের ঘরে যেতে যেতে বললে, 'এক রাত না খেলে কেউ মরে না।'

॥ ৩ ॥

আমি ও রূপলাল আলোর শিখাটা খুব কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। বন্দুকটাকে শুইয়ে রাখলুম ঠিক আমাদের মাঝে।

শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলুম বন-জঙ্গলের উপরে, পাহাড়ের উপরে বৃষ্টি-বালার অশ্রান্ত নৃত্য-নূপুরধ্বনি।

রূপলাল আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'আচ্ছা ভাই, ওই মেয়েটির ইতিহাস কি তোমার কাছে একটু উদ্ভট বলে মনে হল না?'

আমি বললুম, 'কেন?'

রূপলাল বললে, 'ও মেয়েটি কে? ওর কি কোনও অভিভাবক নেই? অত বড়ো মেয়েকে কেউ কি একলা এই বিদেশে ছেড়ে দেয়? ওর মাথায় সিঁদুর নেই, গায়েও একখানা গয়না নেই, ওর সবই যেন কেমন রহস্যময়!'

আমি পাশ ফিরে শুয়ে বললুম, 'ওই সব বাজে কথা ভেবে তুমি মাথা গরম করতে থাকো, ততক্ষণে আমি এক ঘুম ঘুমিয়ে নি।'

আমার যখন বেশ তন্দ্রা আসছে তখন শুনলুম, রূপলাল আপন মনে বলছে, 'অমন সুন্দরি মেয়ে, কিন্তু তার চোখ দুটো কী তীক্ষ্ণ! ওর চোখ দুটো যেন ওর নিজের চোখ নয়, যেন কোনও হিংস্র জন্তুর চোখ!'

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না। হঠাৎ কী একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলুম। তারপর চোখ খুলেই যে দৃশ্য দেখলুম সারা জীবনে কোনওদিন তা ভুলতে পারব না।

এঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজার দিকে পিছন করে মাটির উপরে স্থিরভাবে বসে আছে প্রকাণ্ড একটা বাঘ!

আমার বুকের গতি হঠাৎ যেন থেমে গেল। অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে স্তম্ভিত নেত্রে বাঘটার দিকে তাকিয়ে রইলুম, সেও তাকিয়ে রইল আমার দিকে। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ইতিমধ্যে অল্পে-অল্পে হাত সরিয়ে পাশের বন্দুকটা আমি চেপে ধরলুম।

বাঘটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ল লাফ মারবার জন্যে।

চোখের নিমেষে আমিও বন্দুকটা নিয়ে উঠে বসলুম এবং তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লুম।

একটা উলটো ডিগবাজি খেয়ে বাঘটা পাশের ঘরে গিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-কণ্ঠে বারবার ভীষণ আর্তনাদ! দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ! দ্রুত পদধ্বনি! তারপরে সব আবার স্তব্ধ!

বন্দুক হাতে করে অভিভূতের মতো বিছানার উপরে বসে রইলুম,—রূপলাল জেগে বিছানার উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে উঠল, 'কে চেঁচালে অমন করে? বন্দুক ছুড়লে কেন?'

আমি বললুম, 'বাঘ, বাঘ! এখন ও-ঘরে গিয়ে ঢুকেছে! সেই মেয়েটি চিৎকার করছে!'

—'সর্বনাশ! বাঘ বোধহয় তাকেই ধরেছে'—বলতে বলতে বেগে রূপলাল পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। আমিও বন্দুক আর লণ্ঠনটা নিয়ে তার সঙ্গে ছুটলুম।

পাশের ঘরে কেউ নেই। খালি একটা খোলা দরজা দিয়ে হু-হু করে জোলো হাওয়া আসছে।

রূপলাল বেদনা-বিদীর্ণ স্বরে বললে, 'আর কোনও আশা নেই। অভাগী শেষটা সেই বাঘের কবলেই গিয়ে পড়ল! কিন্তু বাঘ এখানে এল কেমন করে?'

রূপলালের কথার কোনও জবাব দিলুম না। আমি তখন আর একটা ব্যাপার সবিস্ময়ে

লক্ষ করছিলুম। ঘরের ভিতর থেকে একটা একটানা রক্তের রেখা বাহিরের দিকে সোজা চলে গিয়েছে। পরে পরে একখানা করে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ। মানুষের পা!

সবিস্ময়ে বললুম, 'দ্যাখো রূপলাল, দ্যাখো! কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

রূপলাল অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর থেমে থেমে ধীরে ধীরে বললে, 'এত রক্ত, কিন্তু একটাও বাঘের পায়ের দাগ নেই কেন? এ পায়ের দাগগুলো দেখলে মনে হয়, যেন কোনও মানুষের একখানা পা আহত হয়েছে আর সেই আহত পায়ের রক্ত ছড়াতে ছড়াতে সে এঘর থেকে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। বাঘ যদি সেই মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যেত তাহলে তাকে মুখে করে টেনে-হিঁচড়েই নিয়ে যেত, আর তাহলে এখানে কখনই এমন পায়ের ছাপ পড়ত না।'

সেই রক্তের দাগ ধরে আমরা বাইরে বেরিয়ে গেলুম।

এবারে দেখলুম কাদার উপর দিয়ে একজোড়া মানুষের পায়ের ছাপ বরাবর বনের দিকে চলে গিয়েছে।

রূপলাল মাথা নেড়ে বললে, 'তুমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছ নিশ্চয়। সেই মেয়েটি আবার পালিয়েছে, বাঘ-টাঘ কিছুই এখানে আসেনি!'

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'আমি নিজের চোখে বাঘ দেখেছি, নিজের হাতে গুলি করেছি, আর সে নিশ্চয় আহত হয়েছে!'

রূপলাল বললে, 'তোমার গুলি খেয়ে বাঘ কি পাখি হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল? দরজার সামনে এই কাদামাটি, কিন্তু এখানে বাঘের পায়ের দাগ কোথায়? ঘরের ভিতরে মেয়েটি ছিল, কেবল সেই-ই যে বেরিয়ে গেছে তার স্পষ্ট চিহ্ন কাদার উপরে রয়েছে! কোনও বাঘ ঘর থেকে বেরোয়নি! আমার বোধহয় তোমার গুলিতে সেই মেয়েটি আহত হয়ে পালিয়ে গেছে!'

হঠাৎ একটা বিচিত্র সম্ভাবনা আমার মাথার ভিতরে জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি রূপলালকে টানতে টানতে আবার ঘরের ভিতরে এনে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সভয়ে আমি বললুম, 'রূপলাল, রূপলাল! পৃথিবীর সব দেশের লোকেরই একটা বিশ্বাস আছে, কোনও কোনও বাঘ নাকি আসলে বাঘ নয়! রূপলাল, আজ রাত্রে যে স্ত্রীলোকটা এখানে এসেছিল, সে কে? গুলি করলুম বাঘকে, চিৎকার করলে একটা স্ত্রীলোক! এর মানে কী?—সে কে? সে কে?'

রূপলাল অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও তাহলে ওই উড়ে বেয়ারাটার কথাই সত্যি?'

মিসেস কুমুদিনী চৌধুরি

॥ ১ ॥

আমি ঔপন্যাসিক। কেবল এইটুকু বললেই সব বলা হয় না, আমি উপন্যাস লিখে টাকা রোজগার করি—অর্থাৎ আমি যদি উপন্যাস না লিখি তাহলে আমার পেটও চলবে না। অর্থাৎ উপন্যাস লেখা হচ্ছে আমার পেশা।

কিন্তু এ পেশা বুঝি আর চলে না। বাড়িতে রোজ এত লোকের ভিড়—মাসিকপত্রের সম্পাদকের তাগাদা, চেনা-অচেনা লোকের আনাগোনা, বন্ধুবান্ধবদের তাস-দাবার আড্ডা, এই সব সামলাতে সামলাতেই প্রতিদিন কেটে যায়। যখন একলা হবার সময় পাই তখন আসে ঘুমের সময়।

কাজেই কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছাড়তে হল। স্থির করলুম অন্তত একখানা উপন্যাস না লিখে আর কলকাতায় ফিরব না। বিদেশে নিশ্চয়ই বাসায় এত চেনা-অচেনা লোকের ভিড় হবে না।

সিধে চলে গেলুম ঝাঁঝা জংশনে। একখানি ছোটোখাটো বাংলো ভাড়া নিলুম। সকালে ও বিকালে বেড়িয়ে বেড়াই, দুপুর ও সন্ধ্যাবেলাটা কেটে যায় উপন্যাস লেখায়।

ভিড়ের ভয়ে বিদেশে পালিয়ে এলেও মানুষের সঙ্গ বিনা মানুষের প্রাণ বাঁচে না। ঝাঁঝায় এসেও তিন-চারজন লোকের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা হল। একজন হচ্ছেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরি। তিনি বিধবা। তাঁর স্বামী পেশোয়ারে কাজ করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি ঝাঁঝায় এসে বাস করছেন। তাঁর সন্তানাদি কেউ নেই। ধর্মে তিনি খ্রিস্টান।

আমার আর একজন নতুন বন্ধুর নাম অমূল্যবাবু। এ ভদ্রলোকের বয়স হবে বছর পঞ্চাশ। কলকাতার কোনও কলেজে প্রোফেসারি করতেন, এখন অবকাশ নিয়ে এইখানে বসেই লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটিয়ে দেন। অমূল্যবাবু পরলোকতত্ত্ব নিয়ে সারাজীবনই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, মৃত্যুর পরে জীবের কী অবস্থা হয় তাঁর মুখে সর্বদাই সে কথা শুনতে পাওয়া যায়।

এখানকার রেলের ডাক্তার গোবিন্দবাবুর সঙ্গেও আলাপ হল। তিনি খুব সাদাসিধে ভালোমানুষ লোক এবং সন্ধ্যা হলেই ভূতের ভয়ে কাতর হয়ে পড়েন। সূর্যাস্তের পর তিনি প্রাণান্তেও অমূল্যবাবুর বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে রাজি হন না, কারণ পাছে তাঁকে কাছে পেয়ে অমূল্যবাবু দু-চারটে পরলোকের কাহিনি শুনিয়ে দেন।

॥ ২ ॥

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি অমূল্যবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিলুম। কথা হচ্ছিল পৃথিবীতে সত্য সত্যই পিশাচের অস্তিত্ব আছে কি না?

অমূল্যবাবুর বিশ্বাস, পৃথিবীতে সেকালেও পিশাচ ছিল, একালেও আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'পিশাচ কাকে বলে?'

অমূল্যবাবু বললেন, 'প্রেতাত্মাদের আমাদের মতো দেহ নেই—একথা তুমি জানো। দেহ না থাকলেও দুষ্ট প্রেতাত্মাদের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই প্রবল হয়ে থাকে। কিন্তু দেহের অভাবে তারা সে আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না। তাই অনেক সময় দুষ্ট প্রেতাত্মারা মানুষের অরক্ষিত মৃতদেহের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন সেই মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠে জীবিত মানুষদের ধরে রক্তশোষণ করে। এই জীবন্ত মৃতদেহগুলোই পিশাচ নামে খ্যাত।'

অমূল্যবাবু এমন দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলি বললেন যে, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমি বললুম, 'প্রায়ই শুনতে পাই অমুক লোক রক্তস্বল্পতা রোগে মারা গিয়েছে। আপনি কি বলতে চান যে পিশাচরাই তাদের মৃত্যুর কারণ?'

অমূল্যবাবু বললেন, 'অনেক সময় হতেও পারে, অনেক সময় নাও হতে পারে।'

ঠিক এই সময়ই মিসেস কুমুদিনী অমূল্যবাবুর বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'কিসের গল্প হচ্ছে?'

আমি বললুম, 'অমূল্যবাবু আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন।'

কুমুদিনী একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললেন, 'ও, ভূতের গল্প বুঝি? বেশ, বেশ, ভূতের গল্প শুনে ভয় পেতে আমি ভালোবাসি! অমূল্যবাবু, আমাকে একটা ভয়ানক ভূতের গল্প বলুন না!'

অমূল্যবাবু বললেন, 'ভয়ানক ভূত কাকে বলে আমি তো জানি না। তবে আজ আমি পিশাচের গল্প করছিলুম বটে।'

কুমুদিনী খানিকক্ষণ নীরবে অমূল্যবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আচ্ছা অমূল্যবাবু, পিশাচের কথা সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন কি?'

অমূল্যবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সত্যি বিশ্বাস করি। খালি তাই নয়, আমার ধারণা সম্প্রতি এই ঝাঁঝাতেই বোধহয় পিশাচের উপদ্রব শুরু হয়েছে।'

আমি সচমকে অমূল্যবাবুর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালুম।

কুমুদিনীরও মুখ ভয়ে ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু সে-ভাবটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার এমন গাঁজাখুরি ধারণার কারণ কী শুনি?'

অমূল্যবাবু স্থিরভাবেই বললেন, 'সম্প্রতি এখানে রক্তস্বল্পতা রোগে মৃত্যুর হার বড়ো বেড়ে উঠেছে। এর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।'

কুমুদিনী উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেশ তো অমূল্যবাবু, আপনি একটা পিশাচকে বন্দি করবার চেষ্টা করুন না!'

অমূল্যবাবু শুষ্কস্বরে বললেন, 'হুঁ। সেই চেষ্টাই করব।'

ভূত না মানলেও ভূতের ভয় যে ছাড়ে না, অমূল্যবাবুর ওখান থেকে সেদিন আসতে আসতে সে প্রমাণটা ভালো করেই পেলুম। সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রত্যেক আনাচে-কানাচে মনে হতে লাগল, যেন সত্য সত্যই কোনও জীবন্ত মৃতদেহ আমার দিকে লক্ষ স্থির করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে!

॥ ৩ ॥

অমূল্যবাবু প্রতিদিন সকালে আমার বাসায় এসে চা পান করতেন।

সেদিন সকালেও বাংলোর বারান্দায় বসে আমরা দুজনে চা পান করছি, এমন সময়ে দেখলুম সামনের পথ দিয়ে ডাক্তার গোবিন্দবাবু কোথায় যাচ্ছেন।

আমি চেঁচিয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা পান করবার জন্যে আহ্বান করলুম।

গোবিন্দবাবু কাছে এসে বললেন, 'চা পান করতে আমি রাজি আছি, কিন্তু ভায়া, শিগগির! আমার একটুও দেরি করবার সময় নেই।'

আমি বললুম, 'কেন, আপনার এত তাড়াতাড়ি কিসের?'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'মিসেস কুমুদিনী চৌধুরির মালির ছেলের ভারী অসুখ! বোধহয় বাঁচবে না।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী অসুখ?'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'রক্তস্বল্পতা—অর্থাৎ অ্যানিমিয়া।'

অমূল্যবাবু চা পান করতে করতে হঠাৎ পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'ডাক্তার, ঝাঁঝায় এত অ্যানিমিয়ার বাড়াবাড়ির কারণ কি বলতে পারো?'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'না। কিন্তু এই রোগের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি!'

অমূল্যবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিসেস কুমুদিনী চৌধুরির মালির ছেলেকে আমি জানি। তার নাম গদাধর, সে রোজ আমাকে ফুল দিয়ে যায়। তিনদিন আগেও তাকে আমি দেখেছি, জোয়ান সোমত্ত ছেলে! আর তুমি বলছ ডাক্তার, এরই মধ্যে তার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে! অ্যানিমিয়া রোগে এত তাড়াতাড়ি কারুর অবস্থা খারাপ হয় না। চলো ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমরাও গিয়ে গদাধরকে একবার দেখে আসি।'

আমার বাংলো থেকে মিসেস চৌধুরির বাংলোয় যেতে চার-পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। মিসেস চৌধুরির বাগানের এক কোণে মালির ঘর। আমরা সকলে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলুম।

ঘরের ভিতরে একপাশে বুড়ো মালি মাথায় হাত দিয়ে ম্লানমুখে বসে আছে। গদাধর শুয়ে আছে একখানা চৌকির উপরে। তার মুখ এমন বিবর্ণ ও রক্তশূন্য যে দেখলেই মনে হয়, মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই।

ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে চুপি চুপি আমাদের বললেন, 'আজকের রাত বোধহয় কাটবে না।'

অমূল্যবাবু গদাধরের পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর রোগীর গায়ের কাপড়টা খুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কী দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে গদাধরের গলা ও বুকের মাঝখানে একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ডাক্তার, এটা কীসের দাগ?'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'ওটা ক্ষতচিহ্ন বলেই মনে হচ্ছে। যা নোংরা ঘর, ইঁদুর-টিদুর কামড়েছে বোধহয়!'

অমূল্যবাবু গদাধরের বাপকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছেলেকে সেবা করে কে?'

বুড়ো মালি বললে, 'বাবু, গিন্নিমা (অর্থাৎ মিসেস চৌধুরি) গদাধরকে বড়ো ভালোবাসেন, ঠিক নিজের ছেলের মতন। ওকে দেখাশুনো করেন তিনিই, ওর জন্যে দিনে তাঁর বিশ্রাম নেই রাতে তাঁর ঘুম নেই!'

অমূল্যবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, 'রোগীর ভালোরকম যত্ন-সেবা হচ্ছে না। গদাধরকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাব! ডাক্তার, তোমার রেলের দু-চারজন কুলিকে ডাকো, গদাধরকে তারা এখনই আমার বাড়িতে নিয়ে চলুক। আমার বিশ্বাস একে আমি নিশ্চয় বাঁচাতে পারব!'

অমূল্যবাবুর এই অদ্ভুত বিশ্বাসের কারণ কী আমরা বুঝতে পারলুম না। রোগ হয়েছে রোগীর দেহে, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি নিয়ে গেলে তার কী উপকার হতে পারে? যাক, কথামতোই কাজ করা হল।

গদাধরকে যখন বাগানের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই সময় মিসেস কুমুদিনী তাঁর বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে নেমে এসে তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, 'একী ব্যাপার, গদাধরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

অমূল্যবাবু বললেন, 'আমার বাড়িতে। এখানে ওর ঠিকমতো সেবা আর চিকিৎসা হচ্ছে না।'

কুমুদিনীর দুই চোখে একটা ক্রোধের ভাব ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'বেশ, আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন। গদাধর আরাম হলে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না।'

॥ ৪ ॥

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। গাছপালার আর্তনাদ ও মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপর থেকে হুড়হুড় করে বৃষ্টি ধারা নেমে আসার শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

অনেক রাতে আচম্বিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসে মনে হল, জানলার শার্সির উপরে বাইরে থেকে কে যেন ঠক ঠক করে আওয়াজ করছে!

প্রথমটা ভাবলুম আমারই মনের ভুল। বাইরে তখনও সমান তোড়ে বৃষ্টি ঝরছে, বাজ ডাকছে ও ঝড় হই-হই করছে, এমন দুর্যোগে শার্সির উপরে করাঘাত করতে আসবে কে? হয়তো ঝোড়ো-হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকতে চায়!

আবার বিছানার উপরে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তখনই শার্সির উপরে আবার শব্দ হল—ঠক ঠক ঠক। ঠক ঠক ঠক। ঠক ঠক ঠক।

সবিস্ময়ে বিছানার উপর থেকে লাফিয়ে পড়লুম! আর তো কোনওই সন্দেহ নেই! কে

এল? এই বন-জঙ্গল-পাহাড়ের দেশে এই ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকারে কে আমার ঘরের ভিতর ঢুকতে চায়?

অজানা বিদেশে বলে শোবার বালিশের তলায় রোজই একটা 'টর্চ' রেখে দিতুম। টপ করে 'টর্চ'টা তুলে নিয়েই জ্বেলে জানলার উপরে আলোটা ফেললুম! সেই তীব্র আলোকে দেখলুম, বদ্ধ শার্সির উপরে দুই হাত ও মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি! ঝোড়ো হাওয়ায় রাশি রাশি কালো কালো লম্বা চুল এসে তার সারা মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং সেই চুলের ফাঁকে ফাঁকে আগুনের মতন দপ দপ করে জ্বলছে তার দুটো বিস্ফারিত চক্ষু!

পরমুহূর্তে মুখখানা আলোকরেখার ভিতর থেকে সাঁৎ করে সরে গেল!

এ কী দুঃস্বপ্ন! ভয়ে মুষড়ে আলো নিবিয়ে বিছানার উপরে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লুম!

আতঙ্কে সারারাত আর ঘুম হল না। কেবলই মনে হতে লাগল, শার্সির কাচ ভেঙে ওই বুঝি এক অমানুষিক মূর্তি ঘরের ভিতরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে!

॥ ৫ ॥

জানলা দিয়ে সকালের আলো ঘরের ভিতর এসে পড়েছে, কিন্তু তখনও আমি জড়ভরতের মতো বিছানার উপরে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। এমন সময় বাইরে থেকে শুনলুম আমার নাম ধরে ডাকছেন অমূল্যবাবু। আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

অমূল্যবাবু ঘরের ভিতরে এলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত ভোরে আপনি যে! গদাধরের অসুখ বেড়েছে নাকি?'

অমূল্যবাবু বিছানার উপর উঠে বসে হাসিমুখে বললেন, 'অসুখ বেড়েছে কী, এই অল্প সময়েই গদাধর প্রায় সেরে উঠেছে!'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'বলেন কী! কী করে সারল?'

অমূল্যবাবু বললেন, 'গদাধরের কোনও অসুখ তো হয়নি, সে পড়েছিল পিশাচের পাল্লায়!'

চেষ্টা করেও আমি হাসি থামাতে পারলুম না। কৌতুকভরে বললুম, 'আপনি কি চারিদিকেই এখন পিশাচের স্বপ্ন দেখছেন?'

অমূল্যবাবু অটলভাবেই বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা হয় বলো, আমি কোনওই প্রতিবাদ করব না। গদাধর কেন বেঁচেছে জানো? কাল দিনরাত তার শিয়রে বসে আমি পাহারা দিয়েছি বলে। কারুকে তার ত্রিসীমানায় আসতে দিইনি! কাল রাতে আবার কেউ যদি তার রক্তশোষণ করত, তা হলে আজ আর তাকে জীবিত দেখতে পেতে না।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'রক্তশোষণ! অমূল্যবাবু, কী আপনি বলছেন? কে তার রক্তশোষণ করত?'

অমূল্যবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার ও-কথার কোনও জবাব আগে আমি দেব না। কাল রাতে আমি স্বচক্ষে কী দেখেছি তোমার কাছে আগে

সেই কথাই বলতে চাই। তুমি জানো, আমার বাড়ি দোতলা। গদাধরকে আমি দোতলার ঘরেই শুইয়ে রেখেছিলুম। পাহারা দেবার জন্যে তার পাশে বসে কাল সারারাত আমি কাটিয়ে দিয়েছি। কালকের রাতের ঝড়-বৃষ্টির কথা তুমিও টের পেয়েছ বোধহয়। মাঝরাত্রে ঝড়-বৃষ্টির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। সেই সময় বই পড়তে পড়তে হঠাৎ আমি মুখ তুলে দেখি, জানলার ঠিক বাইরেই একটা স্ত্রী-মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দোতলার ঘর, মাটি থেকে সেই জানলাটা অন্তত বিশ ফুট উঁচু, সেখানে কোনও স্বাভাবিক মানুষের মূর্তির আবির্ভাব যে সম্ভবপর নয়, একথা তুমি বুঝতেই পারছ! আমি অবাক হয়ে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। ঘরের আলো তার মুখের উপরে গিয়ে পড়েছিল, তাকে দেখেই আমি চিনতে পারলুম। কে সে, কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

আমি হতভম্বের মতো ঘাড় নেড়ে জানালুম—না।

অমূল্যবাবু বললেন, 'সে মূর্তি হচ্ছে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরির। ...কুমুদিনী খুব হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ালুম। তারপর শার্সি খুলে খড়খড়ির পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলুম সজোরে! আমাকে বাধা দেবার জন্যে মূর্তিটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল—কিন্তু বাধা দিতে পারলে না। আমার মনে হল, জানলা বন্ধ করবার সময় তার ডান হাতখানা পাল্লার তলায় পড়ে চেপটে গেল! তারপরেও জানলার উপরে আরও কয়েকবার করাঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম, কিন্তু সেদিকে আমি আর ভ্রুক্ষেপও করলুম না। এখন বলো, আমার কথা পাগলের গল্প বলে মনে হচ্ছে?'

'আমি রুদ্ধশ্বাস বলে উঠলুম, 'অমূল্যবাবু, অমূল্যবাবু! আপনি কী বলছেন! মিসেস কুমুদিনী চৌধুরি—'

অমূল্যবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'শোনো। টেলিগ্রামে আমি আর এক খবর আনিয়েছি। পেশোয়ারে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরির স্বামী মারা যান অ্যানিমিয়া রোগে। আর মিসেস কুমুদিনী চৌধুরিও তাঁর মৃত্যুর পনেরো দিন আগে দেহত্যাগ করেছেন!'

আমার সর্বশরীর কেমনধারা করতে লাগল, টেবিলের একটা কোণ ধরে তাড়াতাড়ি চেয়ারের উপরে বসে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে অমূল্যবাবুর কাছে আমিও কাল রাত্রে যা দেখেছি, সেই ঘটনাটা খুলে বললুম।

অমূল্যবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

ফিরে দেখলুম, বাংলোর সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে উঠলেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরি! তাঁকে দেখেই সর্বপ্রথমে আমার চোখ পড়ল তাঁর ডান হাতের দিকে। তাঁর ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা!

কুমুদিনীও আসতে আসতে অমূল্যবাবুকে আমার ঘরে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তাঁর মুখে-চোখে এমন একটা অমানুষিক বিশ্রী ভাব জেগে উঠল যা কোনওদিন কোনও মানুষেরই মুখে আমি লক্ষ করিনি!

তারপরেই দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে তিরের মতন তিনি বারান্দার উপর থেকে নেমে গেলেন এবং সেই রকম বেগেই সামনের দিকে ছুটে চললেন।

আমি দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'মিসেস চৌধুরি সাবধান! ট্রেন, ট্রেন—'

কিন্তু আমার মুখের কথা মুখেই রইল; আমার বাংলোর সামনে দিয়ে যে রেলপথ চলে গেছে, কুমুদিনী তার উপরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, একখানা ইঞ্জিন হুড়মুড় করে একেবারে তাঁর দেহের উপর এসে পড়ল—

ভয়ে আমি দুই চোখ বুজে ফেললুম—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম তীক্ষ্ণ এক মর্মভেদী আর্তনাদ, তারপরেই সব স্তব্ধ!

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে রইলুম, আমার চারিদিকে পৃথিবী যেন ঘুরতে লাগল এবং সেই অবস্থাতেই শুনলুম অমূল্যবাবু বলেছেন, 'স্থির হও ভাই, স্থির হও! ট্রেনে যে চাপা পড়ল, ও কোনও মানুষের দেহ নয়, ও হচ্ছে কোনও পিশাচের আশ্রিত দেহ!'

॥ ৬ ॥

ঝাঁঝার গোরস্থানে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরির দেহ কবর দেওয়া হল।

তারপর মাসখানেক কেটে গেল। এই ভীষণ ঘটনার ছাপ আমাদেরও মনের উপর থেকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটা বিষয় সম্বন্ধে এখনও আমাদের মনের ধাঁধা ঘুচল না।

ঝাঁঝায় রক্তস্বল্পতা রোগের বাড়াবাড়ি এখনও কমলো না কেন, তাই নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

অমূল্যবাবু পর্যন্ত ধাঁধায় পড়ে গেছেন। তিনিও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'তাই তো হে, রক্তস্বল্পতা রোগটা এখানে সংক্রামক হয়ে দাঁড়াল নাকি? এর কারণ তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!'

কিছুদিন পরে একদিন নদীর ধার থেকে ফিরতে আমার রাত হয়ে গেল। সে রাতটা ছিল চমৎকার, পরিপূর্ণ পূর্ণিমা নদীর জলকে যেন মেজে-ঘষে রুপোর মতো চকচকে করে তুলেছে এবং চারিদিক ধবধব করছে প্রায় দিনের বেলার মতো। এই পূর্ণিমার শোভা দেখবার জন্যেই এতক্ষণ আমি নদীর ধারে অপেক্ষা করছিলুম।

বিভোর হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বাসার পথে ফিরে আসছি। গভীর স্তব্ধতার ভিতরে ঝিল্লিরব ছাড়া আর কোনও কিছুরই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পথও একান্ত নির্জন।

প্রাণে হঠাৎ গান গাইবার সাধ হল—এমন রাতের সৃষ্টি তো গান গাইবার জন্যেই!

কিন্তু গান গাইবার উপক্রম করতেই সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল!

পথের একটা মোড় ফিরে প্রায় আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরি!

আমার দেখবার কোনও ভ্রম হয়নি, তেমন উজ্জ্বল পূর্ণিমায় ভ্রম হবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

ভাগ্যে কুমুদিনী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাই আমাকে তিনি দেখতে পেলেন না। আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে সরে গেলুম।

কুমুদিনী সেই পথ ধরে একদিকে অগ্রসর হলেন, আমি স্তম্ভিত নেত্রে লক্ষ করলুম, তাঁর দেহ যেন মাটির উপর দিয়ে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে না—শূন্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একখানা মেঘের মতন!

পথের বাঁকে সেই অদ্ভুত ও ভীষণ মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং আমিও ছুটতে লাগলুম রুদ্ধশ্বাসে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে!

ছুটতে ছুটতে একেবারে অমূল্যবাবুর বাড়িতে! অমূল্যবাবু বৈঠকখানায় একলা বসে বই পড়ছিলেন, হঠাৎ আমাকে সেইভাবে সেখানে গিয়ে পড়তে দেখে নির্বাক বিস্ময়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন।

আমি প্রায়-রুদ্ধস্বরে বলে উঠলুম,—'মিসেস চৌধুরি, মিসেস চৌধুরি! অমূল্যবাবু, এইমাত্র মিসেস চৌধুরির সঙ্গে আমার দেখা হল!'

অমূল্যবাবু সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'তার মানে?'

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'নদীর পথ দিয়ে ফিরে আসছিলুম, মিসেস কুমুদিনী চৌধুরি প্রায় আমার পাশ দিয়ে এইমাত্র চলে গেলেন।'

—'তুমি ঠিক দেখেছ?'

—'আপনাকে যেমন ঠিক দেখছি, তাঁকেও ঠিক তেমনি দেখেছি।'

—'ওঠো, ওঠো! আর দেরি নয়, এখনই আমার সঙ্গে চলো। এখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।'

অমূল্যবাবু হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর

বাগানের কোণ থেকে একটা শাবল ও একখানা কোদাল তুলে নিয়ে কোদালখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এসো!' আমি যন্ত্রচালিতের মতন তাঁর সঙ্গে চললুম।

আবার সেই নদীর পথ। চারিদিক তেমনি নীরব ও নির্জন, আকাশে তেমনি স্বপ্নময় চাঁদের হাসি। নিবিড় বনজঙ্গল ও পাহাড়ের পর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে যেন ছবিতে আঁকা। কিন্তু সেসব দৃশ্য দেখবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না, আমার প্রাণ থেকে সমস্ত কবিত্ব তখন কর্পূরের মতন উবে গিয়েছিল। ঘাসের উপরে বড়ো বড়ো গাছের ছায়া নড়ছে আর আমি চমকে চমকে উঠছি। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল, শিউরে উঠে আমি ভাবলুম, ঝোপে-ঝাপে আড়ালে-আবছায়ায় যেসব অশরীরী দুষ্ট আত্মা রক্ততৃষায় উন্মুখ হয়ে আছে, ওই নিশাচর পাখিটা যেন তাদেরই সাবধান করে জানিয়ে দিলে—তোমরা প্রস্তুত হও, পৃথিবীর শরীরী প্রাণী আসছে।

ওই তো ঝাঁঝার গোরস্থান! কবরের পর কবর সারি সারি দেখা যাচ্ছে, তাদের উপরে ইটের বা পাথরের গাঁথুনি। পাশ থেকে নদীর জলের তান ভেসে আসছে অশ্রান্ত তালে। আমার মনে হল, এতক্ষণ ওই সব কবরের পাথরের উপরে যেসব ছায়াদেহ বসে বসে রাত্রিযাপন করছিল, আচম্বিতে জীবিত মানুষের আবির্ভাবে অন্তরালে গিয়ে নদীর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে তারা ভয়াবহ কানাকানি করছে!

একটা ঝোপের ভিতরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে অমূল্যবাবু বললেন, 'এইখানে স্থির হয়ে লুকিয়ে বসে থাকি এসো। সাবধান, কোনও কথা কোয়ো না।'

সারারাত সেইখানে আড়ষ্ট হয়ে দুজনে বসে রইলুম। সেদিনকার সে-রাতটাকে আর পৃথিবীর রাত বলে মনে হল না, ইহলোকে থেকেও আমরা যেন পরলোকের বাসিন্দা হয়েছি!

চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে। পূর্বদিকে ধীরে ধীরে যেন মৃত রাত্রির বুকের রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। ভোর হচ্ছে।

হঠাৎ অমূল্যবাবু আমার গা টিপলেন। চমকে ফিরে দেখি, নিবিড় বনের ভিতর থেকে মেঘের মতো গতিতে এক অপার্থিব নারীমূর্তি বাইরে বেরিয়ে আসছে—মিসেস কুমুদিনী চৌধুরি!

অমূল্যবাবু আমার কানে কানে বললেন, 'আজকের রাতের মতো পিশাচীর রক্তপিপাসা শান্ত হল।'

মিসেস চৌধুরীর দেহ ধীরে ধীরে গোরস্থানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একটা কবরের উপরে গিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আচমকা শূন্যে দুই হাত তুলে এমন প্রচণ্ড তীক্ষ্ণস্বরে হী-হী-হী-হী-হী-হী-হী-হী করে অট্টহাস্য করে উঠল যে আমার সমস্ত বুকটা যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল! সে কী পৈশাচিক শীতল হাসি! .....তারপর দেখলুম, তার দেহটা ধীরে ধীরে মাটির ভিতরে নেমে যাচ্ছে! খানিক পরেই সে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল!

পূর্বআকাশে সূর্যের প্রথম ছটা জেগে উঠল। অমূল্যবাবু এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আর অপেক্ষা নয়! শিগগির আমার সঙ্গে এসো!'

আমরা মিসেস চৌধুরির কবরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। অমূল্যবাবু বললেন, 'আমি শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ি আর তুমি কোদাল দিয়ে মাটি তোলো!'

তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কী জিজ্ঞাসা করলুম না, কারণ আমি তখন আচ্ছন্নের মতো ছিলুম। তিনি যা বলেন, আমি তাই করি।

অল্পক্ষণ পরেই কফিনটা দেখা গেল। অমূল্যবাবু বললেন, 'দ্যাখো, এইবারে আমি কফিনের ডালাটা খুলব তারপর আমি যা করব তুমি তাতে আমাকে বাধা দিয়ো না। খালি এইটুকু মনে রেখো, কফিনের ভেতরে যে দেহ আছে তা কোনও মানুষের দেহ নয়!'

অমূল্যবাবু দুই হাতে টেনে কফিনের ডালাটা খুলে ফেললেন। আমি স্তম্ভিত চক্ষে দেখলুম কফিনের ভিতর শুয়ে আছে মিসেস চৌধুরির পরিপূর্ণ দেহ! সে দেহ দেখলে মনে হয় না তা কোনও দিন ট্রেনে কাটা পড়েছিল! সেটা একমাস আগে কবর দেওয়া কোনও গলিত মৃতদেহও নয়! তার তাজা মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল, তার ওষ্ঠাধরের চারপাশে তরল রক্তধারা লেগে রয়েছে এবং তার জীবন্ত চোখ দুটো সহাস্য দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে!

অমূল্যবাবু দুই হাতে শাবলটা হঠাৎ মাথার উপরে তুলে ধরলেন, তারপর সজোরে ও সবেগে শাবলটা মৃতদেহের বুকের উপরে বসিয়ে দিলেন!

ইঞ্জিনের বাঁশির আওয়াজের মতো এক তীব্র দীর্ঘ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারপর সব চুপচাপ।

চিলের-ছাতের ঘর

॥ ১ ॥

আমার ছেলেবেলার বন্ধু মানিক। সেবারে মানিক তার বাড়ির আর সকলকার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিল, জায়গাটার নাম না হয় আর বললুম না।

কিছুদিন পরে মানিকের কাছ থেকে এই চিঠিখানি পেলুম,—

ভাই অমল,

তোমার জন্যে বড়ো মন কেমন করছে,—কারণ এ-দেশটা এত সুন্দর যে, তোমাকে না দেখালে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না।

যে-বাড়িতে আছি, সেখানিও চমৎকার। একদিকে ধু-ধু মাঠ, দু'দিকে নিবিড় বনের রেখা এবং আর একদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় ও তাদের কোল দিয়ে নাচতে নাচতে বয়ে যাচ্ছে একটি রুপোলি নদী।

তুমি আজকেই মোটঘাট বেঁধে নিয়ে রওনা হও। আমাদের চিলের-ছাতের ঘর থেকে চারিদিকের দৃশ্য খুব স্পষ্ট দেখা যায়। তুমি কবি বলে মা তোমার জন্যে এই ঘরখানি 'রিজার্ভ' করে রেখেছেন।

আসতে দেরি হলে জরিমানা দিতে হবে। এখানকার খবর সব ভালো। ইতি

তোমার মানিক

মানিকের মা আমাকে খুব 'কমপ্লিমেন্ট' দিয়েছেন—আমি নাকি কবি! বাংলাদেশে কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় কিনা! সুতরাং এত বড়ো একটা উপাধি লাভের পরেও মানিকের আমন্ত্রণ রক্ষা না করলে খুবই একটা অকৃতজ্ঞতার কাজ করা হবে! অতএব মোটঘাট বাঁধতে শুরু করলুম।

॥ ২ ॥

মানিকের বাড়িতে এসে উঠেছি।

বাড়িখানি পুরানো হলেও প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড এবং দেখতেও পরমসুন্দর। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত এক বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়ে সেই উঁচু বাড়িখানা প্রত্যেক পথিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এদিকে-ওদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে প্রথম যখন অমলের সঙ্গে বাগানের পথ দিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলুম, হঠাৎ একদিকে আমার চোখ পড়ল। বিলাতি 'পাম' গাছ দিয়ে ঘেরা এক টুকরো জমির ভিতরে ছোট্টো একটা স্মৃতিস্তম্ভের মতো কী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওটা কী মানিক?'

মানিক বললে, 'কবর।'

—'কবর!'

—'হ্যাঁ। এ বাড়িখানা আগে এক সায়েবের ছিল। তার মেম মারা গেলে তাকে এইখানেই কবর দেওয়া হয়।'

এমন সময় মানিকের কুকুর 'লিলি' মনিবের সাড়া পেয়ে সেইখানে এসে হাজির হল। তারপরেই রেগে গরর-গরর করতে লাগল! দেখলুম, সে কবরের দিকে তাকিয়ে গর্জন করছে। কিন্তু কবরের দিকে তাকিয়ে আমি তো কিছুই দেখতে পেলুম না।

বললুম, 'মানিক, তোমার কুকুর কী দেখে ক্ষেপে গেল?'

মানিক বললে, 'জানি না। লিলি ওই কবরটাকে দেখলেই ক্ষেপে যায়,—যেন সে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে চায়।'

আমি বললুম, 'না মানিক, ও তো লড়াই করতে চায় বলে মনে হচ্ছে না,—ওকে দেখলে মনে হয়, ও যেন মহা-ভয়ে পাগল হয়ে গেছে।'

মানিক হেসে বললে, 'জাতে আর নামে বিলিতি হলেও লিলি আমাদের কাছে এসে হিন্দুধর্ম অবলম্বন করেছে। হিন্দুর বাড়িতে ক্রিশ্চানের কবর ও বোধহয় পছন্দ করে না। ...কিন্তু ও-কথা এখন থাক। চলো, তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকলুম। যেমন প্রকাণ্ড বাড়ি তেমনি মস্ত মস্ত ঘর। সেসব ঘরের অবস্থা এখন ভালো নয়,—কোথাও চুন-বালি খসে পড়েছে, কোথাও মেঝে ছ্যাঁদা করে ইঁদুরেরা বড়ো বড়ো গর্ত বানিয়েছে, কোথাও কড়ি-কাঠ থেকে বাদুড়েরা দলে দলে ঝুলছে।

মানিক বললে, 'এ বাড়িখানা অনেক দিন খালি পড়েছিল। এই মেড়ুয়াদের দেশে কুসংস্কার বড়ো বেশি, বোধহয় ওই কবরের ভয়েই এ-বাড়িখানা এতদিন কেউ ভাড়া নিতে চায়নি।'

আমি বললুম, 'বসত-বাড়িতে আমিও কবর-টবর পছন্দ করি না। জীবন আর মৃত্যুর কথা একসঙ্গে মনে পড়লে বেঁচে সুখ পাওয়া যায় না।'

মানিক বললে, 'আমরা কিন্তু আজ তিন হপ্তা ধরে এখানে খুব সুখে বাস করছি। ও কবর ফুঁড়ে উঠে কোনওদিন কোনও মেম-পত্নী আমাদের সঙ্গে গল্প করতে আসেনি।...নাও, এখন ওপরে উঠে তোমার ঘর দেখবে চলো।'

চওড়া এক কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলুম। এক সময়ে এই সিঁড়ি যে দেখতে খুব চমৎকার ছিল, এখনও তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু আজ এ সিঁড়ি এমন জীর্ণ হয়ে গেছে যে, আমাদের পায়ের চাপে যন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করতে লাগল।

॥ ৩ ॥

চিলের-ছাতের ঘর বলতে আমরা যা বুঝি, এখানি সে-রকম নয়—এ ঘরখানা নূতন ধরনের। এ-শ্রেণীর ঘর প্রায়ই খুব ছোটো হয়, কিন্তু এ ঘরখানা বেশ বড়োসড়ো। এর একদিকে কাঠের সিঁড়ি উপরে এসে উঠেছে এবং তার পরেই ঘরখানা শুরু হয়েছে। তিন দিকে সারি সারি বারোটা লম্বা-চওড়া জানলা ও ঘরের ম্যাটিংমোড়া মেঝের উপরে কতকগুলো পুরানো সোফা, কৌচ, চেয়ার, ড্রেসিংটেবিল, ওয়াসিং স্ট্যান্ড ও একখানি মস্ত বড়ো লোহার খাট। সিঁড়ি ছেড়ে ঘরের মেঝেতে পা দিয়েই—কেন জানি না—আমার মনে হল, এ-জায়গাটা

যেন খালি নয়, এখানে যেন কী একটা অদৃশ্য ও বীভৎস রহস্য একান্তে অনেক দিন ধরে গোপনে বাস করছে। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অজানা আতঙ্কে আমার সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যেন এখানে একটুও হাওয়া নেই, আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'মানিক, ঘরের জানলা-দরজাগুলো বন্ধ করে রেখেছ কেন? খুলে দাও, খুলে দাও।'

মানিক আমার কথামতো কাজ করলে। বাহির থেকে খোলা আলো আর হাওয়া ঘরের ভিতর ছুটে এল শিশুর মতো সকৌতুকে! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের সকল গ্লানি কেটে গেল!

একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখের উপরে ভেসে উঠল, অপূর্ব চিত্রপট!

প্রথমেই দেখলুম পাহাড়ের পর পাহাড়ের শিখর ক্রমেই উঁচু হয়ে আলোমাখা নীলাকাশের দিকে উঠে গেছে—যেন ভগবানের পূজার থালার মধ্যে নৈবেদ্যের সার সাজানো রয়েছে! তাদের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক গান-পাগলিনী, নৃত্যশীলা নদী! সেই কালো পাহাড়মালার তলার রৌদ্রদীপ্ত নদীটিকে দেখে মনে হচ্ছে, অচপল কাজল-মেঘের তলায় চঞ্চল বিদ্যুতের একটি চকচকে রেখা!

তারপরেই আবিষ্কার করলুম, আমার জন্যে নির্দিষ্ট এই ঘরের তলাতেই রয়েছে সেই কবরটা! মনটা আমার খুঁতখুঁত করতে লাগল।

ফিরে বললুম, 'দ্যাখো মানিক, এমন সুন্দর জায়গায় যে-সায়েবটি বাড়ি তৈরি করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি কবি ছিলেন। কিন্তু কবির চোখ পেয়েও এমন মনোরম স্থানে তিনি নিজের স্ত্রীর দেহকে গোর দিলেন কেন, সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না!'

মানিক বললে, 'এখানকার লোকেদের মুখে এক গাঁজাখুরি গল্প শুনেছি। মারা গেলে পর মেমের দেহকে নাকি প্রথমে গোরস্থানেই নিয়ে গিয়ে গোর দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরদিনই দেখা যায়, মড়াসুদ্ধ কফিনটা কবরের পাশে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে! কফিনটাকে আবার গর্তে পুরে মাটি চাপা দেওয়া হল। কিন্তু পরদিন সকালে আবার সেই দৃশ্য! উপরি-উপরি তিনবার এই দৃশ্যের অভিনয় হবার পর গোরস্থানের পাদরি বললেন, 'এই পাপীর দেহ গোরস্থান ধারণ করতে রাজি নয়। একে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হোক।' তখন সকলে বাধ্য হয়েই দেহটাকে এই বাড়ির ভিতরে এনে গোর দিলে। সেই থেকে 'পাপী' কবর থেকে আর পালাবার চেষ্টা করেনি।'

আমি বললুম, 'পাদরি-সায়েব মেমের দেহকে পাপীর দেহ বললেন কেন?'

মানিক বললে, 'মেমটা নাকি আত্মহত্যা করেছিল!—কিন্তু আজগুবি গল্প আমি বিশ্বাস করি না—এসব হচ্ছে বানানো কথা!'

॥ ৪ ॥

ঘরের চারিধারে চোখ বুলিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ ঘরের এই পুরানো আসবাবগুলো কোত্থেকে এল?'

মানিক বললে, আসবাবগুলো হচ্ছে সেই সায়েবের। তাঁর মেম এই ঘরেই বাস করত।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আসবাবগুলো যেমন ছিল, তেমনি ভাবেই রেখে দিয়েছেন। আমাদেরও মানা করে দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন এ-ঘর থেকে কোনও জিনিস না সরিয়ে রাখি।'

হঠাৎ কাঠের ঠিক মাথার উপরেই দেওয়ালে-টাঙানো একখানা প্রকাণ্ড 'অয়েল-পেন্টিং'য়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। স্ত্রীলোকের ছবি। আসলে মানুষের দেহ যত বড়ো হয়, সেই আঁকা ছবির দেহটিও তার চেয়ে ছোটো নয়।

শুধালুম, 'ও কার ছবি মানিক?'

মানিক বললে, 'সেই মেমের। কাছে গিয়ে দ্যাখো না, মেমটি দেখতে ঠিক ডানা-কাটা পরির মতো ছিল না!'

পায়ে পায়ে ছবির কাছে এগিয়ে গেলুম। পটে আঁকা আছে এক বুড়ির চেহারা,—তার বয়স পঁয়ষট্টির কম হবে না। লিকলিকে দেহ, বাঁখারির মতন সরু বাহু, সাদা শনের মতন চুলগুলো কাঁধের উপর এসে পড়েছে। ঠোঁটের কোণে অত্যন্ত কুৎসিত হাসি, নাকটা টিয়াপাখির মতন বাঁকানো, আর তার কোটরে-ঢোকা কুৎকুতে চোখ দুটো!—ওঃ, সেই চোখ দুটোর ভিতর থেকে যে ক্রূর দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে, আমি কিছুতেই তা বর্ণনা করতে পারব না! আমার মনে হল, গোখরো সাপের চেয়েও ভয়ানক সেই চোখ দুটো যেন এখনও জ্যান্ত হয়ে

আছে! ছবিতে-আঁকা মূর্তি ও তার চোখ যে এত বেশি স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়, এটা কখনও কল্পনা করতে পারিনি! বিলিতি কেতাবে-আঁকা ডাইনি মূর্তি যেন রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে!

মানিক বললে, 'কী হে অমল, এই মেম-সাহেবটিকে তোমার পছন্দ হল?'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আমি বললুম, 'পছন্দ। যাকে দেখে এই ছবিখানা আঁকা হয়েছে, সে-মানুষটির প্রকৃতি নিশ্চয়ই খুব জঘন্য ছিল। তোমার এই মেমের ছবি যদি ঘর থেকে সরিয়ে না রাখো, তাহলে রাত্রে আমি দুঃস্বপ্ন দেখব!'

মানিক বললে, 'কিন্তু ঘর থেকে যে কিছু সরাতে মানা আছে।'

আমি বললুম, 'তাহলে আমাকে অন্য ঘরে দাও!'

মানিক একটু ভেবে বললে, 'আচ্ছা, এসো আমরা দুজনে মিলে ছবিখানাকে নামিয়ে ঘরের বাইরে রেখে দি। তারপর বাড়ি ছাড়বার সময়ে ছবিখানাকে আবার দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে গেলেই চলবে।'

খাটের উপরে উঠে দুজনে মিলে সেই প্রকাণ্ড ছবিখানাকে নামাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু উঃ, সে কী বিষম ভারী ছবি,—ওজনে যেন একজন মানুষের দেহের মতোই ভারী।

মানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ছবি কখনও এত ভারী হয়।'

অবশেষে কষ্টেসৃষ্টে ছবিখানাকে নামিয়ে, ঘরের বাইরে ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে রেখে এলুম।

মানিক হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে চমকে উঠে বললে, 'ওকী অমল, তুমি হাত কাটলে কেমন করে? তোমার হাতে অত রক্ত কেন?'

তাড়াতাড়ি হাত তুলে দেখি, সত্যই তো! আমার দুখানা হাত-ই যে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

তারপরেই মানিকের দুই হাতের দিকে তাকিয়ে আমিও বলে উঠলুম, 'মানিক, মানিক! তোমার হাতেও যে রক্ত!'

মানিক নিজের হাতের দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে বললে, 'তাই তো। কখন যে হাত কেটেছে, আমি তো কিছুই টের পাইনি!'

দুজনে তখনই ছুটে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেললুম। তারপর আপন আপন হাতের দিকে তাকিয়ে আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। আমাদের কারুর হাতেই কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই!

তবে এ কিসের রক্ত? এ কী রহস্য?

॥ ৫ ॥

সে রাত্রে চাঁদের আলো এসে বাইরের অন্ধকারের সমস্ত ময়লা ধুয়ে দিয়েছিল এবং দূরের নদী পাহাড় বনকে দেখাচ্ছিল ঠিক পরিস্থানের স্বপ্নময় দৃশ্যের মতো।

সেইদিকে মোহিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

আচম্বিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল! কী জন্যে ঘুম ভাঙল, সেটা বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু এটা বেশ অনুভব করলুম, ঘরের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও একটা অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে!

ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসে চেয়ে দেখি, কালো মেঘের চাদরে চাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে গেছে!

ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ আমার নাকে এল—মেডিকেল কলেজে যে-ঘরে পচা মড়া কাটা হয়, একবার সেই ঘরে ঢুকে আমি ঠিক এই রকম দুর্গন্ধই পেয়েছিলুম!

হঠাৎ আমার মাথার উপর কে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললে,—আমার স্তম্ভিত বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল।

ভাবলুম, মনের ভুল! হয়তো জানলা দিয়ে হাওয়ার দমক এসে আমার চুলে লেগেছে।

একটু সরে বসে বিছানা হাতড়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা পেলুম। একটা কাঠি জ্বেলে তুলে ধরে তাড়াতাড়ি ঘরের চারিদিকটা একবার দেখে নিলুম।

দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। কিন্তু যা দেখেছি, সেইটুকুই যথেষ্ট!

মানিক আর আমি দুজনে মিলে যে ভারী ছবিখানাকে ধস্তাধস্তি করে নামিয়ে বাইরে রেখে এসেছিলুম, সেই ছবিখানা ঘরের দেওয়ালে যেখানে ছিল আবার ঠিক সেইখানেই টাঙানো রয়েছে!

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কী করব,—হঠাৎ আমার কাঁধের উপর কে যেন একখানা হাত রাখলে,—বরফের মতো ঠান্ডা কনকনে একখানা হাত।

ভয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়ে আমি সামনের দিকে সজোরে এক ঘুষি ছুড়লুম এবং পরমুহূর্তেই কে যেন সশব্দে দড়াম করে মেঝের উপরে পড়ে গেল!

আমিও আর অপেক্ষা করলুম না,—তিরের মতো ছুটে ছাতের ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলুম।

সিঁড়ির ঠিক তলাতেই একটা লণ্ঠন হাতে করে উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়েছিল মানিক। আমাকে দেখেই শুধোলে, 'ব্যাপার কী? তোমার ঘরে ও-কিসের শব্দ হল?'

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'তোমাদের সেই ডাইনির ছবি আবার ঘরে ফিরে এসেছে।'

—'ধ্যেৎ। যত বাজে কথা। ছবির কি পা আছে? দাঁড়াও, দেখে আসি।'—এই বলে মানিক দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল।

কিন্তু তারপরেই শুনলুম মানিকের উচ্চ আর্তনাদ এবং তার পরেই দেখলুম, সে একসঙ্গে তিন-চারটে সিঁড়ি টপকে নীচে নেমে আসছে। আকুল স্বরে সে বললে, 'ঘরের ভিতরে পচা মড়ার গন্ধ আর ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা বুড়ির পচা আর গলা মড়া!'

হঠাৎ আমার নিজের গায়ের দিকে নজর পড়ল—আমার কাঁধের উপর থেকে একটা রক্তের ধারা গা বয়ে নেমে আসছে। এই কাঁধেই সেই বরফের মতো ঠান্ডা হাতের স্পর্শ পেয়েছিলুম।

খামেনের মমি

॥ ১ ॥

ইউরোপ বেড়িয়ে ফিরছি। ফেরবার মুখে একবার জাহাজ থেকে নেমে নীলনদের দেশ—অর্থাৎ মিশর দেশকে দেখতে গেলুম।

প্রাচীন মিশর আর নেই। যে মিশরের অতীত কীর্তি, বিপুল সভ্যতা, বিচিত্র শিল্প-গৌরব, দিগ্বিজয়ী রাজগণ ও পরাক্রমশালী পুরোহিতবৃন্দ সমস্ত জগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাকে আজ কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যায়। তার পিরামিড ও দেবপূজার মন্দির আজও অক্ষয় হয়ে মরুভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে তার সন্তানদের আজও দেখা যায়, সেদিনকার নীলনদ আজও সেই একই সঙ্গীত গেয়ে সমুদ্রের সন্ধানে ছুটে চলে, কিন্তু প্রাচীন মিশরিদের একজনও বংশধর পৃথিবীর বুকে আজ বর্তমান নেই। একটা অত বড়ো জীবন্ত জাতি কেমন করে এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তা ভাবলে রহস্য বলে মনে হয়। আজ যাদের মিশরি বলে ডাকা হয়, তারা হচ্ছে এক সম্পূর্ণ নূতন ও আধুনিক জাতি।

এই নূতন জাতির দেশে গিয়ে সেই মৃত পুরাতন জাতির অনেক শিল্পকীর্তি ও গৌরবের নিদর্শন দেখলুম। মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। কার্ণাকের মন্দিরের সামনে বসে বসে খানিকক্ষণ পুরাতন মিশরকে ভাবতে চেষ্টা করলুম।

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ বেদুইন আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ করলে। তারপর আমার আরও কাছে সরে এসে চুপি চুপি বললে,—'হুজুর, 'মমি' কিনবেন? খুব ভালো 'মমি'।'

সেকালকার নানান জিনিস কেনা ছিল আমার একটা মস্ত বাতিক। 'মমি' কাকে বলে সকলেই জানেন বোধহয়। প্রাচীন মিশরিরা বিশ্বাস করত, মানুষের প্রাণ বেরিয়ে গেলেও সে মরে না। শেষ বিচারের দিন দেবতাদের কাছে গিয়ে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হয়। ওসিরিস হচ্ছেন শেষ বিচারকর্তা ও অমর জীবনের দেবতা। প্রাচীন মিশরিরা মানুষের মৃতদেহগুলোকে রাসায়নিক ঔষধের প্রভাবে নষ্ট হতে দিত না। কবরের ভিতরে সেই অক্ষয় দেহগুলোকে তারা রেখে দিত—চূড়ান্ত বিচারের দিন ওসিরিসের সামনে গিয়ে আবার তারা জীবন্ত হয়ে নিজেদের কাহিনি বলবে বলে। এই রকম রাসায়নিক ঔষধের প্রভাবে সুরক্ষিত মৃতদেহেরই নাম 'মমি'। পুরাতন সমাধি খুঁড়ে এমনি অসংখ্য মমি পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেরই যাদুঘরে ও খেয়ালি লোকের বাড়িতে খুঁজলে এই রকম মমি আজ দেখতে পাওয়া যাবে। কলকাতার যাদুঘরেও একটি মমি আছে—যদিও সেটি আজ আর আস্ত নেই।

অনেক দিন থেকে আমারও একটি মমি কেনবার শখ ছিল। যথেষ্ট দর কষাকষির পর বেদুইন-বুড়োর কাছ থেকে যে মমিটা আমি কিনলুম, তার ভিতরে কিছু নূতনত্ব ছিল। এটি হচ্ছে একটি অত্যন্ত বামনের মমি—মাথায় আড়াই ফুটের বেশি হবে না। চার হাজার বছর আগে এই বামন-অবতারটি প্রাচীন মিশরের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এ রকম

সুরক্ষিত মমি বড়ো একটা চোখে পড়ে না। দেখলেই মনে হয় প্রাণ পেলে আজও যেন এ হেসে খেলে চলে বেড়াতে পারে।

এই বামনের মমি নিয়ে সানন্দে ভারতগামী জাহাজে গিয়ে উঠলুম।

॥ ২ ॥

লোকে বলে, আমার বাড়িটি নাকি একটি ছোটোখাটো মিউজিয়াম। অতীতের ও বর্তমানের নানান দেশের নানান অদ্ভুত জিনিস দিয়ে আমার বৈঠকখানাটি সাজানো। তারই মাঝখানে একটি 'গ্লাস-কেসে'র ভিতরে আমি সেই বামনের মমিটিকে দাঁড় করিয়ে রাখলুম।

মা তো রেগেই অস্থির! অত্যন্ত ভয় পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'ছি, ছি, গেরস্তের বাড়িতে কোন দেশের কোন জাতের একটা শুকনো পচা মড়া এনে রাখা! সংসারের অকল্যাণ হবে যে রে!'

অনেক বন্ধুও বিদ্রোহ প্রকাশ করলে। কোনও কোনও বেশি-ভিতু বন্ধু সন্ধ্যার পর আর আমার বৈঠকখানায় ঢুকতে রাজি হতেন না। আমি কিন্তু সমান অটল। সকলকে বোঝাতে লাগলুম,—কোনও ভয় নেই, মরা গোরু ঘাস খায় না। চার হাজার বছর আগে যে মরেছে, এই বিংশ শতাব্দিতে আর সে কারুকে ভয় দেখাতে পারবে না।

কিন্তু মাসখানেক পর থেকে একটা নতুন ব্যাপার লক্ষ করতে লাগলুম। যখন মমিটা কিনেছিলুম, তখন এই বামন-মূর্তির দুই চোখ ছিল বন্ধ! কিন্তু আজকাল দেখছি, এর চোখ দুটো ধীরে ধীরে খুলে আসছে! মাস-দুয়েক পরে সেই বামন সম্পূর্ণরূপে চোখ মেলে তাকালে! যদিও সে চোখে পলক পড়ে না এবং তাতে জীবনের কোনও লক্ষণই নেই, তবু এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখে আমারও মনটা কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিন্তু আমার এক ডাক্তার-বন্ধু শেষটা আমায় বুঝিয়ে দিলে, জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্যেই এই ব্যাপারটা ঘটেছে। জলবায়ুর পরিবর্তনে দরজা-জানলার কাঠ যেমন ফাঁক হয়ে যায়, এও তেমনি আর কি!

ডাক্তার-বন্ধুর কথা শুনে আমার মনের খটকা গেল বটে, কিন্তু দিন-কয় পরে আর এক আশ্চর্য কাণ্ড!

অনেক রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনলুম, বাইরের ঘর থেকে কিসের শব্দ আসছে!—যেন কেউ কোনও আলমারির কাচের উপরে ঘন ঘন করাঘাত করছে—ঝন-ঝন-ঝন-ঝন-ঝন-ঝন!

কী ব্যাপার? বৈঠকখানায় চোর-টোর ঢুকল নাকি?—ধড়মড়িয়ে বিছানার উপরে উঠে বসলুম।

সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে আরও জোরে আর একটা শব্দ হল। ঝন-ঝন করে যেন একরাশ কাচ ভেঙে পড়ল! আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না, চোর ধরবার জন্যে দ্রুতপদে বাইরের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম।

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে কিন্তু চোর-টোর কিছুই দেখতে পেলুম না—কেবল 'গ্লাস-কেস'টা ভাঙা এবং বামনের মমিটা ঘরের মেঝের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে!

অবাক হয়ে গেলুম বটে, তবু মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম যে, হয়তো কোনওগতিকে মমিটা টলে কাচের উপরে এসে পড়াতে 'গ্লাস-কেস'টা ভেঙে এই ব্যাপার ঘটেছে।

পরদিন 'গ্লাস-কেস'টা মেরামত করিয়ে মমিটাকে তার ভিতরে আবার রেখে দিলুম। কারুকে ব্যাপারটা জানানো দরকার মনে করলুম না। যদি বলি, হাজার হাজার বছরের পুরানো মমি আমার 'গ্লাস-কেস' ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেছে, তাহলে লোকে আমাকে পাগলের ওষুধ খেতে বলবে। সত্য সত্যই তা অসম্ভব!

॥ ৩ ॥

শরীরটা সেদিন ভালো ছিল না। সন্ধ্যার সময়ই রাত্রের আহারাদি সেরে নিয়ে, বৈঠকখানার সোফায় বসে বিশ্রাম করছিলুম।

হঠাৎ দরওয়ান এসে জানালে, একজন বিদেশি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। আগন্তুকের একখানা কার্ড সে আমায় দিলে। তাতে লেখা রয়েছে—এমিন পাশা, কাইরো।

বিস্মিত হলুম। ইজিপ্টের রাজধানী কাইরো, সেখানকার কারুকে আমি চিনি না, কে এই এমিন পাশা? আমার কাছে তার কী দরকার? যা হোক, দরওয়ানকে বললুম, তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে।

মিনিটখানেক পরে যে মূর্তি ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল তাকে দেখবার কল্পনা আমি করিনি। মাথায় সে প্রায় সাড়ে ছয় ফুট উঁচু, তার উপরে একটা 'ফেজ' টুপি থাকার দরুন তাকে আরও বেশি লম্বা দেখাচ্ছিল। চওড়ায় তার দেহ রীতিমতো শীর্ণ। একটা কম্ফর্টার দিয়ে প্রায় তার সারা মুখ ও গলা ঢাকা—তার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে কেবল চশমাপরা দুটো তীক্ষ্ণ চোখ এবং নাক ও গালের সামান্য অংশ মাত্র। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো একটা কোট ও ইজের। আগন্তুককে দেখেই মনের ভিতর কেমন একটা অজানা অদ্ভুত ভাব জেগে উঠল।

অত্যন্ত ভরাট গলায় আগন্তুক ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই কি মিঃ সেন?'

আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি এত প্রখর, যে সেদিকে তাকানো যায় না। চোখ নামিয়ে আমি বললুম, 'বসতে আজ্ঞা হোক মিঃ এমিন পাশা। আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

এমিন পাশা আমার সামনের একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'মিঃ সেন, সুদূর কাইরো থেকে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'আমার এতটা সম্মানের কারণ কী?'

এমিন পাশা সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'মিঃ সেন, খামেনের মমি আপনার কাছেই আছে?'

—'খামেন? খামেন কী?'

—'খামেন ছিল চার হাজার বছর আগে মিশরের এক বামন পুরোহিত। মাস-কয় আগে খামেনের সমাধি থেকে তার মমিটা একজন বেদুইন চুরি করেছে। ওসিরিসের অভিশাপে সেই হতভাগ্য বেদুইন আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু খবর পেলুম খামেনের মমিটা আপনার কাছেই আছে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সেই মমিটা আমি টাকা দিয়ে কিনেছি।'

এমিন পাশা পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে বললেন, 'কত টাকা পেলে আপনি খামেনের মমি আবার ফিরিয়ে দিতে পারেন?'

আমি একটু বিরক্ত স্বরে বললুম, 'মমিটা বেচব বলে আমি কিনিনি। টাকার লোভ আমাকে দেখাবেন না।'

এমিন পাশা তাঁর দুই কনুই টেবিলের উপরে স্থাপন করে হাত-দুখানা কপালের উপর এমনভাবে রাখলেন যে, তাঁর চোখ দুটোও আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল। সেই অবস্থায় তিনি বললেন, 'মিঃ সেন, খামেনের মমির উপরে আপনার কোনওই দাবি নেই।'

আমি হেসে বললুম, 'টাকা দিয়ে কিনেও ওর উপরে যদি আমার দাবি না থাকে, তবে দাবি আছে কার?'

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে এমিন পাশা বললেন, 'মিঃ সেন, ও মমির উপরে কোনও মানুষেরই দাবি নেই। মমি টাকা দিয়ে কেনবার জিনিস নয়। ওসিরিস তাকে গ্রহণ করেছেন।'

আমি হেসে উঠে বললুম, 'ওসিরিস'। সে তো সেকেলে রূপকথার দেবতা।'

এমিন পাশার সারা দেহের উপর দিয়ে যেন একটা কম্পনের বিদ্যুৎ খেলে গেল। হঠাৎ চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসে কঠিন কর্কশ স্বরে তিনি বললেন, 'না! ওসিরিস রূপকথার দেবতা নন! আজকের এই দু দিনের সভ্যতা আধুনিক মানুষকে অন্ধ আর ভ্রান্ত করে তুলেছে, তাই তারা এমন কথা বলতে সাহস করে। ওসিরিস হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, অমর জীবন-দাতা!

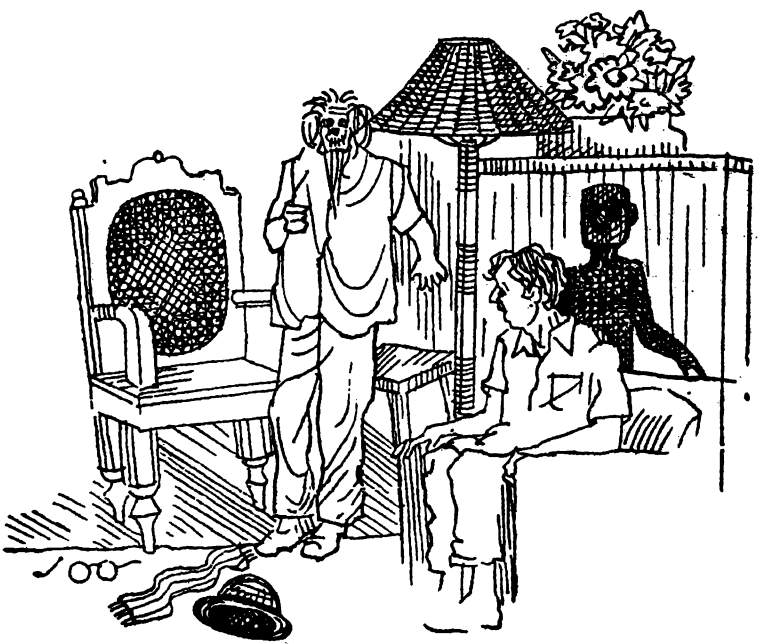

প্রাণ গেলেও মানুষের আত্মা বর্তমান থাকে। প্রত্যেক মানুষের আত্মা আর দেহ ওসিরিস গ্রহণ করেন। শেষ-বিচারের দিন পর্যন্ত সেই দেহ তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে তিনি ছাড়া আর কারুরই মানুষের মৃতদেহের উপরে কোনও অধিকার নেই!'

আমি অবহেলা ভরে বললুম, 'বেশ। তাহলে ওসিরিস নিজে এসে যেদিন দাবি করবেন, সেই দিন আমি খামেনের মমি তাঁকে ফিরিয়ে দেব।'

এমিন পাশা আচম্বিতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, 'নির্বোধ মানুষ! তাই নাকি?'—বলেই তিনি একটানে তাঁর মুখের কম্ফর্টার ও মাথার টুপিটা খুলে ফেললেন এবং চশমাখানা টেনে একদিকে ছুড়ে ফেলে দিলেন!

তারপর আমার স্তম্ভিত দৃষ্টি এক অভাবিত ও অসম্ভব দৃশ্য দেখলে। এমিন পাশার কাঁধের উপর যে মুখখানা জেগে রয়েছে, তা কোনও জ্যান্ত মানুষের মুখের মতন নয়! সে হচ্ছে হাজার হাজার বছরের পুরানো অত্যন্ত বিশুষ্ক এক নরদেহ—অর্থাৎ ভীষণ মমির মুখ! মাথার উপর থেকে বিশীর্ণ মুখের দু পাশে তৈলহীন পিঙ্গল কেশপাশ লটপট করে দুলছে এবং চিবুক থেকে তেমনি রুক্ষ শ্মশ্রুগুচ্ছ বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে!—এ মুখ আমি ইজিপ্টের যাদুঘরে দেখেছি, এ হচ্ছে ওসিরিসের প্রস্তর-মূর্তির মুখ!

মাথা ঘুরতে লাগল, সারা দেহ অবশ হয়ে এল—ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং সেই সময়েই আমি এক অদ্ভুত, বীভৎস ও অমানুষী কণ্ঠস্বরে শুনতে পেলুম—'খামেন! খামেন! খামেন! জাগ্রত হও, তুমি আবার জাগ্রত হও!'

যখন আমার জ্ঞান হল, দেখলুম আমি সোফার উপরে শুয়ে রয়েছি এবং মাথার কাছে বসে মা আমার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন।

সব কথা আমার মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম।

মা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোর কী হয়েছিল বাবা? এখানে অত গোলমাল হচ্ছিলই বা কেন, আর ওই 'গ্লাস-কেস'টাই বা ভাঙল কেমন করে?'

আমি এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে দেখি, 'গ্লাস-কেস'টা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং তার ভিতরে বামনের সেই মমিটা আর নেই!

তাড়াতাড়ি ফিরে বললুম, 'মা, মা, এখানে এসে আর কারুকে দেখতে পেয়েছ?'

মা কিছুই বলতে পারলেন না।

চেঁচিয়ে দরওয়ানকে ডাকলুম, তার মুখে জানলুম ফটক দিয়ে কেউ বাইরে বেরিয়ে যায়নি।

সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও এমিন পাশা বা সেই মমির কোনওই পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘরের মেঝেয় শুধু কুড়িয়ে পেলুম, এমিন পাশার সেই টুপি, চশমা, কম্ফর্টার, জামা, ইজের ও একজোড়া জুতো!

আমি কি অসুস্থ দেহে কোনও বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি? না, কোনও চোর ছদ্মবেশে এসে আমাকে ভয় দেখিয়ে ঠকিয়ে মূল্যবান মমিটাকে চুরি করে নিয়ে গেল?

ক্ষুধিত জীবন

এক

আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের ছোট শহরটিতে অসাধারণ ঘটনা ঘটত না। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে দস্তুরমত উত্তেজনার সাড়া পড়ে গিয়েছে।

ভৈরব গড়গড়ি ছিলেন তান্ত্রিক। আমাদের বাড়ির কাছেই দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। সারাদিন এবং গভীর রাত পর্যন্ত তিনি তাঁর পূজা-অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

বেশি লোকের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল না। তবে কি কারণে জানি না আমার দিকে তিনি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে সময় পেলে আমার বাড়িতে এসে গল্পসল্প করে যেতেন।

ভৈরবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রং কালো, দেহ শীর্ণ কিন্তু অতি-দীর্ঘ! তাঁর চেহারার ভিতরে সব-আগে নজরে পড়ে চোখদুটো। মনে হত কোটরের ভিতর থেকে যে দুটো তীক্ষ্ণ চোখ উঁকি মারছে, তারা যেন ভৈরবের নিজের চোখ নয়! কেন এমন মনে হত জানি না, কিন্তু মনে হত অমন রহস্যময় চোখ আমি আর কোন মানুষের দেখিনি।

খবর পেলুম হঠাৎ ভৈরব মারা পড়েছেন। আমি ডাক্তার, খবর পেয়েই দেখতে গেলুম। পরীক্ষা করে বুঝলুম, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি চোখ খুলেই মারা পড়েছেন—সেই দুটি অদ্ভুত চোখ! এখন তারা স্থির বটে, কিন্তু এখনো তেমনি রহস্যময়! স্থিরতা ছাড়া তাদের মধ্যে মৃত্যুর আর কোন লক্ষণই ছিল না।

ভৈরবের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তিনি একেবারেই একলা থাকতেন, কাজেই শবদাহের ব্যবস্থা করতে হল পাড়ার লোকদেরই।

সন্ধ্যার সময় জনকয়েক লোক ভৈরবের বাসায় গিয়ে হাজির হলুম। যে ঘরে ভৈরবের দেহ ছিল তার দরজায় আমি স্বহস্তে তালা বন্ধ করে গিয়েছিলুম। এখন গিয়ে দেখি দরজা খোলা, তালাটা পড়ে রয়েছে মেঝের উপরে! চোর-টোর এসেছিল নাকি?

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে আরো হতভম্ব হয়ে গেলুম।

এই একটু আগে আমি নিজে চৌকির উপরে যে মৃতদেহটা পরীক্ষা করে গিয়েছি, সেটা আর সেখানে নেই। ঘরে বাইরে চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল। মড়া পাওয়া গেল না।

মড়া কিন্তু বেঁচে উঠে ভিতর থেকে বাইরের তালা খুলে বেরিয়ে যায়নি। তবে কেউ লাশ চুরি করেছে? সম্ভব। কিন্তু মড়া চুরি করে কার লাভ হবে, সেটা আন্দাজ করা গেল না।

ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ছোট শহরটি কিছুদিনের জন্য সরগরম হয়ে উঠল।

তারপর ভৈরবের কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেলুম।

দুই

তিন বছর পরের কথা।

দেশে আবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নানা লোকের হাঁস, মুরগি, ছাগল, বিড়াল, কুকুর,

—এমন কি গরু-মোষ পর্যন্ত চুরি যেতে লাগল।

পুলিসে খবর দিয়েও কোন কিনারা হল না। কারা চুরি করে এবং এত জন্তু-জানোয়ার লুকিয়েই বা রাখে কোথায়, কেউ তা আবিষ্কার করতে পারলে না। গৃহস্থরা জ্বালাতন হয়ে উঠল।

গরু-মোষ প্রভৃতি যেমন মূল্যবান জন্তু, বিড়াল ও দেশী কুকুরও যে অদৃশ্য হচ্ছে, এই বা কি রকম রহস্য? বিড়াল-কুকুর নিয়ে চোর কি করবে? অনেক মাথা খাটিয়েও এই অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতারও অর্থ বুঝতে পারলুম না।

সেদিন একটু বেশি রাত পর্যন্ত বসে বই পড়ছিলুম। বাইরে ক্ষীণ চাঁদের অস্পষ্ট আলো। বাগান থেকে শোনা যাচ্ছে একটা বিড়ালের ম্যাও-ম্যাও ডাক। খানিক পরেই বিড়ালটা হঠাৎ খুব জোরে আর্তনাদ করেই একেবারে চুপ মেরে গেল।

চোরের উৎপাতে মনটা সন্দিগ্ধ হয়েই ছিল, কোথাও ছায়া নড়লেই চোর দেখি। বিড়ালটার তীব্র চিৎকারে চমকে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হল একটা মূর্তি দৌড়ে ঝুপসি বটগাছটার তলায় গিয়ে অন্ধকারে দিল গা ঢাকা।

ঐ কি চোর? নইলে পালাবে কেন? তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে একগাছা লাঠি তুলে নিয়ে আমিও বেরিয়ে বটগাছের দিকে ছুটে গেলুম। এতদিন পরে বোধহয় চোরকে হাতে পেয়েছি। বটগাছের তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক জায়গায় কি যেন চক্‌চক্ করছে—চোরের চোখ নাকি?

হাঁকলুম, "কে তুমি?"

সাড়া নেই। কিন্তু চোখই হোক আর যাই-ই হোক্, আরো বেশী চক্‌চক্ করে উঠল।

লাঠিগাছা বাগিয়ে ধরে সাবধানে এগুতে লাগলুম। তখনি শুনলুম হিংস্র বন্য জন্তুর মতন কণ্ঠে কার একটা ক্রুদ্ধ গর্জন। কে বলে উঠল—"আর এগিয়ো না ডাক্তার, শিগ্‌গির চলে যাও।"

আমায় চেনে দেখছি। আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কে তুমি?"

—"আমি ক্ষুধার্ত। আমার অন্য পরিচয় নেই।"

—"তুমি আলোয় বেরিয়ে এস। আমি তোমাকে দেখতে চাই।"

—"আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো না। আমি হচ্ছি সাক্ষাৎ মৃত্যু। পালিয়ে যাও ডাক্তার, পালিয়ে যাও। আর শোনো, রাত্রে আর কখনো বাইরে বেরিয়ো না। ভয় পাবে, বিপদে পড়বে।"

—"আবার ভয় দেখানো হচ্ছে? দাঁড়াও, তোমার চালাকি বার করছি।"

আমার উচ্চ চিৎকারে চারিধার থেকে লোক ছুটে এল। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন ব্যাপার কি?

—"চোর ধরেছি। ঐখানে লুকিয়ে আছে।"

সকলে চারিদিক থেকে গাছটাকে ঘিরে ফেললে। আলো এল। কিন্তু গাছের তলায় কেউ নেই।

কেবল দূর থেকে ভেসে এল বিকট ও সুদীর্ঘ অট্টহাসির শব্দ! সে হাসিও যেন ক্ষুধার্ত। শুনে শিউরে উঠতে হয়।

কে এই লোক? চোর, না আর কেউ? ও যা বললে তার অর্থই বা কি? ও ক্ষুধার্ত বলে আত্মপরিচয় দিলে কেন? আমাকে রাত্রে পথে বেরুতে মানা করলে কেন? এমনি নানান প্রশ্ন মনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তিন

আবার সব নতুন কাণ্ড!

জন্তু-চুরি বন্ধ হল না, তার উপরে মানুষও অদৃশ্য হতে লাগল।

এক মাসের মধ্যে পাঁচজন মানুষ অদৃশ্য হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা রাত্রে বাইরে বেরিয়ে আর বাড়িতে আসেনি।

বলেছি, আমাদের ছোট শহরে অসাধারণ ঘটনা ঘটে না। এই নতুন কাণ্ডের জন্যে দিকে দিকে জাগল বিষম বিস্ময় ও ভীষণ আতঙ্কের সাড়া। শহরের পথে পথে সারা রাত ঘুরে বেড়াতে লাগল দলে দলে পাহারাওয়ালা। সন্ধ্যা হলেই গৃহস্থরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে বসে থাকে, দলে ভারী না হলে কেউ আর পথে পা বাড়াতে ভরসা করে না। সূর্য অস্ত গেলেই, সব দোকানে তালা পড়ে।

অবশেষে একদিন একটা অদৃশ্য মানুষের মৃতদেহের খানিকটা পাওয়া গেল। তার দেহের উপর-অংশটা শেয়াল বা অন্য কোন জানোয়ারে খেয়ে গেছে। কেমন করে সে মারা পড়ল তা কেউ আন্দাজ করতে পারলে না।

তাহলে যারা অদৃশ্য হয়েছে তাদের সবাই মারা পড়েছে হত্যাকারীরই হাতে? কিন্তু অমন অকারণ নরহত্যার হেতু কি? যাদের পাওয়া যাচ্ছে না তাদের প্রত্যেকেই নিম্নশ্রেণীর গরিব লোক। টাকার লোভে কেউ তাদের খুন করেনি। তাদের শত্রু আছে এমন প্রমাণও পাওয়া গেল না। কে এই মহা-নির্দয় খুনী—যে কেবল হত্যার আনন্দে হত্যা করে?

চার

ডাক্তার মানুষ, রাত্রে প্রায়ই আমাকে রোগী দেখতে যেতে হয়। তবে বেশিদূর যেতে হলে সঙ্গে আজকাল লোক নি।

আজ বাড়ির কাছেই একটা কলেরার রোগীকে দেখতে যেতে হল। বেশিদূর নয়, মিনিট সাত-আটের পথ। একলাই ফিরছি, চাঁদনী রাত। এতক্ষণ চারিধার ধবধব করছিল। কিন্তু হঠাৎ মেঘ এসে গ্রাস করলে চাঁদকে। বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়ছে। বৃষ্টি আসতে দেরি নেই।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলুম—হাতে নিলুম টর্চটা। এমন অন্ধকার হবে জানলে একলা আসতুম না! ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।

পথ একেবারে নির্জন। মফস্বলের এই শহরে চাঁদনী রাতে, পথে আলো দেবার ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালতে হচ্ছে। পথ একটা ছোট মাঠে গিয়ে পড়েছে। ঐ মাঠ পেরুলেই আমাদের পাড়া।

মাঠের মাঝখানে একটা পুকুর, তার পারে গোটাকয়েক গাছ। সেইখানে এসেই মনটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল। মনে পড়ল অজানা হত্যাকারীর কথা।

গাছের ডাল-পাতায় বাতাসের শব্দ শুনেও চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলুম।

আমি বরাবর লক্ষ্য করে দেখেছি, রাত্রে খোলা জায়গায় ভয় হয় না। কিন্তু যেখানে থাকে জঙ্গল বা গাছপালা, রাত্রির বিভীষিকা যেন সেইখানে গিয়েই বাসা বাঁধে। গাছে গাছে শোনা যায় যেন অশরীরীদের কানাকানি, আঁধারে আবছায়ায় চলতে থাকে যেন ইহলোকের বিরুদ্ধে পরলোকের ষড়যন্ত্র!

মেঘলা রাত, অন্ধ পৃথিবী, জনশূন্য মাঠ!

আচম্বিতে বিরক্ত কণ্ঠস্বর শুনলুম, "ডাক্তার, ডাক্তার! আবার তুমি রাত্রে বেরিয়েছ?"

বুক কেঁপে উঠল। মুখে বললুম, "কে?"

—"ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত দারুণ ক্ষুধা আমার। মাংস চাই, হাড় চাই, রক্ত চাই। দিতে পারবে তুমি? পারবে না—পারবে না—হি হি হি হি হিঃ হিঃ!"

ভয়াবহ হাসি, ভয়ানক কণ্ঠস্বর। কে এ? পাগল? এই কি মানুষ খুন করে? যেন বোবা হয়ে

গেলুম।

—"ভয় নেই ডাক্তার, আমি তোমার শত্রু নই। তাই তো বার বার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। কখনো রাত্রে বেরিয়ো না! কি জানি, যদি আমার ক্ষুধা জাগে আমার যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। শিগ্‌গির পালাও শিগ্‌গির!"

আতঙ্কের মধ্যেও মনে জাগল বিষম কৌতূহল। ধাঁ করে দিলুম টর্চটা টিপে।

হা ভগবান, এ কি বিভীষিকার মূর্তি? গাছতলায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে এ যে সেই তান্ত্রিক ভৈরব গড়গড়ি তিন বছর আগে আমাদেরই সামনে যে মারা পড়েছে এবং যার মড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি! ভৈরবের মুখময় রক্ত এবং তার সামনেই মাটির উপরে পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত মৃতদেহ।

প্রচণ্ড গর্জন করে ভৈরব এক লাফ মেরে টর্চের আলোক-রেখার বাইরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম দ্রুত পদশব্দ।

আমিও ঝড়ের বেগে ছুটলুম মাঠের উপর দিয়ে বাড়ির দিকে।

রুদ্রনারায়ণের বাগানবাড়ি

এক

সময়ে সময়ে নাকি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। আমারও একদিন ঐ দশা হয়েছিল। মাছ ধরতে গিয়ে ডাঙায় টেনে তুলেছিলুম—

না, থাক। ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলা ভালো।

আমার কাছে মাছ ধরতে যাওয়া হচ্ছে, একটা নেশার মতো। মাছ পেলে তো কথাই নেই, কিন্তু মাছ না পেলেও আমার আনন্দ ম্লান হয় না। সারা বেলা মেঘমেদুর আকাশের তলায়, নীল সরোবরের পাশে, গাছের সবুজে সবুজে আলোছায়ার ঝিলিমিলি দেখতে দেখতে বাতাসের গান শুনতে আমার বড় মিষ্টি লাগে। তাই কোথাও কোন পুকুরের খবর পেলেই ছিপ কাঁধে করে ছুটি।

সন্তোষ খবর দিলে, তাদের দেশে এক পুকুর আছে, যার জলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ছিপ পড়েনি এবং মাছ আছে হাজার হাজার!

আমি বললুম "এমন আশ্চর্য পুকুরের কথা তো কখনো শুনিনি! পুকুরের অধিকারী গোঁড়া বৈষ্ণব বুঝি?"

সন্তোষ বললে, "ঠিক উল্টো। তাঁরা গোঁড়া শাক্ত।"

—"তবে ছিপের এমন অপমান কেন?"

—"মুর্শিদাবাদের সাগর-দিঘির নাম শুনেছ তো?"

—"রাজা মহীপালের সাগর-দিঘি?"

—"হ্যাঁ। একমাইল ব্যাপী বিরাট সেই দিঘি। তার বয়স শত শত বৎসর, তাতে মাছ আছে হয়তো লক্ষ লক্ষ, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা ভয়ে সেখানে মাছ ধরে না, এমন কি তার জল পর্যন্ত ব্যবহার করতে চায় না। অথচ কি যে সেই ভয়, কেউ তা জানে না! বিভীষিকা যেখানে অজ্ঞাত, মানুষের আতঙ্ক সেইখানেই হয় বেশি।"

—"তোমাদের দেশের পুকুরটাও ঐ জাতীয় নাকি?"

সন্তোষ সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললে, "আমাদের গ্রামের বর্তমান জমিদারের পিতামহের নাম ছিল রাজা রুদ্রনারায়ণ। লোকের বসতি থেকে অনেক দূরে তাঁর একখানি বাগানবাড়ি ছিল। তিনি প্রায়ই সেখানে বাস করতেন। পঞ্চাশ বছর আগে সেই বাগানবাড়ির একটি ঘরে হঠাৎ একদিন তাঁর মুণ্ডহীন মৃতদেহ পাওয়া যায়। আসল ব্যাপারটা প্রকাশ পায়নি, তবে কেউ যে তাঁকে খুন করে মুণ্ড কেটে নিয়ে পালিয়েছিল, এতদিন পরেও এইটুকু আমরা অনুমান করতে পারি।"

সন্তোষ এই পর্যন্ত বলে থামলে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম, রাজা রুদ্রনারায়ণের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পুকুরের রুই-কাতলার সম্পর্ক কি?

সন্তোষ আবার মুখ খুললে। বললে, "সেই সময় থেকেই ও-বাগানে কেউ বাস করে না, তার পুকুরে কেউ মাছ ধরে না। তবে বাগান-সংলগ্ন দুই মন্দিরে জমিদারের ঠাকুর আছেন, আজও তাঁদের পূজা হয়, আর সেইজন্যেই বাগান পুকুর আর বাড়িখানি সংস্কার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়নি। কিন্তু মন্দিরের পূজারীও সন্ধ্যাপূজার পর সেখানে আর থাকেন না, তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে—অর্থাৎ পালিয়ে আসেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ওখানে অপদেবতার ভয়-টয় আছে নাকি?"

—"তাও ঠিক জানি না। এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে জমিদারের নিষেধ আছে। গ্রামের লোক নানারকম কানাঘুষো করে বটে—আমি সে-সবে কানও পাতি না, বিশ্বাসও করি না। তবে শুনেছি, সেখানে এমন কোন মূর্তিমান আতঙ্ক আছে, যার নাম মুখেও উচ্চারণ করা উচিত নয়।... যত সব বাজে কথা!—আর এই-সব কথা নিয়েই পল্লীগ্রামের আড্ডাগুলি ভরসন্ধেবেলায় রীতিমত জমে ওঠে! ভূত পেত্নী, দৈত্য দানব! রূপকথার নায়ক-নায়িকা! ভূত পেত্নী বেঁচে ছিল মান্ধাতার যুগে, একেলে মানুষ মরবার পর আর বাঁচবার সুযোগ পায় না।"

আমারও ঐ মত। মরবার পর যে দেহ লুপ্ত হয়ে যায়, আত্মা যদি আবার সেই দেহ ধারণ করতে পারত, তাহলে এই প্রাচীনা পৃথিবীতে ভূত-পেত্নীর দল এত ভারি হয়ে উঠত যে, মানুষদের আর মাটিতে পা ফেলবার ঠাঁই থাকত না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "রুদ্রনারায়ণের বাগানবাড়িতে মাছ ধরাও নিষেধ নাকি?"

—"না। এখন যিনি জমিদার তিনি আমার বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে অনায়াসেই অনুমতি আনতে পারি। ইচ্ছে থাকলে গ্রামের আরো অনেকেও মাছ ধরার অনুমতি পেতে পারত, কিন্তু কারুর সে ইচ্ছে নেই। সকলেরই বিশ্বাস, ও বাগানের পুকুরে মাছ ধরতে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, "সন্তোষ, তুমি তোমার জমিদার-বন্ধুর কাছ থেকে ছাড়পত্র জোগাড় কর। আমি খালি ওখানে মাছই ধরব না, দিন-তিনেক ঐ বাগানবাড়িতে নির্জন-বাসও করে আসব।"

—"নির্জন-বাস! কেন?"

—"প্রথমত, আমি তোমাদের গ্রামের কুসংস্কার ভেঙে দিতে চাই। দ্বিতীয়ত, রহস্যময় বাড়ি, ভৌতিক আবহ এ-সব আমি ভালোবাসি। তৃতীয়ত, শহুরে জনতার তর্জন-গর্জন ভারি একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, বিজন স্তব্ধতার ভিতরে মনকে খানিকটা ছুটি দেবার সাধ হচ্ছে।"

সন্তোষ বললে, "বহুৎ আচ্ছা! তাহলে আমিও তোমার সঙ্গী হতে চাই।"

দুই

রাজা রুদ্রনারায়ণ নিশ্চয়ই কবিদের মতো নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। সাধারণ ধনীরা এমন জায়গায় বাগানবাড়ি তৈরি করেন না।

বাগানের কোনোদিকে পাঁচ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। চারিধারে ধূ-ধূ করছে মাঠ আর মাঠ আর জলাভূমি।

কিন্তু বাগানখানি যে চমৎকার ছিল, বহুকাল পরে আজও তা বোঝা যায়, পুকুরের জলও এখনো পরিষ্কার আছে। তার কারণ শুনলুম, মন্দিরবাসী দুই পাষাণ-দেবতার দয়া। পুকুরের জল তাঁদের নিত্যপূজার কাজে লাগে, তাই নিয়মিতভাবে তার পঙ্কোদ্ধার হয়।

বাড়িখানিও শুনলুম রুদ্রনারায়ণের যুগে যেমন ছিল প্রায় সেইভাবেই আছে। বর্তমান জমিদার তাঁর পিতামহের প্রিয় আমোদ-ভবনটিকে একেবারে হতশ্রী হতে দেননি। মাঝে মাঝে তার ভিতরে-বাহিরে যে মার্জনা কার্য হয়েছে, এটাও আন্দাজ করতে পারলুম। মানুষ হচ্ছে গৃহের আত্মা। পরিত্যক্ত বাড়ি দেখলেই আমার মনে হয়, আত্মাহীন। এ বাড়িখানাকে তেমন বোধ হল না। মনে হল এখনো তার প্রত্যেকটি ইট প্রাণের হিল্লোলে জীবন্ত! যেন এখনো তার ঘরে ঘরে বাজছে নীরব চরণধ্বনি!

বললুম, "সন্তোষ, এ বাড়িতে ভূতুড়ে কোন লক্ষণই নেই। দোতলার ঐ কোণের ঘরটির দক্ষিণ খোলা। ঐ ঘরেই আমরা আশ্রয় নেব।"

সন্তোষ মাথা নেড়ে বললে, "অসম্ভব। ঐ ঘরেই রাজা রুদ্রনারায়ণের মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গিয়েছিল। ও ঘর তালা বন্ধ, কারুর প্রবেশ-অধিকার নেই।"

—"বেশ, তাহলে ওর পাশের ঘর। ওখানা পেলেও দুঃখিত হব না।"

বাগানের পাশের মন্দিরে উঠেছে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি। তারপরেই এক মুহূর্তের ভিতরে যেন ঘুমিয়ে পড়ল চতুর্দিক। দূরের মাঠ থেকে কোন গৃহস্বামী গাভীর হাম্বাধ্বনি বা কৃষক কি রাখালের একটা কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শোনা গেল না। এ জায়গাটা যেন মানুষের পৃথিবীর বাইরে। নির্জনতাকে কোনদিন এমন স্পষ্টভাবে অনুভব করবার সুযোগ পাইনি।

স্তব্ধতাকেও মানস-চক্ষে দেখলুম ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো। মাঝখানে রয়েছে যেন মৌনতার রেখা লেখা— আর তারই চারিদিক ঘিরে শব্দময় অদৃশ্য ফ্রেমের মতো পাখিদের সন্ধ্যা-কাকলি, তরুকুঞ্জের পত্রমর্মর, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, ঝিল্লীদের ঐকতান!.....সুন্দর!

গাড়ি-বারান্দার উপরে একলা দাঁড়িয়ে আছি। সন্তোষ গিয়েছে রাত্রের-নিদ্রার বন্দোবস্ত করতে।

মন্দিরের ভিতর থেকে তিনজন লোক বেরিয়ে এল। একজনকে দেখেই বুঝলুম পূজারী।

তারা হন হন করে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ আমাকে দেখেই গাড়ি-বারান্দার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের চোখ-মুখ বিস্ময়-চকিত।

তাদের মনের ভাব বুঝে মৃদু হেসে বললুম, "মশাইরা অবাক হয়ে কি দেখছেন?"

পূজারী বললে, "আপনি কে?"

—"জমিদারবাবুর অতিথি।"

পূজারী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে ত্রস্ত স্বরে বলল, "অতিথি! এই বাড়িতে!"

—"সেইরকমই তো মনে হচ্ছে!"

পূজারী আর কিছু বললে না। তারা তিনজনেই একবার পরস্পরের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে দ্রুতপদে বাগানের সীমানা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকগুলোর সন্দেহজনক কথা ও ভাবভঙ্গী নিয়ে হয়তো মনে মনে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করতুম, কিন্তু সে-সময় আর পেলুম না। কারণ সুদূরের একটা তালবনের মাথার উপরে আকাশ তখন পরিয়ে দিচ্ছিল চাঁদের মণিমুকুট। সে গৌরবময় দৃশ্য আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে।

তিন

গ্রামের কোন চাকর বা পাচক আমাদের সঙ্গে এখানে রাত্রিবাস করতে রাজী হয়নি। কাজেই সন্তোষই করলে নিজের হাতে রান্নার আয়োজন। এদিকে আমার বিদ্যা প্রথম ভাগ পর্যন্তও পৌঁছোয় না। আমি চেষ্টা করলে কেবল একটি জিনিস ভাল রাঁধতে পারি, ভাত। তবে হাঁড়ি নামিয়ে ফ্যান গালতে পারি না।

আমরা যে-ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম সেখানে ছিল একখানা সেকেলে পালঙ্ক, দুখানা কাঠের কেদারা, দুখানা টুল, দেয়ালে টাঙানো দুখানা মস্ত মস্ত আরশি, একটা দেরাজ-ওয়ালা আলনা ও কারুকার্য-করা প্রকাণ্ড আলমারি। প্রত্যেক আসবাবই ময়লা ও জীর্ণ। দেওয়ালে খানকয়েক পৌরাণিক ছবি ঝোলানো রয়েছে—সবগুলোই সেকালের বিখ্যাত চোরবাগান আর্ট-স্টুডিয়োর লিথোগ্রাফ।

চেয়ারের উপর বসে বসে সন্তোষের সঙ্গে আগামী কল্যকার মৎস্য শিকার নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। জলে মাছেদের অবিরাম লাফালাফি দেখেই বুঝেছি, এ পুষ্করিণী হচ্ছে ছিপধারীদের স্বপ্নস্বর্গ। বঁড়শির সঙ্গে সাংঘাতিক পরিচয় হয়েছে, এখানে এমন ঘাগী মাছের অভাব। ফ্যালো টোপ, তোলো মাছ, কালকের ব্যাপার যে এই হবে, এ সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ নেই!

মনের আনন্দে এমনি সব আলোচনা চলছে, এমন সময়ে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্তোষ বলে উঠল, "রাত সাড়ে-বারোটা বেজে দু-মিনিট।"

বললুম, "তাই নাকি? তাহলে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করবার আগে আর একবার আকাশের চাঁদমুখ দেখে আসি।"

ওঠবার উপক্রম করছি, হঠাৎ পাশের ঘরে হল একটা অভাবিত শব্দ।.....মেঝের উপর দিয়ে হড়্ হড়্ করে কে যেন একখানা ভারী চেয়ার টেনে ও-ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত নিয়ে গেল। ও-ঘর মানে, রাজা রুদ্রনারায়ণের তালাবন্ধ ঘর। যার মধ্যে কারুর ঢুকবার হুকুম নেই।

সন্তোষ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল।

আমি বললুম, "তুমি বললে এ-বাড়িতে আর কেউ থাকে না। তবে ও-ঘরে অমন সশব্দে চেয়ার টানলে কে?"

হতভম্ব সন্তোষ কোন জবাব দেবার আগেই বাইরে কোথায় দড়াম করে একটা দরজা-খোলার আওয়াজ হল! আধ মিনিট পরেই শোনা গেল, সিঁড়ির উপর দিয়ে কে যেন দুম-দুম করে অত্যন্ত ভারী পা ফেলে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

শব্দ খুব উচ্চ ও পাগুলো ভারী বটে, কিন্তু মনে হল, যে নেমে গেল সে মাতাল আর অন্ধ। কারণ আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়, সে পা ফেলছে দ্বিধাভরে ও বিশৃঙ্খলভাবে।

সন্তোষ বললে, "খালি-বাড়ি পেয়ে নিশ্চয়ই এখানে কোন বদমাইশ এসে বাসা বেঁধেছে। চল, দেখে আসি।"

এর পরে সমস্ত ঘটনা ঘটল ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মতোই দ্রুত। ঘরের কোণ থেকে আমার মোটা লাঠিগাছা তুলে নিয়ে সন্তোষের সঙ্গে আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। নিচে নেমে গিয়ে দেখি, বাড়ির সদর দরজা খোলা। অথচ এ-দরজা আমি আজ নিজের হাতেই বন্ধ করে তবে

উপরে গিয়েছি।

কিন্তু বাগানে বেরিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। কাছাকাছি এমন কোন ঝোপঝাপও দেখলুম না, যার ভিতরে বা আড়ালে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় চারিদিক ধব-ধব করছে, ঘাস-বিছানায় একটা পাখি বা বিড়াল পর্যন্ত থাকলেও নজর এড়াতে পারবে না। তবে বাড়ির উপর থেকে এইমাত্র যে সশব্দে নেমে এসেছে, এর মধ্যে সে কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দিলে?

সবিস্ময়ে এদিকে-ওদিকে চাইতে চাইতে নজর পড়ল পুকুরের দিকে।

জীর্ণ ঘাট থেকে হাত-কয়েক তফাতে জলের উপরে দেখলুম একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য! জল যেন ছটফট করে চারিধারে ছুঁড়ে ফেলছে ছিন্নভিন্ন চাঁদের কিরণ।

কোন মস্ত মাছও ঘাই মেরে জল অমন তোলপাড় করে তুলতে পারে না! পুকুরের বুকে ক্রমেই বৃহত্তর হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে জ্যোৎস্নামাখা জলচক্রের পর জলচক্র!

সন্তোষও দেখতে পেলে। দুজনেই ছুটে ভাঙা ঘাটের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রথমটা আর কিছুই দেখতে পেলুম না। তারপর আচম্বিতে ভেসে উঠল মানুষের দুখানা হাত। যেন কোন জলমগ্ন লোক তলিয়ে যাবার আগে অসহায়ভাবে দুই হাত উপরে তুলে প্রাণ বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

দ্রুতপদে ঘাট দিয়ে নেমে গেলুম জলের ভিতরে। ক্রমে আমার বুকের উপরে জল উঠল। আমি সাঁতার জানি না, আমার পক্ষে এর বেশি এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ব্যাকুল হাত দুখানা জেগে আছে তখনো জলের উপরে। যেন তারা কোন অবলম্বন খুঁজছে।

হাত দুখানা হঠাৎ অদৃশ্য হল। ভাবলুম, লোকটা বোধ হয় একেবারেই তলিয়ে গেল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি হাত দুখানা একেবারে আমার কাছে এসে ভেসে উঠেছে! দুই হাতের দুই মুঠো একবার খুলছে, একবার বন্ধ হচ্ছে—যেন তারা আর কিছু না পেয়ে শূন্যতাকেই ধরবার চেষ্টা করছে!

আমার হাতে ছিল লাঠি। তাড়াতাড়ি লাঠিখানা এগিয়ে দিলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম, আমার লাঠি ধরে জলের ভিতর থেকে কে যেন সজোরে টান মারছে! প্রচণ্ড টান!

সে বিষম টান আমি সামলাতে পারলুম না। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলুম এবং জল উঠল প্রায় আমার গলার উপরে!

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে হাতের লাঠি ত্যাগ করবার উপক্রম করছি, এমন সময়ে পিছন থেকে সন্তোষ এসে আমাকে দুই হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে। তারপরে আমাকে যত জোরে পারে টানতে টানতে সিঁড়ির উপর দিকে নিয়ে চলল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার লাঠির অন্য প্রান্ত ধরে জল থেকে ঘাটের উপরে টলতে টলতে এসে উঠল আর এক মনুষ্য-মূর্তি!

নিরাপদ স্থানে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, "সন্তোষ, ভয় নেই, আমার কিছু হয়নি। কিন্তু ঐ লোকটিকে দেখ, ওর অবস্থা বোধহয় শোচনীয়।"

মূর্তিটা তখন ঘাটের উপর-ধাপে এসে লম্বা হয়ে শুয়েছিল। সন্তোষ এগিয়ে এসে তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং পর-মুহূর্তেই বিকট এক চিৎকার করে সেখান থেকে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

সে-রকম প্রচণ্ড চিৎকার জীবনে আমি কখনো শুনিনি—আমার সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! বিদ্যুৎ-আহতের মতন আমি উঠে বসলুম এবং তার পরেই স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম, ঘাটের উপর

শায়িত এক আড়ষ্ট নিশ্চেষ্ট দেহ,—তার হাত আছে, পা আছে, এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব আছে, কিন্তু স্কন্ধের উপর নেই কেবল তার মুণ্ডু—সে হচ্ছে কবন্ধ!

বিজয়ার প্রণাম

এক

হঠাৎ কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। মনে আছে, সেদিন দুর্গাপূজার অষ্টমী।

ঠিক এক বছর পরে, নবমীর দিন আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। বাড়িতে এসে দেখি, চিঠির বাক্সে আমার নামে খানকয় চিঠি জমা হয়ে আছে।

একখানা চিঠি লিখেছেন আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় সুরেনকাকা। তারিখ দেখে বুঝলাম, চিঠিখানি লেখা হয়েছে গেল বছরের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন।

চিঠিখানি এই

'স্নেহাপদেষু,

প্রিয় নরেশ, একবার আমার সঙ্গে দেখা করো। আমার বিশেষ দরকার আছে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

সুরেনকাকা।'

বিদেশ থেকে সুরেনকাকাকে তিন-চারখানা চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু একখানারও জবাব পাইনি। ঠিক করলাম, আসছে কাল বিজয়াদশমীর দিন সুরেনকাকাকে প্রণাম করতে যাব।

দুই

সুরেনকাকার বাড়ি ছিল ভবানীপুরে। অনেকগুলো বাড়িতে বিজয়ার কোলাকুলি ও প্রণাম সেরে যখন সুরেনকাকার বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলাম, রাত তখন সাড়ে নটার কম হবে না।

গ্যাসের আলোতে দেখলাম, সুরেনকাকার বাড়ির সব দরজা-জানলা বন্ধ। ভিতর থেকে একবিন্দু আলোর আভাও বাইরে আসছে না। এরই মধ্যে কি বাড়ির সব লোক ঘুমিয়ে পড়েছে? কিন্তু একটা জানলাও খোলা নেই কেন? এখন তো শীতকাল নয়, এই গরমে সব জানলা বন্ধ করে কেউ কি ঘুমোতে পারে? তবে কি বাড়িতে কেউ নেই? বাড়িখানাকে দেখলে তাই-ই মনে হয়। সে যেন কাতরভাবে নাচার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে ভেঙে পড়তে পারে! দু-পা এগিয়ে সদর দরজার কাছে গেলাম। দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল।

সুরেনকাকার বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার, কাজেই ভিতরে ঢুকতে কোনো দ্বিধাবোধ করলাম না। উঠানের সামনে এসে আমার থমকে দাঁড়ালাম। দশমীর চাঁদের আলো এসে উঠানের খানিকটা উজ্জ্বল করে তুলেছে, বাকি সবটা অন্ধকার। কোথাও কারুর সাড়াশব্দ নেই, কেবল কতগুলো ঝিঁঝিপোকা কর্কশ স্বরে চিৎকার করছে।

চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'সুরেনকাকা!' আমার গলার আওয়াজ শুনে ঝিঁঝিঁপোকাদের কনসার্ট থেমে গেল।

বাড়ির ভিতর থেকে কোনো সাড়া এল না, কিন্তু বাইরের রাস্তা থেকে আওয়াজ এল 'রাম-নাম

সত্য হ্যায়, রাম-নাম সত্য হ্যায়, রাম-নাম সত্‌ত্য হ্যায়!' কারা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের ভিতরে নিজেকে বড়ো বেশি একলা বলে মনে হতে লাগল!

আবার চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'সুরেনকাকা বাড়িতে আছেন?'

যেন অনেকদূর থেকে ক্ষীণ সাড়া এল, 'কে? কে ডাকে?'

'আমি! আমি নরেশ।'

'যাচ্ছি।'

খট খট খট করে খড়মের শব্দ জেগে উঠে সেই অন্ধকার বাড়ির স্তব্ধতা ভেঙে দিল। সুরেনকাকা বাড়িতে খড়ম পায়ে দিতেন।

খড়মের শব্দ বারান্দার কাছে এসে থামল। সেইখান থেকেই সুরেনকাকা বললেন, 'নরেশ, এতদিন পরে তুমি এলে বাবা? আমি যে আজ এক বছর ধরে তোমার অপেক্ষা করছি।'

আমি বললাম, 'সুরেনকাকা! আমি যে বিদেশে ছিলাম, আপনার চিঠি পাইনি।'

'আচ্ছা, সে-সব কথা পরে শুনব অখন। আগে তুমি ওপরে এসো।'

'ওপরে কী করে যাব, চারদিকে যে অন্ধকার! আগে আলো জ্বালুন!'

'তবেই তো মুশকিলে ফেললে! সব আলোর তেল ফুরিয়ে গেছে যে! . আচ্ছা নরেশ, তাহলে তুমি ওইখানেই দাঁড়িয়ে শোনো। তুমি আমাকে হাজার টাকা ধার দিয়েছিলে, মনে আছে তো? তোমার সেই হাজার টাকা আমার অ্যাটর্নি রামেন্দু বোসের কাছে জমা আছে। সেখানে গেলেই তুমি টাকা পাবে!'

আমি বললাম, 'সুরেনকাকা, ওকথা কেন, আমি তো আপনার কাছে টাকা চাইতে আসিনি, আমি এসেছি বিজয়ার প্রণাম করতে! আমি ওপরে যাব।'

'আচ্ছা, তাহলে ওপরেই এসো। সিঁড়ির ওপরে চাঁদের আলো আছে, তোমার কোনো কষ্ট হবে না!'

খুব সাবধানে, উঠানের অন্ধকার পেরিয়ে সিঁড়ির উপরে গিয়ে উঠলাম। তারপর দ্বিতলের ছাদে গিয়ে দাঁড়াতেই সুরেনকাকা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন।

সুরেনকাকার মাথায় ছিল বকের পালকের মতন সাদা লম্বা চুল ও মুখে ছিল তেমনই লম্বা ও সাদা দাড়ি; তার উপরে আজ তিনি আবার একখানা সাদা চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়েছিলেন। ম্লান চাঁদের আলোতে আজ তাঁর মূর্তির ভিতরে কেমন একটা অমানুষিক ভাব জেগে উঠেছে! এ মূর্তিকে আজ যদি কোনো অপরিচিত লোক অজানা কোনো জায়গায় দেখতে পায়, তাহলে নিশ্চয়ই তার নাড়ি ছেড়ে যায়!

আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলাম, কিন্তু হাত বাড়িয়েও তাঁর পা ছুঁতে পারলাম না। বললাম, 'ও সুরেনকাকা, আপনি পা সরিয়ে নিলেন কেন? দিন, পায়ের ধুলো দিন!'

সুরেনকাকা কোনো জবাব দিলেন না।

আচম্বিতে বাড়ির একটা ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় আর্তনাদ জেগে উঠল, কে যেন কাতরে কাতরে কাঁদছে আর যাতনায় ছটফট করছে।

চমকে মুখ তুলে বললাম, 'সুরেনকাকা, সুরেনকাকা, ও কে কাঁদে?'

সুরেনকাকা এবারেও জবাব দিলেন না। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর দিকে চলে গেলেন, তাঁর খড়মের খটখটানি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে এল, যেন তিনি দূরে, দূরে, অনেক দূরে এগিয়ে আর এগিয়েই যাচ্ছেন—খটখট খটখট খটখট খট, খট, খট, খট

তিন

হতভম্ব হয়ে বসে আছি। চাঁদের আলো আছে বটে, কিন্তু সে যেন আজ মরে গেছে। একটা কালপ্যাঁচা তেতলার ছাদের আলিসার কোণে বসে মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে দেখছে। নীচের উঠান থেকে একটা হুলোবেড়াল ক্রমাগত চ্যাঁচাচ্ছে, আউ, আউ, আউ, আউ—

মিনিট পনেরো কেটে গেল, কিন্তু সুরেনকাকার আর দেখা নেই! আজকে এই বাড়ির অবস্থা, সুরেনকাকার ব্যবহার, মেয়ে-গলায় কাতরানি, সবই কেমন রহস্যময়!

আর-একটা প্রশ্ন মনকে বার বার খোঁচা দিতে লাগল। সুরেনকাকার পায়ে হাত দিয়েও তাঁর পা ছুঁতে পারলাম না কেন? হ্যাঁ, কেন পারলাম না, কেন?

আরও মিনিট পাঁচেক কাটল। আমি আর থাকতে না পেরে ডাকলাম, 'সুরেনকাকা, অ সুরেনকাকা!'

কোনো সাড়া নেই।

'সুরেনকাকা! শুনছেন? অ সুরেনকাকা!'

কোনো সাড়া নেই।

প্যাঁচাটা ওঁচা গলায় চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উড়ে পালাল, হুলোবেড়ালটাও চুপ মেরে গেল। আমি তো এ বাড়ির সর্বত্র যেতে পারি, এখানেই বা বসে থাকি কেন? এই ভেবে উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

উঠানের উপরে দু-দিকে বারান্দা। তার ভিতরে খানপাঁচেক ঘর। সেখানে চাঁদের আলো নেই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম, সব দরজাই কেবল বন্ধ নয়, বাহির থেকে তাদের শিকলে তালা-চাবি লাগানো!

কিন্তু!

সুরেনকাকা যে এদিকেই এসেছেন, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই! আর এই ঘরগুলোরই কোনো একখানার ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় কান্না শুনেছি, এটাও আমি হলপ করে বলতে পারি! . . . সুরেনকাকাই বা কোথায় গেলেন; কাঁদলই বা কে, আর সব ঘর তালাবন্ধই বা কেন?

এতক্ষণ যে সন্দেহ করিনি, এইবারে তা জেগে উঠে আমার মনকে আতঙ্কে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিল। আমি পাগলের মতন উপর থেকে ছুটে নীচে নেমে এলাম, রুদ্ধশ্বাসে সদরের কাছে এসে একটানে দরজা খুলে ফেলতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না, সদর দরজাতেও বাহির থেকে কুলুপ দেওয়া! এই সদর দরজা দিয়েই একটু আগে আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকেছি! এর মধ্যে দরজায় তালা দিল কে? আর কেনই বা দিল?

হতাশভাবে সদর দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে পড়ল, সুরেনকাকার বাড়ির খিড়কিতে পুকুর ও বাগান আছে। এ-কথা মনে হতেই বেগে সেইদিকে ছুটলাম। বাগানে গিয়ে কোনোরকমে পাঁচিল টপকে আবার রাস্তায় এসে পড়লাম।

চার

সুরেনকাকা যে পাড়াতে থাকতেন, সেই পাড়াতেই আমার বাল্যবন্ধু অখিলের বাড়ি। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই অখিলের বাড়িতে ছুটলাম।

বৈঠকখানায় বসে অখিল চা পান করতে করতে খবরের কাগজ পড়ছিল, আমাকে দেখে বিস্মিত স্বরে বলল, 'এই যে, নরেশ যে! কবে কলকাতায় ফিরলে হে?'

'পরশু! কাল তোমাদের পাড়ায় বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছিলাম, কিন্তু সুরেনকাকার বাড়িতে দেরি হয়ে গেল বলে তোমার সঙ্গে আর দেখা করতে পারিনি।'

দুই চোখ কপালে তুলে অখিল বলল, 'কাল তুমি সুরেনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে? কিন্তু সেখানে তোমার দেরি হল কেন?'

'সুরেনকাকার সঙ্গে কথা কইতে কইতে দেরি হয়ে গেল।'

অখিল গম্ভীর মুখে বলল, 'নরেশ, কাল তুমি কতটা সিদ্ধি খেয়েছিলে?'

আমি বললাম, 'কাল বিজয়ার সম্ভাষণ করতে গিয়ে প্রত্যেক বাড়িতেই একটু-আধটু সিদ্ধি খেতে হয়েছিল বটে, তবে বেশি সিদ্ধি নিশ্চয়ই খাইনি। কিন্তু তুমি এ-কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

অখিল বলল, 'এই এক বছরের ভেতরে তুমি কি সুরেনবাবুর কোনো খবর পাওনি?'

'না।'

'গেল বছরে ঠিক এমনি সময়ে এ পাড়ায় কলেরার মড়ক দেখা দিয়েছিল। সাত দিনের ভেতরে সুরেনবাবু, তাঁর স্ত্রী আর দুটি ছেলে-মেয়ে কলেরায় মারা যান। সেই থেকে তাঁর বাড়ি খালি পড়ে আছে।'

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু বিজয়াদশমীর দিন হাজার অনুরোধেও আর আমি সিদ্ধি খাই না।

তবে একটা জায়গায় আজও আমার খটকা লেগে আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই না হয় সিদ্ধির খেয়াল বলে উড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু সুরেনকাকার অ্যাটর্নির কাছে গিয়ে আমার হাজার টাকা যে ফিরে পেয়েছি, এটা তো কিছুতেই ভুলতে পারছি না!

আয়নার ইতিহাস

এক

বেনারসে বেড়াতে এসেছি, সঙ্গে আছেন মা ,ভাই ও বোনেরা।
অগস্ত্য কুন্ডের সরু একটা গলির ভেতরে একখানা মাঝারি আকারের বাড়িতে আমাদের বাসা। বাড়িখানা তেতলা এবং সেকেলে।এ অঞ্চলের অধিকাংশ বাড়ির মত নীচের তলার সঙ্গে সূর্যালোকের সম্পর্ক নেই কিছুমাত্র।তাই একতলার ঘরগুলো আমরা ব্যবহার করতুম না।

আমদের বেনারসে থাকার কথা মাস তিনেক । দু চার দিন যেতে না যেতেই এখানকার জনাকয়েক লোকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন । কাজেই একখানা বাইরের ঘর বা বৈঠকখানার দরকার হল। একদিন সকালে নীচে নেমে দেখলুম নীচের কোন ঘর কাজে লাগানো যায় কিনা। সদর দরজার পাশেই একখানা বড় ঘর পছন্দ হল। যদিও এ ঘরে চারটে জানালা ছিল, তবুও ঘরের ভিতরে বিরাজ করছিল প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার ।কিন্তু বেনারসের বাসিন্দাদের অন্ধকারের সম্বন্ধে বোধহয় কোন অভিযোগ নেই , অতএব এই ঘরখানাকেই বৈঠকখানার উপযোগী করবার চেষ্টায় নিযুক্ত হলুম ।

ঘরের জানালাগুলো খুলে দিয়ে দেখলুম ,মাঝখানে রয়েছে একখানা চৌকি আর পূর্বদিকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো রয়েছে প্রকান্ড একখানা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি- নিশ্চয়ই বাড়িওয়ালারই সম্পত্তি ।

কিন্তু ছবিখানা ছিল পিছন ফেরানো। আমি তাকে সামনে ফেরাতে গিয়ে দেখলুম –না, এখানা তো ছবি নয় – দামি সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত বড় এক আয়না – লম্বায় পাঁচ হাত ও চওড়ায় তিন হাত ।ফ্রেমের সোনালি রঙ নানা জায়গায় চটে গিয়েছে দেখে বুঝলুম ,আয়নাখানার বয়স অল্প নয়।
এরকম মূল্যবান আয়না এভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে কেন,দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছি, এমন সময় আমার সখের কুকুর ঝুমি সেখানে এসে হাজির হল।
আদর করে তাকে ডাকলুম ,আয় রে ঝুমি, আয়।
ঝুমি ল্যাজ নেড়ে মনের আনন্দ জানালে, - কিন্তু পর- মুহুর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে তার কানদুটো হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠল, এবং ল্যাজটা কুঁকড়ে ঢুকে গেল একেবারে পেটের তলায়। ব্যাপার কি? ঝুমি কি আয়নার ভেতরে তার নিজের চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে? একটু আবাক হলুম! কারণ আমি বরাবরি লক্ষ্য করে দেখেছি কুকুর-বিড়ালেরা আরশিতে নিজেদের চেহারা দেখে বিশেষ বিস্মিত হয়না-অনেক সময় গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনা। ঝুমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরে পড়ল। তারপর এ ঘরে সে আর ডাকলেও আসত না। এমনকি ঘরের পাশ দিয়ে আনাগোনার সময়ও গরর গরর করে গর্জন করত। তার এ ব্যবহারের কারণ বোঝা গেল না।

দুই

দিন তিনেক পরের কথা।
দোতলায় বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ নীচু থেকে এল বিমলের পরিত্রাহি চিৎকার ।
বিমল হচ্ছে আমার ছোট ভাই।বয়স সাত বৎসর।
দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলুম। চিৎকার আসছে বাইরের ঘর থেকে।
সেখানে গিয়ে দেখি, আয়নার সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে ভয়ার্ত স্বরে বিমল চিৎকারের পর চিৎকার করছে।
- কি রে বিমলা, কি হয়েছে রে?
- জুজু দাদা জুজু! আয়নার ভেতরে জুজু!
- কি যা তা বলছিস! কই, আয়নার ভেতরে তো কেউ নেই, তুই আর আমি ছাড়া !
- না দাদা, একটা ভয়ানক জুজু আয়নার ভেতর থেকে কটমট করে আমার পানে তাকিয়ে ছিল।তার ছেলেমানুষি ভয়ের কথা শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলুম।
কিন্তু আমার হাসি শুনেও বিমল কিছুমাত্র আশ্বস্ত হল না। দারুন আতঙ্কে আয়নার দিকে তাকাতে তাকাতে পায়ে পায়ে পিছিয়ে পড়ে ঘর থেকে সে পালিয়ে গেল ।
ব্যাপার কি? অবলা পশু ঝুমি, অবোধ শিশু বিমল – এ ঘরে ঢুকে দুজনেই এরকম ব্যবহার করলে কেন? দুজনেই ভয় পেল ঐ আয়নাখানা দেখে ? আশ্চর্য ! একখানা জীর্ণ, ত্যক্ত , সাধারণ সেকেলে আরশি – তার অপরিস্কার কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবল এই ঘরেরই খানিকটা অংশ ,এর মধ্যে আবার ভীতিকর কি থাকতে পারে? তবে কি ওর পিছনে কিছু লুকিয়ে আছে? সাপ-টাপ বা অন্য কিছু জীব ?
সাবধানে এগিয়ে হেলিয়ে দাঁড় করানো সেই আয়ানার পিছনের ফাঁকে উঁকি মারলুম !
কিছুই নেই। আরও ভাল করে দেখবার জন্য দুই হাতে আয়নাখানাকে ধরে টেনে সরাতে গেলুম। কিন্তু পারলুম না – বিষম ভারী । অথচ সেদিন এখানাকে আমি নিজের হাতেই ফিরিয়ে খুব সহজেই সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলুম। হঠাৎ এখানাকে জগদ্দল পাথরের মতন ভারী বলে মনে হচ্ছে কেন?..... আরও খানিক্ষণ প্রাণপণে টানাটানির পর সে ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিলুম।
...এ আবার কি রহস্য?

তিন

কয়েকদিন কেটে গেল ।
সেদিন দুপুরে দুজন বন্ধু এসেছিলেন। বাইরের ঘরে বসে খানিক্ষণ গল্প করে তাঁরা চলে গেলেন।
আমি একলাটি বসে খবরের কাগজ পড়তে লাগলুম ।
দুপুরবেলায় এ ঘরটায় খানিক্ষনের জন্য কিছু আলো আসে।
পড়তে পড়তে প্রাণের ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম । মনে হল, আমি যেন এ ঘরে আর একলা নেই, কে যেন অপলক চোখে আমার পানে তাকিয়ে আছে !
মুখ তুলে অবস্য কাউকে দেখতে পেলুম না । দেখতে পাবার কথাও নয়। তবু কিন্তু মনের ভেতর থেকে সেই অদ্ভুত ভাবতা তাড়াতে পারলুম না – সেখানে আমার পাশে অদৃশ্য আর একজনের উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলুম বারংবার।

আবার মুখ তুলতেই চোখ পড়ে গেল সেই পুরাতন আয়নার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল ! আয়নার মধ্যে সবিস্ময়ে দেখলুম ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক ভীষণ মুর্তি। হ্যাঁ, সেই মূর্তি কে ভীষণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না ! তার চোখ দুটো কোটর থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তার জিভখানাও ঠোঁটের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে, আর তার গলা জুড়ে রয়েছে একটা টকটকে লাল দাগ।

আমি একবার একটা গলায় দড়ি দিয়ে মরা লোক দেখেছিলুম। এরও চেহারা ঠিক সেইরকম। কয়েক মুহূর বসে রইলুম আচ্ছনের মত । তারপর ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকালুম। কিন্তু কই, আর কেউ তো এখানে নেই!

আবার আয়নার দিকে চোখ গেল। তার মধ্যেও আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির চিহ্ন নেই ।

ভূত –টূত মানিনা, আর এমন অসম্ভবও কখনো সম্ভব হয় না, কিন্তু আশ্চর্য আমার চোখের ভ্রম ! নিজের মনেই হেসে উঠলুম । এ হচ্ছে শিবের কাশী,আর শাস্ত্র বলে শিব হচ্ছেন ভূতনাথ । তবে কি কোন শিবানুচরই সময় কাটাবার জন্য আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মস্করা করবার ফিকিরে আছেন? অন্য লোক হলে হয়ত তাইই বুঝত। কিন্তু আমি হচ্ছি অবিশ্বাসী আধুনিক বাঙালী , মেডিকেল কলেজে দস্তুরমতো মড়ার পর মড়া কেটে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি – আমার কাছে শাস্ত্রীয় কুসংস্কারের কোন ধাপ্পাবাজিই খাটবে না। অ্যানাটমির কোন কেতাবেই ভৌতিক দেহের বর্ণনা নেই – ভূত পেত্নী বাস করে কেবল শিশুদের উপকথায় আর অশিক্ষিত লোকের কল্পনা জগতে ।

কিন্তু মনের ভিতরটা কেমন করতে লাগল । এই আবছায়া মাখা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের হাওয়া যেন বিষাক্ত । এ ঘরে কেউ নেই বটে ,তবু যেন সন্দেহ হয় , আমি ছাড়া আর একজন কেউ এখানে নিশ্চয় আছে । তার নিষ্পলক দৃষ্টি এসে বিঁধছে আমার সর্ব্বাঙ্গেই।

খবরের কাগজ ফেলে উপরে গেলুম । বিমলকে ডেকে প্রশ্ন করে বুঝলুম , আয়নার ভিতর সে যাকে দেখেছিল তার চেহারা হচ্ছে আমার আজকের দেখা লোকটার মতই!

গভীর বিস্ময়ে যেন হতভম্ব হয়ে গেলুম ! আমাদের দুজনেরই এমন একরকম চোখের ভ্রম হল কেন? কুকুর ঝুমিই বা ওঘরে ঢুকতে চায় না কেন? সে তো শাস্ত্রীয় ভূতনাথের নাম শোনেনি বা উপকথায় উপদেবতার গল্পও পড়েনি, তবে তার ভয় পাবার কারণ কি?

চার

গঙ্গার ধারে ভূষণবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভূষণবাবু হচ্ছেন এখানকার একজন সবজান্তা লোক – বেনারসের নতুন ও পুরানো সব খবর তাঁর নখদর্পণে।

আজ সকালে আমার বাসায় ছিল ভূষণবাবুর চায়ের নিমন্ত্রণ।

যথাসময়ে তিনি এলেন কিন্তু বৈঠকখানায় ঢুকে আয়নাখানা দেখেই চমকে উঠলেন । তারপর ধীরে ধীরে বললেন , 'শিউপ্রসাদবাবুর আয়নাখানা এখনো এ বাড়িতেই আছে?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,'শিউপ্রসাদবাবু কে?'

- কাশীর এক মহাজন। আগে এ বাড়িখানা ছিল তাঁরই।
- তিনি এখন কোথায়?
- দশ বছর হল মারা গিয়েছেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।
- কিরকম?

- রাগের মাথায় এক চাকরকে তিনি এমন প্রহার করেন যে বেচারা মারা পড়ে। শিউপ্রসাদবাবুর নামে ওয়ারেন্ট বেরোয় । কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে এসে দেখে এই ঘরের কড়িকাঠে তাঁর মৃতদেহ ঝুলছে।তিনি গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।

আমার বুক কেঁপে উঠল। আয়নায় দেখা সেই মুর্তিটাকে আবার মনে পড়ল। সেই ঠিকরে পড়া চোখ, সেই বেরিয়ে পড়া লকলকে জিভ , সেই গলা বেড়ে টকটকে লাল দাগ । রুদ্ধশ্বাসে বললুম, 'তারপর?'

- তারপর এ বাড়িখানা বিক্রী হয়ে যায় । নতুন মালিক এখানে এসে কিন্তু বেশিদিন বাস করতে পারেননি।

- কেন?

- ঐ আয়নাখানার ভয়ে।

- তার মানে?

- আয়নাখানার ভারী দুর্নাম আছে। নানান লোকে নানান কথা বলে। সেসব আজগুবি কথা আমি বিশ্বাস করিনা, আপনাকে বলতে চাই না।

- আয়নার যদি এমন দুর্নাম, তবে অখানা ভেঙে ফেললেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।

- নতুন মালিককে সে পরামর্শও কেউ কেউ দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সাহসে কুলোয়নি। যে অভিশাপ আয়নার ভেতরে বন্ধ আছে, অখানাকে ভেঙে তাকে বাইরে আনতে তিনি ভরসা পাননি।

- তাহলে আপনি বলতে চান এটা হচ্ছে ভূতুড়ে আয়না?

- আমি বলি না, লোকে বলে।

একলাফে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম। ঘরের কোনে ছিল একটা জানালা ভাঙা লোহার গরাদ , টপ করে সেটা তুলে নিয়ে আয়নার ওপরে করলুম সজোরে এক আঘাত। প্রকান্ড কাচের ওপর অংশ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। আবার গরাদ তুললুম এবং পর মুহূর্তেই দেখলুম , আয়নার নীচের অংশে ফুটে উঠেছে আগুন ভরা দুটো চোখ ! কি ক্রুদ্ধ , কি হিংস্র সেই দৃষ্টি ! মুখ নেই, দেহ নেই – খালি দুটো জ্বলন্ত , ক্ষুধিত চোখ ! এও কি আমার চোখের ভ্রম?

আবার আঘাত করলুম, কাচের বাকি অংশও ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

ভূষণবাবু কিছু দেখেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু তিনি কাঁপতে কাঁপতে চৌকির ওপরে ধপাস করে বসে পড়লেন।

জ্বলন্ত চক্ষু

সেরাইকেলা থেকে আসছিলুম কলকাতায়।
সেকেন্ড ক্লাস কামরায় আমি ছিলুম একা। অচেনা লোকের মুখ দেখতে হবে না বলে মনটা খুব খুশি। ট্রেনে মানুষ হয় বিশেষরূপে স্বার্থপর ।
জানালার ধারে বসে খানিক্ষণ দেখলুম চাঁদের-আলো-দিয়ে-ধোয়া নির্জন পৃথিবীটাকে। ছবিতে আঁকা পাহাড় আর বন, মাঠ আর নদী। আরও দূরে চোখ চালালে মনে হয় সেখানে যেন গড়ে উঠেছে অজানা অচেনা অস্ফুট এক স্বপ্নরাজ্য ।
নির্জনতার ভেতর দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ট্রেন গতি কমিয়ে প্রবেশ করলে জনকোলাহলমুখর জামশেদপুর স্টেশনে। সেইখানেই লুপ্ত হল আমার একলা থাকার আনন্দ।
হঠাৎ কামরার দরজা খুলে গেল সশব্দে । ভিতরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল এক বৃদ্ধ শিখের দীর্ঘমূর্তি । তার সমস্তই লম্বা। লম্বাচওড়া প্রকান্ড দেহ , প্রকান্ড দাড়িগোঁফ,প্রকান্ড পাগড়ি। বয়স ষাটের ওপরে বোধহয় , কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ সিধে হয়ে রয়েছে সরল যষ্ঠির মত। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির ভেতর দিয়ে বেরোচ্ছে যেন আগুনের ফিনকি।
আগন্তুক এদিককার একখানা আসন দখল করলে। লক্ষ্য করলুম তার সঙ্গে মোটঘাট কিছুই নেই। সে বেশদূরের যাত্রী নয় ভেবে মনে মনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলুম।
শিখ যাত্রী আমার দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে নির্নিমেষ নেত্রে। ভালো লাগল না তার দৃষ্টির তীব্রতা । জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলুম ।
পাহাড় আর জঙ্গল । আলোক আর অন্ধকার । নির্জনতা আর নিস্তব্ধতা । যদিও রেলগাড়ির শব্দ ভেঙে দিচ্ছিল স্তব্ধতাকে।
কিন্তু এভাবে কতক্ষণ আর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়? কবিরা হয়ত সারা রাত জেগে বসে পাহাড়ে প্রান্তরে বনে জ্যোৎস্নার উৎসব দেখতে পারেন ; কিন্তু কবিতা লেখা দূরের কথা, মিল কাকে বলে তাই আমি জানিনা।
আবার ভিতরের দিকে ঘুরে বসলুম। আবার দেখলুম সেই জাগ্রত জ্বলন্ত দৃষ্টি।
অপরিচিত লোকটির আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকার অর্থ কি? এ হচ্ছে অভদ্রতা। কঠিন ভাষায় প্রতিবাদ জানানোর ইচ্ছা হল, কিন্তু শিখের প্রকাণ্ড দেহের খাতিরে সে ইচ্ছাটা দমন করতে বাধ্য হলুম । শক্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি ব্যর্থ ।
ঐ দৃষ্টিকে ফাকি দেবার সবথেকে নিরাপদ উপায় হচ্ছে বিছানায় লম্বমান হয়ে দুই চোখ মুদে ঘুমিয়ে পড়া । তারপরও লোকটা যদি আমার পানে চেয়ে সারারাত কাটাতে চায় , তাতে আমার আপত্তি নেই একটুও ।
পাতলুম বিছানা। পড়লুম শুয়ে । মুদে ফেললুম দুই চক্ষু।

দুই

আমি হিন্দি ভাষায় শুনলুম , 'বাবাজী কি এইভাবে ঘুমবেন?' জ্বালালে দেখছি ।
চোখ না খুলেই বললুম, 'হ্যাঁ।'

‘ঘুমবেন না।‘
ভাবলুম , মন্দ আবদার নয়। আমি জেগে বসে থাকি আর উনি আমাকে দৃষ্টিবাণ দিয়ে ক্রমাগত বিদ্ধ করতে থাকুন সারারাত ধরে। ঘুমোব বইকি , আলবাত ঘুমোব।
আবার শুনলুম, ‘বাবাজী ঘুমোবেন না।‘
‘কেন ঘুমোব না?’
‘এ কামরায় ঘুমোলে আপনি বিপদে পড়বেন।‘
‘বিপদ?’
‘হ্যাঁ।‘
লোকটা বলে কি ?এতক্ষণ পরে চোখ খুললুম । কারণ এর পরেও চোখ না খোলা হচ্ছে ডাহা বোকামি।
দেখলুম অদিককার আসনের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেই বৃদ্ধ শিখের মূর্তি ।
কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক । চেহারা দেখে বোঝা যায় সে ও শিখ ।
সবিস্ময়ে উঠে বসলুম । সেই বৃদ্ধ শিখ-ই বা কোথায় গেল আর এই যুবকই বা এখানে চলে এল কেমন করে? ইতিমধ্যে ট্রেন তো কোথাও থামেনি ! রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলুম।
ব্যাপারটা হচ্ছে , হতভম্ব ভাবটা লক্ষ্য না করেই যুবকটি যেন নিজের মনেই বলল, ‘হ্যাঁ , বিশেষ করে এই কামরাটা হচ্ছে বিপজ্জনক।‘
ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে বললুম, ‘কেন?’
‘অজিত সিং এখানে বেড়াতে আসে।‘
‘কে অজিত সিং?’
‘ আমার শ্বশুর।‘
অজিত সিং -এর পরিচয়টা স্পষ্ট হল না। বললুম , ‘আপনার শ্বশুর এখানে আসেন বলেই কি
এই কামরাটা বিপজ্জনক?’
‘হ্যাঁ।অজিত সিং হচ্ছে হত্যাকারী।‘
বোঝা যাচ্ছে নিজের শ্বশুর সম্বন্ধে যুবকের ধরণা খুব উচ্চ নয় । কিন্তু অজিত সিং লোকটা কে? হঠাৎ মনে একটা সন্দেহ জাগল। জিঞ্জাসা করলুম , ‘আপনার শ্বশুর কি বৃদ্ধ?’
‘হ্যাঁ।‘
‘মস্ত লম্বা চওড়া দেহ।‘
‘ঠিক।অজিত সিং বুড়ো তবু এখনো খুব জোয়ান । কিন্তু তাকে কি আপনি দেখেছেন?’
যুবকের চোখে মুখে ও স্বরে উত্তেজনা ।
বললুম, ‘কাকে আমি দেখেছি জানি না ,তবে জামশেদপুর থেকে এক বৃদ্ধ শিখ এই কামরায় উঠেছিল বটে । কখন যে নেমে গিয়েছে তা বলতে পারিনা। বোধহয় আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।‘যুবক ব্যস্তভাবে কামরার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। ‘তাহলে এর মধ্যে অজিত সিং এখানে এসেছিল। হায় হায়, এতো করেও তাকে ধরতে পারলুম না । নিশ্চয় সে আমার ভয়েই পালিয়েছে, - ধূর্ত শয়তান। আর বাবুজি, তুমিও বেঁচে গিয়েছ।‘
‘মানে?’

‘আমি এখানে না এলে সে তোমাকে খুন করত।‘
‘কি অপরাধে?’
‘অপরাধ কি আবার? বিনা অপরাধে। সে হচ্ছে হিংস্র পশুর মত। এই কামরায় সে কয়েকজন যাত্রী কে খুন করেছে, তোমাকেও করত।‘
গা শিউরে উঠল। এ যা বলছে তা কি সত্য? বৃদ্ধ শিখের সেই অসহনীয় দীপ্ত চক্ষুর কথা মনে হল। তার দৃষ্টিতে একটা হিংস্র বন্য ভাব দেখেছি বটে। বাঘ হয়ত সেইভাবেই তাকায় শিকারের দিকে।
যুবক বললে, ‘ অজিত সিং তাই আমাকে খুন করেছে আর সেই অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছে। ফাঁসির পরেও তাকে আমি ছাড়িনি, তার পিছনে পিছনে আমি সর্বদা ছায়ার মত ঘুরি। আর কতকাল এইভাবে যাবে জানিনা , কিন্তু একদিন না একদিন তাকে ধরবই ধরব । আর শোন বাবুজি সে আমাকে খুন করেছিল এই কামরার ভিতরেই । সাবধান খুব সাবধান । এখনো এই কামরায় এলে তার মাথায় জাগে খুনের নেশা।‘

তিন

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে । যুবক হঠাৎ কামরার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।
যুবককে খুন করবার অপরাধে অজিত সিং- এর ফাঁসি হয়েছে এবং তার পরেও ট্রেনে চড়ে ভ্রমণ করছে তারা দুজনে!
চমৎকার গল্প । কোনো গাঁজাখুরি উপন্যাসের লেখকও এমন উদ্ভট কল্পনা মাথায় আনতে পারেনি!
ট্রেন ছুটছে। খানিক্ষন বাইরের দিকে তাকিয়ে উন্মত্ত যুবকের কথা ভাবতে লাগলুম। তারপর মনে মনেহেসে আবার শয়নের উদ্যোগ করছি , হঠাৎ চোখ পড়ল ওদিককার আসনে।
এ কি চরম বিস্ময় ! মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছে সেই বৃদ্ধ শিখ ! তার জ্বলন্ত চোখদুটিও স্থির হয়ে আছে আমার দিকে!
প্রথমটা আমার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হয়ে গেল দারুন আতঙ্কে ! হিংস্র হত্যাকারী অজিত সিং । যাত্রীদের সে খুন করে। আমার এখানে তার আবির্ভাবের কারণ কি?
তারপরেই মনে পড়ল সব কথা। আমি হো হো করে হাসতে লাগলুম।
পুরু ভুরু সঙ্কুচিত করে বৃদ্ধ বিরক্ত স্বরে বললে, ‘হাসছ কেন?’
‘তুমি কি অজিত সিং?’
‘আমার নাম তোমাকে কে বললে?’
‘তোমার জামাই।‘
‘কে? শের সিং? সে আর কি বলেছে?’
‘তাকে তুমি খুন করেছ। তাই বিচারে তোমার ফাঁসি হয়েছে।‘
‘সত্য কথা।‘
‘আমি আবার হো হো করে হেসে উঠলাম। তোমরা শবসুর-জামাই কেউ কম যাও না ।ধন্য তোমরা। কিন্তু এ কিরকম ঠাট্টা?’
‘ঠাট্টা?’

‘ঠাট্টা নয় তো কি? চলন্ত ট্রেনে ওঠানামা করে যাত্রীদের মিথ্যা ভয় দেখিয়ে তোমরা কি আনন্দ পাও বাবা? জেনে রেখো এতো সহজে ভয় পাবো না।‘
অজিত সিং – এর চোখদুটো আরো তীব্র হয়ে উঠল । কিন্তু মুখে সে কিছু বললে না।
‘নিহত শের সিং আর ফাঁসিকাঠে মৃত অজিত সিং , দুজনেই জীবন্ত। দুজনেই হয়ত বিনা টিকিটেই রেলপথে ভ্রমণ করছে আর খোশ মেজাজে করছে যাত্রীদের পিলে চমকে দেবার চেষ্টা। এমন আজগুবি ঠাট্টার কথা কে কবে শুনেছে ! দোহাই সিংহমশাই অমন কটমট করে আমার দিকে চেয়ে থাকবেন না। ঠাট্টারও একটা সীমা আছে। আপাতত আমাকে একটু ঘুমোতে দেবেন কি? নইলে আমি অন্য কামরায় যেতে বাধ্য হব। পরের স্টেশন আসতে আর দেরী নেই।
অজিত সিং গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বললে, ‘তোমার ধারণা আমরা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি?’
‘নিশ্চয়।‘
‘তোমার ধারণা আমরা জীবিত?’
‘তা আর বলতে?’
‘মূর্খ!’ অজিত সিং দাঁড়াল । তার কাঁধ থেকে পৈতার মত বন্ধনীতে ঝুলানো কৃপাণ দুলে উঠল। জ্বলজ্বল করছে তার দুটো নৃশংস চক্ষু।
মনে মনে প্রমাদ গুণে ভাবলুম, ব্যাপার তো সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। ঠাট্টাটা এইভাবে সাংঘাতিক হয়ে উঠবে নাকি? শ্বশুর আর জামাই দুজনে নিশ্চয় উন্মাদরোগগ্রস্থ ! ঘুম থেকে উঠে কার মুখ দেখেছি, আজকের যাত্রা শুভ নয়।
প্রচন্ডস্বরে অজিত সিং বললে, ‘ শের সিং ,শের সিং ! তুমিই হচ্ছ আমার দুষ্ট গ্রহ – কুক্ষণে আমি তোমাকে হত্যা করেছিলাম! আমার প্রাণ থেকে অনেক শিকার তুমি কেড়ে নিয়েছ , কিন্তু আজ আর তুমি পারলে না। তুমি আসছ জেনেই আমি গা ঢাকা দিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি বিদায় হবার পর আবার আমি ফিরে এসেছি। এবারে আমার হাত থেকে কেউ আর শিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে না – এবারে জয়ী হব আমিই-হা হা হা হা হা...
কি ভীষণ সে অট্টহাস্য , ফেটে গেল যেন আমার কান ! কাঁপতে কাঁপতে আমি উঠে দাঁড়ালুম ।
আচম্বিতে নিভে গেল কামরার আলো !
বিস্ফারিত চোখের সামনে দেখলুম, নীলবর্ণ অগ্নিতে ভরা দু দুটো নিষ্ঠুর ক্রুদ্ধ ও বুভুক্ষ দৃষ্টি এগিয়ে আসছে আমার দিকে।
পায়ে পায়ে পিছোতে পিছোতে কামরার এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালুম ।
সেই অপারথিব ভয়ঙ্কর চোখদুটো তখন জ্বলছে দাউ দাউ করে।
দৈবগতিকে হাত লেগে গেল বৈদ্যুতিক বাতির চাবিতে । দপ করে আবার জ্বলে উঠল আলো – সঙ্গে সঙ্গে বাইরেও দেখা গেল সারি সারি বৈদ্যুতিক আলোক , জনতার কণ্ঠস্বর । ট্রেন প্রবেশ করছে খড়গপুর স্টেশনে।
কামরার ভেতর দাঁড়িয়ে আছি একলা আমি। কোথায় অজিত সিং আর তার সেই জ্বলন্ত চক্ষু?আমার মাথা কি হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল? আমি কি এতক্ষণ ধরে এক দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম?

স্বপ্নই হোক আর যাই হোক বাবা, আর এ কামরায় নয় ! চুলোয় যাক একলা থাকার আনন্দ, আমি চাই এখন জনতায় পরিপূর্ণ একখানা কামরা। বসবার জায়গা না পেলে দাঁড়িয়ে যেতে রাজি আছি।তাড়াতাড়ি প্লাটফর্মে নেমে পড়ে চিৎকার করলুম, 'কুলি, কুলি!'

কঙ্কাল-সারথি

উঃ—ম্যালেরিয়ার মতন ছ্যাঁচড়া অসুখ পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি? উঁহু।

এই ছ্যাখ না, শখ করে সেদিন ঢাকুরিয়ায় 'লেক' দেখতে গিয়েছিলুম, সন্ধ্যার একটু আগে। হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে আমার জ্বর এল।

সেকি যে-সে জ্বর, যে-সে কাঁপুনি? না পারি দাঁড়াতে না পারি বসতে, একেবারে ঘাসের উপর পড়লুম শুয়ে। কী শীত রে বাপ! পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে, কাঁপতে কাঁপতে কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হয়ে রইলুম।

সেই ভাবে কতক্ষণ ছিলুম, ভগবান জানেন। তবে একবার চাদরের ভিতর থেকে জুল-জুল করে চোখ মেলে উঁকি মেরে দেখলুম চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের মেলা বসেছে, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই।

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কোথায় বাগবাজারে আমার বাড়ি, আর কোথায় পড়ে আছি আমি একলা, গুণ্ডায় গলায় ছুরি বসাতে পারে, সাপে কামড়াতে পারে, বিনা চিকিৎসায় প্রাণপাখি ফুড়ুক করে পালিয়ে যেতে পারে! বাড়ির লোক এতক্ষণে হয়তো ভেবেই সারা হচ্ছে!

আর তো এখানে থাকা চলে না! যেমন করেই হোক আমাকে আজ বাড়ি যেতে হবে!

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালুম। গায়ের ভিতর দিয়ে তখনো যেন আগুনের ঝলক ছুটছে, চোখের সামনে দিয়ে যেন রাশি রাশি সর্ষে ফুল নাচতে নাচতে একবার আঁধার-সাগরে ডুবে যাচ্ছে, আর একবার ভেসে ভেসে উঠছে। প্রতিবার পা ফেলি আর মনে হয়, এই বুঝি আমি দড়াম করে পপাত ধরণীতলে হলুম। তবু থামলুম না, মাতালের মতো

টলতে টলতে এগিয়ে চললুম।

রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে! সেই রাত্রে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, পৃথিবী কত বেশি স্তব্ধ হতে পারে! শহরের হট্টগোলে রাগ হয় বটে, কিন্তু এ স্তব্ধতাও সহ্য করা অসম্ভব! একটা ব্যাঙ, কি ঝিঁঝিঁ পোকা, কি একটা পাহারাওয়ালার নাক পর্যন্ত ডাকছে না, গাছের পাতায় বাতাসের একটু নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না! সারি সারি কোম্পানির আলোর থামগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চক্ষে যেন থমথমে অন্ধকারকে নিরীক্ষণ করছে! তিমির-তুলির প্রলেপ-মাখানো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির পর বাড়ি দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারাও যেন প্রেতপুরীর মতন নিস্তব্ধ—তাদের ভিতর থেকে একটা ঘুম ভাঙা খোকার কান্নার আওয়াজ পর্যন্ত জেগে উঠছে না। কে যেন আজ নিষুটীর মন্ত্র পড়ে সমস্ত জগৎকে বোবা করে দিয়ে গেছে!

জ্বরের ঘোরে চলেছি তো চলেছিই—এই নিঃশব্দ পল্লী ছেড়ে শহরের শব্দের রাজ্যে গিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণ যেন আই-চাই করতে লাগল, তবু এ পথ যেন আজও শেষ হবে না, কালও শেষ হবে না—আমাকে যেন কোন অভিশপ্ত আত্মার মতন চলতে হবে অনন্তকাল ধরে! এক বেচারা ইহুদীর গল্প পড়েছিলুম। কার শাপে তাকে নাকি অনন্তকাল ধরে সারা বিশ্বে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়েছিল। আমারও তাই হলো নাকি?—

মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে ভাবলুম, দূর ছাই, এ-সব কি উদ্ভট কথা ভাবছি? জ্বরে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মাঝে মাঝে এক-একটা মাঠ—যেন এক একটা অন্ধকারের মায়া সরোবর! সেখান দিয়ে যেন অন্ধকারের ঢেউ বইছে, অন্ধকারের স্রোত ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস করবার জন্যে! অন্ধকারের তরঙ্গের ভিতরে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে যেন বড় বড় দৈত্য-দানবের মতো—পথিকের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবার জন্যে তারা ওঁৎ পেতে প্রস্তুত হয়ে আছে! কান্না-ভরা কন্‌কনে বাতাস এসে চুপিচুপি যেন আমার কানে কানে বলে

যাচ্ছে—ওহে নিঝুম রাতের অজানা মানুষ! এ মৃত্যুপুরীর ভিতর দিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? আমার কথা শোনো, ভূত-প্রেতেরা একে একে জেগে উঠছে, এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, যাও গো!···

আরো খানিক অগ্রসর হয়ে মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত শব্দ এসে আমার দুই পায়ের দুই জুতোর ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে! প্রত্যেকবার পা ফেলি আর সেই শব্দগুলো জুতোর ভিতর থেকে চল্‌কে উঠে রাজ-পথের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে আমাকে চমকে চমকে তোলে! শব্দ শুনতে চাই, নিজের পায়ের শব্দ পাচ্ছি, কিন্তু কেন জানি না, সে শব্দ শুনে শুনে মন আমার খুশি হবে কি, আরো বেশি নেতিয়ে পড়তে লাগল!—সে যেন রাজপথে ঘুমন্ত কোন অশরীরী প্রেতাত্মার চিৎকার, আমার পদাঘাতে সে যন্ত্রণায় গজরে গজরে উঠছে!

আঃ! এতক্ষণ পরে রসা রোডের মোড়ে এসে পড়লুম। আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ট্রামওয়ের একটা লোহার থামে ঠ্যাসান দিয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলুম।

এখানটাও তেমনি নির্জন ও তেমনি নিস্তব্ধ হলেও আমার মন যেন অনেকটা আরাম পেল। এই তো ট্রামের রাস্তা! এই পথ ধরে সিধে গেলেই—যত মাইল দূরেই থাক—আমাদের পাড়া বাগবাজার যাওয়া যাবেই যাবে! খানিক দূর এগুতে পারলেই লোকজনের সাড়া পাব নিশ্চয়, আর ট্রাম বাস বন্ধ হলেও ট্যাক্সি মেলাও তো অসম্ভব নয়।

তখন জ্বরে আমার চোখ ছল্‌ছল করছে, কান করছে ভোঁ ভোঁ, আর মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে! বারবার ইচ্ছে হতে লাগল পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বার জন্যে, কেবল বাপ-মায়ের বিষণ্ণ মুখের কথা ভেবেই মনের সে ইচ্ছা দমন করলুম, অনেক কষ্টে। নিজে নিজেই বললুম,—মন, তুমি শান্ত হও! এই পথের শেষেই আছে তোমার বাড়ি, তোমার আত্মীয়-স্বজন, তোমার নরম তুলতুলে বিছানা! কোন রকমে

চক্ষু মুদে এই পথটুকু পার হতে পারলেই—ব্যাস, সকল কষ্ট সকল ভাবনার অবসান!

হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ জেগে উঠে চারিদিকের নিস্তব্ধতার মুখে যেন ভাষা দিলে! ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ করে একটা বাজ ডাকার মতন শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে—তারপরেই শুনলুম ভেঁপুর আওয়াজ—ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্!

ট্যাক্সি, না বাস?

আহ্লাদে চাঙ্গা আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তারপরেই দেখা গেল, নিচে দুটো আর উপরে একটা আলো। তিনটে আলো দেখেই বুঝলুম ট্যাক্সি নয়, বাস আসছে। ……তাহলে জ্বরের ধমকে আমি ভুল বুঝেছিলুম, বাস যখন চলছে তখন রাত খুব বেশি হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য, এরি-মধ্যে এ-অঞ্চলটা এমন ভয়ানক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে? বাবা, আমার কলকাতার গোলমাল বেঁচে থাক, এ অঞ্চলে আবার ভদ্রলোক বাস করে?

কিন্তু বাসের আলো অত বেশি জ্বলছে কেন, সামনে সারা পথে সে যেন আগুনের ঢেউ বইয়ে ছুটে আসছে। আর এই নিরালা পথে অত ভেঁপু বাজাবারই বা দরকার কি, এ-অঞ্চলের সন্ধের-পরেই-ঘুমকাতুরে লোকগুলোর কানে যে তালা ধরে যাবে!

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ধুলোয় ধুলোয় পথ অন্ধকার করে একখানা রাঙা-টক্‌টকে মস্ত বড় বাস আমার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল,—"ধর্মতলা, ওয়েলেস্‌লি, শ্যামবাজার!"

আমি তাড়াতাড়ি বাসে উঠে একখানা গদীমোড়া আসনের উপর গিয়ে ধুপ্ করে বসে পড়লুম। হোক শ্যামবাজারের বাস, এই স্তব্ধ মড়ার মুল্লুক থেকে এখন তো সরে পড়ি, শ্যামবাজার থেকে বাগবাজার পায়ে হেঁটে যেতে এমন বিশেষ দেরি লাগবে না!

কিন্তু কেন জানি না, বাসের ভিতরে ঢুকেই আমার বোধ হল আমি যেন এক জগৎ ছেড়ে আর এক অচেনা জগতের ভিতরে প্রবেশ করলুম।

বাস ছুটছে, তার ভেঁপু বাজছে। এত বেগে বাস ছুটছে, তার জানালাগুলো সব খোলা রয়েছে, অথচ বাহির থেকে বাতাসের একটু-খানি ঝলক পর্যন্ত আমার গায়ে লাগছে না। ভারি অবাক হয়ে গেলুম। আমার জ্বর কি এত বেশি উঠেছে যে দেহের অনুভব করবার ক্ষমতাটুকুও আর নেই?

পথ তেমনি নির্জন আর নিঃসাড়। কিন্তু বাতাসও কি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে? আমার খালি মনে হতে লাগল, দমবন্ধ হয়ে সারা পৃথিবী আজ মারা পড়েছে—তার কোথাও আর জীবনের লক্ষণ নেই। বেঁচে আছি খালি আমি ও এই বাসের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর।

আমরা তিনজন ছাড়া বাসের ভিতরেও কোন আরোহী ছিল না। থাকবেই বা কেন? এত রাতে কার ঘাড়ে ভূত চাপবে যে বাসে চড়ে বেড়াতে বেরুবে।

বাসের ভেঁপু বাজছে আর বাজছে আর বাজছে। কান যে ঝালা-পালা হয়ে গেল। কণ্ডাক্টারের দিকে ফিরে বিরক্ত স্বরে বললুম, "ড্রাইভারকে বারণ করে দাও। পথে লোকও নেই,—তবু এত 'হর্ণ' বাজছে কেন?"

লোকটা শিখ। মস্ত-বড় লম্বা দেহ, মস্ত-বড় দাড়ি। সে কালা আর বোবার মতো আমার পানে তাকিয়ে রইল।

আবার বললুম, "শুনচ? 'হর্ণ' দিতে বারণ কর।"

সে তবু জবাব দিলে না, ড্রাইভারকে হর্ণ থামাতেও বললে না। লোকটা সত্যি-সত্যিই কালা ও বোবা নাকি? কিন্তু না, তাই বা হবে কি করে? এই খানিক আগেই তো সে "ধর্মতলা, ওয়েলেসলি, শ্যামবাজার" বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছিল।

সে বোধ হয় আমার কথার জবাব দিতে চায় না। এরা কি

ভেবেছে যে এদের ভেঁপুর আওয়াজে সারা শহরের ঘুম ভেঙে যাবে, আর তাহলেই সবাই বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে এসে বাসের প্যাসেঞ্জার হয়ে বসবে ?

কিন্তু শহর জাগবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করলে না। পথের আশেপাশে লেড়ি কুকুরগুলো আরাম করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু এই বাসের সাড়া পেয়েই তারা তাড়াতাড়ি উঠে, ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে পালাতে লাগল—মহা-ভয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে। আজকে বাইরের জীবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কেবল ঐ কুকুরগুলোর কাছ থেকে, কিন্তু তারাও দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছে।

কুকুরগুলো কেন আমাদের বাস দেখে পালাচ্ছে ? মনের ভিতর কেবল এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—কেন ? কেন ? কেন ?

কণ্ডাক্টার কেন আমার কথার জবাব দিচ্ছে না—কেন ? কেন ? কেন ?

ড্রাইভার কেন ক্রমাগত ভেঁপু বাজাচ্ছে ?—কেন ? কেন ? কেন ?

কণ্ডাক্টারের দিকে ফিরে বললুম, "তোমার ভাড়ার পয়সা নাও।"

সে মস্ত একখানা কালো হাত বাড়ালে। ভাড়া দিয়ে টিকিট নেবার সময়ে আমার হাতে তার হাতের ছোঁয়া লাগল—উঃ, অমনি মনে হলো কে যেন একখানা তীক্ষ্ণ বরফের ছুরি দিয়ে আমার হাতে খ্যাঁচ করে খোঁচা মারলে ! জ্যান্ত মানুষের হাত এমন ঠাণ্ডা-কনকনে হয় !

আশ্চর্য হয়ে তার মুখের পানে তাকালুম। তার লম্বা চুল আর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ভরা মুখখানা বাসি-মড়ার মতো স্থির। তার চোখেও পলক পড়ছে না। তার চোখ যেন পাথরে গড়া।

আমার বুকটা গুড়গুড় করতে লাগল। আজকের শহরের এই নির্জনতা, পৃথিবীর এই নিঃশব্দতা, বাতাসের এই অভাব, ভাড়াটে বাসের এই ভেঁপুর আওয়াজ, কণ্ডাক্টারের এই উদাসীন মূর্তি সমস্তই যেন রহস্যময়, সমস্তই যেন অস্বাভাবিক !

আশ্চর্য হয়ে তার মুখের পানে তাকালুম

কী কুক্ষণেই আজ বাড়ির বাইরে পা দিয়েছি!

যতবার ফিরে তাকাই, ততবারই কণ্ডাক্টারের সেই মড়ার মতো স্থির মুখ আর পলক-হারা পাথুরে দৃষ্টি চোখে পড়ে! কেমন একটা অমানুষিকভাবে আমার মনটা ছেয়ে গেল—আর সহ্য করতে পারলুম না—সামনের বেঞ্চের উপরে, দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে চোখ মুদে আমি চুপ করে বসে রইলুম। ভাবলুম, শ্যামবাজারে পৌঁছবার আগে আর মাথা তুলে চাইব না!

কিন্তু মাথা তুলতে হলো—আবার চোখ খুলতেও হলো।

আধ ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেছে, গাড়িও না থেমে ক্রমাগত ছুটছে, তবু এখনো শ্যামবাজার এল না কেন?

মুখ তুলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। শ্যামবাজার তো অনেক দূরের কথা, গাড়ি এখনো ভবানী-পুরেই আসে নি! অথচ গাড়ি এত বেগে ছুটছে, যে, পথের দু-পাশের বাড়িগুলো তীরের মতন পিছনে সরে সরে যাচ্ছে! এও কি সম্ভব?

হতভম্বের মতন মুখ ফিরিয়েই দেখি, গাড়ির ভিতরে দশ বারোজন

লোক বসে রয়েছে! নিজের চোখকেও আমি আর বিশ্বাস করতে পারলুম না!

আমি হলপ করে বলতে পারি, এতক্ষণের ভিতরে গাড়ি একবারও থামে নি, তবু কোত্থেকে এরা এল, কখন এরা গাড়িতে উঠল?

একে একে সকলকার মুখের পানেই তাকিয়ে দেখলুম, সব মুখই মড়ার মতন স্থির, নির্বিকার, সব চোখের পাথুরে দৃষ্টিই আড়ষ্ট হয়ে আছে! কে যেন শ্মশান থেকে কয়েকটা মৃতদেহ তুলে নিয়ে এসে বেঞ্চের উপরে সারি সারি বসিয়ে দিয়ে গেছে!

তাদের ভিতরে বাঙালী আছে, খোট্টা আছে, সাহেব আছে। কিন্তু তারা সবাই চেয়ে আছে আমার দিকেই। সে চাউনিতে কোন ভাবের আমেজ নেই, সে চাউনি যেন চাউনিই নয়—অথচ সে চাউনি দেখলেই গা ছমছম করে, দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তাদের চাউনি যেন চোখের ভিতর দিয়ে আসছে না—আসছে আলোকের ওপার থেকে, অন্ধকারের আত্মার ভিতর থেকে, যে দেশে জ্যান্ত মানুষ নেই, সেই দেশ থেকে! ভাবহীন অথচ ভয়ানক তাদের সেই চাউনি!

আর এক আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, গাড়ির ঝাঁকুনিতেও তাদের কারুর দেহ একটুও নড়ছে না! গাড়ির ভিতরে বসেও তাদের দেহ যেন গাড়িকে না ছুঁয়ে শূন্যে বিরাজ করছে! মনে হতে লাগল আমার অজ্ঞাতসারে যেমন হঠাৎ তারা গাড়ির ভিতরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তেমনি হঠাৎ তারা আবার হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে, আমার অজান্তেই। যেন তারা ছায়ার কায়াহীন অনুচর—দেখা দেয়, ধরা দেয় না। তাদের দেখা যায়, ধরা যায় না।

আমার সভয় দৃষ্টি আবার পথের দিকে ফিরিয়ে নিলুম। গাড়ি তেমনি হেঁচকি তোলা আওয়াজের মতন ভেঁপুর শব্দ করতে করতে তীর-বেগে ছুটছে—কিন্তু তখনো ভবানীপুর আসে নি! আমি শ্যামবাজার না সোজা যমালয়ের দিকে চলেছি?

কি এক দুঃসহ অজানা টানে অস্থির হয়ে চোখ আবার গাড়ির

ভিতরে ফেরালুম! গাড়িতে ইতিমধ্যে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে উঠেছে—তারাও স্থির নেত্রে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে!

সমস্ত গাড়ির ভিতরে একটা বোঁটকা গন্ধ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন বাসি-মড়ার গন্ধ। হাসপাতালের মড়ার ঘরে গিয়ে আমি একবার এই রকম গন্ধই পেয়েছিলুম!

আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিলে, বুকের কাছটা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।—আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

আর থাকতে না পেরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললুম, "এই কণ্ডাক্টার গাড়ি বাঁধো!"

কণ্ডাক্টার কোনো সাড়া দিলে না, গাড়ি থামাবারও চেষ্টা করলে না।

আবার বললুম, কিন্তু কোনো ফল হলো না।

রেগে দাঁড়িয়ে উঠে কণ্ডাক্টারের দেহ ধরে আমি নাড়া দিতে গেলুম—কিন্তু তাকে ছুঁতেও পারলুম না! চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট দেখতে পারছি, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারছি না, সে দেহ যেন হাওয়া দিয়ে তৈরি।

হঠাৎ গাড়ির সব লোক একসঙ্গে অট্টহাস্য শুরু করে দিলে! সে অদ্ভুত বীভৎস হাসি আসছে, যেন অনেকদূর থেকে, অনেক আকাশ-ভেদ করে, অনেক সমুদ্র-পাহাড়-প্রান্তর পার হয়ে, অনেক নরকের অন্ধকারে ডুব দিয়ে—অথচ তার আওয়াজ এত স্পষ্ট যে, আমার কান ফেটে যাবার মতো হলো!

আমি পাগলের মতন চিৎকার করে বললুম, "গাড়ি থামাও, জলদি গাড়ি থামাও—এই—ড্রাইভার!"—গাড়ি-থামানো-ঘণ্টার দড়ি ধরে আমি ঘন ঘন নাড়তে থাকলুম!

ড্রাইভার এতক্ষণ পরে আমার দিকে মুখ ফেরালে—সে মুখে এক তিলও মাংস নেই, সে মুখ সাদা-ধবধবে হাড়ের মুখ—নাক-চোখের জায়গায় তিন-তিনটে গর্ত, দু-ঠোঁটের জায়গায় দু-সারি দাঁত বেরিয়ে আছে।

এতক্ষণ তবে এই পোশাক-পরা কঙ্কালটাই গাড়ি চালিয়ে আসছে?

গাড়ির ভিতরে অট্টহাসির আওয়াজ আরো বেড়ে উঠল!

আর সইতে পারলুম না—সেই ভীষণ অট্টহাসি শুনতে শুনতে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

জ্ঞান হলে দেখলুম, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার চারপাশে বসে মা, বাবা, ভাই আর বোনেরা।

শুনলুম, আমি নাকি রসা রোডের ফুটপাতের উপরে জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে শুয়েছিলুম।

কালকের রাতের বিভীষিকার কথা সকলকে বললুম।

বাবা বললেন, "ও-সব বাজে কথা। জ্বরের ঝোঁকে লেকের ধার থেকে রসা রোড পর্যন্ত এসেই তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলে। তারপর ঐ-সব খেয়াল দেখেছ।"

কিন্তু আমার মন বলতে লাগল—না, না, আমি যা দেখেছি তা খেয়াল নয়, খেয়াল নয়!

কিসৃমৎ

ছোট ভাই সুরেশ শয্যাগত হয়ে পড়েছে! অসুখটা ব্লাড-প্রেসার। সুখেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছি। সে আমার বন্ধু ও বিখ্যাত ডাক্তার।

সুখেন্দুর দেখা পেলুম তার ডিসপেন্সারিতে। সে মন দিয়ে সুরেশের রোগের সব লক্ষণ শুনে বললে, "ভয়ের কারণ নেই। আজ ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছি, কাল সকালে নিজে গিয়ে দেখে আসব রোগী কেমন আছে।"

সে কাগজ-কলম নিয়ে ব্যবস্থাপত্র লেখবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে এক অদ্ভুত মূর্তি।

আগন্তুক নারী। কিন্তু এমন তার চেহারা, দেখলেই শিউরে উঠতে হয়। প্রথমেই নজরে পড়ে তার দেহের শীর্ণতা ও দীর্ঘতা। সে এতো রোগা যে তার হাড় কয়খানা কেবল চামড়া দিয়ে ঢাকা আছে বললেই হয়। আর অধিকাংশ পুরুষের চেয়ে সে মাথায় উঁচু। তার বয়সও

আন্দাজ করা সহজ নয়! ত্রিশও হতে পারে, পঞ্চাশও। পায়ে জুতো আছে বটে, কিন্তু তার বেশভূষা আধুনিক নারীর মতো নয়।

তারপরেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার ভয়াবহ গায়ের রঙ। তা হচ্ছে একেবারেই মৃতদেহের মতো—পাণ্ডুর এবং রক্তহীন। অন্তত দুইদিনের বাসি মড়ার দেহের রঙ হয় এমনিধারাই। আমি দুইদিনের বাসি মড়া কখনো দেখি নি। তবু কেন জানি না, এই কথাই মনে হলো।

সুখেন্দুরও মুখে-চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব।

নারী অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট স্বরে বললে, "আমি ডাক্তার এস. বসুর কাছে এসেছি।"

সুখেন্দু বললে, "আমারই ঐ নাম। বসুন। আপনার কি কোন অসুখ করেছে?"

নারী বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"অসুখ কি?"

—"তাই জানবার জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি!" স্বর ক্ষীণ হলেও তার মধ্যে পাওয়া গেল যেন ব্যঙ্গের আভাস!

সুখেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, "বেশ, আমার সঙ্গে আসুন।"

নারীও তার পিছনে পিছনে চলল এবং পাশের ঘরে প্রবেশ করবার আগে হঠাৎ আমার দিকে একটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে।

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল! আমি দেখলুম দুটো মাছের চোখ —সম্পূর্ণ ভাবহীন দুটো মরা মাছের চোখ!

খানিকক্ষণ পরে ডাক্তার ও রোগিণী দুজনেই পাশের ঘর থেকে ফিরে এল।

সুখেন্দু টেবিলের ধারে বসে কলম হাতে নিয়ে শুধোলে "আপনার নাম?"

—"আমোদিনী দেবী।"

ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে সুখেন্দু বললে, "দুটো ওষুধ লিখে দিলুম,

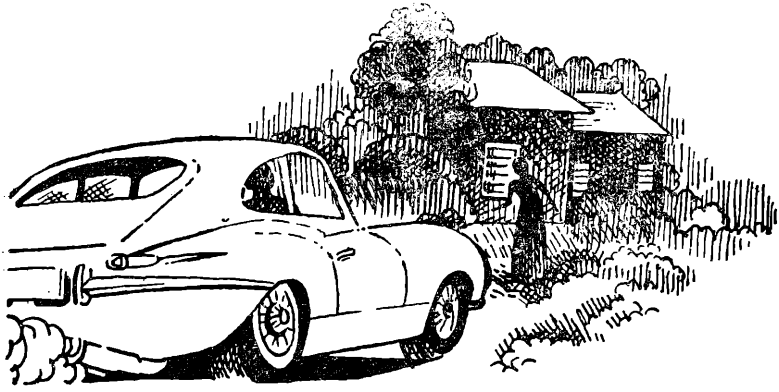

জানালার দিকে তাকিয়ে আছে একটা নারী মূর্তি

ব্যবহার করে কেমন থাকেন জানাবেন।”

দর্শনীর টাকা টেবিলের উপরে রেখে, ব্যবস্থাপত্র নিয়ে রোগিণী দরজার দিকে অগ্রসর হলো, কিন্তু বাইরে যাবার আগে আর একবার হঠাৎ ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে গেল।

আবার দেখলুম, সম্পূর্ণ সেই দুটো মরা মাছের মতো চোখ!

মনের অস্বস্তি মনেই চেপে সুখেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলুম, “ওর কি অসুখ হয়েছে?”

—“অ্যানিমিয়া, বিষম অ্যানিমিয়া। ও বেঁচে আছে কেমন করে বুঝতে পারলুম না।”

দুই

বাড়ির দিকে ফিরছি।

গাড়ির ভিতরে বসেই দেখতে পেলুম, রাস্তার ফুটপাথের উপরে দাঁড়িয়ে আমার বাড়ির বৈঠকখানার জানালার দিকে তাকিয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙা তার চেহারা।

গাড়ির শব্দে চমকে ফিরে চকিতে একবার চেয়ে দেখে মূর্তিটা হনহন করে চলে গেল। তাকে দূর থেকে চিনতে পারলুম না বটে, কিন্তু

কেন জানি না, আবার মনে পড়ল সুখেন্দুর ডিসপেন্সারির সেই অদ্ভুত রোগিণীর কথা।

আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, আমার বাড়ির বৈঠকখানার দিকে তাকিয়ে মূর্তিটা কি দেখবার চেষ্টা করছিল ?

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সেটা বুঝতে দেরি লাগল না।

বৈঠকখানার ভিতরে বাড়ির সব লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকলেই হায় হায় করছে। নিশ্চয়ই ঘটেছে একটা কোন অঘটন।

ভিড় সরিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে চিত হয়ে পড়ে আছে আমার ছোটভাই সুরেশের চৈতন্যহীন দেহ। তার দুই হাত বিস্ফারিত, আড়ষ্ট চক্ষু নিবদ্ধ হয়ে আছে রাস্তার ধারের জানালার দিকে এবং তার মধ্যে ফুটে আছে এক প্রচণ্ড আতঙ্কের ভাব।

কিন্তু কেন ? জানালার ভিতর দিয়ে পথের উপরে কি বা কাকে দেখে সুরেশ এতটা ভয় পেয়েছিল ?

তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডেকে আনা হলো। তিনি সব দেখে-শুনে বললেন, "আর কোন আশা নেই। রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে অত্যধিক রক্তের চাপে।"

তিন

মৃতদেহ নিয়ে এসেছি নিমতলার শ্মশান-ঘাটে।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে চিতার আগুন। বড় নিষ্ঠুর ঐ চিতা। মানুষ যাদের ভালোবাসে তাদেরই গ্রাস করা তার ধর্ম।

সংসারে আপন বলতে ছিল কেবল আমার এই ভাইটি। সেও আমাকে ফেলে চলে গেল। দুনিয়ায় আজ আমি একা।

চিতার কাছে উবু হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে এইসব কথা ভাবছি। আচম্বিতে মুখ তুলে আমার দুই চক্ষু হয়ে উঠল সচকিত।

খানিক তফাতে একদল কৌতূহলী লোকের মাঝখানে স্থিরভাবে

দাঁড়িয়ে আছে এক সুদীর্ঘ, কঙ্কালসার নারীমূর্তি। সেই রোগিণী! মরা মাছের মতো দুটো নিষ্পলক ড্যাবডেবে চোখে সে তাকিয়ে ছিল আমার দিকেই।

আমার সর্বাঙ্গের ভিতর দিয়ে খেলে গেল যেন উত্তপ্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ!

কিন্তু এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠেই দেখি, সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেই রহস্যময়ী নারীমূর্তি!

চার

কেটে গিয়েছে প্রায় এক বৎসর।

মানুষ একেবারে একলা থাকতে পারে না। একটি স্প্যানিয়েল কুকুর পুষেছি। সে আমার অষ্টপ্রহরের সঙ্গী—নাম তার রোভার। তাকে আমি ভালোবাসি, সে মানুষ হলেও তাকে আমি আরো বেশি ভালোবাসতে পারতুম না।

সেদিন বৈকালে গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়ে কার্জন পার্কের একখানা বেঞ্চির উপরে বসে বিশ্রাম করছিলুম!

রোভার আপন মনে খেলা করে বেড়াচ্ছিল ঘাস-জমির এখানে ওখানে। তারপর সে ছুটতে ছুটতে চলে গেল আমার পিছন দিককার একটা ঝোপের ওপাশে।

মিনিটখানেক পরেই সে ক্রুদ্ধস্বরে ঘেউ ঘেউ গর্জন করে উঠল এবং পরমুহূর্তেই শুনলুম তার আর্ত চিৎকার।

তাড়াতাড়ি উঠে ঝোপের ওধারে ছুটে গেলুম।

প্রথমটা রোভারকে দেখতে পেলুম না। তার বদলে দেখলুম, একটা নারীমূর্তি মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কি যেন লক্ষ্য করছে।

আমার পদশব্দে চমকে উঠে ফিরে দেখেই সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং হন্তদন্তের মতো দ্রুতপদে চলে গেল সেখান থেকে। কিন্তু দেখিবামাত্রই তাকে চিনলুম, সে সেই দীর্ঘ, কৃশ ও পাণ্ডু রোগিণী—দুই চোখ যার মরা মাছের মতো বিস্ফারিত ও ভাবহীন!

সে যেখানে হুমড়ি খেয়ে ছিল, সেখানে আড়ষ্ট হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রোভারের দেহ। দৌড়ে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বুঝলুম, সে আর বেঁচে নেই! আমার বলবান, স্বাস্থ্যবান ও সুবৃহৎ কুকুর, আচম্বিতে মারা পড়ল কেমন করে?

হঠাৎ খিল্ খিল্ করে শুকনো হাসি শুনেই মুখ তুলে দেখি, খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই বীভৎস রোগিণী! ক্ষীণ অথচ খন্‌খনে গলায় সে বলে উঠল—"আসব, আবার আমাদের দেখা হবে!"

নিদারুণ ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে মারমুখো হয়ে আমি বেগে ছুটে গেলুম তার দিকে।

কিন্তু তাকে ধরতে পারলুম না। আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে সে চলে গেল আমার নাগালের বাইরে এবং তারপর হারিয়ে গেল চৌরঙ্গীর সচল জনতারণ্যে।

পাঁচ

কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আজ তিন বৎসর ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভারতের দেশে দেশে। সেই শরীরী অমঙ্গল এখনো আমাকে দেখা দেয় নি।

কিন্তু আমার মন বলে—এখনো সে আছে আমার পিছনে পিছনে, শেষবারের মতো আবার তার চরম দেখা পাব যে-কোন দিন, যে-কোন মুহূর্তে!

সে কি আমার নিয়তি?

সে যেখানে হুমড়ি খেয়ে ছিল, সেখানে আড়ষ্ট হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রোভারের দেহ। দৌড়ে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বুঝলুম, সে আর বেঁচে নেই! আমার বলবান, স্বাস্থ্যবান ও সুবৃহৎ কুকুর, আচম্বিতে মারা পড়ল কেমন করে?

হঠাৎ খিল্ খিল্ করে শুকনো হাসি শুনেই মুখ তুলে দেখি, খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই বীভৎস রোগিণী! ক্ষীণ অথচ খন্‌খনে গলায় সে বলে উঠল—"আসব, আবার আমাদের দেখা হবে!"

নিদারুণ ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে মারমুখো হয়ে আমি বেগে ছুটে গেলুম তার দিকে।

কিন্তু তাকে ধরতে পারলুম না। আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে সে চলে গেল আমার নাগালের বাইরে এবং তারপর হারিয়ে গেল চৌরঙ্গীর সচল জনতারণ্যে।

পাঁচ

কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আজ তিন বৎসর ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভারতের দেশে দেশে। সেই শরীরী অমঙ্গল এখনো আমাকে দেখা দেয় নি।

কিন্তু আমার মন বলে—এখনো সে আছে আমার পিছনে পিছনে, শেষবারের মতো আবার তার চরম দেখা পাব যে-কোন দিন, যে-কোন মুহূর্তে!

সে কি আমার নিয়তি?

তিন নম্বরের ঘর

এক

বেড়াতে এসেছি। পুরী। আমি আর শচীন দুই বন্ধু।

সমুদ্রের গায়ে একটি হোটেল ছিল—"সাগর-পুরী।" শচীন আগে আর একবার এই হোটেলে এসে উঠেছিল। এবারেও সে আমাকে নিয়ে

সেইখানে গিয়ে হাজির হলো।

"সাগর-পুরীর"র ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, তাঁর হোটেলের কোন ঘরই খালি নেই।

শচীন বললে,—"মশাই, আমি আপনাদের পুরোনো খদ্দের। কিন্তু এখানে যখন ঠাঁই নেই, তখন আমাকে বাধ্য হয়েই অন্য হোটেলে যেতে হবে।"

ম্যানেজার বললেন,—"এবারকার পুজোর মরসুমে পুরীর কোন হোটেলেই তিলধারণের ঠাঁই নেই। যাবেন কোথায় ?"

শচীন হতাশ ভাবে বললে,—"তাহলে উপায় ?"

ম্যানেজার খানিক ভেবে বললেন—"আপনি যখন পুরোনো খদ্দের, তখন উপায় একটা করতে পারি। কিন্তু একটু কষ্ট হবে।"

শচীন বললে,—"হোক কষ্ট। এই বিদেশ-বিভূঁয়ে চেনা জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন সরছে না।"

ম্যানেজার বললেন,—"আমাদের রান্নাঘরের পাশে ছোট একখানা কুঠরী আছে। সেখানে থাকতে পারবেন ?"

শচীন বললে,—"খুব পারব।"

ম্যানেজার বললেন,—"তবে আসুন।"

একখানা কয়লা রাখবার কুঠরীর মতো খুব ছোট্ট ঘর। সমুদ্রের ধার, তবু সেখানে আলো-হাওয়া ঢোকে না। তার বদলে সর্বদাই সেখানে রান্নাঘরের নানারকম গন্ধ, ধোঁয়া আর উত্তাপ এসে ঢোকে।

বৈকাল হতে-না-হতেই শচীনের সহ্যশক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। মাথা নেড়ে বললে,—"উঁহু, এ অসম্ভব। আমরা কেউ ইট কি পাথর নই। এখানে থাকলে মারা পড়ব।"

আমি বললুম,—"তাহলে কোথায় যাবে ?"

শচীন বললে,—"যেখানে মানুষ থাকে। গেল-বারে এই হোটেলের সবচেয়ে ভালো ঘরে আমি ছিলুম। এবারেও সেই ঘরে থাকতে সাধ হচ্ছে।"

আমি বললুম,—"তোমার সাধ চাঁদ ধরবার সাধের মতো। এ-সাধ মিটবে না, কারণ সে ঘর এখন অন্য লোকের দখলে।"

শচীন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে,—"সেই তো হচ্ছে সমস্যা!"

তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা, উপর থেকে চা-পান করবার জন্যে ঘণ্টার আওয়াজ এলো।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—"চল, খানিকক্ষণ ভালো ঘরে গিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে আসি!"

দুই

খাবার ঘরের জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশে মেঘের পর মেঘ জমেছে।

চা-পান শেষ হবার আগেই সারা আকাশ মেঘের কাজলে এমন কালো হয়ে গেল যে, তার ছায়ায় সমুদ্রের গায়ে নীলরঙের একটুও চিহ্ন রইল না। চারিদিকে অকাল-সন্ধ্যা নেমে এলো, তারপরেই বাজের বাজনা আর বিজলীর রোশনাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি শুরু।

টেবিলের ধারে বসে যাঁরা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন, একে একে তাঁদের অনেকেই অদৃশ্য হলেন। আমরা দুজন ছাড়া আরো যে-তিনজন লোক তখনো স্থান ত্যাগ করলেন না, তাঁদের একজন হচ্ছেন কলকাতার কোন সওদাগরী অফিসের মাঝবয়সী বড়বাবু, আর একজন হচ্ছেন কলকাতার কোন স্কুলের বুড়ো মাস্টারমশাই এবং আর একজন হচ্ছেন কলকাতার কোন কলেজের নব্য ছাত্র।

জল-ঝরা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম,—"এমনি বাদলার দিনে ভূতের গল্প বেশ জমে।"

নব্য ছাত্রটি নাক সিঁটকে বললেন,—"আমি ভূত মানি না।"

মাঝবয়সী বড়বাবু বললেন,—"আমি ভূত মানি। ভূতকে ভয় করি। আমার বুকের ব্যামো আছে,—ভূতের গল্প শুনলে বুক ঢিব্ ঢিব্ করে।"

বুড়ো মাস্টারমশাই বললেন,—"আমি ভূতের গল্প শুনতে খুব

ভালোবাসি। কিন্তু সত্যি ভূতের গল্প।”

শচীন এতক্ষণ কি-যেন ভাবতে ভাবতে অপলক চোখে বড়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। এখন হঠাৎ—মুখ খুলে বললে,—“আমি একটা খুব সত্যি ভূতের গল্প বলতে পারি। এ-ভূতটাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু উনি যে ভূতকে ভয় করেন—তার ওপরে ওঁর নাকি আবার বুকের ব্যামো!”

বড়বাবু বুকে হাত দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, অনেক দিনের ব্যামো। সত্যি ভূতের গল্প শুনলে হয়তো ভিরমি যাব।”

নব্য ছাত্রটি বাঁকা চোখে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—“আমি ভূত মানি না,—কিন্তু সময় কাটাবার জন্যে ভূতের গল্প শুনতে রাজি আছি।”

মাস্টারমশাই বললেন,—“ভোটে গল্প শোনার লোকই বেশি হলো। আপনার সত্যি ভূতের গল্পটি বলুন।”

চাকর ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। বড়বাবু হতাশ চোখে একবার সকলের মুখের পানে তাকিয়ে, চেয়ার টেনে একেবারে আলোর কাছে সরে গিয়ে বসলেন।

শচীন গল্প বলতে লাগল! আকাশও তখন মেঘ-বিদ্যুৎ-বৃষ্টির গল্প ভালো করে জমিয়ে তুলেছে!

তিন

“গল্পের নায়ক হচ্চি আমি। কিন্তু গল্পের ঘটনাস্থলের নাম আমি বলব না। সত্যি ভূতের গল্পে ঘটনাস্থলের নাম বলতে নেই। তবে একটা কথা শুনে রাখুন, এই গল্পের ভূতটিকে দেখেছিলুম এই হোটেলেরই মতন আর একটা হোটেলে।”

বড়বাবু চমকে উঠে বললেন, “তাই নাকি?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ। সেবারেও আমি পুজোর সময় বেড়াতে বেরিয়ে সেই হোটেলে গিয়ে উঠেছিলুম। আমি যে ঘরখানি পেলুম সে-খানি

বেশ বড়-সড়। তার পাঁচটা জানলা আর দুটো দরজা। ঘরখানি হোটেলের দোতলায়, আর ঠিক সিঁড়ির ডান পাশে।"

বড়বাবু বিড়্ বিড়্ করে বললেন,—"হোটেলের দোতলায়, সিঁড়ির ডান পাশের ঘর—"

—"হ্যাঁ। ঘরের ভিতরকার বর্ণনাও একটু দিতে হবে—সত্যি গল্প কিনা! দক্ষিণদিকে ছিল একখানা লোহার খাট। আর একদিকে দুটো দেয়াল-আলমারি। আর একদিকে ছিল চৌকো আয়না-বসানো একটা 'ড্রেসিং-টেবিল'। তার সামনে একখানা কাঠের চেয়ার। সে ঘরে একখানা ইজি-চেয়ারও ছিল। একটা দরজার মাথায় কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি ছাড়া আর কোথাও কোন ছবি ছিল না।"

মাস্টারমশাই অধীরভাবে বললেন,—"ভূত কোথায় মশাই, ভূত কোথায়? এত ঘরের বর্ণনা কেন?"

—"যদিও ঘটনাস্থলের নাম বললুম না, তবু ঘরের বর্ণনাটা শুনে রাখুন। বিদেশের কোন হোটেলে এ রকম ঘর দেখলে আগে থাকতেই সাবধান হতে পারবেন।.....এখন শুনুন। সে ঘরখানার ভিতরে দিনের বেলাটা আমার দিব্যি আরামে কেটে গেল। কিন্তু ঘরের ভেতরে সন্ধ্যার অন্ধকার যেই নেমে এলো,—অমনি কেন জানি না, আমার মনটা কেমন ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করতে লাগল! সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা অজানা ভয় পা টিপে টিপে সেই ঘরের ভেতরে এসে ঢুকে পড়ল। যেন অদৃশ্য একটা বিভীষিকা ছায়ার মতন আমার পিছনে ফিরতে লাগল। যেন দেখা যাচ্ছে না এমন দুটো স্থির আড়ষ্ট চোখ ড্যাব্‌ড্যাব্ করে আমার পানে তাকিয়ে রইল তো তাকিয়েই রইল!

আমি ভীতুলোক নই, তবু কিছুতেই মন থেকে এই ভয়-ভয় ভাবটা তাড়াতে পারলুম না। মনকে প্রবোধ দিলুম, অন্যমনস্ক হবার জন্যে বার-বার চেঁচিয়ে গান গাইতে লাগলুম, কিন্তু মন আমার শান্ত হলো না। তখন তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ে এই অজ্ঞাত ভয়টাকে ভোলবার চেষ্টা করলুম।

ঘুম আমাকে সব ভুলিয়ে দিল বটে—কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। গভীর অন্ধকারের ভিতরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল! জেগে উঠেই বুঝলুম, আমার ঘুম স্বাভাবিক ভাবে ভাঙে নি। ঘরের ভিতরে একটা কিছু বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে—এই কথাটাই তখনি আমার মনে হলো!

শচীন এইখানে থামল। বাইরে তখন অবিরাম চলেছে বজ্রের হুঙ্কার, সমুদ্রের গর্জন, বৃষ্টিধারার কান্না ও ঝোড়ো হাওয়ার হাহাকার। দম্‌কা বাতাস মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরেও এসে ঠাণ্ডা জলের ছিটে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে!

মাস্টারমশাই রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন—"ওকি মশাই, এমন জায়গায় এসে থামলেন কেন?"

বড়বাবু দুই চোখ মুদে বললেন,—"আমার বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে!"

ছাত্রটি বললেন—"আমি ভূত মানি না।"

শচীন আবার আরম্ভ করলে,—"কোথাও একটি পাতা নড়ার শব্দও নেই এবং রাত করছে ঝাঁ ঝাঁ! আগেই বলেছি, আমার ঘুম ভাঙল গভীর অন্ধকারের ভিতরে। কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন কিনা জানি না, সে অন্ধকার কালো অন্ধকার নয়, সে যেন আলোময় অন্ধকার। কারণ বাতি জ্বলছিল না, খোলা জানালা দিয়ে একটুও চাঁদের কিরণ আসছিল না, তবু অন্ধকারের ভিতরেই বায়োস্কোপের ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঘরের সেই 'ড্রেসিং-টেবিল'টা! স্তম্ভিতভাবে দেখলুম, টেবিলের আয়নার সামনে, আমার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারের উপরে বসে আছে একজন লোক! আয়নার ভিতরে তার মুখও আমি দেখতে পেলুম—সম্পূর্ণ অচেনা মুখ! তার নাকের তলায় দুর্গাঠাকুরের অসুরের মতন মস্ত বড় গোঁফ আর তার ভয়ঙ্কর দুটো চোখ যেন জ্বলন্ত ভাটার মতো! তার ডান হাতে একখানা চক্‌চকে খুর,—আর সেই খুর দিয়ে নিজের গলা সে নিজেই কাটছে! হঠাৎ ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক দৃশ্যটা আবার মিলিয়ে গেল! ঘর আবার

সেই খুর দিয়ে নিজের গলা সে নিজেই কাটছে

অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে ড্রেসিং টেবিলের দিক থেকে আমার বিছানার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে! আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না, একলাফে বিছানা ছেড়ে নেমে, কোনরকমে দরজা খুলে ঘরের বাইরে পালিয়ে গেলুম!

পরের দিন সকালে খোঁজখবর নিয়ে জানলুম, "সেই হোটেলের তিননম্বরের ঘরে একজন লোক আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার আমার কাছে কোনমতেই সে কথা স্বীকার করলে না!"

বড়বাবু হঠাৎ চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চিঁ চিঁ করে বললেন,—"আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। এই রে, আমি ভিরমি যাব।"

মাস্টারমশাই আর নব্য ছাত্রটি ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—"দেখচি ওঁর সামনে ভূতের গল্প বলা আমার উচিত হয় নি।"

রাত তখন সাড়ে নয়টা। আমি আর শচীন আমাদের অন্ধকূপে বসে আছি, এমন সময় হোটেলের একটা চাকর এসে আমার হাতে একটুকরো কাগজ দিয়ে বললে,—"ম্যানেজারবাবু দিলেন।"

কাগজে ম্যানেজারবাবু লিখেছেন :

"হোটেলের তিন নম্বরের ঘর হঠাৎ খালি হয়েছে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিন নম্বরের ঘরে উঠে আসতে পারেন।"

শচীন দুষ্টুমির হাসি হাসতে হাসতে বললে,—"এ আমি আগেই জানতুম!"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কেমন করে?"

শচীন বললে,—"হোটেলের দোতলায়, সিঁড়ির ডানপাশের ঐ তিন নম্বরের চমৎকার ঘরখানিতে আমি গেলবারে এসে থেকে গিয়েছি। আজ দুপুরেও ও-ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসেছি, ও-ঘরের আসবাব-গুলো ঠিক আগেকার মতোই সাজানো আছে। ঐ ঘরেই বড়বাবু ছিলেন।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে, তুমি একটি আস্ত গাড়ল! এতক্ষণেও এটা বুঝলে না যে, বড়বাবুকে তাড়াবার জন্যেই আমার ভূতের গল্পে তিন নম্বরের ঘরের বর্ণনা স্থান পেয়েছে?"

—"তাহলে তোমার সত্যি ভূতের গল্পটা—"

—"একেবারে গাঁজাখুরি।"

দিঘির মাঠে বাংলো

॥ এক ॥

মাসিক পত্রে কবিতা লিখি বলে বন্ধুমহলে নাম হয়েছিল, কবি।

আমার কবিতায় যে কবিত্ব নেই, সে কথা আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না।

কবিত্ব থাকে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে। এই হিসাবে প্রত্যেক মানুষই কবি। কিন্তু ভাষায় সেই কবিত্বকে প্রকাশ করতে পারে খুব অল্প লোকই এবং আমি ওই অল্পসংখ্যকদের কেউ নই। যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবু আমি কবিতা লিখি কেন, তবে উত্তরে বলব, ওটা আমার মুদ্রাদোষ।

সম্প্রতি বাল্যবন্ধু সতীশের পত্র পেয়েছি। সতীশ গিয়েছিল পুজোর সময়ে বায়ুপরিবর্তনে। পশ্চিমের এক দেশ থেকে লিখেছে:

'কবি,

আমি যেখানে বাসা বেঁধেছি তার আশে-পাশে অজস্র কবিত্বের বাহার। এখানে উপর-পানে তাকালে ঝুলে-ভরা কড়িকাঠের বদলে দেখা যায় নীলার-রং-মাখানো অসীম আকাশ, পদব্রজে বেড়াতে বেরুলে নরহত্যাকারী মোটর ও ট্রামের বদলে চোখে পড়ে কেবল বনফুলে রঙিন পাহাড় ও নদীর হার-দোলানো স্নিগ্ধসবুজ খেতের পরে খেত এবং কান পেতে শুনলে হেটো লোকের হট্টগোল আর পাওনাদারের সচিৎকার তাগাদার বদলে শোনা যায় শুধু মুক্তবিহঙ্গের আর গিরি-নির্ঝরিণীর মতো সংগীত। অতএব বাঁধো তোমার মোটমাট, কেনো একখানা ইন্টার ক্লাসের টিকিট এবং চলে এসো আমার ঠিকানায়। তোমার উদরে অন্ন জোগান দেবার ভার গ্রহণ করব আমি।'

বলাবাহুল্য সতীশের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দেরি করলুম না।

॥ দুই ॥

সতীশের বাসায় পৌঁছে দেখলুম, অত্যুক্তি করেনি। যা আমার কবিতায় প্রকাশ পায় না, সেই কবিত্বই এখানে সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে-বাতাসে, বনে-বনে, নদীর লহরে, প্রজাপতির পাখনায়, মৌমাছির গানে। নিজেকে কী নিঃস্বই মনে হল! একরত্তি একটি ঘাসের দুলদুলে ফুল, বাতাসের দীর্ঘশ্বাসও সইতে পারে না, কিন্তু তারই তিল-পরিমাণ পাপড়িতে যে অনন্ত ছন্দ ও কবিত্বের ইঙ্গিত, আমার শত শত বড়ো বড়ো কবিতাও তার কাছে নগণ্য! এখানে আমার কবিতার পাশ ফিরে শোবারও ঠাঁই নেই!

সতীশ বললে, 'কবি, এখানে খালি কবিত্ব নয়, তারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস পাওয়া যায়।'

আমি বললুম, 'কবিত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস স্বর্গেও নেই।'

—'স্বর্গে—অন্তত হিন্দুদের স্বর্গে—না থাকতে পারে কিন্তু মর্ত্যে আছে। টাকায় দুই গন্ডা রামপাখি কিংবা বিশ গন্ডা তস্য ডিম্ব! 'এমন দেশটি কোথায় গেলে পাবে খুঁজে তুমি'?'

চমৎকৃত হয়ে বললুম, 'তাহলে প্রাণপণে আমি প্রতিজ্ঞা করছি সতীশ, এ দেশকেই আমার স্বদেশ বলে মনে করব।'

সতীশ চোখ পাকিয়ে বললে, 'কবি, তুমি মিরজাফরেরও চেয়ে নিম্নশ্রেণির লোক!'

—'কেন?'

—'মিরজাফর স্বদেশ ভুলেছিলেন সিংহাসনের আর বিপুল ঐশ্বর্যের লোভে। আর তুমি এমনি পামর যে তুচ্ছ ফাউলের লোভে স্বদেশকেও ভুলতে চাও?'

—'ভুল সতীশ, ভুল! ফাউল তুচ্ছ নয়, আর ফাউল হচ্ছে আমার স্বদেশেরই একটি বড়ো সম্পদ। 'এনসাইক্লোপিডিয়া' খুলে দ্যাখো: ফাউল বিদেশি নয়, তার প্রথম জন্ম ভারতবর্ষেই। অতএব ফাউলের স্বদেশ হচ্ছে আমাদেরও স্বদেশ। ইউরোপের রসনা সেদিনও পর্যন্ত ফাউলের আস্বাদ জানত না, কিন্তু তার উপরে আমাদের জন্মগত অধিকার। ইউরোপ যখন শ্রীরামপক্ষীর স্বপ্নও দেখেনি, ভারতের বিরাট আকাশ আচ্ছন্ন করে উড়ত তখন ফাউলের পর ফাউল—কোটি কোটি নরম নধর রংচঙে ফাউল। এদেশে এত ফাউল থাকতে লক্ষ্মীদেবী 'আউল'-বাহিনী হলেন কেন, মাঝে মাঝে তাই ভেবে আমি অবাক হই, কেন না লক্ষ্মীমন্ত না হলে নিত্য কেউ ফাউলকারি খেতে পারে না। মা লক্ষ্মীর সঙ্গে ফাউলের সম্পর্ক বড়োই ঘনিষ্ঠ!'

সতীশ বললে, 'তোমার গভীর গবেষণার উপরে আর কথা চলে না। আজ তাহলে ফাউলের চপ, কাটলেট আর কারিই তোমার বরাদ্দ রইল।'

সেদিন সন্ধ্যার চাঁদ আসন্ন কোজাগরি পূর্ণিমার আনন্দে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তার রূপ দেখে মন আর বাসায় ফিরতে চাইলে না, পাহাড়ের একখানি পাথরের উপরে একলাটি বসে বসে দেখতে লাগলুম, ঝরনায় ঝরছে হিরের ধারা, আর শালবনে কালোর ফাঁকে ফুটছে আলোর চিত্রমালা!

এ সময়ে প্রত্যেক মানুষই মনে মনে কবিতা রচনা করে,—এমনকি শিশুরা পর্যন্ত। আমারও মন তখন যে-কাব্যকথা উচ্চারণ করছিল, অক্ষম ভাষায় তার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করব না।

কিন্তু আচম্বিতে শরতের এক বেরসিক মেঘ কোথা থেকে ছুটে এসে চাঁদের উপরে করলে যবনিকাপাত। শরতের মেঘ বটে, কিন্তু অভাবিতরূপে ঘন। চাঁদ-তারার আলোকিত নাট্যশালা একেবারে অন্ধকার!

এমন আকস্মিক দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। ভাগ্যে সঙ্গে 'ইলেকট্রিক টর্চ'টা ছিল, তাই কোনওরকমে পাহাড় থেকে নেমে বাসার পথ ধরতে পারলুম।

পৃথিবীর সৌন্দর্য আলোকের উপরে কতটা নির্ভর করে, তাই ভাবতে ভাবতে পথ চলছি, হঠাৎ বইল ঠান্ডা জোলো হাওয়া, এবং তার সঙ্গে-সঙ্গেই জাগল বজ্র-বিদ্যুতের সমারোহ! আরও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলুম বটে, কিন্তু পৃথিবীকে অনর্থক জ্বালাতন

করবে বলেই আজ যে অকালবাদলের আগমন হয়েছে, তাকে বোধহয় আর ফাঁকি দিতে পারব না!

'টর্চে'র আলোতে পথের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল, আমাদের বাসার অনতিদূরেই এসে পড়েছি। আমার ডান পাশেই রয়েছে একটা ছোটো মাঠ, স্থানীয় লোকেরা তাকে 'দিঘির মাঠ' বলে ডাকে।

বৃষ্টি শুরু হল—প্রথমে বড়ো বড়ো দু-চার ফোঁটা। অনুভবে ফোঁটার আকার বুঝেই আন্দাজ করলুম বৃষ্টি খুব জোরেই আসবে।

অসময়ে স্নান করে দেহ আর জুতো-জামা-কাপড় ভেজাবার সাধ হল না। আশ্রয়ের জন্যে অসহায় ভাবে এদিক-ওদিকে তাকিয়ে দেখছি, হঠাৎ চোখে পড়ল দিঘির মাঠের নিবিড় অন্ধকারের বুক ছ্যাঁদা করে ফুটে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল অনেক জানলা-দরজা।

বৃষ্টির তোড় বেড়ে উঠল, আমিও বেগে ছুটলুম সেই আলো লক্ষ্য করে।

॥ তিন ॥

ছোটো বাঁশঝাড়ের পাশে ছোটো একখানি বাগান, তার মাঝখানে ছোটো একখানি বাংলো। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু লোকের দেখা বা সাড়া নেই।

চার-পাঁচটি ধাপ পেরিয়ে বারান্দা বা দালানের তলায় গিয়ে যখন দাঁড়ালুম তখন বৃষ্টির মুষলধারায় পৃথিবী হয়ে উঠেছে শব্দময়।

দালানের মাঝখানে এবং দুই দিকেই রয়েছে একটা একটা করে তিনটে দরজা। সব দরজাতেই পর্দা ঝুলছে।

একদিক থেকে মিহি নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'কে ওখানে?'

গলার আওয়াজটা যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললুম, 'আজ্ঞে, ভেজবার ভয়ে এখানে এসে একটু দাঁড়িয়েছি।'

নারীকণ্ঠ বললে, 'বেশ করেছেন। কিন্তু বাইরে কেন, ভিতরে এসে বসতে পারেন।'

বুঝলুম, এমন কোনও শিক্ষিতা আধুনিক মহিলা কথা কইছেন, পর্দার আড়ালে থেকেও যিনি পর্দাপ্রথার ধার ধারেন না। অতএব অসংকোচে পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলুম।

ছোটো ঘর। মেঝের উপরে খুব পুরানো কার্পেট পাতা। মাঝখানে রয়েছে মার্বেলের সেকেলে একটা গোল টেবিল, তার উপরে রয়েছে একটা সেকেলে বড়ো ল্যাম্প এবং টেবিলের চারপাশে রয়েছে খানকয় ভারী ভারী সেকেলে চেয়ার। একটু তফাতে একখানা ইজিচেয়ারের উপরে অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন একটি মহিলা,—তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্য প্রথম দৃষ্টিতেই মনকে বিস্মিত করে দেয়। মহিলার কোলের উপরে পড়ে আছে একখানি খোলা বই, বোধহয় এতক্ষণ তিনি বই পড়ছিলেন।

হঠাৎ গর্জন-শব্দ শুনে চমকে চেয়ে দেখি, ইজিচেয়ারের পিছন থেকে একটা কালো

কুকুরের মস্ত মুখ উঁকি মারছে! তার চোখদুটো আগুন-ভরা! ত্রস্তপদে আমি আবার পিছিয়ে পড়লুম। ভেড়া ছাড়া আর কোনও চতুষ্পদ জীবকে আমি বিশ্বাস করি না।

মহিলা ধমক দিয়ে বললেন, 'টাইগার! চুপ।' কুকুরের মুখখানা আবার চেয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতি মিষ্ট হাসি হেসে তিনি আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'ও কী, ভয় পাচ্ছেন কেন? একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসুন না, টাইগার আপনাকে আর কিছু বলবে না!'

চেয়ারের উপরে বসে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটিও আর-একবার বিশেষ ভাবে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন আমার অস্তিত্ব একেবারে ভুলে গেলেন, বইখানা মুখের সামনে তুলে ধরে আবার পড়তে শুরু করে দিলেন!

তিনি যখন আমাকে লক্ষ করছিলেন আমিও তখন লক্ষ করেছিলুম, তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক উগ্রভাবে ভরা! তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হলে, মনে কেমন একটা অস্বস্তি ছটফট করতে থাকে।

বাইরের ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ তমিস্রার ভিতর থেকে ভেসে আসছে বৃষ্টিধারার প্রচণ্ড ঐকতান। তাই শুনতে শুনতে আরও লক্ষ করলুম, মহিলাটি অপূর্বসুন্দরী ও যুবতী বটে এবং তাঁর মুখে-চোখেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ আছে বটে, কিন্তু তাঁর সাজপোশাক একেবারেই আধুনিক নয়। প্রাচীন তৈলচিত্রে সেকালকার ইংরেজি-শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাদের যে-রকম সাজপোশাক দেখা যায়, এঁরও পরনে অবিকল সেইরকম জামাকাপড়!

ঘরের প্রত্যেক ছবি ও তার গিল্টি করা ফ্রেমগুলোও সেকেলে! ওই যে মস্ত ঘড়িটা টক টক শব্দে সময়ের গতি নির্দেশ করছে, তারও জন্ম নিশ্চয় আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে! এই গৃহের মধ্যে গত যুগ যেন বন্দি ও অচল হয়ে আছে।

মহিলার হাতের বইখানার দিকে আমার নজর পড়ল। মলাটের উপরে লেখা রয়েছে 'দুর্গেশনন্দিনী।'

আর কৌতূহল দমন করতে পারলুম না, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এতদিন পরে আপনি 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ছেন?'

মহিলা বইখানি নামিয়ে অল্পক্ষণ স্থির-চোখে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এতদিন পরে বলছেন কেন? আমি তো শুনেছি বইখানি সবে বাজারে বেরিয়েছে!'

সবে বাজারে বেরিয়েছে! তবে কি কোনও অপোগণ্ড লেখক 'দুর্গেশনন্দিনী' নামে নতুন একখানা বই লিখেছে? বাঙালি লিখিয়েদের এ নষ্টামি হচ্ছে চিরকেলে। পুরানো নাটক-উপন্যাসের নামেই তাঁরা নতুন বইয়ের নাম রাখেন। তাঁদের বিশ্বাস বোধহয়, পুরানো নামের খাতিরেই লোক নতুন বই না কিনে পারবে না।

আবার শুধলুম, 'ওখানি কি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' নয়?'

মহিলাটি বললেন, 'হ্যাঁ, এখানি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোকেরই লেখা। নতুন লেখক। নাম আগে কখনও শুনিনি।'

মহিলাটি বেশ গম্ভীর মুখে পরিহাস করতে পারেন দেখে, আমি মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠলুম।

আমাকে হাসতে দেখে মহিলাটির মুখে বিরক্তিমাখা বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। এমন সময়ে ঘড়িতে টং টং করে দশটা বাজল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠে পড়ে বললেন, 'মাপ করবেন, বাড়ির ভিতরে আমার একটু কাজ আছে। যতক্ষণ বৃষ্টি না ধরে, আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি একটু পরেই আসছি। আয়, টাইগার!' তিনি ভিতরের এক দরজা দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং টাইগারও আবার চেয়ারের পিছন থেকে বেরিয়ে অগ্নিময় দৃষ্টিতে আর-একবার আমার দিকে তাকিয়ে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনিবের অনুসরণ করলে। পাশের ঘরের আলো দপ করে নিবে গেল।

বৃষ্টির শব্দ তখন কমে এসেছে—আকাশেও স্থানে স্থানে মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্নার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এ-ঘরের আলোও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে পড়ছে—নিশ্চয়ই ল্যাম্পে তৈলের অভাব! হঠাৎ দরজা দিয়ে আমার দৃষ্টি গেল পাশের ঘরে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দপ দপ করে জ্বলছে দুটো ক্ষুধার্ত বন্য চক্ষু! আমার বুক শিউরে উঠল! টাইগার কি আমাকে একলা পেয়ে ভালো করে আদর করতে আসছে? কিন্তু তারপরেই সন্দেহ হল, ও চোখ দুটো বোধহয় টাইগারের নয়! কারণ চোখ দুটো জ্বলছে মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচুতে। টাইগারের চোখ অত উঁচুতে উঠবে কী করে? তারপরেই মনে হল, হয়তো আমাকে ভালো করে দেখবার জন্যেই, টাইগার ওই অন্ধকার ঘরের কোনও টেবিলের উপরে লাফিয়ে উঠে পড়েছে।

আমিও উঠে পড়ে এক লাফে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। এখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, পড়ুক গে! টাইগারের চেয়ে বৃষ্টি ঢের বেশি নিরাপদ!

কিন্তু বাংলোর বাইরে এসেই মনে পড়ল,—ওই যাঃ, তাড়াতাড়িতে ভুলে ইলেকট্রিক টর্চটা টেবিলের উপরে ফেলে এসেছি। তখনই আবার ফিরে দাঁড়ালুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, সেই আলোকোজ্জ্বল বাংলো হঠাৎ নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে ডুব দিয়েছে! এবং সেখানে কেবল ধক ধক করছে ভয়ানক দুটো চলন্ত ও জ্বলন্ত চক্ষু। তারপরেই শুনলুম, অতিশয় খনখনে গলায় খিল খিল করে কে হেসে উঠে, সেই ভিজে রাতের স্তব্ধতাকে করে তুললে সচকিত।

টর্চের কথা ভুলে গিয়ে বাসার উদ্দেশে দিলুম দৌড়। এবং দৌড়তে-দৌড়তেই ভাবতে লাগলুম, বাংলোর সমস্ত আলো হঠাৎ এক সঙ্গে নিবে গেল কেন? ওই জ্বলন্ত চোখদুটো কার? অমন করে হাসলে কে? আর কেনই বা হাসলে? আমার পালানো দেখে?

॥ চার ॥

ঊর্ধ্বশ্বাসে একেবারে বাসায়। আমার চেহারা দেখেই সতীশ বলে উঠল, 'এ কী কবি, এ কী মূর্তি!'

আমি কাদামাখা জুতোজোড়া খুলতে খুলতে বললুম, 'আস্ত মূর্তিটাকে যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, সেজন্যে ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দিই।'

—'কেন হে, কেন?'

ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'বৃষ্টির ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎসিংহ মাঠের ভাঙা মন্দিরে ঢুকে পেয়ে ছিলেন দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে। বৃষ্টির ভয়ে আমিও দিঘির মাঠের বাংলোয় ঢুকে পেয়েছি নব্যযুগের অসীম এক সুন্দরীকে—হাতে তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', মুখে তাঁর সকৌতুক প্রলাপ। আলাপ বেশ জমে উঠেছিল, কিন্তু আমার ভাগ্যে ওসমানের ভূমিকায় অভিনয় করতে এল, এক বিপুলবপু সারমেয়-অবতার। ওসমান তরবারি ব্যবহার করত, কিন্তু এ ব্যবহার করে খালি বড়ো বড়ো দাঁত। কাজেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ না করে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছি।'

সতীশ সবিস্ময়ে বললে, 'এর মধ্যে যে দস্তুরমতো রোমান্সের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে হে!'

—'রোমান্স নয় ভাই, মিস-অ্যাডভেঞ্চার! বিউটি অ্যান্ড বিস্টের আর একটা নতুন নমুনা। রূপে মুগ্ধ হলুম, আর টাইগারের দাঁত দেখে পালিয়ে এলুম।'

সতীশ সাগ্রহে বললে, 'কবি, তোমরাই হচ্ছ ভাগ্যবান জীব। এখানে এসেই রোমান্স আবিষ্কার করলে! ব্যাপারটা খুলে বর্ণনা করো দেখি।'

একে একে সব কথা বললুম। সব শুনে সতীশ প্রায় হতভম্বের মতন বললে, 'দিঘির মাঠের ধার দিয়ে এতবার আনাগোনা করেছি, কিন্তু ওখানে যে এমনধারা এক চিত্তাকর্ষক রহস্যময় বাংলো আছে, কোনওদিন তো আমি লক্ষ করিনি! একেই বলে কবির দৃষ্টি! বন্ধু, কাল সকালেই তোমার ওই জ্যান্ত আবিষ্কারটিকে স্বচক্ষে দর্শন করতে যাব। তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তো?'

বললুম, 'কিন্তু কাল সকালে তো আর বৃষ্টি পড়বে না! কী অছিলায় আবার সেখানে মুখ দেখাতে যাব? টাইগারকে একটু আদর করব বলে?'

সতীশ বললে, 'দূর ওসব নয়, তুমি বলবে গিয়ে, তোমার 'টর্চটা' নিয়ে যেতে এসেছ।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, এ ওজর অকাট্য বটে! কিন্তু এখন ওসব বাজে কথা রাখো, উদর-দেবতার পুজোর দরকার। এইবারে থালা-বাটি ভরে তোমার বহু-বিজ্ঞাপিত ফাউলের নৈবেদ্য নিয়ে এসো, এই আমি আসনে বসে ধ্যানস্থ হলুম।'

সকালে উঠে সতীশের সঙ্গে দিঘির মাঠে গিয়ে অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেলুম।

কোথায় সেই বাংলো? মাঠময় ঝোপঝাপ, দু-চারটে ছোটো-বড়ো গাছ, সেখানে বাড়িঘর কিছুই নেই। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে দেখলুম খালি পানায় সবুজ দিঘির ধারে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে গোটাকয় বক, আর একটা গাছের ডালে স্থির হয়ে বসে আসে তিনটে শকুন।

সতীশ বললে, 'কবি, আমি জানি, দিঘির মাঠে বাংলো-টাংলো কিচ্ছু নেই। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তোমাকে বলতে পারি—'পথিক, তুমি পথ ভুলেছ।'

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'না, তা বলতে পারো না! পাহাড়ের ঝরনাতলা থেকে বাসায় ফিরতে গেলে, এই মেঠো পথ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। 'টর্চে'র আলোতে কাল আমি ওই বাঁশঝাড়কে পষ্ট দেখেছিলুম—বাংলোখানা ছিল ওরই পাশে।'

সেইদিকে এগুতে এগুতে সতীশ বললে, 'কবি, তুমি কি বলতে চাও আলাদিনের দৈত্য এসে সেই বাংলোখানাকে রাতারাতি উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে?'

আমি জবাব না দিয়ে পায়ে পায়ে বাঁশঝাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু দ্যাখো সতীশ, কী আশ্চর্য! ভাঙা ইটের স্তূপ আর ভিতের চিহ্ন দেখছ? এক সময়ে এখানে সত্যি-সত্যিই বাড়িঘর ছিল!'

সতীশ সায় দিয়ে বললে, 'তা হয়তো ছিল। আর সেই সময়েই হয়তো তোমার দুর্গেশনন্দিনীর অসীম-সুন্দরী পাঠিকা তার দীপ্তচক্ষু টাইগারকে নিয়ে এখানে বাস করত। কবি, তুমি কি এইখানে বসে বসে মনের মতো স্বপ্ন দেখছিলে?'

উত্তর খুঁজে পেলুম না। কী করে সতীশকে বোঝাব, আমি মিথ্যা স্বপ্ন দেখিনি, সত্য-সত্যই এইখানে এক আলোকময় বাংলোয় এসে উঠেছি, ঝড়-বৃষ্টির কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি, এক বিচিত্র সুন্দরীর সঙ্গে কথা কয়েছি এবং তারপর অন্ধকারে ভীষণ এক কুকুরের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছি!

সতীশ হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে ভাঙা ভিতের উপরে হেঁট হয়ে পড়ে কী-একটা জিনিস কুড়িয়ে নিলে। অবাক হয়ে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলুম, কালকের ভুলে-ফেলে-যাওয়া আমার সেই 'ইলেকট্রিক টর্চ'টা! তাহলে আমি পথ ভুলিনি! সত্যই আমি এখানে এসেছিলুম!.... তবে? তবে কাল যা দেখেছি সেগুলো কী?

ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিলে! তাহলে এখানে কি কোনও অজানা অদৃশ্য রহস্যের আত্মা বিরাজ করছে?

কোনওরকমে হাসি চেপে সতীশ একবার শিস দিলে। তারপর বললে, 'একেই বলে কবির দৃষ্টি! ধন্য! কবি, আলাদিনের দৈত্যও তোমার কাছে হার মানে!'

ভারী রাগ হল। ভাবলুম, দি ঠাস করে সতীশের গালে এক চড় বসিয়ে!

পিশাচ

॥ এক ॥

বাড়িওয়ালা অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, এ বাড়িখানা নিয়ে আমি রীতিমতো বিপদে পড়ে গিয়েছি। খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তা মিথ্যে নয়। এ বাড়িতে গেল তিন মাসের মধ্যে তিনজন লোক মারা পড়েছে! আর সেই তিনটি মৃত্যুই রহস্যময়। এ বাড়িতে আর বোধহয় নতুন ভাড়াটে আসতে রাজি হবে না।'

বিমল বললে, 'ব্যাপারটা আমাদের একটু খুলে বলবেন কি?'

বাড়িওয়ালা বললে, 'ব্যাপারটা এখন সবাই জানতে পেরেছে। সুতরাং আমার আপত্তি নেই।'

কুমার বললে, 'এ বাড়িতে যিনি শেষ-ভাড়াটে ছিলেন, সেই রামময়বাবুর নাম আমরা শুনেছি। উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে তিনি খুব নাম কিনেছেন।'

বিমল দেখলে, কুমার ধীরে ধীরে অর্কিডগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, তারপর সেই রক্তমুখো অর্কিডফুলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই এক আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে কুমারের দেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে বিষম ছটফট করতে লাগল!

চোখের পলক ফেলবার আগেই বিমল সেখানে গিয়ে হাজির হল এবং কুমারের দিকে চেয়েই ব্যাপারটা বুঝতে তার বিলম্ব হল না। সে তখনই রিভলভার তুলে অর্কিডগাছটাকে লক্ষ্য করে উপরি উপরি দুইবার গুলিবৃষ্টি করলে, তারপর মাটি থেকে কুমারের বন্দুকটা নিয়ে আরও দু-বার ছোড়বার পরেই রক্তমুখো ফুলসুদ্ধ অর্কিড-গাছটা দু-খানা হয়ে ভেঙে পড়ল!

কুমার তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার সারা দেহ জড়িয়ে অনেকগুলো লম্বা শুয়া বা দাড়া থর থর করে কাঁপছে! বিমল তাড়াতাড়ি ছুরি বার করে সেইগুলো কাটতে বসল!

॥ পাঁচ ॥

কুমারের জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু তার সর্বাঙ্গ তখন ফোড়ার মতন টাটিয়ে রয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে বিমল বললে, 'আসল ব্যাপারটা এইবার বোঝা গেল.। কেতাবে পড়েছিলুম, দক্ষিণ আমেরিকা ও আরও কোনও কোনও দেশে এমন কোনও কোনও জাতের অর্কিড পাওয়া যায়, যারা জীবজন্তুর রক্তশোষণ করতে পারে। উদ্ভিদশাস্ত্রে পণ্ডিত রামময়বাবু ওই-রকম এক মারাত্মক অর্কিড এনে এখানে পালন করছিলেন। দিনে সে নিরাপদ ছিল, কিন্তু রাত্রে তার ফুলে গন্ধ জাগার সঙ্গে-সঙ্গেই সে রক্তপান করতে চাইত! তখন গন্ধ ছড়িয়ে নানা জীবজন্তুকে কাছে আকর্ষণ করে এই পিশাচ অর্কিড অক্টোপাসের মতন শুয়া দিয়ে তাদের আক্রমণ করত!'

ভীমেডাকাতের বট

॥ এক ॥

বড়োদিনের ছুটিতে আমাদের বন্ধু অসিতের দেশে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

বৈকালে শশা, নারিকেল, মুড়ি ও ফুলুরির থালা এবং চায়ের পিয়ালা টেবিলে সাজিয়ে নিয়ে বসে আমরা সবাই মিলে গল্প করছিলুম।

অসিত বিনয় জানিয়ে বললে, 'পাড়াগেঁয়ে 'লাইট রিফ্রেশমেন্টে' হয়তো পেট ভরলেও তোমাদের মন ভরবে না! কিন্তু কী করব ভাই, এখানে পেলিটি কি ভীম নাগের কোনও আত্মীয়ই বাস করে না.'

পরিতোষ টপ করে একখানা মস্তবড়ো কপির ফুলুরি মুখের গর্তে ফেলে দিয়ে বললে,

'বহুত-আচ্ছা! কলকাতায় যা পাওয়া যায়, পাড়াগাঁয়ে এসে আমরা তা চাই না! কিন্তু অসিতভায়া, তুমি বোধহয় ভুলে গিয়েছ যে, আমি দুনিয়ার আলো দেখেছি সেই পূর্ব-বাংলায়, যেখানে কাঁচালঙ্কাকে মনে করা হয় মুড়ি-ফুলুরির অলংকারের মতন। তুমি কাঁচালঙ্কাকে 'বয়কট' করেছ কেন?'

প্রিয়নাথ বললে, 'যেহেতু আমরা বাঙাল নই।'

এবারে একখানা পেঁয়াজের বড়াকে চোখের নিমিষে উড়িয়ে দিয়ে পরিতোষ বললে, 'তোমরা বাঙাল নও, কিন্তু তোমরা হচ্ছ বিখ্যাত ঘটিচোর। তাই লাল কাঁচালঙ্কা দেখলে লাল-পাগড়ির কথা মনে করে ভয়ে তোমাদের বুক কাঁপে।'

শ্রীপতি দুই হাত আন্দোলন করে বললে, 'বাঙাল আর ঘটিচোর! তোমরা দুজনেই ক্ষান্ত হও! অকারণে গৃহবিবাদে দরকার নেই! তার চেয়ে অসিতের মুখ থেকে শোনা যাক, তার দেশে দ্রষ্টব্য আছে কী কী?'

অসিত বললে, 'এখানকার ধোঁয়া-ধুলোহীন আকাশ, মোটরের উৎপাতহীন মেঠোপথ, আর জনতার-চিৎকারহীন প্রান্তরের মধ্যে তোমরা হয়তো দ্রষ্টব্য কিছুই খুঁজে পাবে না। তবে আমাদের খঞ্জনা নদীর ধারে গেলে তোমরা অনেক হাঁস শিকার করতে পারবে। ঘুঘু, 'স্নাইপ' আর চকাও পাওয়া যায়।'

প্রিয়নাথ বললে, 'আমি হচ্ছি বৈষ্ণবকুলতিলক। জীবহিংসা আমার পক্ষে মহাপাপ।'

পরিতোষ বললে, 'তুমি হচ্ছ ভণ্ড দি গ্রেট। আমাদের দলে তোমার চেয়ে মুরগিখোর আর কেউ নেই।'

প্রিয়নাথ বললে, 'হতে পারে। মুরগি ভক্ষণ করা আর নিধন করা এক কথা নয়।'

শ্রীপতি বললে, 'আহা হা, আবার বাক্যযুদ্ধ কেন? প্রিয়নাথ কেন শিকারে যেতে চায় না, আমি তা জানি। বন্দুকের শব্দ শুনলে তার পেটের অসুখ হয়। কিন্তু সে কথা যাক। কী বলছিলে অসিত! এখানে দেখবার জায়গা কিছুই নেই?'

অসিত একটু ভেবে বললে, 'দ্যাখো, এখানে একটি দেখবার বিষয় আছে বটে, কিন্তু তোমরা সেটাকে হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে!'

আমি বললুম, 'কেন?'

—'তোমরা হয়তো বলবে, সেটা মোটেই দ্রষ্টব্য নয়।'

—'তবু সেটা কী শুনতে ইচ্ছা করি।'

—'ভীমেডাকাতের বটগাছ।'

—'বটগাছ তো পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু এ বটগাছের নামটা 'ইন্টারেস্টিং' বটে!'

—'এর কাহিনিও কেবল 'ইন্টারেস্টিং' নয়, 'থ্রিলিং'!'

পরিতোষ বললে, 'আরও দু-ডজন ফুলুরির 'অর্ডার' দিয়ে কাহিনিটা তুমি আমাদের কাছে বলতে পারো।'

—'তথাস্তু।'

॥ দুই ॥

অসিত বলতে লাগল:

'নবাবি আমলের পর বাংলা দেশে তখন ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়েছে। খালি ইংরেজ নয়, দেশ জুড়ে তখন ঠগি, ডাকাত আর বোম্বেটারাও রাজত্ব আরম্ভ করেছে। দূর-দেশে যেতে হলে লোকে তখন প্রাণ হাতে করে পথে বেরোয়।

সেই সময়েই এ অঞ্চলে ভীমেডাকাতের নামে সবাই হত থরহরি কম্পমান! তোমরা সবাই নিশ্চয় বিশেডাকাতের নাম শুনেছ? বিশে ছিল অত্যাচারী ধনীর যম, কিন্তু গরিবের মা-বাপ। তাকে অনায়াসেই বিলিতি ডাকাত রবিনহুডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ডাকাত হলেও বিশের মধ্যে উদার মনুষত্বের অভাব ছিল না।

কিন্তু ভীমেডাকাত ছিল সম্পূর্ণ উলটো-ধরনের মানুষ। গরিব বা ধনী কারুকেই সে ছেড়ে দিত না। কেবল ডাকাতি নয়, নরহত্যাতেও ছিল তার উৎকট আনন্দ! শোনা যায়, দু-এক আনা পয়সার জন্যেও সে অগুনতি মানুষ খুন করেছে। সাধারণ ডাকাতরা টাকা পেলে মিছামিছি খুন-খারাপি করে না। ভীমে কিন্তু আগে করত খুন, তারপর নিত টাকাকড়ি। যে কালীকে পুজো করে ভীমে ডাকাতি করতে বেরুত, সেই কালীমূর্তির গলায় আর কোমরে সে পরিয়ে দিয়েছিল আসল নরমুণ্ড ও কঙ্কালের মালা। কালীঠাকুরের হাতে সে নাকি প্রতি রাত্রেই নিত্য-নতুন মানুষের রক্তমাখা কাঁচা মাথা ঝুলিয়ে দিত। বনের মধ্যে এক ভাঙা মন্দিরে সেই ডাকাতে-কালী আজও বিরাজ করছেন, কিন্তু তাঁর ভীষণ অলংকারগুলো অনেকদিন আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে।

ভীমের চেহারাও ছিল নাকি ভয়াবহ। তার মতন লম্বা-চওড়া লোক কেউ কখনও দেখেনি, আর তার রংও ছিল মিশমিশে কালো। সেই কালো মুখে তার টকটকে লাল চোখদুটো জ্বলত আগুনের ভাঁটার মতন। তার মূর্তি দেখলেই লোকে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ত।

ভীমেডাকাতের অত্যাচারে এঅঞ্চলে লোক-চলাচল যখন বন্ধ হয়ে গেল, অনেকেই যখন দেশ ছেড়ে দেশান্তরে পালাতে লাগল, তখন এক সায়েব এল সেপাইদের নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে।

কয়েক মাস ধরে বহু চেষ্টার পর ভীমের দলের কয়েকজন ধরা পড়ল বটে, কিন্তু ভীমের পাত্তা পাওয়া ভার! বিপদ দেখলেই সে তার 'রণ-পা'-এ চেপে হাওয়ার আগে উধাও হয়ে যেত! 'রণ-পা' কী জানো? দুটো লম্বা বাঁশের লাঠি, তাতে আছে পা রাখবার জায়গা। এই রণ-পা ছিল বাংলার সেকেলে ডাকাতদের ভারী-আদরের বস্তু, কারণ তার উপরে চড়ে তারা এক রাত্রেই পঞ্চাশ-ষাট মাইল পথ অনায়াসেই পার হয়ে যেতে পারত। 'রণ-পা'য়ে উঠে ভীমে যে কোথায় সরে পড়ত, তার খোঁজ আর কেউ পেত না।

কিন্তু সাহেব ছিলেন মহা বুদ্ধিমান। একদিন ভীমে সদলবলে এক গ্রামে ডাকাতি করতে গিয়েছে, এমন সময়ে সায়েবও সেখানে এসে পড়লেন সদলবলে। সেপাইরা বন্দুক ছুড়লে, জনকয়েক ডাকাত মরল বা জখম হল, বেগতিক দেখে ভীমে 'রণ-পা'-এ চড়ে লম্বা দিলে,

সায়েবও এবারে ঘোড়ায় চেপে তার পিছু নিলেন। কিন্তু কিছুদূর যেতে-না যেতেই সায়েবের ঘোড়া গেল ভীমের 'রণ-পা'র কাছে হেরে। খানিক পরেই ভীমেডাকাতের টিকিটি পর্যন্ত আর দেখা গেল না!

কিন্তু সায়েবের চোখ বড়ো সাফ। তিনি দেখলেন, ধূলিধূসরিত পথের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে ভীমের 'রণ-পা'র দীর্ঘ রেখা! সেই চিহ্ন ধরে তিনি এগুতে লাগলেন। মাইল চার পরে 'রণ-পা'র চিহ্ন যেখানে শেষ হল, সেখানে দেখা গেল যুগযুগান্তরের পুরানো বিপুল এক বুড়ো বটগাছকে! ততবড়ো বটগাছ দেখা যায় না, তার গুঁড়ির বেড় প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাত। সেই গুঁড়ি আর শত শত ঝুরির উপরে ভর দিয়ে এই একটিমাত্র বটগাছ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছোটোখাটো অরণ্যের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মোটা মোটা প্রত্যেক ঝুরি এক-একটা আলাদা গাছের গুঁড়ির মতন শিকড় গেড়েছে মাটির ভিতরে।

সায়েব আন্দাজ করলেন, ভীমে নিশ্চয় এই মস্ত গাছে চড়ে ঘন ডাল-পাতার আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে। পিঠে বন্দুক বেঁধে তিনিও গাছে উঠলেন। কিন্তু বহুক্ষণ এ-ডালে ও-ডালে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ভীমকে পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে সাহেব যখন মাটিতে নেমে পড়বার জোগাড় করছেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল, বটের গুঁড়ির উপর দিয়ে ধোঁয়ার চক্র বেরিয়ে আসছে!

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সায়েব আরও-উপরে উঠে উঁকি মেরে দেখেন, বটের প্রকাণ্ড গুঁড়িটা একেবারে ফাঁপা, আর তার ভিতরে পরম আরামে বসে ভীমেডাকাত আপন মনে হুঁকোয় দম মারছে!

তামাকখোর ভীমে সে-যাত্রা আর রক্ষা পেলে না। এক ছিলিম তামাকের লোভেই সে নিজের প্রাণটা বিলিয়ে দিলে। সেই বটগাছেরই এক ডালে তাকে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মরবার সময়েও সে ভয় পেলে না। দম্ভ করে বললে, 'সায়েব, আমি আমার এ আস্তানা ছেড়ে নড়ব না! ভূত হয়ে এখানেই রাজত্ব করব, এখানে যে আসবে সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না!'

সেই ফাঁপা বটগাছই আজ 'ভীমেডাকাতের বট' নামে বিখ্যাত। শত শত ঝুরির শিকড় দিয়ে রস টেনে সে কেবল বেঁচেই নেই, আকারে আগেকার চেয়েও আরও বড়ো হয়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের প্রত্যেকেরই কাছে সে একটা দ্রষ্টব্য জিনিস হয়ে পড়েছে।

কিন্তু রাতের বেলায় কেউ তার ত্রিসীমানায় যায় না।

ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, ভীমেডাকাতের কথা পরীক্ষা করবার জন্যে, সেকালে কোনও কোনও অতিবড়ো ডানপিটে রাত্রে ওই বটগাছের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ আর ফিরে আসেনি, কোনওরকম চিহ্ন না রেখেই তারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে!

আজ আর কেউ ভীমেডাকাতের কথা পরীক্ষা করতে সাহস করে না। সেই বটগাছের চারিদিকের জমি আজ জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। জলাভূমির কাছে জ্যান্ত মানুষের বসবাস নেই, আছে কেবল মড়াদের রাজ্য—অর্থাৎ গোরস্থান!'

অসিতের কাহিনি শেষ হলে পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাহলে তোমাদের বিশ্বাস,

রাত্রে সেই বটগাছের কাছে গেলে আজও ভীমেডাকাতের সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা আছে?'

—'লোকে তো তাই বলে।'

—'বটগাছটা এখান থেকে কত দূরে?'

—'চার মাইল।'

পরিতোষ বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, 'আজ দ্বাদশীর চাঁদ উঠবে আকাশে। তারই আলোতে আমরা ভীমেডাকাতের সঙ্গে দেখা করব।'

অসিত বললে, 'কিন্তু—'

শ্রীপতি বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তুর নিকুচি করেছে। আমরা আজ হাতে-নাতে প্রমাণ করতে চাই, সেকেলে গাঁজাখুরি উপকথা কোনওকালেই সত্য হয় না।'

কেবল প্রিয়নাথ আমতা আমতা করে বললে, 'ওই বটগাছটাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু ওই যে গোরস্থানের কথা বললে, ওটা আমার ভালো লাগছে না।'

কিন্তু তার প্রতিবাদ আমরা কেউ আমলেও আনলুম না।

॥ তিন ॥

শীতকালের কুয়াশায় আচ্ছন্ন চাঁদের আলো দেখলেই শনিগ্রস্ত বলে মনে হয়। একেবারে নির্জন পথ, ঝিঁঝির ডাকে শব্দময় ও বুনো পুষ্পপত্রে গন্ধময়। বহুদূর থেকে নিস্তব্ধ রাত্রির বক্ষ ভেদ করে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে চলন্ত রেলগাড়ির আওয়াজ। এ আওয়াজ আগেও অনেকবার শুনেছি, কিন্তু আজকে শুনে মনে হল, ওই রেলগাড়িতে চড়ে যেন ইহলোকের যাত্রীরা চলেছে পরলোকের দিকে!

বন্ধুদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলুম। তাদেরও শ্বাস-প্রশ্বাস হয়েছে দ্রুত, কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। মুখে কেউ মানি আর না মানি, আসন্ন কোনও অলৌকিক ভাবের প্রভাবে আমাদের সকলেরই মন আজ মোহগ্রস্ত!

এখানে মানুষের শেষ-আশ্রয় হচ্ছে সরকারি ডাকবাংলো। তাকেও পিছনে ফেলে মাইল-খানেক এগিয়ে গেলুম।

তারপর একদিকে আঙুল দেখিয়ে অসিত চুপি চুপি বললে, 'ওটা হচ্ছে গোরস্থান।'

মৃতের সেই মৌন জগতেও জীবন্ত ঝিঁঝিদের ভাঙা গলার অশ্রান্ত আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কী-একটা কালো জন্তু আমাদের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে একটা উঁচু কবরের আড়ালে পালিয়ে গেল। প্রিয়নাথ ছিল সব-পিছনে, সে এগিয়ে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তার মুখের ভাব অস্বাভাবিক।

শ্রীপতি বললে, 'কিন্তু সেই বুড়ো বটগাছটা কোথায়?'

অসিত নীরবে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

একটা মস্তবড়ো জলাভূমি দৃষ্টিসীমা জুড়ে ধু ধু করছে এবং তারই উপরে পড়ে হিংস্র

দাঁতের মতন চকচক করে জ্বলছে কুয়াশায় আধমরা চাঁদের আলো! জায়গায় জায়গায় কুয়াশা এত ঘন যে, তাকে ঠেলে চোখ চলে না। জলারই একপাশে পাহাড়ের মতন উঁচু প্রকাণ্ড একটা ঢিপির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, শূন্যের অনেকটা পূর্ণ করে বিপুল সেই বটগাছ। কেউ বলে না দিলে আমরা তাকে অরণ্য বলেই ধরে নিতুম! আবছায়ামাখা রহস্যময় জ্যোৎস্নায় বৃদ্ধ বটের ডালপালা শীতার্ত হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং তার তলায় জমে আছে বিরাট ও নিরেট একটানা অন্ধকার!

প্রিয়নাথ অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, 'ওগুলো কী? ওগুলো? ওই যে, নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে? কী ওগুলো?'

শ্রীপতি বললে, 'আলেয়া।'

প্রিয়নাথ বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, যাদের দেখা যায় না তারা ওই জলায় আগুনের ফুটবল নিয়ে 'ওয়াটার-পোলো' খেলছে!'

মনে মনে ভাবছি, এ স্থানটা গোরস্থানের চেয়েও স্তব্ধ, কারণ এখানে ঝিঁঝিরাও ডাকছে না! ঠিক সেই সময় নানা শব্দে চতুর্দিক হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠল! প্রথমে চিৎকার করে উঠল বিকট স্বরে একপাল শেয়াল, তারপরই কোথা থেকে চেঁচাতে লাগল তিন-চারটে প্যাঁচা এবং তারপরই শুনতে পেলুম মাথার উপরে একদল বাদুড়ের ডানার ঝটপট ঝটপট শব্দ—যেন কী দেখে ভয় পেয়ে তারা প্রাণপণে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে!

প্রিয়নাথ সচকিত কণ্ঠে বললে, 'ওহে, এখানে দাঁড়িয়ে মিছামিছি আর হিম লাগিয়ে আর শীতে কেঁপে কী হবে? এবারে ফেরা যাক, আর নয়!'

পরিতোষ ঠাট্টা করে বললে, 'কী হে অসিত, তোমার ভীমেডাকাত কোথায়?'

শ্রীপতি বললে, 'ভীমেডাকাত আজ বোধ হয় নরকের দরজা খোলা পায়নি!'

আচম্বিতে একটা বরফের মতন ঠান্ডা-কনকনে হাওয়ার ঝটকা উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলেয়াদের দলে যেন একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—কাকে দেখে তারা যেন দু-ভাগে ভাগ হয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে!

প্রিয়নাথ কাঁদো কাঁদো গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কুয়াশার একটা মেঘ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! ওর পিছনে কী আছে, কে জানে!'

পরিতোষ চিৎকার করে বললে, 'কোথায় হে ভীমেডাকাত! দয়া করে একবার দেখা দাও!'

সেই মুহূর্তে শুনতে পেলুম, জলার জলে ছপ-ছপ-ছপ-ছপ-ছপ-ছপ করে কীসের শব্দ উঠল!

দুই চোখ পাকিয়ে অসিত ক্ষীণ স্বরে বললে, 'মনে হচ্ছে কে যেন 'রণ-পা'-এ চড়ে জলা পেরিয়ে আমাদের দিকেই আসছে!'

আড়ষ্ট ভাবে অবরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীপতি বললে, 'কোথায় 'রণ-পা'?....কোথায় কে?'—তার স্বরে এখন কিন্তু আর কৌতুকের ভাব ছিল না।

আমি দুর্বল স্বরে বললুম, 'কেবল একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর একখানা ঘন কুয়াশার মেঘ হু হু করে এগিয়ে আসছে!'

প্রিয়নাথ হঠাৎ বিকট ও বিশ্রী এক চিৎকার করে পাগলের মতন দৌড় মারলে! সে অমন ভাবে চেঁচিয়ে না পালালে আমরা কী করতুম জানি না, কিন্তু ভয় হচ্ছে এমন সংক্রামক যে, দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমরাও ছুটতে লাগলুম প্রিয়নাথের সঙ্গে সঙ্গে!

গোরস্থান ছাড়িয়ে মিনিট-পাঁচেক ছোটবার পর আমরা আবার দাঁড়িয়ে পড়লুম।

পরিতোষ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ঘটি, তুমি হঠাৎ পালিয়ে এমন ভয় দেখালে কেন?'

প্রিয়নাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'বাঙাল, তোমাকে তো আমার পিছু নিতে বলিনি, তুমি পালালে কেন?'

পরিতোষ কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত শিউরে উঠে থেমে গিয়ে আবার দৌড় মারবার উপক্রম করলে! আমরাও আড়ষ্ট হয়ে শুনতে পেলুম, আমাদের পিছনে পথের উপরে জেগে উঠেছে, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের খটমট শব্দ!

শ্রীপতি সভয়ে বললে, 'রণ-পা'র শব্দ কি ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতো?'

কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিলে না, কারণ তখন আমরা সকলেই ঘৌড়দৌড়ের ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতবেগে আবার ছুটতে শুরু করেছি! পিছনের শব্দও যত এগিয়ে আসে, আমরাও ততবেশি পা চালাতে থাকি—এ যেন সাক্ষাৎ-মৃত্যুর সঙ্গে ভীরু জীবনের দৌড়ের পাল্লা!

এবারে একেবারে এসে থামলুম ডাকবাংলোর সীমানার মধ্যে! আমাদের দমাদ্দম পদাঘাতে বাংলোর দরজা ভেঙে পড়ে আর কী! রক্ষী দরজা খুলে দিয়ে বিস্মিত স্বরে বললে, 'কী হয়েছে বাবু, কী হয়েছে?'

আমি বললুম, 'কিছু হয়নি। আজ রাত্রে আমরা এখানে থাকব।'

একটা ঘরে ঢুকে যে যেখানে পারলুম হাত-পা এলিয়ে বসে পড়লুম।

বাইরের স্তব্ধ পথের উপরে আবার সেই ভয়াবহ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। বেশ বুঝলুম, শব্দটা বাংলোর সীমানার মধ্যে এসে থামল।

আমার হৃৎপিণ্ড বুকের ভিতরে ছটফট করে লাফাতে লাগল!

রক্ষী আবার দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে পরিতোষ ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরে উন্মত্তের মতন বলে উঠল, 'খবরদার, দরজা খুলে দিয়ো না!'

রক্ষী আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দরজা খুলে দেব না কী বাবু? আজ যে এখানে পুলিশ-সায়েবের আসবার কথা আছে!'

॥ চার ॥

ঘোড়া থেকে নেমে পুলিশসায়েবই বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করলেন।

আমরা বোকা এবং বোবার মতন পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম।

খানিক পরে পরিতোষ বললে, 'ওই কাপুরুষ প্রিয়নাথই যত নষ্টের গোড়া!'

প্রিয়নাথ বললে, 'জলায় যাবার রাস্তা খোলাই আছে। তুমি আবার সেখানে গেলে আমি বারণ করব না।'

অসিত বললে, 'হতে পারে, পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পুলিশসায়েবই আসছিলেন। কিন্তু জলার জলে যে ছপ ছপ করে শব্দ হচ্ছিল, সেটা কীসের শব্দ?'

শ্রীপতি বললে, 'হয়তো কোনও জন্তু সাঁতরে জলা পার হচ্ছিল। আমরা রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি, কাল আমরা আবার এই বটগাছ দেখতে আসব।'

কিন্তু যাঁরা এই কাহিনি শুনছেন তাঁদের কানে কানে আমি জানিয়ে রাখছি যে, পরদিনের সন্ধ্যায় বটগাছ দেখতে আসবার কথা আমরা সকলেই আশ্চর্যরূপে ভুলে গিয়েছিলুম। আজও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই ছপ ছপ শব্দ শুনি আর গলদঘর্ম হয়ে জেগে উঠি! আজও মনে মনে প্রশ্ন জাগে, সে শব্দটা কীসের?

তোমরা কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো?

জীবন্ত মৃতদেহ

এক

সুরমা সমুদ্র দেখেনি। এবার পূজার সময়ে সুরেশের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ল, 'দাদা আমাকে সমুদ্র দেখাও।'

সুরেশ মাথা নেড়ে বললে, 'এ-যাত্রায় হল না বোন!'

'কেন?'

'পূজার ছুটি পাব বটে, কিন্তু ছুটিতে কলকাতায় কাজও আছে। আমি বড়-জোর হপ্তাখানেক বাইরে থাকতে পারি। কিন্তু সমুদ্র দেখতে গেলে পুরীতে যেতে হয়। হপ্তাখানেকের জন্য পুরীতে গিয়ে কি হবে? মজুরীতে পোষাবে না।'

সুরেশের বন্ধু দীপক সেখানে বসেছিল। সে বললে, 'সমুদ্র দেখবার জন্যে উড়িষ্যা মুল্লুকে ছুটতে হবে কেন?'

—'কারণ বাঙালীর পক্ষে সেইটেই হচ্ছে 'সর্ট-কাট্'!'

—'দেখ সুরেশ, আমরা প্রায় ভুলেই যাই, সমুদ্রের স্পর্শ থেকে বাংলাদেশও বঞ্চিত নয়।'

—'হাঁ দীপক, আমিও তা জানি। কিন্তু কাছাকাছির ভিতরে পুরীর মতন অন্য কোথাও যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা নেই।'

দীপক বললে, 'সুরমা পুরীর চেয়ে ঢের কাছে তুমি সমুদ্রকে পেতে পারো।'

সুরমা সাগ্রহে বললে, 'কোথায়, দীপুদা?'

—'কাঁথিতে,' আমাদের দেশ কাঁথির কাছে।

—'সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়?'

—'নিশ্চয়, নইলে আর বলছি কেন! আমরা এখন কলকাতার বাসিন্দা হয়েছি বটে, কিন্তু দেশের বাড়িখানা আছে আমাদের পুরানো চাকর সনাতনের জিম্মায়। সুরেশ, দিন পাঁচ-ছয়ের ভিতরে যদি সুরমাকে নিয়ে সমুদ্র দেখে আবার কলকাতায় ফিরতে চাও, তবে বাঁধ মোট, কেনো টিকিট, চল আমাদের দেশ! তোমাদের রাজভোগ দিতে পারব না বটে, তবে অনাহারেও থাকতে হবে না। কি বল? রাজি?'

হয়তো অদৃষ্টেরই কারচুপি। নারাজ হবার মতন বুদ্ধি খুঁজে না পেয়ে সুরেশ বলতে বাধ্য হল, 'আচ্ছা, রাজি।'

—'তাহলে 'ষষ্ঠির' দিনই আমরা যাত্রা করব।'

—'হাঁ। দশমীর পরেই আমাকে আবার কলকাতায় ফিরতে হবে। জরুরী কাজ।'

দুই

কিন্তু দশমীর পরেই সুরেশ ফিরতে পারলে না কলকাতায়। দেবতা সাধলেন বাধ।

সুরমার ভাগ্যে সমুদ্র-দর্শন হল—ভালো করেই হল। সেই অনন্ত নীল সৌন্দর্যের দিকে প্রথমটা সে তাকিয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে। তারপর কচি মেয়ের মতন সকৌতুকে হাসতে হাসতে নাচের তালে তালে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল সাগর-সৈকতের বালুকা শয্যার উপর দিয়ে।

সুরেশ বললে, 'কলকাতার এত কাছে সমুদ্র, অথচ আমরা জেনেও জানি না। সমুদ্র দেখবার কথা উঠলেই পুরীর কথা মনে হয়।'

দীপক বললে, 'এটা অভ্যাসের দোষ ভায়া। বাংলাদেশের কত জায়গা থেকেই সমুদ্রের নাগাল পাওয়া যায়। 'সমতট' বা দক্ষিণ বাংলার বাসিন্দাদের তো সমুদ্রের ছেলে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যুগে যুগে বাঙালী বাংলার সমুদ্র-পথ দিয়ে যাত্রা করেছে পৃথিবীর দিগবিদিকে। বাংলার প্রথম বন্দর তাম্রলিপ্ত বা তমলুক থেকে খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগেও শত শত জাহাজ যাত্রা করত সমুদ্রের ভিতরে। বাংলার বীর ছেলে বিজয় সিংহ আর চীনা পর্যটক ফাহিয়ান তমলুক থেকেই সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। আজও সমুদ্রগামী জাহাজে অগুন্তি বাঙালী নাবিক কাজ করে। সমুদ্রের সঙ্গে যে বাঙালীর নাড়ীর যোগ আছে।'

সুরমা বললে, 'আমার মনে হচ্ছে দাদা, সমুদ্রকে দর্শন করাও যেন মস্তবড় একটা 'অ্যাডভেঞ্চার'। ও দীপুদা একখানা নৌকা ভাড়া কর না।'

—'কেন?'

—'একবার সমুদ্রের বুকে ভাসতে ইচ্ছে করছে।'

সুরেশ ধমকে দিয়ে বলে, 'না না অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়! সমুদ্র কি পুকুর, না খাল? ঢেউয়ের ধাক্কায় দৈবগতিকে নৌকা যদি ডুবে যায় কি বানচাল হয়, তাহলে সখের 'অ্যাডভেঞ্চারে'রই মজাটা ভালো করেই টের পাবি! যত-সব ছেঁদো কথা! 'অ্যাডভেঞ্চার'।'

তা 'অ্যাডভেঞ্চারে'র মজাটা হাড়ে-হাড়ে টের পেতে সুরমাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না।

আকাশ ছেয়ে গেল কালো কালো মেঘে। মেঘের পর মেঘ, মেঘের ভিতরে মেঘ। দেখতে দেখতে আরম্ভ হল বারিপাত। ক্রমে বৃষ্টি জোর পড়তে লাগল। দিন গেল রাত এল, রাত গেল দিন এল, আবার দিনের পর এল রাত—তবু প্রবল বৃষ্টি ঝরছে অবিশ্রান্ত, ঝুপ ঝুপ ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে আর স্থলে। তার সঙ্গীরূপে জাগ্রত হল ঝোড়ো হাওয়া।

এমন বিস্ময়কর বৃষ্টি সুরমা আর কখনো দেখেনি। বাড়ি থেকে এক পা বেরুবার যো নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে কেবল দেখা যায় বৃষ্টির ধারায় চিকের ভিতর দিয়ে দূরের অস্পষ্ট সমুদ্র এবং দিকে দিকে ঝাপসা বন-জঙ্গল, আর শোনা যায় থেকে থেকে পাগলা ঝড়ের হাহাকার!

তারপর আচম্বিতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল—তার মধ্যে যেন ডুবে গেল জল-স্থল-শূন্যের সমস্ত।

দীপক, সুরেশ ও সুরমা স্তম্ভিতনেত্রে দেখলে, সমুদ্র আকাশমুখো হয়ে লক্ষ

লক্ষ সফেন তরঙ্গ যাদু বিস্তার করে লাফিয়ে উঠেছে ঊর্দ্ধে. ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে! সর্বাঙ্গ তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কারময়!

পৃথিবীর বুকের উপরে মহাশব্দে ভেঙে পড়ে সেই বিপুল জলরাশি ধেয়ে এল উগ্র বেগে! তারপর দিকে দিকে উঠল অগণ্য মানুষ ও জন্তুর কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ আর আর্তনাদ আর আর্তনাদ।

এ সেই চিরস্মরণীয় বন্যার আরম্ভ, যার কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সারা ভারতবর্ষ!

সুরমা অভিভূত কণ্ঠে বলল, 'মনে হচ্ছে, এ যেন প্রলয় পয়োধি জল।'

দীপক ভয়ার্তস্বরে বললে, 'এখন আর কাব্য নয় সুরমা! হ্যাঁ, এ হচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্রোত! সমুদ্রের বন্যা ছুটে আসছে পৃথিবীর মাটিকে গ্রাস করতে।'

অজস্র ধারায় ঝরছে আকাশ প্রপাত, হা হা হা হা অট্টহাসি হাসছে দুর্দান্ত ঝটিকা, তাণ্ডব নৃত্যে ছুটে আসছে বন্য বন্যার উত্তাল তরঙ্গদল, কর্ণভেদী মৃত্যু-ক্রন্দন তুলেছে অসংখ্য অসহায় মানব, হুড়মুড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে শত শত ঘর-বাড়ি এবং বনস্পতি। যেন পৃথিবীর অন্তিমকাল উপস্থিত।

তিন

আমরা বন্যার ইতিহাস লিখতে বসিনি, যেটুকু ইঙ্গিত দিলুম সেইটুকুই যথেষ্ট।

বন্যা যখন বিদায় নিলে চারিদিকে দেখা গেল এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য, ভালো করে যা বর্ণনা করতে গেলে ভাষাও বোবা হয়ে যায়; সুতরাং সে অসম্ভব চেষ্টা করব না।

এইটুকু বললেই চলবে যে, কয়েকদিন ব্যাপী ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার পর সূর্যদেব মেঘ সরিয়ে এসে দেখলেন, এ অঞ্চলের বাইরে অধিকাংশ ঘর-বাড়ি একেবারে বিলুপ্ত কিম্বা জলময় হয়েছে এবং অনেক জায়গায় গ্রাম বা অঞ্চল ডুবিয়ে থই থই করছে অগাধ জলরাশি এবং তার উপরে দলে দলে ভাসছে গণনাতীত নর-নারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর মৃতদেহ। যেদিকে তাকাও, দৃষ্টিসীমা জুড়ে এই একই দৃশ্য!

দীপকদের এবং অন্যান্য কারুর বাড়ি ছিল উচ্চ ভূমির উপরে, তাই তারা

কোনক্রমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। কিন্তু দীপকদের বাড়িও একেবারে অক্ষত ছিল না, তার পিছন দিকের যে অংশটা ছিল বেশী পুরাতন তা অদৃশ্য হয়েছে। উঁচু জমির উপরে থাকলেও বাড়ির একতলায় ঢুকেছে বেনো জল, সকলে তাই বাস করছে দোতালায়। কারুর এক তালায় নামবার কোন উপায় নেই। কিন্তু তবু তো তাদের বলতে হবে ভাগ্যবান, কারণ জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কত লোক বাস করছে মুক্ত আকাশের তলায় জলমগ্ন ঘর-বাড়ির ছাদের উপরে বা বনস্পতির শাখায়-শাখায়, এবং এইভাবে হয়তো উপবাস করেই তাদের যে কতদিন থাকতে হবে তা কেউ জানে না।

সুরেশ বললে, 'দীপক, আমাদের যখন এখানে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলে তখন কী বলেছিলে, মনে আছে? তোমাদের অনাহারে থাকতে হবে না।' কিন্তু এখন কি বলতে চাও? আমি সাঁতার জানি না, সুরমাও তাই। বাড়ির নীচে চারিদিকে সমুদ্রের জল বয়ে যাচ্ছে কলকল করে। এই জলরাশি ভেদ করে যে আবার ডাঙা দেখা দেবে, ভগবান জানেন এর মধ্যে আমরা জঠর-জ্বালা নিবারণ করব কেমন করে?'

দীপক বললে, 'ভয় নেই ভায়া! অন্তত দিন তিনচার আমাদের অনাহারের ভয় নেই। কিছু চাল, কিছু ডাল আর কিছু শাক-সব্জী আমি রক্ষা করতে পেরেছি।'

—'কিন্তু দিন তিন চার পরে?'

—'খুব সম্ভব জল তখন সরে যাবে। ভগবান আমাদের সহায়।'

—'এই যে কত শত মানুষ বানের তোড়ে ভেসে গেল, ভগবান কি তাদের সাহায্য করেছিলেন? ভগবান আমাদের সহায়। ওসব বাঁধা গৎ ছেড়ে দাও।'

—'বাঁধা গৎ নয় বন্ধু, বাঁধা গৎ নয়! ভগবানের উপর বিশ্বাস কখনও হারিয়ো না। যারা বানের জলে ভেসে গেল নিশ্চয়ই তাদের কাল পূর্ণ হয়েছিল, ভগবান তাই তাদের সাহায্য করেন নি। কিন্তু এত বড় দৈবদুর্বিপাকেও আমরা যখন এখনও বেঁচে আছি, তখন আমাদের কাল পূর্ণ হতে দেরী আছে।'

—'বেশ, দেখা যাক।'

খাবার গেল ফুরিয়ে। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ, জলাভাব। জল যা আছে, তা আজকের পক্ষেও অপ্রচুর। মানুষ অনাহারে থাকতে পারে দিন কয়, কিন্তু জলাভাব সহ্য করা অসম্ভব।

অথচ চারিদিকে এত জল! মাটির উপরে এখানে এত জল কেউ কোনদিন দেখেনি! কিন্তু তা হচ্ছে সমুদ্রের লবণাক্ত জল, মাটির জিবের গলা দিয়ে গলে না।

দীপক জানলার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বাহিরটা একবার দেখে নিয়ে বললে,

'সুরেশ, কোন দিকে এখনো জ্যান্ত মানুষের সাড়া পাচ্ছি না। আমার বাড়ির চারিপাশ থেকে জল এখন সরে গিয়েছে বটে, কিন্তু খুব সম্ভব গ্রাম এখন জনহীন। যারা বন্যাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে তারা পালিয়েছে প্রাণ নিয়ে। এমন অবস্থা এখানে হাট-বাজারও বসবে না। রেলপথও হয়তো এখনো জলের তলায়, সুতরাং ট্রেনও চলবে না। কলকাতায় যখন যাবার উপায় নেই, তখন আমাদের কি করা উচিত বল দেখি?'

—'তোমার দেশ, তুমি বল।'

—'নন্দীগ্রামে আমার মামার বাড়ি। এখান থেকে মামার বাড়ি পনেরো মাইলের কম হবে না। যদিও চারিদিকের অবস্থা দেখে সন্দেহ হচ্ছে, জলমগ্ন জমি এড়িয়ে সেখানে যেতে হলে আমাদের হয়তো পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পথ পার হতে হবে। সেখানে যাবার চেষ্টা করব কি?'

—'নন্দীগ্রামের অবস্থাও যদি এখানকার মত হয়ে থাকে?'

—'হয়তো হয়েছে। হয়তো হয়নি। হয়তো সেখানে গেলে হয়তো পানাহারের অভাব হবে না। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে একবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি?'

—'বোধহয়, উচিত। এখানে থাকলে খাবার আর জলের অভাবে আমরা মারা পড়ব সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।'

সুরমা সভয়ে বললে, 'উঁঃ। পায়ে হেঁটে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল!'

সুরেশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'হাঁ, তাই! তোর জন্যেই তো এই বিপদ! তোর জন্যেই তো বাংলাদেশে বসে সমুদ্র দেখতে এলুম! এই বাংলাদেশ হচ্ছে ঈশ্বর-বর্জিত দেশ। পুরীতে গিয়ে কেউ এমন বিপদে পড়ে না—সেখানকার সমুদ্র হিংসুক রাক্ষসের মতন নয়, তাই সবাই যেতে চায় সেখানে!'

সুরমা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললে, 'রাগ করো না দাদা, কিন্তু তুমি কথা কইছ ঠিক একটি আস্ত বোকার মতন!'

সুরেশ আরো রেগে উঠে বললে, 'তুই 'অ্যাডভেঞ্চার' চেয়েছিলি না? এখন দ্যাখ, কত ধানে কত চাল!'

দীপক বললে, 'শান্ত হও বন্ধু, শান্ত হও! এখন মাথা গরম করবার সময় নয়।....সনাতন, নিরেট খাবার তো খতম। এখন যেটুকু জল আছে একটা 'ফ্লাস্কে' ভরে নাও। তারপর চল, আমরা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি।'

চার

চোখের সামনে দেখলে তারা যে মর্মান্তিক দৃশ্য, যে ভীষণতা ও যে বীভৎসতা, তার পূর্ণ বর্ণনা না দেওয়াই ভালো। কবি দান্তে নরকের যে সব ছবি এঁকেছেন তাও এমন ভয়াবহ নয়।

জনহীনতার মধ্যে বিরাজ করছে যেন এক বিরাট সমাধি-ভূমির শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা। জনহীনতাই বা বলি কেন, যেখানে সেখানে রয়েছে মনুষ্য-মূর্তি—একক, জোড়া-জোড়া বা দলে-দলে; তাদের সংখ্যা গোণা অসম্ভব। কিন্তু তারা সকলেই মৃত। এ হচ্ছে মৃত জনতার দেশ! কত দেহ জলে ভাসছে, কত দেহ পুঞ্জীভূত ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে মাটির উপরে।

মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জলমগ্ন জলের উপর অংশ। সে-সব গ্রামে যারা থাকত তাদের অনেকেই ভেসে গিয়েছে বন্যাস্রোতে, বাকী সবাই করেছে প্রাণ নিয়ে পলায়ন।

থেকে থেকে সুদূর বা অল্প দূর থেকে ভেসে আসছে 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনি। আত্মীয়েরা যে-সব দেহের সন্ধান পেয়েছে তাদের নিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে।

সব-আগে দীপক, তারপর সুরেশ, তারপর সুরমা এবং সব শেষে মোট-ঘাট নিয়ে পথ চলছে বৃদ্ধ ভৃত্য সনাতন। তাদের মনের ভিতর কি হচ্ছিল জানি না, কিন্তু তাদের মুখের পানে তাকালে বোধহয়, যেন তারা এগিয়ে যাচ্ছে চোখ থাকতেও অন্ধের মতন।

সত্যই তাই। ইচ্ছে করেই তারা এদিকে ওদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিল না, কারণ তা দেখলে হয়তো বন্ধ হয়ে যেতো তাদের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া।

প্রত্যেকেই পদচালনা করছে কলের পুতুলের মতন কারুর মুখে কথা নেই বললেও চলে। এই মড়ার মুলুকের মৌন ব্রতের মধ্যে কথা কইতে যেন ভয় হয়, শিউরে উঠে প্রাণ। মনে হয় পরিচিত জীবনের বাণী শুনলে দেহহীন আত্মারা আবার ফিরে আসতে চাইবে আপন আপন দেহের মধ্যে।

পথ ধরে সোজা চলতে পারলে হয়তো তারা সন্ধ্যার আগেই গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারত। কিন্তু পথ ও মাঠের অধিকাংশই এখনো জলমগ্ন। যেখানে জল নেই সেখান দিয়ে অনেক ঘুরে তবে তারা অগ্রসর হতে পারছে।

অবশেষে সন্ধ্যা হল। চাঁদ উঠল—শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল চাঁদ! কিন্তু মানুষ যে-চোখে দেখে, চাঁদকে মনে হয় সেইরকম। তারা ভাবলে, ও চাঁদের মুখ যেন মড়ার মতন হলদে!

জ্যোৎস্নার আলোতে তফাতের সব দৃশ্য আর স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না—এ তবু মন্দের ভালো। অন্তত খানিকটা কমল ভয়াবহতা।

সুরমা কাতরস্বরে বললে, 'দাদা, জল।'

সুরেশ বললে, 'এইতো একটু আগে জল খেলি!'

—'কি করব দাদা, আজ আমার গলা যে খালি খালি শুকিয়ে যাচ্ছে!'

—'শুকিয়ে গেলে কি করব বোন, 'ফ্লাস্কে' যে আর এক ফোঁটাও জল নেই।'

একটা অস্ফুট আর্তধ্বনি করে সুরমা চুপ মেরে গেল।

দীপক বললে, 'পচা মড়ার দুর্গন্ধ ক্রমেই বেড়ে উঠেছে! আর যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে!'

সুরেশ বললে, 'পথের আর কত বাকি?'

—'আমাদের এখনো মাইল সাত-আট যেতে হবে।'

—'ওঃ!'

—আবার সবাই নীরব। কিন্তু রাত্রি আজ নীরব নয়। একটানা শোনা যেতে লাগল শৃগাল-কুকুরের চীৎকার-ধ্বনি। মড়ার অধিকার নিয়ে তারা ঝগড়া করছে পরস্পরের সঙ্গে।

খানিক পরে সুরমা আর পারলে না, অবশ হয়ে বসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'দাদা গো' বলে চেঁচিয়ে উঠে এলিয়ে পড়ল এক দিকে!

দীপক ও সুরেশ ছুটে এসে তাকে ধরে তুলে দাঁড় করালে। দেখা গেল, সুরমা বসে পড়েছিল একটা নারীর মৃতদেহের উপরে।

সুরমা কাঁদতে লাগল।

সুরেশ বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কি হবে বোন? চল, যত তাড়াতাড়ি পারি এই নরকের বাইরে পালাই চল!'

—'তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আর আমি হাঁটতে পারব না।'

—'তাহলে তোকে কি আমাদের কোলে নিয়ে যেতে হবে?'

এত দুঃখেও ম্লান হাসি হেসে সুরমা বললে, 'কী যে বল দাদা।'

—'তবে এগিয়ে চল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরমা আবার অগ্রসর হল।

চাঁদের আলো আরো জ্বল-জ্বলে। ওদিকে তেপান্তরের মাঠটাকে দেখাচ্ছে অপার সমুদ্রের মতন। চন্দ্রকিরণ তার বুক জুড়ে খেলছে যেন লাখো-লাখো হীরা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

এদিকে খানিকটা খোলা জমি। তার এখানে ওখানে অস্বাভাবিক সব

ভঙ্গিতে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে রয়েছে কতগুলো দেহ—কেউ নর, কেউ নারী, কেউ শিশু। তিন-চারদিন আগেও তারা ছিল এই উৎসবময়ী ধরণীর গর্বিত প্রাণী। স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি নিজেদের এমন ভয়ানক পরিণাম।

পাশের বনের ভিতরে উঠছে ঘনঘন হরিধ্বনি। শবযাত্রীরা যাচ্ছে শ্মশানের দিকে।

হঠাৎ সনাতন আঁতকে উঠে বললে, 'বাবু!'

দীপক ফিরে বললে, 'কি রে সনাতন?'

সনাতন ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।'

—'মড়া জ্যান্ত হয়েছে কি রে?'

—'ঐ দেখুন, ঐ দেখুন।' সে সেই খোলা জমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

ফিরে দেখে সকলেরই বুক শিউরে উঠল।

জমির উপরে যে মৃতদেহগুলো ছিল, তাদের একটা শুয়ে শুয়েই অগ্রসর হচ্ছে।

সুরমা ভয়ে চোখ মুদে ফেললে।

সনাতন বললে, 'পালিয়ে আসুন বাবু, পালিয়ে আসুন। মড়াটাকে দানোয় পেয়েছে।'

খুব তীক্ষ্ণ চোখে জ্বলন্ত মূর্তিটাকে দেখে দীপক বললে, 'ধেৎ! অসম্ভব কখনো সম্ভব হয়? ওটা কুমীর।'

—'কুমীর?'

—হাঁ, এখানে এসেছিল মড়ার লোভে। আমাদের দেখে জলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই আমরা ভূত দেখি।'

পাঁচ

অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে সুরমা বললে, 'জল, জল।'

সুরেশ বললে, সুরো জল যখন নেই তখন 'জল জল' করে মিছে কেঁদে কেন আমাদের কষ্ট দিচ্ছিস?'

—'জল জল করছি কি সাধে দাদা? আমি যে আর পারছি না!'

দীপক বললে, 'ভয় নেই সুরমা, পথের আর মাইল তিন বাকী।'

—'মাগো, সে যে অনেক দূর।'

কেউ আর কিছু বললে না।

কিছু দূরে দেখা গেল দু'টো লণ্ঠনের আলো। জন মানুষকেও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

দীপক বললে, 'ওখানে একটা শ্মশান আছে।'

সুরেশ বললে, 'একটা কথা মনে হচ্ছে। যারা শ্মশানে এসেছে তারা এখানকার পানীয় জলের অভাবের কথা নিশ্চয়ই জানে। ওরা কি সঙ্গে পানীয় জল আনেনি!'

—'আনা তো উচিত।'

—'সুরমার অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। একবার জলের খোঁজে ওদের কাছে যাব নাকি?'

—'চল।'

সকলে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হল।

যখন তারা শ্মশানে এসে উপস্থিত হল তখন কয়েকজন লোক চিতায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। তারা তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

চিতা জ্বলল। আগুনের রক্ত শিখা ক্রমেই উঠতে লাগল উপর দিকে।

হঠাৎ এক অভাবিত কাণ্ড!

প্রথমেই জাগল যন্ত্রণা-বিকৃত নারী কণ্ঠের তীব্র এক আর্তনাদ।

তারপরেই দেখা গেল, চিতার উপরকার কাঠগুলো ঠেলে ফেলে দিয়ে চিতার উপরে বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে উঠল এক শীর্ণ-বিশীর্ণ জীবন্ত নারীমূর্তি—তার পরনের কাপড়, তার এলান চুলে-চুলে দংশন করছে ক্রুদ্ধ সর্পশিশুর মতন অগ্নিশিখারা।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, 'জ্বলে মলুম, পুড়ে মলুম।'

মূর্তি চিতার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। যারা দাহ করতে এসেছিল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলে প্রাণপণে।

সেই ভয়ঙ্করী অগ্নিময়ী মূর্তির চোখ দুটো ঠিকরে পড়ছে। সে দুই হাত বিস্তার করে বেগে দৌড়ে আসতে আসতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জ্বলে মলুম, পুড়ে মলুম। রক্ষা কর, রক্ষা কর!'

দীপক, সুরেশ, সুরমা ও সনাতন দ্রুতপদে না পালিয়ে পারলে না।

ছয়

অনেকদূরে ছুটে এসে তারা থামল।

খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়বার পর দীপক বললে, 'কী কাপুরুষ আমরা। কার ভয়ে পালিয়ে এলুম? জ্যান্ত মানুষ কেউ মারা গেছে ভেবে ভুল করে শ্মশানে নিয়ে আসার কথা তো আগেও শুনেছি। এ-ও নিশ্চয় সেই ব্যাপার!'

সুরেশ বললে, 'আমারও এখন সেই সন্দেহ হচ্ছে। চল, শ্মশানের দিকে আর একবার গিয়ে দেখে আসি।'

সুরমা সভয়ে কেঁদে উঠে বললে, 'ওরে বাবা, আমি পারব না।'

'কে তোকে যেতে বলছে! তুই সনাতনের কাছে বসে থাক।'

কিন্তু তাদের বিফল হয়ে ফিরে আসতে হল। সেই অদ্ভুত মূর্তি একেবারেই অদৃশ্য!

সনাতন মাথা নেড়ে মত জাহির করলে, 'যে মূর্তি দুনিয়ার নয়, তাকে কি আর দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায়?'

অভিশপ্ত মূর্তি

(ক)

রমেশের মতে গরম যখন চরম হইয়া উঠে এবং বিশুদ্ধ বাতাস না পাইয়া প্রাণপাখী 'খাঁচা-ছাড়ি খাঁচা-ছাড়ি' করিতে থাকে, বিকালে তখন গড়ের মাঠের 'কার্জন-পার্কে' গিয়া হাঁ করিয়া হাঁপ ছাড়াই, বাঁচিবার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত এবং সহজ উপায়। অতএব, তারা কয় বন্ধুতে প্রত্যহ এই প্রশস্ত ও সহজ উপায় অবলম্বন করিত।

সেদিনও তারা 'কার্জন-পার্কে' গিয়া জমিয়াছিল।

রমেশ ঘাসের উপরে উড়ানি বিছাইয়া শুইয়াছিল, যোগেশ একটা মৌরির বিড়ি বারংবার নিবিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্রমেই চটিয়া উঠিতেছিল, সুরেশ একমনে একখানা বিলাতী ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেছিল এবং উমেশ সকৌতুকে দূরের এক বেঞ্চের দিকে স্থিরচক্ষে তাকাইয়াছিল ;—সেই বেঞ্চখানার উপরে দু-জোড়া সাহেব-মেম বসিয়াছিল—তার মধ্যে যে সাহেবটি তাকিয়ার মতন মোটা তাঁর মেমটি বাঁখারির মতন রোগা, আর যে সাহেবটি বামনের মতন

বেঁটে তাঁর মেমটি প্রায় জিরাফের মতন ঢ্যাঙা—এমন বিসদৃশ চার-চারটি চেহারা এক জায়গায় দেখিতে পাওয়ার সৌভাগ্য, বড় দুর্লভ!

হঠাৎ পিছন হইতে চেনাগলায় একজন বলিল, 'ওহে, আমি যে তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলুম।'

সবাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখিল, পরেশ। অমনি একসঙ্গে প্রশ্ন হইল, 'কিহে, তুমি না পুরী গিয়েছিলে?' 'কবে ফিরলে হে?' 'জায়গাটি কেমন লাগল?' 'আর কোথাও গিয়েছিল নাকি?'

পরেশ আগে সকলকার মাঝখানে আসিয়া বসিল। তারপর কোঁচানো উড়ানিখানি খুলিয়া সাবধানে কোলের উপর রাখিয়া বলিল, 'ভাই, আমি চতুর্মুখ নই, সুতরাং একসঙ্গে তোমাদের চার-চারটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে একে একে বলছি শোন। হ্যাঁ, আমি পুরী গিয়েছিলুম। আজ সকালে ফিরেছি। জায়গাটা ভালই লাগল—দোষের মধ্যে আমাদের কালো রং সেখানকার জল-হাওয়ায় ঘোরতর হয়ে ওঠে। পুরী থেকে আমি কণারকে গিয়েছিলুম—'

রমেশ চমকাইয়া বলিল, 'অ্যাঃ, কণারকে!'

—'ওকি, কণারকের নামে তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?'

—'না, না ও কিছু নয়, তুমি যা বলছিলে বল!'

—'সে হবে না! আগে বল তুমি চমকালে কেন?'

—'সে অনেক কথা!'

—'তা হোক—বল!'

—'শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে না।'

—'যদি ভাল লাগে আর মাসিকপত্রের ছোট গল্পের মতন চর্বিত-চর্বণ না হয়, তাহলে আমরা উনিশবার জেল-ফেরতা দাগী চোরের কথাও বিশ্বাস করতে রাজী আছি!'

—'কিন্তু—কিন্তু—'

—'কিন্তু তুমি বড় বেশী ল্যাজ খেলছ রমেশ!'

অগত্যা বাধ্য হইয়া রমেশ তার কথা শুরু করিল :—

(খ)

অনেকদিন আগেকার কথা ; আমরা কয় বন্ধুতে কণারক দেখতে গিয়েছিলুম। কণারকের মন্দিরের কথা তোমরা অনেকেই জান, সুতরাং আমি আর মন্দিরের কথা বলতে চেষ্টা করব না।

কণারকের আশেপাশে মাঝে-মাঝে দু-চারখানি ছোটখাট গাঁ আছে ; এ-সব গাঁয়ে লোকজন খুব কম, যারা থাকে তারা হচ্ছে চাষাভূষো ও গয়লা শ্রেণীর।

কণারক দেখতে যেদিন আমাদের আসবার কথা, সেইদিন বৈকালে আমরা অমনি একখানি গাঁয়ের ধার দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিলুম।

কৌতূহলী চোখে এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে আসছি, হঠাৎ একটা গাছতলায় পুতুলের মতন কি-একটা নজরে ঠেকল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই এক পাথরের মূর্তি—তার নীচের দিকটা বালিতে পুঁতে গিয়েছে।

মূর্তিটি রমণীয়—গড়ন দেখে মনে হল কণারকের সেকেলে শিল্পীদের কেউ এটিকে গড়েছে! কেননা তেমন রূপে-ভরা দেহ, হাসি-ভরা মুখ, ভাবে-ভরা চোখ বড় যে-সে কারিগরের কল্পনায় সম্ভব নয়,—উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্পের এটি একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

এ-হেন মূর্তি এখানে অযত্নে পড়ে আছে কেন, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাই ভাবছি, এমন সময়ে দেখি 'অসুছন্তি ব্রজবাসী' বলে গান গাইতে-গাইতে, পাশ দিয়েই একজন গাঁয়ের লোক যাচ্ছে।

তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁরে, এ পুতুলটা এখানে পড়ে আছে কেন?'

উড়িষ্যা-ভাষায় সে যা বললে তার মর্ম বুঝলুম এই যে, গাঁয়ের মধুসূদন শ্রীচন্দনের বাড়িতে এ-মূর্তিটি আগে ছিল, কিন্তু সে মরে যাবার পর তার ছেলেরা এটাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।

—'ফেলে দিয়ে গেছে কেন রে?'

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে লোকটি বললে, 'কেন যে সে তা জানে না।' তার মুখ দেখে মনে হল, সে যেন কি লুকোচ্ছে।'

—'আচ্ছা, তু এই পুতুলের গা থেকে বালিগুলো সরিয়ে ফেল দেখি! বখশীষ পাবি।

লোকটা কেমন শিউরে উঠে তিনহাত পিছিয়ে গেল। তারপর দংশনোদ্যত সাপের দিকে লোকে যেমন করে তাকায় তেমনি ভীরু চোখে মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললে, 'সে পারবে না।'

খামকা লোকটা আঁৎকে উঠল কেন? মূর্তিটির দিকে তার পাষাণ নয়ন তুলে সে যেন করুণ হাসি হাসছে ; আপনার নীরব ভাষায় যেন বলছে, 'আমাকে উদ্ধার কর—এই আসন্ন সমাধি থেকে আমাকে উদ্ধার কর।'

লোভে আমার মনটা ভরে গেল। অপূর্ব শিল্পের এই উজ্জ্বল রত্নটিকে যদি কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার বাড়ি আলো হয়ে উঠবে।

ফিরে দেখি, পিছনে সে লোকটা আর নেই, হনহন করে তাড়াতাড়ি সে গাঁয়ের দিকে চলে যাচ্ছে।

বন্ধুরাও আমাকে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন, চেঁচিয়ে ডাকতে সবাই ফের ফিরে এলেন।

সকলে মিলে বালি সরিয়ে মূর্তিটাকে আবার টেনে তুললুম। সেটি একটি নর্তকীর নগ্নমূর্তি ; এতক্ষণ তার আধখানা বালির ভিতরে ঢাকা ছিল বলে তার অপরূপ রূপ ভাল করে বুঝতে পারিনি, এখন তার সবটা দেখতে পেয়ে আমাদের চোখে যেন তাক লেগে গেল। কী সুন্দর তার দাঁড়াবার ভঙ্গী, কী অপূর্ব তার হাত-পায়ের শ্রী-চাঁদ! আর পাথরের মূর্তি যে এতটা জীবন্ত হতে পারে, আমি তা জানতুম না ; মনে হল, শিল্পী আর একটু চেষ্টা করলেই এর মৌনব্রত ভঙ্গ হয়ে যেত!

ভেবেছিলুম মূর্তিটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে গেলে, গাঁয়ের লোকে নিশ্চয়ই উড়িয়া-ভাষায় যৎপরোনাস্তি রুদ্ররস প্রকাশ করবে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কেউ টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করলে না।

(গ)

সন্ধ্যার পর আমরা কণারকের কালো দেউলের কালো ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে, সীমাহীন বালুকা-সাগরের তীরে এসে দাঁড়ালুম।

আমরা চারখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করেছিলুম। অন্য তিনখানা গাড়িতে দু-জন করে লোক উঠল, কিন্তু আমায় গাড়িতে সেই মূর্তিটি ছিল বলে আমি ছাড়া আর কারুর জায়গা হল না।

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ঘুমন্ত সেই অনন্ত বালু-প্রান্তরকে চাকার শব্দে জাগ্রত করে, গরুর গাড়িগুলো ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে চলতে লাগল। উপরে আকাশ, নীচে সেই ধূ-ধূ মরুভূমি—চারিদিকে আর কিছুই নেই—না গ্রাম, না মানুষ, না গাছপালা!

সারাদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে দেহ-মন যেমন এলিয়ে পড়েছিল—আস্তে আস্তে গাড়ির ভিতরে দেহটাকে ছড়িয়ে দিলুম ; আর আমার পাশেই নর্তকীর সেই পাষাণ মূর্তিটি স্তব্ধ মৃতদেহের মতন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল।...

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম...সেই পাষাণী নর্তকী যেন প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। টানা টানা বিদ্যুৎভরা চোখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে, কুন্দদন্তে অধর চেপে সে ফিক্ করে হেসে ফেললে, তারপর সামনের দিকে ধীরে ধীরে তার দু-হাত বাড়িয়ে দিলে—আমাকে ধরবার জন্যে!

সেই জীবন্ত পাষাণীর স্পর্শ থেকে তাড়াতাড়ি যেমন সরে আসতে যাব অমনি চট করে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ কচলে উঠে বসে দেখি, পাথরের প্রতিমূর্তিটা গাড়ির ভিতরে পাতলা অন্ধকারে আবছায়ার মতন দেখা যাচ্ছে ; হঠাৎ দেখলে মনে হয় সে মূর্তি যেন এক ঘুমন্ত মানুষের। বাইরে মরার মতন হলদে আধখানা চাঁদ একরাশ এলোমেলো কালো মেঘের উপরে স্তম্ভিত হয়ে আছে। গভীর রাত্রি অত্যন্ত স্তব্ধ—কেবল খুব দূর থেকে চিরজাগ্রত সমুদ্রের অশ্রান্ত হাহাকার বাতাসের ঠাণ্ডা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ভেসে-ভেসে আসছে!

হঠাৎ আমার কানে একটা শব্দ গেল! গাড়ির ভিতরে কে ফোঁশ করে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। প্রথমে ভাবলুম, আমার ভ্রম! কিন্তু তারপর ভাল করে শুনে বুঝলুম—না, ভ্রম নয়, ভিতর থেকে নিশ্চয় কারুর নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে!

গাড়োয়ান ছোঁড়াটা তখন নেমে গাড়ির আগে আগে হেঁটে চলছিল।

প্রতিমূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে তেমনি স্থির ভাবে পড়ে আছে।—

ঝাঁ-করে মনে হল, কণারকের সেই গেঁয়ো লোকটার রহস্যপূর্ণ আচরণ। বকশিসের লোভেও সে এই মূর্তিটার গায়ে হাত দিতে রাজী হয়নি।....এ মূর্তিটাকে নিয়ে কিছু গোলমাল আছে নাকি? নইলে, দেখতে যাকে এত সুশ্রী, তাকে গাছতলায় অমন করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কেন?

নিঃশ্বাস তখনো উঠছে পড়ছে! শুধু তাই নয়—গাড়ির ভিতরে বিছানার তলায় খড় বিছানো ছিল—সেই খড়গুলো হঠাৎ খড়্ খড়্ করে উঠল—কে যেন এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরে শুল।

আমি ভূত মানি না। কিন্তু তবু কেন জানি না আমার বুকের কাছটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করে উঠল। গাড়ির ভিতর পানে চাইতে আর ভরসা হল না—খালি মনে হতে লাগল, যেন কার দু-দুটো পাথুরে চোখের থম্‌থমে চাহনি ধারালো ছুরির কন্‌কনে ফলার মতন ক্রমাগত আমার পিঠের উপরে এসে বিঁধছে আর বিঁধছে। শেষটা এমনি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল যে, আমি আর কিছুতেই সেখানে তিষ্ঠতে পারলুম না,—এক লাফে সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে অন্য এক গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। সেখানে আমার দুই বন্ধু শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন ; গুঁতোগুঁতি করে কোনগতিকে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলুম।

ভোর হল। প্রান্তর তখনো শেষ হয়নি।

নিজের গাড়িতে ফিরে আসতেই দেখি, আমার বিছানার উপরে একটা কুকুরছানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে!

কান ধরে সেটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিলুম। ছানাটা কেঁউ-কেঁউ করে উঠতেই গারোয়ান-ছোঁড়া ছুটে এল। বললে, 'বাবু, মের না, মের না, ও আমার কুকুর!'

'তোর কুকুর!'

—'হ্যাঁ বাবু, ওর মা মরে গেছে—তাই ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িতেই থাকে।'

বুঝলুম, গেল রাত্রে গাড়িতে কার নিঃশ্বাস শুনেছিলুম! কিন্তু, তবু—

(ঘ)

কলকাতায় এসে নর্তকীর সেই প্রতিমূর্তিটিকে আমার বাইরের ঘরের একটি ছোট টেবিলের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

আমার স্ত্রী তাকে দেখবার জন্যে একদিন বাইরের ঘরে নেমে এলেন। অনেক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভঙ্গিভরে ব্যঙ্গ করে তার দিকে চেয়ে বললে,—'কালামুখীর দাঁড়াবার আর ঢং দ্যাখ না—দি ঠাস করে গালে এক চাপড়।' রমা মূর্তির গালে সকৌতুকে একটি চড় বসিয়ে দিলে।

—কিন্তু সেইসঙ্গেই সে আর্তনাদ করে দু পা পিছিয়ে গেল! আমি অবাক হয়ে দেখলুম, তার মুখ একেবারে পাঙ্গাশ হয়ে গেছে!

—'কি হল রমা, অমন করে উঠলে কেন?'

—'আমার হাত ও কামড়ে দিয়েছে।'

—'কামড়ে দিয়েছে! ক্ষেপে গেলে নাকি?'

—'ওকে চড় মারতেই ও-যেন আমাকে কটাস করে কামড়ে দিলে! বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, হাত দিয়ে আমার রক্ত পড়ছে!'

তাই ত, রমার হাত দিয়ে সত্যিই রক্ত গড়াচ্ছে যে! হতভম্বের মতন মূর্তির দিকে চাইলুম—কিন্তু তখনি বুঝতে পারলুম আসল ব্যাপারটা কি! নর্তকীর নাকের ডগাটি শিল্পী অত্যন্ত সূক্ষ্ম করে ক্ষুদেছে, রমার হাত তার উপর গিয়ে পড়াতেই আঁচড়ে গেছে আর কি।'

কিন্তু রমা বিশ্বাস করলে না। আমার মুখে সে আগেই শুনেছিল, এ মূর্তিকে আমি কি করে কেমন অবস্থায় পেয়েছিলুম। সে বললে, 'একে যখন লোকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, তখন এ আপদকে ঘাড়ে করে বয়ে তোমার বাড়িতে আনবার কি দরকার ছিল?'

স্ত্রীলোকের কী কুসংস্কার! আমি হেসে বললুম, 'যাও, যাও, আর পাগলামি করতে হবে না—হাতে জল দাও-গে যাও!'

ভয়ে-ভয়ে নর্তকীর দিকে তাকাতে তাকাতে রমা ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেল।

আমিও কিন্তু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নর্তকীর দিকে চেয়ে রইলুম। রূপের-গরবে-ভরা হাসিমুখে, আমার দিকে দুখানি নিটোল বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—যেন কার অভিশাপেই সে আজ নিশ্চল পাষাণে পরিণত হয়ে নিস্তব্ধ, নইলে ঐ মুখের কলহাস্যরোলে এবং ঐ চরণের রুণু-ঝুণু নূপুরনিক্কণে এখনি আমার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত!

(ঙ)

বিনোদকে তোমরা সকলেই জান বোধহয়। এখন তার যে ভয়ানক দশা হয়েছে, তার জন্য দায়ী কে জান? নর্তকীর ঐ প্রতিমূর্তিটা। বিনোদ যদি ঐ নর্তকীর প্রতিমা না দেখত, তাহলে ভাল আঁকিয়ে বলে দেশ-বিদেশে আজ তার নাম ছড়িয়ে পড়ত—সে একজন মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠত।...বিনোদের শোচনীয় পরিণাম তোমাদের কারুর অজ্ঞাত নেই, কিন্তু তার আসল কারণ খালি আমিই জানি।

বিনোদ কলকাতায় থাকত না। কলকাতায় যখন আসত তখন আমার বাড়িতেই এসে উঠত। আমি ছিলুম তার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

সেবারে কলকাতায় এসে দেবদাসীর এই মূর্তিটা দেখে, সে আনন্দে একেবারে বিভোর হয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'রমেশ, এ যে অমূল্য রত্ন! বন্ধু, তুমি লাখ টাকা পেলেও আজ আমি এত খুসী হতুম না!' বিনোদ কাছে দূরে আশপাশ সুমুখ ও পিছন থেকে নানারকমে ঘুরে-ফিরে প্রতিমূর্তিটা দেখলে। তারপর তার গায়ের পরে আপনার হাত রেখে আবার বললে, 'এ সেই অতীতের বিশ্বকর্মার গভীর সাধনার ফল, এ যুগের সাধ্য কি এমন প্রতিমা গড়তে পারে: দেখ বন্ধু, এক পাষাণ-দেহে কি অপূর্ব সুষমা, হাত-পায়ের কি বিচিত্র ভঙ্গিমা!....আমি যদি সম্রাট হতুম আর এ যদি মানুষ হত, এর একটি চাহনির জন্যে আমি সাম্রাজ্য বিকিয়ে দিতুম! হায়, এ হচ্ছে পাষাণী—একে ভালবাসলেও প্রতিদানে আমি কিছুই পাব না! তবু দেখ, এ পাষাণও শিল্পীর হাতের মায়াস্পর্শ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যেন এই কঠিন পাথরের আড়ালে আড়ালে প্রাণের লুকানো ধারা চুপি-চুপি বয়ে যাচ্ছে—হাত দিলে যেন হাতে তার উত্তাপ পাওয়া যায়।'—

এই বলে বিনোদ সেই প্রতিমার গায়ে হাত দিলে—কিন্তু পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের হাতের মতন হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইল।'

আচমকা তার এই ভাবান্তর দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কিহে, ব্যাপার কি?'

বিনোদের মুখের দিকে খানিকক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর একবার সেই মূর্তির দিকে, আর একবার আমার দিকে ফ্যালফেলে চোখে চেয়ে আমতা-আমতা করে বললে, 'এ কি সত্যি?'

—'কি সত্যি হে?'

—'দেখ রমেশ, এই মূর্তির গায়ে যেমনি হাত রাখলুম অমনি আমার কি মনে হল জান? মনে হল ওর দেহের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা দুপদুপিয়ে নেচে উঠল!'

আমি উচ্চস্বরে হেসে বললুম, 'মূর্তিটা দেখে তোমার এত আনন্দ হয়েছে যে তুমি একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসে আছ!'

বিনোদ প্রতিমার গায়ে আবার হাত দিয়ে একটু হেসে বললে, 'তাই বটে—আমারই ভ্রম। কৈ, এখন তো আর তা মনে হচ্ছে না—এ দেহ এখন স্তব্ধ, স্থির, মৃত্যুর মতন শীতল! তারপর থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললে, 'হায়রে, পাষাণকে কি বাঁচানো যায়! তা যদি পারতুম, তাহলে আমরা,—শিল্পীরা, আজ শত শত নিখুঁত আদর্শ মানুষ গড়ে সমস্ত সংসারকে সুন্দর করে তুলতুম!'

(চ)

আমার একটি বদ অভ্যাস আছে। রাত অন্তত দেড়টা-দুটো না বাজলে সহজে আমার ঘুম হয় না। প্রথম রাতটা আমি বই-টই পড়ে কাটিয়ে দিই।

সে রাত্রে যখন পড়া সাঙ্গ করে উঠলুম, ঘড়িতে তখন দুটো বাজতে দশ মিনিট। আলো নিবিয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পেলুম।

এত রাতে জেগে কে? একটু আশ্চর্য হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিনোদ! বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সে অস্থিরভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সে রাত্রে গরমটা পড়েছিল কিছু অতিরিক্ত ; ভাবলুম, গরমে বোধহয় তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই সে বাইরে বাতাস পাবার জন্যে বেরিয়ে এসেছে। এই ঠিক করে তাকে আর না-ডেকেই আমি শুয়ে পড়লুম।....

পরদিন সকাল বেলায় বিনোদের সঙ্গে যখন দেখা হল, বললুম, 'কিহে, কাল ভাল করে ঘুম হয়নি বুঝি?'

সে বিস্মিত স্বরে বললে, 'তুমি জানলে কি করে?'

আমি বললুম, 'কাল রাত দুটোর সময় তুমি যখন বারান্দায় এসেছিলে আমি তখন জেগেছিলুম।'

বিনোদ আমার কাছে সরে এসে খুব মৃদুস্বরে বললে, 'ভাই, কাল এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।'

—'কি-রকম?'

—'নর্তকীর মূর্তিটার একটা নকল তুলতে তুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম জানো? দেখলুম, প্রতিমা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠলো—যদিও তার দেহ যেমন ছিল তেমনি পাথরেরই রইল। এক-পা এক-পা করে আমার কাছে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে সে বললে, 'তোমার কথা আমি শুনেছি, তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও, না?' আমি বললুম, হ্যাঁ'।

—'তাহলে আমিও তোমাকে ভালবাসব, আর কখনও ছাড়ব না'—এই বলে সে আমাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করলে! তার সেই শক্ত পাথরের হাতের চাপে আমার দম যেন আটকে আসতে লাগল। আমি জোর করে যেমন তার হাত ছাড়াতে যাব অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর কিছুতেই আর ঘুম আসে না। সেই বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নের কথা কোনমতেই আর ভুলতে পারলুম না—সেটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে মাথাটা এমনি গরম হয়ে উঠল যে শেষটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। কাল সারারাত অনিদ্রায় কেটেছে।'

কণারকের প্রান্তরে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলুম, সেটাও অনেকটা এই ধরনের। আমার বুক কি-এক বিপদভয়ে গুরগুর করে উঠল। তবে কি সত্যসত্যই এ মূর্তিটার ভিতরে অস্বাভাবিক কিছু আছে? একটু উত্তেজিত স্বরে বললুম, 'বিনোদ, ও ঘরে আর তুমি শুয়ো না।'

আমার স্বরে চমকে উঠে বিনোদ বললে, 'কেন বল দেখি?'

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'তুমি ও মূর্তিটার কথা বড় বেশী ভাবছ। হয়ত আজও তুমি ওকে আবার স্বপ্নে দেখবে।'

বিনোদ হাসতে হাসতে বললে, 'দেখলুমই-বা, তাতে হয়েছে কি!—স্বপ্ন ত সত্য নয়!'

তাকে আমি আর কখনও হাসতে দেখিনি, সেই হাসিই তার শেষ হাসি।

(ছ)

তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি—যে রাত্রির কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

সে রাত্রেও আমি টেবিলের সামনে বসে একখানা বই পড়ছিলুম। রাত তখন একটার কাছাকাছি। চারিদিকে স্তব্ধতা যেন থমথম করছে।

কোথাও কিছু নেই,—হঠাৎ একটা ভারি জিনিষ-পড়ার শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক এক আর্তনাদ!—সে কী চিৎকার,—চারিদিকের গভীর নীরবতার মধ্যে সে আর্তনাদ যে আকুলভাবে ঝাঁপ দিয়ে কোথাও থৈ না পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডুবে গেল!

একলাফে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম।

আমার স্ত্রীও ধড়মড়িয়ে জেগে, বিছানায় উঠে বসে সভয়ে বললে, 'ও কী গো, ও কী!'

আবার আর্তনাদ! এবার তত জোরে নয়—কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাভরা! এ যে বিনোদের স্বর!

আমি আর দাঁড়ালুম না, ঝড়ের মতন বেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে গেলুম।

বাইরের ঘরের দরজা ঠেলতেই দড়াম করে খুলে গেল, ভিতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার—মনে হল, সে অন্ধকার হা করে আমাকে গিলতে আসছে!

শুনলুম সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে অতি কষ্টে গেঁঙিয়ে-গেঁঙিয়ে বিনোদ বলছে, 'ছাড়, ছাড়,—ওরে পিশাচী, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—ছে—' আর কথা বেরুল না,—কেউ যেন তাকে এত জোরে চেপে ধরলে, যে তার স্বর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

তোমরা বুঝবে না—সে যে কি এক মহা ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ নেতিয়ে পড়ল। পারলে, তখনি আমি ছুটে পালাতুম—কিন্তু সে শক্তিও আমার ছিল না। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে মাটির উপরে আমি দু-হাতে ভর দিয়ে বসে পড়লুম! অন্ধকার ঘরের ভিতরে কেমন একটা অস্পষ্ট ঝটপটানি শব্দ হতে লাগল—কেউ যেন কারুর সঙ্গে বোঝাবুঝি করছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুক্তিলাভ করতে পারছে না!.....ক্রমে ক্রমে সেই ঝটপটানি শব্দটা থেমে এল—তারপর, সব চুপচাপ! আর একটু তেমনভাবে থাকলেই আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতুম কিন্তু বাড়ির যে যেখানে ছিল সবাই জেগে উঠে হৈ-চৈ করতে-করতে সে ঘরে ছুটে এল, আলো দেখে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।.....

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, নর্তকীর সেই প্রতিমূর্তিটা টেবিলের উপর থেকে মাটিতে উপুড় হয়ে সটান পড়ে আছে, আর তারই তলায় বিনোদের মৃতদেহ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে!

সবাই মিলে ধরাধরি করে পাথরের সেই ভারি মূর্তিটি বিনোদের উপর থেকে তুলে ফেললুম। বিনোদের বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, সে বেঁচে আছে।

তখনি ডাক্তার ডেকে আনা হল।

সেই মূর্তির চাপে বিনোদের দেহ আষ্টেপৃষ্ঠ থেঁৎলে গিয়েছিল ; অনেক কষ্টে সে প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। এখন তার কাছে গেলে সে ক্রমাগত বলতে থাকে, পাষাণীর স্পর্শে বুক তার পাষাণ হয়ে গেছে!

(জ)

রমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ শ্রোতারা কেউ কোন কথা কহিল না।

তারপর যোগেশ আপনার নিবন্ত বিড়িতে খুব একটা জোর টান মারিয়া বলিল, 'সে লক্ষ্মীছাড়া মূর্তিটার কি হল?'

রমেশ বললে, 'তাকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেলে দিয়েছি।'

সুরেশ বললে, 'সেটা নিশ্চয়ই ভৌতিক মূর্তি, নইলে—'

রমেশ বাধা দিয়ে বললে, 'না, আমি ভূত মানি না।'

—'তাহলে বিনোদের অমন দশা হল কেন?'

—'মূর্তিটা বোধহয় কোন গতিকে তার ঘাড়ের উপর পড়ে গিয়েছিল। এর-মধ্যে ভৌতিক কি আছে?'

—'তবে সেটাকে ভাঙ্গলে কেন?

—'তারই জন্যে আমার বন্ধুর অমন অবস্থা হল, সেই রাগে।.....কিন্তু মূর্তিটাকে ভাঙ্গবার সময়েও আর এক কাণ্ড ঘটে। চাকররা যখন হাতুড়ি দিয়ে মূর্তিটার উপরে ঘা মারছিল, তখন হঠাৎ তার গা থেকে একখানা ভাঙ্গা পাথর ঠিকরে একটা চাকরের কপালে গিয়ে এমনি জোরে লাগে যে, সে তখনি অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে যায়।'

উমেশ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, 'কি ভয়ানক। তবু তুমি বলতে চাও, এটা ভৌতিক ব্যাপার নয়?'

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না, আমি ভূত মানি না।'

— ইতি —

কলকাতার বিজন দ্বীপে

॥ এক ॥

অনেকেই কলকাতায় অনেককাল থেকেও শহরের অনেক খবরই রাখেন না। ধরুন, এই গঙ্গা নদীর কথা। গঙ্গা যে খালি কলকাতার তেষ্টা মেটায়, তা নয়; বাণিজ্যে কলকাতার লক্ষ্মীলাভের আসল কারণই ওই গঙ্গা! স্নান করতে গিয়ে, বেড়াতে গিয়ে বা পারাপার হতে গিয়ে গঙ্গাকে দেখেনি কলকাতায় এমন লোক নেই। তবু জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে, কলকাতার গঙ্গার বুকেও যে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে দিব্যি একটি ছোট্ট দ্বীপের মতন বালুচর জেগে ওঠে, এ দৃশ্য অনেকেই দেখেননি।

আমার আজকের বন্ধুরা ছিলেন ওই দলে। গঙ্গার ধারেই আমার বাড়ি। সকালে এসেছিলেন তাঁরা আমার বাড়িতে বেড়াতে। গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে চা পান করতে করতে হঠাৎ ওই বালুচর দেখে তাঁরা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বাগবাজারের কাছ থেকে বালুচরটি সমান চলে গিয়েছে বালি ব্রিজের দিকে। চওড়ায় তা বেশি নয় বটে, কিন্তু লম্বায় হবে অন্তত মাইল খানেক। বেশি হতেও পারে।

পরেশের বোন ছন্দা, বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে। পয়লা নম্বরের শহুরে মেয়ে, জন্মে কখনও পল্লীগ্রাম বা ধানের খেত দেখেনি। সবচেয়ে বিস্মিত হল সে। বললে, 'কলকাতা শহরে দ্বীপ! এ কী অদ্ভুত দৃশ্য!'

আমি বললুম, 'কিছুই অদ্ভুত নয়! গঙ্গায় এ সময়ে রোজই দিনে আর রাতে ভাটার সময়ে চড়া পড়ে, আবার জোয়ার এলেই ডুবে যায়!'

পরেশ বললে, 'এ খবর তো জানা ছিল না!'

নবীন বললে, 'আমরা বালিগঞ্জবাসী জীব, পাশের বাড়ির খবর রাখি না, বাগবাজারের গঙ্গা তো আমাদের পক্ষে দস্তুরমতো বিদেশি নদী, ম্যাপ দেখে তার অস্তিত্বের খবর পাই!'

ছন্দা বিপুল পুলকে নেচে উঠে বলল, 'ওখানে যাওয়া যায় না বড়দা?'—সে আমাকে 'বড়দা' বলে ডাকত।'

বললুম, 'খুব সহজেই। একখানা মাত্র পানসির দরকার!'

পরেশ সোৎসাহে বললে, 'ডাকো, তাহলে একখানা পানসি! আমরা ভারতের প্রধান নগর কলকাতার মাঝখানেই দ্বীপভ্রমণ করব!'

নবীন বললে, 'তারপর ভ্রমণকাহিনি লিখে মাসিকপত্রে প্রকাশ করব!'

আমি বললুম, 'সাধু!'

ঠাট্টা করে বললুম বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারিনি যে, আমাদের এই ভ্রমণটা সত্য-সত্যই একটি চমকপ্রদ অসাধারণ কাহিনি হয়ে দাঁড়াবে!

॥ দুই ॥

গঙ্গার চড়ায় গিয়ে লাগল আমাদের পানসি।

চরের এক জায়গায় খানকয় বড়ো বড়ো নৌকা বাঁধা। অনেকগুলো কুলি চর থেকে ঝুড়ি করে বালি তুলে নৌকোয় গিয়ে বোঝাই করে আসছে। গঙ্গার একপারে কলকাতার অগণ্য বাড়ির থাক সাজানো রয়েছে এবং আর একপারে গাছের সার, চিমনিওয়ালা কলকারখানা ও মন্দির প্রভৃতি। উত্তর দিকে বালির রাঙা সাঁকো এবং তারই একমুখে দক্ষিণেশ্বরের কালি-মন্দির ও আর একমুখে বেলুড়ের নতুন মঠের গম্বুজ।

চরের যে-দিকটা নির্জন আমরা সেইদিকে গিয়ে নামলুম।

বাতাসে কালো চুল ও বেগুনি শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ছন্দা মহা আনন্দে ভিজে বালির ওপরে ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

নবীন এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, 'চরটাকে ডাঙা থেকেই ভালো দেখাচ্ছিল। এখানে তো ভ্রমণকাহিনি লেখবার কোনও রঙিন মালমশলাই চোখে পড়ছে না! ওখানে বালি বোঝাই নৌকো, চরের চারপাশে গঙ্গার ঘোলা জল আর জেলেডিঙি, মাথায় ওপরে উড়ছে কতকগুলো গাংচিল—ধেৎ, এই নিয়ে কি ভ্রমণকাহিনি রচনা করা যায়?'

পরেশ বললে, 'রাখো তোমার ভ্রমণকাহিনি! জীবনে যা দেখিনি, আজ সশরীরে সেই দ্বীপে আরোহণ করলুম, এইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা! এ ঠাঁইটিকে আমরা যদি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সুমাত্রা কি সিংহলের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করি, তাহলে কার সাধ্য প্রতিবাদ করে?'

এমন সময়ে খানিক তফাত থেকে ছন্দা চেঁচিয়ে ডাক দিল, 'বড়দা, একবার এদিকে এসে দ্যাখো তো এগুলো কীসের দাগ!'

তার কাছে গিয়ে দেখি, বালির ওপরে হেঁট হয়ে পড়ে অত্যন্ত কৌতূহলে কীসের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে।

বালির ওপরে অনেকগুলো অদ্ভুত চিহ্ন!

পরেশ দেখে বললে, 'পায়ের দাগ!'

আমি বললুম, 'কিন্তু কোন জীবের পায়ের দাগ? আমরা কেউ পদচিহ্নবিশারদ না হয়েও বলতে পারি, এ দাগগুলো কোনও চতুষ্পদ জীবের পায়ের দাগ নয়! এগুলো যার পায়ের দাগ, সে দুই পায়ে হাঁটে। মানুষ দুই পায়ে হাঁটে, কিন্তু এগুলো মানুষের পায়ের দাগ নয়। পাখি দুই পায়ে হাঁটতে পারে বটে, কিন্তু কোনও পাখির পায়ের দাগই এত বড়ো বা এরকম দেখতে হয় না। এমন বড়ো যার পা, তার দেহও না জানি কত প্রকাণ্ড। দেখছ পরেশ, এর পায়ে মস্ত মস্ত নখও আছে? কী ভয়ানক! যে এমন পায়ের অধিকারী তার চেহারা দেখলে পেটের পিলে হয়তো চমকে যাবে!'

নবীন চোখ পাকিয়ে বললে, 'দুই সার পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। গঙ্গা থেকে কোনও জীব উঠে চরের ওপরে এসে আবার জলে ফিরে গিয়েছে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু কোনও জলচর জীবই দুই পায়ে ভর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে পারে না! কুমির ডাঙায় ওঠে, তার পায়েরও অভাব নেই—কিন্তু চারখানা পা।'

পরেশ এক কথায় সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তাহলে এগুলো পায়ের দাগের মতন দেখতে বটে, কিন্তু পায়ের দাগই নয়!'

নবীনও সায় দিয়ে বললে, 'সেই ঠিক কথা! গঙ্গার স্রোতের তোড়ে বালির ওপরে এই অদ্ভুত দাগগুলো হয়েছে!'

আমিও তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলুম না। এগুলো কোনও জীবের পায়ের দাগ হলে তাকে সৃষ্টিছাড়া আজগুবি জীব বলেই মানতে হয় এবং তেমন উদ্ভট জীব কলকাতার গঙ্গার চরে আসবে কেমন করে? এলেও খবরের কাগজের সর্বদর্শী রিপোর্টারদের চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারত না, অন্তত বাগবাজারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সর্বাগ্রেই তাকে আবিষ্কার করে ফেলত!'

যার আবদারে আমরা এই চিহ্নগুলি পরিদর্শন করতে এদিকে এসেছি, সেই ছন্দা কিন্তু এতক্ষণ আমাদের কাছে ছিল না, সে কখন সরে পড়ে দূরে গিয়ে চরের ওপরে বসে শিশুর মতো বালির ঘর তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল!

কড়া রোদে ঘেমে উঠে ছন্দাকে ডেকে আমরা আবার পানসির দিকে ফিরে চললুম।

ছন্দা এসে বললে, 'আমার ভারী ভালো লাগছে। এক্ষুনি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'আর থাকার উপায় নেই। একটু পরেই জোয়ার আসবে, চর ডুবে যাবে।'

ছন্দা একটু ভেবে বললে, 'আচ্ছা, বড়দা, রাতে আবার এই দ্বীপটা জেগে উঠবে তো?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টা চারেকের জন্যে।'

আজ তো পূর্ণিমে? সন্ধেবেলাতেই চাঁদ উঠবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আজ সন্ধেবেলায় এখানে সকলের নিমন্ত্রণ রইল। আমি চড়িভাতি করে তোমাদের সবাইকে খাওয়াব।'

পরেশ একটু ইতস্তত করে বললে, 'কিন্তু সে যে অনেক তোড়জোড়ের ব্যাপার! দরকার নেই ছন্দা!'

প্রস্তাবটায় নতুনত্ব আছে। আমি রাজি হয়ে গেলুম।

'তোড়জোড়ের জন্যে তোমাদের কারুকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না দাদা। আমি সব গোছগাছ করব, তোমরা খালি দয়া করে দুটো খেয়ে উপকার কোরো।'

এর পরেও আপত্তি করা অভদ্রতা, এবং পরেশ সেই অভদ্রতাই করলে। বললে, 'তুমি

যা মেয়ে, তা জানি। আবার জোয়ার না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়তেই চাইবে না! অতক্ষণ এই ভিজে বালির ওপরে বসে থাকলে অসুখ করবে। অতটা কবিত্ব আমার নেই।'

ছন্দা রেগে বললে, 'দাদা, গেল-জন্মে তুমি মাড়োয়ারি ছিলে, তোমার একটুও imagination নেই! বেশ, আমাদের জন্যে চারখানা ফোল্ডিং চেয়ারও আসবে, কারুকেই ভিজে বালিতে বসতে হবে না!...বড়দা, পানসিখানা আজ সন্ধে থেকে ভাড়া করে রেখো। প্রথমে চড়িভাতির ভোজ, তারপর চন্দ্রালোকে নৌকোয় করে গঙ্গায় ভ্রমণ,—ওঃ, ওয়ান্ডারফুল!'

॥ তিন ॥

ছন্দা, পরেশ ও নবীন নৌকোর ঘরের ভেতরে গিয়ে বসল, আমি গেলুম বুড়ো মাঝির কাছে।

'ওহে মাঝি, আজ সন্ধের সময়ে তোমার নৌকো নিয়ে আমরা আবার এই চরে আসব। তুমি ঘাটে তৈরি থেকো।'

'সন্ধের সময়? ওই চরে? কতক্ষণ থাকবেন?'

'যতক্ষণ জোয়ার না আসে।'

মাঝি চুপ করে রইল।

'কী হে, কথা কও না যে?'

মাঝি খুব মৃদুস্বরে বলল, 'সন্ধের পরে ওই চরে কেউ থাকে না। জায়গাটার বদনাম আছে।'

'বদনাম! কীসের বদনাম!'

অল্পক্ষণ ইতস্তত করে মাঝি বললে, 'কীসের বদনাম জানি না বাবু। আমাদের বুদ্ধু ওখানে হারিয়ে গিয়েছিল।'

'কেমন করে? ওখানে তো হারিয়ে যাওয়ার উপায় নেই?'

'তা নেই? কিন্তু বুদ্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে সে জলে ডুবে গিয়েছিল।'

'হতেও পারে, না হতেও পারে। ওই চরে আমরা নৌকো বেঁধেছিলুম। অন্ধকার রাত। আমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, হঠাৎ কী দরকার হওয়াতে বুদ্ধু চরে গিয়ে নামল। তারপরেই শুনি সে বিকট চিৎকার করে উঠল। আমরা সবাই আলো-টালো নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু আর বুদ্ধুর সাড়া কি দেখা পাওয়া গেল না! ওই রাক্ষুসে চর যেন তাকে গিলে ফেললে!'

'চর নয়, মাঝি! তাকে গিলে ফেলেছিল এই গঙ্গা!'

'হতেও পারে, না হতেও পারে। তার কিছুকাল পরে আর এক রাতে বদরিও ওই চরে নৌকো বেঁধেছিল। সকালে উঠে দেখে, তাদের দলের একজন লোক নেই। সে যে কোথায় গেল, তা কেউ জানে না...বাবুজি, ও চরের ভারী বদনাম।'

'যত সব মিথ্যে ভয়। গঙ্গায় তো রোজই লোক ডুবছে, চরের দোষ দাও কেন?...তাহলে তোমার নৌকো পাওয়া যাবে না?'

'পাওয়া যাবে না কেন বাবুজি, পয়সার জন্যেই তো নৌকো চালাই। আপনি পয়সা দিচ্ছেন, আমরাও নৌকো আনব। তবে কিনা, জায়গাটার বদনাম আছে!'

নৌকোর ভেতরে আসতে ছন্দা বললে, 'বড়দা, মাঝির সঙ্গে অত কীসের কথা হচ্ছিল?'

'বাজে কথা!'

মিথ্যা তার মনে ভয় জাগানো উচিত নয়। আমার কাছে মাঝির গল্প হাস্যকর বলে মনে হচ্ছিল! তবে একটা ভয় আছে। চরে চোরাবালি নেই তো?

॥ চার ॥

গঙ্গা তখন চাঁদের আলোর সঙ্গে খালি খেলাই করছিল না, গল্পও করছিল কুলুকুলু স্বরে। সেই গল্প যারা বুঝতে পারে তারাই হয় কবি। আমরা কবি নই, আমাদের মন চড়িভাতির কথা ভেবেই সরস হয়ে উঠছে।

তা ছন্দা উদর-তৃপ্তির আয়োজন বড়ো কম করেনি। মাংস হবে, খিচুড়ি হবে, আরও কী কী হবে! ভীম নাগের সন্দেশ, নবীন ময়রার রসগোল্লা, আমের চাটনিও এসেছে এক বোতল। একে চড়িভাতি না বলে রীতিমতো ভোজের আয়োজন বলাই উচিত।

ছন্দা দুটো পেট্রলের লণ্ঠন জ্বাললে, যদিও আজকের পূর্ণিমায় তাদের দরকার ছিল না। তারপর দুটো ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'চলো, এইবারে দ্বীপে খানিকটা ভ্রমণ করে আমরা খিদে বাড়িয়ে আসি!'

নবীন গম্ভীর হয়ে বললে, 'খিদে দ্বিগুণ বাড়লে অতিরিক্ত খাবারের জোগান দেবে কেমন করে? মনে রেখো ছন্দা এখানে কলকাতার খাবারের দোকান নেই, আমরা বাস করছি এক অচেনা বিজন দ্বীপে!'

পরেশ বললে, 'রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপের চেয়েও এ দ্বীপ ভয়ানক। এখানে ফ্রাইডের মতো বিশ্বস্ত ভৃত্যও মিলবে না যে খাবার কিনতে পাঠাব!'

ছন্দা হাত নেড়ে বললে, 'ওগো ক্ষুধার্ত ভদ্রলোকরা, থামো! তোমাদের ভুঁড়ির বহর জানা আছে!...চলো বড়দা!'

আমরা চর ধরে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখে নৌকো থেকে মাঝি সাবধান করে দিলে, 'বেশিদূর যাবেন না বাবু, এটা বেড়াবার জায়গা নয়!'

মাঝির কথার মানে বুঝে আমার হাসির পেলে। এখানে কীসের ভয়? আকাশ ভরে জাগছে চাঁদের মৌন সংগীত, কানে আর প্রাণে জাগছে ঠান্ডা বাতাসের গুঞ্জন এবং বালুচরের কূলে কূলে জাগছে গঙ্গার রচিত কবিতার ছন্দ! এপারে-ওপারে আলোর মালায় মালায় দেখছি যেন দীপাবলির উৎসব!

ছন্দা খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'মাঝিবুড়োর কথা শোনো! এটা বেড়াবার জায়গা নয় তো ঘুমোবার জায়গা নাকি?'

পরেশ বললে, 'আমার কীরকম ঘুম আসছে ছন্দা! ওই কুলুকুলু শব্দ, এই ঝিরঝিরে বাতাস আর এমন ঝিলমিলে জ্যোৎস্না! সবই কেমন স্বপ্নময়!'

আমি বললুম, 'সবই যখন স্বপ্নময় আর সংগীতময়, তখন ছন্দার গলাও আর চুপ করে থাকে কেন? ছন্দা, চলতে চলতে তুমিও রবি ঠাকুরের একটি গান ধরে ফ্যালো।'

ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাতের ওপরে সজোরে ও সশব্দে এক তালি বসিয়ে দিয়ে নবীন বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ, লাখ টাকার এক কথা! এ সময়েও যদি রবি ঠাকুরের গান না হয় তাহলে বৃথাই তিনি সংগীত রচনা করেছেন! গাও ছন্দা!'

ছন্দা আপত্তি করলে না। রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে প্রকৃতির নিজস্ব জিনিসের মতো, তার সঙ্গে আজকের এই জ্যোৎস্নামাখা গঙ্গার কলতান এমনি খাপ খেয়ে গেল।

আমি বললুম, 'চমৎকার ছন্দা, চমৎকার! এখানে মানুষের বীণা-বেণুর সঙ্গত নেই, তুমি যেন তাই গঙ্গার সুরে সুর মিলিয়েই গান ধরেছ!'

ছন্দা খানিকক্ষণ নীরবে কান পেতে গঙ্গার ঢেউয়ের গান শুনলে। তারপর বললে, 'গঙ্গার সুর? যদি তোমরা কেউ এখানে না থাকতে, যদি এই নির্জন চরে একলা বসে বসে আমাকে গঙ্গার এই কল্লোল শুনতে হত, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ভয় পেতুম!'

'ভয় পেতে। সে কী!'

'চেয়ে দ্যাখো না, পূর্ণিমার চাঁদও পৃথিবীকে স্পষ্ট করতে পারেনি, আলোর সঙ্গে যেন আবছায়া মাখানো। কলকাতার বাড়িঘর এত কাছে, কিন্তু এই নির্জন নিরালা বালুচরের সঙ্গে আজ মানুষের কোনও সম্পর্কই আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে না! আজ আমরা যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি! মনে হচ্ছে এই চরের যেন আত্মা আছে, আর মানুষের ছোঁয়া পেয়ে সে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে! গঙ্গার ডাক শুনছ? ও ডাক ছুটে আসছে যেন অতল পাতালের গভীর অন্ধকার থেকে—যেখানে হাসি নেই, আলো নেই, মানুষ নেই; যেখানে পাতা আছে শুধু শীতল মৃত্যুর কঙ্কাল-শয্যা, যেখানে দয়া-মায়া-প্রেমের নাম কেউ শোনেনি! গঙ্গার ও-ডাক কি সংগীত? ও যেন প্রাণদণ্ডের বাণী, ও যেন জীবনের বিরুদ্ধে মানুষের

বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে অভিশাপময় নিষ্ঠুর প্রতিবাদ! মানুষের পক্ষে নিঝুম রাত্রে এখানে একলা থাকা অসম্ভব!'

পরেশ বিরক্ত হয়ে বললে, 'ছন্দা, তুই বড়ো বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে শিখেছিস! তুই যেন আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিস!'

নবীন কিন্তু কোনও কথাই শুনছিল না, নিষ্পলক নেত্রে একদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে চমকে উঠল!

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম, খানিক তফাতেই দুটো উজ্জ্বল লণ্ঠন জ্বলছে আর কুকারে আমাদের খাবার সিদ্ধ হচ্ছে।

'নবীন, কী দেখে তুমি চমকে উঠলে? ওখানে তো দেখে চমকাবার মতো কিছুই নেই!

নবীন অত্যন্ত অস্বাভাবিক স্বরে বললে, 'ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো!'

তীক্ষ্ণ চোখে আবার সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বুক ছম ছম করতে লাগল। ওখানে কিছুই নেই, কিন্তু তবু কিছু যেন আছেও! কী ওটা? ওকে কি শূন্যতার মধ্যে শূন্যতার মূর্তি বলব? না, চাঁদের আলোর মধ্যে ঘনীভূত আলোর মূর্তি? ওকে দেখাও যায় দেখা যায়ও না। যেন নিরাকারের প্রকাণ্ড আকার, কিন্তু ভয়াবহ! পূর্ণিমায় ধবধব করছে বালুচর, কিন্তু পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে যেন আর একটা উজ্জ্বলতর আলোকের ছায়া ফেলে কে সেখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আলোকের মধ্যে আলোকের ছায়া! আমার এই অদ্ভুত ভাষা শুনে লোকে হয়তো হাসবে, কিন্তু যা দেখলুম তা অমানুষিক বলেই মানুষী ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব! ওই অনামা ভয়ংকরের হাত-পা-দেহ বা মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বালির ওপরে কেউ ভারী ভারী পা ফেলে চললে যেমন বালি ছিটকে ছিটকে পড়ে, ওখানেও ঠিক তেমনি হচ্ছে!

তখন পরেশ ও ছন্দাও সেই দৃশ্যমান অদৃশ্যের ভীষণ অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছে, বলে অনুভব করেছে!

ছন্দা আঁতকে বলে উঠল, 'ও কে বড়দা, ও কে? ও যে এগিয়ে যাচ্ছে, কুকারের দিকে!'

পরেশ সর্বপ্রথম সেই অবর্ণনীয় অলৌকিক মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে 'আমরা সবাই কি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছি? বানিয়ে বানিয়ে ভয়ের স্বপ্ন দেখছি? কই ওখানে তো কেউ নেই! এসো আমার সঙ্গে!'

পরেশ দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছে, আচম্বিতে দুটো ইকমিক কুকারই সশব্দে বালির ওপরে কাত হয়ে পড়ে গেল এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার ভেতরের খাবার-ভরা পাত্রগুলো! এবং পরমুহূর্তেই আমাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে, বয়ে গেল একটা ঠান্ডা কনকনে দমকা বাতাসের ঝটকা। ঝটকাটা যেমন হঠাৎ এল, চলে গেল তেমনি হঠাৎ।

পরেশ একবার হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়েই আবার এগুবার উপক্রম করলে!

নৌকোর মাঝি কিছু দেখেছিল কি না জানি না, কিন্তু সে-ও সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবু, বাবু! নৌকোয় চলে আসুন!'

আমি বিহ্বলা ছন্দার হাত ধরে টেনে পানসির দিকে ছুটতে ছুটতে বললুম, 'নবীন! পরেশ শিগগির নৌকোয় চলো!'

॥ পাঁচ ॥

নৌকোয় চড়ে ঘণ্টাখানেক গঙ্গার বুকে ভেসে চললুম। বালুচর তখন চোখের আড়ালে।

সকলেই যে আমরা সেই চরের কথাই ভাবছি তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলেই এমনি অভিভূত হয়েছি যে মুখ যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

পানসি যখন হাওড়ার পুলের কাছে এসে পড়েছে পরেশ তখন বললে, 'আমরা কি কাপুরুষ! রজ্জুতে সর্পভ্রম করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলুম! মাঝি, নৌকো ফেরাও! আমরা আবার সেই চরে যাব!'

মাঝি মাথা নেড়ে বললে, 'তা আর হয় না বাবুজি! যেতে যেতেই জোয়ার এসে পড়বে, চর ডুবে যাবে।'

ছন্দা বললে, 'চরে যা দেখেছি, আমার আর সেখানে যেতে ইচ্ছেও নেই।'

পরেশ উত্তেজিতভাবে বললে, 'চরে কী দেখেছি আমরা? কিছুই না—একটা ছায়া পর্যন্ত না! খানিকটা বাষ্প উড়ে গেলেও বুঝতুম; আমরা তাও দেখিনি! বোকা নবীনটা বাজে কী ধুয়ো তুললে, আর আমরাও সবাই হাউমাউ করে পালিয়ে এলুম! ছি ছি, কী লজ্জা!'

'ইকমিক কুকার দুটো কে ফেলে দিলে?'

'দমকা ঝোড়ো বাতাস! ঝড়ের মতো একটা বাতাসের ঝটকা তো আমাদেরও গায়ে লেগেছিল।'

'বালি উড়িয়ে কে ওখানে চলে বেড়াচ্ছিল?'

'বালি উড়ছিল ওই বাতাসেই!'

'আর সকালের সেই পায়ের দাগগুলো?'

'জানোই তো, সেগুলো পায়ের দাগই নয়, বালির ওপরে স্রোতের দাগ!'

ভাবলুম মাঝির গল্পটা বলি,—ওখানে পরে পরে দু-দুটো মানুষ কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, কেউ জানে না। কিন্তু বলতে গিয়ে বললুম না; কারণ নিশ্চয়ই উত্তরে শুনব, তারা জলে ডুবে মারা পড়েছে!

নবীন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'হায়রে খিচুড়ি, হায়রে ফাউলকারি, হায়রে সন্দেশ-রসগোল্লা, আমের চাটনি! ওগো প্রিয়, তোমাদের পেয়েও হারালুম!'

ছন্দা বললে, 'চলো, চৌরঙ্গির কোনও হোটেলে গিয়ে খাবারের শোক আর পেটের জ্বালা নিবারণ করে আসি গে!'

বন্দি আত্মার কাহিনি

এক

বিখ্যাত 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' অনন্তবাবুর বাড়িতে বসে এক সন্ধ্যায় আলাপ করছিলুম।

কথা হচ্ছিল প্রেততত্ত্ব নিয়ে! আমি ডাক্তার। কিঞ্চিৎ পসারও যে আছে, নিজের মুখে একথা বললে গর্ব করা হবে না।

আত্মা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে, আজ পর্যন্ত হাতে-নাতে এমন প্রমাণ পাইনি। জন্ম, মৃত্যু ও দেহগত সমস্ত রহস্য আমার নখদর্পণে, এমন অভিমান আমার আছে।

কিন্তু অনন্তবাবু আমার সেই অভিমানে আঘাত দিতে চান। তিনি বলেন, জন্ম ও মৃত্যু কথার কথা মাত্র, দেহটা সাময়িক খোলস ছাড়া আর কিছু না, জন্মের আগেও এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা বেঁচে থাকে, ইত্যাদি।

খুব জোরে তর্ক চালিয়েছি। আমিও বুঝব না, অনন্তবাবুও না বুঝিয়ে ছাড়বেন না। তর্কটা যখন রীতিমতো জমে উঠেছে, হঠাৎ রাস্তায় উঠল বিষম গোলমাল। সচমকে মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি, পথের ওপাশের 'ফুটপাথে'র উপরে সুরেনবাবুর বাড়ির সামনে মস্ত ভিড়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম।

'ফুটপাথে'র উপরে হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন সুরেনবাবু নিজেই। তিনি কেবল আমাদের প্রতিবেশী নন, আমাদের দু-জনেরই বিশেষ বন্ধু।

ভিড়ের একজন লোক জিজ্ঞাসার উত্তরে বললে, 'উনি বারান্দার উপর থেকে পড়ে গিয়েছেন।'

আমরা ধরাধরি করে সুরেনবাবুকে নিয়ে তাঁর বাড়ির ভিতরে ঢুকলুম। তারপর বৈঠকখানায় তক্তাপোষের উপরে শুইয়ে রেখে তাঁকে পরীক্ষা করতে লাগলুম।

পরীক্ষার পর বুঝলুম গতিক সুবিধার নয়। সুরেনবাবুর দেহের উপরটায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু তাঁর দেহের ভিতরের অবস্থা যে ভয়াবহ, এটা অনুমান করতে পারলুম।

অনন্তবাবুকে বললুম 'এঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই।'

অনন্তবাবু বললেন, 'কী সর্বনাশ, তাহলে উপায়? সুরেনের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই যে হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়েছে! বাড়িতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। এখন আমরা কী করব?'

বললুম, 'আমার পরীক্ষা ভুল হতে পারে। দাঁড়ান, ডাক্তার পি ঘোষকে ডাকি।'

ডাক্তার পি ঘোষ হচ্ছেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের অন্যতম। 'ফোনে' খবর পেয়েই এসে হাজির হলেন। সুরেনবাবুকে পরীক্ষা করে বললেন, 'কোনও আশা নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ইনি মারা পড়বেন।'

আমি বললুম, 'অনন্তবাবু, যদি আপনার ঠিকানা জানা থাকে, তবে সুরেনবাবুর স্ত্রীকে এখনই তারে খবর দিন।'

—ঠিকানাও জানি, তারও যেন করে দিচ্ছি। কিন্তু আপনারা বলছেন সুরেন এখনই মারা পড়বেন। হরিদ্বার এখান থেকে এক দিনের পথ নয়, সুরেনের আর-কোনও আত্মীয়ও নেই। সমস্ত ঝুঁকি আমাদেরই সামলাতে হবে তো? মৃতদেহ নিয়ে আমরা কী করব? মিঃ ঘোষ, দেখুন—আপনাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান যদি এঁকে কোনওরকমে আর দিন-তিনেক বাঁচিয়ে রাখতে পারে।'

ডাক্তার ঘোষ মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এতক্ষণে মৃত্যু ওঁর দেহের ভিতরে প্রবেশ করেছে। উনি মারা পড়লেন বলে।'

অনন্তবাবু অত্যন্ত উত্তেজিতের মতো একবার ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে এলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'মৃত্যুর পরেও কি দেহের ভিতরে আত্মার সাড়া পাওয়া একেবারেই অসম্ভব?'

ডাক্তার ঘোষ সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি কী বলছেন!'

আমিও হতভম্বের মতন অনন্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা হিপনটিজ্‌ম-এর কথা জানেন তো? বাংলায় যাকে বলে সম্মোহন-বিদ্যা বা যোগনিদ্রা?'

আমি বললুম, 'জানি। আর এও জানি যে, 'হিপনটিজ্‌ম'-এ আপনার দেশজোড়া খ্যাতি আছে। কিন্তু তার কথা এখন কেন?'

—'আমি এখনই সুরেনকে সম্মোহন বিদ্যায় অভিভূত করতে চাই।'

—'তাতে ফল কী হবে? সুরেনবাবু কি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবেন?'

—'মৃত্যুর কবল থেকে কোনও মানুষই কোনও মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। তবে যোগনিদ্রার একটা আশ্চর্য মহিমা আছে। তার দ্বারা নিশ্চয়ই একটা কিছু ফল পাওয়া যাবে। সেটা যে কী, তা আমি বলতে পারছি না, তবে—না, থাক! আর কথার সময় নেই। সুরেনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ওঁর শেষ-মুহূর্ত উপস্থিত!'

দুই

সুরেনবাবুর মুখ তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভীষণ হয়ে উঠেছে, তাঁর দুই বিস্ফারিত চোখের তারা চারিদিকে ঘুরছিল। অনন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সুরেনবাবুর দেহের উপরে বিশেষ কৌশলে হস্তচালনা করতে লাগলেন। ডাঃ ঘোষ গম্ভীর ভাবে বসে রইলেন। তাঁর মুখেচোখে দারুণ অবিশ্বাসের ভাব।

আমি অবাক হয়ে অনন্তবাবুর কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলুম।

কয়েক মুহূর্ত পরে তেমনি হস্তচালনা করতে-করতেই অনন্তবাবু দৃঢ়স্বরে বারংবার ডাকতে লাগলেন, 'সুরেন! সুরেন! সুরেন!'

প্রথমটা সুরেনবাবুর কোনওরকম ভাবান্তরই হল না। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর চোখের তারা স্থির ও স্বাভাবিক হয়ে এল।

অনন্তবাবু বললেন, 'সুরেন, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

সুরেনবাবুর চোখ অনন্তবাবুর চোখের দিকে ফিরল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা দেহ একবার শিউরে উঠল।

—'সুরেন!'

স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব হল, 'কী?'

—'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?'

—'না।'

—'তবে?'

জবাব নেই। আবার তিন-চারবার ডাকাডাকির পর সুরেনবাবু চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁঃ?'

—'তুমি কি ঘুমুচ্ছ?'

—'হ্যাঁ। আর আমায় ডেকো না, আমাকে ঘুমুতে ঘুমুতে মরতে দাও।'

—'তবে তুমি ঘুমোও। কাল সকালে আবার আমি তোমাকে ডাকব। তোমাকে সাড়া দিতেই হবে।'

—'সাড়া দেব। এখন আমি মরছি। আমাকে ঘুমুতে দাও।' সুরেনবাবুর দুই চোখ মুদে গেল।

অনন্তবাবু আমাদের কাছে এসে বললেন, 'আপনাদের মত কী?

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'আপনি কি ভাবছেন, কাল সকালে ওঁর সাড়া পাওয়া যাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'অসম্ভব! তাহলে আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

—'বেশ, কাল সকালে এসে দেখবেন।'

—'আসব। যদিও জানি অসম্ভব সম্ভব হবে না, তবু আপনি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন। কাল সকালে আমি আসছি।'

তিন

পরদিনের সকাল। বহুকাল ধরে প্রেততত্ত্ব নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে করে গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অনন্তবাবু বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন,—এই কথা বলাবলি করতে করতে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে আমি সুরেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম! দেখলুম বৈঠকখানার সমস্ত জানলা বন্ধ করে আধা-অন্ধকার ঘরে সুরেনবাবুর দেহের পাশে অনন্তবাবু চুপ করে বসে আছেন।

ডাক্তার ঘোষ সুরেনবাবুর দেহ পরীক্ষা করে বললেন, 'দেহ শীতল আর আড়ষ্ট। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। কাল রাত্রেই এঁর মৃত্যু হয়েছে। অনন্তবাবু, এখনও কি আপনার সন্দেহ দূর হয়নি?'

অনন্তবাবু উত্তর দিলেন না।

সুরেনবাবুর গায়ের রং রীতিমতো হলদেটে হয়ে গেছে। তাঁর দুই চোখ মোদা। মুখ হাঁ করা।

আমি বললুম, 'আর কেন অনন্তবাবু, এইবারে এঁর সৎকারের ব্যবস্থা করুন।'

—'হরিদ্বারে তার করে দিয়েছি! আগে সুরেনের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা আসুক।'

—'সে কী! ততক্ষণে দেহের কী অবস্থা হবে, বুঝতে পারছেন?'

—'দেহের কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছি না। তবে সুরেনকে আর-একবার ডেকে দেখা দরকার।'

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আর কাকে ডাকবেন?'

—'সুরেনকে। .....সুরেন, সুরেন!'

কোনও সাড়া নেই।

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'কী আশ্চর্য! মড়া কখনও কথা কয়?

—'সুরেন, সুরেন! আমি ডাকছি। সুরেন, সাড়া দাও!'

স্তম্ভিতনেত্রে দেখলুম, সুরেনবাবুর ফাঁক-করা ওষ্ঠাধরের ওপাশে জিভখানা করছে যেন ছটফট, ছটফট!

—'সুরেন, সুরেন!'

সুরেনবাবুর চোয়াল ও ওষ্ঠাধর একটুও নড়ল না, কিন্তু তাঁর হাঁ করা মুখবিবর থেকে অদ্ভুত বিকৃত স্বরে এই কথাগুলো বেরুল—'আঃ! আবার কেন? আমার মৃত্যু হয়েছে! আমি এখন ঘুমুচ্ছি!'

সে কী স্বর! মনে হল সুরেনবাবুর মুখ যেন কথা কইছে না, সে স্বর আসছে যেন বহুদূর থেকে—যেন গভীর কোনও গিরিগুহার অতলতার ভিতর থেকে!

একটা অজানা ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগল। ডাক্তার ঘোষ যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালেন—তাঁর মুখ-চোখ উদ্ভ্রান্তের মতো!

—'সুরেন, তুমি কি এখনও ঘুমিয়ে আছ?'

—'না, না, আমি ঘুমোচ্ছিলুম বটে! কিন্তু এখন আমার মৃত্যু হয়েছে।'

—'সুরেন, আবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। .....ডাক্তার ঘোষ, এখন আপনার কোনও বক্তব্য আছে?'

ডাক্তার ঘোষ ক্ষীণস্বরে বললেন, 'না।'

—'সুরেনবাবুর কণ্ঠস্বর কীরকম মনে হল?'

—'ভয়ানক! মানুষের গলার ভিতর থেকে যে ওরকম বীভৎস আওয়াজ বেরুতে পারে, এটা ধারণারও অতীত। ও তো মানুষের কণ্ঠস্বর নয়—যেন একটা অমানুষিক ধ্বনি মাত্র!'

—'কিন্তু ও ধ্বনি আসছে সুরেনেরই গলার ভিতর থেকে। সুরেনকে আর ব্যস্ত করব না, ও এখন ঘুমিয়েই থাক। বোধ হয় পরশুদিনই সুরেনের স্ত্রী এসে পড়বেন, তখন আর-একবার আপনাকে ডাকব, আসবেন তো?'

—'নিশ্চয়ই আসব! এ যে এক অজানা নতুন বিজ্ঞানের রহস্য! না এসে থাকতে পারব না।'

চার

আজ অনন্তবাবুর আহ্বানে আবার সুরেনবাবুর বাড়িতে চলেছি আমরা দু-জনে। সন্তানদের নিয়ে সুরেনবাবুর স্ত্রী কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর নাম হৈমবতী।

ক্রন্দনধ্বনি শুনতে শুনতে সুরেনবাবুর বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। সুরেনবাবুর আড়ষ্ট দেহ ঘিরে বসে আছেন হৈমবতী। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। সকলেরই চক্ষে অশ্রু, কণ্ঠে আর্তনাদ।

অনন্তবাবু বসে আছেন মৃতদেহের ডান পাশে। মুদিত চোখে তিনি মূর্তির মতন স্থির—যেন ধ্যানমগ্ন।

সুরেনবাবুর দেহ যেমন ভাবে দেখে গিয়েছিলাম তেমনি ভাবেই আছে। হৈমবতী গতকল্য এসেছেন। হিসাব করে দেখলাম, সুরেনবাবুর মৃত্যুর পর পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে। একে গ্রীষ্মকাল, তায় এ বছর পড়েছে আবার অতিরিক্ত গরম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সুরেনবাবুর পায়ের রং হলদে এবং দেহ মৃত্যুশীতল ও কাঠ-আড়ষ্ট হয়ে গেলেও তা একটু পচেনি বা ফুলে ওঠেনি।

অনন্তবাবু চোখ খুলে বললে, 'এই যে, আপনারা এসেছেন! হৈম বড়োই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাহলে সুরেনকে আর-একবার জাগাবার চেষ্টা করি?'

আমরা নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। যদিও আমার বুকের ভিতরে জাগল কাঁপন।

মৃতদেহের উপরে খানিকক্ষণ হস্তচালনা করে অনন্তবাবু ডাকলেন, 'সুরেন! সুরেন! সুরেন!'

প্রায় দশ-বারো বার নাম ধরে ডাকার পর মৃতদেহের আড়ষ্ট, হাঁ করা মুখের ভিতরে জিভখানা হয়ে উঠল আবার সেইরকম ভয়াবহ রূপে চঞ্চল!

হৈমবতী স্বামীর বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রন্দনস্বরে বলে উঠলেন, 'ওগো, তাহলে তুমি সত্যিই বেঁচে আছ?'

ছেলেমেয়েরাও 'বাবা, বাবা' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

অনন্তবাবু বললেন, 'কথা কও সুরেন, কথা কও!'

আবার শোনা গেল সেই বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর—যা আসছে যেন বাড়ির বাহিরে পৃথিবীর অতল পাতালের ভিতর থেকে—

—'আঃ, আবার কেন ডাকাডাকি? বলেছি তো, আমি বেঁচে নেই!'

হৈমবতী বললেন, 'ওগো, এই তো তুমি বেঁচে আছ—এই তো তুমি কথা কইছ! একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দ্যাখো—আমরা সবাই এসেছি।'

অনন্তবাবু বললেন, 'হৈম, স্থির হও—শান্ত হও। সুরেন এখন আমি ছাড়া আর কারুর কথার জবাব দেবে না।.....সুরেন, হৈম তোমাকে ডাকছে।'

মৃতদেহ বললে, 'ডেকে লাভ নেই। আমার মৃত্যু হয়েছে।'

—'তোমার যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে তুমি কথা কইছ কেমন করে?'

—'আমি এখন আমার মৃতদেহের ভিতরে বন্দি হয়ে আছি।'

—'বন্দি! কেন?'

—'তুমি যেতে দিচ্ছ না বলে।'

অনন্তবাবু এতক্ষণ সমানে হস্তচালনা করছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি যে তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল ভাবে নিযুক্ত করেছেন, সেটা বোঝা যায় তাঁর চেহারা দেখে। তাঁর কপালের উপরে শিরাগুলো এবং কণ্ঠের উপরে মাংসপেশিগুলো দ্বিগুণ ফুলে এবং মুখের রং টকটকে হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ তিনি হস্তচালনা বন্ধ করে খানিকক্ষণ নীরবে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগলেন। তারপর ফিরে বললেন, 'হৈম, আর কেন? তোমার জন্যেই এই কদিন সুরেনকে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছি। এইবার ওর ঘুম ভাঙাই, ওর আত্মাকে মুক্তি দিই তোমরা মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করো।'

হৈমবতী এমন তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন যে, আমাদের কান যেন ফেটে গেল। তারপর তিনি মাটির উপরে আছড়ে পড়ে বললেন, 'অনন্তবাবু, অনন্তবাবু, আমাকে দয়া করুন! উনি এ অবস্থাতে থাকলেও আমার সুখ! মনে করব আমি বিধবা নই।'

অনন্তবাবুর মুখে ফুটে উঠল একসঙ্গে ব্যথা, দয়া ও মমতার ভাব। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'বেশ মা, তাই হোক। আরও কিছুদিন এইভাবে যাক। তুমি নিজের মনকে দৃঢ় করো, শান্ত হও—সংযত হও। তারপর আমার যা করবার করব। মনে রেখো মা, আমি হচ্ছি তুচ্ছ মানুষ। মৃত্যু হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা, তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমার ও সর্বনাশ হবে, আমিও বাঁচব না!'

অনন্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ আমরা ছিলুম দুঃস্বপ্নে অভিভূতের মতো। অনন্তবাবু উঠে দাঁড়াতেই সাড় হল আমাদের।

ডাক্তার ঘোষ বলিলেন, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না—আমার প্রাণ-মন হাঁপিয়ে উঠেছে।'

আমি বললুম, 'আমারও। এখন বাইরে বেরুতে পারলেই বাঁচি!'

অনন্তবাবুও হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমারও ওই ইচ্ছা। চলুন, আমরা বাড়ি যাই।'

পাঁচ

তারপর কেটে গেছে দুই মাস। সুরেনবাবুর দেহ এখনও পড়ে আছে বৈঠকখানার তক্তাপোষে। তাতে এখনও পচ ধরেনি।

ইতিমধ্যে এই অদ্ভুত খবর শুনে দলে দলে বাইরের লোক এবং খবরের কাগজের সংবাদদাতারা সুরেনবাবুর বাড়িতে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছিল। অনন্তবাবু খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন, বাইরের লোকেরা আর ভিতরে ঢুকতে পায় না। কিন্তু খবরটা রটে গিয়েছিল দিকে দিকে। চারিদিকে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কেবল বাঙালি নয়, ইংরেজ এবং আরও নানাজাতীয় লোকও কৌতূহলী হয়ে আবেদন জানাচ্ছেন, সুরেনবাবুর দেহ পরিদর্শনের জন্যে। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিল বহু বিখ্যাত নাম।

একদিন অনন্তবাবুর জরুরি আহ্বান এল। তাঁর বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনলুম সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ির ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ। অনন্তবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, একখানা চেয়ারের উপরে বসে আছেন ডাক্তার ঘোষ। অনন্তবাবু ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর ভাবভঙ্গি ক্রুদ্ধ, বিরক্ত।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'কান্না শুনছেন?'

—'হাঁ, ব্যাপার কী?'

—'আজ সুরেনের যোগনিদ্রা ভাঙব তাই ওই কান্না। হৈমবতীর ইচ্ছা, সুরেনের দেহ ওই ভাবেই থাকুক। কিন্তু তাও কি সম্ভব? আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার নিজের স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভেঙে পড়ছে—এরকম অস্বাভাবিক উত্তেজনা আর কতদিন সহ্য হয়? প্রথম ইচ্ছাশক্তিরও সীমা আছে?'

—'এইজন্যেই আমাকে ডেকেছেন?'

—'আপনাকেও, ডাক্তার ঘোষকেও। তারপর আর-একটা কী কথা জানেন? নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।'

—'কেন?'

—'বোধহয় প্রকৃতির আইনভঙ্গ করছি। ভগবান সুরেনের আত্মাকে যে-অদৃশ্য পথে নিয়ে যেতে চান, আমি হয়েছি তার বাধার মতো। এ এক মস্ত অপরাধ, এজন্যে হয়তো আমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হবে। হয়তো একটা প্রাণহীন কুৎসিত দেহের কারাগারে বন্দি হয়ে সুরেনের আত্মাও অত্যন্ত কষ্টভোগ করছে। না, আর নয়। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছি, এ ব্যাপারের উপরে আজকেই যবনিকা ফেলে দেব—কারুর মিনতি, কারুর অশ্রু আর আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আসুন আপনারা। গোড়া থেকেই যখন সঙ্গে আছেন, তখন শেষ দৃশ্যটাও দেখুন।'

ছয়

শেষ পর্যন্ত হৈমবতীকেও সম্মতি দিতে হল।

অনন্তবাবু অনেক চেষ্টার পর তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই মৃতদেহের মধ্যে সুরেনবাবুর আত্মা বন্দি হয়ে আছে অভিশপ্তের মতো, দেহ থেকে বেরুতে না পারলে আত্মার গতি হবে না।

অনন্তবাবু দেহের পাশে বসে হস্তচালনা করতে করতে ডাকলেন, 'সুরেন, সুরেন, সুরেন!'

আমরা রোমাঞ্চিত দেহে বিস্ফারিত চক্ষে রুদ্ধ শ্বাসে দেহের দিকে তাকিয়ে রইলুম। সাত-আট

মিনিট কেটে গেল, দেহ নিসাড়—নিস্পন্দ। অনন্তবাবুর কপাল থেকে দর দর ধারে ঘাম ঝরতে লাগিল।

—'সুরেন, সুরেন! জাগো, সাড়া দাও। আমি ডাকছি

আরও সাত-আট মিনিট কাটল।

অনন্তবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'তবে কি আমি ব্যর্থ হব? সুরেনের আত্মা কি এখানে নেই? না, না, তা তো হতে পারে না! যোগনিদ্রার প্রভাব না থাকলে দেহের অবস্থা হত যে অন্যরকম। ...সুরেন, সুরেন, জাগো—তোমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হোক!

এইবারে উন্মুক্ত দন্ত-কণ্ঠকিত মুখ-বিবরের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে ছটফট করতে লাগল জিহ্বাখানা!

—'সুরেন!'

উত্তরে শোনা গেল এক ভীষণ ও তীক্ষ্ণ আর্তধ্বনি। সে আর্তনাদ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, মানুষের কান কোনওদিন শোনেনি তেমন আর্তনাদ! ছেলে-মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল, হৈমবতী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। আমাদেরও অবস্থা শোচনীয়!

—'সুরেন, শান্ত হও ভাই, শান্ত হও।'

—'শান্ত হব? তোমরা জানো না এই দেহের নরকে কী দুঃসহ যন্ত্রণা? নিশিদিন কাঁদছি আর ছটফট করছি—মৃত্যুর পরেও এ কী শাস্তি? আর কেন? আমাকে মুক্তি দাও—মুক্তি দাও!' আজকের স্বর আরও বিকট ও ভয়াল এবং আসছে যেন আরও—আরও—আরও বেশি দূর থেকে।

অনন্তবাবু বললেন, 'তোমাকে মুক্তি দিলুম। সুরেন, ভেঙে যাক তোমার যোগনিদ্রা।'

পরমুহূর্তে অদ্ভুত একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্নের মতো দেখলুম, তক্তাপোষের উপরে পড়ে রয়েছে সুরেনবাবুর দেহের বদলে একটা নরকঙ্কাল এবং তার চারিদিক দিয়ে গড়াচ্ছে বিগলিত মাংস মেদ মজ্জার তরল, বিবর্ণ ধারা। বিষম পূতিগন্ধে ঘরের বদ্ধ বাতাস বিষাক্ত।

.....সভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে এলুম।

ছায়া, না কায়া?

বেশিদিনের কথা নয়। এই গেল শ্রাবণ মাসের এগারোই তারিখ।

পূর্ণিমার রাত। দশটার সময়ে শয্যা নিয়েছি, এখন বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু চোখে আর ঘুম আসে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। সামনেই গঙ্গা, চাঁদের আলো তাকে যেন রুপো দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। ভাবলুম, খানিকটা বেড়িয়ে এলে হয়তো অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তিলাভ করব।

বেরিয়ে পড়লুম। একদিকে চির-জাগন্ত গঙ্গা, আর এক দিকে ঘুমন্ত বাড়ির সারি, মাঝখানে পথিকহীন পথ। কোনও ঘাটে বিকটকণ্ঠ গায়করা পর্যন্ত পাড়া কাঁপানো চিৎকার করছে না। এই চমৎকার নির্জনতাটুকু উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চললুম।

কলকাতা শহরে গঙ্গার ধারে বেড়াবার আসল সময় হচ্ছে এই। এখন থেমেথুমে গেছে যত বাজে গোলমাল,—আকাশ আর বাতাস, কান আর প্রাণ ভরে জেগে আছে শুধু গঙ্গার জলতরঙ্গে হিমালয়ের গম্ভীর বাণী। কত কোটি কোটি যুগ আগে জন্ম হয়েছে এই পবিত্র বাণীর, কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না। একে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারেনি অনন্ত সমুদ্রও।

মস্তবড়ো একটা বটগাছ অনেকখানি জায়গা জুড়ে আবছা অন্ধকার সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে এখানে ওখানে দপদপ করছে চার-পাঁচটে জোনাকি, কে যেন আগুনের ফিনকি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে!

জায়গাটি ভালো লাগল। বটের ছায়ার তলায় নিদ্রিত ঘাটের কোলে এসে ছলাৎ ছলাৎ করে বেজে উঠছে গঙ্গাজল,—ছোটো ছোটো ঢেউ-শিশুরা যেন কৌতুকহাস্যধ্বনি তুলে পাষাণের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

সেইখানেই বসে পড়লুম। গঙ্গা জুড়ে রুপোলি আলোর কারিকুরি দেখতে দেখতে নিজেরই অজান্তে কখন গুনগুন করে গান শুরু করে দিলুম।

হঠাৎ লজ্জিত হয়ে গান থামিয়ে ফেললুম। লজ্জার কারণ আছে। দৃঢ় পণ করে গঙ্গার ধারে যারা নিয়মিত ভাবে বেসুরো গান গেয়ে লোক জ্বালাতে আসে, আমি তাদের দু-চক্ষে দেখতে পারি না। অথচ আজ আমি নিজেই গঙ্গার ধারে বসে গান গাইবার চেষ্টা করছি।

গান থামিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে চাঁদের আলোয় ধোওয়া ওপারের অস্পষ্ট গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ওখানে একটা আগুন জ্বলছে, বোধ হয় চিতার আগুন। স্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে মেয়ে-গলার একটা কান্নার শব্দও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

এমন সুন্দর রাত্রে মৃত্যুর স্মৃতি ভালো লাগল না।

আচমকা আমাকে চমকে দিয়ে গাছের উপর থেকে ডেকে উঠল একটা বাচ্ছা প্যাঁচা। ঠিক যেন ভূতুড়ে শিশুর কান্না!

ভয়ের কারণ ছিল না, আমি ভিতু মানুষও নই। তবু কেন জানি না, বুকের কাছটা কেমন ছ্যাঁৎছ্যাঁৎ করতে লাগল।

অকারণেই মনে হল, প্যাঁচার বাচ্ছাটা অকারণে কাঁদছে না। সে নিশ্চয় ভয় পেয়েছে। কিন্তু কীসের ভয়?

তারপরেই অনুভব করলুম, এখানে আমি যেন আর একলা নই। যেন কার হিঁসকুটে চোখের তীক্ষ্ণ, উত্তপ্ত দৃষ্টি আমার পিঠের উপরে এসে বিঁধছে বার বার।

নিজের অমূলক ভয়কে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইলুম। কিন্তু ভয় গেল না।

হঠাৎ শুনলুম পিছনে কে বিড় বিড় করে কথা কইছে!

তাড়াতাড়ি ফিরে দেখি বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। যেন স্থির পাথরের মূর্তি।

মাথায় এলোমেলো ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল; চোখ দুটো বিস্ফারিত নিস্পলক; বিষম লম্বা নাকটা বড়শির মতন বাঁকানো; অস্থিচর্মসার দীর্ঘ দেহ; রং কুচকুচে কালো; আদুর গা, খালি পা, কাপড় হাঁটু পর্যন্ত। ভদ্রলোক নয়।

তখন খেয়ালে আনিনি, কিন্তু পরে ভেবে বুঝেছিলুম, লোকটা দাঁড়িয়েছিল ঝুপসি বটগাছের তলার প্রায়-অন্ধকারে, তবু বিশ-পঁচিশ হাত দূর থেকেও আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলুম তার চোখ নাক মুখ—এমনকি হাত পায়ের নখ পর্যন্ত!

চেঁচিয়ে বললুম 'কে হে তুমি?'

লোকটা জবাব দিল না, একটুও নড়ল না, আপন মনেই বিড় বিড় করে বকতে লাগল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী হে, এত রাতে এখানে কী করছ?'

জবাব নেই। কিন্তু বিড় বিড় করে বকুনি থামল না।

নিশ্চয় পাগল, নইলে বিড় বিড় করে বকে কেন?

তাকে নিয়ে আর মাথা ঘামানো দরকার মনে করলুম না।

প্যাঁচার বাচ্ছাটা তখনও সমান চিৎকার করে মৌন রাত্রিকে বীভৎস করে তুলছিল। তার এ চ্যাঁচামেচির মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন ডালে তার বাসা? গাছের চারিদিকে চোখ বুলিয়েও আবিষ্কার করতে পারলুম না।

মনে এল বিরক্তি। নাঃ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কোথাও নেই। চাঁদের আলোয় গঙ্গার ধারে এলুম, নিরালায় বসে একটু রূপের স্বপন দেখব বলে। কিন্তু স্বপ্ন আমার ভেঙে দিলে ওপারের ওই জ্বলন্ত চিতা আর শোকার্ত নারীর আর্তনাদ এবং এপারের ওই প্যাঁচার কান্না—আর পাগলের বিড় বিড় বকুনি!

দরকার নেই আর কবিত্বে, আবার বাড়িতে ফিরে যাওয়া যাক।

উঠে দাঁড়ালুম। একবার গাছতলার দিকে তাকালুম। পাগলটা সেখানে নেই। কিন্তু তার বিড় বিড় বকুনি তখনও শোনা যাচ্ছে!

সে কথা কয় কোথা থেকে? এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল গাছের উপর দিকে।

একটা মোটা ডালের দুইদিকে দুই পা ঝুলিয়ে বসে পাগলটা নিজের গলায় পরেছে একটা দড়ির ফাঁস, বিড় বিড় করে বকতে বকতে!

কী সর্বনাশ! তবে কি ও পাগল নয়? ওকি এখানে এসেছে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে?

না, না, লোকটা পাগলই বটে। নইলে আমার সামনেই আত্মহত্যা করতে চায়? অন্তত উপস্থিত মুহূর্তে পাগলামির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ওর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে!

চিৎকার করে বললুম, ওহে, করো কী—করো কী! শিগগির গলার দড়ি খোলো, গাছ থেকে নেমে পড়ো!

লোকটা ফিরেও তাকালে না, কিন্তু হা হা হা করে হেসে উঠল!

কী ভয়ানক অট্টহাসি, প্যাঁচার বাচ্ছাটা পর্যন্ত ভয়ে চুপ মেরে গেল! কানের কাছেই শুনছি বটে, কিন্তু আমার মনে হল যেন, ও হাসি যে হাসছে সে আছে অনেক—অনেক—অনেক দূরে! ও যেন পৃথিবীর হাসি নয়!

পরমুহূর্তেই আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, লোকটা ঝুপ করে নীচে লাফিয়ে পড়ে দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে হাত-পা ছুড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে লক্ষ করলুম, তার দুটো পাকানো কপালে ওঠা চোখ জ্বলছে ফসফরাসের মতো!

দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলুম মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিষ্পন্দ হয়ে। চোখের সামনে এমন আত্মহত্যার চেষ্টা দেখে কে না স্তম্ভিত হয়? তার জিভখানা মুখের বাইরে বেরিয়ে পড়ে লকলক করে ঝুলছে, আর তার পা দুটো ক্রমাগত করছে শূন্যকে পদাঘাত!

তারপরেই হুঁশ হল। তার দেহটা ঝুলছিল মাটি থেকে মাত্র তিন হাত উপরে। দ্রুতপদে দৌড়ে গিয়ে দুইহাত দিয়ে তার দেহটাকে উপর দিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করলুম—সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তার দু'খানা দীর্ঘ কঙ্কালসার পা দিয়ে আমার বুক-পিঠ জড়িয়ে ধরে শক্ত বাঁধনে বেঁধে ফেললে—

...এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার নাকে এল একটা অত্যন্ত পচা ও ধসা মড়ার ভয়াবহ দুর্গন্ধ!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ছাড়ো, ছাড়ো—আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই—এমন করে চেপে ধরলে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না!'

সে হি হি করে হাসতে ও হেঁচকি তুলতে লাগল! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে কেউ কখনও হাসতে পারে? মনে হতেই আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিলে!

অনুভব করলুম, যে দেহের স্পর্শ আমি পাচ্ছি সেটা অস্বাভাবিক রকম ঠান্ডা! এ জ্যান্ত মানুষের দেহ নয়!

মনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের মতন খেলে গেল একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত!

এদিকে পায়ের বাঁধন ক্রমেই ভীষণ হয়ে উঠছে, আমার বুক-পিঠের হাড়গুলো এইবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে!

প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলুম, বাঁচাও! বাঁচাও! কে কোথায় আছ, বাঁচাও!

পায়ের চাপ আরও বাড়তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবন্ত মৃতদেহটা হাসতে ও হেঁচকি তুলতে লাগল ক্রমাগত!

আবার চ্যাঁচালুম, বাঁচাও! আমাকে মেরে ফেললে, বাঁচাও! দেখতে দেখতে পায়ের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে এল—দুই হাত দিয়ে টেনে সেই সাংঘাতিক পায়ের বাঁধন খোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা!.....

অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনলুম—শব্দ কাছে এসে পড়ল।

কে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে, কী হয়েছে? অমন চিৎকার করছেন কেন?'

পা দুটো তখনও আমাকে ছাড়েনি। হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে বললুম, এই লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দেওয়াতে পা দিয়ে চেপে ধরে আমাকে মারবার চেষ্টা করছে।—আমাকে বাঁচাও!

বিস্মিত প্রশ্ন শুনলুম, কই, কে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে? কে আপনাকে মারবার চেষ্টা করছে? কেউ তো এখানে নেই!

দুই হাত দিয়ে সেই পচা মাংসের দুর্গন্ধ ভরা পা দু-খানা টানতে টানতে রুদ্ধশ্বাসে বললুম, দেখতে পাচ্ছ না? এই দ্যাখো—এই দ্যাখো—এই দ্যাখো!

হঠাৎ পা-দুটো আমাকে ছেড়ে দিলে—আমি এলিয়ে ধপাস করে মাটির উপরে প[illegible] গেলুম।.....

একটি লোক 'টর্চ' টিপে গাছের এদিকে-ওদিকে আলো ফেলে বললে, চেয়ে দেখুন, কেউ কোথাও নেই! মাসখানেক আগে একটা লোক এই গাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল বটে, কিন্তু আজ আবার কে এখানে মরতে আসবে? আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি? স্বপ্ন দেখছিলেন?

পাছে ওরা আমায় পাগল ভাবে সেই ভয়ে বললুম, তাই হবে!

জীবন্ত মৃত্যু

মাস-কয় আগে বাংলা দেশের সব সংবাদপত্রেই এই খবরটি বেরিয়েছিল

কলিকাতার নিকটবর্তী কোনও গ্রামের শ্মশানপ্রান্ত দিয়ে যেতে যেতে পুলিশের এক কর্মচারী সবিস্ময়ে দেখলেন, শ্মশানের এক চিতার উপরে কয়েকজন শবদাহকারী দমাদম লাঠির আঘাত করছে।

কৌতূহলী পুলিশ কর্মচারী কাছে ছুটে গিয়ে শুনলেন, একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করবামাত্র সে জ্যান্ত হয়ে চিতার উপরে উঠে বসেছে এবং তাই মড়াকে দানোয় পেয়েছে বলে লাঠির বাড়ি মারা হচ্ছে।

পুলিশ ভূত মানে না, কারণ আইন ভূতকে অস্বীকার করে। পুলিশ কর্মচারী স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করে আহত অবস্থায় কলকাতার মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে সে কয়েকদিন বেঁচে ছিল। তারপর রোগ ও মৃত্যুকে একেবারে ফাঁকি দিয়ে, জ্বলন্ত চিতাকেও এড়িয়ে অভাগী শেষটা আবার মারা পড়ল নির্বোধ মানুষেরই লাঠির আঘাতে।

যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, এরকম ঘটনা অসাধারণ হলেও অনেকবার ঘটেছে। এদেশে মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরেই শব পুড়িয়ে ফেলা বা কবর দেওয়া হয় বলেই এরকম ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। কারণ শ্বাস রুদ্ধ হওয়াই সব সময়ে মৃত্যুর প্রধান লক্ষণ নয়, মানুষের শ্বাস অস্থায়ী ভাবেও রুদ্ধ হতে পারে। এর একাধিক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে পাশ্চাত্য দেশে—মৃত্যুর কয়েকদিন পরে যেখানে শবকে কবরে রাখা হয়। বিশ্ববিখ্যাত লেখক এডগার অ্যালেন পো এ সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন, আমরা এখানে তিনটি তুলে দিলুম।

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে এমন এক সত্য ঘটনা ঘটে, যা উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য।

ভিক্টোরাইন লাফোর্কেড কেবল সুন্দরী নয়, নামজাদা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তাকে বিবাহ করবার জন্যে সবাই লালায়িত।

জুলিয়েন হচ্ছে সাহিত্যিক। সে-ও সেই মেয়েটিকে বউ করতে চায় এবং লাফোর্কেডও তাকে পছন্দ করে। কিন্তু ধনী ও কুলিন নয় বলে শেষ পর্যন্ত জুলিয়নের সঙ্গে তার বিবাহ হল না।

রেনেল নামে এক ধনবান লোকের সঙ্গে সুন্দরী লাফোর্কেডের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ে সুখের হল না। রেনেল বউয়ের দিকে ফিরেও চাইত না এবং তাকে নানানরকম যন্ত্রণাও দিতে শুরু করলে।

চার বছর পরে লাফোর্কেডের অসুখ হল এবং সে মারা পড়ল। যে গ্রামে সে জন্মেছিল তার দেহ সেইখানে নিয়ে গিয়ে কবরস্থ করা হল।

জুলিয়েনও তার মৃত্যুর সংবাদ পেলে। সে তখনও মনে মনে লাফোর্কেডকে ভালোবাসত, কাজেই শোকে পাগলের মতো হয়ে উঠল। স্থির করলে, যেমন করে হোক লাফোর্কেডের একটা কোনও স্মৃতিচিহ্ন সে সংগ্রহ করবেই! অন্তত তার মাথা থেকে কেটে নেওয়া একগুছি চুল।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে এক রাত্রে সে লুকিয়ে গোরস্থানের ভিতর গিয়ে ঢুকল এবং লাফোর্কেডের কবর খুঁড়ে কফিনের ডালা খুলে ফেললে!

নিঝুম রাত। অন্ধকারের বুক ছ্যাঁদা করে জুলিয়েনের লণ্ঠনের আলো শবদেহের মুখের উপরে গিয়ে পড়বামাত্র মড়া ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালে!

এতদিন পরেও নিশ্চয় করে বলা যায় যে, সেই দৃশ্য দেখে জুলিয়েনের সর্বাঙ্গ দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল! কেবল লাফোর্কেডকে অত্যন্ত ভালোবাসত বলেই সে পালিয়ে যেতে পারলে না!

আসল কথা একটু পরেই বোঝা গেল। লাফোর্কেড মরেনি। তার নিশ্বাস পড়ছে না দেখেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

জুলিয়েন তখন লাফোর্কেডের প্রায় অচেতন দেহ কফিন থেকে তুলে নিয়ে গেল। তারপর গোপনে চিকিৎসা ও সেবা করে তাকে আবার সুস্থ সবল করে তুললে। তারপর দু-জনে পালিয়ে গেল আমেরিকায়।

সেইখানেই দীর্ঘ বিশ বছর কেটে গেল।

জুলিয়েন ও লাফোর্কেডের চেহারা গেছে বদলে। দু-জনেই আন্দাজ করলে, এতদিন পরে দেশে ফিরে গেলে আর কেউ তাদের চিনতে পারবে না!

তারা ফ্রান্সে ফিরে এল এবং দৈবগতিকে রেনেলের সঙ্গে লাফোর্কেডের একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। রেনেল তখনই তাকে চিনতে পারলে! সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল বটে, কিন্তু লাফোর্কেডকে নিজের বউ বলে দাবি করতে ছাড়লে না।

কিন্তু লাফোর্কেড আর সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারী স্বামীর কাছে ফিরে যেতে রাজি হল না।

রেনেল করলে নালিশ। আদালতেই এই অদ্ভুত ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে।

বিচারক রায় দিলেন, আইন যাকে মৃত বলে মেনে নিয়েছে, এতদিন পরে তার উপরে স্বামী বলে রেনেলের কোনও দাবিদাওয়া থাকতে পারে না।

আইনে মৃত কিন্তু দুনিয়ার জীবন্ত লাফোর্কেড তখন আবার রেনেলের হাত ছাড়িয়ে জুলিয়েনের সঙ্গে চলে গেল।

তারপর দ্বিতীয় ঘটনা।

লিপজিকের এক পুরাতন সাময়িক পত্রে প্রকাশ : পল্টনের এক বিপুলবপু সেনানী, দুরন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। যদিও তিনি অসাধারণ বলবান ছিলেন, তবু তাঁর মাথার খুলি গেল ফেটে। ডাক্তারদের অনেক চেষ্টাতেও তাঁর জ্ঞান হল না। কয়েকদিন পরে তাঁর নিশ্বাস-বায়ুও বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তাররা পরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে স্থির করলেন। এক বৃহস্পতিবারে সেনানীকে কবর দেওয়া হল।

দু-দিন পরে, অর্থাৎ রবিবারে জনৈক শ্রমিক গোরস্থানে বসেছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেলে, মাটির তলায় একটা কবরের ভিতর থেকে বিষম হুটোপুটির শব্দ হচ্ছে!

শ্রমিক ভয়ে আঁতকে উঠে সেখান থেকে লম্বা দৌড় মারলে এবং লোকজন ডেকে এই অসম্ভব খবর দিলে।

প্রথমে কেহই তার কথায় বিশ্বাস করতে রাজি হয় না। তারপর শ্রমিকের জেদ দেখে সবাই শাবল কোদাল নিয়ে যথাস্থানে—অর্থাৎ সেই সেনানীর কবরের কাছে গিয়ে হাজির হল।

কবর খুঁড়ে দেখা গেল, সেনানীর মৃতবৎ দেহ উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছে এবং কফিনের ডালা ভাঙা! দেখলেই বোঝা যায়, মড়া জ্যান্ত হয়ে ধাক্কা মেরে ডালা ভেঙে উঠে বসে বাতাসের অভাবে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

সকলের চেষ্টায় সেনানীর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি তখন নিজের মুখেই তাঁর যোঝাযুঝি ও যন্ত্রণার কথা খুলে বললেন এবং একথাও জানালেন যে, মাথার উপর দিয়ে লোকজনের আনাগোনার শব্দ শুনে তিনি তাদের কাছে নিজের অস্তিত্ব জানাবারও চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সেনানীর নবজীবন ব্যর্থ হল। কারণ প্রবন্ধের প্রথমেই উক্ত বাঙালি মেয়েটির মতন তিনিও দ্বিতীয় বার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানেই।

তৃতীয় ঘটনা ঘটে লন্ডনে, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। এই ঘটনাটি নিয়ে বিলাতে তখন বিষম উত্তেজনার সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

এডওয়ার্ড স্টেপলটন ছিলেন একজন অ্যাটর্নি। তাঁর টাইফাস জ্বর হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর দেহের কতকগুলো অজানা লক্ষণ ডাক্তারদের মনে কৌতূহল জাগ্রত করেছিল।

স্টেপলটন মারা পড়লেন। ডাক্তাররা নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে শব ব্যবচ্ছেদ করতে চাইলেন, কিন্তু আত্মীয় বন্ধুরা অনুমতি দিলেন না। মৃতদেহ সমাধিস্থ হল।

সে সময়ে বিলাতে লাশ-চোরদের ভারী উপদ্রব ছিল। এখনকার মতন তখনকার ডাক্তাররা ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যবচ্ছেদ করবার জন্যে সাধু উপায়ে শব সংগ্রহ করতে পারতেন না। কাজেই তাঁদের অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে হত। তাঁরা শব পেলে মূল্য দিতেন এবং লাশ-চোররা অর্থলোভে গোপনে শব এনে তাঁদের কাছে বিক্রি করত। তারা কবর খুঁড়ে মড়া চুরি করে আনত এবং সেসুযোগ না পেলে জ্যান্ত মানুষ খুন করে তারও মৃতদেহ নিয়ে আসত! শেষটা এই উদ্দেশ্যে এত নরহত্যা হতে থাকে যে, ডাক্তারদের বৈধ উপায়েই শব সংগ্রহ করবার অনুমতি দেওয়া হয়।

বর্তমান ক্ষেত্রেও ডাক্তাররা লাশ-চোরদের আশ্রয় নিলেন। সমাধিস্থ হবার পর তৃতীয় রাত্রে তারা স্টেপলটনের মৃতদেহ গোর খুঁড়ে চুরি করে আনলে।

ডাক্তাররা শব নিয়ে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। মৃতদেহে তখনও পচ ধরেনি দেখে একজন পরামর্শ দিলেন বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র বা 'গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি' ব্যবহার করতে।

তাই করা হল। প্রথমটা বিশেষ কোনও ফল ফলল না। রাত শেষ হয়ে আসছে দেখে শব ব্যবচ্ছেদ করবার প্রস্তাব হল। চোরাই মড়া, সকালের আগেই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।

ইতিমধ্যে একজন ছাত্র নিজের এক অনুমান সত্য কি না পরখ করবার জন্যে মৃতদেহের বুকের মাংসপেশিতে ছ্যাঁদা করে ব্যাটারি চালিয়ে দিলে।

পরমুহূর্তেই ভয়ানক ব্যাপার! মৃতদেহ শোয়ানো ছিল শব ব্যাবচ্ছেদের টেবিলের উপরে। আচম্বিতে সেই কয় দিনের বাসি মড়া ধড়মড় করে টেবিলের উপরে উঠে বসল, তাড়াতাড়ি মেঝেয় নেমে পড়ল, চারিদিকে অস্বস্তি ভরা চোখে তাকিয়ে দেখল এবং তারপরে—কথা কইলে! জড়িয়ে জড়িয়ে কী যে বললে বোঝা গেল না। কথা কয়েই সে আবার মেঝের উপরে দড়াম করে পড়ে গেল!

থমথমে নিশুত রাতে, শব ব্যবচ্ছেদাগারে, তিন দিন কবরবাসী একটা মড়া যদি উঠে দাঁড়িয়ে কথা কয়, তাহলে দর্শকদের মনের অবস্থা কীরকম হয় সেটা সকলে একবার ভেবে দেখুন।

ডাক্তাররা ভয়ে আড়ষ্ট! সকলেই একেবারে বোবা! তাঁরা ডাক্তার, মড়া ঘাঁটতে অভ্যস্ত ও দলে ভারী, তাই হয়তো আর্তনাদ করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন না এবং তাড়াতাড়ি নিজেদের সামলে নিয়ে বুঝতে পারলেন যে, স্টেপলটন কবরে গিয়েও মারা পড়েননি।

তখনই 'ইথারে'র সাহায্যে স্টেপলটনের মূর্ছা ভাঙানো হল। তারপর কিছুদিন ধরে গোপনে তাঁর

চিকিৎসা করে যখন বোঝা গেল যে, স্টেপলটনের আর কোনও অমঙ্গলের ভয় নেই, তখন তাঁকে আবার বাড়িতে ফিরে যেতে দেওয়া হল। যমালয়ের মানুষকে সশরীরে লোকালয়ে ফিরে আসতে দেখে স্টেপলটনের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মুখচোখ কেমনধারা হয়েছিল, এতদিন পরে সেটা বলবার উপায় নেই।

এর চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে স্টেপলটনের নিজের কথা।

তিনি বলেন, 'বাইরে আমাকে অজ্ঞানের মতো দেখালেও আমি একবারও জ্ঞান হারাইনি। সমস্ত গোলমেলে বলে বোধ হলেও, নিজের অবস্থা আমি আন্দাজ করতে পারছিলুম। যখন থেকে ডাক্তার আমাকে মৃত বলে সাব্যস্ত করে গেলেন এবং আমাকে গোর দেওয়া হল, তখন থেকে শব ব্যবচ্ছেদাগারে আমার দাঁড়িয়ে উঠে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই আমি সচেতন অবস্থাতেই বুঝতে পেরেছি। ডাক্তাররা আমার কথা বুঝতে পারেননি, কিন্তু সে কথাগুলি হচ্ছে—'ডাক্তার, আমি বেঁচে আছি'! আমার দারুণ আতঙ্ক হয়েছিল, ডাক্তাররা যদি জীবিত অবস্থাতেই আমাকে কাটতে শুরু করে দেন!'

কয়েক দিন পরে সমাধিস্থ মৃত দেহেও যদি আবার জীবন সঞ্চার হয়, তাহলে ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই যে সংখ্যাতীত শব দাহ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কত হতভাগ্য জীবন্তে পুড়ে মরেছে সে হিসাব কে করতে পারে? একথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে!

নবাব কুঠির নর্তকী

এক

—'হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই নবাব কুঠি! সেকালে এক বিলাসী নবাব এখানে বাস করতেন। রোজ নাচ গান আর আনন্দ কলরবে নিশীথ রাতের নীরবতা এখানে মুখরিত হয়ে উঠত। শোনা যায়—নবাবের এক নর্তকী ছিল, তার নাচের খ্যাতি ফিরত লোকের মুখে মুখে। তারপর হঠাৎ একদিন কী কারণে জানি না, নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে নর্তকীকে নিজের হাতে কেটে কুচি কুচি করে ফেলেন। আর সেই দিন রাত্রেই নাকি নবাবও গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। তারপর থেকে এখানে আর কেউ বাস করে না। নবাবের বংশধররা আজও আছেন, কিন্তু তাঁরা এই প্রাসাদকে অভিশপ্ত বলে মনে করেন। তাই এই প্রাসাদের উপরে আজ পাহারা দেয় কেবল নিবিড় অরণ্য, এর ছাদে বসে করুণস্বরে কাঁদে ঘুঘুর দল, এর ঘরে এসে বাসা বাঁধে বাদুড় আর প্যাঁচারা,—এমনকি খুঁজে দেখলে এখানে দু-চারটে শেয়াল বা নেকড়ে বাঘের সন্ধানও মিলতে পারে।'

আমি আর বসন্ত পুজোর ছুটিতে নলিনদের দেশে বেড়াতে এসেছি। তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়েছি পাখি শিকার করতে। তারপর গভীর জঙ্গলে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলি। সন্ধ্যার আবছায়ায় হঠাৎ যখন এই পরিত্যক্ত, স্তব্ধ প্রাসাদের সামনে এসে পড়লুম, নলিন তখন পথ চিনতে পারলে বটে, কিন্তু তখন আর গ্রামে ফেরবার উপায় নেই। কারণ এখনই অমাবস্যার আঁধার রাত এসে পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে আর গ্রামও নাকি এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে! কাজেই স্থির করা গেল, আজকের রাতটা এই নবাব কুঠির মধ্যে বসেই কাটিয়ে দেব!

নলিনের মুখে নবাব কুঠির ছোট্ট ইতিহাস শুনে বসন্ত বললে, 'এই ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবী থেকে 'রোমান্সে'র গন্ধটুকু পর্যন্ত উপে গিয়েছে! যাক, তবু যে একখানা 'রোমান্টিক' বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল, এইটুকুই সৌভাগ্য!'

নলিন বললে, 'সৌভাগ্যের ঠেলা একটু পরেই বুঝতে পারবে!'

—'কেন?'

—'রাতে খাবে কী? বাদুড়? চামচিকে? না কালো অন্ধকার?'

আমি বললুম, 'নির্ভয় হও! দৈব দুর্ঘটনার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আমার ব্যাগের জঠরে আছে এক ডজন মর্তমান কলা, আধ ডজন ডিম আর দু-খানা বড়ো পাউরুটি।'

বসন্ত বললে, 'আর আমার 'ফ্লাস্কে' আছে গরম চা! ব্যাস, আজ আর কিছু না থাকলেও চলবে! কর্মভোগের পর রাজভোগ! মন্দ কী!'

নলিন তবু খুঁত খুঁত করতে করতে বললে, 'কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারে—'

আমি বললুম, 'আমার কাছে একটা 'টর্চ' আর দুটো মোমবাতি আছে, সুতরাং—'

বসন্ত বললে, 'সুতরাং দুর্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে এই কোণটা পরিষ্কার করে ফেলা যাক। এখানে যে ধুলো জমে আছে তার বয়স অন্তত একশো বছর!'

দুই

তখনও ভালো করে সন্ধ্যার আসর বসেনি। পশ্চিম দিকের বড়ো বড়ো জানলাগুলো দিয়ে যেটুকু ম্লান আলো আসছিল, তাইতেই ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল আবছা আবছা।

এ হচ্ছে একটা মস্তবড়ো হলঘর—এর মধ্যে অনায়াসে একশোজন লোকের জায়গা হতে পারে। কেবল মেঝের সমস্তটাই নয়—চারদিকের দেওয়ালও শ্বেতপাথরে বাঁধানো। অযত্নে ও কালের প্রভাবে মার্বেলের শুভ্রতা মলিন হয়ে গেছে বটে, তবু তার ভিতর থেকেই নবাবি ঐশ্বর্যের যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল তা মুগ্ধ করে দিলে আমাদের নয়ন মনকে। মাঝে মাঝে রঙিন পাথরের লতা পাতা ফুল বসিয়ে দেওয়ালকে অলঙ্কৃত করা হয়েছে, সে কারুকার্যও অনুপম।

আমি বললুম, 'বোধ হয় এইটেই ছিল নবাববাহাদুরের নাচঘর?'

বসন্ত কবিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করে বললে, 'হায় কী দুর্ভাগ্য! আজ নবাবি নাচঘর স্তব্ধ,—নর্তকীর নূপুরে বাজবে না আর কবিতার ছন্দ—ঘরের হাওয়ায় দুলবে না আর ফুলের মালার গন্ধ! সব 'রোমান্স' মাটি!'

হঠাৎ ওধারের একটা দরজা খুলে গেল সশব্দে।

নলিন চমকে উঠল।

আমি হেসে বললুম, 'ব্যাপার কী নলিন? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন ভয় পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছ।'

নলিনও হেসে বললে, 'একে বাড়িটার নামডাক ভালো নয়, তার উপরে আচমকা দরজাটা খুলে গেল কিনা!'

বসন্ত বললে, 'দমকা হাওয়ায় দরজা খুলে গেল, তাতে হয়েছে কী? তুমি কি ভাবছ দরজা খুলে কোনও বাইজি আমাদের নাচ দেখাতে আসছে? আহা, তা যদি আসত! আমি প্যালা দিতে রাজি!'

নলিন বললে, 'এখানে ওসব কথা আমার ভালো লাগছে না। বসন্ত আলো জ্বালো—খাবার বার করো!'

আমি বাতি জ্বাললুম।

তিন

বাতির আলোতে ঘরের একটা কোণ কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বটে, কিন্তু হাতকয়েক এগিয়েই পরিপূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল সেই ক্ষীণ আলোর ধারা।

পরিত্যক্ত প্রাসাদ, বিজন বন, অন্ধ রাত্রি! কিন্তু এরা কেউ স্তব্ধ নয়। রাত্রির কালো আঁচলের ভিতর থেকে কতরকম চিৎকার করছে কত জাতের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছের ডালে পাতায় বাতাসের হুড়োহুড়ি, বাড়ির ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে যেন সমস্ত দরজা-জানলা!

একখানা এনামেলের ডিশের উপরে ডিমগুলো রেখে আমি পাউরুটি কাটতে লাগলুম। নলিন কলার খোসা ছাড়াতে বসল। বসন্ত 'ফ্লাস্ক' থেকে চা ঢালতে উদ্যত হল। আমি বললুম, 'চা পরে ঢেলো, আগে ডিমগুলোর খোলা ছাড়িয়ে নাও।'

বসন্ত কাছে এসে বললে, 'কোথায় ডিম?'

—'ওই ডিশে।'

—'ডিশে ঘোড়ার ডিম আছে।' বলেই সে খালি ডিশখানা আমার দিকে ঠেলে দিলে।

আমি বললুম, 'চালাকি হচ্ছে? আমি এইমাত্র ছটা ডিম ডিশে নিজের হাত রেখেছি!'

—'তোমার দিব্যি সুরেন, ডিশে আমি একটাও ডিম দেখিনি।'

ডিমগুলো কি আমি ভুলে মাটিতে রেখেছি, আর সেগুলো গড়িয়ে দূরে চলে গেছে? দুটো বাতিই জ্বেলে এবং 'টর্চে'র আলো নিয়ে তিনজনে মিলে ঘরের চারিদিক খুঁজতে লাগলুম, কিন্তু একটাও ডিম আবিষ্কার করতে পারলুম না।

চার

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'তবে কি কোনও জন্তু-টন্তু আমাদের অজান্তে এসে ডিমগুলো নিয়ে পালিয়ে গেছে?

বসন্ত বললে, অসম্ভব!'

—'তবে?'

—'সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন' এ বাড়িতে আমরা ছাড়া নিশ্চয় আরও কোনও মানুষ আছে! হতভাগা চোরকে এখুনি আমি খুঁজে বার করব!'

আচম্বিতে আমিও অনুভব করলুম, ঘরের ভিতরে আমরা ছাড়া যেন বাহিরের কোনও লোক এসে হাজির হয়েছে। কোনওখানে পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে সে যেন অদৃশ্য চক্ষের ছুরির মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে আমাদের প্রত্যেক ভাবভঙ্গি লক্ষ করছে!

মনে মনে শিউরে বলে উঠলুম, 'বসন্ত, বসন্ত এ বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে! এখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি চলো।'

বসন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'না, না,—কীসের ভয়ে পালিয়ে যাব? আগে আমি চোরটাকে ধরে শিক্ষা দিতে চাই!' সে হেঁট হয়ে বন্দুকটা তুলে নিলে।

নলিন সচকিত স্বরে বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! ওই কোণে সাদা মতন কী রয়েছে দ্যাখো!'

ঘরের দক্ষিণ কোণে মেঝের উপরে সত্যই শ্বেতবর্ণ কী যেন অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে! টর্চের আলো তার উপরে পড়তেই দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে গেল!

একজোড়া পা! রক্তমাংসের পা নয়—একেবারে অস্থিসার কঙ্কালের পা! তার চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে, দুই কঙ্কাল পদের উপরে বাঁধা রয়েছে একজোড়া নূপুর!

বসন্ত বললে, 'ও হাড় দু-খানা নিশ্চয়ই ওখানে ছিল, এতক্ষণ আমরা দেখতে পাইনি!'

নলিন কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'না, না! এতক্ষণ ওখানে কিছুই ছিল না!'

আমি বললুম 'নলিন, সেকালের সেই নবাব নাকি তাঁর নর্তকীর দেহকে কেটে কুচি কুচি করে ফেলেছিলেন?'

নলিন আমার কথার জবাব না দিয়ে, আর একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রীতিমতো কান্নার স্বরে বললে, 'ও আবার কী বসন্ত, ও আবার কী?'

চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলুম আর এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য!

এতক্ষণ আমরা ঘরের যেখানে বসেছিলুম ঠিক সেইখানেই পাথরের দেওয়ালের উপর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে দুটো আশ্চর্য চক্ষু! চোখ দুটো গড়া যেন লাল টকটকে পদ্মরাগ মণি দিয়ে এবং তাদের ভিতর থেকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে যেন মৃত্যুভীষণ দুর্দান্ত ক্ষুধা!

বিনাবাক্যব্যয়ে বসন্ত বন্দুক তুলে চোখ দুটোকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপে দিলে—বন্দুকের বিষম গর্জনে ঘর যেন ফেটে গেল—কিন্তু সেই বীভৎস রক্তাক্ত চোখ দুটো জ্বলতে লাগল ঠিক তেমনি জ্বলজ্বল করেই।

ওদিকে বন্দুকের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ভালো করে মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘরের মধ্যে আর একটা অদ্ভুত শব্দ জেগে উঠে আমাদের সর্বশরীর আচ্ছন্ন করে দিলে!

ঠক-ঠক ঠকা-ঠক-ঠক—ঝুনুঝুনু ঝুম-ঝুম-ঝুম! টক-ঠক ঠকা-ঠক-ঠক—ঝুনু-ঝুনু ঝুম-ঝুম-ঝুম!

ঠিক যেন দু-খানা নূপুর পরা হাড়ের পা মেতে উঠেছে নাচের আনন্দে!

পরমুহূর্তে বিকট এক আর্তনাদ করে নলিন ছুটল বাইরের দরজার দিকে!

ঠক-ঠক ঠকা-ঠক-ঠক—ঝুনু-ঝুনু ঝুম-ঝুম-ঝুম!—বেশ বুঝতে পারলুম, নূপুরপরা হাড়ের পা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই! পিছন ফিরে দেখতে ভরসা হল না—এতক্ষণে হয়তো সেখানে আবির্ভূত হয়েছে কোনও ভয়াবহ কঙ্কালমূর্তি!

বসন্ত চিৎকার করে বললে, 'কাপুরুষ! কীসের ভয়ে ও পালাল? এসব হচ্ছে 'হ্যালিউসিনেশন'! মিথ্যা মরীচিকা!

তার হাত ধরে প্রাণপণে টানতে টানতে বাইরের দিকে অগ্রসর হয়ে আমি বললুম, 'পাগলামি কোরো না বসন্ত,—শিগগির বেরিয়ে এসো, এ প্রাসাদ মানুষের পৃথিবীর বাইরে!'

কোর্তা

সরকারি কাজের জন্যে বিহারের একটি ছোটো শহরে কিছুদিন আমাকে থাকতে হয়েছিল। শহরের নাম না বললেও চলবে।

বৈকালে একদিন বেড়াতে বেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে পড়লুম। আমার এপাশে-ওপাশে সবুজ মাঠ আর শস্য খেত। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো পাহাড়। মাঝে মাঝে পড়ন্ত রোদে চকচক করছে নদীর জল। বেড়াতে ভালো লাগছিল।

ফেরবার মুখে আকাশে দেখা দিলে মস্ত একখানা কালো মেঘ। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, কিন্তু আলো হয়ে এল নিবু নিবু। দেখতে দেখতে আকাশ ডুব দিলে অন্ধকারে—দূরে জেগে উঠল একটা অস্পষ্ট শব্দ। বুঝলুম ঝড় এসেছে।

এই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ঝড়ের সঙ্গে আলাপ করা সুবিধাজনক হবে বলে মনে হল না। খানিক তফাতে পথের ধারের জঙ্গলের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছিল একখানা জীর্ণ সেকেলে বাড়ির খানিকটা। সেই দিকেই ছুটলুম।

মাঝারি আকারের দোতলা বাড়ি। তার গা থেকে মাঝে মাঝে চুন-বালির প্রলেপ খসে পড়েছে, এখানে ওখানে গজিয়ে উঠেছে অশথ-বটের দল, কোনও কোনও জানলার পাল্লা ভাঙা। দেখলেই বলা যায়, এ হচ্ছে পরিত্যক্ত বাড়ি।

হোক পরিত্যক্ত, আমার এখন চাই খালি মাথার উপরে একটা আচ্ছাদন। কারণ গাছে দোলা দিয়ে এবং চারিদিকে ধুলো-কাঁকর উড়িয়ে দুর্দান্ত ঝড় তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে দেখলুম, সদরের দু-খানা কবাটই ভেঙে পড়েছে। ভিতরে ঢুকেই বাঁ দিকে পেলুম একখানা ঘর। মেঝের উপরে পুরু ধুলো, কোথাও কোনও আসবাব নেই। তিনটে ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে হু হু করে ঢুকছে ঝড়ের সঙ্গে কাঁকর, ধুলো, বালি।

এ ঘরে মন আশ্রয় নিতে চাইলে না। পায়ে পায়ে বাড়ির ভিতর দিকে এগিয়ে পেলুম একটি উঠান। তারই এক কোণে সিঁড়ির সার। আমি উপরে উঠতে লাগলুম। যেখানে পা দি, সেখানেই পুরু ধুলোর উপরে ছড়ানো হরেক রকম নোংরা জিনিস।

সিঁড়ির পাশেই ছিল একটি ঘর, তারও দরজা খোলা। কিন্তু ঘরের ভিতরে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

আমি ভিতু লোক নই, কোনও রকম কুসংস্কারও আমার নেই। কিন্তু কেন জানি না, আমার পা দুটো যেন হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে আর আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে না। কে যেন নীরবে আমার কানে কানে বললে—ও ঘরে ঢুকো না, ও ঘর নিরাপদ নয়!

এরকম অহেতুকী ভয় আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আকাশে মেঘের সমারোহ দেখছি, চারিদিকে ঝড়ের গর্জনও শুনছি, কিন্তু এখনও দিনের আলো মরে যায়নি। একবার উঁকি মেরেও ঘরের ভিতরে কারুকে দেখতে পেলুম না। নিজের মনে-মনেই হেসে হাতের মোটা লাঠিগাছা ভালো করে চেপে ধরে আমি ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

শূন্য ঘর। কেবল মেঝের এক দিকে পড়ে আছে একখানা ধূলি-ধূসরিত ছেঁড়া মাদুর এবং দেওয়ালের একটা হুকে ঝুলছে লম্বা একটা কোর্তা।

কোর্তাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পুরানো বেরঙা জামা, গায়ে দিলে তার তলদেশটা গিয়ে পড়বে

হাঁটুর নীচে। পুরু বনাতে তৈরি শীতবস্ত্র। কিন্তু এ জামাটকে কেউ এখানে নিশ্চয়ই বেশিদিন আগে ঝুলিয়ে রেখে যায়নি। কারণ জামাটার কোথাও এতটুকু ধুলোর চিহ্ন নেই—যেন এখনও তাকে নিয়মিতরূপে ব্যবহার করা হয়।

হঠাৎ নীচের দিকে চোখ পড়ল। কোর্তার ঠিক তলায় ধুলোর উপরে এবং ঘরের অন্যান্য দিকেও অদ্ভুত সব টানা হ্যাঁচড়ার দাগ! এসব দাগ কীসের? অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। মনে হল, কেউ যেন কোর্তাটাকে ধুলোর উপরে লুটিয়ে ঘরময় টানাটানি করে বেড়িয়েছে। হেঁট হয়ে দেখলুম, কোর্তার তলদেশে ধুলোর চিহ্ন রয়েছে বটে! এমন আশ্চর্য আচরণের অর্থ কী?

কোর্তাটার উপরে হাত রেখে ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে দেখলুম, তার বুকপকেটের উপরে রয়েছে একটা প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া ছ্যাঁদা! এ কীসের ছ্যাঁদা? আর এই ছ্যাঁদার চারিপাশে ওই শুকনো দাগটাই বা কীসের? ও কি রক্তের দাগ? কোর্তার উপরে কেউ কি ছোরার আঘাত করেছিল? তাহলে কি এই জামাটাকে কোনও মৃতদেহের গা থেকে খুলে নিয়ে এইখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে?

মনের ভিতরে জেগে উঠল কেমন একটা ঘৃণার শিহরণ! তারপরেই মনে হল, কোর্তার গা থেকে বেরুচ্ছে যেন পচা মাংসের দুর্গন্ধ! যদিও বুঝলুম, এ হচ্ছে আমার মিথ্যা সন্দেহ বা মনের ভ্রম, তবু কোর্তাটার কাছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হল না। তাড়াতাড়ি সরে এসে ঘরের একটা জানলা খুলে দিলুম।

ঝড়ের গোলমাল কমে এসেছে বটে, কিন্তু তখনও মেঘের ঘোর কাটেনি এবং বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে দেখা গেল প্রায় সিকি মাইল দূরে রয়েছে একখানি বৃষ্টিধৌত গ্রামের ছবি। মনে মনে বললুম, আগে জানা থাকলে এই ছমছমে ভাব ভরা পোড়ো বাড়িতে না এসে ওই গ্রামে গিয়েই আশ্রয় গ্রহণ করতুম! এ যেন অলক্ষুণে বাড়ি! ঘরের ভিতরটা ক্রমেই যেন কেমনতর হয়ে উঠছে। এখানে আমি যেন আর একলা নাই!

হঠাৎ বাইরের বারান্দায় ধপাস করে একটা শব্দ হল—কে যেন মাটির উপরে এক বস্তা কাপড় ফেলে দিলে!

দৌড়ে বাইরে গেলুম। বারান্দায় কোনও কাপড়ের বস্তা বা জনপ্রাণী নেই। এক মুহূর্ত আগে এখানে যে কেউ এসেছিল তারও প্রমাণ পেলুম না। যেই-ই আসুক, ধুলোর উপরে পদচিহ্ন থাকতই। .....কিন্তু তবু একটা শব্দ যে আমি শুনেছি সেবিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কে শব্দ করলে? আর কীসেরই বা শব্দ? এ বাড়িতে কি আমি ছাড়া আরও কেউ লুকিয়ে আছে? কে সে? চোর? ডাকাত? ফেরারি আসামি?

তারপরেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিলে—কারণ স্পষ্ট শুনলুম, যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম তারই ভিতর থেকে যেন কে চাপা গলায় হেসে হেসে উঠছে!

আর ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখবার সাহস হল না! হতে পারে, যা শুনেছি সবই আমার কানের বা মনের ভুল, তবু এরকম সন্দেহজনক বাড়ির ভিতরে আর থাকা উচিত নয়। এরচেয়ে বৃষ্টিতে ভেজাও ভালো।

মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে সিঁড়ির দিকে এগুতে এগুতে ভয়ে ভয়ে আবার পিছন দিকে তাকালুম। ঘরের দরজার ওপাশ থেকে একটা চলন্ত ছায়া যেন বারান্দার উপরে এসে পড়ল এবং পরমুহূর্তে দেখলুম, দরজা জুড়ে বিরাজ করছে সেই সুদীর্ঘ কোর্তাটা!

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম পাথরের মূর্তির মতন—কতক্ষণ ধরে জানি না! কে যেন বিষম এক

সম্মোহন মন্ত্রে আমার নড়বার শক্তি একেবারে হরণ করে নিলে। আমার অসাড় হাত থেকে খসে লাঠিগাছা সশব্দে মেঝের উপরে পড়ে গেল।

কিন্তু আমি ভাববার শক্তি হারালুম না। বেশ বুঝলুম, আমি দাঁড়িয়ে আছি নরকের দূতের সামনে। ও যদি একবার আমাকে স্পর্শও করে তাহলে কেবল আমার দেহই ধ্বংস হবে না, আমার আত্মাও হবে নরকস্থ!

কোর্তা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার ভিতরে এসে আবির্ভূত হয়েছে যেন কোনও ভয়াবহ অদৃশ্য দেহ! জামার হাতার বাইরে হাত নেই, তলদেশে পায়ের চিহ্নও নেই, কিন্তু এইবার সেটা ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

তবু আমি নিশ্চল হয়ে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে আর তাকিয়েই রইলুম।

কোর্তা আসছে, আসছে, এগিয়ে আসছে। পদশব্দ নেই, সে এগিয়ে আসছে যেন শূন্যপথে। .....সে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনেই। তারপর হাতা দুটো বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। এইবারে সে আমাকে স্পর্শ করবে।

হঠাৎ প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলুম, 'ভগবান, ভগবান!'—সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরিয়ে পেলুম আমার সমস্ত শক্তি!

পাগলের মতন হেঁট হয়ে পড়ে মাটির উপর থেকে তুলে নিলুম আমার মোটা লাঠিগাছা এবং সজোরে আঘাত করলুম কোর্তার উপরে! আশ্চর্য! পরমুহূর্তেই সেটা সাধারণ জামার মতোই ঠিকরে পড়ল আমার পায়ের তলায়!

একলাফে জামাটা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে বেগে ছুটে গেলাম। নামবার আগে বিদ্যুতের মতন একবার ফিরে, দেখলুম, কোর্তাটা আবার শূন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছে—যেন সে আবার আমাকে ধরতে আসবে।

তিন-চার লাফে এসে পড়লুম একতলায়।

মানুষ যে কত জোরে ছুটতে পারে, সেদিন সেটা প্রথম অনুভব করলুম। জানলা থেকে দেখা সেই গ্রামের এক মুদির দোকানে না এসে আর থামলুম না।

মাটির উপরে এলিয়ে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'জল! এক গেলাস জল!'

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে মুদির মুখে যা শুনলুম তা হচ্ছে এই—

পঁচিশ বছর আগে ওই বাড়িতে বাস করত এক দারোগা। তার প্রকৃতি ছিল এমন ভীষণ যে, এ অঞ্চলের সাধু-অসাধু সমস্ত লোকই অতিষ্ঠ হয়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে আরম্ভ করেছিল।

হঠাৎ কে একদিন ছোরা মেরে দারোগাকে হত্যা করে যায়। সেই দিন থেকে ও-বাড়ি খালি পড়ে আছে। হাজার টাকা পুরস্কারের লোভ দেখালেও এ অঞ্চলের কোনও গরিব ভিখারিও ওই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে চাইবে না।

ভূত-পেতনির কথা

তোমাদের কাছে আমি কাল্পনিক ভূতের গল্প বলেছি অনেক। কিন্তু সত্যি সত্যি ভূতের অস্তিত্ব আছে কি না, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই।

এসব নিয়ে দরকার নেই আমাদের মাথা ঘামিয়ে। কারুকেই আমি ভূত বিশ্বাস করতে বলি না। অন্তত ভূত মানলেও ভূতকে ভয় করবার দরকার আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ভূত মানি আর না মানি, মাঝে মাঝে এমন কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যাদের কোনও মানে হয় না। সেগুলো ভূতের কীর্তি না হতে পারে, কিন্তু তাদের মূলে নিশ্চয়ই কোনও অপার্থিব শক্তি কাজ করে।

প্রায় বছর কুড়ি আগে কলকাতায় জয় মিত্র স্ট্রিটের একটি বাড়িতে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে। কোথাও কিছু নেই, বদ্ধ ঘরের মধ্যে হঠাৎ একরাশ ইট বা রাবিশ বৃষ্টি হল। চোখের সামনে ঘটি, বাটি ও থালা মাটি থেকে উঠে শূন্যে উড়তে লাগল পাখির মতো, তারপর ঝনঝন করে আবার মাটির উপরে পড়ে ভেঙেচুরে গেল। থানায় খবর দেওয়া হল। পুলিশবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করে সতর্ক পাহারা দিতে লাগল, তবু ওইসব উপদ্রব বন্ধ হল না। অথচ তার কিছুকাল পরে—পুলিশ যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে সরে পড়েছে—তখন সমস্ত উৎপাত আপনা-আপনি আবার থেমে গেল! ওই উপদ্রবের কাহিনি সংবাদপত্রেও প্রচারিত হয়েছিল এবং দলে দলে লোক ঘটনাস্থলে গিয়ে স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করেছিল।

আমাদের নিজেদের ভিতরে দুইবার দুটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে।

অনেক দিন আগে আমরা রাওলপিণ্ডিতে গিয়ে এক বৎসর বাস করেছিলুম। পরিবারের মধ্যে বাবা, মা, আমি আর দুই বোন। পে-অফিস লেন নামক রাস্তায় যে বাড়িখানা আমরা ভাড়া নিয়েছিলুম, সেখানা এখনও বর্তমান আছে কি না জানি না, কিন্তু তখন সে-বাড়িতে সহজে কেউ থাকতে চাইত না। আমরা ভাড়া নেবার পরেই পাড়ার লোকের মুখে খবর পাওয়া গেল, এ বাড়িতে নাকি অনেকরকম ভয় আছে। এর মধ্যে একজন পাঠান নিহত হয়েছে এবং আর একজন পাঠান করেছে আত্মহত্যা। তারপর থেকে এখানে আর কেউ বাস করতে পারে না। বাবা কিন্তু ওসব কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

আমার বয়স তখন অল্প। সব কথা ভালো করে মনে হয় না, তবে কোনও কোনও ঘটনা এখনও ভুলিনি। এক রাত্রে মায়ের ডাকাডাকিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল।

বাবা বিছানার উপরে উঠে বসে বললেন, 'ব্যাপার কী?'

মা বললেন, 'দেখবে এসো।'

আমাদের শোবার ঘরের সামনেই ছিল একটা দালান, তারপর উঠান এবং উঠানের তিন দিকে কয়েকখানা ঘর। বাবা ও মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমিও গেলুম তাঁদের পিছনে পিছনে।

দালান থেকে বেরিয়েই অবাক হয়ে দেখলুম, উঠানের উপরে মাটি থেকে প্রায় চার হাত উঁচুতে জ্বলছে আশ্চর্য একটা আলো। দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, প্রদীপ, বাতি, লণ্ঠন, বা মশাল থেকে সে আলোর উৎপত্তি নয়। নীলাভ আলো, আকার ক্রিকেট বলের মতন। চাঁদের কিরণে ধবধবে উঠানের উপরে আলোটা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত নেচে নেচে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে এক-একটা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে যেন ঠোকর খেয়েই আবার ফিরে আসছে।

মায়ের বাধা না মেনে বাবা উঠানের দিকে অগ্রসর হলেন—আলোটাও হঠাৎ নিবে গেল!

তারপর কয়েক রাত ধরে আর একরকম কাণ্ড! গভীর রাত্রে উঠানের ধারের ঘরগুলোর দরজায় দরজায় শিকল বেজে ওঠে ঝন ঝন ঝন! বাবা বাইরে ছুটে যান, কিন্তু কারুকে দেখতে পান না। হয়তো বাইরের দুষ্ট লোক এসে ভয় দেখাচ্ছে এই ভেবে ভিতরে ঢুকবার দুই দরজার তালাচাবি লাগানো হল কিন্তু তবু থামল না শিকল সংগীত।

মা তো ভয়ে সারা। বলেন, এ অলক্ষুণে বাড়ি ছেড়ে চলো! বাবা কিন্তু অটল। বলেন, আলো দেখিয়ে আর শিকল বাজিয়ে কোনও পাঠান-ভূত আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

পাঠান-ভূতরা শেষটা হতাশ হয়ে আলো দেখানোর ও শিকল বাজানোর কাজে ইস্তফা দিলে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি গুরুতর এবং ঘটনাস্থল হচ্ছে কলকাতা।

আমাদের পৈতৃক বসতবাড়ি ছিল পাথুরিয়াঘাটায়! তিন মহলা বাড়ি, তার পরে একটি হাত দেড়েক চওড়া খানা তারপরে আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের এক সারে তিনখানা বাড়ি। শেষোক্ত তিনখানা বাড়ির মধ্যে একখানা ছিল খালি—ভৌতিক বাড়ি বলে তার ভিতরে কেউ বাস করতে পারত না।

ছেলেবেলা থেকেই আমি ভূতকে ভয় করি না—যদিও ভূতের গল্প শুনতে বা পড়তে খুব ভালোবাসি। মনে আছে বালক বয়সে একদিন কৌতূহলী হয়ে ছাদ থেকে পাঁচিল বেয়ে সেই হানাবাড়িতে নেমেছিলুম—ভূতকে বধ করবার জন্যে আমার হাতে ছিল একখানা কাটারি!

দোতলা ও একতলার প্রত্যেক ঘরে ঢুকে দেখলুম খালি দু-ইঞ্চি পুরু ধুলো এবং ধুলোর উপরে নানা আকারের পদচিহ্ন। একটা ঘরে রয়েছে ধুলো ভরা তৈলহীন প্রদীপের ভিতরে আধপোড়া সলিতা এবং আর একটা ঘরের মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা কঙ্কাল! তোমরা চমকে উঠো না, কারণ সেটা হচ্ছে বিড়ালের কঙ্কাল! ভূত দেখাও দিলে না, কোনওরকম শব্দ-টব্দ করবার বা কথা কইবার চেষ্টা করলে না,—বোধহয় আমার হাতে কাটারি দেখে ভয় পেয়েছিল! অথচ এই বাড়িরই ছাদের উপরে ঘটেছিল একটি রোমঞ্চকর ঘটনা! তখন আমার বয়স দশ বৎসরের বেশি নয়।

আমার বাবার একটি অভ্যাস ছিল। গ্রীষ্মকালের রাত্রে তিনি খোলা ছাদের উপরে শয়ন করতেন। একদিন অনেক রাতে বিষম গোলমালে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি, কাকারা আমার বাবার অচেতন দেহ বহন করে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছেন।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর বাবার জ্ঞান হল। তারপর তখন এবং পরেও বাবার মুখে একাধিকবার যে কাহিনিটি শুনেছি তা হচ্ছে এই

ছাদের উপরে উঠে ঘুমোবার আগে বাবা খানিকক্ষণ পায়চারি করতেন।

দুই-তিন দিন পায়চারি করতে করতে বাবা দেখতে পেলেন, খানার ওপাশে হানাবাড়ির ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এক শ্বেতবসনা নারীমূর্তি।

ওদিকের পাশাপাশি তিন বাড়ির একটা ছাদে উঠলেই অন্য দুটো ছাদের উপরেও অনায়াসে যাওয়া চলত। হানাবাড়ির ও তার পাশের বাড়ির ছাদে ওঠবার সিঁড়ি ছিল না। বাকি যে বাড়ির সিঁড়ি ছিল তার মধ্যে বাস করতেন 'রাঙা গিন্নি' নামে এক বিধবা নারী ও 'তুলসীর মা' নামে এক মহিলা। ছাদের উপরে প্রথম দুই-তিন দিন নারীমূর্তি দেখে বাবা ভেবেছিলেন, গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যে নিশ্চয়ই রাঙা গিন্নি বা তুলসীর মা ছাদের উপরে উঠে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

ঘটনার দিন বাবা অনেক রাতে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছিলেন। আহারাদি সেরে তিনি যখন ছাদের উপরে শয়ন করতে যান রাত তখন প্রায় তিনটে।

নিঝুম রাতে বৈশাখী জ্যোৎস্নায় চারিদিক সমুজ্জ্বল। বাবা সেদিনও স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একটি নারীমূর্তি হানাবাড়ির ছাদ থেকে মেঝের বাড়ির ছাদের উপরে এসে দাঁড়াল।

আজ বাবার মনে কেমন সন্দেহ হল। ওই হানাবাড়িকে পাড়ার সকলেই ভয় করে। ও বাড়ি কেউ ভাড়া পর্যন্ত নেয় না। এই স্তব্ধ শেষ রাতে ওর ছাদের উপরে পাড়ার মেয়ের নিয়মিত আবির্ভাব দেখে তিনি বিস্মিত হলেন।

দূর থেকে বাবা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কে তুমি দাঁড়িয়ে আছ?'

কোনও সাড়া নেই।

বাবা এগুতে এগুতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রাঙা গিন্নি নাকি? ...তুলসীর মা?'

মূর্তি উত্তর দিলে না।

বাবা তখন খানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এতক্ষণে তিনি লক্ষ করলেন, মূর্তির মুখে ঘোমটা। রাঙা গিন্নি বা তুলসীর মা বাবার সমানে ঘোমটা দিতেন না। ওখানে অন্য কোনও মেয়ের আসবার কথাও নয়। তবে কে এই নারী?

মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোতেও তার কাপড়ের ভিতর থেকে দেহের কোনও অংশই দেখা যাচ্ছে না। তার ভাবভঙ্গি বৃদ্ধার মতন নয় বটে, কিন্তু সে যুবতী কি প্রৌঢ়া, তাও বোঝবার উপায় নেই।

বাবা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে খানা ডিঙিয়ে পাশের ছাদের উপরে গিয়ে উঠলেন। তিনি স্থির করলেন, নিশ্চয় এ কোনও মেয়ে-চোর! ধরা পড়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা তার দিকে অগ্রসর হতেই সে পায়ে পায়ে পিছোতে লাগল।

বাবা বললেন, 'দাঁড়াও। শিগগির বলো কে তুমি?'

কোনও জবাব না দিয়ে মূর্তি পিছোতে লাগল। ক্রমে তার সঙ্গে বাবাও হানাবাড়ির ছাদের উপরে গিয়ে পড়লেন।

নারীমূর্তি একেবারে ছাদের ধারে গিয়ে দাঁড়াল—তারপর আর পিছোবার উপায় নেই।

—'আর কোথায় পালাবে? এখন আমার কথার জবাব দাও। কে তুমি?' বলে বাবা আরও দুই পা এগিয়ে গেলেন।

তারপর যা হল সেটা একেবারেই কল্পনাতীত। বাবা যখন মূর্তির কাছ থেকে মাত্র এক হাত তফাতে, তখন পূর্ণ চন্দ্রালোকেই সেই অদ্ভুত স্ত্রীলোকটি যেন হাওয়ার ভিতরে মিলিয়ে গেল।

বাবা অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, তিনি যে ভূতকে ভয় করতেন না একথা আমি জানি। কিন্তু এই অপার্থিব ও অসম্ভব দৃশ্য দেখে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল এবং তিনি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে আমাদের বসতবাড়ি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের অংশে পড়ে বাড়ির পিছন দিকটা। খানার ধারে হানাবাড়ির ঠিক পাশেই তেতলার ঘরে আমি বহু বৎসর শয়ন করেছিলুম, কিন্তু প্রেতিনী-দর্শনের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনওদিন আমার হয়নি।

বাবা এর পরেও গ্রীষ্মকালে ছাদে শয়ন করতেন, কিন্তু কোনও ছায়ামূর্তিই আর তিনি দেখতে পাননি। হানাবাড়িখানাও পরে সংস্কার করে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনও ভাড়াটিয়া ভূতের ভয় পেয়েছে বলে অভিযোগ করেনি।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী, নির্ভীক, স্বল্পবাক ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তিনি যে মিথ্যা ভয় পেয়েছিলেন বা কাল্পনিক গল্পকে সত্য বলে চালিয়েছিলেন, এমন অসম্ভব কথা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারি না।

পোড়ো-মন্দিরের আতঙ্ক

কলকাতা থেকে আমার কলেজের তিনজন সহপাঠী বন্ধু এসেছিল আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে। তাঁদের নিয়েই আমি সেদিন বৈকালে গিয়েছিলাম গাঁ ছাড়িয়ে মাইল দেড়েক দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে। ওখানকার ময়ূরাক্ষীর দুই তীরের শোভা বড়োই নয়নমুগ্ধকর। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার কোল অবধি নদীর ধারে বসে গল্প-গুজব করে তারপর বাড়ি ফিরব। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আসতে পথে সাপ-খোপের সম্মুখীন হতে পারি, এই ভয়ে বাবার পাঁচ সেলের টর্চটা সঙ্গে এনেছিলাম।

গরমকাল। সাড়ে ছ-টাতেও তখন অনেক বেলা। প্রায় সাড়ে ছ-টাই হবে তখন। আমরা চারজনে কবিগুরুর একটা গান নিয়ে আলোচনা করছি। আলোচনায় আমরা এতই মশগুল ছিলাম যে, পশ্চিম দিক থেকে কালো মেঘ উঠে কখন যে প্রায় অর্ধেকটা আকাশ ঢেকে ফেলেছে খেয়ালই হয়নি। হঠাৎ ঝড় উঠতে খেয়াল হল। আমরা ধড়মড় করে উঠে পড়ে একরকম ছুটতে ছুটতেই বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম। আমি জানি এই দেড় মাইল পথের মধ্যে কোনো ঘরবাড়ি নেই—অর্থাৎ বৃষ্টির হাত থেকে শরীর বাঁচাবার মতো কোনও আশ্রয় নেই।

বরাত মন্দ। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই দৈত্যের মতো কালো মেঘটা সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে ঝড়ের সে কী বেগ!

প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম আমরা চারজনে। ছুটতে-ছুটতেই আমার খেয়াল হয়ে গেল যে, আর একটু এগোলেই আমাদের ডান পাশে পড়বে একটা পোড়ো-কালীমন্দির। সেখানে গিয়ে উঠলে ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ওই মন্দিরের ধারে কাছে কেউ ঘেঁষে না, আমারও মন চাইছিল না ওদিকে যাবার। গাঁয়ের অন্য সকলের মতো ওই মন্দিরের প্রতি আমার মনেও ভয় আছে। অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ আজ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি কারও ক্ষেত্রে—ভয়টা কেবল সংস্কারবশেই। তবু আমি যদি একা থাকতাম, তাহলে হয়তো একা থাকার জন্যেই ওই মন্দিরে যেতে ভয় পেতাম। কিন্তু আমরা রয়েছি চারজন, সঙ্গে পাঁচ সেলের টর্চ। অযথা ভয় পাবার কোনও কথাই নয়। তাই মনে সাহস পেয়ে আমি বন্ধুদের নিয়ে ভিজে গোবর হয়ে ওই পোড়ো-মন্দিরটার চাতালে গিয়ে উঠলাম।

বেশ বড়োসড়ো মন্দির। মন্দিরের দুই পাশে ও পিছনে আরও খানচারেক ঘর আছে। এই মন্দির ছিল একজন তান্ত্রিকের। ঘরগুলির মধ্যে একটাতে নাকি মায়ের ভোগ রান্না হত, অন্য ঘরগুলিতে চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে তান্ত্রিক বাস করত।

মন্দির ও ঘরগুলির কিছু কিছু অংশ এখন ভেঙে পড়েছে। দেওয়ালে ছাদে গাছপালা গজিয়েছে, মন্দিরপ্রাঙ্গণ লতাগুল্মের ঝোপেঝাড়ে আবৃত। এমন মুষলধারে বৃষ্টি না নামলে আমি কখনওই এই পোড়ো-মন্দিরে আশ্রয় নিতাম না।

এখন মাত্র সন্ধ্যা-রাত। কিন্তু জায়গাটার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, যেন এখন মাঝরাত।

বন্ধু শ্যামল বলল, আচ্ছা জায়গায় আমাদের নিয়ে এলি বটে, সাপ-খোপে কামড়াবে না তো?

আমি টর্চটা জ্বেলে চারিদিকে দেখে নিয়ে বললাম, দেখে তো সেইরকমই মনে হচ্ছে। কী করব ভাই, যা বৃষ্টি নামল, বাড়ি যে এখনও অনেক দূর। এই বৃষ্টিতে এতখানি রাস্তা ভিজলে সবাইকেই জ্বরে পড়তে হত।

আরেক বন্ধু রতন বলল, সেকথা সত্যি। কী মন্দির ছিল রে এটা? দেখে তো মনে হচ্ছে এককালে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পুজো-আচ্চা হত এখানে।

বললাম, হ্যাঁ, মারাত্মক রকমের জাঁকজমক সহকারেই এখানে কালীপ্রতিমার পুজো হত শুনেছি। সে জাঁকজমক এতই মারাত্মক ছিল যে, কোনো লোক পুজো দেখা তো দূরের কথা, কোনোদিন প্রতিমা দেখতেও এখানে আসত না।

একথা শুনে শ্যামল, রতন ও অজয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, শোন তবে এই মন্দিরের ইতিহাস, যেটুকু আমি জানি। আমার ঠাকুরদার বয়স যখন ছিল চব্বিশ-পঁচিশ, সেই সময় এই মন্দিরে কালীসাধনা করত একজন তান্ত্রিক কাপালিক। শুনেছি, সেই কাপালিকের চেহারা এতই ভয়ংকর ছিল যে, কোনো সাধারণ মানুষ তার ধারে কাছে যেত না। সাত-আট জন চেলা ছিল তার, তাদের চেহারাও ছিল ভয়ঙ্কর। ওই যে বেদিটা দেখছিস, ওই বেদির ওপর থাকত কালীমূর্তি। তখন কেউই জানত না যে, ওই মূর্তিটা নকল কি আসল মূর্তি। অর্থাৎ নীচেকার একটা গোপন কক্ষে। মন্দিরের পিছন দিকে একখানা ঘর আছে। সেই ঘরের মেঝের মধ্যে দিয়ে নীচেকার ঘরে যাবার সিঁড়ি আছে। এই ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে টের পেয়ে যায় আমাদেরই গাঁয়ের একদল ছেলে। দলে তারা ছ-জন ছিল। সেদিন তারা গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে এক বউভাতের নিমন্ত্রণ খেতে। খেয়েদেয়ে যখন তারা ফিরছিল, রাত তখন এগারোটা।

আমরা আজ যে কারণে মন্দিরে এসে ঢুকলাম, সেদিন তারাও ঠিক একই কারণে এই মন্দিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। আজকের মতো সেদিন রাতেও এমন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। তারা এই মন্দির চাতালে উঠে দেখে, প্রতিমার দরজা বন্ধ। মানুষের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা ভাবল, কাপালিক ও তার চেলা-চামুণ্ডারা সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় তাদের কানে পৌঁছায় পুজোর ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু ঘণ্টার যে আওয়াজ তাদের কানে আসছিল, সে আওয়াজটা ছিল খুব চাপা ও ক্ষীণ। প্রথমটা তাদের মনে হয়েছিল, খানিকটা দূর থেকে বোধহয় আওয়াজটা আসছে, তাই এমন চাপা মনে হচ্ছে। তারপরই তাদের খেয়াল হল যে, এই মন্দিরের চারিপাশের প্রায় মাইলখানেক জায়গার মধ্যে কোনও বাড়িঘর, লোকবসতি নেই। তবে... তবে ওই ঘণ্টার শব্দ আসছে কোত্থেকে? পুজোর সময় পুরোহিত যে ঘণ্টা বাজায়, সেই ঘণ্টার শব্দ। তাহলে নিশ্চয় এই মন্দিরের মধ্যেই অন্য কোনো ঘরে পুজো হচ্ছে। এই কথা মনে হতেই ওই ছ-জন ছেলে উঠে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে তিনজনের টর্চ ছিল। একজন বলল, চল না, ভেতরের দিকটা একবার চুপি চুপি ঘুরে দেখে আসি, কোথায় কী পুজো হচ্ছে।

যতগুলো ঘর ওই মন্দিরের ভেতরে ছিল, সব ঘরের দরজাই তারা বন্ধ দেখল। ছেলেরা প্রত্যেকটি দরজার গায়ে কান দিয়ে বুঝল, না, এসব ঘরের মধ্যে কোনো আওয়াজ নেই। তবে ঘণ্টার শব্দ আসছে কোত্থেকে? তারপর তারা মন্দিরের পিছন দিকে যেতেই তাদের মনে হল, যেন ঘণ্টার আওয়াজটা এখানে স্পষ্ট। টর্চের আলোয় দেখল, সেখানে একটা ঘর রয়েছে, এবং ঘরের দরজাটাও আধখোলা অবস্থায় রয়েছে।

ছেলেরা এবার আরও হুঁশিয়ার হল। ঘরটার মধ্যে কোনও লোকজন থাকতে পারে বলে তাদের মনে সন্দেহ হওয়ায় তারা অন্ধকারের মধ্যে গা মিশিয়ে নিশ্চুপে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু ওই ঘরটাও জনশূন্য রয়েছে, এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে তারা সকলে ধীরে ধীরে ওই কক্ষে প্রবেশ করল। ভেতরে কী আছে এটাই তারা দেখতে চায়। কিন্তু ঘরটার মধ্যে ঢুকতেই ঘণ্টার শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবার তারা বুঝল, ওই ঘরের মধ্যেই ঘণ্টাধ্বনির রহস্য লুকিয়ে আছে। টর্চের আলোয় তারা ঘরের মেঝেতে একটা বিরাট চৌকো ভারী লোহার পাত দেখতে পেল। লোহার পাতটা দেখে তাদের মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগল। খুব সন্তর্পণে পাতটার দিকে এগিয়ে একজন সেটা টেনে সারাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা এত ভারী একজনের পক্ষে টেনে

সরানো সম্ভব নয়। তখন তারা করল কী, চারজনে ধরে সেটাকে এমন সাবধানে টানতে লাগল যাতে কোনো রকম শব্দ না হয়। খানিকটা টানতেই একটা গর্তের মুখ তারা দেখতে পেল এবং সেই ঘণ্টার শব্দ একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝল, এই ঘরের নীচেকার কোনো চোরাকুঠুরিতে ঘণ্টা বাজছে, এবং সেই ঘরে যাবার এটাই হল গুপ্তদ্বার।

ছেলেরা রহস্যের গন্ধ পেল। এমন গুপ্তকক্ষে পূজা-আচ্চা করার কারণ কী? নিগূঢ় কারণ নিশ্চয় কিছু একটা আছে, এবং সে কারণ জানবার জন্য তাদের সকলকার ডানপিটে মন আনচান করে উঠল। তারা সেই লোহার পাতটাকে আরও খানিকটা সরিয়ে গুপ্তদ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে ফেলল। তাদের নজরে পড়ল, কয়েক ধাপ সিঁড়ি সোজা নীচের দিকে নেমে গিয়ে ডান দিকে বেঁকে গেছে। গুপ্তকক্ষে যে আলো জ্বলছে, তারই আলোয় আলোকিত হয়ে আছে সিঁড়ির বাঁকের মুখটা। ফলে সমস্ত সিঁড়িটাই মোটামুটিভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপর ছেলেরা মুহূর্তকালের জন্য একবার চুপি চুপি যুক্তি করে স্থির করে নিল যে, তারা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা নীচে নেমে দেখে আসবে কী ধরনের পুজো ওখানে হচ্ছে, যে পুজোর জন্যে এত গোপনীয়তার প্রয়োজন!

সিঁড়ির সেই বাঁক অবধি নেমে ছেলেরা সন্তর্পণে ডান দিকে দৃষ্টিপাত করে যা দেখতে পেল, তাতে তারা ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল! তারা দেখল, দরজা-জানালাবিহীন মাঝারি আকারের একখানা ঘর, ঘরখানার একপাশে হাত তিনেক লম্বা এক কালীপ্রতিমার সামনে একজন ভয়ংকর-দর্শন তান্ত্রিক কাপালিক পূজায় মগ্ন। তার আশেপাশে কয়েকজন চেলা-চামুণ্ডা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন একটি দশ-বারো বছরের বালক ধরে আছে, আর-একজনের হাতে রয়েছে একটি তীক্ষ্ণধার খড়্গ। এ ছাড়া ঘরখানার একটি কোণে জড়ো করা ছিল কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ বর্শা এবং আরও গোটা চারেক খড়্গ।

ছেলেরা বুঝল, এই মন্দিরের আসল পূজা এখানেই হয়, এবং নরবলি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে কাপালিক পূজা শেষ করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং ঘাতকের দিকে চেয়ে ইশারায় বলির নির্দেশ দিল। ইশারা পেয়ে ঘাতক খাঁড়াটাকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরল, আর সেই চেলা দুজন বালকটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল প্রতিমার সামনে।

এর পরের অমানুষিক মর্মান্তিক দৃশ্যটি দেখবার জন্যে গাঁয়ের সেই ছেলেরা

আর সেখানে অপেক্ষা করেনি। কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। ওই অসহায় বালকটিকে বাঁচাবার জন্য সেসময় ছেলেগুলোর মনে প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা জেগে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারা বুঝেছিল যে, বাধা দিতে গেলে ওই সশস্ত্র দুর্ধর্ষ, কাপালিকগণের হাতে তাদের মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাই তারা আবার চুপি চুপি উপরে উঠে এসে লোহার পাতটা আগেকার মতোই চাপা দিয়ে রেখে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু ওই হিংস্র নরঘাতক কাপালিকদের কথা তারা ভুলতে পারল না। ওই কাপালিকরা ইতিপূর্বে কত যে শিশুহত্যা, নরহত্যা করেছে, তার হয়তো ইয়ত্তা নেই। তবে ওইসব বলি ওরা ছেলে চুরি যাওয়ার অপবাদের জন্য আশপাশের গাঁ থেকে জোগাড় করত না। তা যদি করত, তাহলে আমাদের গাঁয়ের মধ্যে ভীষণ একটা হইচই পড়ে যেত। কিন্তু সেরকম কিছু শোনা যায়নি কোনোদিন। ওরা নিশ্চয় কোনো দূরদেশ থেকেই বলি জোগাড় করত।

যাই হোক, ভবিষ্যতে আর যাতে তারা কোনো মানুষ খুন করতে না পারে, ছেলেরা তার যথাযথ প্রতিকার করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। নির্জনে অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি করে তারা স্থির করল যে, ওই কাপালিক ও তার চেলাদের সকলকে তারা হত্যা করবে। এবং কীভাবে হত্যা করবে, তারও একটা সাংঘাতিক উপায় স্থির করে ফেলল।

দিন ছয়-সাত পরই একদিন রাত দশটা নাগাদ তারা আবার এই মন্দিরের নিকটে এসে পৌঁছাল। তাদের সঙ্গে ছিল বড়ো বড়ো টিনের দু-টিন পেট্রল। এসব ব্যাপার তখনও পর্যন্ত তারা গাঁয়ের কোনো লোককেই জানায়নি। জানিয়েছিল কাপালিকদের হত্যা করার পরে।

মন্দিরের নিকটবর্তী বড়ো একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা মন্দিরটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেও কোনো জন-মনিষ্যির সাড়াশব্দ পেল না। তখন তারা নিঃশব্দে মন্দিরের চাতালে গিয়ে উঠল। তারপর পিছন দিকের সেই ঘরখানার নিকট হতেই তাদের কানে ঘণ্টার চাপা আওয়াজ ভেসে এল। এতক্ষণে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারল। যাক, পুজো হচ্ছে এবং কাপালিকেরা তাহলে সেই পুজোর ঘরেই আছে।

অতঃপর তারা এসে হাজির হল সেই গুপ্তদ্বারের নিকট। তাদের এর পরের কার্যকলাপ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শেষ হল। একজন একটু তফাতে সরে গিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা কাগজ ধরাল, আর-একদিকে অন্য ছেলেরা লোহার পাতটা সরিয়ে ফেলেই সেই গুপ্ত-গহ্বরের মধ্যে দু-টিন পেট্রল সম্পূর্ণ

ঢেলে দিল। তারপর সেই জ্বলন্ত কাগজের টুকরোটা ভেতরে ফেলে দিতেই দপ করে গহ্বরের মধ্যে করাল অগ্নি জ্বলে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তকক্ষের দরজাটাও তারা আবার বন্ধ করে দিল সেই লোহার পাতটা দিয়ে।

ততক্ষণে গুপ্তকক্ষের মধ্যে কাপালিকদের বীভৎস অন্তিম চিৎকার শুরু হয়ে গেছে! কিন্তু সে চিৎকার অতি অল্পকালের মধ্যেই থেমে গেল...প্রচণ্ড নিঃস্তব্ধতা নেমে এল তারপর।

শত্রু ধ্বংস করে ছেলের দল বীরবিক্রমে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সকলের কাছে প্রকাশ করেছিল তাদের দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানার কথা। শুনে গাঁয়ের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মন্দিরের ধারেকাছে আগেও যেমন কেউ আসত না, কাপালিকদের মৃত্যুর পরও কেউ কোনো দিন শখ করে এদিকে আসেনি। সেদিন সেই ছেলেরা যেমন এসেছিল, আমরা আজ যেমন এলাম, তেমনি নিতান্ত দায়ে পড়ে হয়তো কেউ কদাচিৎ এদিকে এসে থাকতে পারে।

গল্প শেষ করে আমি চুপ করতেই অজয় বলল, এমন কাণ্ড!

অপর দুই বন্ধু নীরব।

হঠাৎ ভয়ে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল। সর্বশরীর কুঁকড়ে গেল আমার। হ্যাঁ, বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি ঘণ্টার শব্দ! যদিও খুব চাপা তথাপি সাংঘাতিক রকমের স্পষ্ট যেন! সেই বহুকাল আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি এই মন্দিরের চারিপাশে প্রায় মাইলখানেক জায়গার মধ্যে কোনো ঘরবাড়ি নেই। তবে? তবে কোত্থেকে আসছে এই ঘণ্টার শব্দ? সেই গোপন কক্ষে আবার কি কোনও নতুন কাপালিক আশ্রয় নিয়েছে? উঁহু, মন্দিরের যা পোড়ো অবস্থা, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে কোনো লোক বাস করে না। মন্দিরের সর্বত্র ধুলো-বালি, শুকনো পাতা, কাঠি-কুটিতে ভরতি। দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে গাছপালা জন্মেছে। লোক বাস করলে মন্দির চাতালে এমন এক ইঞ্চি পুরু ধুলো-বালিও জমে থাকত না—শুকনো কাঠি-কুটিও পড়ে থাকত না। তবে? এই ঘণ্টার আওয়াজ আসছে কোথা থেকে? এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই আসছে—তা ছাড়া আবার কোথা থেকে আসবে?

শ্যামল, অজয় আর রতন এদের কানেও পৌঁছেছে ঘণ্টার শব্দ।

অজয় দুই ভ্রূ কুঁচকে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, ঘণ্টার আওয়াজ আসছে না?

আমি বললাম, হুঁ!

সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম, অপর বন্ধু জ্বলজ্বলে চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অজয় হচ্ছে পয়লা নম্বরের ডানপিটে ছেলে—অত্যন্ত সাহসী। সে আমাকে শুধাল, এ ঘণ্টার আওয়াজ কোত্থেকে আসছে বলে মনে হয় তোর? আগে তো কাছাকাছি কোনো ঘরবাড়ি ছিল না শুনলাম, এখন?

—না, এখনও তেমনি—মাইলখানেকের মধ্যে বাড়িঘর কিছু নেই।—বললাম।

—তাহলে? ক্ষণকাল ভাবল অজয়। তারপর পুনরায় বলল, তাহলে কি আবার কেউ বা কারা সেই ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে পুজো করছে? অবশ্য দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে না, বিশ বছরের মধ্যেও এখানে কোনও লোক বাস করছে। যাই হোক, ব্যাপারটা না দেখে ছাড়ছি না। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই আওয়াজটা আসছে। চল তো, সেই ঘরটার মধ্যে নিয়ে চল আমাকে, যে ঘরটায় বলছিলি লোহার পাতে ঢাকা গুপ্তপথ আছে।

বললাম, সে ঘর তো আমি জানিনে—তবে শুনেছি পিছন দিকে—দেখি চল।

আমার সেদিকে যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পাছে শহরের বন্ধুদের কাছে আমি ভিতু কাপুরুষ প্রতিপন্ন হই, সেই ভয়েতেই আমাকে ওদের নিয়ে যেতে হল। মন্দিরের পিছন দিকে পৌঁছাতেই ঘণ্টার আওয়াজ খানিকটা স্পষ্ট হল।

ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। কম্পিত গলায় বললাম, হ্যাঁ, সেই ঘরেতেই ঘণ্টা বাজছে, কোনও ভুল নেই। আবার কারা এল?

আমি ভীত হয়ে পড়েছি, অজয় বোধহয় তা টের পেয়ে বলল, কী রে বিপিন, তুই কি ভয় পাচ্ছিস?

—না-না-না, ভয় পাব কেন? তবে...তবে...ভাবছি আবার কোনও নরবলি-টরবলি হচ্ছে না তো?

অজয় বলল, দেখা যাক না কী হচ্ছে?

আমি বুঝতে পারলাম, রতন বা শ্যামলেরও এসব ব্যাপারে উৎসাহের অভাব রয়েছে। ওরা দুজনও কেমন যেন মিইয়ে রয়েছে। আমার মতোই অবস্থা আর কী! ভিতু কাপুরুষ প্রতিপন্ন হতে চায় না বলেই নিরুত্তরে এগিয়ে চলেছে।

অজয় আমার কাছ থেকে আগেই টর্চটা নিয়েছিল। টর্চের আলোয় দুই পাশ দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চলেছিল। যে ক-টা ঘর দেখলাম, কোনো ঘরেরই দরজা-জানালা নেই। সব উই-এ নষ্ট করেছে আর ভেঙেচুরে পড়েছে। সর্বত্র ধুলো-বালি, নোংরা ইত্যাদিতে ভরা। এখানে কোনো লোকের যাওয়া-আসা থাকলে এই পুরু ধুলোর ওপর পায়ের দাগ নিশ্চয় থাকত। কোনো পদচিহ্ন নেই—এমনকি কোনও জন্তু জানোয়ারের পর্যন্ত না। শুধু আমরাই ক-জন সুস্পষ্ট পদচিহ্ন ফেলে এগিয়ে চলেছি।

—অসম্ভব, এখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে না! কথাটা আচমকা বলল অজয়।

—তবে?—আমি আর শ্যামল দুজনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করে বসলাম।

অজয় বলল,—'তবে'টা যে কী, সেটাই তো জানতে যাচ্ছি।

আমরা সেই ঘরটার মধ্যে এসে হাজির হলাম। মুখে চোখে মাকড়সার জালের স্পর্শ পাওয়া গেল। এ ঘরে লোকের যাওয়া আসা থাকলে কি এমন মাকড়সার জাল ছড়িয়ে থাকত?

এবার উজ্জ্বল টর্চের আলোয় মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, একটা বিরাট মরচে ধরা লোহার পাত পড়ে রয়েছে। ঘরের মেঝে ও লোহার পাতটার ওপর আধইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ জমে রয়েছে। এখানে ঘণ্টার শব্দ আরও স্পষ্ট। একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে—মনে হচ্ছে যেন আরতি হচ্ছে।

আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এই ঘরের নীচে থেকেই ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। যেখানে লোকজনের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে ঘণ্টা বাজে কী করে? এ কী অলৌকিক কাণ্ড! আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল! ভীষণ একটা বিপদের ইঙ্গিত পাচ্ছি যেন।

—আশ্চর্য! অদ্ভুত!—অজয় নির্নিমেষ দৃষ্টিতে লোহার পাতটার দিকে তাকাতে তাকাতে কথাটা বলল।

শ্যামল বলল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বহুকাল এ ঘরে কোনও মানুষের পদার্পণ হয়নি, অথচ নীচেকার ঘরে ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টাটা আপনা-আপনি বাজছে না নিশ্চয়ই, মানুষেই বাজাচ্ছে তো! তবে কি সে মানুষ হাওয়ায় মিশে নীচেকার ঘরে গেছে—যার জন্য তার পায়ের ছাপ পড়েনি!

অজয় বলল, সত্যিই ভাববার কথা! এ রহস্যের কারণ জানতেই হবে।

এবার আমরা সকলে মিলে লোহাটা টেনে সরাতেই গুপ্তপথ নজরে পড়ল। আর সেই সঙ্গে ঘণ্টার আওয়াজটাও একেবারে কানের কাছে এগিয়ে এল।

কিন্তু কী অন্ধকার গর্তটা! সিঁড়ির একটা ধাপও নজরে পড়ছে না। নীচেকার ঘরে নিশ্চয় কোনও আলো জ্বলছে না। ছোটো একটা প্রদীপ জ্বললেও তার আলোর রেখা নিশ্চয় আমাদের নজরে পড়ত। এবং সিঁড়ির নীচেকার দিকটাও অন্তত আবছাভাবে আলোকিত হয়ে থাকত। তবে কি পুরোহিত অন্ধকারে বসেই পুজো করছে? এ কী অস্বাভাবিক ব্যাপার!

অজয় চুপি চুপি বলল, আমার পিছু পিছু আয় তোরা। খুব সাবধানে নামবি, টর্চ জ্বালব না। কোনো রকম শব্দ-টব্দ হয় না যেন!

দু-পাশের দেওয়াল ধরে ধরে নিঃশব্দে সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত নেমে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার আওয়াজ থেমে গেল। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা। অস্বাভাবিক অন্ধকারে আমরা চারজনে যেন অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি! এত নিরেট অন্ধকার জীবনে কোনো দিন দেখিনি।

আমরা সকলে গায়ে গা ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও মানুষ-জনের তো দূরের কথা, একটা আরশোলার অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পেলাম না।

হঠাৎ অজয়ের হাতের পাঁচ সেলের টর্চটা জ্বলে উঠল। টর্চটায় ছিল নতুন ব্যাটারি। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারিদিক। দেখতে পেলাম, সেই গুপ্তকক্ষের মেঝের ওপর কতকগুলো নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। প্রতিমা যেখানে ছিল, সেখানে পোড়া-প্রতিমারও কিছু অংশ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের একটা কোণে সেই বর্শা আর খাঁড়াগুলোও রয়েছে, আর একটা খাঁড়া পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাছাকাছি জায়গায়। পূজার ঘণ্টা এবং কয়েকটা থালা কোশাকুশী ইত্যাদি প্রতিমার সামনে পড়ে রয়েছে। এ সমস্ত জিনিস আগুনে পুড়ে এবং তার ওপর ধুলোর আবরণ জমে এমন চেহারা হয়েছে যে, বোঝবার উপায় নেই কোনটা লোহার তৈরি, কোনটা তামার বা কোনটা পিতলের জিনিস।

বেশ কিছুক্ষণ ঘরটা দেখে নিয়ে অজয় গলায় বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, অসম্ভব! এ ঘরে কখনোই ঘণ্টা বাজছিল না। ঘণ্টার শব্দ অন্য কোথাও থেকে আসছিল। আমাদের সকলকারই শোনার ভুল হয়েছে। আর এখানে নয়—ওপরে যাওয়া যাক।

আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, কথা বলার সময় অজয়ের গলা কাঁপছিল। আর আমার নিজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কী যেন এক নিদারুণ ভয়ে আমি ঘেমে উঠলাম।

যাই হোক, আমরা ওপরে উঠতে শুরু করলাম। সবার আগে আছি আমি, আর সবার নীচে টর্চ হাতে অজয়।

অকস্মাৎ অজয়ের আর্ত চিৎকারে আমরা ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। আঁ আঁ আঁ করে চিৎকার করতে করতে অজয় বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর। তার হাত থেকে টর্চটা খসে পড়েই নিবে গেল। অজয়ের চিৎকার শুনলাম ওরে তোরা আমাকে বাঁচা—বাঁচা—

তারপরই চুপ।

আমরা হুড়মুড় করে নেমে গেলাম অজয়ের কাছে। টর্চটা কোথায় পড়েছে কে জানে, আমরা তো সেই অন্ধকারের মধ্যেই অজয়কে ধরাধরি করে কোনও রকমে নিয়ে এলাম ওপরে। বুঝলাম, অজয়ের জ্ঞান নেই।

তারপর কীভাবে অত কষ্ট করে যে অচৈতন্য অজয়কে নিয়ে সে রাতে বাড়ি পৌঁছেছিলাম, সে কথা এখানে না বললেও চলবে।

ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু একটা দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

ডাক্তারের কথা সত্য প্রমাণিত হল অজয়ের জ্ঞান ফেরার পর তার মুখ থেকে সব কথা শুনে। জ্ঞান অবশ্য ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরেছিল—কিন্তু সে মোহাচ্ছন্নের মতো ছিল পরদিন বেলা প্রায় আটটা অবধি। বেলা দশটা নাগাদ তাকে বেশ খানিকটা সুস্থ মনে হতে আমরা গত রাতের ঘটনাটার কথা তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে সে বলেছিল যে, তার মনে হয়েছিল একজন ভীষণ-দর্শন কাপালিক এক হাতে তাকে চেপে ধরে অন্য হাতে ধারালো খাঁড়া তুলে তার গলায় একটা কোপ বসিয়ে দিয়েছিল। তাই অমনভাবে সে চিৎকার করে উঠেছিল।

তার মুখে একথা শুনে তখুনি গাঁয়ের প্রায় বিশ-পঁচিশজন যুবক সেই পোড়ো-মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল। শ্যামল, রতন আর আমি আগে আগে চললাম। সকলের মনেই সেই ঘরটা দেখার তীব্র আগ্রহ। দিনের বেলা বেশ ভালোভাবেই দেখাশোনা যাবে। এতকাল কারও মনে কোনো আগ্রহ জাগেনি—আজ এত বছর এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় গাঁয়ের আজকালকার তরুণ যুবকেরা কৌতূহল দমন করতে পারল না।

দিনের বেলা হলেও সেই পাতালকক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে অনুমান করে নিয়ে আমি গোটা চার-পাঁচ টর্চ নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রায় জনা দশেক টর্চ নিয়ে এসেছে।

গুপ্তদ্বারের সামনে এসে দেখা গেল, সত্যই ভেতরটা বেশ অন্ধকার। যাই হোক, আমরা টর্চগুলো জ্বেলে একে একে নামতে লাগলাম নীচে।

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে নেমে আমার টর্চটা পেয়ে গেলাম। কিন্তু একী! এখানে একটা নরকঙ্কাল এল কী করে? দেখেই শিউরে উঠলাম। বেশ মনে আছে, এখানে সিঁড়ির গোড়ায় তো কোনও কঙ্কাল ছিল না। কঙ্কালগুলো তো সবই দেখেছিলাম ঘরের মেঝের ওপর এদিকে ওদিকে পড়ে ছিল। আরে, পায়ের কাছে বিরাট একখানা খাঁড়া পড়ে রয়েছে দেখছি। কঙ্কাল, খাঁড়া—না কক্ষনো না,

এসব মোটেই এখানে ছিল না। ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রতিমার কাছে যে খাঁড়াটা পড়ে ছিল, সেটা তো সেখানে নেই।

সবগুলো টর্চের আলোয় ঘরখানা প্রায় সাদা হয়ে গেছে। অন্য সকলে অবাক চোখে ঘরের মধ্যে যা যা রয়েছে সেই সব লক্ষ করছে। কিন্তু আমার নজরে যা পড়ছে তা আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য, একেবারে অলৌকিক ব্যাপার! প্রতিমার কাছে যে খাঁড়াটা পড়ে ছিল, সেখানে খাঁড়াটা নেই বটে, কিন্তু সেই জায়গায় খাঁড়ার ছাপটা জ্বলজ্বল করে যেন জ্বলছে! বহুকাল ধরে ঘরের মেঝে ও জিনিসপত্রের ওপর বেশ পুরু একটা ধুলোর আস্তরণ জমেছিল। কাজেই সেখান থেকে খাঁড়াটা উঠে আসার জন্যই অমন সুস্পষ্ট ছাপটা দেখা যাচ্ছে। আর ওখানকার ওই খাঁড়াটাই যে এখানে এসে পড়েছে, এ বিষয়ে আমার মনে কোনো রকম সন্দেহ রইল না। শুধু খাঁড়াটাই নয়, ওই একই রহস্যজনক উপায়ে কঙ্কালটাও যে ঘরের মেঝে থেকে উঠে এসেছে এখানে, সে বিষয়েও আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মাল। কিন্তু এই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার মূলে কোন অলৌকিক রহস্য যে অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার মীমাংসায় পৌঁছানোর মতো বুদ্ধিবৃত্তি আমার নেই।

অত লোকজনের মধ্যে থেকেও কী যেন এক দারুণ ভয়ে আমার সারা দেহ শক্ত কাঠ হয়ে গেল!

অভিশপ্ত নীলকান্ত

প্রায় আটশতাব্দী আগেকার কথা। আমেরিকায় তখনও শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার পত্তন হয়নি। আমেরিকার নামও তখন শ্বেতাঙ্গরাও জানত না। বর্তমানে যে দেশ দক্ষিণ আমেরিকা নামে বিখ্যাত, তারই উত্তর-পশ্চিম দিকে এক বিশাল অংশ জুড়ে ছিল তখন ইনকাদের সাম্রাজ্য। ইনকা জাতের লোকদের আজ 'রেড ইন্ডিয়ান' বা লাল মানুষ বলে ডাকা হয়।

ইনকারা যে রীতিমতো সভ্য ছিল, তাদের স্থাপত্য প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখলে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু মধ্যযুগের যুদ্ধলিপ্সু শ্বেতাঙ্গেরা তাদের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

পৃথিবীর সব রাজবংশেই কোহিনুরের মতো বিখ্যাত মণি বা হীরকের আদর আছে। ইনকারাও একটি বিশেষ হীরকের অধিকারী ছিল। সে একটি অতি মূল্যবান নীলকান্ত মণি। তার রং উজ্জ্বল নীল।

প্রায় আট শত বৎসর আগে ওই দুর্লভ হিরাখানি চুরি যায়। কেমন করে, কেউ তা জানে না।

ইনকাদের প্রধান পুরোহিত চোরের উদ্দেশে দিলেন অভিশাপ। একটা বা দুটো নয়, মোট নিরানব্বইটা অভিশাপ! প্রত্যেক অভিশাপের মূল কথা হচ্ছে, যার কাছে এই মণি থাকবে তার সর্বনাশ হবে।

পুরোহিতের অভিশাপ ব্যর্থ হয়নি। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহু ব্যক্তি এই অভিশপ্ত মণির মালিক হয়ে লাভ করেছে চরম দুর্গতি বা দুর্ভাগ্য—অর্থাৎ মৃত্যু।

সেকালের করুণ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করবার জায়গা আমাদের নেই। আমরা একালের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব।

॥ খ ॥

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে একজন নাবিক ব্রেজিলের পার্নামবুকো শহরে গিয়ে এক দোকানে ওই নীলকান্ত মণিখানি দেখতে পায় এবং কিনতে চায়।

দোকানদার বললে, 'কিন্তু আমি জানানো উচিত মনে করছি যে এখানা হচ্ছে ইনকাদের বিখ্যাত অভিশপ্ত মণি।'

নাবিক বললে, 'অভিশাপের নিকুচি করেছে। হিরাখানা আমি কিনব।'

হিরাখানা সে নিজের আংটির উপরে বসিয়ে নিলে। চারদিন পরে গলাকাটা অবস্থায় তার মৃতদেহ পাওয়া গেল এক জেটির উপরে।

তারপরেই ওই হিরার আংটির মালিক হল আর এক নাবিক। তারও মরতে দেরি লাগল না। দেহ তার কুচি কুচি করে কাটা, কিন্তু হাতের আঙুলে সেই হিরার আংটি।

নাবিকের বউ শখ করে আংটিটা নিজের আঙুলে পরলে এবং ঠিক বিশ দিন পরেই একখানা পাঁচতলা বাড়ির উপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে আত্মহত্যা করলে।

আংটিটার নতুন নাম হল 'পার্নামবুকোর প্রমাদ।'

তারপর আংটিটা যেখানে যায়, সেখানেই ডেকে আনে সর্বনাশকে। একে একে মারা গেল পাঁচজন লোক। প্রত্যেক মৃত্যুই অপঘাত।

তারপর বেশ কিছুকাল ধরে এই সর্বনেশে হিরার আংটির আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি, সুতরাং ইতিমধ্যে সে আরও কারুর কারুর অপঘাত-মৃত্যুর কারণ হয়েছিল কি না সে কথা জানা যায় না।

আমরা বলব তার পরের ঘটনা।

॥ গ ॥

পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত হলিউড শহর।

সেখানে হঠাৎ এক শ্রেণির চোরের আবির্ভাব হল। তারা দামি দামি মোটরের নানা অংশ খুলে নিয়ে চম্পট দেয়। থানায় থানায় অভিযোগের পর অভিযোগ আসে। পুলিশ রীতিমতো সজাগ।

ক্লার্ক হচ্ছে একজন পুলিশ কর্মচারী। এক রাত্রে রাস্তায় টহল দিতে দিতে দেখতে পেলে, দু-খানা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে পিছনের গাড়িখানার চলন্ত ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আরও কয়েক পা এগিয়েই ক্লার্ক বুঝতে পারলে, দুজন লোক সামনের গাড়িখানার অংশ খুলে নেওয়ার কাজে ব্যাপৃত হয়ে আছে।

তৃতীয় এক ব্যক্তি যে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, ক্লার্ক তা দেখতে পেলে না। সে আরও এগিয়ে ভালো করে তদন্ত করতে এল।

অমনি ওরে বাসরে, ধ্রুম ধ্রুম ধ্রুম! উপর-উপরি রিভলভারের গুলিবৃষ্টি!

ক্লার্ক এক লাফে একটা দেওয়ালের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করলে। পিছনের গাড়িখানা তিরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ক্লার্ক ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে রিভলভার বাগিয়ে ধরে ছুটন্ত গাড়িখানার দিকে প্রেরণ করলে একটা উত্তপ্ত বুলেট।

গাড়িখানা থামল না বটে, কিন্তু শোনা গেল একটা একটানা আর্তনাদ।

বুলেটে বিদ্ধ হয়েছে অন্তত একটা চোরের দেহ।

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। হাসপাতালে হাসপাতালে এবং ডাক্তারদের বাড়িতে বাড়িতে সন্ধান নেওয়া হল, কোনো আহত লোক চিকিৎসার জন্যে গিয়েছে কি না।

না, কেউ যায়নি।

তবে কি লোকটা মারা পড়ল? লাশটা কি কোথাও পুঁতে ফেলা বা ফেলে দেওয়া হয়েছে? তখন সেই তল্লাশ চলল।

দিন-চারেক পরে একটা ড্রেনের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হল একখানা মোটর-গাড়ির তলায় পাতা কম্বল এবং একটা সচ্ছিদ্র টুপি। দুটো জিনিসেই লেগে আছে রক্তের দাগ।

বোঝা গেল বুলেটের আঘাতেই টুপিটা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। মাথায় যখন বুলেট লেগেছে, লোকটা তখন আর বেঁচে নেই।

'কিন্তু তার মৃতদেহ কোথায়?'

॥ ঘ ॥

দুর্ঘটনার পর কেটে গেল আট দিন।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনোর মতো।

মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের স্টুডিয়োর কাছে যে ছোটো নদী আছে, তারই তীরে মাটি খুঁড়ছিল দুজন মজুর।

খুঁড়তে খুঁড়তে আচমকা বেরিয়ে পড়ল একটা মৃতদেহ! প্রায় গলিত অবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ যেন রক্তে ছোপানো এবং লাশের মাথায় একটা বুলেটের ছিদ্র।

খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এল দলে দলে।

পুলিশের এক বড়োকর্তা দেখে শুনে বললে, 'নিশ্চয় ক্লার্কের গুলিতেই লোকটা মারা পড়েছে।'

কিন্তু তার পরেই আবিষ্কৃত হল আর এক ব্যাপার। মৃতদেহের বুকের উপরে আর একটা বুলেটের ছ্যাঁদা।

ক্লার্ক বলে, সে একবারের বেশি রিভলভার ছোড়েনি। একটি মাত্র বুলেট, কিন্তু মাথায় এবং বুকে দু-দুটো ছ্যাঁদা! তাও কখনও হয়?

গোয়েন্দাদের চক্ষুস্থির!

যুবকের মৃতদেহ। মাথায় মাঝারি, পেশিবদ্ধ জোয়ান দেহ, সাজপোশাক দামি কিন্তু রুচিসম্মত। পোশাক তল্লাশ করে কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল কামিজের হাতায় আছে দুটো বোতাম, তার উপরে খোদা তিনটে অক্ষর—এন. এফ. ডি.।

পোশাকের উপরে দেখা গেল ওকল্যান্ডের এক দরজির নাম ও ঠিকানা।

আবার তিন দিন কেটে যায়।

ওকল্যান্ড থেকে খবর এল, মেরি ডাবেলিকের স্বামী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে। তার নাম নিকোলাস এফ ডাবেলিক।

মেরি এসে নিকোলাসের দেহ শনাক্ত করলে।

তার মুখে জানা গেল, নিকোলাস ভদ্র বংশের সন্তান এবং নিজেও অতি ভদ্র, অতি সজ্জন। সে নাম-করা ব্যবসায়ী। সে অসৎ-সঙ্গ পরিহার করে চলে। সে অজাতশত্রু।

মাস-কয়েক আগে সে একটি দশ রতি হিরার মূল্যবান আংটি ক্রয় করেছিল এবং তারপর থেকেই কেবল যেন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। প্রায়ই বলত, 'কে যেন সর্বদাই আড়াল থেকে আমার উপরে ওত পেতে আছে, কে যেন আমার সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করছে, কে যেন আমাকে গুরুতর বিপদে ফেলতে চায়!'

—'যেদিন নিকোলাসের সঙ্গে তোমার শেষ দেখা, সেদিনও কি তার হাতে ওই আংটিটা ছিল?'

—'ছিল বই কি!'

—'টাকাকড়ি?'

—'তার সঙ্গে সর্বদাই কয়েক শত টাকা থাকত।'

—'টাকা বা আংটি কিছুই আমরা পাইনি।'

—'শুনেছি ওই হিরার আংটিটা নাকি বড়োই অলক্ষুণে! কিন্তু শুনেও নিকোলাস আংটিটা হাত থেকে খুলে রাখতে রাজি হয়নি।'

—'তোমার স্বামীর বন্ধুদের কথা কিছু বলতে পারো?'

—'আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু বলতে একজনকেই বোঝায়। তাঁর নাম জ্যাক অ্যালেন। খুব ভদ্রলোক। ওকল্যান্ডেই থাকেন! এখনও তিনি আমাদের খোঁজ-খবর নেন।'

ওকল্যান্ড থেকে ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে চারশো মাইল দূরে। তবু গোয়েন্দারা অ্যালেনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

কিন্তু অ্যালেনের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছুই জানা গেল না।

গোয়েন্দারা ফাঁপরে পড়ে গেল। একটা আহত বা নিহত চোরের সন্ধান করতে গিয়ে পাওয়া গেল ওকল্যান্ডের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মৃতদেহ! তার উপরে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল একটা প্রাচীন ও অভিশপ্ত নীলকান্ত মণির রহস্য! কিছুই ধরবার ছোঁবার জো নেই।

॥ ৬ ॥

তারপরেই সব ঘটনার জট খুলে গেল অকস্মাৎ।

ওকল্যান্ডের এক জহুরির কাছে খবর পাওয়া গেল, সেখানে জনৈক ব্যক্তি একখণ্ড মূল্যবান হিরার দর যাচাই করতে গিয়েছিল। কিন্তু যাচাই করতে দিন কয় দেরি লাগবে শুনে সে হিরা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থান করেছে।

—'তার চেহারা আর সাজপোশাক কী-রকম?'

জহুরির বর্ণনা শুনে গোয়েন্দাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল হুবহু জ্যাক অ্যালেনের মূর্তি!

অ্যালেনকে থানায় ডেকে আনা হল। সে বললে, 'আমি নির্দোষ ভদ্রলোক। আমি চোরও নই, খুনিও নই।'

গোয়েন্দারা তখন পুলিশের দপ্তর খুঁজে দেখতে লাগল, তার মধ্যে নির্দোষ ভদ্রলোক অ্যালেনের পূর্বজীবনের কাহিনি পাওয়া যায় কি না?

পাওয়া গেল। তার আসল নাম হচ্ছে, ফরেস্ট সিসিল মিঙ্গল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সে আমেরিকার অন্য এক শহরে একটি মহিলাকে হত্যা করে তাঁর গহনার বাক্স চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং দীর্ঘকাল জেল খাটে।

তখন ভেঙে গেল মিঙ্গল ওরফে অ্যালেনের সাধুতার ভড়ং। তারপর খুব সহজ হয়ে গেল গোয়েন্দাদের কাজ। অবশেষে মিঙ্গলকে কারে পড়ে স্বীকার করতে হল যে, অভিশপ্ত নীলকান্ত মণির লোভেই সে নিকোলাসকে হত্যা করেছে।

বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হল।

কিন্তু যাকে নিয়ে এই কাহিনির সূত্রপাত, সেই মোটর-চোরটা ক্লার্কের গুলি খেয়ে জখম হল কি মারা পড়ল, তার কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না।

আর জানা গেল না সেই ভয়াবহ নীলকান্ত মণির পরিণাম! মিঙ্গল ধরা পড়বার আগে সেখানা কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে, না আবার কারুর কারুর হাতের আংটিতে সংলগ্ন হয়ে সে নূতন নূতন সর্বনাশের আয়োজন করেছে?

কিন্তু তার অভিশাপ থেকে মিঙ্গলও শেষ পর্যন্ত মুক্তিলাভ করতে পারেনি।

কারাগারে একদিন আচম্বিতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল 'ওই আংটি! ওই আংটি! ওই আংটি!'

তারপর কারাগারেই হঠাৎ তার মৃত্যু হয়।

বাড়ি

শ্রীমতী বলতে লাগলেন পাঁচ বৎসর আগে আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়েছিলুম। সেই সময়ে প্রতি রাত্রেই দেখতুম একই স্বপ্ন।

আমি পল্লিপথ দিয়ে চলেছি। সামনে একখানা সাদা রঙের একতলা সুদীর্ঘ বাড়ি—কাগজিলেবুগাছ দিয়ে ঘেরা! বাড়ির বাঁ দিকে ময়দান, তার উপরে ঝাউগাছের সারি।

স্বপ্নের এই বাড়ির দিকে আকৃষ্ট হতুম, এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতুম তার দিকে। প্রবেশপথে শ্বেতবর্ণ ফটক। তারপর চমৎকার একটি আঁকাবাঁকা পথ—দুই ধারেই তার পায়ের তলায় ছায়া ফেলে সারি সারি গাছের পর গাছ। সেই ছায়ায় হালকা হাওয়ায় নানা রঙের হিন্দোল দুলিয়ে দিয়েছে সব মরশুমি ফুলের চারা। আমি ফুল তুলি, কিন্তু তারা বেরঙা হয়ে যায় সঙ্গে-সঙ্গেই। পথ শেষ হয়। আমি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই।

বাড়ির সুমুখে একটা বড়ো ঘাস জমি। তারই মাঝখানে যেন কাঁচা-সবুজের ফ্রেমে বাঁধানো ফুলশয্যা—সেখানে ফুটে আছে বেগুনি, লাল ও সাদা রঙের ফুল। বাড়ির সদর দরজার উপরে কারুকার্য। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার কাছে পৌঁছানো যায়।

এই আমার স্বপ্ন। মাসের পর মাস ধরে রোজ রাত্রে দেখি অবিকল এই একই স্বপ্ন! শেষটা আমার মনে দৃঢ় ধারণা হল, শৈশবে নিশ্চয়ই আমি স্বচক্ষে এই বাড়িখানা দর্শন করেছি। কিন্তু সে যে কোথায়, কিছুতেই তা মনে করতে পারি না। তবু বাড়িখানা আমায় যেন পেয়ে বসল। পণ করলুম, বাড়িখানা খুঁজে বার করতেই হবে।

আরোগ্য লাভ করবার পর একদিন নিজের মোটর নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনের মধ্যে দুর্দান্ত ইচ্ছা, বাস্তব জগতে আবিষ্কার করতেই হবে আমার স্বপ্নে-দেখা বাড়িখানাকে!

আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে। এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াই কত গ্রামে গ্রামে। সবিস্তারে বলবার দরকার নেই আমার ভ্রমণকাহিনি। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ব্যর্থ হল আমার প্রথম বারের অন্বেষণ! হতাশ হয়ে আবার

শহরে ফিরে এলুম এবং আবার রাতের পর রাত দেখতে লাগলুম সেই সাদা বাড়ির স্বপ্ন!

কিছুদিন পরে আবার পল্লিভ্রমণের জন্যে যাত্রা করতে হল। এ গ্রাম, ও গ্রাম, সে গ্রাম। আজ এক পথে, কাল অন্য পথে।

আচম্বিতে একদিন আমার বাড়িটা যেন দুলে উঠল! মনে হল যেন আমি অতি-পরিচিত কোনো স্থানে এসে পড়েছি। যদিও জীবনে আর কোনোদিনই এ অঞ্চলে আসি না, তবু এখানকার সবই যেন আমার চেনা চেনা! ওই ঝাউগাছের সার, ওই কাগজিলেবুর কুঞ্জ!

বাড়িখানা এখনও দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আমি যে আমার স্বপ্নে-দেখা বাড়ির কাছে এসে পড়েছি, সে-বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নেই। আমি জানি, আর অল্পদূর অগ্রসর হলেই দেখা যাবে, বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছে একটি ছোটো পথ। সেই ছোটো পথটি দিয়ে করেছি কত আনাগোনা!

নামলুম ছোটো পথে। হলুম অগ্রসর। এই তো সেই সাদা ফটক! এই তো সেই গাছের ছায়ায় ঘুমন্ত আঁকাবাঁকা পথটি—দুই পাশে তার মরশুমি ফুলের চারার রঙিন পাড়! ওই যে সেই কাঁচা সবুজ ঘাস-জমি, আর আমার স্বপ্নে-দেখা সাদা বাড়ি!

সদর দরজার কড়া নাড়া দিলুম। ভয় হচ্ছিল কারুর সাড়া পাব না, সে ভয় অমূলক। কারণ, দ্বিতীয় বার কড়া নাড়বার আগেই হল এক ভৃত্যের আবির্ভাব।

সে থুত্থুড়ো বুড়ো, মুখ তার বিমর্ষ। আমাকে দেখেই সে যেন অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং অবাক মুখে আমার পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম, 'বাড়ির মালিক কে তা আমি জানি না, কিন্তু তিনি কি আমার কথা রাখবেন? বাড়ির ভিতরটা একবার আমাকে দেখতে দেবেন?'

সে বললে, 'অনায়াসেই দেখতে পারেন। এ বাড়িখানা ভাড়া দেওয়া হবে।'

সবিস্ময়ে বললুম, 'ভাড়া দেওয়া হবে? আমার কী সৌভাগ্য! কিন্তু এমন চমৎকার বাড়িতে মালিক নিজে বাস করেন না কেন?'

সে বললে, 'মালিক এখানে নিজেই বাস করতেন, কিন্তু তারপর ভূতের উপদ্রব শুরু হওয়াতে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন।'

আমি বললুম, 'ভূতের উপদ্রব? কিন্তু তবু আমি বাড়িখানা ভাড়া নেব। একালেও লোক ভূত বিশ্বাস করে, তা আমি জানতুম না।'

গম্ভীর মুখে সে বললে, 'আমিও ভূত বিশ্বাস করতুম না, যদি না তাকে নিজের চোখে দেখতুম। আমি স্বচক্ষে তাকে রাত্রিবেলায় ওই বাগানে বেড়াতে দেখেছি।'

কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলুম। হাসবার চেষ্টা করে বললুম, 'কী আজব গল্প!'

বৃদ্ধ বললে, অভিযোগ-ভরা কণ্ঠেই বললে, 'ঠাকরুন, অন্তত আপনার মুখে ও-কথা শোভা পায় না। কারণ বাগানের সেই ভূত তো আপনিই।'

ফরাসি লেখক Andre Maurois-এর গল্পাবলম্বনে।

ভূতের ভয়

আবার বৃষ্টি নামল। আজ সারাদিন ধরেই বৃষ্টি এই থামে, এই নামে। মেঘের কাজল মেখে আকাশ হারিয়ে ফেলেছে তার নীলিমা। সূর্য কখন উঠেছে আর কখন অস্তে গিয়েছে কেউ জানে না। ময়লা দিনের আলো এবং তারই ভিতরে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে উঠছে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকার।

গঙ্গার ধারে, বাড়ির তেতলার বারান্দায় বসে আছি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। নদীর বুকজোড়া বৃষ্টির জলছড়া দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বার চায়ের পেয়ালা খালি করলুম। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

একটা দমকা ভিজে বাতাস গায়ের উপরে হুস করে স্যাঁতসেঁতে নিশ্বাস ফেলে চলে গেল। বারান্দার কোণ ঘেঁসে সরে বসে চোখ তুলে দেখি অন্ধকার কখন নিঃশব্দে এসে গ্রাস করে ফেলেছে গঙ্গার ওপারকে। নীল গাছের সার, বেলুড় মঠের গম্বুজ, বালি ব্রিজ ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচূড়া অদৃশ্য।

এপারে আমার বাড়ি ও নদীর মাঝে জনবিরল পথ হঠাৎ মুখরিত হয়ে উঠল। রাম নামের মহিমা কীর্তন করতে করতে একদল হিন্দুস্থানি শবদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

জনৈক বন্ধু শুধোলেন, 'হেমেন্দ্র, এ বাড়িতে তুমি একলাই থাকো?'

—'প্রায় তাই-ই বটে।'

—'এখান থেকে শ্মশান খুব কাছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'রোজ রাত্রেই এখান দিয়ে মড়া নিয়ে যায়?'

—'তা যায়।'

—'তখন তোমার একলা থাকতে ভয় হয় না?'

হেসে ফেলে বললুম; 'কীসের ভয়?'

—'কীসের আবার? ভূতের।'

—'আমার ভূতের ভয় নেই।'

—'তুমি ভূত মানো না?'

—'ঠিক মানি না বলতে পারি না। এ দেশের আর বিদেশের বড়ো বড়ো পণ্ডিতরাও ভূত মানেন। তাঁদের কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।'

—'তুমি তো নিজেও অনেক ভূতের গল্প লিখেছ?'

—'হ্যাঁ, কাল্পনিক গল্প।'

—'তুমি কখনও ভূত দ্যাখোনি তো?'

—'আমার বাবা প্রেতিনী দর্শন করেছিলেন। তাঁর নিজের মুখে সে গল্প শুনেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভূত দেখেছিলেন, তাঁর জীবনী পাঠ করলেই জানতে পারবে।'

—'কিন্তু তুমি নিজে ভূত দেখেছ?'

—'ভৌতিক কাণ্ড দেখেছি।'

—'কী রকম? কোথায়?'

—'জয় মিত্র স্ট্রিটে। একত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। খবরের কাগজেও সেই ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। প্রত্যহ দলে দলে কৌতূহলী লোক ঘটনাস্থলে গিয়ে জনতার সৃষ্টি করত।'

—'ব্যাপারটা কী?'

ভৌতিক উপদ্রব। চোখের সামনে দেখেছি দুমদাম করে ইষ্টকবৃষ্টি। কিন্তু কে যে ফেলছে কিছুই বোঝা যায় না।'

—'দুষ্ট লোকের নষ্টামি।'

—'মোটেই নয়। দিনের বেলা। বাড়ি ঘিরে পুলিশ পাহারা, তবু ইটপড়া বন্ধ হয় না। ঘরের ভিতরে মেঝের উপরে রয়েছে বাসন-কোসন, হঠাৎ সেগুলো জ্যান্ত হয়ে পাখির মতো শূন্য দিয়ে উড়ে আর এক জায়গায় ঝন ঝন করে গিয়ে পড়ল।'

—'কিন্তু তুমি স্বচক্ষে আসল ভূত দেখেছ কি?'

—'আসল-নকল জানি না, একবার একটা ব্যাপার দেখেছিলুম।'

এতক্ষণে কিছু হদিস পেয়ে বন্ধু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? ব্যাপারটা শুনতে পাই না?

—'বলছি। কিন্তু এটা বোধহয় ভূতের গল্প নয়।'

—'ভণিতা ছাড়ো। গল্প বলো।'

আরও জোরে বৃষ্টি এল—ঝম ঝম ঝম ঝম! গঙ্গাজল আর দেখা যায় না, কিন্তু শোনা যায় তার তরঙ্গ তান। এখনও আলো জ্বলেনি, বারান্দায় বন্ধুদের দেহগুলো দেখাচ্ছে ছায়ামূর্তির মতো। একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারের উপরে ভালো করে বসে আরম্ভ করলুম:

তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। গঙ্গার ধারে আমার এ বাড়িখানার জায়গায় তখন ছিল খোলা জমি। আমরা বাস করতুম পাথুরিয়াঘাটার পৈতৃক বাড়িতে।

তেতলার ছাদে একপাশে আমার শয়নগৃহ। তার দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। জানালার নীচেই একটা হাত দেড়েক চওড়া, কিন্তু বেশ-খানিকটা লম্বা খানা—তার ভিতরে ছিল সাপ আর ইঁদুরের বাসা, মাঝে মাঝে সেখানে প্যাঁচারাও আনাগোনা করত।

খানার পরেই পাশাপাশি তিনখানা ছোটো ছোটো পুরানো বাড়ি। পূর্ব দিকের বাড়িখানা এ-পাড়ায় ছিল কুবিখ্যাত। আমাদের বাল্যকালে ও প্রথম যৌবনে বাড়িখানা ছিল পরিত্যক্ত। সবাই বলত সেখানা হানাবাড়ি, ভাড়া নিতে চাইত না। আমার বাবা ওই বাড়ির ছাদের উপরেই গভীর রাত্রে একটি অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি দেখেছিলেন। কিন্তু তাকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারেননি—তাঁর চোখের সামনেই মিলিয়ে গিয়েছিল মূর্তি!

আমি যখন তেতলার ওই ঘরে গিয়ে বাসা বাঁধি, তখন বাড়িখানা সংস্কার করে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, যদিও রাত্রে সবাই তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত। আমি কিন্তু বহু বৎসরেও সে বাড়ি থেকে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।

তবে একদিনের ব্যাপারের কথা মনে আছে। আমার অভ্যাস ছিল ঘুমের আগে অন্তত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়া করা! সেদিনও তাই করছিলুম। রাত বারোটা বাজে—চারিদিক নিঝুম। আচম্বিতে সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ ও আকাশ-বাতাস স্তম্ভিত করে অপার্থিব নারীকণ্ঠে জেগে উঠল তীব্র ও প্রচণ্ড ক্রন্দনস্বর! তেমন ভয়াবহ চিৎকার জীবনে আর কখনও আমি শুনিনি—আমার সর্বাঙ্গ যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাত্র একবার সেই বীভৎস কান্না শোনা গিয়েছিল বটে, কিন্তু

তা শুনতে পেয়েছিল পাড়ার সমস্ত লোক। এ পাড়ায় সকলেই আমার আত্মীয়-কুটুম্ব। পরদিন সকালে উঠে খোঁজ-খবর নিয়ে বুঝলুম, কোনো বাড়ি থেকে কোনো নারীই কাল রাত্রে অমন করে ক্রন্দন করেননি। সকলেই মত প্রকাশ করলেন, আওয়াজটা এসেছিল আমাদের বাড়ির পাশের খানার ভিতর থেকেই। আমিও এই মতে সায় দিতে বাধ্য হলুম বটে কিন্তু মধ্যরাত্রে খানার ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে কোনো নারী যে অমন ভয়ানকভাবে কেঁদে উঠবে, এটাও সম্ভবপর বলে মনে হল না। আজ পর্যন্ত এই ক্রন্দন-রহস্যের কোনো হদিস পাইনি।

অতঃপর যে ঘটনার কথা বলব তারও উৎপত্তি ওই খানার ভিতরেই।

সে রাত্রে ভারী গুমোট। বাইরে চাঁদ আলো ঢালছে বটে, কিন্তু বাতাসের শ্বাস একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। রাত দুটো বেজে গিয়েছে, তবু চোখে নেই ঘুম, বিছানায় পড়ে আই-ঢাই করছি।

পাশ ফিরে পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। ধবধবে জ্যোৎস্নায় ছাদের পর ছাদ ভেসে যাচ্ছে। চাঁদের আলোর ভিতরে যে ঠান্ডার আমেজটুকু আছে, এই দারুণ গুমোটে তা মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলুম।

হঠাৎ আমার চোখ দুটো উঠল বিষম চমকে! খানার দিক থেকে জাগল দু-খানা ছোটো ছোটো হাত, তারপর চেপে ধরলে জানালার দুটো গরাদে। তারপরই দেখা গেল একটা মাথা এবং তারপরেই সমস্ত দেহটা। একটা পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশুর দেহ! বিশেষ করে কিছুই বুঝতে পারলুম না, কারণ বাইরের চাঁদের আলোর দিকে পিছন ফিরে ছিল বলে দেহটাকে দেখাচ্ছিল যেন ঘোর কালো অন্ধকার দিয়ে গড়া।

জানালার মাঝামাঝি যে আড়াআড়ি কাঠ থাকে, মূর্তিটা তার উপরে উবু হয়ে বসল, তারপর ঊর্ধ্বোত্থিত দুই হাত দিয়ে গরাদ ধরে বোধহয় আমার পানেই তাকালে—বেশ দেখতে পেলুম তার অগ্নিময় চোখদুটো! তিন কি চার সেকেন্ড সে স্থিরভাবে বসে রইল। তারপর জানালার গরাদে ছেড়ে দেওয়াল ধরে উপর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ভীরু নই কোনোকালেই, তবু বুকের ভিতরটা ছমছম করে উঠল বইকি! প্রায় মিনিটখানেক ধরে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো চুপ করে বসে রইলুম বিছানার উপর। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে চট করে উঠে পড়লুম এবং ঘরের কোণ থেকে একগাছা লোহা-বাঁধানো লাঠি নিয়ে দরজা খুলে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

পরিষ্কার চাঁদের আলো। চারিদিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই কোথাও। তেতলার ছাদে উঠলুম। মূর্তিটার এইখানেই আসবার কথা। সেখানেও কেউ নেই।

কী বলছ? আমি বানরের মূর্তি দেখেছি? প্রথমে আমারও সেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মূর্তিটা বানরের মতো ছোটো হলেও বানর নয়। কারণ, প্রথমত, জলভরা অন্ধকার খানায় বানর থাকে না। দ্বিতীয়ত, বানররা নিশাচর জীব নয়। তৃতীয়ত, জানালার উপর ছিল মসৃণ দেওয়ালের অনেকখানি, তাই বলে কোনো বানরই টিকটিকি কি মাকড়সার মতো উপরে উঠতে পারে না।

তবে সেটা কী? জানি না। তারপরেও ওই ঘরে কাটিয়েছি অনেক বৎসর, কিন্তু মূর্তিটা আর কখনও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।

ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কবলে পড়ে সেই রহস্যময় বাড়িখানা এবং সেখানকার বাড়িগুলো এখন অদৃশ্য হয়েছে। আমার কথা ফুরুল।

ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টি পড়ছে, হু হু করে বাতাস বইছে, ছলাৎ ছলাৎ করে গঙ্গাজল তীরে এসে আছড়ে পড়ছে, পৃথিবী অন্ধকার। বন্ধুরা স্তব্ধ।

সুইচ টিপে আলো জ্বাললুম। বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে বললে, 'ধেৎ, দিব্যি একটি ভুতুড়ে অ্যাটমসফিয়ার গড়ে উঠেছিল, আলো জ্বেলে সব মাটি করে দিলে!

হেসে বললুম, 'আমি এটা ভূতের গল্প বলে মনে করি না'

বন্ধুরা বললে, 'আমরা যদি নকলে আসলের সুখ পাই, তাতে তোমার কী?'

—'বলো তো আবার আলো নিবিয়ে দি।'

—'না, ছেঁড়া তার জোড়া লাগে না। তার চেয়ে আবার গরম চা আনাও।'

আজও যা রহস্য

ফ্রান্সের ইতিহাসে সব থেকে রহস্যজনক প্রেতের আগমন ঘটেছিল সম্ভবত মেরি অ্যান্টয়নেটের উপস্থিতি। ভার্সাই-এর প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে দুজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা একবার হারিয়ে যান। সেই বাগানে প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁরা কাকে দেখেছিলেন? মেরি অ্যান্টয়নেটকে? নাকি এ সবই তাঁদের দেখার ভুল? এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা, যার রহস্য আজও আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত। কিন্তু তদানীন্তনকালে এ ঘটনা খুব আলোড়ন তুলেছিল একথা সবাই স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালেও সেই দুই ইংরাজ রমণীর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কিছু গবেষণা নতুন করে আলোকপাত করলেও—সত্যিই সেদিন মেরি অ্যান্টয়নেট এসেছিলেন কি না তা আজও রহস্য এবং সন্দেহের পর্যায়ে রয়ে গেছে।

ভার্সাই-এর বাগানে সেদিন দুই মহিলা যা দেখেছিলেন তা নির্ভরযোগ্য সত্য কি না তা কেউ হলফ করে বলতে না পারলেও, গবেষকরা যে এই দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণকে এত মূল্য কেন দিয়েছিলেন তাও একটি ভাববার বিষয়। এই দুই মহিলা ছিলেন পেশায় সম্মানিতা। বয়েস এবং বংশ মর্যাদায় ছিলেন রানি ভিক্টোরিয়ার সমগোত্রিয়া। এঁদের একজনের নাম শার্লো অ্যানি মোবারলি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৬ সালে। পনেরোটি ভাই-বোনের মধ্যে তিনি দশম। লেখাপড়াতেও তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। মেধায় ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এর জন্যে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে খুবই সাহায্য করেছিল। বাবা ছিলেন

উইনচেস্টার কলেজের কৃতী প্রধানশিক্ষক এবং স্যালিসবেরির বিশপ। অন্য ইংরেজ মহিলার নাম ছিল এলিনর জর্ডেন। বংশমর্যাদায় তিনিও খুব একটা হেলাফেলার নন। তাঁর পিতা ছিলেন ডার্বিশায়ারের অন্তর্গত অ্যাসবোর্ন-এর ধর্মযাজক। যাই হোক শার্লোর সঙ্গে জর্ডেনের বয়েসের বেশ কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও দুজন ছিলেন দুজনের পরম মিত্র।

১৮৬৬ সাল। মিস মোবারিল অক্সফোর্ডের সেন্ট হুগস হলে অধ্যক্ষা হয়ে এলেন। তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ। বিবাহও করেননি। দিনরাত পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অবসর সময় কাটান দেশ ভ্রমণে। সেন্ট হুগস হলটি ছিল মেয়েদের আবাসিক হোস্টেল। বিদেশ থেকে বা দূর দূর অঞ্চল থেকে যারা লেখাপড়া করতে আসত তারাই ওখানে বসবাস করত। রাসভারী অধ্যক্ষা হিসেবে মিস মোবারলিকে প্রত্যেকেই বেশ সমীহ করে চলত।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর ওই হোস্টেলে প্রধান অধ্যক্ষা হিসেবে কাটিয়ে দিলেন মিস মোবারলি। আসলে তিনি হয়তো ওই পেশাটিকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ছিলেন। তাই এতদিন তাঁর মধ্যে কোনো কর্মশৈথিল্য আসেনি। কিন্তু বয়েস সবসময় মনের ইচ্ছা পূরণ করে না। শরীর এসে বাদ সাধে। দেখতে দেখতে প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়েস হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন জানালেন এক সহকারিণীর জন্য। আবেদন মঞ্জুর হল। নতুন সহকারিণী হয়ে এলেন মিস জর্ডেন। মিস মোবারলির থেকে ইনি বয়েসে অনেক ছোটো। জর্ডেনকে প্রথম সাক্ষাতে মোবারলি বেশ ভালো লাগল। বেশ চটপটে আর করিতকর্মা। তবুও হোস্টেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উভয়কে একই সঙ্গে একটি ছোট্ট ভ্রমণে বের হতে হল।

ঠিক হল পনেরো দিনের ছুটিতে উভয়ে প্যারিস যাবেন। যদিও মিস জর্ডেনের অনেকবারই প্যারিস ভ্রমণ করা ছিল তবুও তিনি নতুন সহকর্মিণীর সঙ্গিনী হলেন। কারণ মিস মোবারলির একবারও প্যারিস যাওয়া হয়নি। বলাবাহুল্য জর্ডেন ছিলেন বেশ মিশুকে ধরনের মহিলা। আর মোবারলির তো মিস জর্ডনকে ভালোই লেগেছিল। ট্রেনে ওঠার পর উভয়ের বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগল না।

এরপরের কাহিনি সেই ঐতিহাসিক রহস্যময় ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সেই বৃত্তান্ত শোনার আগে আমার মনে হয় একবার ইতিহাসের পাতায় কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরে আসা দরকার। মেরি অ্যান্টয়নেটের জীবন ইতিহাস সামান্য জানা থাকলে পরবর্তী কাহিনির রহস্যময়তা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

মেরি অ্যান্টয়নেট—পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বিশেষ করে ফ্রান্সের ইতিহাসে তৎকালীন সভ্যতায় মেরি অ্যান্টয়নেট রানি হয়েও

জীবদ্দশায় তিনি জনখ্যাতি পাননি। বরং জনমানসে তিনি ছিলেন বিলাসী, খামখেয়ালি এবং হঠকারিনী।

মেরি অ্যান্টয়নেট যখন ফ্রান্সের রানি তখন ফ্রান্সের ঘোর দুর্দিন। ফ্রান্সের জনগণ মনে করত তাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্যে রানির দায়িত্ব কিছু কম ছিল না।

১৭৫৫ সালের ২রা নভেম্বর অ্যান্টয়নেট ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস এবং মারিয়া থেরেসার কন্যা ছিলেন এই মেরি অ্যান্টয়নেট।

সম্রাটদুহিতা অ্যান্টয়নেট আজন্ম সুখ আর ভোগে লালিতা পালিতা। তার ওপর বাবা-মায়ের চোখের মণি তিনি। দুঃখ এবং দারিদ্র্য যে কী জিনিস সেটুকু বোঝার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না মেরির। আর তার খোঁজ রাখার প্রয়োজনই বা কী? ফলে খুব ছোটো থেকেই মেরি হয়ে উঠলেন খামখেয়ালি আর বিলাসী প্রকৃতির। যখন যেটি দরকার সেই মুহূর্তেই সেটি হাতের সামনে পাওয়া চাই। নইলে? নইলে যে কী তা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

কন্যার এই খামখেয়ালিপনা আর অতি আদুরে স্বভাব বাবা-মাও লক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁরা বেশিদিন কন্যাকে নিজেদের কাছে রাখতে চাইলেন না। মাত্র পনেরো বছর বয়েসে মেরির বিয়ে দিয়ে দিলেন। আশা করেছিলেন বিয়ের পর স্বামীর গৃহে গেলে হয়তো বা কন্যার স্বভাব পালটাতে পারে।

বিয়ে হল ফ্রান্সের যুবরাজের সঙ্গে। ১৭৭৪ সালে ফ্রান্সের রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ সিংহাসনে বসলেন রাজা ষষ্ঠদশ লুইস নামে। ফ্রান্সের নতুন রানি হলেন মেরি আন্টয়নেট।

মেরির বাবা-মা ভেবেছিলেন স্বামীর গৃহে গেলে মেয়ের হয়তো মতি ফিরবে। কিন্তু তা হল না। পনেরো বছর বয়েসে যুবরাজের পত্নী হলেন আর উনিশ বছর বয়সে হলেন রানি। জীবনের দুঃখ-কষ্টের দিক তাঁর দেখা হয়নি। আশপাশের জগতে কেবল সচ্ছলতা আর স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ার। উনিশ বছরের রানির পক্ষে তাই বেহিসেবী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো গতি ছিল না। নিত্যনতুন উপায়ে তিনি সুখ খুঁজে বেড়াতেন।

ফ্রান্সের তখন ঘোর দুর্দিন। বিশেষ করে রাজা ষষ্ঠদশ লুইসের রাজত্বকালে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য চরমে উঠেছিল। বিশেষ করে দিনমজুর আর চাষি সম্প্রদায়ের মধ্যে অভাবের জ্বালা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। অনাহার আর রোগ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের উপর। একবেলাও পেটপুরে খাবার সংস্থান তাদের ছিল না।

জনগণের ক্রোধ আর রোষ বেশিদিন চাপা রইল না। প্রতিদিন অবস্থা সঙিন থেকে সঙিনতর হয়ে উঠল। আর শেষপর্যন্ত সেই জনরোষ একদিন 'ফরাসি বিপ্লবে' রূপান্তরিত হল।

মাত্র ক-টা বছর। ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৯। পাঁচ বছরের মধ্যে সারা দেশ একসঙ্গে জ্বলে উঠল। ১৭৭৯ সালে অক্টোবরে ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদে বিপ্লবের আগুন ধরে গেল। ক্রুদ্ধ জনতার রোষ রাজপরিবারকে প্রাসাদ থেকে প্যারিসে পলায়ন করতে বাধ্য করল। সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে তাঁরা পালাতে চেয়েছিলেন উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে। কিন্তু তা হল না। রাজা-রানিকে আশ্রয় দেবার মতো কেউ ছিল না। দেশের আপামর জনতা যে রাজার শত্রু। উভয়েই শেষ পর্যন্ত জনতার হাতে বন্দি হলেন। সশস্ত্র প্রহরা বসল বন্দিনিবাসের দরজায়। বিদ্রোহী এবং দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা চাইল প্রকাশ্যে তাঁদের বিচার করা হোক।

অবশেষে বিচার শুরু হল। ফল কী হবে তা জানাই ছিল। ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারি গিলোটিনের করাত রাজা ষষ্ঠদশ লুইসের মাথাটি কেড়ে নিল।

মুক্তি পেলেন না রানি অ্যান্টয়নেট।

অবশেষে ১৭৯৩ সালের ১৬ই অক্টোবর। রাজা ষষ্ঠদশ লুইসের মতো তিনিও নিজের মাথা দিয়ে গেলেন গিলোটিনের নীচে।

এরপর কেটে গেছে অনেক বছর। পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছে অনেক বিবর্তন। জীবনের সব ঋণ শোধ করে মেরি অ্যান্টয়নেট হয়েছেন ইতিহাসের একটি চাঞ্চল্যকর এবং করুণ নাম। মেরির জীবন-ইতিহাস বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় স্বেচ্ছাচারিতার পরিণাম। কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা? সত্যিই কি মৃত্যুর পর আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না? অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে কেউ মারা গেলে আমরা দেখেছি সে সব আত্মারা বারবার পৃথিবীর আশেপাশে ফিরে আসতে চেয়েছে। মেরিরও কি অতৃপ্ত বাসনা কিছু ছিল? তাঁরও কি জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পুনর্বার বাঁচার বাসনা জেগেছিল? অন্তত ষষ্ঠদশ লুইসের জীবদ্দশায় আমরা দেখেছি মেরি বাঁচার জন্য শেষ সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর মেরিকে আমরা পেয়েছি শান্ত এবং স্থির উদাসীন এক মূর্তির মতো। অনেক ঝড়ের শেষে পৃথিবী যেমন শান্ত হয়, মেরিও ঠিক তেমনি সারাজীবন ভোগবিলাসের শেষে হয়ে পড়েছিলেন নির্বিকার। শান্তভাবে এসেছেন নিজের বিচারের এজলাসে। দৃঢ় উন্নত ভঙ্গিতে শুনেছেন নিজের মৃত্যু পরোয়ানা। তারপর রানির মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন গিলোটিনের নীচে।

তবু যেন মনে হয় সব শেষ হয়েও সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। অন্তত পরবর্তী ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে মেরি অ্যান্টয়নেটেরও ছিল কিছু শেষ কথা বলার যা তিনি জীবদ্দশায় বলে যেতে পারেননি।

সেদিন ১০ই আগস্ট। ১৯০১ সাল। এই শতাব্দীর বছর শুরু। রানির মৃত্যুর

পর কেটে গেছে একশো আট বছর। পৃথিবীর মানুষ ইতিহাসের পাতা ব্যতিরেকে তাঁর সব কিছু ভুলে গেছে। সচরাচর মনে পড়ে না তাঁর জীবনের করুণ আলেখ্য।

মিস মোবারলি আর মিস জর্ডেন গেছেন প্যারিস ভ্রমণে। বাড়িতে বসে না থেকে দুই অসমবয়সি নারী প্রতিদিন বিকেলে বেরিয়ে পড়েন। আজ এখানে কাল সেখানে। কখনও ট্রেনে কখনও অন্য কোনো যানে। সেদিন হঠাৎ মিস জর্ডনের খেয়াল হল ভার্সাই-এর বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ দেখতে যাবেন। মিস মোবারলির প্যারিস ঘোরা হয়নি এর আগে। ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদের ঐতিহাসিক মূল্যও আছে যথেষ্ট। দুই মহিলা ট্রেনে চেপে উপস্থিত হলেন ভার্সাইতে। যতটা উৎসাহ নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন, ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ তাঁদের তেমন মুগ্ধ করল না। তখন মিস মোবারলিই জানালেন তিনি প্রেটিট ট্রায়ানোঁতে যাবেন। বিখ্যাত 'প্রেটিট ট্রায়ানোঁ' মেরি অ্যান্টয়নেটের সাধের বাড়ি। ভার্সাই রাজপ্রাসাদ থেকে কিছুদূরে বাগানের মধ্যে অবস্থিত এই প্রেটিট ট্রায়ানোঁ।

পায়ে হেঁটেই তাঁরা রওনা হলেন। সাধারণত অন্যান্য দর্শনার্থীরা কোনো পথ নির্দেশককে সঙ্গে নেন। অপরিচিত স্থান। পথ ভুল হতেই পারে। সঙ্গে পথ নির্দেশক থাকলে অনেক পরিশ্রম আর হয়রানি লাঘব হয়। কিন্তু মহিলাসুলভ লজ্জায় তাঁরা কোনো পথ নির্দেশক অথবা কোনো পথ নির্দেশিকার বইও কিনলেন না। তাঁরা ভাবলেন, বিখ্যাত স্থান, স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা প্রেটিট ট্রায়ানোঁতে পৌঁছে যাবেন।

আগেই বলেছি অপরিচিত স্থানে পথ ভুল হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে পদে। অচিরেই তাঁরা রাস্তা ভুল করলেন এবং পথ হারালেন। বড়ো রাস্তা ছেড়ে তাঁরা একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ফলে প্রেটিট ট্রায়ানোঁতে পৌঁছনোর বদলে এসে উপস্থিত হলেন একটি গ্রাম্য আর মেঠো বাড়ির সামনে। মিস মোবারলির হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হল, হয়তো তাঁরা ঠিক রাস্তায় আসেননি। সেই কুঁড়ে-ঘরটির জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তখন একটি গ্রাম্য মহিলা কাপড় থেকে জল ঝাড়ছিলেন। এবার তাঁর মনে হল মহিলাটিকে প্রেটিট ট্রায়ানোঁ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তিনি ফরাসি ভাষা জানতেন না। তবে আশ্চর্য হলেন মিস জর্ডেন যৎসামান্য ফরাসি ভাষা জানা সত্ত্বেও গ্রাম্য মেয়েটিকে কিছু জিজ্ঞাসাই করলেন না। আসলে মিস জর্ডেন বোধহয় মেয়েটিকে লক্ষই করেননি।

যে গলি ধরে ওঁরা যাচ্ছিলেন কিছুদূর এগোবার পরই দেখলেন গলিটি তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

দুজনে একবার থমকে দাঁড়ালেন। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালেন।

দুজনের মুখে তখন একটা প্রশ্নই আটকে আছে—এবার কোন রাস্তায়? কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করতে না করতেই তারা মধ্যবর্তী রাস্তায় দুজন লোককে দেখতে পেলেন। তাদের দেখে প্রাসাদের মালি বলেই মনে হয়েছিল। সুতরাং আর কিছু চিন্তা না করে মাঝের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন।

মিস মোবারলি পরে অবশ্য বলেছিলেন, লোকদুটোকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল সাধারণ মালি নয় এরা। নিশ্চয় সৈন্যবিভাগের কোনো উচ্চপদস্থ অফিসার হবেন। তাঁদের পরনে ছিল ধূসর সবুজ রঙের লম্বা কোট। আর মাথায় ছিল তিন-কোনা টুপি। মিস জর্ডেনও পরবর্তী কালে বলেছিলেন তিনিও ওই রকম দুজন লোককে দেখেছিলেন। এমনকি তাদের হাতে যে ছড়ি জাতীয় কিছু ছিল তারও উল্লেখ করেছিলেন। যাই হোক, লোক দুটিকে দেখার পর মিস মোবারলিই এগিয়ে গিয়ে প্রেটিট ট্রায়ানোঁ কোন রাস্তায় পড়বে তার হদিস জিজ্ঞাসা করেছিলেন। লোকদুটি ইংরেজি প্রশ্নের কী মানে করেছিল কে জানে। তারা ফরাসি ভাষায় উত্তর দিয়েছিলো, 'টুট্য ড্রাআ' (Tout Droit)।

ভুল হয়েছিল এখানেই। Droit শব্দটির ইংরেজি আভিধানিক অর্থ হল right মানে দাবি বা অধিকার। কিন্তু মিস মোবারলি ধরে নিলেন তাঁদের বুঝি ডান দিকের গলিতে যেতে বলা হচ্ছে। কালবিলম্ব না করে তাঁরা ডান দিকের রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই মিস জর্ডেনেরই প্রথম নজরে এল একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর। বাড়িটির নির্মাণ কৌশল ছিল বহু পুরনো আমলের ফরাসি কায়দায়। কুঁড়েঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একজন মধ্যবয়সি স্ত্রীলোক ও একটি অল্পবয়সি কুমারী মেয়ে। সম্ভবত ছোটো মেয়েটি ওই বয়স্কা মহিলারই কন্যা হবে। মিস মোবারলি আর মিস জর্ডেন দুজনেই একটু আশ্চর্য হলেন। কারণ ওই দুজন গ্রাম্য মহিলার পরনে ছিল অতি পুরনো দিনের পোশাক-আশাক। কম করেও এক শতাব্দীর আগের পরিচ্ছদ। এসব পোশাকের চলন ১৯০১ সালে ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাঁরা একটা জিনিস লক্ষ করে বেশ চমকেই উঠেছিলেন। মেয়ে দুটির মুখে কোনো কথা ছিল না। বয়স্কা মহিলাটিকে দেখে মনে হল সে যেন হাতে একটা বালতি জাতীয় কিছু নিয়ে কোমর ভেঙে নিচু হয়ে কী যেন করছে। কিন্তু তার ওই ভঙ্গির মধ্যে জীবনের কোনো স্পন্দনই ছিল না। মনে হল কেউ যেন তাকে শাস্তি দিয়ে ওই ভাবে আজন্মকাল ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। মিস জর্ডেন তো অস্ফুটে বলেই ফেললেন, দেখে মনে হচ্ছে 'ট্যাবলো ভিভাঁ'র মতো জীবন্ত কোনো প্রতিমূর্তি। কেউ যেন মোম দিয়ে জ্যান্ত মানুষের মতো প্রতিকৃতি তৈরি করে রেখেছে।

তাঁদের এই প্রথম অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটি পরবর্তীকালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মেয়েদুটিকে ওই ভাবে নিশ্চল এবং নিথর অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুজনেই বেশ হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। যখন তাঁরা ভাবছিলেন এরপর কী করবেন, ঠিক তখনই অকল্পনীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করল। মুহূর্ত মধ্যেই সুস্পষ্ট তাঁরা অনুভব করলেন, চারিদিকের প্রকৃতির মধ্যে অভাবনীয় সব পরিবর্তন। আকাশের রং একটু আগেও ছিল নীল। হঠাৎই কেমন যেন সেই রং হয়ে উঠল বিবর্ণ হলুদ। আশপাশে সমস্ত প্রকৃতির বুকে নেমে এল রাতের নিস্তব্ধতা।

এমন একটা পরিবেশ, চারিদিক অসহ্য নিস্তব্ধ, আশেপাশে একটা জীবন্ত প্রাণি পর্যন্ত নেই, এমনকি গাছে গাছে যে সব পাখিরা ওড়াউড়ি করছিল তারাও ছবির মতো স্থির; মিস মোবারলি আর মিস জর্ডেনের মতো শিক্ষিতা দুই মহিলা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওই অভিশপ্ত জায়গাটি পার হয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়াতে হল।

কুঁড়েঘরটার ঠিক পিছনেই ছিল একটা জঙ্গল। কিন্তু জঙ্গলটাকে দেখে তাঁদের মনে হল কে যেন থিয়েটারের জন্যে একটা চিরকালীন দৃশ্যপট এঁকে দিয়েছে। সেখানেও মৃত্যুর শীতলতা ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর হঠাৎই তাঁরা দেখতে পেলেন মাটির একটা ছোট্ট ঢিপি। সেখানে বসে আছে একটি মাঝবয়সি লোক। লোকটির পরনে রয়েছে একটা পুরনো আমলের কালো আলখাল্লা। আর মাথায় ঢাউস টুপি।

অন্য সময়ে হলে এই লোকটিকে দেখে তাঁদের এমন কিছুই মনে হত না। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুজনেই তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মনে মনে তাঁরা দুজনেই যখন ভাবছেন এখন কী করা যায় ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের সেই বসে থাকা লোকটি হঠাৎ যেন নড়ে উঠল। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম মৃত্যুপুরীর শীতলতায় প্রাণের স্পর্শ লাগল যেন। লোকটি বসা অবস্থায় ধীরে ধীরে ওদের দিকে ফিরে তাকাল।

ওঃ সে কী বীভৎস মুখ! আর কী জঘন্য চাউনি লোকটির। মিস মোবারলি তো আঁতকে দু-পা পিছিয়ে এলেন।

অবশ্য অত ভয়ের মধ্যেও দুজনের মনেই একটা কথার উদয় হয়েছিল। লোকটা তাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল বটে কিন্তু তার দৃষ্টি ঠিক তাঁদের দিকে নিবদ্ধ ছিল না। তার ওই কুৎসিত শয়তানি দৃষ্টিটা যেন বারবার বলছিল,—কেন, কেন তোমরা এখানে? তোমরা এখান থেকে যাও। পালাও এখান থেকে।

সেই মায়াময় পরিবেশে, সেই রহস্যময় বিকেলে রাস্তা হারিয়ে ফেলা দুই ইংরেজ মহিলা মনে মনে হয়তো এটাই চাইছিলেন যে এই ভয়াবহ পরিবেশ থেকে এক্ষুনি পালিয়ে যাওয়া উচিত। নইলে যে কোনো মুহূর্তে আরও ভয়াবহ কিছু ঘটে যেতে পারে।

ঠিক তখনই ঘটল আরও এক অদ্ভুত কাণ্ড। আশেপাশে কোনো জনমানবের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আর-একজন লোক। অবশ্য এই লোকটির মধ্যে অত ভীতিজনক তেমন কিছু ছিল না। তবে লোকটি যে ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল তাতে মনে হল সে যেন অনেক দূর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে। লোকটি তখন রীতিমতো উত্তেজিত। চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'মহাশয়ারা, আপনারা এখনও কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াবেন না। আপনারা যা দেখতে চাইছেন সেটা এদিকে নয়, ওদিকে।' বলেই হাত তুলে অন্য রাস্তা দেখিয়ে দিল। মিস জার্ডেন বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু লোকটি সে অবকাশই দিল না।

লোকটির দেখিয়ে দেওয়া রাস্তা ধরে উভয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। সামনেই পড়ল অতি প্রাচীন একটি গ্রাম্য সেতু। সেতুটি পার হতেই এসে পড়লেন বাগান ঘেরা একটি বাড়ির সামনে। তখন কিন্তু আর সেই আগের থমথমে অবস্থাটা ছিল না। প্রকৃতিও অনেক স্বাভাবিক। চারদিকের পরিবেশ দেখে মনে হল তাঁরা যেন কোনো ব্যারাকে এসে পড়েছেন। যে বাড়িটার সামনে এসে ওঁরা দাঁড়ালেন ওটাই সেই বিখ্যাত প্রেটিট ট্রয়ানোঁ। মেরি অ্যান্টয়নেটের সাধের বাড়ি।

অস্বাভাবিকতা পার হয়ে স্বাভাবিক এবং জাগতিক পরিবেশের মধ্যে আসতে পেরে উভয়েই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। প্রাণ ভরে প্রকৃতির নির্মল বাতাস নিলেন। কিন্তু এখানেই মিস মোবারলির জন্যে সব থেকে বেশি চমক আর বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল।

সবুজ ঘাসে মোড়া শান্ত লনটির দিকে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন দুজনেই। সামনেই প্রেটিট ট্রায়ানোঁ। মেরি অ্যান্টয়নেটের প্রিয় আবাসস্থল। ঐতিহাসিক মূল্যেও এ স্থান বেশ উল্লেখযোগ্য। সহসা, বিকেলের অর্ধম্রিয়মান আলোয় চমকে উঠলেন মিস মোবারলি। কোনো ভুল ছিল না তাঁর দেখায়। বিকেলের আলোয় দৃশ্য অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল হলেও মিস মোবারলির চোখের দৃষ্টি খুবই প্রখর। তিনি দেখলেন বাড়ির দিকে পিছন ফিরে এক সুবেশা রমণী ছোট্ট একটি টুলের ওপর বসে আছেন। তাঁর হাতে ধরা একটি কাগজ। বাঁ হাতটিকে সোজা টান টান রেখে কাগজটি চোখের সামনে ধরে আছেন। দেখে

মনে হচ্ছিল তিনি যেন ছবি আঁকার স্কেচ করছেন। মিস মোবারলি বেশ আশ্চর্য হলেন। এই পরিবেশে এখন একজন মহিলাকে একা একা বসে থাকতে দেখা একটু অস্বাভাবিক। কনুই-এর ঠেলা দিয়ে তিনি পাশে দাঁড়ানো মিস জর্ডেনকে বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো? এমন এক নির্জন জায়গায় ওই মহিলা একা একা বসে কী করছেন?'

মিস জর্ডেন বেশ অবাক হয়ে চারদিক দেখে বললেন, 'কার কথা বলছেন মিস মোবারলি? কে বসে আছেন?

'সে কী, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ওই তো এক মহিলা ওখানে বসে কিছু বোধহয় আঁকছেন।

'আপনি যে কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তবে...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবছা মতো একটা কিছু ওখানে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে?'

'আবছা! কী বলছ তুমি? তোমার কি চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে গেছে! আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওই তো, ওই তো উনি আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন—ওঃ ঈশ্বর! এ আমি কী দেখছি—উনি, উনি তো মেরি অ্যান্টয়নেট—'

মিস মোবারলি পরবর্তীকালে তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন, 'সেই অভিশপ্ত বিকেলে আমি যা দেখেছিলাম তা বিস্ময়ের হলেও বেশ স্পষ্ট।

এই ঘটনার কিছু পরেই মিস মোবারলি এবং মিস জর্ডেনের আর সেখানে দাঁড়াবার মতো মানসিক ক্ষমতাই ছিল না। তাঁরা চটপট বাগান সংলগ্ন বাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে খুব প্রাণবন্ত এবং হাসিখুশি ভরা এক তরুণ এসে তাঁদের সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল তাঁরা কোথায় যেতে চান। তরুণটিই শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রেটিট ট্রায়ানোঁর প্রধান ফটকের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্যরকম। এই যে এতক্ষণের দেখা অলৌকিক সব কাণ্ডকারখানা তার কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রেটিট ট্রয়ানোঁর প্রধান ফটক পার হতেই তাঁরা দেখলেন হাসিখুশি ভরা বহু দর্শনার্থীর ভিড়। সেই মুহূর্তে তাঁদের মনে হয়েছিল মৃত্যুপুরী থেকে তাঁরা ফিরে এসেছেন।

মেরি অ্যান্টয়নেটের ঐতিহাসিক বাড়ি দেখে একসময় ওঁরা দুজনে অন্যান্য দর্শনার্থীদের সাথে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছিলেন প্যারিসে।

এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরেও মিস মোবারলিকে বেশ চিন্তাচ্ছন্ন এবং ভারাক্রান্ত দেখাত। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি সর্বদাই কী যেন ভাবেন। এমনকি মনের ভার হালকা করার জন্যে তিনি ইংলন্ডে তাঁর বোনকে সবকিছু জানিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন।

একদিন কথায় কথায় মিস জর্ডেনকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা জর্ডেন, তোমার কি মনে হয় প্রেটিট ট্রায়ানোঁর বাড়িটা ভূতুড়ে বাড়ি? মিস জর্ডেন এক কথায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ মিস মোবারলি। কোনো সন্দেহ নেই ও বাড়িতে ভূত আছে।'

এরপর ওই দুই ইংরেজ মহিলা অনেকদিন ধরে সেদিনের ঘটনার মানে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। পুরনো দিনের শোনা সব ভূতের গল্পের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা বার বার মিলিয়ে দেখেছিলেন। তাঁরা দুজনেই একমত হয়েছিলেন যে সেদিন তাঁরা যা দেখেছিলেন তাতে তাঁরা দুজনেই একই সঙ্গে ভয়চকিত হয়েছিলেন। দুজনেই সেই বিকেলে একই সঙ্গে এক অজানা শিহরণে শিহরিত হয়েছিলেন। এমনকি দুজনে আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। পরে মিলিয়ে দেখেছিলেন দুজনের বক্তব্য আর অভিজ্ঞতা হুবহু এক। সেদিনটা ছিল ১০ই আগস্ট। পুরনো ইতিহাসে ওই দিনটার একটি ঐতিহাসিক ঘটনাও তাঁরা পেয়েছিলেন। ১০ই আগস্ট ১৭৯২ সাল। রাজার সুইস রক্ষীদল সেদিন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল যার ফরে আর রাজার পক্ষে নিজের রাজতন্ত্রবাদ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

এরপর তাঁরা দুজনে তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে এবং মেরি অ্যান্টয়নেটের জীবন ইতিহাসের সঙ্গে মিল ঘটিয়ে লিখলেন একটি বই। বইটির নাম দিলেন— 'অ্যান অ্যাডভেঞ্চার'।

'অ্যান অ্যাডভেঞ্চার' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ সালে। আর ওই একই বছরে বইটির এডিসন হু হু করে বিক্রি হয়ে যায়।

ভূত যখন বন্ধু হয়

ভূতেরা বন্ধু হয় এমন কথা ভাবতেও অবাক লাগে। আমাদের ছোটো থেকে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে ভূত মাত্রেই মানুষের শত্রু। আমরা অনেক গল্পে দেখেছি ভূত কেমন ভাবে তার প্রতিহিংসা গ্রহণ করে। কেমন করে তার

জীবিত কালের শত্রুকে মৃত্যুর পর তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। একটি গল্পে তার সামান্য দৃষ্টান্ত আছে। রণক্ষেত্রে মৃত এক সৈনিকের ভূত সেখানে সিজারকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছিল। এবং সেই যুদ্ধে সিজারের জয় হবেই এমন ভবিষ্যতবাণীও করে গিয়েছিল। পরম বন্ধুর মতো ভূত সেখানে পথের সন্ধান দেখিয়েছে। আমাদের এবারের গল্প আর এক বন্ধুভূতের। ভূত এখানে পরম হিতৈষীর মতো এক নরপতিকে ইঙ্গিত দিয়েছে তার আসন্ন বিপদের। যদিও সে রাজাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি তবুও তার উপদেশ মতো কাজ করে রাজা সাময়িক অব্যাহতি পেয়েছিলেন। কিন্তু ভবিতব্যের হাত থেকে রাজা শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাননি। কে-ই বা পায়?

তখন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস। চার্লসের রাজত্বকাল বেশ অশান্তিতেই কেটেছিল। এর কারণ চার্লসের রাজনীতি। চার্লস মনে করতেন রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ। ঈশ্বরই রাজাকে প্রেরণ করেন এবং রাজাই পারেন ঈশ্বরের বিধান মতো রাজ্যশাসন করতে। চার্লস তাঁর সংস্কারে ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে। ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে তিনি গির্জা প্রভৃতির মধ্যেও রাজকীয় আড়ম্বর আনতে চেয়েছিলেন। গির্জা ইত্যাদি ধর্মীয় স্থানে রাজকীয় আসবার এবং বিলাসবহুল সামগ্রীর জোগান দিতে গিয়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অর্থের সংকুলান করতে গিয়ে চার্লসকে নিত্যনতুন কর চাপাতে হল রাজকোষ ভরতি করার জন্য। করভারে পীড়িত মানুষ তখন প্রায় খেপে গেল। কমনস সভাও ছিল এর বিরোধী। তারা চিৎকার করে জানাল রাজার প্রবর্তিত এই করনীতি বে-আইনি। ফলে রাজার সঙ্গে কমনস সভার লাগল বিরোধ।

১৬২৯ সালে চার্লস তাঁর রাজ্যসভা ভেঙে দিলেন। তারপর রাজ্যসভা ছাড়াই এগারো বছর তিনি নিজের খুশিমতো রাজত্ব চালালেন। রাজকীয় অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন বিব্রত হয়ে উঠল। দেশের চারিদিকের মানুষ, বিশেষ করে পিউরিটান গোষ্ঠীর লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কারণ রাজার ধর্মীয় সংস্কার পিউরিটান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই কার্যকরী হয়েছিল। এ ছাড়াও আমদানিকৃত জিনিসের ওপর প্রচুর শুল্ক চাপানোর ফলে ব্যবসায়ী মহলও হয়েছিল ক্ষুব্ধ। বলপূর্বক ঋণদানও সাধারণ মানুষের রাগের আরও একটি বড়ো কারণ হয়ে উঠল। দেশের চারদিকে যখন বিক্ষোভ ভয়ংকর আকার ধারণ করল তখন রাজা বাধ্য হলেন আবার রাজ্যসভার অধিবেশন ডাকতে। রাজার ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের পুরোধায় ছিল স্কটল্যান্ডবাসীরা। বিদ্রোহ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে

পৌঁছল তখন চার্লস বাধ্য হলেন রাজ্যসভার অধিবেশন ডাকতে। অবশেষে ১৬৪০ সালে যে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসল সেই অধিবেশনে সদস্যরা একযোগে রাজাকে নমনীয় না হলে তাঁকে কোনো ভাবেই সাহায্য করবে না এমন কথাও জানিয়ে দিল।

কিন্তু চার্লস ছিলেন বরাবরই একগুঁয়ে এবং দাম্ভিক। তিনি সদস্যদের স্পর্ধা মেনে নিতে পারলেন না। এবং রাজ্যসভা সঙ্গে-সঙ্গেই ভেঙে দিলেন।

স্কটল্যান্ডের বিদ্রোহীরাও রাজার এই স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিল না। তারা একযোগে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করে রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। ফলে চার্লস বাধ্য হলেন আবার পার্লামেন্ট ডাকতে। এই পার্লামেন্ট অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ১৬৪০ থেকে ১৬৫৩ সাল পর্যন্ত। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই পার্লামেন্টের গুরুত্ব অনেকখানি। এই পার্লামেন্ট অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল।

যাই হোক আমাদের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের বা চার্লসের ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিক এক প্রেত কী ভাবে প্রথম চার্লসকে তাঁর বিপদের আভাস দিয়েছিল এ কাহিনির গল্প তাই নিয়েই। চার্লসের জীবনের দুরবস্থার কথা বলার কারণ তাঁর আত্মম্ভরিতা, তাঁর অবিবেচকতা এবং ধর্মান্ধতাই যে তাঁর শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়েছে এটুকু বোঝার সুবিধে হবে বলেই এই ইতিহাস কথন।

পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধের অনেক কিছুর মীমাংসা হলেও একটা ব্যাপারে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠল। পার্লামেন্ট চেয়েছিল বিশপের ক্ষমতা হ্রাস করতে। আমাদের দেশে যেমন পুরোহিতদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ—বিশেষ করে নীচজাতীয় লোকেরা চিরকালই অত্যাচারিত হয়েছে ঠিক সেই রকমই চার্লসের আমলে বিশপদের একচেটিয়া ক্ষমতা সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করত। বিশপরা ছিলেন রাজার হাতের পুতুল। আর ধর্মের নামে বিশপেরা রাজার ইচ্ছাকে যেমন খুশি তেমনভাবে চালিয়ে দিতেন। তাই রাজা বিশপের ক্ষমতা হ্রাস করতে চাইলেন না কিছুতেই। অবশ্য পার্লামেন্টের অনেক সদস্যই রাজার পক্ষেও মত দিলেন। এর মধ্যে আবার অনেকে মনে করলেন রাজার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়ানো দেশের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। আবার পার্লামেন্ট বাদ দিয়ে রাজাকে একাধিপত্য দেওয়াও অত্যন্ত কুফল দায়ক। এর ফলে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল সমস্ত সৈন্যদল। ১৬৪২ সালে রাজা তৈরি করলেন নিজস্ব সেনাবাহিনী। পার্লামেন্টও বসে ছিল না। তারা তৈরি করল নিজেদের বাহিনী। শুরু হল গৃহযুদ্ধ। এজহিলের রণাঙ্গনে মুখোমুখি হল দু-পক্ষ।

পার্লামেন্টের বাহিনীর অধিনায়ক হলেন ওলিভার ক্রমওয়েল। তাঁর নেতৃত্বে ১৬৪৫-এ গৃহযুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করল। প্রায় পাঁচ হাজার পদাতিক এবং বিপুল সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চার্লস নর্দাম্পটনে এসে হাজির হলেন। চারদিকে তখন যুদ্ধের বীভৎসতা ছড়িয়ে পড়েছে। যে সমস্ত সৈন্যরা একদা একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শিখেছে—একই সঙ্গে দিনের পর দিন পাশাপাশি সুখে-দুঃখে কাটিয়েছে একই শিবিরে, এক সর্বনাশা গৃহযুদ্ধে তারা হয়ে পড়ল পরস্পরের শত্রু। সুযোগ পেলেই একে অপরকে নিধন করার যজ্ঞে মেতে উঠল।

বোধ হয় গৃহযুদ্ধ এমনই ভয়াবহ। সেখানে ভাই বন্ধু আত্মীয়-স্বজন কখন যে পর হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। এক সর্বনাশা ধ্বংসের খেলায় মানুষ তখন পশুতে পরিণত হয়ে যায়।

শিপ স্ট্রিটের সুইটসেফ হোটেলে রাজা তাঁর শিবির তৈরি করেছেন। সেখানে বসেই তিনি পরামর্শ করছেন যুদ্ধ কীভাবে চালাবেন। ক্রমওয়েলের বাহিনীকে কীভাবে পর্যুদস্ত করবেন সেই নিয়ে ঘন ঘন বৈঠক বসাচ্ছেন। ভবিষ্যত রণনীতি কী হবে তা নিয়েও বেশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তারপর সভা শেষে রাজা গেলেন শুতে। মানসিক এবং দৈহিক দুই ভাবেই রাজা তখন ক্লান্ত। বিছানায় শোবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমে তাঁর চোখের দু-পাতা জুড়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন কে জানে! হঠাৎ একটা অস্পষ্ট খসখসে আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটায় তিনি তেমন কিছু বুঝতে পারলেন না। আসলে তখনও তাঁর ঘুমের রেশ কাটেনি। চোখে তন্দ্রাও লেগে আছে। এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার ঘরে শুনতে পেলেন কে যেন ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধের সময়। গোপনে তাঁর ঘরে শত্রুপক্ষের কারও আসাও বিচিত্র নয়। বিছানার পাশে রাখা নিজের তলোয়ারটা নিমেষের মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর মনে সাহস এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে, কে তুমি? এত রাতে আমার ঘরে কী করতে এসেছ?'

রাজা যেন হাওয়ার সঙ্গে কথা বললেন। কারণ কেউই তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল কেউ যেন তাঁর শয্যার চারপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আর সুযোগ দেওয়া সমীচীন নয় ভেবে রাজা তলোয়ার নিয়ে বিছানায় উঠে বসতে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল ফিসফিস স্বরে আগন্তুক তাঁকে যেন কিছু বলতে চাইছে। আওয়াজটা কেমন যেন ফ্যাঁসফেঁসে আর হিসহিসে ধরনের।

রাজা অধৈর্য হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি? কী বলতে চাইছ এত রাতে, আমার ঘরে এসে?'

আবার সেই হিসহিস শব্দ। এবারও রহস্যময় কিন্তু খানিকটা স্পষ্ট। রাজা

কান পেতে শব্দটার মানে বুঝতে চাইলেন। আগন্তুক হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটাকে চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু একটা অশরীরী উপস্থিতি তিনি ঠিকই টের পাচ্ছিলেন।

আবার হিসহিস শব্দ হতেই রাজা স্পষ্ট শুনতে পেলেন, সেই ছায়া ছায়া মূর্তি বলছে, 'আমাকে চিনতে পারছ না রাজা? আমি তোমার বন্ধু।'

'বন্ধু? কিন্তু কে তুমি? কী তোমার নাম? বন্ধুই যদি হবে তাহলে আলোটা জ্বালাও। সামনে এসে দেখা দাও।'

রাজা বোধহয় আলো জ্বালাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ছায়ামূর্তি বাধা দিল, 'আলো জ্বালিয়ো না। আলো জ্বালালে আমি এখানে থাকতে পারব না।'

'বেশ। আলো জ্বালাব না। কিন্তু তোমার পরিচয়টা দাও।'

'আমি স্ট্রাফোর্ড।'

'স্ট্রাফোর্ড? কী আশ্চর্য? সে তো অনেকদিনই মারা গেছে।'

'হ্যাঁ। তোমার জন্যেই আমি মারা গিয়েছিলাম। জীবিতকালে আমি সর্বদাই তোমার বন্ধু ছিলাম। সর্বদাই তোমাকে আমি সুপরামর্শ দিতাম।'

'আমি তো সে কথা অস্বীকার করিনি। চারিদিকে আমার অনেক শত্রুর মধ্যে তুমিই ছিলে আমার যথার্থ বন্ধু। রাজপরিবারের জন্য তোমার আত্মত্যাগ আমি ভুলিনি বন্ধু।'

'চার্লস, তোমার নিশ্চয় মনে আছে তোমার রাজতন্ত্রের নীতি-প্রতিষ্ঠার জন্য যারা যারা আত্মত্যাগ করেছে—তাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম প্রাণ দিই।'

'যতদিন বাঁচব সেকথা আমি মনে রাখব। এ যুদ্ধে জয়লাভ করলে তোমার জন্যে আমি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করব রাজকীয় মর্যাদায়।'

'কিন্তু' বলেই হঠাৎ স্ট্রাফোর্ড চুপ করে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই। রাজাও অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কী? তুমি চুপ করে গেলে কেন বন্ধু? বলো তুমি কী বলতে চাইছিলে?'

আবার ধীরে ধীরে সেই ফ্যাঁসেফেঁসে আওয়াজটা ভেসে এল। 'জীবিত অবস্থায় আমি যেমন তোমার বন্ধু ছিলাম মৃত্যুর পরও, আমার প্রেতাত্মা এখনও তোমার বন্ধুই আছে। তুমি একটু আগে বলেছিলে না আমার জন্যে স্মৃতিসৌধ স্থাপন করে দেবে। রাজা, তুমি আর কোনোদিনও সে সুযোগ পাবে না।'

রাজা যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কী বলছ স্ট্রাফোর্ড?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, স্থূল দেহে তোমরা যা দেখতে পাও না, সূক্ষ্মদেহে আমরা

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, সব কিছুই দেখতে পাই। আমি বন্ধু হিসেবেই তোমাকে বারণ করতে এসেছি—এ যুদ্ধ বন্ধ করো।'

'না, না তা হয় না। আমি রাজা চার্লস। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। আমরা শরীরে রাজরক্ত বইছে। সামান্য এক ক্রমওয়েলের দম্ভ আমি সহ্য করব না। তাকে আমি ধ্বংস করে ছাড়ব।'

'পারবে না বন্ধু। তুমি তা পারবে না। আর কোনোদিনও তোমার পক্ষে তোমার প্রবর্তিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। মৃত্যুর পর আমি জেনেছি একনায়কতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে আসছে। ক্রমওয়েল সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। ওকে হারানো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাকে এও বলে রাখছি জীবনে আর কোনোদিনও কোনো যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করতে পারবে না। তাই বলছি বন্ধু—আপোষে সব কিছুর মীমাংসা করে নাও।'

কথাগুলো বলেই লর্ড স্ট্রাফোর্ডের ভূত যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এরপর রাজা শূন্য বিছানায় অনেকক্ষণ একা একা বসে রইলেন। একটু আগের সব কিছু ভালোভাবে তলিয়ে দেখলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে হল এ সবই অলীক এবং দুঃস্বপ্ন। মুখে চোখে ঠান্ডা জল দিয়ে আবার তিনি শুয়ে পড়লেন।

সেই রাতেই, বোধহয় ভোর রাতেই আবার স্ট্রাফোর্ডের আত্মা তাঁকে দেখা দিল। পূর্বের কথাগুলি আবারও তাঁকে জানিয়ে সাবধান করে দিল। এবার আর রাজা দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তিনি ঠিক করলেন স্ট্রাফোর্ডের আত্মার উপদেশ গ্রহণ করবেন।

তিনি আর যুদ্ধে অগ্রসর হলেন না। ১৬৪৫ এর ১৪ই জুন জেসবিতে ক্রমওয়েলের বাহিনীর কাছে চার্লস প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হলেন। তারপর ১৬৪৬ এর গোড়ায় তিনি ক্রমওয়েলের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলেন।

স্ট্রাফোর্ডের প্রেতাত্মা বন্ধুর কাজই করেছিল। রাজাকে সসৈন্যে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডন করা যায় না। তা মেনে নিতেই হবে। রাজা প্রথম চার্লসকেও তাঁর নির্দিষ্ট ভাগ্য মেনে নিতে হল।

প্রায় তিন বছর পর পার্লামেন্টে রাজার বিচার চলল। বিচারের শেষে রাজাকে পার্লামেন্টে চুক্তিবদ্ধ হবার নির্দেশ দিল। কিন্তু রাজরক্তের দম্ভ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না চার্লস। ভুলে গেলেন বন্ধু স্ট্রাফোর্ডের প্রেতাত্মার সাবধান বাণী। স্ট্রাফোর্ডের প্রেত রাজাকে মীমাংসায় আসতে বলেছিল। রাজা তা শুনলেন না। তিনি স্পষ্ট জানালেন, তিনি রাজা। তিনি সর্বশক্তিমান। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনোরকম কোনো চুক্তিতে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এবং গোপনে তিনি নিজের সৈন্যদলকে সাজাতে শুরু করলেন পুনর্বার যুদ্ধের জন্য।

ক্রমওয়েল রাজাকে আর বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর শক্তি তখন অনেক বেড়ে গেছে। যাঁরা পার্লামেন্টে রাজার সপক্ষে ছিলেন তাঁদেরকে তিনি বিতাড়িত করলেন। আর 'রাম্প' নামে পরিচিত পার্লামেন্টের বাকি সদস্যরা রাজাকে পুনর্বিচারে বসালেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজাকে স্বৈরাচারী ও দেশের পরমশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। শেষ বিচারে ১৬৪৯ সালে রাজাকে গদিচ্যুত করে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হল। ১৬৪৯ সালেই তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়।

স্ট্রাফোর্ডের প্রেত অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রাজাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। প্রেত বলে গিয়েছিল পার্লামেন্টের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসতে। কিন্তু অহংকারী রাজরক্ত পরমবান্ধবের হিতোপদেশ কানে তোলেনি। তাহলে হয়তো ইতিহাসের ধারাটাই পালটে যেত—হয়তো অন্য কিছু হত...।

এথেন্সের শেকল বাঁধা ভূত

সে অনেক দিন আগের কথা। তখনও যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়নি। আড়াই কি তিন হাজার বছর হবে। প্রাচীন গ্রিসে এথেন্স বলে একটা জায়গা ছিল। এথেন্স কিছু অপরিচিত নাম নয়, সবাই এর নাম শুনেছে। সেই এথেন্সেরই একটা পাহাড় ঘেরা ছোট্ট গ্রামে এক জঙ্গলের মধ্যে পুরনো একটা বাড়ি ছিল। বাড়িটা অবশ্য অনেক দিন ধরেই খালি পড়েছিল। একে তো নির্জন পাহাড়ি অঞ্চল। তার ওপর ঘন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা পরিবেশ। তায় পরিত্যক্ত। লোকজনও না থাকলেও বাড়িটা কিন্তু খুব একটা ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল না। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে পরিষ্কার করে বা সামান্য সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে লোকে অনায়াসেই সেখানে বসবাস করতে পারত। আসলে সবাই কি আর লোকজনে ঠাসা ভিড় হই-হট্টগোলের মধ্যে বাস করতে পছন্দ করে? অনেকেই নির্জন শান্ত পরিবেশে নিজের মতো করে থাকতে ভালোবাসে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ওই বাড়ির যে মালিক সে কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও

অনেকদিন পর্যন্ত কাউকে ওই কুঠিটা ভাড়া দিতে পারেনি। আসলে পাহাড়ের উপর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত কুঠিটার বেশ বদনাম হয়ে গিয়েছিল। একবার এক শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক কুঠিটা দেখে লোভ সামলাতে পারেননি। তিনি ছুটির অবকাশ কাটাবার জন্য ওই নির্জন কুঠিটাকে বেছে নিয়েছিলেন কয়েকদিন শান্তিতে কাটাবেন বলে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল লোকটির মৃতদেহ পড়ে আছে কুঠির দালানে। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামায়নি। তবে যারা তাঁর মৃতদেহ দেখেছিল তাদের মধ্যে কিছু সন্দেহ দানা পাকিয়েছিল। কারণ মৃত্যুর পরেও লোকটির চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক ভয় লগে ছিল। আর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু, পরে, মানে বেশ কিছুদিন পর আর-একজন সৈনিক ধরনের লোক সেই বাড়িতে এসেছিল রাত কাটাতে। লোকটি ছিল অসম্ভব সাহসী। সেই লোকটি প্রাণে মরেনি ঠিকই, কিন্তু তার মুখ থেকে রাত্রির অভিজ্ঞতা যা শোনা গিয়েছিল তা ছিল রীতিমতো ভয়াবহ। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে সবে সে শুতে গিয়েছিল এমন সময় সে হঠাৎ দেখতে পেল ছাই রঙের দাড়িওয়ালা ইয়া চেহারার বিশাল এক বুড়ো হাতে-পায়ে শেকল লাগানো অবস্থায় ঘুমন্ত সৈনিকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ থেকে কেমন এক ধরনের গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছিল। সৈনিক পুরুষটি মারা যায়নি। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পরদিন জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে সেই কুঠি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। সৈনিকটির মুখে সব কথা শোনার পর সারা গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি দিনের বেলাতেও আর কোনো সাহসী লোক ওই কুঠির ত্রিসীমানায় পা বাড়াত না। কুঠির মালিক যে ছিল সে লোকটি কুঠিটা ভাড়া দিয়ে নিজের সংসার চালাত। কিন্তু যে মুহূর্তে ওই ধরনের একটা ভূতুড়ে প্রবাদ ছড়িয়ে পড়ল তারপর থেকে আর কেউই কুঠিটা ভাড়া নিয়ে কয়েকদিন থাকার কথা ভাবতেও পারত না। ফলে হল কী কুঠিটা সবার কাছে 'ভূতকুঠি' নামে পরিচিত হয়ে গেল। কেই-বা সাধ করে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে যাবে? শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই জলের দরে কুঠিটা বিক্রি করে দিতে চাইল কুঠির মালিক। কিন্তু কিনবে কে? শখ করে ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াতে কেউ রাজি নয়।

তবু একজন রাজি হল। কুঠির মালিক একজন খদ্দের পেলেন। লোকটি ছিলেন তখনকার দিনে একজন নামকরা দার্শনিক। দার্শনিক মানুষেরা সাধারণত নির্জন জায়গায় থাকতেই ভালোবাসেন। লোকমুখে কুঠিটার অপবাদের কথা তাঁরও কানে এসেছিল। কিন্তু দার্শনিক ভদ্রলোক মনে-প্রাণে কোনো অলৌকিক

ব্যাপার বিশ্বাস করতে চাইতেন না। তিনি ভাবলেন বাড়িটায় গিয়ে তিনি উঠবেন। মানুষের মধ্যে ভূতের ভয়ে অযৌক্তিক সংস্কারকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কুঠির মালিকের কাছে গিয়ে তিনি কুঠিটি কেনার বাসনা জানালেন। মালিক তো হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এমন ভূতুড়ে বাড়ি কোনোদিনও ভাড়া বা বিক্রি হবে না। তাই দার্শনিক ভদ্রলোকের প্রস্তাব শুনে মালিক আকাশ থেকে পড়লেন। বলে কী এই বুড়ো, ভাড়া নয় একেবারে কিনতে চাইছেন? অত্যন্ত কম দামে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুঠিটি বিক্রি করে হাঁফ ছাড়লেন।

আগেই বলেছি যুক্তি ছাড়া দার্শনিক চলেন না। যা চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে যাকে ছোঁয়া যায় না অথবা অন্তর দিয়ে যাকে উপলব্ধি করা যায় না তেমন কিছুতে তাঁর বিশ্বাস আসবে কেন?

নিজের সব জিনিসপত্তর নিয়ে গিয়ে উঠলেন সদ্য কেনা সেই বাড়িটায়। সারা দিন ধরে নিজের হাতে সব কিছু সাজালেন। নিজের হাতেই তাঁকে সব কিছু করতে হয়েছিল, তার কারণ বাড়িটার ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা নিয়ে এমন সব গল্পগুজব তৈরি হয়েছিল যে তিনি অনেক বেশি পয়সার লোভ দেখিয়েও কোনো চাকর-বাকর পাননি।

যাই হোক, সারাদিন পরিশ্রমের পর দার্শনিক ভদ্রলোক বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খুব একটা খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না। সামান্য রুটি-মাংস আর কফি দিয়ে রাতের আহার শেষ করলেন। তারপর গিয়ে শুলেন তাঁর ছোট্ট বিছানায়। মাথার কাছে বিশাল সেকেলে ধরনের একটা জানালা ছিল। সেটাও খুলে রাখলেন। গরমের দিন। সন্ধেরাতের ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। দেহেও ছিল অত্যন্ত ক্লান্তি। বাতি নিবিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু-চোখের পাতায় নেমে এল রাজ্যের ঘুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন কে জানে! হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ আর অস্বস্তির মধ্যে তাঁর ঘুমটা গেল ভেঙে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সামান্য সময় লাগে প্রকৃতিস্থ হতে। দার্শনিক ভদ্রলোকেরও সামান্য সময় লাগল তিনি কোথায় আছেন, কেমনভাবে আছেন এটুকু বুঝতে। তারপর তাঁর সব কিছু একে একে মনে পড়ে গেল। তাঁর মনে পড়ল তিনি এসেছেন এক নতুন বাড়িতে। আর এই নতুন বাড়িতেই তাঁর প্রথম রাত্রিবাস। কান খাড়া করে অদ্ভুত আওয়াজ আর অস্বস্তিটা তিনি বোঝার চেষ্টা করতে চাইলেন। মিনিট দুই-তিন মড়ার মতো বিছানায় শুয়ে থেকে তিনি বুঝলেন আওয়াজটা অনেকটা শেকলের ঝনঝন আওয়াজের মতো। কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। কে যেন অনেক দূর থেকে

শেকল টেনে টেনে আসছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। জমাট অন্ধকার সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে। মাথার কাছে জানালা দিয়ে কেবল আকাশটুকু দেখা যায়। অবশ্য সেই সময় আকাশটাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। আকাশের রং আর ঘরের রং এক হয়ে গিয়েছিল। দার্শনিক ভদ্রলোক কিন্তু চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন না। তিনি লক্ষ করতে চাইলেন ব্যাপারটা কী? আরও একটা জিনিস তিনি অনুভব করলেন। সমস্ত ঘরের বাতাস যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। একটা দম বন্ধ করা গুমোট পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকটা সময় যখন এইভাবে কেটে গেল, আর জমাট বাঁধা অন্ধকারটা যখন ধীরে ধীরে সয়ে এল, হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করলেন হাতে পায়ে শেকল বাঁধা একটা অশরীরীর হাল্কা ছায়া মূর্তি আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে। হাত নেড়ে সেই ছায়ামূর্তিটা কী যেন বলতে চাইছে। মূর্তিটার দুটো চোখ আর মুখের হাঁ থেকে জ্বলন্ত আগুনের আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে।

দার্শনিক ভদ্রলোক ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। ভৌতিক কিছুতে তাঁর তেমন বিশ্বাস বা সংস্কার কিছুই ছিল না। তবু, ভয় না পেলেও, একটা অদ্ভুত বিস্ময় তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখল।

তিনি বুঝতে চাইলেন, এটা কী? কোনো ভয়ংকর দানব নাকি কোনো অসৎ মানুষ ওইভাবে সাজগোজ করে তাঁকে ভয় দেখাতে চাইছে?

শুয়ে শুয়ে এইসব নানান যুক্তি তর্ক যখন তাঁর মনে ঝড় তুলেছে তখনই তিনি দেখলেন সেই হাতে-পায়ে শেকল পরা ছায়া ছায়া মূর্তিটা ধীরে ধীরে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত মূর্তিটা তাঁর একেবারে খাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। দু-চোখ আর মুখের গহ্বর থেকে তখনও সেই লাল আগুনের আভাটা ঠিকরে পড়ছিল। সে যেন মুখ হাঁ করে হাত পা নেড়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল। আর তার হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেকলের ঝনঝন আওয়াজটাও ক্রমাগত শব্দ তুলে যাচ্ছিল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যেত অথবা দুর্বল হৃদয়ের কোনো রোগী হলে নির্ঘাৎ তার মৃত্যু হত। কিন্তু অত্যন্ত সাহসী সেই দার্শনিক ভদ্রলোকটির কিছুই হল না। বরং তিনি যেমন ছিলেন সেইভাবেই তাকিয়ে রইলেন ছায়ামূর্তিটার দিকে। আসলে তিনি দেখতে চাইছিলেন অশরীরী মূর্তিটি এরপর কী করে?

একমুখ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, আর একমাথা রুক্ষ চুলে মূর্তিটিকে তখন বেশ বীভৎস এবং ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল। তার উপর তার হাতের নখগুলো ছিল বেশ বড়ো বড়ো। হাতের তীক্ষ্ণ আর বড়ো বড়ো নখ দেখে দার্শনিকের মনে একটা

অন্য ধরনের ভয় এল। ভূত তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু জ্যান্ত দেহের কোনো চোর-ডাকাতকে তাঁর ভয় না করার কোনো কারণ ছিল না। মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা মানুষের কতটা ক্ষতি করতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। অদেখা এমন কিছু পৃথিবীতে আছে বলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু জ্যান্ত চোর-ডাকাত মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে। তাছাড়া তাঁর কাছে আত্মরক্ষার মতো তেমন কোনো অস্ত্রই ছিল না। মনে মনে যখন তিনি ভাবছিলেন সত্যিই যদি লোকটি কোনো চোর-ডাকাত হয় তাহলে তাঁর করার কিছু থাকবে না। তার উপর লোকটাকে দেখে মনে হয় তার গায়ে বেশ জোরও আছে। তাই তিনি যখন সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কী করা যায় তাই ভাবছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন মূর্তিটি আর এক পা-ও না এগিয়ে এসে ক্রমাগত পিছু হটতে শুরু করল। পিছতে পিছতে সে একসময় ঘর পরিত্যাগ করল।

অশরীরী মূর্তিটিকে পিছিয়ে যেতে দেখে দার্শনিক ভদ্রলোকটি ক্ষণিকের অবশ অবস্থা ত্যাগ করে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর নিজেও ছুটে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

অশরীরী মূর্তিটি ভূত বা অদ্ভুত যাই হোক না কেন দার্শনিক পরম বিস্ময়ে লক্ষ করলেন বারান্দা পার হয়ে মূর্তিটি ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল। তারপর লম্বা উঠোনের ঠিক মাঝ বরাবর গিয়ে হঠাৎই যেন কর্পূরের মতো উধাও হয়ে গেল। দার্শনিক ঠিক তখনই একবার চিৎকার করে উঠলেন 'কে কে' বলে। কিন্তু উত্তরে কেবল অনেক দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না।

উঠোনের ঠিক যে জায়গায় মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে কী যেন ভাবলেন। আরও দু-এক বার ডাকাডাকি করেও কারো উত্তর কিছু পেলেন না। বিফল মনোরথে তিনি ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লেন। বাকি রাতটা এই অদ্ভুত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করতে করতে কাটিয়ে দিলেন।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রে ঠিক যে জায়গা থেকে মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেখানে এসে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু দিনের আলোয় কোনো কিছুই তাঁর অস্বাভাবিক বলে মনে হল না।

পাহাড়ের টিলায় এই বাড়িটি ছিল লোকালয় থেকে বেশ কিছু দূরে। লোকজন কেউ তেমন থাকত না। হয়তো সেটা কুঠিবাড়িকে কেন্দ্র করে যে সব গল্প এবং গুজব আছে তারই ভয়ে কোনো সাহসী পুরুষ এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসত না।

নির্বান্ধব এবং নির্জন বাড়িটায় দার্শনিক আবার তন্ময় হয়ে গেলেন তাঁর নিজের কাজে। নিজের চিন্তায়। নিজের পড়াশুনায়। প্রায় সারাদিনই তিনি বই-এর জগতে ডুবে রইলেন। ফলে রাতের সেই অশরীরী এবং অদ্ভুত ঘটনার কথা তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে যখন তিনি বিছানায় শুতে গেলেন তখনই একবার গত রাতের কথা মনে হল। কিন্তু ঘটনাটিকে তিনি তেমন আমল দিলেন না। ভাবলেন অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত থাকার জন্য আধা ঘুম আধা জাগরণে কী দেখতে কী দেখেছিলেন। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম না এলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

ভয়ডর না থাকার জন্যে সমস্ত কিছুকে অলীক বলে উড়িয়ে দিলেও পরের রাতে কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তার পরের রাতেও সেই একই ব্যাপার। পর পর তিন রাত্রি একই ভাবে অশরীরী মূর্তির আবির্ভাব এবং একই ভাবে হাত নেড়ে কিছু বলতে চাওয়ার চেষ্টা এবং একই ভাবে উঠোনের ঠিক একই জায়গায় এসে মিলিয়ে যাওয়া, তাঁকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। তিনি কিছুতেই কোনো ব্যাখ্যা দিয়েই বুঝতে পারছিলেন না—এটা কেমন করে হয়? কীভাবে হয়? তবে কি এটা নতুন ধরনের যাদুবিদ্যা? অবশেষে চতুর্থ দিন সকালে দার্শনিক কিন্তু আর নিছকই কল্পনা বলে সব কিছু উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আবার ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েও গেলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু অনুসন্ধানের আছে। নিছক মায়া বা যাদুবিদ্যা নয়। আর সত্যিই যদি অশরীরী কোনো প্রেত হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় সে কিছু বলতে চাইছে। আর সব থেকে দার্শনিককে বেশি আকৃষ্ট করল উঠোনের সেই নির্দিষ্ট স্থানটি। কেনই বা প্রতি রাতে অদ্ভুত এবং বীভৎস আকৃতির সেই মূর্তি ওই বিশেষ একটি জায়গায় এসে হারিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি ওই জায়গাটিতেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লুকিয়ে আছে? এর একটা বিশেষ তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন।

চতুর্থ দিন সকালে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক আর বাড়িতে বসে রইলেন না। চলে গেলেন শহরে। প্রথমেই তিনি যোগাযোগ করলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। সব কথা তাঁকে খুলে বললেন। অন্য কেউ হলে হয়তো পাগলের খেয়াল ভেবে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এই দার্শনিক ছিলেন বেশ নামী লোক। জ্ঞান এবং বুদ্ধিমান হিসেবে তিনি প্রায় সকলেরই পরিচিত। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের মতো একজন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে যে তিনি মশকরা করবেন না এটা ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব নিজেও জানতেন। কালবিলম্ব না করে তিনি বেশ কিছু মজুর নিয়ে ফিরে এলেন দার্শনিকের কেনা নতুন বাড়িতে।

উঠোনের ঠিক যে জায়গায় এসে অশরীরী মূর্তিটি গত তিন রাত্রে অদৃশ্য হয়ে যেত সেই জায়গায় মাটি খোঁড়া শুরু হল। অবশ্য বেশি দূর খুঁড়তে হল না। সামান্য কয়েক হাত জমির নীচেই পাওয়া গেল একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল। কঙ্কালটির হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা। শিকলে মরচে ধরেছে বেশ পুরু হয়ে।

প্রেত বা ভূত কোনোদিনও বিশ্বাস ছিল না দার্শনিক ভদ্রলোকটির। কিন্তু গত তিন রাত ধরে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি মূর্তির সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কালটির কোথায় যেন কী সাদৃশ্য রয়েছে। এটা অনুমান করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হল না। সহজ এবং যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধি দিয়ে দার্শনিক এর কোনো অর্থই করতে পারলেন না।

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের পরামর্শে নিয়মকানুন মেনে তাঁরা কঙ্কালটি যথাযথভাবে কবর দিলেন। আর সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার যা, তা হল কঙ্কালটি ভালোভাবে কবরস্থ হবার পর আর কিন্তু কোনোদিনও কোনো রাতেই দার্শনিকের ঘরে সেই অশরীরী মূর্তির আবির্ভাব ঘটেনি।

এরপর দার্শনিক বহুদিন সেই বাড়িতে বাস করেছিলেন। বহুদিন ধরে তিনি কবরস্থ কঙ্কালটির সম্বন্ধে খোঁজখবরও করেছিলেন। কিন্তু সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি ওই বাড়িতে কাউকে কোনোদিনও কবর দেওয়া হয়েছিল কি না। তবে ওই গ্রামের এক অতি বৃদ্ধের মুখে শোনা যেত, অনেক-অনেক দিন আগে এক বৃদ্ধ ক্রীতদাসকে সামান্য অপরাধের জন্য ওইভাবে হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তা জানার উপায় নেই। তবে দার্শনিক এটুকু বুঝেছিলেন মৃত্যুর পর আত্মার আসা-যাওয়া থাকে। আর সে আত্মা যদি অতৃপ্ত হয় তাহলে অশরীরী রূপ নিয়ে মানুষকে দেখা দিতে চায়। হয়তো বা তার অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তির পথ খোঁজে।

আধ খাওয়া মড়া

রূপনারায়ণ নদের বিরাট একটা চর।

নদীর বাঁধটা একটা বিরাট অজগরের মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে দূর থেকে

বহুদূরে। বাঁধের ধারে ধারে, দু-পাশেই বট, অশ্বত্থ, জাম, তেঁতুল, শিরীষ, অর্জুন, প্রভৃতি গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাঁধ থেকে নেমে খানিকটা এগিয়ে গেলেই গ্রামের সীমানা। প্রথমেই জেলেপাড়া। তার ডান দিকে বাগদিপাড়া, উত্তর দিকে বিভিন্ন জাতের লোক বাস করে। অপর দিকে রূপনারায়ণ নদ ঢেউ তুলে তরতর করে এগিয়ে চলেছে। বাঁধের উপর দিয়ে প্রায় মাইল খানেক গেলেই রূপনারায়ণের প্রকাণ্ড চর। এই চরেই গাঁয়ের লোকেরা মড়া পোড়ায়।

আশপাশের প্রায় দশখানা গাঁয়ের মধ্যে ওই একটাই শ্মশান।

শ্মশানের কাছাকাছি অনেক নাম না জানা বড়ো বড়ো গাছ আর ঝোপঝাড়।

পাড়াগাঁয়ের শ্মশান যে কত ভয়ংকর না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শ্মশানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে পোড়া কাঠ, আধপোড়া বাঁশ, ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া মাদুর, মড়ার হাড়, ভাঙা হাঁড়ি আর সরা।

যারা মড়া পোড়াতে পারে না, তারা সব মড়া আর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মড়া মাটিতে পুঁতে দিয়ে যায়। তারপর সেই সব মড়া মাটির ভেতর থেকে টেনে বের করে শেয়াল-কুকুর আর শকুনে মনের আনন্দে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। কাছের ঝাঁকড়া শিরীষগাছটায় একদল শকুন থাকে।

হঠাৎ একদিন ঘটে গেল একটা ব্যাপার। বাগদিপাড়ার নগেন দলুই বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে যায়। প্রায় চার দিন কেটে গেল, সে আর বাড়ি ফেরে না দেখে, সবাই চিন্তায় পড়ল। যেখানে যত আত্মীয় ছিল, খোঁজ নেওয়া হল। কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না তার।

সেদিন সকালে জেলেপাড়ার জনাকয়েক লোক ডিঙি ভাসিয়ে মাছ ধরতে ধরতে এসে পড়েছে শ্মশানের বেশ কাছাকাছি।

হঠাৎ তাদের নাকে দুর্গন্ধ লাগল। আর সেই সঙ্গে শকুনের ডানা ঝাপটানির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখল, নগেন দলুই-এর পচা-গলা মৃতদেহটা চরে এসে আটকে আছে। শকুনে খানিকটা ছিঁড়ে খেয়েছে। চোখ দুটোও শকুনে খুবলে খেয়ে নিয়েছে। শুধু চোখের গর্ত দুটো আছে।

জেলেরা এই বীভৎস দৃশ্য দেখে বাগদিপাড়ায় সংবাদ ছিল। সকলে তখন সেখানে ছুটে এসে দেখল, এত দুর্গন্ধ ছাড়ছে যে কার সাধ্য সেখানে দাঁড়ায়। তখন সবাই নাকে কাপড় চাপা দিয়ে, মড়াটার পায়ে দড়ি বেঁধে, শ্মশানের ভেতর এনে মাটি চাপা দিয়ে চলে এল। রাত্তির বেলা মাটির ভেতর থেকে নগেনের মৃতদেহটা তুলে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলল।

নগেন দলুই-এর অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল। তার দুটি ছেলে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা ভালোভাবেই বাপের শ্রাদ্ধ করলে। জেলেপাড়া-বাগদিপাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রণ খেয়ে গেল।

এই ঘটনার পর প্রায় এক মাস কেটে গেল। তারপর থেকেই নানারকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে লাগল। কখনও বাগদিপাড়া থেকে আবার কখনও জেলেপাড়া থেকে হাঁস-মুরগি-ছাগল চুরি যেতে লাগল।

একদিন নগেনের বউ রাত্রে একটা শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখলে—তাদের আমগাছটার নীচে, যেন কে একজন সাদা কাপড় গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয় পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

মায়ের চেঁচানি শুনে ছেলেরা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে বাইরে এসে চারিদিক দেখল। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, ও সব মনের ভুল, গাছের ছায়া দেখে মা ভয় পেয়েছে।

রাত্রে বাঁধের ওপর আর শ্মশানেও একটা কঙ্কালকে ঘোরাফেরা করতে দেখে গাঁয়ের সবাই ভয় পেয়ে গেল। রাত্রে শ্মশানে মড়া নিয়ে আসা বন্ধ করে দিল সবাই। জেলেরা সারাদিন রূপনারায়ণে মাছ ধরে, সন্ধ্যা হলেই যে যার বাড়ি ফিরে আসতে লাগল। এমনকি বাঁধের ওপর দিয়েও লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সন্ধে হলেই রাস্তা একেবারে ফাঁকা।

সে দিন রাখাল জেলের একটা বাছুর গেল হারিয়ে। সারাদিন খোঁজ করা হল কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না বাছুরটাকে। এক দিন পরে একজন লোক শ্মশানের দিকে এসে দেখল। রাখাল জেলের বাছুরটা মরে পড়ে আছে, তার আধখানা কে যেন চিবিয়ে খেয়েছে। বাকিটা পড়ে আছে একটা গাছের তলায়।

খবরটা শুনে রাখাল এসে দেখল ব্যাপারটা। কী করবে? তাই সে কিছু না বলে চলে এল সেখান থেকে। মনে মনে সে বুঝল, নগেন দলুই ভূত হয়ে এইসব কাণ্ড করছে।

জেলেপাড়ার ফকির আর নিধিরাম ভোরবেলায় জাল কাঁধে নিয়ে মাছ ধরতে গেল। নগেনের বাড়ির পাশ দিয়েই তাদের যাবার রাস্তা। তাই তারা সেই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল আপনমনে। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল নগেন দলুইয়ের বাস্তুভিটাটার দিকে।

অবাক হয়ে ফকির আর নিধিরাম দেখল নগেনের বাড়ির দরজার কাছে একটা আবছা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। সারাদেহ তার সাদা কাপড়ে ঢাকা। ওরা চোর ভেবে জিজ্ঞাসা করলে, ওখানে কে রে? সঙ্গে সঙ্গে আবছা মূর্তিটা ঘুরে দাঁড়াল।

ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখল লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু চোখ দুটো যেন আগুনের গোলার মতো জ্বলছে। দেখতে দেখতে মূর্তিটা বিরাট লম্বা হয়ে গেল।

এই ব্যাপার দেখে ফকির আর নিধিরাম ভয় পেয়ে, ওরে বাবারে গেলুম রে, বলে ছুটে পালাল প্রাণপণে।

সবার মুখে মুখে খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। পাড়ার লোক ভয় পেয়ে সন্ধে সাতটার পর নগেন দলুই-এর বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিল।

ফকির জেলে নগেনের ছেলেদুটোকে বললে, বাপু, ব্যাপার খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। তোদের বাপ ভূত হয়েছে। তোরা ছেলেপুলে নিয়ে থাকিস, একটা কিছু ব্যবস্থা কর। তা না হলে কোনোদিন তোদের বিপদ হতে পারে।

নগেনের বড়োছেলেটা ভয় পেয়ে বললে, কী ব্যবস্থা করা যায় বলো দেখি খুড়ো? মা-ও একদিন দেখেছিল, আমরা তার কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন দেখছি বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

নগেনের ছোটোছেলে বললে, আমিও সেদিন ভোরের দিকে বাইরে বেরিয়ে সাদা কাপড় ঢাকা একটা মূর্তি দেখেছিলাম, কিন্তু সবাই ভয় পাবে বলে কাউকে আর কিছু বলিনি।

নিধিরাম সব শুনে কিছুক্ষণ ধরে কী যেন ভাবলে। তারপর গম্ভীরভাবে বললে, এখানে তো তেমন ভূতের ওঝাও নেই। তবে শুনেছি মহেশপুরে একজন লোক আছে। সে নাকি ভূত ছাড়ায়, তোরা তার কাছে যা, সে কী বলে দেখ।

এই পরামর্শ দিয়ে ফকির আর নিধিরাম যে যার বাড়ি চলে গেল।

নগেনের বড়োছেলে তার ছোটোভাইকে বললে, মহেশপুর এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশের ওপর। যেতে-আসতে প্রায় নয়-দশ ক্রোশ। আজকে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়। কাল সকালেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যাব। বিকেলে তাহলে ফিরে আসতে পারব। এইভাবে দু-ভাই যুক্তি করলে।

সেদিন রাত্রেই ঘটনাটা ঘটল নগেনের বাড়িতে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রাত প্রায় তখন দুটো-আড়াইটে হবে। হঠাৎ হাঁস-মুরগির ঘরে ঝটপটানি আর কোঁক কোঁক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল নগেনের বউ-এর।

নগেনের বউ ভাবলে, বোধহয় হাঁস-মুরগির ঘরে শেয়াল ঢুকেছে। এই কথা মনে করে সে একটা হ্যারিকেন আর একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

উঠোনে পা দিতেই সে দেখল, খুব লম্বা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের

মাঝখানে। তার লম্বা লম্বা লিকলিকে হাত দুটোতে দুটো মুরগি, আর সে মুরগি দুটো ছিঁড়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে নগেনের বউ আঁ-আঁ করে চিৎকার করে উঠোনে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেই শব্দ শুনে ছেলেরা বউরা সব ছুটে এল হ্যারিকেন নিয়ে।

উঠোনের মাঝে মাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি জল পাখা নিয়ে এসে সবাই শুশ্রূষা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ সেবা-শুশ্রূষা করার পর জ্ঞান ফিরে এল নগেনের বউ-এর।

ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলে, কী হল মা? তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন? নগেনের বউ তখন হাঁপাতে হাঁপাতে দু-এক কথায় ছেলেদের সব ব্যাপারটা বলে, উঠোনের যেখানে কঙ্কালটা দাঁড়িয়েছিল, সেই জায়গাটা ইশারা করে দেখিয়ে দিল।

সবাই আলো হাতে নিয়ে উঠোনের মাঝখানে গিয়ে দেখল, চারদিকে মুরগির পালক আর রক্ত ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু ধারে কাছে কাউকেই দেখা গেল না।

ছোটোছেলে বললে, হয়তো শেয়াল ঢুকে মুরগি খেয়েছে। রাতের অন্ধকারে শেয়ালের চোখ দুটো তো দপদপ করে জ্বলে, মা হয়তো তাই দেখেই ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছল।

ছেলেদের কথা শুনে নগেনের বউ বললে, তোরা আমার কথা বিশ্বাস করলি না। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি খুব লম্বা একটা মূর্তি উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারাদেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা। মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে। তার লিকলিকে লম্বা হাত দুটোয় দুটো মুরগি—সে মুরগি দুটো ছিঁড়ে ছুঁড়ে খাচ্ছে।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে। এমন সময় বাড়ির পিছন দিকে শোনা গেল একটা ভয়ংকর হাসির শব্দ। সেই হাসির শব্দ শুনলে বুক কেঁপে ওঠে। সেই শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল। তারা বুঝতে পারল এটা একটা ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

ভয় পেয়ে সবাই ঘরে ঢুকে বসে রইল সকাল হবার অপেক্ষায়।

পরের দিন নগেনের বড়োছেলে সাইকেল নিয়ে চলে গেল সেই প্রায় চার ক্রোশ দূরে মহেশপুরে ওঝার বাড়িতে। কিন্তু মুশকিল হল, ওঝা তখন অসুস্থ। নগেনের ছেলে একে একে সব কথা বললে তাকে।

ওঝা সব কথা মন দিয়ে শুনে বললে, দ্যাখো বাবা, আমার বয়েস হয়েছে। তাছাড়া আজ এক সপ্তাহের ওপর আমি উঠতে হাঁটতে পারছি না। একটু সুস্থ

হলেই আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসব। এখন বলো, তোমাদের ঘরে মোট কতজন লোক?

নগেনের ছেলে বললে, সবসুদ্ধ আটজন।

ওঝা বললে, আমি তোমাকে আটটা মাদুলি দিচ্ছি। কালো সুতোয় বেঁধে হাতে বেঁধে রাখবে। আর ছেলেদের গলায় বেঁধে দেবে। আর এই চারটে পেরেক দিচ্ছি তোমাদের ভিটের চার কোণে পুঁতে দিয়ো। তাহলে সে আর তোমাদের বাড়ির সীমানায় আসতে পারবে না।

এই কথা বলে ওঝা আটটা মাদুলি আর চারটে বড়ো বড়ো পেরেক তার হাতে দিল।

পেরেক আর মাদুলি নিয়ে নগেনের বড়োছেলে বিকালের দিকে ফিরে এল। তারপর ওঝার কথামতো সকলকে মাদুলি পরানো হল, আর পেরেক পুঁতে দেওয়া হল।

সেদিন থেকে নগেন দলুই-এর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব কমে গেছে বটে, কিন্তু গ্রামে উপদ্রব বেড়ে গেল।

গাঁয়ের লোকের ঘর থেকে হাঁস-মুরগি আর ছাগল প্রায়ই চুরি হতে লাগল। অন্ধকারে সেই ছায়ামূর্তিকেও দেখল অনেক লোক। তাছাড়া কারও বাড়িতে গভীর রাতে ইট পড়তে থাকে দুমদাম করে। আবার কারও বাড়িতে গোরুর হাড়, মোষের হাড়, মানুষের হাড় পড়তে থাকে। আবার কারও ঘরের চালে মড়া পোড়া কাঠ, বাঁশ পড়তে থাকে।

সারা গাঁয়ের লোক ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। সন্ধে হতে না হতেই যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে ভয়ে রাত কাটাতে লাগল। সন্ধের পর অতবড়ো গ্রামটা যেন শ্মশানের মতো জনশূন্য মনে হয়। সেদিন রাত্রে অনেক দূর থেকে একদল লোক একটা মড়া নিয়ে শ্মশানে এল পোড়াতে। লোকগুলো চিতা সাজিয়ে, মড়াটাকে তার ওপর তুলে আগুন দিল। তারপর শবযাত্রীরা একটু দূরে বসে আপন মনে তামাক টানতে লাগল।

এদিকে সেই অবসরে পাশের বটগাছ থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে নগেন মড়াটাকে চিতা থেকে তুলে নিয়ে গাছের ওপর বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল।

তামাক খেয়ে লোকগুলো চিতার কাছে এসে দেখেই অবাক হয়ে গেল। শুধু চিতাটাই জ্বলছে মড়ার পাত্তা নেই। লোকগুলো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। নদীতে তখন মালপত্র বোঝাই করা একটা বেশ বড়ো নৌকা বাঁধা ছিল। মাঝি

বসে অপেক্ষা করছিল জোয়ারের আশায়। নৌকার ছাদের ওপর হালের কাছে বসে মাঝি তামাক খাচ্ছিল।

অনেক আগেই সে ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল, কিন্তু শবদাহকারীরা পাছে ভয় পায়, এজন্যে সে চুপচাপ দেখেই যাচ্ছিল। শবযাত্রীরা যখন ভয় পেয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চেঁচাতে লাগল, আর নৌকোর আলো দেখে সেদিকে ছুটে গেল, তখন নৌকার মাঝি চেঁচিয়ে বললে, ভয় পেয়ো না তোমরা। ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি যাচ্ছি।

মাঝির কথা শুনে শবযাত্রীরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

নৌকোর মাঝিটি ছিল একজন বেশ নামকরা ভূতের ওঝা। সে একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে আর এক হাতে হুঁকো নিয়ে নৌকো থেকে নেমে এলো শ্মশানে।

লোকগুলোকে তখন মাঝি তার কাছে বসিয়ে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র বলতে বলতে লোকগুলোর চারপাশে কী যেন সব ছড়িয়ে দিয়ে বসে হুঁকোয় দু-একটা টান দিয়ে বললে, কোনো ভয় নেই তোমাদের। ভূতের বাবারও সাধ্য নেই যে আর তোমাদের কাছে আসে। আমি গণ্ডি দিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ তোমরা এই গণ্ডির মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের ভূতে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারপর সকাল হলে বাড়ি চলে যাবে। দিনের বেলা ভূত লোকের কাছে আসে না।

একজন জিজ্ঞাসা করল, মড়াটা তাহলে গেল কোথায়?

মাঝি বললে, তাকে চিতা থেকে তুলে নিয়েছে।

মাঝির কথা শুনে সবাই ভয় পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। কারও মুখে আর কথা নেই।

মাঝি বললে, হ্যাঁ, তাকে তুলে নিয়েছে।

ওদের মধ্যে একজন যুবক বললে, আগুনের ভেতর থেকে তুলে নিল কী করে?

মাঝি বললে, গাছের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে।

মাঝির কথা শুনে যুবকটি যেন একটু অবজ্ঞার হাসি হাসল।

তাই দেখে মাঝি বললে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? দেখতে চাও?

যুবক বললে, বেশ দেখান, তাহলে বিশ্বাস করব।

-দ্যাখো, আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে না তো?

—এখনও যখন হইনি, তখন আর হব না।

—বেশ তাহলে এসো আমার সঙ্গে। এই কথা বলে মাঝি তাদের সঙ্গে নিয়ে বটগাছের ওপর ইশারা করে দেখিয়ে দিল। —ওই দ্যাখো।

সকলে দেখল, বটগাছের মগডালের ওপর বসে একটা বীভৎস কঙ্কাল তাদের সেই মড়াটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে! কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

ভয় পেয়ে সবাই চোখে হাত চাপা দিয়ে মাঝির কাছে সরে এল।

মাঝি বললে, এবার বিশ্বাস হল তো? যাক তোমাদের কোনও ভয় নেই। ও গাছ থেকে নেমে আসতেও পারবে না। আর কোথাও যেতেও পারবে না। আমি গাছটাকে গণ্ডি দিয়ে দিয়েছি।

এই কথা বলে মাঝি হুঁকোটা সেখানে রেখে, পুঁটলিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমরা এখানে চুপচাপ বসে থাকো।

মাঝিকে চলে যেতে দেখে, লোকগুলো ভয় পেয়ে কাতরভাবে বললে, আপনি আমাদের এভাবে ফেলে রেখে যাবেন না, সকাল হলে তারপর যাবেন। দয়া করে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন।

মাঝি হেসে বললে, ভয় নেই, আপনারা এখানে বসুন। আমি ওর পরিচয় নিয়ে আসছি।

মাঝি চলে গেল বটগাছের দিকে। লোকগুলো ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল। স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল, মাঝি বলছে, তুই কে?

—আমি নগেন দলুই।

—তোর বাড়ি কোথায়?

—বাঁধের ওপারে বাগদিপাড়ায়।

—বাড়িতে তোর কে আছে?

—আমার বউ, দুটো ছেলে, তাদের বউ, নাতি-নাতনি।

—ঠিক আছে, তুই গাছেই বসে থাক। পালাবার চেষ্টা করলেই, জ্বলে-পুড়ে মরবি। আমি তোকে বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি।

মাঝি আবার ফিরে এল, লোকগুলোকে বললে, সকাল হলেই আপনারা গাঁয়ে গিয়ে লোকজনদের ডেকে আনবেন।

দেখতে দেখতে পূর্ব দিক ফর্সা হয়ে এল। গাছে গাছে পাখি ডেকে উঠল। একটু পরে সকাল হল।

দুজন লোক গাঁয়ে গিয়ে এই সংবাদ দিল। গ্রাম থেকে বহুলোক এল দেখতে। নগেন দলুই-এর ছেলেদুটোও এল।

সবাই এল বটগাছের নীচে।

গাছের ওপর তখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা মড়া ঝুলছে দেখা গেল।

মাঝি বললে, মড়াটাকে ফেলে দে নগেন।

সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে মড়াটা মাটিতে পড়ে গেল।

সবাই দেখে তো অবাক। মড়াটার খানিকটা মাংস কে যেন খুবলে খেয়েছে।

মাঝি বললে, নগেনের ভূতই মড়াটাকে চিতা থেকে তুলে গাছে নিয়ে গিয়ে বসে খেয়েছে। দিনের বেলা তো ওদের দেখা যায় না। তা না হলে আমি দেখিয়ে দিতাম।

মাঝি এবার বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র বলে উঠতেই, গাছের ওপর থেকে খনখনে গলায় নগেন বলে উঠল—এবার আমাকে ছেড়ে দে।

মাঝি বললে, তুই একেবারে এদেশ থেকে চলে যাবি।

নাকিসুরে উত্তর এল, না, যাব না। আমি এখানেই থাকব।

—এখানে থাকবি কেন?

—এখানে আমার বউ-ছেলে রয়েছে। তাছাড়া বউটার জন্যই আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছি। ওকেও আমি ঘাড় মটকে শেষ করব।

এই কথা শুনে নগেনের ছেলেরা ভয় পেয়ে মাঝিকে বলল, দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

মাঝি বললে, তোমাদের বাবা ভূত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। শুধু শুধু ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

নগেনের বড়োছেলেকে মাঝি বললে, তুমি গয়ায় গিয়ে ওর নামে পিন্ডি দাও, তাহলেই তোমার বাবা প্রেতযোনি থেকে উদ্ধার পাবে।

তখন গাঁয়ের একজন বয়স্ক লোক বললে, এখন ওরা কী করবে? যদি আজ রাতেই কারও ঘাড় মটকে দেয় বা গ্রামবাসীদের ক্ষতি করে?

মাঝি বললে, তা পারবে না। আমি গাছের চারদিকে গণ্ডি দিয়ে যাচ্ছি। ও গাছ থেকে কোথাও যেতে পারবে না। সাত দিন এই গাছে ও বন্দি হয়ে থাকবে, তার মধ্যে পিন্ডি দেওয়া না হলে, ও আবার গ্রামে গিয়ে উপদ্রব করবে।

নগেনের ছেলে বললে, আমি আজই রওনা হয়ে যাচ্ছি।

মাঝি বললে, তুই উদ্ধার হলে কী চিহ্ন রেখে যাবি?

এবার কিন্তু কোনও উত্তর এল না, গাছের ওপর থেকে খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠল নগেনের ভূতটা, ওরে বাবা রে—গেছি রে—জ্বলে মলুম রে।

মাঝি বললে, বল কী চিহ্ন রেখে যাবি?

নগেনের ভূত বললে, দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি—বলছি।

এই বলে একটু থেমে, তারপর বললে, এই গাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে দিয়ে যাব।

মাঝি তখন লোকগুলোকে বললে, আপনারা মড়াটা নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিন। তারপর গ্রামবাসীদের বললে, আপনারা ফিরে যান, আজ থেকে আর গাঁয়ে কোনও উপদ্রব করবে না নগেন।

এই কথা বলে মাঝি ফিরে গেল নৌকায়।

শবযাত্রীরা আবার নতুন করে চিতা সাজিয়ে আধ খাওয়া মড়াটাকে পুড়িয়ে ফিরে গেল যে যার ঘরে।

নগেনের বড়োছেলে রওনা হয়ে গেল গয়ায়। সে যেদিন নগেনের নামে গয়ায় পিন্ডি দিল, সেইদিন দুপুরেই মড়মড় করে ভয়ংকর শব্দে বটগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। অবাক হয়ে গ্রামবাসীরা দেখল সেই দৃশ্য।

সেদিন থেকে গাঁয়ে আর কোনও ভূতের উপদ্রব রইল না।

স্বপ্ন হলেও সত্য

কেন জানি না আমার হঠাৎই খেয়াল হল লন্ডন শহরে বনেদি এলাকায় গিয়ে থাকবার। অনেক খুঁজেপেতে একটা বনেদি ও সেকেলের পুরানো বাড়ির সন্ধান পেলাম, এই বাড়িটা ছিল নদীর পাশ দিয়ে প্রধান রাস্তার উপর দিয়ে গিয়ে ভিতর দিকে টেম্পলে কিংসফোর্ড ওয়াকের। এই বাড়িটা দেখতেও ছিল অদ্ভুত ধরনের। বাড়িটা দেখেই আমার পছন্দ হয়ে গেল। ভাবলাম, যাক এতদিনে একটা মনের মতো বাড়ি পেলাম। একটু নির্জনে থাকতে পারব। চিন্তা-ভাবনা করবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা পেয়ে খুব খুশিই হলাম।

আমার পাঠকেরা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, যেখানে আমি আছি সেখানে ভূত-প্রেতের গন্ধ থাকবেই। কিন্তু এই বাড়িটার ব্যাপারে আমার মনে কোনো ভূত-প্রেতের সন্দেহও উঁকি মারেনি। তাছাড়া আমি কোনো প্রেত-চর্চাসঙ্ঘের সদস্যও নই। কিন্তু কী করব আমার ভাগ্যটাই এমন। যেখানেই যাই সেখানেই আমার গন্ধে ভূতপ্রেতেরা এসে হাজির হয়। তাই এই বাড়িটাও আমাকে শান্তিতে থাকতে দিল না।

আমার বাড়িওলি বেশ বয়স্ক ধরনের মহিলা। দেখলেই বোঝা যায় পাকা

গিন্নিবান্নি মানুষ, তাছাড়া উনি সৎ, কর্মঠ ও পরিশ্রমী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এই বাড়িতে এসে আমার ব্রেকফাস্ট বন্ধ হল। কোনো দিনই সকালে ব্রেকফাস্ট পেতাম না। তার কারণ আমি রোজ সকালে দশটার পর ঘুম থেকে উঠতাম আর দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তা টেবিল থেকে তুলে নেওয়া হত। এই ছিল বাড়িওলির নিয়ম। নিয়মমতো টেবিলে উপস্থিত না থাকার জন্যে আমার কপালে খাওয়া জুটত না। ঘুম থেকে উঠে খিদেয় ছটফট করতাম। তাই খিদের জ্বালা মেটাতাম হোটেলে গিয়ে।

এইভাবে বেশ চলতে লাগল। মনে মনে খুবই অশান্তিতে ভুগছিলাম। ব্রেকফাস্ট খাই না অথচ তার টাকাগুলো আমাকে দিতে হচ্ছে। একদিন ভাবলাম, না আর অপেক্ষা করা চলে না, বাড়িওলিকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। এইভাবে দিনের পর দিন না খেয়ে বিল মেটানোর কোনো মানে হয় না।

খুব সাহস করেই একদিন মহিলাকে বলে ফেললাম—দেখুন, আমার রাতে ঘুম হয় না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি, তাই আপনি যদি দয়া করে ব্রেকফাস্টটা দশটার সময় না সরিয়ে আরও দশ মিনিট পরে সরান তাহলে আমার খাওয়াটা হয়। এই ব্যাপারে আপনি একটু ভেবে দেখবেন।

আমার কথা শুনে মহিলাটি তো খেপে আগুন। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন—তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমি বলি, তোমার বিবেক বলেও কিছু নেই। তুমি আমার অসুবিধে বোঝো না। তোমার চেয়ে আমার দ্বিগুণ বয়স, দ্যাখো তো আমি কত পরিশ্রম করি। আর তুমি রবিবার গির্জায় যাও, রাতে প্রার্থনা করো, আর সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো। তার পরেও তোমার ন-টার সময় ঘুম ভাঙে না, ব্রেকফাস্ট খেতে পারো না, আমার মনে হয় তুমি একটা দুর্বৃত্ত। তোমাকে আমার বাড়িতে থাকতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে। যুবক বয়সে যে ছেলে এমন অকর্মণ্য হয় তাকে দিয়ে আর কোনো কাজই হয় না।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, ভাবলাম ওনাকে বোঝাতে পারব না। এ আমার সাধ্যের অতীত, কী করে বোঝাব যে, এই ঘরে যে শোবে তার ঘুমের সর্বনাশ হবে। আমি বেশ কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছিলাম এই ঘরে কোনো ভৌতিক ব্যাপার আছে। তা-ই রাতের পর রাত আমাকে জাগিয়ে রেখে ঘুম কেড়ে নিয়েছে, সারারাত জেগে জেগে বই পড়ে ক্লান্ত হয়ে ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়ি, যার জন্যে কিছুতেই সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারি না। এই কথা কাকে বোঝাব, কেউই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

একদিন দুপুরবেলায় খুবই ক্লান্ত ছিলাম, তাই আমার বৈঠকখানার ছোটো শোফাটায় ঘুমিয়ে পড়লাম। এত গভীর ঘুম দিয়েছিলাম যে আমি দুপুর থেকে

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমালাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি আমার হাতে একটা পেনসিল ধরা রয়েছে, আর মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন হয়ে রয়েছে। স্বপ্নের কথাগুলো আমার মনের মধ্যে ছবির মতো ফুটে উঠল কিন্তু পেনসিলটা কোথা থেকে এল তা কিছুতেই মনে পড়ল না। আরও অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম পাশেই কয়েকটা কাগজের টুকরো পড়ে রয়েছে। কাগজের টুকরোগুলো হাতে তুলে আমি চমকে উঠলাম, কারণ যে স্বপ্নটা আমি ঘুমের ঘোরে দেখেছি, আর তারই সব কথা এই কাগজগুলোতে আমি ঘুমের মধ্যে লিখে রেখেছি। ঘুমের মধ্যে আমি কী করে লিখলাম, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তবুও আমি যা স্বপ্নের কথা লিখেছিলাম তাই পাঠকদের জানাচ্ছি—আমি যে ঘরটায় থাকতাম সেটা জেমসের রাজত্বকালে স্টেলা নামে একটি সুন্দরী মেয়ে, আর তরুণ এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গোপনে দেখাশোনার জায়গা ছিল। তরুণটি ছিল প্রোটেস্টান্ট আর স্টেলা ছিল ক্যাথলিক। একদিন ক্যাথলিক রাজার কাছে তাদের গোপন অভিসারের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এই খবর পেয়ে তরুণটি রাগে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে তার উপপত্নীকে খুন করে এই বাড়ির নীচে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এই মারাত্মক স্বপ্নের কথাগুলো পড়ে আমি শোফা ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, তারপর আমি শান্তিতে ঘুমিয়েও পড়লাম।

পরের দিন রাতে আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। এমনকি স্বপ্নে অশরীরীকে অনুসরণ করে আমি তার সঙ্গে অচেনা একটা ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরে আগে আমি কখনও আসিনি, কিন্তু স্বপ্নে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মাটির নীচের ঘরটা, যার মেজেটা মস্তবড়ো একটা চৌকো, পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি, বহুদিনের অব্যবহারের ফলে কালো হয়ে গেছে।

স্বপ্নে আরও অনেক কিছু দেখলাম। আমি এই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো হল, আর যেইমাত্র প্রার্থনাটা শেষ হল অমনি সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল, এমনকি জায়গাটাও আবার ফাঁকা আর পোড়া হয়ে গেল।

পর পর তিন দিন একই স্বপ্ন দেখে আমি ঠিক করলাম এই রহস্যের সমাধান করতে হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে পরের দিন বাড়িওলিকে বললাম—এই বাড়িতে কোনো গোপন ঘর আছে? আমাকে একটু বলুন না সেই ঘরটা কোথায়?

আমার কথা শুনে মহিলাটি রেগেই গেলেন, বললেন, এই ঘরটা ভাড়া দিলেই যত জ্বালাতন বাড়ে! যে-ই এই ঘরে রাত কাটিয়েছে তারাই এই একই প্রশ্ন করেছে আমাকে। কেন যে তারা এই গোপন ঘরের প্রশ্ন করে তা আমি আজও জানতে পারিনি। তারপর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, একটা গোপন ঘর আছে। সেটা রান্নাঘরের নীচে।

আমি ভদ্রমহিলাটির কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম তার সঠিক উত্তর না পেয়ে মনে মনে অখুশি হলাম। তারপর ভাবলাম, ওঁনাকে প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই। উনি ঠিক বলতে পারবেন না। তাই ঠিক করলাম, বাড়িওলি বাড়ি থেকে বের হলেই আমি একলাই অনুসন্ধান চালাব। একটু পরেই বাড়িওলি বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি উঠে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলাম। এই রান্নাঘরটা রাস্তার সমতলের ঠিক নীচে। বেশ খানিক খোঁজাখুজি করে পুরানো ওক কাঠের একটা দরজা খুঁজে পেলাম। তারপর সেই দরজার ভিতর দিয়ে গোপন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার স্বপ্নে দেখা এই সেই ঘরটা। স্বপ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এমনকি মেজেটাও গাঢ় কালো রঙের পাথর দিয়ে বাঁধানো। আর আমি বেশিক্ষণ এই ঘরটায় থাকলাম না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। এটা কী ধরনের রহস্য বুঝতে পারলাম না। মন থেকে ব্যাপারটা মুছে ফেলবার জন্যে ড্রেস করে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। যাতে এই বাজে চিন্তার থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি।

সারা সন্ধ্যাটা আমি বাইরেই কাটালাম, থিয়েটার দেখলাম, তারপর অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এলাম। খুবই পরিশ্রান্ত ছিলাম। বিছানায় শুয়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার সেই একই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। কিন্তু আজকের স্বপ্নটা ছিল অন্যদিনের চেয়ে একটু আলাদা। স্টেলা নামে সুন্দরী মেয়েটি আমাকে পথ দেখিয়ে সেই মাটির নীচের ঘরে নিয়ে গেল, তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, আজ রাত বারোটার সময় এই ঘরে মৃতের জন্যে প্রার্থনার আয়োজন করো। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপ্ন দেখা শেষ হতেই আমি চমকে উঠে পড়লাম। স্বপ্নের কথাগুলো কানের মধ্যে বাজতে লাগল। এমনকি মেয়েটার শীতল নিশ্বাসের স্পর্শ পর্যন্ত আমি অনুভব করতে পারছিলাম; সবকিছু মিথ্যে ভাববার জন্যে আমি ভালো করে চোখ রগড়াতে লাগলাম। তারপর দেওয়ালের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলাম। চোখের সামনে, স্বপ্নে, কানে শোনা কথাগুলো দেওয়ালে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। ঠিক সেই কথা—'মাঝরাতে এই ঘরের মৃতের জন্যে প্রার্থনা করো'। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করে এই দেওয়ালে লেখা হল। তাহলে কি আমিই ঘুমের ঘোরে উঠে টেবিল থেকে পেনসিল নিয়ে দেওয়ালে লিখেছি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল না, না এটা অসম্ভব।

আমি এসব কথা কাউকে কিছু না বলে পোশাক পরে পথে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম যেমন করেই হোক আজ রাতে প্রার্থনার ব্যবস্থা করব। পথে বেরিয়ে মনটা ভোরের ঠান্ডা মিষ্টি হাওয়ায় ভরে উঠল। মনে হল দিনের সঙ্গে রাতের কত পার্থক্য। এই কথা ভাবতেই মনে পড়ে গেল রাতের স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলো,

যে কথাগুলো আমার কানের মধ্যে হাতুড়ি মারতে লাগল, মনে মনে ভাবলাম স্বপ্নের কথামতো সবই পালন করব, সকলকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করব। আমি নিজে ক্যাথলিক নই। আমি কখনও কোনো গোঁড়া মতের সমর্থক নই, কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে প্রায়ই ক্যাথালিক চার্চে যেতাম। যার ফলে চার্চের কয়েকজন যাজকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আমি ভাবলাম এখান থেকে আমি সাহায্য পেতে পারি। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে চার্চে গেলাম এবং যাজকের সঙ্গে দেখা হল। আমি জানতাম উনি খুব সহানুভূতিশীল ও খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু আমার সব কথা শুনেও উনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন—এসব বাজে কথা, মিথ্যে কথা! তাছাড়া তিনি আমাকে আরও বললেন—আপনার এই বাজে চেষ্টা ছেড়ে দিন। কেউই ওই ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করবে না। আমি বলছি এই লন্ডন শহরে আপনি এমন একজনও পাদরি খুঁজে পাবেন না যিনি আপনার ইচ্ছা পূরণ করবেন।

আমি অনেকগুলো চার্চ পেরিয়ে এলাম। আর একটায়ও ঢুকলাম না। অশান্ত মনে গ্রিন পার্কে ঢুকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারপর একটা বেঞ্চে বসে ভাবতে লাগলাম কী করা যেতে পারে। হঠাৎ দেখলাম একজন তরুণ পাদরি আপনমনে একটা প্রার্থনার বই পড়তে পড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে সুপ্রভাত জানিয়ে হাতের বইটা বন্ধ করলেন এবং আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। কথা বলে এই তরুণ পাদরিটিকে আমার বেশ ভালো লাগল। ভাবলাম তাহলে ওঁনাকে আমার স্বপ্নের কথাটা বলা যেতে পারে, হয়তো উনি বিশ্বাসও করতে পারেন। তাই সাহস করে আমার স্বপ্নের কথা বললাম।

আমার কথা শুনে মনে হল, উনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন। উনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন—আমি আপনাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করব। আপনি আর কোনো কিছু ভাববেন না। আপনার যা যা দরকার সবই আমি করে দেব। কথা দিলাম আজ রাতে আমি আপনার বাড়িতে যাব। এই তরুণ পাদরিটি কাছ থেকে কথা পেয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত হলাম। মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে এলাম।

রাত্রিবেলায় কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের আমি এই ব্যাপারে সব কথা বললাম। বন্ধুরা সব কথা শুনে খুবই উৎসাহী হয়ে অনুরোধ করল—আমরাও এই রাতে এই ঘরে থাকতে চাই। দয়া করে তুমি পাদরিকে জিজ্ঞাসা করো প্রার্থনার সময় আমরা উপস্থিত থাকতে পারব কি না। আমারও মনে মনে ইচ্ছা এই ঘটনায় বন্ধুরা উপস্থিত থাকুক।

সবাই মিলে গল্প করতে লাগলাম। সময় হু হু করে কেটে যেতে লাগল। বারোটা বাজতে যখন পনেরো মিনিট বাকি—ঠিক সেই সময় দরজার কাছে

পাদরির পায়ের শব্দ পেলাম। ওঁনাকে আমি বন্ধুদের মনোবাসনা জানালাম। উনি বললেন—আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনার বন্ধুরা সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন।

পাদরির মত পেয়ে আমরা সবাই খুশি হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সবাই মিলে ধীরে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো রহস্যজনক কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু ঘরটায় ঢুকে মনে হল মৃত্যুর পরিবেশেই আমরা রয়েছি। কী নিস্তব্ধ, নিথর চারিদিক। মোমবাতির ম্লান আলোয় পাদরির মুখটা আমার কাছে খুবই রহস্যময় বলে মনে হল। কী নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করছেন। আমি শুধু সেদিকেই চেয়ে দেখতে লাগলাম। প্রার্থনা শেষ হলে সবাই আমরা নীচে নেমে এলাম। তারপর তরুণ পাদরিটি আমাদের সকলকে বিদায় জানিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আমি মনে মনে খুবই নিশ্চিন্ত হলাম। স্বপ্ন দেখার আর কোনো উৎপাত রইল না। প্রার্থনার দিন থেকেই আমি শান্তিতে ঘুমুতে পাচ্ছিলাম। কোনো রকম গোলমাল হয়নি। বেশ সুখেই বাড়িটায় ছিলাম।

হঠাৎ একদিন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় দেখলাম একদল রাজমিস্ত্রি আর জলের কলের মিস্ত্রি ঘরের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ করাবার জন্যে দরকারি কী সব কাজকর্ম করছিল। ওদের ঘরের মেঝের পাথর তোলবার দরকার ছিল তাই তারা পাথর উঠিয়ে মাটির তলায় একটা কুয়ো আবিষ্কার করল। সেদিন সবাই খুব অবাক হয়ে দেখেছিল কুয়োটা। আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হয়নি। কারণ আমি এই মাটির তলার ঘর ও বাড়ির নীচে কুয়োর কথা সবই স্বপ্নে দেখেছিলাম।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে একটি পত্রিকায় খবরটি প্রকাশ পায়। ঘটনাটির বিবরণ ছিল এমনি: আরম্ভের প্রথমেই ছিল—মাটির নীচে মনুষ্যদেহাবশেষ। চমকপ্রদ আবিষ্কার। কিংস বেঞ্চওয়াদের একটা বাড়ি মেরামত করবার সময় মিস্ত্রিরা একতলা ঘরের নীচে একটা কুয়ো আবিষ্কার করেছে এবং কুয়োর তলায় পাওয়া গেছে একটা তরুণীর কঙ্কাল ও একটা তরবারি। তরবারিটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতে দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বকালের তারিখ দেওয়া আছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে, নিশ্চয় কোনো রোমান্সজনিত ঘটনা রয়েছে। তাছাড়া রহস্যপূর্ণ নারীর মৃত্যু—এইসব মিলিয়ে এই বাড়িটায় একটা গোপন রহস্য এতদিন ধরে ছিল।

সত্যি কথা বলতে কী—এই ঘটনার পর আমার জীবন অনেকখানি পার হয়ে গেছে—তবুও যখন নির্জনে ভাবতে বসি, তখন কিছুতেই এই ঘটনার রহস্যটা খুঁজে পাই না। ভাবি, এটা কি নিছক স্বপ্ন না অন্য কিছু। আজও উত্তর পাইনি।

শয়তান

॥ ১ ॥

পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে অনেক, কিন্তু সে-সব ঘটনায় বিশ্বাস করে এমন লোক অনেক পাওয়া যায় না।

আমার জীবনেও একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল, তা শুধু আশ্চর্য নয় অত্যাশ্চর্যও বটে। তোমাদের কাছে সেই কথাই আজ বলব, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বাস করো! বিশ্বাস না করলেও দুঃখিত হব না।

সরকারি কাজে আমি তখন হাজারিবাগ অঞ্চলের এক জায়গায় থাকি। একটা মানুষখেকো বাঘের অত্যাচারে সেখানকার লোকেরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছিল। বারে বারে দেশি-বিলাতি বহু শিকারির গুলি হজম করে সে বেঁচে আছে। লোকে বলে, সে বাঘটা নাকি সাধারণ বাঘ নয়—বাঘের আকারে হিংস্র অপদেবতা! কেউ কেউ নাকি চোখের সামনে তাকে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে দেখেছে! তাকে মানুষের ভাষায় কথা কইতে শুনেছে, এমন লোকেরও অভাব নেই! বনের ভিতরে বসে সে নাকি মেয়েমানুষের মতন আর্তনাদ করত। তার সেই কান্নাকে মানুষের কান্না ভেবে যে বনের ভিতর ঢুকত, সে আর ফিরে আসত না! লোকে তাই তাকে 'শয়তান' বলে ডাকত! 'শয়তান'কে দেখলেই চেনা যেত, কারণ তার ল্যাজ ছিল না! হয়তো বনের ভিতরে অন্য কোনো জন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েই ল্যাজের গৌরব থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু লোকের বিশ্বাস, 'শয়তানে'র এই লাঙ্গুলহীনতাই তার অলৌকিকতার মস্ত প্রমাণ। বাঘের ল্যাজ নেই, তাও কখনো সম্ভব?

এ-সব গল্প যে মিথ্যে তাতে আর ভুল নেই। মানুষখেকো বাঘেরা প্রায়ই ভারী চালাক হয়। বড়ো বড়ো শিকারিও তাদের বধ করতে পারে না। তাই তাদের নামে এমনই সব গল্প শোনা যায়। বৃক্ষ-বিশেষের আশ্চর্য শিকড়ের গুণে মানুষ বাঘের রূপ ধরতে পারে, এমন গল্পও শুনেছি। কিন্তু আধুনিক যুগে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন আর কেউ এ-সব গল্প বিশ্বাস করবে না।

'শয়তান' যে সাধারণ বাঘ একদিন তার প্রমাণ পেলুম।

বন্ধু হরিশের সঙ্গে একদিন সন্ধ্যার আগে হরিণ মেরে ফিরে আসছি। আমাদের পিছনে পিছনে আসছিল মরা হরিণটাকে কাঁধে করে দুজন কুলি, আর বাঘের মতোই বড়ো আমার শখের কুকুর 'টাইগার'। বনের একটা মোড় ফিরতেই সামনে দেখি, পথের উপরে বিড়ালের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে, মস্ত বড়ো একটা বাঘ! তার ল্যাজ নেই!

পিছনের কুলিরা রুদ্ধশ্বাসে, অস্ফুট স্বরে এক সঙ্গে বলে উঠল—'শয়তান!'

পরমুহূর্তেই আমরা দুজনেই এক সঙ্গে বন্দুক ছুড়লুম।

'শয়তান' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই আবার পড়ে গেল,—আর নড়ল না!

এত সহজে 'শয়তান'কে ঘায়েল করে আমাদের আনন্দের আর সীমা রইল না—কুলি দুজনও মনের খুশিতে ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিলে! আশপাশের গাঁয়ে সে খবর তখনই ছড়িয়ে পড়ল—দলে দলে লোক 'শয়তান'কে দেখতে এল। অনেকে তার মৃতদেহের উপরে কিল-চড় লাথি বৃষ্টি করে মনের ঝাল ঝেড়ে নিলে। অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে জনকয়েক কুলির সাহায্যে 'শয়তানে'র দেহ তুলে আবার নিজেদের বাসার দিকে রওনা হলুম।

॥ ২ ॥

খানিক দূর যেতেই, বিরাট এক ক্রুদ্ধ দৈত্যের মতো সারা আকাশ জুড়ে একখানা মিশেমিশে কালো মেঘ ছুটে এল—ভীষণ ঝোড়ো নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে! শহরে বসে তোমরা এই মেঠো বুনো ঝড়ের কল্পনাও করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে পরেশনাথ পর্বতের আকাশভেদী চূড়া ধুলো-মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, বনের গাছগুলো পাগলের মতো মাটির উপরে বারবার মাথা কোটবার চেষ্টা করতে লাগল, আর যেন কার বিপুল ফুৎকারে সারা-পৃথিবীর আলো কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল! খানিক তফাতেই একখানা পুরানো বাংলো ছিল, আমরা তাড়াতাড়ি তার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। ঝড়ের পর এল বৃষ্টি সন্ধ্যার অন্ধকারকে সঙ্গে করে।

বুঝলুম, আজ আর বাসায় ফেরা হবে না। কারণ এখান থেকে আমার বাসা অন্তত পাঁচ মাইল তফাতে। মাঝে আবার নদী আছে। সেই পাহাড়ে-নদী বৃষ্টিধারায় পুষ্ট হয়ে এতক্ষণে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে নিশ্চয়!

কুলিরাও চলে যেতে চাইলে—বকশিশের লোভও গ্রাহ্য করলে না।

তারা দুটো কারণ দেখালে। প্রথমত, 'শয়তানে'র মৃতদেহের সঙ্গে তারা রাত্রিবাস করতে নারাজ। দ্বিতীয়ত, এই বাংলোয় আগে এক সাহেব থাকত। কারা নাকি তাকে খুন করেছিল। সেই থেকেই এই বাংলোয় কোনো মানুষ বাস করতে পারে না। সেই বৃষ্টিতেই কুলিরা বাংলো ছেড়ে পালাল।

শিকারি মানুষ, সব রকম বিপদের জন্যেই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়—সঙ্গে লণ্ঠন এনেছিলুম, তাই জ্বালালুম। ব্যাগের ভিতরে তখনও কয়েক টুকরো পাউরুটি আর খানিকটা 'গোয়াভা জেলি' ছিল, তার দ্বারাই আমার, হরিশের আর 'টাইগারে'র

নৈশ-আহার শেষ করতে হবে। উপায় কী? আমরা যে খোলা মাঠে নেই, এখন এইটুকুই পরম সান্ত্বনার কথা।

মাঝের হলঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। ঘরখানা প্রকাণ্ড—দেয়ালে দেয়ালে উইদের রাজত্ব, সমস্ত দরজা-জানলাই ভাঙা, মেঝেতে পুরু ধুলোর প্রলেপ—তার উপরে নানা জীবজন্তুর পায়ের দাগ—বাঘের, ভাল্লুকের, শেয়াল-কুকুরের! এখানে-ওখানে হাড় পড়ে আছে—কোনো কোনো হাড় মানুষের বলেও সন্দেহ হল। বুঝলুম, মানুষের বাড়ি আজ বাঘ-ভাল্লুকের আস্তানায় পরিণত হয়েছে! বললুম, 'হরিশ, এখানে আমরা নিরাপদ নই! বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে, বন্দুকে টোটা ভরে তৈরি হয়ে থাকো।'

হরিশ আমার কথামতো কাজ করতে করতে বললে, 'আজ রাত্রে দেখছি ঘুমের দফা রফা!'

'শয়তান' আর হরিণের দেহ দুটো ঘরের কোণে টেনে এনে রাখলুম।

॥ ৩ ॥

আকাশের অন্ধকারকে ছ্যাঁদা করে জলধারা অশ্রান্তভাবে গড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকের উপর। বিদ্যুৎ-সাপগুলো কিলবিল করে ক্রমাগত চলে যাচ্ছে শূন্যতার এধার থেকে ওধারে। বৃষ্টি-বাণে আহত অরণ্যের কান্নায় চারিদিক পরিপূর্ণ।

'টাইগার' এই পোড়োবাড়ির ভাঙা ঘর মোটেই পছন্দ করলে না। ঘরময় ছড়ানো হাড়গুলো সে আগে শুঁকে শুঁকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে। তারপর উপরদিকে মুখ তুলে কীসের ঘ্রাণ নিতে লাগল—যেন সে কোনো অদৃশ্য বিভীষিকার সন্ধান পেয়েছে! 'টাইগার' সাহসী কুকুর, বাঘ দেখলেও ডরায় না। কিন্তু সে আজ অত্যন্ত ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল,—পেটের তলায় ল্যাজ ঢুকিয়ে একবার এখানে, একবার ওখানে গিয়ে বসে পড়ে, আবার উঠে কান খাড়া করে যেন কার পদশব্দ শোনে! আমি তাকে ডাকলুম, সে কিছুতেই কাছে এল না। থেকে থেকে চমকে ওঠে আর হা হা করে হাঁপায়। হরিশ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'টাইগার এমন করছে কেন? সে কী দেখেছে?'

আমারও মনে ওই একই প্রশ্ন! ...চারিদিকে তাকিয়েও সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেলুম না। বলেছি—মস্ত ঘর। আমার এই ছোটো লণ্ঠনের আলোতে সে ঘরের অন্ধকার দূর হয়নি। হঠাৎ মনে হল, দেয়ালের উপর দিয়ে যেন একটা

লম্বা ছায়া দুলতে দুলতে সরে যাচ্ছে...হরিশের একখানা হাত চেপে ধরে বললুম, 'দ্যাখো, দ্যাখো!'

টাইগার ঊর্ধ্বমুখে অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ, শিয়ালের মতো স্বরে কাঁদতে লাগল।

হরিশ বললে, 'কী? কী দেখব?'

—'ওই ছায়াটা?'

—'কোথায়?'

—'ওই যে! দেয়ালের উপর দুলছে!'

—'তুমিও পাগল হলে নাকি? ওখানে তো কিছুই নেই!'

চোখ রগড়ে চেয়ে আমিও আর কিছু দেখতে পেলুম না। নিজের ভ্রম বুঝে লজ্জায় চুপ করে রইলুম।

বাইরের বনের ভিতর থেকে একটা বাঘ ক্রমাগত গর্জন করতে লাগল। হয়তো 'শয়তানে'র বউ! বনে বনে স্বামীকে খুঁজে খুঁজে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে!...গর্জনটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল! হঠাৎ মনে হল আমার কানে কানে কে যেন কথা কইলে! রোমাঞ্চিত দেহে আমি হরিশের কাছ ঘেঁষে সরে বসলুম! আমার মুখের ভাব দেখে হরিশ বললে, 'আবার কী হল?'

—'কে আমার কানে কানে কথা কইলে!'

—'সুরেন, তোমার মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে! তুমি যে এমন ভিতু তা জানতুম না!'

তার ধিক্কার শুনে মনটাকে আবার শক্ত আর চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কেন জানি না, বুকের ছমছমানি কিছুতেই আজ থামতে চাইলে না। খালি মনে হয়, আমার চারিপাশ দিয়ে আজ সেই সব পা চলে বেড়াচ্ছে, যে সব পা চললে কোনো শব্দ হয় না! আমার চারিপাশে সব অদৃশ্য চোখ! আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছে! কী অসোয়াস্তি! ওদের চোখ এড়াই কেমন করে? বললুম, 'হরিশ, এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি চলো! এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলেই আমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাব!'

হরিশ বললে, 'কুলিদের বাজে কথা তোমার মনের উপরে কাজ করছে! তুমি শান্ত হও। এ রকম পোড়োবাড়িতে এলে অকারণেই গা একটু ছমছম করে বটে, কিন্তু ও কিছু নয়।'

—'কিন্তু টাইগারও অমন কাতরাচ্ছে কেন? সে তো কুলিদের কথা বোঝেনি!'

—'টাইগার হচ্ছে অবোধ জন্তু, মিছামিছি ভয় পেয়েছে। সে ভয় পেয়েছে বলে তুমিও ভয় পাবে? তুমি যে মানুষ!'

॥ ৪ ॥

এবারে সত্যি সত্যিই ঘরের বাইরেকার দালানে দ্রুত পদশব্দ হল! শব্দটা একটা দরজার কাছে এসে, আবার দূরে চলে গেল। হরিশ বললে, কোনো জন্তুর পায়ের শব্দ। আমার মনে হল, কোনো জন্তুর পায়ের শব্দ নয়! জীবনে আমার মনের ভিতরে এমন অলৌকিক ভাবের উদয় হয়নি। ভাগ্যে সঙ্গে হরিশ আছে, নইলে আমার অবস্থা কী হত কে তা বলতে পারে? হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত বারোটা। হরিশ খাবারের 'বাস্কেট' বার করে বললে, 'অনেক রাত হয়েছে। এসো, এইবারে আমরা খেয়ে নি।'

আমি বললুম, 'তুমি একলা খাও। আজ আমার খিদে নেই।'

ঠিক সেই সময়ে, খুব কাছেই আবার বাঘের ঘন ঘন চিৎকার শুরু হল। 'শয়তানে'র সঙ্গিনী কি খোঁজ পেয়েই এখানে এসে হাজির হয়েছে?

হরিশ বললে, 'বন্দুক নাও! বাঘটা ভেতরে আসতে পারে!'

খুব দীর্ঘ, করুণ ও অস্বাভাবিক এক চিৎকার করে বাঘের ডাক থামল—সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা জানলা দিয়ে ঝটপট করে ঘরের ভিতরে কালো কুচকুচে কী একটা ঢুকে পড়ল! হরিশ বললে, 'বাদুড়!'

তারপরেই দরজার চৌকাঠের উপরে এসে দাঁড়াল, মস্ত বড়ো একটা কালো কুৎসিত বিড়াল! বাদুড়টা ঘরের চারিদিকে চক্রাকারে উড়তে লাগল আর কালো বিড়ালটা ল্যাজ তুলে ডাকতে লাগল, ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও!

বাদুড়টা হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে 'শয়তানে'র মৃতদেহের উপরে গিয়ে পড়ল, তারপর দুই ডানা বিস্তার করে সেইখানেই স্থির হয়ে রইল—একটা মূর্তিমান অভিশাপের মতো!

টাইগার আবার দাঁড়িয়ে উঠল এবং ভয়ানক এক আর্তনাদ করে আমার পায়ের কাছে ছুটে এসে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, সে মরে গেছে!

হরিশ সবিস্ময়ে বললে, 'সুরেন! দ্যাখো, দ্যাখো!'

ওঃ! কী সে দৃশ্য! যাকে আমরা স্বহস্তে গুলি করে মেরেছি,—যার মৃতদেহ এতগুলো কুলি কাঁধে করে এনেছে,—যে মরে এতক্ষণে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, সেই 'শয়তান' এখন আমাদের চোখের সামনেই চার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আর, তার দুটো চক্ষু আগুনের দুটো গোলার মতন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর জ্বলছে! সে চোখটা যেন আমাদের ভস্মসাৎ করে দিতে চায়! বাইরে আবার বাঘ ডাকতে লাগল। 'শয়তান' ধীরে ধীরে ঘরের

ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই বাদুড় আর কালো বিড়ালকেও আর দেখতে পেলুম না!

চিৎকার করে আমি মাটির উপরে পড়ে গেলুম।

॥ ৫ ॥

সেই সপ্তাহেই দরখাস্ত করে অন্য দেশে বদলি হয়েছি—পাছে 'শয়তানে'র সঙ্গে আবার দেখা হয়!

হরিশের মতে, আমাদের বন্দুকের গুলিতে 'শয়তান' মরেনি, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল মাত্র। হতেও পারে। না হতেও পারে!

গঙ্গার বিভীষিকা

॥ ১ ॥

গঙ্গা! এ নামে ভারতের কোটি কোটি হিন্দুর মনে যে-ভাবের উদয় হয়, পৃথিবীর আর কোনো দেশের আর কোনো নদীর নাম শুনে আর কোনো জাতির মনে সে-ভাব জাগে না। ক্রিশ্চানদের জর্ডন নদীর মহিমাও গঙ্গা-মাহাত্ম্যের কাছে ম্লান হয়ে যায়।

মিসিসিপি, অ্যামাজন, সেন্ট-লরেন্স, ম্যাকেঞ্জি, লা প্লাটা, নাইল, কঙ্গো, অ্যামুর, ভোলগা প্রভৃতি পৃথিবীর আরও অনেক নদ-নদী গঙ্গার চেয়ে আকারে বড়ো হলেও সম্মানে বড়ো নয়। আদি-গঙ্গা তো সামান্য একটুখানি গঙ্গার খাল, কিন্তু নামের গুণে তারও আদর কত! অথচ আসলে গঙ্গা হয়েও বিভিন্ন নামে ডাকা হয় বলে অত বড়ো পদ্মানদীও এত বেশি পূজার ফুল আর ফলমূলের নৈবেদ্য পায় না। সত্যি, নামের গুণে অধমও তরে যায়!

গঙ্গাতীরে যারা বাস করবার সৌভাগ্য পায়, ভারতে অ-গঙ্গা দেশের লোকেরা তাদের ভাগ্যবান বলে মনে করে। গঙ্গাকে দেখলেই হিন্দুর প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই গঙ্গার ধারে গেলেও মনে যে আনন্দের ভাব জাগে না, আপনারা কি তা বিশ্বাস করতে পারবেন?

আমি প্রায়ই ডায়মন্ড হারবারে যাই—গঙ্গার বিশাল রূপ দেখতে। হরিদ্বার, এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল, বেনারস, চন্দননগর ও কলিকাতা প্রভৃতি আরও অনেক

জায়গা থেকে আমি গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখেছি, কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গার ভিতরে অন্য সব রূপ তলিয়ে যায়।

অপূর্ব তার বিশালতা—ভীষণ বললেও চলে! এ গঙ্গার তুলনা খুঁজলে সমুদ্রের কথাই মনে পড়ে! ডায়মন্ড হারবারকে পিছনে রেখে তীরে গিয়ে বসলে চোখে পড়ে কেবল আকাশের অ-সীমার তলায় ওপারের লুপ্তপ্রায় সামান্য তটরেখা এবং বিরাট এক উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গিত জলের জগৎ,—আর-একদিকে মুখ ফেরালে অনন্ত জলরাশির ভিতরে এতটুকু তটরেখাও আর দেখা যায় না।

অতুল, অপূর্ব, আশ্চর্য! কে বলবে এই গঙ্গাই হিমালয়ে হয়ে যায় এতটুকু নালার মতো!

এইখানে একদিন শেষ-রাতে আমি গঙ্গাকে দেখতে গিয়েছিলুম। ঠিক দেখতে গিয়েছিলুম বললেও ভুল বলা হয়, কারণ সে রাতে কালো আকাশে চাঁদের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। থমথম করছে নিশুত কালো রাত, তার অন্ধকার গর্ভে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য যেন ফতুর হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। দেখব আর কী,—কিছুই দেখা যায় না! পিছন ফিরলে শুধু নজরে আসে দূরে ডাকবাংলোর দ্বিতল থেকে ম্লান আলোকের একটুখানি শিখা মাত্র। এবং কানে আসে অনেক কিছুই। একটানা ঝিঁঝির কান্না, বাদুড়ের ডানার ঝটপট, প্যাঁচার কর্কশ ধমক, অন্ধকারে নিষ্পেষিত বনস্পতির দীর্ঘশ্বাস, শৃগালের দ্রুত পদধ্বনি, সুদূর থেকে কুকুরদের ভীত চিৎকার—এবং আরও অনেক স্পষ্ট-অস্পষ্ট অজানা শব্দের সঙ্গে বিশাল গঙ্গার বিরাট কোলাহল! মহাসাগরের কাছ থেকে গঙ্গা যেন তার বুকচাপা গর্ভযন্ত্রণার দিগ্বিদিকব্যাপী গম্ভীর চিৎকারকে এখানে চুরি করে এনেছে!

সে কোলাহল নিবিড় অন্ধতার ভিতর দিয়ে আমার প্রাণে অজ্ঞাত এক আতঙ্কের বার্তা বহন করে আনলে! আমার মনে হল পৃথিবী যেন আসন্ন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ক্রন্দন করছে! প্রলয়ের পূর্বমূহূর্তে নিখিল জীবের সৃষ্টিব্যাপী যে হাহাকার জেগে উঠবে, এ যেন তারই ধ্বনিময় ইঙ্গিত! বিশ্বের যত অবিচার, ব্যভিচার, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, রোগ, শোক আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা যেন এখানে আর্তধ্বনির তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বয়ে যাচ্ছে আর বয়ে যাচ্ছে!

চর্মচক্ষে শব্দের রূপ দেখা যায় না, কিন্তু মন দিয়ে তার প্রত্যেকটি রেখা অনুভব করা যায়। অদৃশ্য আকাশের আঁধারপটে অন্ধ শব্দের তিমির-তুলি কালোর উপরে কালো ছবি এঁকে চলেছে—বীভৎস সব শব্দময় দানব-মূর্তি ফুটে উঠছে! প্রত্যেক মূর্তিই কালবৈশাখীর আঁধির মতো, নিষ্ঠুর নিয়তির দুঃস্বপনের মতো পাকসাট খেয়ে হু-হু-হু-হু হাওয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ইহলোক থেকে পরলোকে, পরলোক থেকে ইহলোকে আনাগোনা করছে,—প্রত্যেকেরই চক্ষে হিংসার হত্যা-

উল্লাস, প্রত্যেকেরই মুখে ক্ষুধিত বিকৃত ভঙ্গি, প্রত্যেকেরই হাবেভাবে জীবন্ত ধরণীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ!

বেশিক্ষণ সেদিন গঙ্গার কাছে বসে থাকতে পারিনি।

॥ ২ ॥

কলকাতায় রোজ সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার জলস্রোতের পাশে জনস্রোত বইতে থাকে।

পথে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখানে-ওখানে দলে দলে লোক জটলা ও হল্লা করছে, দলে দলে চানাচুরওলা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কান কালা করে দিয়ে যাচ্ছে এবং ঘাটে ঘাটে 'কণ্ঠ'হীন নরগর্দভরা প্রাণপণে গান গাইবার মিথ্যে চেষ্টা করছে! এই শেষোক্ত শ্রেণির জীবরা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর। বাগবাজার থেকে হাওড়ার পোল পর্যন্ত—কলকাতার গঙ্গাতীরের সর্বত্রই এদের ভয়াবহ অস্তিত্বের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। সারা শহরে গান গাইতে জানে না এমন যত বেসুরো বেতাল লোক আছে এবং বাড়িতে বসে গান গাইবার উপক্রম করলেই পাড়ার লোকেরা লাঠি নিয়ে যাদের কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা করে, তারা প্রত্যেকেই গঙ্গার ধারে পালিয়ে এসে তান ধরে লোকের সান্ধ্য-ভ্রমণকে বিষাক্ত করে তোলে। এদের জন্যে আলাদা আইন হওয়া উচিত।

এমনি সব নানান উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে, আমি গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই রাত বারোটার পর। তখন গঙ্গাতীরের গাইয়েরা পর্যন্ত ঘুমোতে যায়—যদিও মাঝে মাঝে এক-একজন নাছোড়বান্দা গাইয়েকে আমি রাত বারোটার পরেও গঙ্গার ঘাটে আবিষ্কার করেছি!

চারিদিকে তখন জনতার সাড়া থাকে না। ওপারে দেখা যায় সার-বাঁধা, রাত-জাগা কল-কারখানার সুদীর্ঘ বৈদ্যুতিক আলোর মালা। মাঝে মাঝে যেখানে সে-মালা ছিঁড়ে গেছে সেখানে জেগে রয়েছে খানিকটা করে অন্ধকার। পূর্ণিমার চাঁদও সে-অন্ধকারকে মুছে দিতে পারে না। দিনের আলো ফুটলে বোঝা যায়, সে খণ্ড খণ্ড অন্ধকারগুলো নীল বন ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানেও গভীর নিশীথে বসে বসে শুনি, গঙ্গা যা বলতে চায় তা আনন্দের রূপকথাও নয়, শান্তির বাণীও নয়। ও কলবেদনার গানে ছন্দে ছন্দে জাগে যেন সংখ্যাহীন অশান্ত আত্মার আর্ত কলরব! আমি ভূতের ভয় করি না, ভূতও মানি না, তবু আমার মনে হয়,—রাত্রে গঙ্গার অশ্রান্ত তরঙ্গ-দোলায় দুলে দুলে অশরীরীরা যেন শরীরী মানুষের সঙ্গে কানাকানি করতে চায়! আজ পর্যন্ত হাজার

হাজার যত অভাগা ভ্রান্ত ব্যর্থ শান্তির খোঁজে ওই ঠান্ডা জলের স্রোতে শেষ-ডুব দিয়েছে, তারা যেন আবার নতুন করে পৃথিবীর বাসিন্দার কাছে অভিশপ্ত আত্মার চিরন্তন অশ্রুজলের কাহিনি বলতে চায়!

আকাশে সেদিন একটুখানি চাঁদের ফালি জ্বালা ছিল। গঙ্গাজলে তারই সামান্য ছায়া চিকচিক করছে। কুৎসিত নারীর অলঙ্কারের মতন এটুকু চন্দ্রলেখা সমান ব্যর্থ,—কারণ কালো রাতের ঘোমটাকে তা স্বচ্ছ করে না।

যে-জায়গায় বসে আছি তার নাম বিচালিঘাট। একতলা কি তার চেয়েও উঁচু বড়ো বড়ো খড়বোঝাই নৌকোগুলো গায়ে-গা-দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আশেপাশে আবছায়ার সৃষ্টি করে। সামান্য আলোর আভায় তাদের নৌকো বলে চেনাই যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে গঙ্গাতীরে যেন অগুনতি কুঁড়েঘর নিয়ে একখানা ঘুমন্ত গ্রাম রাত-আঁধারে আড়ষ্ট হয়ে আছে!

ওই ভাসমান গ্রামের তলায় অলিগলির ভিতরে গঙ্গাজল ঢুকে কত রকম রহস্যময়, ভীতিকর শব্দ তুলছে! দিনের বেলায় তো ওখানে ও-রকম শব্দ শোনা যায় না! রাত্রে যারা ঘুমোয় না, অন্ধকারে যাদের অদৃশ্য চোখে দৃষ্টি জাগে, তারাই কি এখন ওখানে সাঁতার-খেলা খেলতে এসেছে? এক-একটা অলিগলিতে জল ঢুকে অমন গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে কেন? ওদের ভয়াবহ হাত-পায়ের তাড়নায় গঙ্গাও কি ভয়ে-ব্যথায় কাতরে উঠছে?...রাত যত বাড়ে, পৃথিবীর ঘুম যত গাঢ় হয়ে ওঠে, মানুষের সাড়া যখন আর কখনো শুনতে পাব না বলে সন্দেহ হয়, কষ্টিপাথরের মতো কালো অন্ধকারের গর্ভে বন্দি জলকল্লোলের অপার্থিবতা মনকে তখন একেবারে পঙ্গু ও আতুর করে তোলে!

চাঁদের ফালি অত্যন্ত অসহায়ের মতো টিপটিপ করছে! সে জানে, তাকে চাঁদের ফালি বললেও চাঁদকে অপমান করা হয়। সে যেন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত চাঁদের হীন, হাস্যকর, অক্ষম অনুকরণ, কিংবা চাঁদের শত্রু রাহুর দন্তবিকাশ! ওই তুচ্ছ আলোর আভাস গঙ্গাজলের আবর্তকে ভয়মাখা করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, গঙ্গাস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেন সন্দেহজনক ছায়াময় কী সব ভেসে যাচ্ছে—যেন তারা জ্যান্ত না হলেও মৃত নয়! যেন তারা আমাকেও তাদের কাছে যাবার জন্যে ইশারা করছে!

ওইরকম কী একটা অস্পষ্ট বস্তু আমার দিকে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। এক-একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় বস্তুটা যেন কোনো জীবন্ত দেহের মতো উপরে ভেসে উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছে।

একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। বস্তুটা একেবারে তীরের কাছে এসে থামল। ভালো করে দেখবার চেষ্টা করেও কিছুই বুঝতে পারলুম না।

আমার চোখের ভ্রম কি না জানবার জন্যে নীচে নেমে গেলুম! দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বাললুম এবং এক-মুহূর্তেই তার সমস্তটা দেখতে পেলুম।

একটা মৃতদেহ তার দুটো মরা চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঢেউ এর ধাক্কায় জীবন্ত এক মড়া! ভয়ানক!

দ্রুতপদে ঘাটের উপরে উঠে এলুম।

॥ ৩ ॥

আর এক রাতে গঙ্গার এক ঘাটে চুপ করে বসে আছি। সেদিনও গঙ্গা ছাড়া আর কেউ নিশীথিনীর নিদ্রাভঙ্গ করছে না।

আকাশে প্রতিপদের চাঁদ আছে, কিন্তু ভাদ্রমাসের খণ্ড খণ্ড মেঘের গুণ্ঠনে আকাশের চাঁদ-মুখ ঘন ঘন ঢেকে যাচ্ছে—গঙ্গাজলের উপরে বারে বারে আলো-আঁধারের অভিনয়!

ঘাটের ধারে অনেকগুলো নানা আকারের নৌকা বাঁধা রয়েছে, কিন্তু দাঁড়ি-মাঝিরা এখন নৌকার ভিতরে, হয়তো কেউ আর জেগে নেই।

নিস্তব্ধতার সঙ্গে গঙ্গা কী কথা কইছে, অনেকক্ষণ ধরে তা বুঝবার চেষ্টা করলুম।

এর-মধ্যে কখন একখানা বড়ো মেঘ এসে আকাশকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে, কিছুই টের পাইনি।

হঠাৎ একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম,—কিন্তু কাছে কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই দেখলুম না। ঘাটের পাশেই বাঁধা ছিল একখানা পানসি, তার উপরেই গিয়ে উঠলুম।

পানসির ভিতরে অন্ধকার, দাঁড়ি-মাঝিরা সেখানে নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে, নিরুপায় হয়ে তারই ভিতরে ঢুকে পড়লুম। তাদের ঘুম তবু ভাঙল না, কারণ কারুরই সাড়া নেই। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বেচারিরা গভীর নিদ্রায় অচেতন, তাই আমিও তাদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করলুম না। এককোণে বসে বৃষ্টি থামার প্রতীক্ষায় রইলুম।

কিন্তু সেদিনকার এই একগুঁয়ে বৃষ্টি কিছুতেই থামবার নাম করল না। গঙ্গাজলের উপরে ক্রমাগত ঝরঝর জল ঝরার একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে আমার চোখে কেমন তন্দ্রার ঘোর এল। সে ভাবটাকে তাড়াবার জন্যে একটা সিগারেট

মুখে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললুম। এবং সেই আলোতে দেখলুম, পানসির ভিতরে জনপ্রাণীও নেই।

আশ্চর্য হলুম না। নৌকোর লোকেরা হয়তো কোনো কাজে কাছেই কোথাও গিয়েছে, বৃষ্টি ধরলেই ফিরে আসবে।

সিগারেট ফুরিয়ে গেল, কিন্তু আকাশে জলের ভাণ্ডার তবু ফুরল না। আবার তন্দ্রা এল। এবারে আর জাগবার চেষ্টা না করে, পানসির ভিতরে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে, আকাশে আবার চাঁদ উঠেছে।

তারপরেই মনে হল, নৌকো যেন চলছে!

পানসির বাইরে চাঁদের আলো, ভিতরেও জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে,—কিন্তু ভিতরে-বাইরে কোথাও দাঁড়ি-মাঝিরা কেউ নেই, অথচ নৌকোসুদ্ধ আমি একেবারে মাঝ-গঙ্গায় এসে পড়েছি!

প্রথমে ভাবলুম, ঝোড়ো-হাওয়ায় বা অন্য কোনোগতিকে বাঁধন খুলে গিয়ে নৌকোখানা স্রোতের মুখে আপনি ভেসে চলেছে!

কিন্তু তারপরেই ভালো করে দেখে বুঝলুম, নৌকো স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে না—যাচ্ছে স্রোতের টান এড়িয়ে সোজা গঙ্গার এপার থেকে ওপারের দিকে! ঠিক যেন অদৃশ্য হাতের হাল আর দাঁড় ধনুক-থেকে-নিক্ষিপ্ত বাণের মতো নৌকোখানাকে সিধে একদিকে বইয়ে নিয়ে চলেছে!

এও কি সম্ভব? আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। কোথায় দাঁড়ি, কোথায় মাঝি? দাঁড়ের কোনোই শব্দ নেই, কিন্তু নৌকোর গতি ওপারের দিকে!

ভূত মানি না, চোখের সামনে কোনো ছায়াদেহও দেখছি না, কিন্তু এ কী ব্যাপার?

কেমন একটা অজানা ভয়ে সর্বশরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল,—কী করি? পানসির ভিতরে গিয়ে বসব? না—না, যদি ঢুকে দেখি, ভিতরটা এখন আর নির্জন নয়, যদি আমার পাশে অন্য কেউ এসে ধুপ করে বসে পড়ে?

পানসি তখন মাঝ-গঙ্গা পেরিয়ে এসেছে! নৌকোর হাল শূন্যে উঁচু হয়ে আছে, দাঁড়গুলো পাটাতনের উপরে পড়ে আছে—কিন্তু নৌকোর তীব্র গতির মুখে দু-ধারে কল কল করে জল কাটার শব্দ হচ্ছে! মানুষের বদলে নৌকোর উপরে আমি যদি কতগুলো অমানুষী, স্বচ্ছ ছায়ামূর্তিও দেখতুম, তাহলেও আমার মনে বোধহয় এতটা অস্বাভাবিক আতঙ্কের সঞ্চার হত না! তাহলে হয়তো একটা কোনো হদিস পেতুম—মানুষ হোক অমানুষ হোক নৌকো কেউ চালাচ্ছে বলে

অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারতুম! কিন্তু এই যে অদৃশ্য নীরব আত্মার অস্তিত্ব আমার চারিদিকে অনুভব করছি, যারা আমার খুব কাছে থেকেও চোখের আড়াল হয়ে আমাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করছে, তাদের সহ্য করা অসম্ভব! আমি আর অগ্র-পশ্চাৎ ভাবলুম না—একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়লুম গঙ্গার বুকে!

ভালো সাঁতার জানি। খানিকক্ষণ পরে কলকাতার এক ঘাটে এসে উঠলুম। যতক্ষণ সাঁতার দিয়েছি খালি ভয় হয়েছে, পানসিখানা যদি আবার আমাকে তুলে নিতে আসে!

পরদিন বেলা থাকতে আবার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাজির হলুম।

কালকের মতো ঘাটের পাশেই একখানা পানসি বাঁধা আছে। একজন দাঁড়ি কি মাঝি পানসির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে জাল বুনছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাপু, বলতে পারো, কাল রাতে এখানে কার পানসি বাঁধা ছিল?'

—'আমারই পানসি, হুজুর!'

—'কিন্তু পানসিতে তোমরা কেউ ছিলে না!'

—'না হুজুর, ছিলুম না। শনিবার রাতের বেলায় এ পানসিতে আমরা কেউ থাকি না।'

—'থাকো না কেন?'

লোকটা চুপ করে রইল।

আমি বললুম, 'আমার কাছে লুকিয়ো না। কাল হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়াতে আমি ওই পানসির ভিতরে গিয়ে বসেছিলুম। তোমরা কেউ ছিলে না, তবু পানসিখানা আমাকে নিয়ে ওপারে ভেসে যাচ্ছিল। এর মানে কী?'

লোকটা খানিক ইতস্তত করে বললে, 'আজ্ঞে, হুজুর যখন জেনেছেন তখন বলতে আর দোষ কী? শনিবারে এ পানসির ওপরে ভর হয়।'

—'ভর হয়?'

—'হ্যাঁ হুজুর, আমরা বেঁধে রাখলেও সকালে উঠে দেখি পানসিখানা ওপারে গিয়ে পৌঁছেছে!'

—'বরাবরই এই রকম হয়?'

—'না হুজুর, মাস-চারেক আগে এক শনিবারে গঙ্গা পার হবার সময়ে কালবোশেখিতে আমাদের নৌকো উলটে যায়। তিনজন লোক জলে ডুবে মারা পড়ে। তারপর থেকেই ফি শনিবারে এই ব্যাপার হচ্ছে!'

বাদশার সমাধি

অনেক অনেককাল আগেকার কথা।

আমরা তিন বন্ধু গেছিলাম দিল্লিতে বেড়াতে। প্রতি বছর পূজার ছুটিতে আমরা তিন বন্ধু বাইরে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতাম।

তখন এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব। বাংলা দেশ তখনও দু-ভাগ হয়নি।

সারা ভারতের লোক তখন পরম সুখে দিন কাটাচ্ছে। দেশে এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল না। এত খুন জখম ছিল না। এত গুণ্ডামি, রাহাজানিও ছিল না।

সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে পথে বের হতে পারত।

তিনজনে আমরা টিকিট কেটে সেদিন সকালে তুফান মেলে উঠে বসলাম।

ওল্ড দিল্লিটা ছিল অনেকটা আমাদের চিৎপুর রোডের মতো। সরু সরু রাস্তা, সরু সরু গলি, পুরোনো আমলের সব ঘরবাড়ি। আর আমরা যেখানে উঠেছিলাম সেই 'ফতেপুরী' ছিল ওল্ড দিল্লি স্টেশনের খুব কাছে। ওল্ড দিল্লিতে দর্শনীয় ছিল লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ, লৌহোরি গেট, আজমিরি গেট, কাশ্মীরি গেট প্রভৃতি।

ওল্ড দিল্লি থেকে বাসে উঠে আমরা নিউ দিল্লিতে গিয়ে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, ভাইসরয়ের বাড়ি এবং আরও নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখলাম। একদিন বাসে উঠে তিনজন গেলাম কুতুবমিনার দেখতে। এই ঐতিহাসিক কীর্তি দেখে খুব ভালো লাগল।

আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। এবার হাওড়ার দিকে ফিরব বলে কথাবার্তা বলছি। ওই হোটেলের ম্যানেজার আমাদের প্রশ্ন করলেন—আমরা কী কী দর্শনীয় স্থান দেখলাম।

আমরা আগ্রা মথুরা থেকে দিল্লি পর্যন্ত যা যা দেখেছি সব তাঁকে বললাম। এমনকি সেকেন্দ্রার আকবরের সমাধি পর্যন্ত দেখেছি, বললাম।

তিনি তখন বললেন—আপনারা কুতুবপুর যাননি?

আমরা বললাম—না।

তিনি বললেন—পূর্ণিমার রাতে কুতুবপুরের বাদশার সমাধি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

আমরা প্রশ্ন করলাম—সেটা এখান থেকে কতদূর?

—বেশি দূর নয়—মাইল পনেরো-ষোলো। বাসে যেতে হয় কুতুবপুরে। স্টেশন থেকে বাস ছাড়ে। তারপর হেঁটে মাইল খানেক গেলেই বাদশার সমাধি।

আমরা প্রশ্ন করলাম—এ কোন বাদশা?

ম্যানেজার বললেন—মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অনেক বাদশা দিল্লির সিংহাসনে আসীন হন—কিছুদিন পরেই তাঁরা আবার একে একে চক্রান্তের শিকার হয়ে নিহত হন। ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। এই বাদশা ও তাঁর বেগমকে চক্রান্তকারীরা ওই কুতুবপুরেই হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা করে। তাঁদের সমাধিই ওখানে আছে।

একটু ভেবে ম্যানেজার বললেন—আগামি পরশু তো পূর্ণিমা আছে। ওই দিন সকালে খেয়ে-দেয়ে রওনা হবেন। সব দেখে পরদিন ফিরবেন।

আমরা রাজি হলাম।

* * *

গাইড ধরলাম আমরা কুতুবপুরে গিয়ে। সে আমাদের সঙ্গে চলল বাদশার সমাধিতে।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। আমরা সমাধি থেকে কিছু দূরে একটা গাছের কুঞ্জের আড়ালে বসে রইলাম। মাঝে মাঝেই এখানে এমনি সব ঝোপ আছে। এদের বলে কুঞ্জ।

আমরা গাইডকে প্রশ্ন করলাম—এই সব কুঞ্জে সাপ-খোপ নেই তো?

—না, সব নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়।

আমরা প্রশ্ন করলাম তাহলে এই সমাধি দেখতে কি তারই লোক আসে?

—হ্যাঁ আসে বটে, তবে শুধু পূর্ণিমায়। সবাই তো এ সমাধির কথা জানে না। তাই ভিড়ও হয় না।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখি আজব কাণ্ড।

একটি সমাধি থেকে বাদশা এবং অন্য সমাধি থেকে বেগম বের হলেন।

বাদশা হাততালি দিলেন দু-বার।

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা সুন্দর সিংহাসন বার করে আনল দুজন লোক

ধরাধরি করে। তারপর তারা একটা আলবোলা আনল। তাতে সুগন্ধি তামাক সেজে দিল।

বাদশা ও বেগম সিংহাসনে বসলেন।

বাদশা বুড়ুক বুড়ুক করে আলবোলা টানতে শুরু করলেন।

অপূর্ব সুমধুর গন্ধে চারদিক যেন আমোদিত হয়ে উঠল। তামাকের যে এত সুমধুর গন্ধ হয়, তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

তামাক খাওয়া শেষ হল।

তারপর বাদশা আবার দু-বার হাততালি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল বিশাল একটা সাদা ঘোড়া।

বাদশার পরনে ছিল দামি কুর্তা, পাজামা, মাথায় দামি উষ্ণীষ। তাতে অনেক হিরা, মণি, মুক্তা বসানো। কুর্তাতেও মাঝে মাঝে হিরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি বসানো।

চাঁদের আলো সেগুলির উপরে পড়ে ঝকঝক করছিল যেন। বাদশার কোমরে খাপে মোড়া তলোয়ার।

বাদশা তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠলেন।

বেগমকে ইশারায় সিংহাসনে বসে থাকতে বললেন।

বাদশা ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বের হলেন।

খটাখট খটাখট করে শব্দ তুলে ঘোড়া ছুটে চলল বাদশাহকে পিঠে নিয়ে।

একটু পরে তারা অদৃশ্য হল।

দুজন বাঁদী এসে বেগমের হাত পা টিপতে লাগল।

আমাদের চোখের সামনে একের পর এক এই সব দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এ যেন কোনো যাত্রা-নাটকের অভিনয় দেখছি।

* * *

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ কেটে গেল।

তারপর আবার দূর থেকে শোনা গেল খটাখট শব্দ।

দেখা গেল বাদশা ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছেন।

এই সময় আমার কেমন যেন মনে হল, এই সব কিছু সাজানো নয় তো? কতকগুলি লোক হয়তো এসব অভিনয় করছে।

আমি লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কুর্নিশ করলাম।

বাদশা তাকালেন আমার দিকে।

কেমন যেন নিষ্প্রভ দৃষ্টি। মরা কোনও জন্তু-জানোয়ারের চোখের মতো। সেই চোখের দৃষ্টি স্থির, চোখের পাতা নড়ছে না।

বাদশা বললেন—কোন হো তুম?

আমি বললাম—ম্যায় হুঁ এক গরিব ভিখারি বান্দা। বাদশাকো পাশ কুছ ভিখ মাঙতা হুঁ।

সঙ্গে সঙ্গে বাদশা পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলি সোনার আমলকী বের করে আমার দিকে ছুড়ে দিলেন।

সেগুলি ছিটিয়ে পড়ল।

আমি আমলকীগুলো কুড়িয়ে পকেটে রেখে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম এতগুলি সোনার আমলকীর দাম কয়েক হাজার টাকা হবে।

কিন্তু এদিকে কবরের কাছের সেই বাদশা ও বেগমের মূর্তি এবং তাঁদের সব সঙ্গীসাথিদের মূর্তি যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল।

* * *

গাইড ছোকরা আমার কাছে এসে বললে—এ আপনি কী করলেন?

—কেন? কী হল?

আপনার জন্যে ওরা অদৃশ্য হল। তা না হলে আপনারা কত কী দৃশ্য দেখতে পেতেন।

আমি বললাম—মৃত আত্মাদের এই সব দৃশ্য দেখে লাভ কী?

গাইড বললে—এই সব দেখতেই তো লোকে আসে এখানে।

আমি বললাম—তার চেয়ে আমি যে আমলকী পেয়েছি, তা অনেক মূল্যবান।

গাইড ছোকরা কিছু বললে না—শুধু মৃদু হেসে উঠল।

আমরা ফিরে চললাম।

পরদিন ভোর পর্যন্ত একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে গল্প করে কাটালাম। শুনলাম, প্রতি পূর্ণিমার রাতে চায়ের দোকানটা সারা রাত খোলা থাকে।

অবশেষে ভোরের বাসে ফিরে এলাম দিল্লি।

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের বললেন—কেমন দেখলে সব কিছু?

আমরা তখন সব ঘটনা বর্ণনা করলাম।

তিনি তখন বললেন—কই দেখি আমলকীগুলো।

আমি পকেট থেকে সেগুলো বের করতে গেলাম।

কিন্তু এ কী?

পকেটে আমলকী একটাও নেই—তার বদলে সব মাটির খোলার টুকরো। যেন কোনো ভাঙা মাটির হাঁড়ি বা কলসির টুকরো টুকরো চাকতি।

বিস্ময়ে আমরা সকলেই হতবাক হয়ে গেলাম।

পোড়ো বাড়ি

বাড়িওয়ালা বললে, 'হাঁ মশাই, দাঙ্গার পর থেকেই আমার এই বাড়িখানা খালি পড়ে আছে। এ অঞ্চলে আর কোনো হাঙ্গামা নেই, অথচ এমন চমৎকার বাড়ি, তবু লোকে এখনও কেন যে এখানে বাস করতে ভয় পায়, আমি তা বুঝে উঠতে পারি না।'

আমি বললুম, 'বাড়িখানা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি মিথ্যা ভয় পাওয়ার লোক নই, আর আমার কাছে বন্দুক আছে। কিন্তু আপনি কত ভাড়া চান?'

—'বেশি নয়, মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এ বাড়ির জন্যে আগে আমি একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া পেতুম। কিন্তু একে এখন দিন-কাল খারাপ, তার উপরে বাড়িখানার সুনাম আবার আমি ফিরিয়ে আনতে চাই। তাই আপাতত পঞ্চাশ টাকা করে পেলেও আমি খুশি হব।'

আমি বললুম, 'তাই সই।'

লক্ষ করলুম, বাড়িওয়ালা একটা আস্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। ভাড়া কম হোক, এই পোড়োবাড়ির জন্যে অবশেষে একজন ভাড়াটিয়া যে জুটল, এইটেই সে সৌভাগ্য বলে মনে করলে। লোকটার দেহ হাড়-জিরজিরে, আর কথা কইতে কইতে সে ক্রমাগত হাঁপাচ্ছিল—পুরাতন হাঁপানির রোগীর মতো! কিন্তু তার চোখ দুটো এমন উজ্জ্বল যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন জ্বলন্ত। আমার হাতে চাবির গোছা দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ও লাঠি ঠক ঠক করতে করতে সে চলে গেল। বাঁচলুম,—কেন জানি না, তাকে দেখে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল! যেন সে কোনো ভাবী অমঙ্গলের অগ্রদূত।

॥ দুই ॥

এতদিন বিহারে ছিল আমার কর্মস্থল, এখন হঠাৎ বদলি হয়েছি কলকাতায়। পরিবারবর্গকে আপাতত বিহারে রেখেই, আমার বিহারি বেয়ারা রামসহায়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছি বাসাবাড়ির খোঁজে।

ভাড়া পেলুম মনের মতো বাসা। 'ফ্লোরে'র উপরে দিব্য দোতলা বাড়ি, নীচে চারখানা ও উপরে দুখানা ঘর, তার উপরে আছে রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। সংসারে মানুষ বলতে আমি, আমার স্ত্রী ও দুটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, সুতরাং এই বাড়িতেই আমাদের বেশ কুলিয়ে যাবে।

গেল বারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এখানে নাকি চরমে উঠেছিল। এই বাড়িতে যারা বাস করত, তাদের কেউ কেউ মারা পড়ে, কেউ কেউ পালিয়ে যায়, আজ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে বাড়িখানা পোড়ো হয়ে আছে।

বাড়িখানা শহরের উপকণ্ঠে। এর আশেপাশে ছিল কয়েকটা বস্তি, দাঙ্গার সময়ে মারামারি, লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেগুলোর অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে! আজও সেখানে বসতি নেই, দেখা যায় কেবল জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ! তাই প্রায় আধ-পোয়া পথ পার না হলে এখানে কোনো প্রতিবেশীর মুখ দেখবার উপায় নেই। কিন্তু সেজন্যে বিশেষ মাথা ঘামালুম না, কারণ আমি নিজে কুনো মানুষ, আমার পক্ষে প্রতিবেশীরা অনেক সময় বিরক্তিদায়ক।

ভৃত্য রামসহায় অনেক বিহারির মতো বেশ ভালো বাংলা বলতে পারত। আমি তাকে 'রাম' বলে ডাকি।

বললুম, 'রাম, আজকের মতো তুমি বাড়ির দোতলাটা সাফ করে রাখো। আজই সন্ধ্যার আগে রাত কাটাবার জন্যে জিনিসপত্তর নিয়ে আমরা এই বাড়িতে এসে উঠব।'

রাম বললে, 'যে আজ্ঞে হুজুর!'

ভাবতে লাগলুম, বাড়িখানা আমি ভাড়া নিতে রাজি শুনে বাড়িওয়ালার উজ্জ্বল চোখ দুটো অমন আরও বেশি জ্বলজ্বল করে উঠল কেন? তা কি আনন্দে? না তার অন্য কোনো রহস্যময় কারণ আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেলুম সেই রাত্রেই।

॥ তিন ॥

বলেছি, বাড়ির দোতলায় মাত্র দুখানা ঘর। একখানা পশ্চিম দিকে, আর একখানা দক্ষিণ দিকে। ঘর দুখানা বেশ বড়োসড়ো।

বাড়িতে এসে যখন উঠলুম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। স্থির করলুম, নিদ্রাদেবীর আরাধনার পক্ষে দক্ষিণের ঘরই প্রশস্ত।

নির্জন পল্লি, নিরালা সন্ধ্যা, নিস্তব্ধ বাড়ি। নিজেদের পদধ্বনি চারিদিককে প্রতিধ্বনিত করে তুলল—ঠিক যেন আরও কেউ কেউ পদচালনা করছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে! অনেক দিনের খাঁ খাঁ করা পোড়োবাড়ি, এরকম ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। এই মিথ্যা ভ্রমটা মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না,—বারবার তবু মনে হতে লাগল, এ বাড়িতে আমরা ছাড়া আরও কাদের অস্তিত্ব আছে। এখনও তারা অদৃশ্য বটে, কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে হতে পারে দৃশ্যমান!

এমন ধারণার কোনো অর্থ হয় না। আমি ভীরু নই, ভূত মানি না, ভূতের গল্প শুনেছি কিন্তু ভূত কখনো দেখিনি এবং দেখব বলে বিশ্বাসও করি না। হয়তো মানুষের মনের উপরে কাজ করে কোনো কোনো স্থান-কালের বিশেষত্ব। অসম্ভবকেও মনে হয় সম্ভবপর।

নির্বাচিত ঘরে ঢুকেই পড়লুম এক মুশকিলে। দক্ষিণ দিকের জানালা খুলে দিতেই মন উঠল শিউরে—পেলুম যেন কোনো গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধ!

নাকে কাপড়চাপা দিয়ে উঁকি মারলুম জানালার বাইরে। নীচেই রয়েছে পচা জলে ভরা একটা খানা এবং তারপরেই খানিকটা জমির উপরে ভাঙাচোরা, লণ্ডভণ্ড, জনহীন বস্তি। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

বললুম, 'রাম, ওই খানার ধারে নিশ্চয় কোনো মরা কুকুর-বিড়ালের পচা দেহ পড়ে আছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে দক্ষিণের জানালা বন্ধ করে তো এ ঘরে থাকা যাবে না। চলো, পশ্চিম দিকের ঘরে যাই।'

রাম বললে, 'তাই চলুন।'

পশ্চিমের ঘরে হাওয়া কম হলেও দুর্গন্ধ নেই। কিন্তু অসুবিধায় পড়লুম আর এক কারণে। 'সুইচ' টেপাটিপি করেও আলো জ্বালতে পারলুম না। ইলেকট্রিকের তার কোথাও খারাপ হয়ে গিয়েছে।

নাচার হয়ে রামকে বললুম, 'তুমি বাজার থেকে বাতি কিনে আনো। আজকের রাতটা তো কোনোরকমে কাটিয়ে দি, তারপর কাল সকালে উঠে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

॥ চার ॥

বাতি নিবিয়ে, কেমন একটা অহেতুকী অশান্তির ভাব মনের মধ্যে নিয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলুম। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু তন্দ্রাঘোরেও মনে হয়েছিল, ঘরের ভিতরে কারা যেন নীরবে আনাগোনা করছে!

কতক্ষণ পরে জানি না, আমার ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। আমার মুখের উপরে পড়ল যেন কার উত্তপ্ত নিশ্বাস!

আমি কি স্বপ্নলোকে বাস করছি? কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুভব করলুম, ঠিক পাশেই আমার গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে শুয়ে আছে আর-একটা জীবের দেহ! কোমল, রোমশ, জীবন্ত দেহ! স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ! সেই সঙ্গে পেলুম একটা জান্তব গন্ধ!

ধড়মড় করে উঠে বসে একলাফে বিছানার বাইরে গিয়ে পড়লুম এবং পর-মুহূর্তে আচম্বিতে দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের বৈদ্যুতিক আলো!

কিন্তু তখন আলো-জ্বালার ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করলে না, কারণ সর্বপ্রথমেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল বিছানার দিকে।

কে ওখানে, কী ওখানে শুয়ে আছে? কিন্তু কী আশ্চর্য, বিছানার উপরে কেউ তো নেই!

কেবল বিছানার উপর নয়, আমার বিস্ফারিত চক্ষু সমস্ত ঘরখানা আঁতিপাঁতি করে খুঁজে সন্দেহজনক বা ভয়াবহ কোনো কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না।

এ কি ভ্রম? এ কি দুঃস্বপ্ন? কিন্তু তাই যদি হবে, তবে বারবার 'সুইচ' নাড়াচাড়া করে বহু চেষ্টার পরেও যে আলো জ্বালতে পারিনি, সেটা হঠাৎ এখন আপনা আপনি জ্বলে উঠল কেমন করে?

এগিয়ে 'সুইচ' তুলে দিলুম। কিন্তু চেষ্টা করেও যে আলো জ্বালতে পারিনি, এখন চেষ্টা করে তাকে আর নেবাতেও পারলুম না!

সবই অস্বাভাবিক ব্যাপার! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রামের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলুম। সে শুয়েছিল দরজার বাইরে বারান্দার উপরে। আমার চিৎকার শুনে ভিতরে ছুটে এল হন্তদন্তের মতো।

উত্তেজিত স্বরে বললুম, 'রাম, এতক্ষণ আমার বিছানার উপরে কে শুয়ে ছিল। তারপর চেয়ে দ্যাখো, ঘরের আলোটা আপনা আপনি জ্বলে উঠেছে!'

আমার মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রামসহায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে

রইল বোবা মূর্তির মতো! সে বেশি ভয় পেয়েছে, না বেশি হতভম্ব হয়েছে, বোঝা গেল না।

আবার বিছানার দিকে চেয়েই আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল! ও আবার কী ব্যাপার?

বিছানার চাদরের উপরে রয়েছে কতগুলো কাদামাখা পদচিহ্ন! দেখতে অনেকটা বিড়ালের থাবার মতো, কিন্তু সেগুলি বিড়ালের থাবার চেয়ে অনেক বড়ো!

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'হলপ করে বলতে পারি, আধ মিনিট আগেও ওই থাবার দাগগুলো ওখানে ছিল না!'

আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে রামসহায় বললে, 'হুজুর! বাইরে চলে আসুন!'

বাইরেই চলে এলুম—একেবারে বাড়ির বাইরে। শেষ রাতটা কাটল রাস্তার ধারে রোয়াকের উপরে।

॥ পাঁচ ॥

সকালে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা। সব কথা খুলে বললুম।

বাড়িওয়ালা হাঁপের টান সামলাতে সামলাতে হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'মিছেই ভয় পেয়েছেন। ঘরের ভিতরে ভাম এসেছিল। পাশের খানায় ভাম থাকে।'

—'কিন্তু সে বন্ধ ঘরের ভিতরে এল কেমন করে?'

—'জানালা দিয়ে।'

—'ভাম কখনো একতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে উঠতে পারে?'

—'দোতলায় যখন উঠেছে, নিশ্চয়ই পারে।'

—'ধরলুম তাই। কিন্তু ভাম যখন ঘরের ভিতরে নেই, তখন তার পায়ের চিহ্ন বিছানার উপরে পড়ল কেন?'

—'আপনি ভুল দেখেছেন। পায়ের চিহ্ন আগে থাকতেই বিছানার উপরে ছিল।'

—'আর ইলেকট্রিক লাইটের ব্যাপারটা?'

—'তারের ভিতর গলদ থাকলে অমন ব্যাপার মাঝে মাঝে হয়। আপনি পাখা চলে, আপনি আলো জ্বলে। মশাই, আজই আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনার কোনো ভাবনা নেই।'

দেখছি, বাড়িওয়ালার ওজরের অভাব নেই। শুকনো হাসি হেসে বললুম, 'না আমার আর কোনো ভাবনাই নেই। কারণ, আজকেই আমি অন্য বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।'

ভৌতিক, না ভেলকি?

হ্যাঁ, আফ্রিকায় অনেক বিচিত্র ঘটনাই ঘটে।

তখন আমি ছিলুম কঙ্গো প্রদেশে। যেখানে গ্রিবিঙ্গুই ও চারি নদী পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে, সেখানে পেয়েছিলুম একখানা খালি বাড়ি। সাধারণ বাড়ি, তার উপরে ঘাসে-ছাওয়া চাল এবং তার চারিদিক বেষ্টন করে বারান্দা।

প্রথম দিনে আমার মালপত্তর বারান্দাতেই তোলা হল। পাহারা দেবার জন্যে রাত্রে সেখানে রইল দুজন বেয়ারা।

রাত ন-টা বাজতেই নৈশভোজনের পর শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম এবং ঘুমিয়ে পড়তে বিলম্ব হল না। কিন্তু খানিক পরেই ঘুম গেল ভেঙে এবং শুনতে পেলুম, বাইরে থেকে বন্ধ দরজার উপরে আঁচড়াআঁচড়ির শব্দ হচ্ছে।

চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে?'

কারুর সাড়া নেই, কিন্তু শব্দটা গেল থেমে। ভাবলুম, কোনো জন্তুজানোয়ার হবে। আর মাথা না ঘামিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার সেই আঁচড়াআঁচড়ির শব্দ।

আবার শুধালুম 'কে?' কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে, উঠে আলো জ্বেলে ঘরের দরজা খুললুম।

কেউ কোথাও নেই। বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে কেবল আমার দুজন বেয়ারা। কিছুই বুঝতে না পেরে দরজা বন্ধ করে আলো না নিবিয়েই আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু মিনিট কয় যেতে না যেতেই ফের শুরু হল সেই আঁচড়াআঁচড়ি। এবারে ভারী রাগ হল। লাফ মেরে বিছানা ছেড়ে গালাগালি দিতে দিতে খুলে ফেললুম ঘরের দরজা। সব ফাঁকা, রাত করছে খাঁ খাঁ। চারিদিকের বারান্দায় এক চক্কর ঘুরে এলুম দ্রুতপদে। বেয়ারারা তেমনি নিদ্রিত। নেই আর কোনো জনপ্রাণী।

এবারে রীতিমতো হতভম্বের মতো ঘরের ভিতরে ফিরে এলুম। কেউ নেই, শব্দ করে কে? শুয়ে শুয়ে এই কথা ভাবছি, তারপরেই আবার কে দরজা আঁচড়াতে লাগল!

এবার বিছানা না ছেড়েই জ্বালাতন হয়ে চিৎকার করে বললুম, 'দূর হ, দূর হ! নইলে বন্দুকের গুলিতে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!'

শাসানির ফল ফলল। একটা কণ্ঠস্বরে শুনলুম, 'ও মি. স্মিথ! আপনি কি আমাকে ভুলে গিয়েছেন? মনে নেই ঔবাংঘিতে আমি আপনাকে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছিলুম?'

সিয়েরা লিয়নের একজন কালা আদমির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, মনে হল তারই কণ্ঠস্বর। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, সে হচ্ছে 'জুজু'-মানুষ, অলৌকিক জাদু জানে।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু কোথায় তুমি? বাইরে গিয়েও আমি তো কারুকে দেখতে পাইনি?'

উত্তর হল, 'হতে পারে, কিন্তু আমি এইখানেই আছি। আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমি আপনাকে আরও কিছু দেখাব!'

বিছানা থেকে নেমে চেয়ারের উপর বসে আমি আরও কিছু দেখবার অপেক্ষায় রইলুম।

এখানে এ ঘরের ভিতর থেকে আর-একটা ঘরে যাওয়া যায়, মাঝে আছে একটা দরজা।

সেই দিকে তাকিয়ে দেখি—কী আশ্চর্য, দরজার মাথার উপরে রয়েছে একটা কালা আদমির মুখ!

অবাক হয়ে ভাবছি, কেমন করে ওই অসম্ভব জায়গায় তার আবির্ভাব হল—হঠাৎ সে জিব বার করে আমাকে ভেংচি কাটলে।

না, এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করা অসম্ভব—আমি তেরিয়া হয়ে তার দিকে ছুটে গেলুম, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখখানা!

সেই দরজা খুলে ফেলে তার পিছনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেও কারুর টিকি পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না। আবার দরজা বন্ধ করে চেয়ারের উপরে এসে বসে পড়লুম দস্তুরমতো ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতো। কে হেসে উঠল আচম্বিতে! চোখ তুলে দেখি, দরজার টঙে আবার সেই কালা মুখ—আবার সে আমাকে ভেংচি কাটছে!

এবারে আমি আর চেয়ার ছেড়ে উঠলুম না, নাচারের মতো বসে রইলুম চুপচাপ। একটু পরেই মুখখানা মিলিয়ে গেল।

কে বললে, 'মেঝের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

তাকিয়ে দেখলুম। মস্ত একটা সাপ সড়সড় করে আমার চেয়ারের দিকেই এগিয়ে আসছে!

এতক্ষণে বেশ বুঝলুম, এ সব হচ্ছে আমার চোখের ভ্রান্তি। তবু সাপটা যখন চেয়ারের কাছে এসে পড়ল, আমি তাড়াতাড়ি পা দুটো উপরে তুলে না নিয়ে থাকতে পারলুম না।

পরদিন দুপুরে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার এবং শাসনকর্তার ওখানে ছিল আমার ভোজনের নিমন্ত্রণ। তাঁদের কাছে প্রকাশ করলুম গত রাত্রের কথা।

আমিও যা ভেবেছিলুম, তাঁরাও তাই বললেন। কেউ আমাকে নিয়ে মজা করছে।

তাঁরা আমার সঙ্গে এলেন আমার বাসাটা খানাতল্লাশ করবার জন্যে। কিন্তু সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

শেষে স্থির হল, আজ রাত্রে পাহারাওয়ালারা এই বাড়িখানার চারিদিক ঘিরে মোতায়েন থাকবে। এখান থেকে বিশ গজ দূরে আছে আর-একখানা বাড়ি, সেখানে হাজির থাকবেন দুই জন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী। আজও রাত্রে আবার যদি সেইরকম শব্দ হয়, আমি যেন খুব চিৎকার করে বলি—'কে ওখানে?' তৎক্ষণাৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা বেগে ছুটে আসবেন এবং বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে কারুকে দেখতে পেলেই পাহারাওয়ালারা বন্দুক থেকে করবে অগ্নিবর্ষণ।

আবার রাত এল। যথাসময়ে আমিও শয্যাগ্রহণ করলুম। কেটে গেল মিনিট পনেরো। তারপরেই শুরু হল দরজার উপরে সেই আঁচড়াআঁচড়ি।

চিৎকার করে উঠলুম আমি উচ্চকণ্ঠে। দ্রুতপদে ছুটে এলেন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা, হাতে তাঁদের রিভলভার। পাহারাওয়ালারা চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু কাকে ধরবে? কোথাও নেই জনমানব!

তারপরেও এক সপ্তাহকাল আমি সেই বাসায় বাস করেছিলুম। রোজ রাত্রেই ঘটত অমনি সব অলৌকিক ঘটনা।

কিন্তু আমি সে সব আর আমলে আনতুম না। আহারের পর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে বলতুম, 'আর নয়, এইবারে বিদায় হও। আমি এখন ঘুমুতে চাই।' সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু শুনতে বা দেখতে পেতুম না।

আর-একটা উল্লেখযোগ্য কথা। আমি আসবার আগে ওখানে কোনো উৎপাত হয়নি। আমার পরেও বাড়িতে বাসা বেঁধে ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার। তখনো ঘটেনি কোনো আজব ঘটনা।

ভৌতিক চক্রান্ত

শিল্পী প্রমোদ রায়ের নাম অনেকেরই কাছে সুপরিচিত। আমি উদীয়মান চিত্রকর ও ভাস্কর প্রমোদ রায়ের কথা বলছি। ছবি আঁকায় এবং মূর্তি গড়ায় তার সমান খ্যাতি।

সে বাস করত নিমচাঁদ মল্লিক স্ট্রিটের একখানা ভাড়াবাড়িতে। স্ত্রী ছাড়া তার পরিবারে আর কোনো লোক নেই, বাড়িখানা ছোটো হলেও সে কোনো অসুবিধা বোধ করত না। নীচের তলায় ছিল তার কারুকক্ষ বা 'স্টুডিয়ো'।

তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল দিব্য নির্ভাবনায়, কিন্তু হঠাৎ হল এক মুশকিল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এক নোটিশ এসে হাজির, এ বাড়ি ছেড়ে তাকে উঠে যেতে হবে।

কলকাতায় তখন ভাড়াবাড়ির একান্ত অভাব, পাড়ায় পাড়ায় উদ্বাস্তুদের ভিড়। মোটা টাকা সেলামি এবং ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ ভাড়া দিতে চাইলেও খালি বাড়ি পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ বাড়িওয়ালাই পুরাতন ভাড়াটিয়া উঠে গেলে খুশি হয়, নূতন ভাড়াটিয়া বসিয়ে বেশি লাভ করবার লোভে।

প্রমোদ বাড়িওয়ালার দাবি সহজে মানতে রাজি হল না। বাড়িওয়ালা নালিশ করলে। মামলা হল এবং মামলায় হেরে গেল প্রমোদই। বাড়ি ছাড়বার জন্যে সে সময় পেলে মাত্র এক মাস।

॥ দুই ॥

ইতিমধ্যে ঘটতে লাগল অদ্ভুত সব কাণ্ড!

প্রমোদদের ঠিক পাশের বাড়িতে থাকত নরহরি দাস, মফস্‌সলের লোক, কলকাতায় বাস করত ব্যাবসাসূত্রে। মাঝখানের একটা পাঁচিল টপকালেই তাদের বাড়ির ছাদ থেকে অনায়াসে প্রমোদদের বাড়ির ছাদের উপরে এসে পড়া যেত।

নরহরির চেহারাখানি ছিল আদর্শ গদিওয়ালার মতো—মোটাসোটা, বেঁটেসেটে, কালোকোলো দেহ; চাঁদের মতো গোলাকার মুখমণ্ডল; সাজগোজও তথৈবচ। সে পরমবৈষ্ণব, মাথায় চৈতনচুটকি, কপালে ও নাসিকায় তিলকমাটির চিহ্ন এবং কণ্ঠদেশে তিন সার তুলসীর মালা।

অথচ তার অত্যন্ত দহরম-মহরম ছিল মহাশাক্ত ভৈরব ভটচাজের সঙ্গে। ভৈরবের চেহারা ছিল লম্বায় চওড়ায় দশাসই, হাস্য ছিল অট্টাহাস্যের মতো এবং বাক্য ছিল হুংকারের মতো। তান্ত্রিক ক্রিয়া ছিল তার পেশা এবং মদ্য আর মাংসই ছিল তার প্রধান পানীয় ও খাদ্য।

কিন্তু চেহারায় ও চরিত্রে আকাশ-পাতাল তফাত থাকলেও ভৈরব ও নরহরি দুজনেরই নেশা ছিল এক এবং সেটা হচ্ছে দাবাখেলা।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় নরহরি তাম্বুল চর্বণ করতে করতে এবং ভৈরব তামাকু টানতে টানতে দাবাবোড়ের ছকের সামনে বসে খেলায় বিভোর হয়ে থাকত। সে সময়ে তাদের দেখলে লোকে বলাবলি করত, 'এও যখন সম্ভবপর, তখন বাঘে আর গোরুতে মিলনই বা অসম্ভব হবে কেন?'

কিন্তু এমন মিলনেও তাগড়া পড়ল। আচম্বিতে মেনিনজাইটিস রোগে নরহরি হল গতাসু এবং সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেল তার পরিবারবর্গ। ভেঙে গেল সেখানকার দাবাবোড়ের সান্ধ্যআসর।

॥ তিন ॥

নরহরির মহাপ্রস্থানে ভৈরব ভটচাজ দুঃখ পেলে বটে, কিন্তু পরম আনন্দ লাভ করলে তার বাড়িওয়ালা ক্ষেত্র বা ক্ষেতু মল্লিক।

নরহরি ভাড়া দিত মাসিক পঞ্চাশ টাকা। ক্ষেতু মল্লিক এখন জো পেয়ে দাবি করে বসল এককালীন এক হাজার টাকা সেলামি এবং মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়া। দিনকাল যা পড়েছে, তার দাবি নিশ্চয়ই অপূর্ণ থাকত না। এমনকি, হবু ভাড়াটিয়ারা আনাগোনাও শুরু করে দিলে।

কিন্তু সহসা সংঘটিত হল এক রোমাঞ্চকর ও অভূতপূর্ব ঘটনা।

এক পূর্ণিমার রাত্রে পথ দিয়ে চলতে চলতে নরহরিদের পরিত্যক্ত, তালাবন্ধ, খালি বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে বদন চাটুজ্জে দেখলে এক বিসদৃশ দৃশ্য!

বারান্দার একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢেকে এক সন্দেহজনক মূর্তি!

বদন চেঁচিয়ে বললে, 'কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?'

কোনো সাড়া নেই।

বদনের সঙ্গে ছিল টর্চ, সে টপ করে টর্চের চাবি টিপে আলো জ্বেলে যা দেখলে, তা সম্ভবপরও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়।

সে মূর্তি হচ্ছে নরহরি দাসের!

তার পেটের পিলে চমকে গেলেও, নিজের চোখের ভ্রম ভেবে বদন চাটুজ্জে আরও ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে। উঁহু, মোটেই চোখের ভ্রম নয়, ও মুখ অবিকল নরহরি দাসের! ভয়ে সাদা হয়ে গেল বদনের বদন, ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে 'আঁ' বলে পাড়াকাঁপানো চিৎকার করে সে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে দৌড় মারলে নিজের বাড়ির দিকে।

॥ চার ॥

বলা বাহুল্য, খবরটা পাড়ার ঘরে ঘরে রটে যেতে দেরি লাগল না।

ক্ষেতু মল্লিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললে, 'বদনাব্যাটা ভাংচি দিতে চায়! নরহরি ছিলেন পরমবৈষ্ণব মানুষ, তিনি এখন গোলকধামে বসে মনের সুখে বিশ্রাম করছেন, কোন দুঃখে আবার এই ছাই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন?'

কিন্তু নরহরি যে এখনও সশরীরে বিরাজ করছে তার ওই ভাড়াবাড়িতেই, পাড়ার আরও কেউ কেউ তার অকাট্য চাক্ষুষ প্রমাণ পেলে। তবে দিনের বেলায় তাকে দেখা যায় না এবং দিনের বেলায় তাকে দেখবার আশাও কেউ করে না।

ফলে দাঁড়াল এই প্রথমত, নরহরির বাড়ির সুমুখ দিয়ে লোকে রাত্রে পথ-চলাই ছেড়ে দিলে। দ্বিতীয়ত, হবু-ভাড়াটিয়ারা ক্ষেতু মল্লিককে একেবারেই বয়কট করলে। বিনা ভাড়াতেও নরহরির বাড়িতে বাস করবার মতো লোকও আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

অবস্থা যখন এই রকম, ঠিক সেই সময়ে তান্ত্রিক ভটচাজ এসে বাসনাপ্রকাশ করলে, 'ক্ষেতুবাবু, নরহরিদের বাড়িখানা আমি ভাড়া নিতে চাই!'

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে না পেরে ক্ষেতু মল্লিক বললে, 'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ ক্ষেতুবাবু! আমি হচ্ছি তন্ত্রসিদ্ধ মানুষ, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা আমাকে দেখলেই ভয়ে পিঠটান দেবার পথ পাবে না!'

ক্ষেতু মল্লিক তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঠিক বলেছ ভটচাজ! তোমার সঙ্গে আমিও একমত।'

—'কিন্তু আমি হচ্ছি গরিব মানুষ, মাসে ত্রিশ টাকার বেশি ভাড়া দেবার শক্তি আমার নেই।'

—'বেশ, তাই সই।'

॥ পাঁচ ॥

নরহরির বাড়িতে এসে জাঁকিয়ে বসল ভৈরব ভটচাজ। সত্য সত্যই মনে মনে তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা কিছুতেই শাক্তের নিকটবর্তী হওয়ার সাহস প্রকাশ করতে পারবে না।

এবং যখন প্রথম দুই রাত্রির মধ্যে নরহরির চৈতনচুটকি পর্যন্ত দেখা গেল না, ভৈরব তখন পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তন্ত্রের অপূর্ব মহিমা সম্বন্ধে জোরগলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

তারপরই এল অমাবস্যার রাত্রি।

দোতলার একটি ঘরে পূজার উপকরণ নিয়ে আসনাসীন হল ভৈরব ভটচাজ।

নরহরির ভয়ে পথ নির্জন, কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, ঘরের ভিতরে জ্বলছে একটা হারিকেন লণ্ঠনের টিমটিমে আলো।

ভৈরব একমনে দুই চক্ষু বুঁজে মন্ত্র জপ করছিল।

আচমকা একটা বিকৃত, অনুনাসিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ভৈঁরঁব, এঁকচাঁল দাঁবাঁ খেঁলবেঁ ভাঁয়াঁ?'

ভয়ংকর চমকে গিয়ে ভৈরব চোখ খুলেই দেখে, ঘরের দরজার কাছে পা থেকে গলা পর্যন্ত ধবধবে সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং নরহরি ছাড়া আর কেউ নয়! ভৈরবই সব চেয়ে বেশি চিনত নরহরিকে, তার চোখের ভ্রম হবার জো নেই।

তারপর আর কিছু নয়, বিকট এক আর্তনাদ এবং ভৈরবের ভূমিতলে পতন ও মূর্ছা!

॥ ছয় ॥

ক্ষেতু মল্লিক হতাশ ভাবে স্থির করলে, ওই ভূতুড়ে বাড়িখানা ভেঙে ফেলে একেবারে নতুন বাড়ি তৈরি করবে।

কিন্তু হঠাৎ যখন শিল্পী প্রমোদ রায় এসে নরহরির বাড়িখানা ভাড়া নিতে চাইলে, তখন ক্ষেতু মল্লিকের চেয়ে বিস্মিত লোক পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না বোধ হয়।

প্রমোদ বললে, 'কলকাতায় খালিবাড়ি দুর্লভ, অথচ বাড়িওয়ালার হুকুমে আর এক হপ্তার মধ্যেই আমাকে উঠে যেতে হবে। সুতরাং আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন তো?'

ক্ষেতু মল্লিক বললে, 'বেশ বাবা, আমি বেশি ভাড়াও চাই না, তুমি মাসে পঁচিশটি করে টাকা দিয়ো।'

—'তাহলে এই পঁচিশ টাকা অগ্রিম নিয়ে তিন বছরের কড়ারে আমাকে চুক্তিপত্র লিখে দিন।'

—'আচ্ছা।'

॥ সাত ॥

পাশের বাড়িতে উঠে যাবার জন্যে প্রমোদ নিজের 'স্টুডিয়ো'র ছবি ও প্রতিমূর্তিগুলোকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময়ে তার স্ত্রী নমিতা এসে ভয়ে ভয়ে বললে, 'ওগো, নরহরিবাবুর বাড়িতে গিয়ে আমি থাকতে পারব না।'

—'কেন?'

—'কেন, তা কি তুমি জানো না?'

প্রমোদ হাসিমুখে নমিতার হাত ধরে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একখানা সাদা চাদর একধারে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, একটা খড়ের কাঠামোর উপরে বসানো রয়েছে নরহরির রং-করা মাটি দিয়ে গড়া মুখমণ্ডল!

নমিতা হতভম্ব!

প্রমোদ বললে, 'আমি হচ্ছি ভাস্কর, নরহরির মুখ আমি অনায়াসেই গড়তে পেরেছি। পাঁচিল টপকে পাশের বাড়িতে যাওয়াও আমার পক্ষে কঠিন হয়নি; আমাকে সাহায্য করেছে আবছা রাত, মানুষের স্বাভাবিক ভয় আর কুসংস্কার!'

পেপির দক্ষিণ পদ

বিলাত থেকে বাংলা দেশে ফিরছি।

জাহাজ যখন এডেন বন্দরে, একজন বুড়ো আরব আমার সামনে মোট নামিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে শুধোলে, 'কিউরিও কিনবেন? ভালো কিউরিও!'

কিউরিও কেনবার বাতিক আমার ছিল। কলকাতায় আমার বৈঠকখানা দেখে বন্ধুরা মত প্রকাশ করত, ঘরখানাকে আমি প্রায় ছোটোখাটো মিউজিয়ম করে

তুলেছি—কারণ সেখানে দিকে দিকে সাজানো ছিল দেশ-বিদেশের নানান শিল্প ও কৌতুক সামগ্রীর নমুনা।

বুড়ো আরবটাকে সাগ্রহে বললুম, 'খোলো তোমার মোট, দেখাও তোমার মাল।'

মোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল রকম-বেরকম জিনিস। বেশির ভাগই আজেবাজে ছেলেখেলার সামিল। কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

চোখে দেখে আমার মনের ভাব বুঝে চালাক আরবটা বললে, 'ওটি হচ্ছে দুর্লভ পদার্থ। চার হাজার বছর আগেকার মমির পা।'

প্রাচীন মিশরের সুরক্ষিত, বিশুষ্ক মৃতদেহের কথা সকলেই শুনেছে। মিশরের বা আধুনিক ইজিপ্টের যাদুঘরে আমি অনেক মমি দেখেছি! কলকাতার যাদুঘরেও মমির একটি নিদর্শন আছে—যদিও তার অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু এই বুড়ো আরবটা যা দেখাল, তা গোটা মমি নয়—বিশুষ্ক মনুষ্যদেহের হাঁটুর নীচে থেকে কেটে নেওয়া একখানা পা মাত্র। একেবারে নিখুঁত পা, তার কোনো অংশই একটুও নষ্ট হয়নি।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'গোটা মমিটা কোথায় গেল?'

সে বললে, 'কেউ তা জানে না। মহাশয়, এই মমির পায়ের ইতিহাস আছে। প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রথম মেন্টুহোটেপ যখন মিশরের রাজা, তখন শেয়ালমুখো দেবতা আনুবিসের মন্দিরে এক পুরোহিত ছিল, নাম তার পেপি। কী কারণে জানি না, রাজা মেন্টুহোটেপের হুকুমে পেপির প্রাণদণ্ড হয়। ঘাতক আগে তার দুই হাত আর দুই পা একে একে কেটে নেয়, তারপর করে মুণ্ডচ্ছেদ। অনেক চেষ্টার পর আমি কেবল পেপির এই ডান পা-খানা সংগ্রহ করতে পেরেছি।'

আমি বুঝলুম, বুড়োর এই বাজে গালগল্পটা ব্যাবসাদারির একটা চাল মাত্র। তা নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে, খানিকক্ষণ দরদস্তুরের পর মমির সেই পা-খানা আমি কিনে ফেললুম।

জাহাজের কাপ্তেন সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি কী কিনেছি দেখে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মি. সেন, এ সব জিনিস কেনার খেয়াল ভালো নয়। ইজিপ্টের মমিকে তার স্বদেশের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে আমার কোনো কোনো

বন্ধু সমূহ বিপদে পড়েছেন—কারণ সেটা হচ্ছে পবিত্র বস্তুর অপব্যবহার।'

কাপ্তেনের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলুম।

॥ দুই ॥

কলকাতার বাড়িতে ফিরে আসতেই আমার মা করলেন মমির এই দক্ষিণ পদের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্রোহ ঘোষণা।

স্পষ্ট ফতোয়া দিলেন, 'আমার বাড়িতে ওই পচা মড়ার ঠাঁই হবে না!'

আমি বললুম, 'পচা নয় মা, শুকনো। এই যেমন শুঁটকিমাছ আর কী! অনেকে কি শুঁটকি মাছ খায় না?'

মায়ের নাসিকাযন্ত্রকে সত্য সত্যই যেন আক্রমণ করলে কোনো উৎকট দুর্গন্ধ! তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'ওরে পিশাচ, থুঃ থুঃ থুঃ! ম্লেচ্ছের মুল্লুকে গিয়ে তুই কি শুঁটকি মড়াও খেতে শিখেছিস?'

অনেক চেষ্টা ও খোশামোদের পর শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে এই রফাই হল যে, পুরোহিত পেপির দক্ষিণ পদখানি অতঃপর বিরাজ করবে সদর-মহলে একতলার বৈঠকখানায় 'গ্লাস কেসে'র মধ্যে এবং কোনো ওজরেই তাকে নিয়ে আমি বাড়ির উপরতলায় উঠতে বা অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারব না।

॥ তিন ॥

তেরাত্রি পোয়াতে না পোয়াতে যে সব ঘটনা ঘটতে লাগল, তার কোনো মানে হয় না।

এক সকালে ঘরের বাইরে এসেই শুনলুম, মহাশোরগোল শুরু করে দিয়েছে আমাদের দারোয়ান।

কাল রাত্রে সে নাকি নিজের হাতে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ভোরবেলায় উঠে দেখে, দরজা কে দোহাট করে খুলে দিয়েছে!

কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

দরজার সামনে চলনপথে পড়ে রয়েছে পুরোহিত পেপির কর্তিত দক্ষিণ পদ!

এই পা-খানাকে আমি স্বহস্তে রেখে দিয়েছিলুম বৈঠকখানার চাবিবন্ধ গ্লাস-কেসে'র ভিতরে এবং সে ঘরের দরজাও ছিল বাহির থেকে তালাবন্ধ!

॥ চার ॥

এ অঞ্চলের থানার ইনস্পেকটার নবীন হচ্ছে আমার বন্ধু।

আজ সকালেও আমাদের সদর দরজা ছিল খোলা এবং সেই হতচ্ছাড়া কাটা ডান পা-খানা পড়েছিল [illegible] [illegible]ের উপরে! বলা বাহুল্য, আজও সে সচল হয়ে বেরিয়ে এসেছে তালাবন্ধ ঘরের চাবিবন্ধ 'গ্লাস কেসে'র ভিতর থেকে!

আড়ষ্ট ও নিরুপায় ভাবে তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে নবীনের প্রবেশ। এসেই সে বললে, 'ওহে, কাল নিশুত রাতে এমন একটা ব্যাপার দেখেছি, যা আজব বলাও চলে।'

'আজব [illegible]পার? কোথায়?'

—'তোমাদের সদর দরজার সামনে।'

—'তার মানে?'

—'রোঁদে বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ দেখি আমাদের আগে আগে যাচ্ছে একটা মস্ত ঢ্যাঙা মূর্তি। মাথা সমান উঁচু একগাছা লাঠির উপরে ভর দিয়ে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছিল।'

—'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে?'

—'হ্যাঁ। পথের আধা আলো আর আধা অন্ধকারে তাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তবু মনে হল সে বিদেশি, আর তার ডান পা-খানা নেই।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধালুম, 'তারপর?'

—'লোকটা যখন তোমাদের বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এসেছে, তখন আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি তাকে চেঁচিয়ে 'চ্যালেঞ্জ' করলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তিটা—বললে তুমি বিশ্বাস করবে না—ঠিক যেন বাতাসের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেল! এমন আশ্চর্য চোখের ভ্রম আমার আর কখনো হয়নি।'

এ কথার উত্তরে কোনোরকম উচ্চবাক্য-করা আমি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলুম না।

॥ পাঁচ ॥

এবারে চূড়ান্ত ঘটনা।

যদি কোনো বিশেষজ্ঞ এই ঘটনা শোনেন, তবে তিনিই বলতে পারবেন, আমি স্বপ্নচারণ-রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলুম, না, যা দেখেছিলুম তা হচ্ছে 'হ্যালসিনেশন' বা ভ্রান্তি মাত্র।

সে রাতে ঘুম ভেঙে গেল আচমকা।

তিনতলার ছাদের উপরে স্পষ্ট শুনলুম ধুপ ধুপ ধুপ শব্দ। যেন কে ভারী ভারী পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে ছাদের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত!

চোর নাকি! কিন্তু চোর কি পদচারণা করবে এমন সশব্দে?

দৌড়ে গিয়ে উঠলুম ছাদের উপরে। অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত। কিন্তু দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠেছে এক অদ্ভুত মূর্তি! ঠিক যেন পুরু অথচ স্বচ্ছ কালো মেঘ দিয়ে গড়া এক আশ্চর্য মনুষ্যদেহ এবং তার মেঘবরন মুখমণ্ডলের মধ্যে জ্বলছে স্থির বিদ্যুৎবর্ত্তুলের মতো দুটো নিষ্পন্দ চক্ষু!

স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম—দুই মিনিট, কি দুই ঘণ্টা, জানি না!...

আচম্বিতে যেন অন্য জগৎ থেকেই জেগে উঠল ভোরের পাখিদের প্রথম কাকলি।

সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বীভৎস আর্তনাদ! সভয়ে রোমাঞ্চিত দেহে দেখলুম, সেই অসম্ভব মূর্তিটার বাম-হাতখানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছাদের উপরে গিয়ে ঠিকরে পড়ল,—তারপর আবার আর্তনাদ এবং বিচ্ছিন্ন হল বাম পদ,—তারপর মূর্তিটা একেবারে শুয়ে পড়ে আবার আর্তনাদ করে উঠল এবং তার বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ পদখানা নিক্ষিপ্ত হল আমার পায়ের কাছে! তারপর আর আর্তনাদ শুনলুম না, কেবল দেখলুম মূর্তির ধড় থেকে বিযুক্ত হয়ে গেল মুণ্ডটা, নিবে গেল দুটো অগ্নিচক্ষু এবং ফিনকি দিয়ে ছুটতে লাগল রক্ত আর রক্ত আর রক্ত!

আর আমি সইতে পারলুম না, মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম সেইখানেই।

ছাদের উপরেই চোখ মেললুম প্রথম রোদের ছোঁয়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

আমি একলা। কেবল আমার পাশে পড়ে রয়েছে মমির সেই দক্ষিণ পদ।

সেই অভিশপ্ত বস্তুটাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে স্নান করে বাড়িতে ফিরে এলুম।

পর্বত ও মূষিক

কেউ কেউ বলে, ভূতের গল্প ভালো নয়। কেন? ভূতের গল্পে নাকি থাকে ভূতের ভয় এবং ভয় ব্যাপারটা ভীতু করে তোলে তোমাকে-আমাকে।

তাহলে বলি দাদা, মানুষের ভয় কি খালি একটা? রাত হলেই অন্ধকারের ভয়, শীত পড়লেই সর্দি-কাশির ভয়, বসন্তকালে মারী-ভয়, জলপথে ডুবে যাবার, স্থলপথে গাড়ি চাপা পড়বার ও শূন্যপথে বিমান বিকল হবার ভয় এবং চুপ করে বাড়ির ভিতরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও হঠাৎ বজ্রপাত ভূমিকম্পের ভয়। এ-সবার উপরেও আছে অগুনতি ভয়, সঠিক ফর্দ দাখিল করা অসম্ভব। কোন দিক সামলাবে? ভয় আছে মানুষের হৃদয়ের পরতে পরতে গাঁথা, তাকে এড়াবার চেষ্টা বৃথা। মারা পড়বার ভয়ে সৈনিকরা কি যুদ্ধে যায় না?

ভয়কে দমন করে সাহস। যার সাহস নেই, ভূতের গল্প না শুনলেও সে হবে পয়লা নম্বরের ভীতু।

কী বলছ? আমার আসল বক্তব্য কী? আরে ভায়া, ভূতের গল্পের বিরুদ্ধে তোমাদের নজিরগুলো শুনতে শুনতে অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার জীবনেই। আমি ভূত মানি না, কিন্তু সেই ভয়াবহ ঘটনায় আমার সমস্ত সাহস উপে গিয়েছিল।

ঘটনাটা শুনতে চাও? বেশ, শোনো তবে—

বাহান্ন বৎসর আগেকার কথা, অর্থাৎ আমার বয়স তখন আঠারো।

প্রেমলাল জাতে ছিল স্বর্ণবণিক কি গন্ধবণিক, ঠিক আমার মনে নেই। সে আমাদের পাড়ার কাছেই থাকত। তার সঙ্গে কিছুদিন পর্যন্ত আমার বেশ দহরম-মহরম ছিল, কিন্তু তারপর সে কোথায় হারিয়ে গেল এবং এখনও ইহলোকে টিকে আছে কি না, এসব খবর আমার জানা নেই।

যখন এই প্রেমলালের বিয়ে হয়ে গেল সতরো বছর বয়সে তখন আমরা কেউই অবাক হলুম না। সে সময়ে কোনও কোনও জাতের ছেলেদের খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়ে যেত। হেয়ার স্কুলে এক সুবর্ণবণিকদের ছেলে আমার সহপাঠী ছিল, সে যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে, তখনই এক সন্তানের পিতা!

কিন্তু ও-সব কথা থাক! প্রেমলালের অকালবিবাহের কথাটাও এখানে উপলক্ষ মাত্র, তবু উল্লেখ করবার কারণ, সেই সূত্রেই পূর্বোক্ত ভয়াবহ ঘটনাটার উৎপত্তি।

প্রেমলালের বিবাহের জের শহরেই মিটল না, উৎসবটা ভালো করে জমিয়ে তোলবার জন্যে তার বাবা ও মা, ছেলে আর নতুন বউ নিয়ে কিছুদিনের জন্য দেশে রওনা হলেন।

প্রেমলাল আমাকেও নিমন্ত্রণ করে বললে, 'চলো না, দিন-তিনেক পাড়াগাঁয়ে ঘুরে আসবি, মন্দ লাগবে না!' আমিও রাজি হয়ে গেলুম।

প্রেমলালদের দেশ কলকাতার কাছেই। ছোটো গ্রাম, এতদিন পরে তার নাম আমার মনে পড়ছে না।

সেখানে গিয়ে আমি পড়লুম কিন্তু বিপদে। যত সব অচেনা লোকের ভিড় এবং বিরক্তিকর প্রশ্ন! তার উপরে সেকেলে গ্রাম্য ধুমধড়াক্কার চোটে প্রথম দিনেই প্রাণ আমার আইঢাই করতে লাগল। রাত্রে ঘুমের দফা প্রায় রফা হবার ব্যাপার।

প্রেমলাল চালাক ছেলে, সকালে দেখা হতেই বললে, 'ভাই, তোর মুখ দেখেই পেটের কথা বুঝতে পারছি। তোর কষ্ট হচ্ছে, নয়? তা তুই এক কাজ কর। মুখুজ্জেদের বাগানবাড়িতে থাকবি?'

—'সে আবার কোথায়?'

—'গাঁয়ের শেষে, মাঠের ধারে। তুই কবি মানুষ, তোর ভালো লাগবে।' (তখন থেকেই আমি গদে-পদ্যে হাতমক্স শুরু করেছি এবং ছোটো ছোটো মাসিকপত্রে আমার দুই-একটি লেখা বেরিয়েও গিয়েছে।)

আমি ইতস্তত করে বললুম, 'কিন্তু মুখুজ্জেদের তো আমি চিনি না!'

প্রেমলাল বললে, 'তারা ওখানে নেই। বাগানখানা আমাদেরই জিম্মায় আছে।'

সত্যসত্যই বাগানখানার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য আমার ভালো লাগল। পশ্চিমে ও দক্ষিণে ধু ধু মাঠ। পূর্ব দিকে গ্রাম এবং উত্তর দিকে কলাইশুঁটি খেতের কোলে একটি ঝিলমিলে ঝিল। মেহেদীগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগানের ভিতরে নানান ফলফুলের গাছ ও কানায় কানায় জল-ভরা পুকুর এবং একখানি ছোটো একতলা বাড়ি। আর এক প্রান্তে মালির জন্যে আর একখানা মেটেঘর। চারিদিক নির্জন ও নিরিবিলি। গ্রাম্য হট্টগোল থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সন্ধ্যার পর খাবারদাবার এল বিয়ে বাড়ি থেকে এবং একখানি দক্ষিণখোলা ঘরে তক্তাপোশের উপরে বিছানো হল আমার বিছানা। কিন্তু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হল না। প্রতিপদের চাঁদের আলোতে তেপান্তরের মাঠ হয়ে উঠেছিল স্বপ্নলোকের মতো, আমার শহুরে দৃষ্টিকে তা আকৃষ্ট করে রাখলে অনেকক্ষণ ধরে। গানের পাখিরাও কানে করছিল মধুবৃষ্টি।

ঘরের কোলে বারান্দায় বসে এই সব দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে বেশ একটু তন্দ্রার আবেশ এসেছিল, কিন্তু চটকা ভেঙে গেল শেয়ালদের হুক্কাহুয়া চিৎকারে! চাঁদ তখন বাড়ির ছাদের আড়ালে সরে গিয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লুম। জানালা দিয়ে আসছিল দখনে বাতাসের মেঠো উচ্ছ্বাস। ঘুমিয়ে পড়তে দেরি লাগল না।

আমার ঘুম বরাবরই সজাগ। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, আচম্বিতে অজানা কারণে ঘুম গেল ছুটে। বিছানায় উঠে বসে কারণটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করলুম।

ঝাঁ ঝাঁ রাতে ঝিঁঝিপোকাগুলো খালি ঝিঁ ঝিঁ করছে। গানের পাখিদের জলসা বন্ধ হয়েছে। বাতাসও আর গাছে গাছে সবুজ পাতার বীণা বাজাচ্ছে না।

কিন্তু একটা শব্দ—সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়। খস খস খস খস খস খস! বারান্দার উপরে কে পায়চারি করছে!

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। চোর-টোর নয়, চোর পায়ের শব্দে গৃহস্থকে জাগায় না। কোনও জন্তুর পায়ের শব্দ বলেও মনে হয় না। কিন্তু অজ-পাড়াগাঁয়ে এই নিশুতিতে মেঠো বাড়ির বারান্দায় বেড়াবার শখ হল কার?

আবার শব্দ—খস খস খস খস খস খস! তারপর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ!

একবার উঠে দেখতে হল তো! তখনও ভূতের কথা একবারও মনে জাগেনি। ছেলেবেলা থেকেই ভূতের গল্প পড়তে ভালোবাসি, কিন্তু ভূতের ভয় আমার ছিল না।

জানালা দিয়ে উঁকি মারলুম। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ধু ধু মাঠ জ্যোৎস্নায় ধবধব করছে। মাথা-ঢাকা বারান্দায় রয়েছে আলোমাখা ছায়া কিংবা ছায়ামাখা আলো—সব দেখা যায় কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় না।

আচমকা আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল! সেই আবছায়ায় আমার দিকে পিছন ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন কালি জমিয়ে তৈরি একটা অতি শীর্ণ কঙ্কালসার নারীমূর্তি? এটুকু আন্দাজ করা গেল, তার দেহের উপরার্ধ নগ্ন এবং মাথায় জটপাকানো চুলগুলো সর্পশিশুদের মতো কাঁধের উপরে ঝুলছে!

সত্যই আমার গায়ে জাগল রোমাঞ্চ! যে-সব নিশীথ-প্রেতিনীর কথা শোনা যায়, এ কি তাদেরই কেউ? তবু ভয়ে ভয়ে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে কে ওখানে?'

তৎক্ষণাৎ এমন বিদ্যুৎবেগে সেই প্রস্তর স্থির মূর্তিটা ফিরে দাঁড়াল যে আমি সচমকে পিছু হটে জানালার কাছ থেকে সরে এলুম।

মূর্তিটা আবার মুহূর্তকাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ করলুম সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হল, অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটো ক্ষুধিত চক্ষু যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে! যদিও আমি বদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে আছি, তবু নিজেকে কী অসহায় বোধ হতে লাগল! বাইরে যে অমন মাঠভরা চাঁদের আলোর জোয়ার, তাও যেন আমার চোখের সামনে ডুবে গেল অমাবস্যার গহন আঁধারে!

তারপরেই যেন শিকার খুঁজে পেয়ে সেই বিভীষণ মূর্তিটা তীব্র স্বরে খিল খিল করে হেসে উঠল। এবং পায়ে পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি আর সহ্য করতে পারলুম না—বেগে দৌড়ে গিয়ে দড়াম করে জানালা বন্ধ করে দিলুম।

কিন্তু বাহির থেকে আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না—না হাসির, না পায়ের শব্দ!

বাকি রাতটা জেগে জেগেই কেটে গেল। অবশেষে ভোরের পাখিদের বৈতালিকী শুনে আশ্বস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। সন্তর্পণে এদিক ওদিকে খুঁজে দেখলুম—কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে সেই নৈশ অপচ্ছায়া!

চিৎকার করে মালিকে ডাক দিলুম।

মালির কথা সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পর্বতের মূষিক প্রসব!

এই গাঁয়েরই এক বাগদি জাতের পাগলি ঘুরে বেড়ায় হাটে-মাঠে-ঘাটে এবং রাত্রে মাঝে মাঝে বাগানের বেড়া পেরিয়ে বারন্দায় উঠে শুয়ে থাকে।

গল্পটি শুনে তোমরা হয়তো বলবে, 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!' কিন্তু এ গল্পের 'মর‍্যাল' হচ্ছে ভূত নেই বললেই ভয় যায় না! আমার অবস্থায় পড়লে তোমরা কী করতে, সেইটে একবার ভেবে দ্যাখো।

অট্টহাসক

সুখে ছিলুম উত্তর-বাংলায়। কিন্তু উত্তর-বাংলা হঠাৎ পরিণত হল পাকিস্তানে। সে আস্তানা ত্যাগ করতে বাধ্য হলুম।

এলুম কলকাতায়। কিন্তু ভারতের রাজধানী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েও ভারতের সর্বপ্রধান নগরী বলে কীর্তিত কলকাতায় মাথা গোঁজবার জন্যে একটিমাত্র খালি গর্ত পর্যন্ত খুঁজে পেলুম না। অবশেষে—হ্যাঁ, বহু তন্বেষণা ও পদচালনার পর অবশেষে—হাওড়ার শেষ প্রান্তে ভাড়া পাওয়া গেল একখানা ছোট্ট, সেকেলে, নড়বড়ে বাড়ি।

বাড়ি তো ভারী! বুড়ো বাড়ি, বয়স তার ষাট-সত্তরের কম নয়। দোতলায় একখানা ঘর একটুখানি দালান। তিনখানা ঘর একতলায়। সব ঘরই ছোটো ছোটো। তিন-চার যুগের মধ্যে বাড়ির কোথাও যে রাজমিস্ত্রির হাত পড়েছে, এমন সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নেই। ভাঙা, রেলিংহীন সিঁড়ি, তার উপরে পদার্পণ করলে বুকও কাঁপে, সিঁড়িও কাঁপে। সর্বত্রই দেওয়ালের চুন-সুরকির প্রলেপ খসে পড়েছে কিংবা খসে পড়ি পড়ি করছে। কোনও কোনও জানালার গরাদ ভাঙা। একতালার রোয়াকে যে এক সময়ে সিমেন্টের আবরণ ছিল, তার কিছু কিছু পরিচয় আজও পাওয়া যায়। মেটে উঠান, বর্ষাকালে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাদায় বসে যায়।

কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে বাড়ির পশ্চিম দিকে জমিটা। সেখানে আছে পানায় ভরতি ডোবার মতো একটা ছোটো পুকুর আর বেশ বড়ো বড়ো একটা জঙ্গল, তাকে নিবিড় অরণ্য বলা চলে। সেখানে রোজ রাত্রে নিয়মিতভাবে কণ্ঠসাধনা করতে আসে শৃগালরা। সেখানে যখন তখন আনাগোনা করে নানা জাতের সাপ ও সরীসৃপরা, তাদের কেউ কেউ বাড়ির ভিতরেও তদারক করতে আসে মাঝে মাঝে।

প্রথম যেদিন এখানে পদার্পণ করি, বাড়ি দেখেই গৃহিণী কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'ও মাগো এ বাড়িতে আমি থাকতে পারব না।'

আমি বললুম, 'থাকতে পারবে না কী সরলা, থাকতেই হবে। ভারত অঙ্গহীন হয়েছে বটে, আমরা বাস্তুহারা হয়েছি বটে, কিন্তু গান্ধিজি-নেহরু-প্যাটেলের কৃপায় আমরা যে এখন স্বাধীনতা পেয়েছি। সেই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হবে না?'

॥ দুই ॥

পরিবারের মধ্যে কেবল আমি, সরলা, কুত্তা টুনি ও বিল্লী মেনি। আমরা নিঃসন্তান, তাই শেষোক্ত দুটি চতুষ্পদের সাহায্যে সরলা তার মাতৃহৃদয়ের অভাব কতটা পূরণ করবার চেষ্টা করত।

আমরা এখানে এসেছিলুম বর্ষার শেষে। একটু বেশি জোরে বৃষ্টি হলেই দোতলার ঘরের

ছাদ দিয়ে ঝরত অনর্গল জল। দিনের বেলায় একতালার ঘরে এসে আত্মরক্ষা করতুম, কিন্তু রাত্রে সরলা কিছুতেই একতলায় নামতে রাজি হত না।

বলত, 'পাড়ার লোকের মুখে শুনেছি এখানা হানাবাড়ি। রাত্রে আমি নীচেয় নামতে পারব না।'

আমি বলতুম, 'গিন্নি, পাড়ার লোকরা ভ্রান্ত। ভূতেরা নির্বোধ নয়, হানা দেবার জন্যে তারা এমন একখানা যাচ্ছেতাই বাড়ি নির্বাচন করবে না।'

কিন্তু সরলা তবু নীচে নামবার নামও মুখে আনত না।

টুনি আর মেনি বৃষ্টি-সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিল খুব সহজেই। রাত্রে ছাদ ফুঁড়ে ধারাপাত হলেই তারা খাটের তলায় গিয়ে ঢুকতে একটুও দেরি করত না। খাটের বিছানা ভিজলেও তাদের দেহ ভিজত না। শেষটা আমরাও তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হতুম। সারমেয়-মার্জারের কাছেও মনুবংশীয়রা জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

বর্ষা কাটল, শীত এল, আমরাও অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

কিন্তু তারপর থেকে ঘটতে লাগল সব ভয়াবহ ঘটনা। সত্যই কি এখানা হানাবাড়ি?

॥ তিন ॥

একদিন সন্ধ্যার পর টুনি চাঁদের আলোয় বাগানে বেড়াতে গিয়েছে। শোনায় ভালো বলে জঙ্গলের নাম দিয়েছিলুম আমরা 'বাগান'।

টুনি অবশ্য চন্দ্রকিরণ উপভোগ করবার জন্যে বাগানে বেড়াতে যায়নি। ওখানে সে যেত ভেক শিকার করতে। হাওড়া অঞ্চলে ভেক শিকারে সে ছিল অদ্বিতীয়।

কিন্তু সেদিন টুনি বাগানে গিয়ে হঠাৎ আর্তস্বরে প্রাণপণে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর সব চুপচাপ। একটা লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে বাগানে ছুটে গেলুম। কিন্তু টুনির কোনও চিহ্নই আর আবিষ্কার করতে পারলুম না। তারপর সে আর ফিরে আসেনি। সরলা কেঁদে কেঁদে অস্থির।

মেনি শিকার করত বাড়ির ভিতরেই। সে ছিল ইঁদুর ও আরশোলা মারতে ওস্তাদ। কিন্তু সে-ও রাত্রে উদ্যান-ভ্রমণ করতে ভালোবাসত। বোধহয় সে উদ্যানবিহারী অন্যান্য বিড়ালদের সঙ্গে আলাপ করতে যেত। কিন্তু একদিন রাত্রে সে-ও বাগানে গিয়ে বিকট চিৎকার করে কেঁদে উঠে একেবারে নিখোঁজ হল।

ব্যাপার ক্রমেই আরও সঙিন হয়ে উঠল। রাত্রি হলেই বাড়ির একতলায় কারা যেন আনাগোনা করে, এটা-ওটা-সেটা নিয়ে টানাটানি করে। শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি, সরলার নিষেধ না মেনেই নীচে নেমে যাই, কিন্তু জনপ্রাণীকেও দেখতে পাই না।

রান্নাঘরে খাবার থাকলেই কে খেয়ে যায়। ধরলুম ভাঙা জানালা দিয়ে বাড়ির ভিতরে চোর আসে। কিন্তু সে বাসন-কোসন চুরি না করে কেবল খাবার খেয়েই খুশি হয়ে সরে পড়ে কেন?

তারপর এক গভীর রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, বিছানার এক কোণে দুই হাতে দুই কান চেপে সরলা সভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

—'ব্যাপার কী সরলা? কী হয়েছে, তুমি অমন কাঁপছ কেন?'

শিউরোতে শিউরোতে সরলা বললে, 'বাগান থেকে কে হেসে হেসে উঠছে।'

তার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই শুনলুম, বাড়ির পশ্চিম দিকের জঙ্গলের ভিতরে উঠল হা হা হা হা হা হা অট্টহাস্যের ধ্বনি। তেমন ভয়ঙ্কর অট্টহাসি আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। সরলা তো ভীরু নারী মাত্র, সে হাসি শুনে আমারও সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ও কে হাসে? কোনও পাগল-টাগল? কিন্তু পাগলও তো মানুষ, আর ও হাসি যে একেবারেই অমানুষিক। ও অট্টহাসির মধ্যে রয়েছে যেন একটা অপার্থিব, অমঙ্গলকর, বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা। কোনও পাগলই অমন করে হাসতে পারে না।

সরলা সাশ্রুনেত্রে বললে, 'ওগো, এখনও কি তুমি বিশ্বাস করবে না? এখানে ভূত আছে। কালকেই এখান থেকে পালাই চলো।'

আমি বললুম, 'না। কাল সকালে উঠে আগে আমি একটা বন্দুক কিনে আনব। শেষ পর্যন্ত না দেখে কাপুরুষের মতো বাড়ি ছেড়ে পালাব না।'

॥ চার ॥

পরের দিন রাত্রেও আবার সেই ভীষণ হাস্যধ্বনি শুনলুম বটে, কিন্তু অনেক দূর থেকে।

বন্দুক হাতে নিয়ে দোতলার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, কিন্তু হাস্যধ্বনি আর কাছে এগিয়ে এল না। নৈশ আকাশকে বিষাক্ত করে তুলে হাসি থামল এবং তার পরিবর্তে জেগে উঠল পথের কুকুরদের ভীত আর্তধ্বনি।

আর একটা বিষয় লক্ষ করছি। আজ কয়দিন ধরে পশ্চিমের জঙ্গলে শৃগাল-সভায় কোলাহল শোনা যাচ্ছে না। কোনও অজ্ঞাত বিভীষণ নিশাচরকে দেখে তারা এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে?

পরদিন আমাদের বাগানের পুকুরের কাছেই উঠল আবার সেই ভৈরব অট্টহাস্যধ্বনি! সে যেন খালি হাসিও নয়, কাশিও বটে। কে যেন একসঙ্গেই বিকট স্বরে কাশছে আর হাসছে, কাশছে আর হাসছে। কী তীব্র ধ্বনি, খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল যেন রাত্রির নিস্তব্ধতা।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, হাতে বন্দুক প্রস্তুত।

পাণ্ডু চাঁদ, ছায়ামাখা আলো। হাস্যধ্বনি মৌন। পুকুর-পাড়ের একটা ঝোপ নড়ছে। তারপর দেখা গেল দুটো আগুনের গুলি। কে যেন ঝোপের ভিতরে বসে বসে আমাকে নিরীক্ষণ করছে জ্বলন্ত চক্ষে।

সেই অগ্নিময় হিংসুক চোখদুটোর মাঝখান লক্ষ করে টিপলুম আমার বন্দুকের ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল দীপ্ত চোখদুটো।

পরের দিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের ভিতরে ছুটে গেলুম। পুকুরপাড়ের সেই ঝোপের কাছে গিয়ে দেখি, একটা মস্তবড়ো হায়না সেখানে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে।

চমৎকৃত হলুম, প্রথমটা নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলুম না হায়নার হাসি বিশ্রী অট্টহাসির মতো বটে, কিন্তু হাওড়া শহরে হায়না! এও কি সম্ভবপর?

দু-দিন পরেই এ রহস্যেরও কিনারা হল। খবর পাওয়া গেল, হাওড়ার ময়দানে একটা সার্কাসের দল এসেছে, কয়েক দিন আগেই তার পশুগৃহ থেকে একটা হায়না কেমন করে পালিয়ে গিয়েছিল।

টেলিফোন

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং!...

ঝট করে ভেঙে গেল ঘুম। টেলিফোনের ঘণ্টা!

—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা চিৎকার করছে ঢং, ঢং, ঢং, ঢং,...

একে একে গুনলুম রাত বারোটা—তন্দ্রাকাতর চোখ না খুলেই।

আরও দুটো শব্দ এল কানে—গড় গড় গড় গড় বজ্রের গর্জন এবং ঝুপ ঝুপ ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির পতন!

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং...

নিজের ডাক্তারি জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে ধড়মড় করে উঠে বসলুম বিছানার উপরে। এই সলিলাক্ত দুপুর রাত্রি, নিশ্চয় কোনও রোগী—

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং...

বিছানা ছেড়ে নেমে 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে সাড়া দিলুম—'হ্যালো!'

—'ডাক্তার?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার! শিগগির আসুন, শিগগির!'

—'কোথায়?'

—'আমার বাসায়। সাত নম্বর সাতকড়ি সেন স্ট্রিট।'

—'অসুখটা কী?'

—'আমি এখনই মারা যাব! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আমি আর কথা কইতে পারছি না! শিগগির এসো, শিগগির! ডাক্তার!'

আর কোনও সাড়া নেই! রিসিভারটা রেখে দিয়ে কী করব ভাবতে লাগলুম। জানালার উপরে শোনা গেল দমকা ঝোড়ো বাতাসের করাঘাত। কিন্তু শেষটা যাওয়াই স্থির করলুম।

গাড়ির ভিতর থেকেই 'টর্চে'র আলো ফেলে আবিষ্কার করলুম সাতকড়ি সেন স্ট্রিটের সাত নম্বরকে।

একখানি পুরানো ছোটোখাটো দোতলা বাড়ি। প্রত্যেক জানালা—এমন কি সদর দরজা পর্যন্ত ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা-জানালার ফাঁক-ফোক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না একটিমাত্র আলোকরেখাও।

এত রাত্রে ড্রাইভারের ঘুম ভাঙাইনি, নিজেই এসেছি গাড়ি চালিয়ে। ব্যাগটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামলুম—

রাস্তায় গিয়ে নামলুম? একি রাস্তা, না বেগবতী স্রোতস্বতী? কল কল করে ছুটন্ত জল ধাক্কা মারছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত উঠে। যেদিকে তাকাই, চিহ্ন নেই জনপ্রাণীর—এ যেন মানুষের পৃথিবীই নয়। কেবল মানুষ কেন, পথচারী কুকুর-বিড়াল এবং রাত্রির পেচক-বাদুড়রাও যেন আজকে এই পৃথিবী ছেড়ে পলায়ন করেছে কোথায়, কেউ জানে না। কেবল

দীপ্তনেত্র গ্যাস-পোস্টগুলো পায়ের তলায় নিজেদের অভাবিত প্রতিবিম্ব দেখে দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভিতের মতো।

হু হু হু হু! কী কনকনে ভিজে বাতাস! ঝম ঝম ঝম ঝম! ও বৃষ্টি, না নৈশ প্রেতিনীদের পায়ের মলের শব্দ?

শীতে কাঁপতে কাঁপতে সাত নম্বর বাড়ির কাছে গিয়ে সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলুম সজোরে!

হঠাৎ খুলে গেল দরজাটা। বাড়ির ভিতরটাও অন্ধকার। কে দরজা খুললে দেখবার জন্যে 'টর্চ' ব্যবহার করলুম, কিন্তু কারুকেই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

ভাবলুম, বোধহয় কোনও অন্তঃপুরিকা এসে দরজা খুলে দিয়েই তাড়াতাড়ি আবার ভিতরে চলে গিয়েছেন।

কিন্তু কী মুশকিল, এরা ডাক্তারকে ডাক দিয়েছে অথচ বাড়ির ভিতরে একটা লণ্ঠন পর্যন্ত জ্বেলে রাখেনি।

অন্ধকারেই বাড়ির ভিতরে দুই-চার পা এগিয়ে গলা তুলে বিরক্তভাবে বললুম, 'মানুষের চোখ অন্ধকারে চলে না। একটা আলো দেখাবার ব্যবস্থা করুন।'

অত্যন্ত গম্ভীর এবং অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে কে বললে, 'আলো নেই। আলো দেখাবার লোকও নেই। 'টর্চ' জ্বেলে এগিয়ে আসুন। ডানদিকেই সিঁড়ি। দোতলায় উঠে বাঁ-দিকের প্রথম ঘরেই রোগীকে দেখতে পাবেন।'

কে কথা কইছে? কোথা থেকে কথা কইছে? চারিদিকে 'টর্চে'র আলো ফেলতে লাগলুম—সামনে দেখা গেল কেবল একটা সরু পথ—তার উপরে ছাদ, দুই পাশে দুই দেওয়াল। কোথাও মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই। যে কথা কইলে সে নিশ্চয় আমাকে দেখতে পেয়েছে, নইলে আমার 'টর্চে'র উল্লেখ করত না। কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

—'ডাক্তার, ডাক্তার! নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? উপরে এসো—উপরে এসো!' অপার্থিব কণ্ঠস্বর—আসছে যেন খুব কাছ থেকে, আসছে যেন বহু দূর থেকে!

বুকের কাছটা করতে লাগল ছমছম ছমছম! সদর দরজাকে সশব্দে নাড়া দিয়ে আচম্বিতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল বৃষ্টির কাদাজল-মাখানো খানিকটা দমকা হাওয়া।

আমি আর দাঁড়ালুম না। নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললুম। ডানদিকের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে লাগলুম এবং উঠতে উঠতে সবিস্ময়ে লক্ষ করলুম সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে জমে রয়েছে প্রায় আধ-ইঞ্চি পুরু ধুলো। সেই ধুলোর উপরে নেই একটিমাত্র পদচিহ্ন। যেন বহুকালের মধ্যে এই সিঁড়ির উপর দিয়ে কোনও মানুষই ওঠা-নামা করেনি!

আর একটা ব্যাপার অনুভব করলুম। আমার চারিদিক ঘিরে যেন কোনও মৃত বা জীবন্ত অদৃশ্য বিভীষিকার ধারণাতীত উপস্থিতি! যেন আমার প্রত্যেক পদক্ষেপ লক্ষ করছে তার জাগ্রত চক্ষুহীন দৃষ্টি!

থেকে থেকে আমার গা এমন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল যে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবতে লাগলুম, অতঃপর এই অস্বাভাবিক বাড়ি ত্যাগ করে আবার বাইরে বেরিয়ে যাওয়া উচিত কি না?

আবার কে যেন ব্যঙ্গের স্বরেই বললে, 'ডাক্তার, কত মড়ার হাড় নেড়েচেড়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছ, কত পচা-গলা মড়ার দেহ কেটে কেটে ডাক্তারি পাস করেছ, তবু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

মনের ভাব লুকোবার জন্যে জোর করে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমি ভয় পাইনি।'

—'কিন্তু তুমি কাঁপছ!'

—'ঠান্ডা হাওয়ায় আমার শীত করছে।'

কানে এল একটা শুকনো ও চাপা বিশ্রী হাসির আওয়াজ।

দারুণ ক্রোধে জেগে উঠল আমার পুরুষত্ব। বেশ চেঁচিয়েই বললুম, 'কারুর হাসি শোনবার জন্যে আমি এখানে আসিনি, আমি এসেছি রোগী দেখতে।'

বাঁ-পাশের ঘরের ভিতর থেকে শোনা গেল, 'উত্তম। ভিতরে এসো দরজা খুলে।'

দরজায় ধাক্কা মারলুম, খুলল না।

—'দেখতে পাচ্ছ না, দরজায় বাহির থেকে শিকল-তোলা আছে?'

তাই বটে। শিকল নামিয়ে ঠেলা মেরে দরজা খুলতেই ভিতর থেকে বেগে বেরিয়ে এল যেন হিমালয়ের তুষার মাখানো বাতাসের একটা ঝটকা! ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আবার পিছিয়ে এলুম।

সেই ভয়াবহ কণ্ঠ ততোধিক ভয়াবহ যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বললে, 'এসো এসো, আর দেরি কোরো না! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—আমি আর কথা কইতে পারছি না—ডাক্তার, ডাক্তার!'

নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। নাকে লাগল গলিত শবের দুর্গন্ধ। সেটা আমলে না এনে 'টর্চ' জ্বালবার উপক্রম করতেই কে বললে, 'আলো জ্বেলো না ডাক্তার, আলো জ্বেলো না!'

—'কেন?'

—'আতঙ্কে আঁতকে উঠবে, মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে!'

এখানে কোনও পাগল কি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে কথা কইছে? না কেউ আমার সঙ্গে 'প্রাক্টিকাল জোক' করতে চায়? অধীরকণ্ঠে বললুম, 'কী আশ্চর্য, আলো না জ্বাললে আমি রোগীকে পরীক্ষা করব কেমন করে?'

—'তবে জ্বালো আলো!'

জ্বাললুম।

ময়লা চাদরে মোড়া বিছানার উপরে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে রয়েছে একটা সুদীর্ঘ দেহ। দেখলে বোঝা যায় সেটা অনেক দিনের পুরাতন মৃতদেহ—অথচ পচে বা গলে যায়নি! কিন্তু কী ভীষণ তার মুখমণ্ডল! ভুরু দুটো উঠে গিয়েছে কপালের অনেকটা উপরে এবং দুই কোটরের মধ্যে চক্ষু দুটো যে কত নীচে তলিয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাওয়া যায় না! এমনভাবে সে মুখ্যব্যাদান করে আছে যে দেখলেই বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে! এবং সবচেয়ে

ভয়ানক দৃশ্য হচ্ছে, তার মুখগহ্বরের ভিতর থেকে কিলবিল করতে করতে বেরিয়ে আসছে সার বেধে পোকার পর পোকা!

স্তম্ভিত নেত্রে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। হে ভগবান, এই কি আমার রোগী?

—'ডাক্তার, ডাক্তার! এ যমযন্ত্রণা আর সইতে পারছি না যে! শিগগির এসো—দেখতে পাচ্ছ না, আমাকে আক্রমণ করেছে দলে দলে নরকের কীট? এই পোকাগুলোকে তাড়িয়ে দাও, এই পোকাগুলোকে তাড়িয়ে দাও—উঃ!'

বেশ বুঝতে পারলুম, সেই রোমাঞ্চকর অমানুষিক কণ্ঠস্বরটা বেরিয়ে আসছে ওই হাঁ করা মুখ-বিবরের ভিতর থেকেই! এবং তারও চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, মুখের ভিতর থেকেই কণ্ঠস্বর নির্গত হচ্ছে বটে, কিন্তু একটুও নড়ছে না মূর্তির ওষ্ঠাধর!

স্তম্ভিত ভাবের ভিতর দিয়ে কেটে যেতে লাগল মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

তারপর চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম, মৃতদেহটা টলমল করতে করতে উঠে বসছে আস্তে, আস্তে, আস্তে! কিন্তু তার উঠে বসবার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, যে যেন নিজে উঠে বসছে না, কেউ যেন তাকে ধরে ধরে তুলে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে—তার মাথাটা পড়েছে কাঁধের উপর লুটিয়ে আর তার হাত দুটো করছে ঝল ঝল ঝল ঝল। কিন্তু যে তাকে তুলে বসাতে চায়—সে কোথায়, সে কোথায়? সে যে একেবারেই অদৃশ্য!

আচম্বিতে মৃতদেহটার কাঁধের উপরে লটকে পড়া মুণ্ডটা ধীরে ধীরে সিধে হয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরেই আমার দিকে এবং তার দৃষ্টিহীন চক্ষু কোটরের অনেক তলা থেকে চক চক করতে লাগল যেন দুটো রাঙা আগুনের ফিনকি!

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহে কেটে গেল আমার সমস্ত আচ্ছন্নভাব! এক লাফে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে ক্রমে উঠি কি পড়ি এমনি ভাবে সশব্দে নেমে এলুম নীচের দিকে—

—এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পিছনে ছুটে এল সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর—'ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার!'

দিন তিনেক পরে সাহস সঞ্চয় করে এক সকালে কৌতূহলী মনে আবার হাজির হলুম সাত নম্বর সাতকড়ি সেন স্ট্রিটে।

দেখলুম বাড়ির সদর দরজায় তালা দেওয়া এবং বাড়ির দেওয়ালে ঝুলছে ভাড়াপত্র: 'এই বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাইবে।'

অবাক হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে পিছন থেকে শুনলুম, 'ডাক্তারবাবু এখানে কেন?'

ফিরে দেখি আমারই পরিচিত লোক, এই অঞ্চলেই তাঁর বাসা। বললুম, 'দিন-তিনেক আগে এই বাড়িতে এক রোগী দেখতে এসেছিলুম। কিন্তু আজ দেখছি সদরে তালা দেওয়া।

তিনি বললেন, 'ডাক্তারবাবু, বাড়ি ভুল করেছেন। এ বাড়ি আজ এক বৎসর ধরে খালি পড়ে আছে। বাড়িখানার ভারী বদনাম, কেউ নিতে চায় না।'

আসল কথা চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ বাড়ি শেষ ভাড়াটে কে?'

—'ভুবনেশ্বরবাবু।'

—'তিনি এখন কোথায়?'

—'পরলোকে।'

—'এই বাড়িতেই তিনি মারা যান?'

—'হ্যাঁ। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় হঠাৎ তিনি মারা পড়েন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না, পাড়ার লোকেরাই উদ্যোগী হয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করে।'

কিন্তু পরলোকেও কি টেলিফোন-যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে?

কারণ ভুবনেশ্বরবাবু তারপরেও বারকয়েক আমার সঙ্গে সংযোগস্থাপন করেছিলেন।

প্রতি শনিবারেই রাত-বারোটায় ফোনের ঘণ্টা বেজে ওঠে, আর সেই ভয়ানক কণ্ঠস্বরে শুনি 'ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার! শিগগির এসো, শিগগির!'

ভুবনেশ্বরবাবু আজও আমাকে ডাকাডাকি করেন কি না জানি না, কারণ এখন শনিবার রাত্রে টেলিফোনের ডাকে আমি আর সাড়া দিই না।

নবাবগঞ্জের সমাধি

হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলুম হাজারিবাগে।

হাওয়া নিশ্চয়ই বদলাল, মন কিন্তু বদলাল না। বাসা পেয়েছিলুম শহরের ভিতরে। সেখানে কিছু কিছু গাছপালা থাকলে কী হয়, সেই ধুলো ভরা রাজপথের পর রাজপথ, দুইধারে বাড়ির পর বাড়ি, আপিস-আদালত, হাট-বাজার, পানের দোকান, মোটর-বাস, রিকশা, লোকের ভিড়, হট্টগোল। যেন কলকাতার ক্ষুদ্র সংস্করণ! কাজের খাতিরে সব করা যায়, কিন্তু শখ করে এক শহর ছেড়ে আর এক শহরে আসার মানে হয় না।

বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র হাজারিবাগের ভক্ত। এখানে আগেও বারদুয়েক ঢুঁ মেরে গিয়েছে। বললে, 'মা ভৈঃ! এখনই হাল ছাড়বার দরকার নেই। বৈকালে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ো।'

'ধুলো ভক্ষণের জন্যে?'

—'উঁহু।'

—'তবে?'

—'সত্যিকার হাজারিবাগ দেখবার জন্যে।'

—'দশ-বারো বাইল পথ হাঁটলে অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে জানি। কিন্তু আমি অতখানি কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নই।'

—'মাইল তিন হাঁটতে পারবে?'

—'খুব পারব। সে তো কলকাতার এপাড়া ওপাড়া!'

—'তবে প্রস্তুত থেকো। আমি ঠিক সময়ে আসব।'

বৈকালে বিপিনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। সে মিথ্যা বলেনি। মাইল খানেক অগ্রসর হবার পরেই দৃশ্য পরিবর্তন আরম্ভ হল। তারপর যত এগুই তত বেশি মুগ্ধ হয়ে যাই।

আরও কিছুদূর পদ-চালনা করে দাঁড়িয়ে পড়ে বিপিন প্রশ্ন করলে, 'এখন কেমন লাগছে?'

—'চমৎকার! অপূর্ব!'

অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। দিকে দিকে নতোন্নত প্রান্তর, তার উপর দিয়ে কোথায় হারিয়ে যায় বিহ্বল দৃষ্টি। মাঝে মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে অরণ্যের শ্যামল ছন্দ। কল্পনার রহস্যবিচিত্র দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়। অনাদৃত নীলাকাশের সমগ্রতা এসে প্রবেশ করে দুই নয়নের অন্তঃপুরে। যেন ছবির জগৎ।

একখানা বড়ো পাথরের উপরে বসে পড়ে বললুম, 'হ্যাঁ, এই হচ্ছে সত্যিকার হাজারিবাগ! আজ প্রতিপদ। অন্ধকারের ভয় নেই, এইখানে কিছুক্ষণ বসে থাকলে ক্ষতি হবে না।'

—'ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।'

—'মানে?'

—'এটা হচ্ছে আষাঢ় মাস। আকাশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

তাকিয়ে দেখলুম। আকাশের এক প্রান্ত জুড়ে দেখা যাচ্ছে কাজলকালো মেঘ।

বিপিন বললে, 'কালো মেঘ। ওর সাথী বোধ হয় ঝড়।'

—'মেঘ তো এখনও অনেক দূরে!'

'আমাদের বাসাও তো পাশে নয়। আর একদিন এখানে এলে চলবে। আজ উঠে পড়ো।'

বিপিনের অনুমান ঠিক। খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমরা যখন শহরের প্রান্তে এসে পড়লুম, প্রায় গোটা আকাশই তখন মেঘাচ্ছন্ন এবং গাছে গাছে ঝোড়ো হাওয়ার একটানা চিৎকার। গায়ে পড়ল জলের কয়েকটা বড়ো বড়ো ফোঁটা। বাসা তখনও বেশ-খানিকটা দূরে।

কিন্তু বৃষ্টিকে বোধ হয় ফাঁকি দিতে পারব না—জলের ফোঁটা বেড়ে উঠল।

হঠাৎ মোড় ফিরে একটা গলির ভিতরে ঢুকে বিপিন ছুটতে ছুটতে বললে, 'এদিকে এসো।'

একটা প্রশস্ত, জীর্ণ দ্বারপথের পর খানিকটা জঙ্গলময় জমি। আলো-আঁধারের মধ্যে দেখা গেল, চারিদিকে কতকগুলো দোদুল্যমান বড়ো বড়ো গাছ এবং তাদেরই মাঝখানে সার-গাঁথা খিলানওয়ালা বাড়ি এবং তারই উপরে মস্ত একটা সুডৌল গম্বুজ।

ভাঙা সিঁড়ির ধাপ। একটা খিলানের তলা দিয়ে দালানে গিয়ে উঠলুম।

শুধালুম, 'কী এটা? মসজিদ নাকি? শেষটা বিপদে পড়ব না তো?'

—'ভয় নেই। এ হচ্ছে নবাবগঞ্জের সমাধি-ভবন। কার সমাধি জানি না, কিন্তু এখানে কেউ থাকে না।'

কৌতূহলী হয়ে টর্চের এবং তখনও যেটুকু দিনের আলোর আভাস ছিল তার সাহায্যে দেখলুম, এ হচ্ছে বহুকালের প্রাচীন সমাধিপুরী। মলিন দেওয়ালগুলো যত্নের অভাবে কালের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হলেও এখনও এখানে-ওখানে রয়েছে সূক্ষ্ম ও সুন্দর নকশার চিহ্ন। প্রচুর অর্থব্যয় করে সব দিকের মাপজোক ও ছন্দ বজায় রেখে শ্রেষ্ঠ কারিকর দিয়ে যে এই সমাধি মন্দির গড়ানো হয়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আর এ সমাধি যে কোনও নবাব বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির, তাও আন্দাজ করা কঠিন নয়।

দালানের পরে দেওয়ালের গায়ে একটা কুলুপ দেওয়া দরজা—মূল সমাধি কক্ষের ভিতরে যাবার পথ। চারিধারে বোধকরি জাফরি-কাটা শ্বেতপাথরেরই পর্দা বা জানালা। পর্দায় জাফরির ছিদ্রগুলো কে বা কারা কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে—যেন বাইরের কৌতূহলী চক্ষুকে বাধা দেবার জন্যেই।

কোনও কোনও পর্দার উপর থেকে কাদামাটির প্রলেপ আবার খসে পড়েছে। একটা পর্দার ছিদ্রের উপরে টর্চ রেখে ভিতরে দৃষ্টিচালনা করলুম। ভালো করে দেখতে না পেলেও খানিকটা আন্দাজ করতে পারলুম।

মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে কক্ষতলে একটি সমাধি-বেদি। বাকি সবটা জুড়ে শূন্যতা যেন থমথম করছে। কেবল এখানে-ওখানে নীচে অন্ধকার ফুঁড়ে কতকগুলো আলোর ফিনকি জ্বলছে আর নিবছে! ঠিক যেন জোনাকি। পর্দার ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে কতকগুলো জোনাকি কি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে?

সেই মৃত্যুপুরীর অন্ধকারে জীবনের এই দীপ্তি অস্বাভাবিক বলে মনে হল।

বাইরে আকাশ যেন বলছে, ভেঙে পড়ি!

দিনান্তের শেষ আলোটুকু করেছে নিবিড় তিমিরের কোলে আত্মসমর্পণ। থেকে থেকে জেগে উঠছে কেবল লকলকে বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ী জ্যোতির্ময় জিহ্বা এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ বজ্রের জগৎ-জাগানো যুদ্ধ-ধ্রুপদ। হু-হু-হু-হু ঝড়ের প্রচণ্ড তাড়নায় সমাধি ভবনের আশপাশকার মস্ত মস্ত পুরানো গাছগুলো ঠিক যেন উন্মত্ত অতিকায় জীবের মতো ছটফট করতে করতে কোলাহল করছে, ভয়াবহ কোলাহল!

আর ঝরছে হুড়হুড় করে অবিশ্রান্ত জল ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম—সৃষ্টি ভাসাতে চায় যেন প্রলয়-প্লাবনে। এমন বিষম বৃষ্টি জীবনে দেখিনি—এ হচ্ছে একেবারে অভাবিত!

এক ঘণ্টা কেটে গেল, দু-ঘণ্টা যায় যায়। তবু বৃষ্টি থামল না, তার জোরও কমল না। শব্দ শুনেই বুঝলুম, নীচেকার জমি ডুবিয়ে কল-কল করে ছুটছে যেন বন্যার প্রবাহ! বড়ো রাস্তা খুব কাছেই। কিন্তু সেখানে মানুষের একটুও সাড়া নেই। কিংবা আমরা যেন মানুষের পৃথিবীর বাইরে এসে পড়েছি!

দুজনে দুই খিলানের মাঝখানকার দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসেছি, তবু কনকনে দমকা বাতাসের সঙ্গে বরফের মতো ঠান্ডা জলের ঝাপটা এসে হাড়ের ভিতরটা পর্যন্ত অসাড় করে দিচ্ছে।

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'বিপিন, এমন করে আর কতক্ষণ কাটবে?'

কোনও সাড়া পেলুম না। বিপিন ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? জোরে ডাকলুম, 'বিপিন!'

—'উঁ?'

—'রাস্তা এখন নদী। বাড়ি যাবে কেমন করে?'

—'হুঁ।'

—'হুঁ কী হে? যা বলছি শুনছ?'

—'আমি এখন কিছুই শুনছি না। আমি এখন ভাবছি।'

—'ভাবছ? কী ভাবছ?'

—'জাফরি কাটা পর্দার ফাঁকগুলো কাদামাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে কেন?'

—'এই নিয়ে আবার ভাবনা কীসের? এর তো সোজা উত্তর হচ্ছে, বাইরের লোকের ঘরের ভিতরে তাকানো নিষেধ।'

বিপিন উত্তেজিত স্বরে বললে, 'কেন নিষেধ? আর কেই-বা নিষেধ করে? এ হচ্ছে পোড়ো সমাধি। এর মালিক নেই। আর থাকলেও নিষেধ করবে কেন? ঘরের ভিতরে আছে তো খালি একটা গোর। ভারতের কত দেশে কত বড়ো বড়ো নবাব-বাদশার গোর দেখে এসেছি, কোথাও কেউ নিষেধ করেনি, আর এই বেওয়ারিশ সমাধি-বাড়িতেই বা নিষেধ থাকবে কেন? ভেবে দ্যাখো, যখন এই জাফরিকাটা পর্দাগুলো বসানো হয়েছিল, তখন এই নিষেধ ছিল না, কিন্তু এখন—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কী পাগলের মতো বকছ?'

—'না, আমি পাগলের মতো বকছি না।'

—'তবে তুমি কী বলতে চাও?'

—'এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে।'

—'কী রহস্য?'

—'অপার্থিক রহস্য!'

—'বিপিন, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?'

—'মোটেই নয়।'

—'তবে তোমার কথার মানে কী?'

—'মানে-টানের কথা এখন রেখে দাও। কিন্তু এইমাত্র এখান দিয়ে কে চলে গেল!'

—'কেউ চলে যায়নি।'

—'আলবত গিয়েছে। অন্ধকারে তুমি দেখতে পাওনি।'

—'তুমি দেখলে কেমন করে?'

—'আমিও দেখিনি। আমি পায়ের শব্দ শুনেছি।'

—'পায়ের শব্দ আমিও শুনতে পেলুম না কেন?'

—'তুমি অন্যমনস্ক ছিলে।'

—'যাও যাও, বাজে বোকো না।'

বিপিন তার টর্চটা জ্বেলে দালানের মেঝের উপরে উপুড় করে ধরলে। প্রায় এক ইঞ্চি পুরু ধুলোর উপরে রয়েছে একটা পদচিহ্ন।

বিপিন বললে, 'দ্যাখো'।

আমি হেসে উঠে বললুম, 'দেখব আবার কী? তুমি নিজেই বলছ এটা বেওয়ারিশ বাড়ি। বাইরের কত লোক এখানে আনাগোনা করে, কে তার হিসাব রাখে? আমরা আসবার আগেই ওই পদচিহ্নটা যে ওখানে ছিল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

বিপিন মাথা নেড়ে বললে, 'না, না, এ হচ্ছে একেবারে টাটকা পায়ের দাগ। ওই দ্যাখো একটা একটা করে আরও কতগুলো পায়ের দাগ সোজা চলে গিয়েছে। সব দাগ টাটকা। আরও কোনও কোনও বিশেষত্ব লক্ষ করেছ কি?'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'মাপ করো ভাই, আমি তোমার মতো পদচিহ্ন বিশারদ নই, কোনও বিশেষত্বই লক্ষ করিনি।'

বিপিন নিজের মনেই বলে চলল, 'প্রত্যেকটাই হচ্ছে ডান পায়ের দাগ। মানুষ তো এক পায়ে হাঁটে না! কিন্তু এখানে বাঁ পায়ের দাগ একটাও নেই। এ থেকে কী বুঝতে হবে? যে এখান দিয়ে গিয়েছে তার পা আছে একটিমাত্র! কিন্তু এই একঠেঙো লোকটা কেনই বা এখানে এসেছিল, আর গেলই বা কোথায়? আর কেই বা সে? মানুষ? না আর কিছু?'

বিপিনটা বলে কী? তার কল্পনাশক্তি যে এতটা প্রবল, আগে তা জানতুম না।

আচম্বিতে খুব জোরে একটা শব্দ হল। কে যেন কোথায় সবলে একটা দরজার উপরে ধাক্কা মারলে!

বিপিন আঁতকে উঠে বললে, 'ওই শোনো! কে ভিতরকার ঘরের দরজা খুলছে!'

ঝড়ের গর্জন কমেছে বটে, কিন্তু বড়ো বড়ো গাছগুলোর পাতায় পাতায় তখনও শোনা যাচ্ছে তার শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস। ঝুপঝুপ ঝুপঝুপ করে তখনও ঝরছে বৃষ্টি এবং গড়গড় গড়গড় করে বাজ তখনও ধমক দিচ্ছে মেঘলোকের কোনও অদৃশ্য শত্রুকে।

জাফরি-কাটা পাথুরে পর্দার ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল সন্দেহজনক আলোর চঞ্চলতা!

ও আবার কী? বিস্মিত হয়ে উঠলুম। পর্দার ছিদ্রে চক্ষু সংলগ্ন করে দেখলুম, ঘরের ভিতরে অসম্ভব রকম বেড়ে উঠেছে জোনাকির ঝাঁক! পুঞ্জে পুঞ্জে তারা ঘুরছে ফিরছে উঠছে নামছে—সারা ঘরখানা জুড়ে চলেছে আশ্চর্য এক আগুন-জ্বালানোর এবং আগুন-নেবানোর খেলা! জোনাকিরা সংখ্যায় কত হবে? হাজার হাজার? না তারও চেয়ে বেশি? এত জোনাকি বাহির ছেড়ে ভিতরে এসে জুটল কেন? ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে?

ওপাশের দালানে হঠাৎ আর একটা শব্দ শুনলুম—ধুপধুপ ধুপধুপ.....পদধ্বনি?

শব্দ হচ্ছে তালে তালে তালে। কিন্তু প্রত্যেক তালের দুই মাত্রার মধ্যে একটা করে মাত্রা যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে! দুই পা ফেলে চললে প্রত্যেক শব্দের মাঝখানে আর একটা করে শব্দ শোনা যেত! এ যেন কেউ এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে!

বিপিন প্রায় কান্না ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে আসে? ও কে আসে?'

ভয় বড়ো সংক্রামক। এতক্ষণ পরে আমারও বুক ঢিপ ঢিপ না করে পারলে না। কোনও একপদ লোকের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না—এই পোড়ো সমাধি-বাড়িতে, এই ভীষণ দুর্যোগের রাত্রে!

তড়াক করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিপিন উদভ্রান্ত স্বরে বললে, 'ওই সে আসছে—এদিকেই আসছে—আমাদের দিকেই আসছে!'

ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ.....

যে আসছে তাকে দেখতে কেমনধারা? তার চেহারা কি আমাদেরই মতো?

হঠাৎ দালানের ভিতরে উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি! উপরে নীচে ডাইনে বামে ঘুরে ঘুরে জ্বলে আর নিবে, জ্বলে আর নিবে উড়তে লাগল—যেন জীবন্ত অন্ধকারের হাজার হাজার চক্ষু একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে!

ধুপ ধুপ.....শব্দ খুব কাছে!

'বাবা গো!' বলে চিৎকার করে উঠেই বিপিন দালানের উপর থেকে বাইরের দিকে লাফ মারলে!

যেদিকে পদশব্দ হচ্ছিল সেইদিকের নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে সভয়ে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আমিও বিপিনের পন্থা অনুসরণ করলুম।

তখনও শান্ত হয়নি বৃষ্টিস্নাত কালো রাত্রি! তখনও মৌন হয়নি বজ্রের কণ্ঠ।

কেমন করে বাসায় ফিরলুম সে কথা না বলাই ভালো।

বৃষ্টি থেমেছে। মেঘ ভেদ করে রোদের একটি সোনালি রেখা এসে পড়েছে আমাদের সকালের চায়ের টেবিলে।

বললুম, 'বিপিন, কাল মিছেই আমরা ভয় পেয়েছিলুম।'

—'তাই নাকি? বেশ, পায়ের দাগ সম্বন্ধে তোমার মতই না হয় মানলুম। কিন্তু অমন সময়ে গোরস্থানের দরজা খুললে কে?'

—'দরজা কেউ খোলেনি, দরজার কেউ ধাক্কা মেরেছিল। হয়তো তোমার আমার মতোই কোনও অসহায় পথিক দুর্যোগের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ওখানে আশ্রয় নিতে এসেছিল। ধাক্কা মেরে দরজাটা বন্ধ দেখে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছিল।'

বিপিন ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'তারও কি একটা পা নেই।'

—'স্থান-কালের মহিমায় আমাদের মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। হয়তো কারুর হাতের মোটা লাঠির শব্দকেই আমরা পায়ের শব্দ বলে ভুল করেছিলুম।'

—'তাই যদি তোমার বিশ্বাস, তাহলে আজকের রাতটা তুমি আবার ওখানে গিয়ে কাটিয়ে আসতে পারো?'

—'পাগল? গোরস্থান কি জ্যান্ত ভদ্রলোকের রাত কাটাবার জায়গা?'

বিপিন ঠোঁট টিপে একটুখানি হাসলে, আর কিছু বললে না।

ভূত আর ভূতনাথ

সে-বছরে আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সবে কলেজি লেখাপড়া শুরু করেছি। আমি, অখিল ও ভূতনাথ।

সাঁওতাল পরগণায় অখিলদের একখানা ছোটো বাংলো ছিল। স্থির করলুম অখিলের সঙ্গে সেখানে গিয়ে গোটাকয়েক দিন আনন্দে কাটিয়ে আসব।

ভূতনাথ খবর পেয়ে আমার কাছে এসে শুধোলে, 'তোমরা নাকি বেড়াতে যাচ্ছ?'

—'খালি বেড়াতে নয়, ভ্রমণের সঙ্গে উদরপোষণ করতে।'

—'কলকাতা ছেড়ে সাঁওতাল পরগণায় গিয়ে উদরপোষণ! খাবে কী? পাথর, বালি, গাছের পাতা?'

—'উঁহু, ওখানে এখনও জলের দরে মুরগি পাওয়া যায়।'

এতক্ষণ ভূতনাথ ছিল উদাসীন। কিন্তু এইবারে তার আগ্রহ জাগ্রত হল। বললে, 'ও, তাই নাকি? প্রতিদিন প্রত্যেকের ভাগ্যে একটা করে রামপাখি জুটবে নাকি?'

—'অনায়াসে। দরকার হলে দুটো করেও জুটতে পারে।'

সে যে তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করে ফেলবে আমরা তা জানতুম। সে ছিল পয়লা নম্বরের উদরপিশাচ, তাই আমরা তার নাম দিয়েছিলুম 'পেটুক ভূতনাথ।' পরিপূর্ণ মাত্রায় উদরপূজা করবার সুযোগ পেলে সে হয়ে উঠত দস্তুরমতো দুর্দমনীয়।

ভূতনাথ দৃঢ়স্বরে বললে, 'তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

প্রতিবাদ নিস্ফল হবে বুঝে আমরা আর উচ্চবাচ্য করলুম না।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে একটা রাত কাটিয়েই পরদিন সকালে হাটের পথে নরেশ ও তার বন্ধু পরেশের সঙ্গে দেখা। আগে তারাও আমাদের সহপাঠী ছিল, কিন্তু গতবারের পরীক্ষায় ফেল করে আমাদের নাগাল ধরতে পারেনি। নরেশ ধনীর সন্তান, পরেশও গরিবের ছেলে নয়।

আমি বললুম, 'আরে, তোমরাও এখানে! কোথায় উঠেছ হে?'

নরেশ বললে, 'কেন, এখানে যে আমাদেরও একখানা বাড়ি আছে। অখিল তো সে কথা জানে।'

অখিল বললে, 'হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু সে-বাড়ি তো ভাড়া দেওয়া হয়, এই পুজোর সময়ও সেখানা কি খালি পড়ে আছে?'

নরেশ বললে, 'হ্যাঁ, এবারে সে-বাড়ির ভাড়াটে জোটেনি। তাই দুটো দিন কাটিয়ে দিতে এসেছি।'

—'মাত্র দুটো দিন!'

—'হ্যাঁ। বাড়িখানার একটা ব্যবস্থা করেই ফিরে যাব। গুরুজনের আদেশ। তবে সেই ফাঁকে আর একটা কাজও সারতে চাই। এখানে নদীর ধারে পাওয়া যায় বালিহাঁস আর বন্য কুক্কুট। আমরা দুজনে দুটো বন্দুক নিয়ে তাদের সঙ্গেও মুলাকাত করতে যাব।'

আমি বললুম, 'আমরাও যদি তোমাদের সঙ্গী হই, আপত্তি করবে না তো!'

—'আরে, সে তো সুসংবাদ! পার্টি জমবে ভালো।'...

অখিল বললে, 'তোমাদের বাড়ি আমি চিনি। বৈকালেই আবার দেখা হবে।'

ভূতনাথ রীতিমতো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা?'

ভূতনাথের উদরপরায়ণতার কথা কারুর কাছেই অবিদিত ছিল না। ফিক করে হেসে ফেলে নরেশ বললে, 'মাভৈঃ! সে ভারও আমরা নেব।'

আমি বললুম, 'আমরাও তোমাদের জন্যে কিছু উপহার নিয়ে যাব।'

—'যথা?'

—'রামপাখির 'স্যান্ডউইচ' আর একটি 'এয়ার-টাইট' টিনে ভরা রসগোল্লা।'

—'আহা, সে তো হবে সোনায় সোহাগা!'

যথাসময়ে নরেশদের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। মাঝারি আকারের দোতলা বাড়ি! অবস্থান সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়, মাঠ ও বন। কাছেই নদীর তীর। কানে আসে খালি নদীর জলতান আর পাখির কলগান।

ভূতনাথ উৎসুক হয়ে বললে, 'এইবারে চা-চক্রের আয়োজন হবে তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'সেই সঙ্গে আমাদের 'স্যান্ডউইচ' প্রভৃতি?'

নরেশ মাথা নেড়ে বললে, 'না, এখন খালি চা, আমাদের তাড়াতাড়ি আছে। নদীর ধারে গিয়ে শিকারের জায়গাটা একবার তদারক করে অন্ধকার নামবার আগেই আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। তারপর 'স্যান্ডউইচ' আর রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করলে কোনই ক্ষতি হবে না।'

—'আজ তো জ্যোৎস্না আছে। অন্ধকার এলেও ভয়টা কীসের?'

—'যে দারোয়ান আর মালির উপরে বাড়ি দেখবার ভার আছে, আর অন্ধকার হবার আগেই তাদের ছুটি দিতে হবে। একটা ঠিকে চাকরও রেখেছি, সে-ও রাত্রে এখানে থাকতে নারাজ।'

—'কী আশ্চর্য! কেন?'

নরেশ বাধো-বাধো গলায় বললে, 'নিতান্তই শুনবে তাহলে?'

—'নিশ্চয়ই! রাত্রে এখানে কেউ থাকতে চায় না, এর মানে কী?'

—'শোনো তবে। আমাদের বাড়ির শেষ ভাড়াটিয়া গেল বছরে এখানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই বাড়িখানার বদনাম হয়ে গেছে, কেউ আর ভাড়া নিতে চায় না। সবাই বলে, প্রতি রাত্রেই এখানে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। সেইজন্যেই তো একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।'

ভূতনাথ লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে দুইচক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'কচুপোড়া কী ব্যবস্থা করবে শুনি? রোজা ডাকবে? ভূতকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে থানায় খবর দেবে?'

নরেশ বললে, 'ও-সব কিছুই করব না। আমি এখানে দুটো রাত্রি বাস করে প্রমাণিত করব, এ বাড়িতে ভূতের ভয়টয় কিছুই নেই—ওসব হচ্ছে দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা মাত্র।'

ভূতনাথ হনহনিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'বেশ তাই কোরো। কিন্তু আমি এই চললুম।'

আমি বললুম, 'ওহে ভূতনাথ, যাও কোথায়?'

—'অখিলের বাংলোয় ফিরে যাচ্ছি।

—'সে কী, রাত্রে পেটের খোরাকের ব্যবস্থা না করেই?'

—'আলবত! পেটের খোরাক জোগাতে গিয়ে আমি ভূতের খোরাক হতে রাজি নই।'

অখিল ডাকলে, 'ওহে ভূতনাথ! শোনো, শোনো! অন্তত খানকয় 'স্যান্ডউইচ' আর গোটাকয় রসগোল্লা নিয়ে যাও!'

কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! লম্বা লম্বা পা ফেলে ভূতনাথ হল অদৃশ্য।

নরেশ বললে, 'ভূতনাথটা খালি পেটুক চূড়ামণি নয়, কাপুরুষদের মধ্যেও অধমাধম! চুলোয় যাক, এসো আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

নদীর ধার থেকে সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরে এলুম।

প্রথমেই ভূতনাথ, তারপর এখন আবার দারোয়ান, বেয়ারা ও মালিরও দ্রুতপদে পলায়ন দেখে আমরাও বুকটা ছাঁৎ ছাঁৎ করতে লাগল। অখিল, নরেশ ও পরেশেরও শুকনো মুখ দেখে বুঝলুম, কারুর অবস্থাই ভালো নয়। ভয় হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির মতো।

তার উপরে আর এক অভাবনীয় ব্যাপার—যাক এলে একেবারেই আক্কেলগুড়ুম!

একটা বাস্কেটের ভিতর ছিল দুই ডজন ফাউল স্যান্ডউইচ ও এক টিন রসগোল্লা, কিন্তু আতিপাঁতি করে খোঁজবার পরও তার আর কোনও চিহ্নই আবিষ্কার করা গেল না।

আমি বললুম, 'তবে কি—'

অখিল বাধা দিয়ে বললে, 'যেতে দাও,—যা হবার তা হয়ে গেছে!'

আহারাদি সারবার পর প্রায় সারা রাতটাই কী অস্বস্তি ও হৃৎকম্পের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে যে কেটে গেল, তা আর বর্ণনায় বোঝানো যাবে না। খোলা মাঠের দমকা বাতাস এসে জানালায় শব্দ তুললেই নরেশ ও পরেশ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি বন্দুক বাগিয়ে ধরে!

আমি বলি, 'ও কিছু নয়।'

অখিল বলে, 'বন্দুক ছুড়ে অশরীরীকে শিকার করা যায় না!'

নরেশ বলে, 'আবার অশরীরী কথা তোলো কেন? লোকের মুখে কি গল্প শোননি? অশরীরীরাও মাঝে মাঝে শরীরী হয়, আর মানুষের হাত থেকে ইলিশমাছ ছিনিয়ে নেয়? আজকেই কি এখান থেকে খাবারের বাস্কেটটা অদৃশ্য হয়নি?'

পরেশ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'উঃ, রাতটা কাটলে বাঁচি!'

ভূতনাথ সময় থাকতে সরে পড়ে যথার্থ বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছে বলে মনে হল। কেবল একটু মাথা খাটিয়ে কিছু মিষ্টি আর 'স্যান্ডউইচ' নিয়ে গেলেই তাকে আজ আর উপোস করতে হত না।

অবশেষে পূর্বাকাশ সামান্য ফরসা হতেই আমরা চটপট বাইরে বেরিয়ে পড়ে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

চুলোয় যাক ভূত-টুত, আর আমাদের পাত্তা পায় কে? মস্ত মস্ত বীরের মতো ছুটলুম সবাই নদীর দিকে।

শিকার রীতিমতো সফল। লাভ হল পাঁচটা বন্য কুক্কুট ও চারটে বালিহাঁস।

অরণ্য ও ধু ধু মাঠ রোদে সোনালি—কোথাও নেই ভৌতিক প্রতিবেশ। যেখান থেকে সভয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলুম, বুক ফুলিয়ে ফিরে এলুম সেইখানেই।

বিস্মিত চোখে দেখলুম, বাগানের খাসজমিতে পদচারণ করছে প্রশান্ত মুখে ভূতনাথ!

একগাল হেসে বললে, 'দিনের বেলায় আমার ভূতের ভয় থাকে না। তাই নরেশের নিমন্ত্রণ রাখতে এলুম।'

বললুম, 'তা বেশ করেছ! কিন্তু কাল রাতটা মিছে উপোস করে মরলে কেন? কিছু মিষ্টি আর 'স্যান্ডউইচ' নিয়ে গেলেই তো পারতে!'

মুচকে হেসে ভূতনাথ বললে, 'কে বলে আমি উপোস করেছি—আমি কি সেই ছেলে ব্রাদার? তোমার কি খাবারের 'বাস্কেট'টা খুঁজে পেয়েছ?'

সচমকে বললুম, 'তবে কি ভূত নয়, ভূতনাথই 'বাস্কেট'টা নিয়ে উধাও হয়েছে?'

ভূতনাথ বেশ সপ্রতিভ মুখেই বললে, 'তা ছাড়া আর কে? খাবারের কথা আমিও তাড়াতাড়িতে ভুলেই গিয়েছিলুম, যথাসময়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে অখিলকে ধন্যবাদ! খানিক দূর গিয়েই ভেবেই দেখলুম—তাই তো, তোমরা তো নরেশের এখানে মজা করে 'ডিনার' খাবে, আর আমিই বা খামকা উপোস করে মরি কেন? আবার এখানে ফিরে এসে দেখলুম তোমরা সবাই বেরিয়ে গিয়েছ। অতএব—'

সবিস্ময়ে বললুম, 'অতএব তুমি সেই দুই ডজন 'স্যান্ডউইচ' আর একটিন রসগোল্লা একাই নিজের উদরগহ্বরের নিক্ষেপ করেছ?'

—'আরে, ও হচ্ছে আমার কাছে নস্য ভাই, নস্য! দরকার হলে আমি অনায়াসেই পাঁচ ডজন 'স্যান্ডউইচ' আর দু-টিন রসগোল্লা উড়িয়ে দিতে পারি!'

নরেশ চমৎকৃত কণ্ঠে বললে, 'ভূতনাথ, তোমারই জয়জয়কার!'

আজব সত্য-কাহিনি

এবারে (১৩৪৮ সাল) কালবৈশাখী করেছিল কলকাতাকে 'বয়কট'। বরাবরই সে ফাগুনের শেষ থেকে চৈত্র মাসের মধ্যেই দেখা দেয় এবং সঙ্গে আসে তার অল্পবিস্তর বৃষ্টিধারা। আজ পর্যন্ত আমি তাকে এই বাৎসরিক কর্তব্যপালনে অমনোযোগী হতে দেখিনি।

কিন্তু এবারে সে ছিল অদৃশ্য। এমনকি বৈশাখের তিন-তিনটে দিন গেল, অথচ আকাশ থেকে ঝরল না একটি ফোঁটা জল! রোজই বৈকালে তৃষিত চোখে মুখ তুলে দেখি কাঠফাটা রোদে পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে আকাশের নীলিমা। ধুলোয় ধূসর কলকাতায় জাগল নাগরিকদের হাহাকার।

ঠিক এই সময়ে আমাদের 'রংমশালের দল'* রেডিয়োর আসরে বসে একতানে ধরলে যখন গান—

জাগো জাগো কালবৈশাখী!

আর থেকো না সুপ্ত হে—

আকাশে ছিল না তখন একখানা মেঘ।

কিন্তু 'বৈশাখী'র পালা শেষ হবার পরই রেডিয়ো-অফিস থেকে পথে বেরিয়ে সবিস্ময়ে দেখি, পশ্চিম আকাশ ভরে গিয়েছে কালো কালো মেঘে আর মেঘে!

এ যে অবাক কাণ্ড! মনে মনে বললুম, ধন্য 'রংমশালের দল', ধন্য! সারা দেশ গোটা ফাগুন-চৈত্র মাস ধরে কোটি কোটি কণ্ঠে ডেকেও যার সাড়া পায়নি, 'রংমশালের দলে'র কাতর আরজি বেতারে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে শূন্যে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই হল তার অভাবিত আবির্ভাব! উড়ল মেঘের কাজল-কালো পতাকা, বাজল ঘন ঘন বাজের দামামা, ফুটল বিজলির আলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ঝরল ঝরো ঝরো জলের ঝরনা! 'রংমশালের দলে'র বাহাদুরি আছে বই কি!

এরকম আশ্চর্য ব্যাপার আমার জীবনে আরও বার কয়েক ঘটেছে।

ছেলেবেলায় একদিন আমি ও আমার খুড়তুতো ভাই শক্তি আমাদের পাথুরেঘাটার বাড়ির ছাদের উপরে খেলা করছি। বাড়ির সামনেই তখন গলির ওপাশে ছিল ঘোষেদের লম্বা একতলা আস্তাবল-বাড়ি।

ছেলেমানুষির কোন খেয়ালে হঠাৎ বললুম, 'দেখ শক্তি, আমি যা বলব এখুনি তা ফলে যাবে!'

শক্তি বললে, 'ইস!'

—'বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখবি? আমি যদি বলি, তাহলে ওই আস্তাবল-বাড়ির ছাদ এখুনি ভেঙে পড়বে!'

কেন যে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বিশেষ করে ওই কথাটাই বেরুল তা জানি না, কিন্তু কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই সেই পাকা আস্তাবল-বাড়ির একাংশের ছাদ ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে!

শক্তি বিপুল বিস্ময়ে হাঁ করে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। আমি নিজেও রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলুম।

আর একদিনের কথা বলি। বছর উনিশ-বিশ আগেকার কথা।

আমার বাল্যবন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ হালদার ও আরও দুজন সঙ্গীর সঙ্গে পি, সেট কোম্পানির বাগানে (বোধ হয় দমদমায়) যাচ্ছি। সরু একটা পথ, তার একদিকে একটানা ঝোপঝাপ।

হঠাৎ কী মনে হল, বললুম, দেখ নরেন, এই ঝোপ থেকে এখনই যদি একটা সাপ বেরিয়ে পড়ে?'

নরেন কোনও জবাব দেবার আগেই পাশের ঝোপ থেকে ফস করে বেরিয়ে পড়ল মাঝারি আকারের একটা কালো সাপ! কী সাপ বুঝতে পারলুম না, কারণ দেখা দিয়েই সে বিদ্যুৎবেগে আবার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল!

অবশ্য, এর মধ্যে আমার নিজের কোনও বাহাদুরি নেই। এই ধরনের ঘটনা প্রত্যেক মানুষের

জীবনেই ঘটে। হয়তো পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে আট-দশ বৎসর দেখা নেই, তার কথাও ভাবিনি। হঠাৎ একদিন অকারণেই তাকে মনে পড়ল এবং ঠিক সেইদিনেই হল তার আকস্মিক আবির্ভাব!

উপরে যে-দুটি ঘটনার উল্লেখ করলুম, ও-রকম ঘটনা আমার জীবনে আরও ঘটেছে, কিন্তু এখানে আর পুথি বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে 'রংমশালের দলে'র আবাহন গীতির সঙ্গে-সঙ্গেই কালবৈশাখীর বিস্ময়কর উদয় দেখে আর একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল।

আমি তখন বালক। মা-বাবার সঙ্গে থাকি সুদূর রাওলপিণ্ডির পে-অফিস লেনে। রাস্তাটির অস্তিত্ব এখনও আছে কি না জানি না, কিন্তু তখন সেখানে বাস করতেন প্রধানত বাঙালিরাই।

সেখানে একটি প্রাচীন ভদ্রলোক থাকতেন, তাঁর আসল নাম ভুলে গিয়েছি। কিন্তু মনে আছে, সবাই তাকে 'খুড়ো' বলে ডাকতেন।

খুড়োর ভারী গানের শখ ছিল, নিজেকে তানসেন-জাতীয় বলে মনে করতেন।

কিন্তু পাড়ার লোকের ধারণা ছিল অন্যরকম। কারণ প্রতিদিন যখন তানপুরো নিয়ে খুড়ো ভগ্নকণ্ঠে দীর্ঘকালব্যাপী আর্তনাদ বা সংগীতসাধনায় নিযুক্ত হতেন, তখন পাড়ার লোকের প্রাণের ও কানের অবস্থা হয়ে উঠত দস্তুরমতো ভয়াবহ।

এক সন্ধ্যায় খুড়ো তানপুরোর 'তবলি'তে চাঁটি মেরে গান ধরেছেন বিকট স্বরে। সে কী গান!

পাড়ার কেউ কেউ আর সইতে না পেরে খুড়োর কাছে গিয়ে করলেন প্রবল প্রতিবাদ।

খুড়ো ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'তোমরা তো আচ্ছা অরসিক হে! জানো, সংগীতের মতন বিদ্যে নেই! জানো, আজ তিন মাস এখানে বৃষ্টি হয়নি?'

—'বৃষ্টি হয়নি তো হয়েছে কী?'

—'হয়েছে কী? বৃষ্টি হয়নি বলেই তো আমি 'মেঘমল্লার' ধরেছি!'

'যাও যাও খুড়ো, বাজে বোকো না। তোমার গান শুনলে বৃষ্টিও পালাবার পথ খুঁজে পাবে না! ওই গানে বৃষ্টি আসবে!'

—'কী! আসবে না? জানো তানসেন 'দীপক' গাইলেই আগুন জ্বলত, মল্লার ধরলে বৃষ্টি পড়ত?'

—'থো করো খুড়ো, তানসেনের কথা থো করো! আমাদের কথা হচ্ছে, তোমার গান আর সহ্য করা অসম্ভব। আমরা হয় প্রাণে মারা পড়ব, নয় পাগল হয়ে যাব?'

—পাড়ার লোকের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রেই এল ঝমঝম করে জল।

শেষ রাতে আমাদের বাড়ির সদর-দরজার কড়া এমন বিষম উৎসাহে নড়তে লাগল যে, বিছানা ছেড়ে উঠে বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

দরজা খুলেই দেখা গেল লণ্ঠনধারী খুড়োকে।

—'কী খুড়ো, ব্যাপার কী? কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি?'

—'বলি, আরও চাই নাকি?'

—'কী আরও চাইব?'

—'কী আবার! বৃষ্টি হে, বৃষ্টি! আমার মেঘমল্লারের মাহাত্ম্যটা দেখলে তো? বৃষ্টিকে কান ধরে টেনে এনেছি—বুঝলে হে?' বলতে বলতে খুড়ো চলে গেলেন এবং তারপরেই পাশের বাড়ির দরজায় বেজে উঠল কড়াজোড়া।

পরদিন সকালে উঠে শুনলুম, সে-পাড়ার কোনও বাড়ির কড়াই সে-রাত খুড়োর কবল থেকে অব্যাহতি লাভ করেনি।

এতদিনে খুড়ো নিশ্চয়ই লোকান্তরে গমন করেছেন। পৃথিবীকে বঞ্চিত করে হয়তো তিনি ধন্য করেছেন স্বর্গসভাকে। কিন্তু মাভৈ, চিন্তারও কারণ নেই। খুড়ো নেই, আমাদের 'রংমশালের দল' আছে, অনাবৃষ্টির সময়ে তোমরা এই দলটিকে গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ কোরো।

বাজলে বাঁশী কাছে আসি

তোমরা কণারকের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। কণারক হচ্ছে একটি জায়গার নাম—পুরী থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে। সেখানে খুব-পুরানো একটি ভাঙাচোরা সূর্য্যমন্দির আছে। মন্দিরের বেশীরভাগ এখন ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু যেটুকু এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তা এত সুন্দর যে, পৃথিবীর সব দেশ থেকে দর্শকের দল আসে আগ্রহে।

কণারক ও পুরীধামের মাঝখানকার আঠারো মাইল জায়গাটাকে মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই মরুভূমির একদিকে দাঁড়িয়ে আছে জগন্নাথের মন্দির, একদিকে আছে কণারকের সূর্য্যমন্দির, একদিকে দেখা যায় অনন্ত সমুদ্র এবং আর একদিকে আকাশের সীমা-রেখা পর্যন্ত চলে গেছে অনন্ত বালির প্রান্তর। এই বালুকার রাজ্যে ছোটখাটো একটি জন জঙ্গল শ্যামলতা পাওয়া যায় কেবল কণারকের ভাঙা দেউলের আশেপাশে।

এই বন জঙ্গলের মধ্যেই একটি সরকারি ডাক্‌বাংলো আছে। আমি যখন সেই বাংলোয় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলুম, তখন সেখানে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর নির্জন আশ্রয় দেখেছিলুম! বাংলোর ভিতরে দু'খানি শোবার ঘর—তার একখানিতে ছিলুম আমি, এবং আর একখানি দখল করেছিলেন আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর নাম পূর্ণবাবু, কলকাতার কোন কলেজের অধ্যাপক, এখানে এসেছেন কণারকের মন্দির দেখবার জন্যে।

কণারকের মন্দির থেকে খানিক তফাতে এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় চন্দ্রভাগা নদী। একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি এই নদীর ধারে

বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ আমার পায়ে কিসে ঠোক্কর লাগল। হেঁট হয়ে চেয়ে দেখি, বালির ভেতর থেকে কি-একটা জিনিষের আধখানা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে! খানিক টানাটানি করতেই জিনিষটার সবখানাই বেরিয়ে পড়ল! ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বুঝলুম সেটা হচ্ছে অদ্ভুত আকারের এক বাঁশী। অন্যমনস্ক ভাবে সেটাকে হাতে নিয়ে আমি আবার বাংলোর দিকে ফিরলুম।

যখন বাংলোর খুব কাছে এসে পড়েছি, তখন কেন জানিনা আমার মনে হ'ল, একবার পিছন পানে ফিরে তাকানো উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, নদীর ধার থেকে একটা মানুষের মূর্ত্তি হন্‌হন্ ক'রে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার যেন খুব তাড়া অথচ সে কিছুতেই তাড়াতাড়ি আসতে পারছে না—অন্ততঃ তার ভাবভঙ্গী দেখে আমার এইরকমই মনে হ'ল! সে যেন আসছে আসছে, আস্‌ছেই—সে আসছে অথচ আসতে পারছে না! সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে মূর্ত্তিটাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় না—অথচ তাকে ভালো ক'রে দেখবার জন্যে মনের ভিতরে একটা অকারণ কৌতূহল জেগে ওঠে।

বাংলোর ঘরের ভিতর ব'সে বাতীর আলোতে বাঁশীটাকে ভালো ক'রে পরীক্ষা করে দেখলুম। বাঁশীটা মোটেই একালের নয়। তামার বাঁশী, এবং বয়েস এ হয়তো কণারকের মন্দিরেরই মতন সুপ্রাচীন। তার গায়ে কতকগুলো যেন অক্ষর খোদা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো যে কোন-ভাষার অক্ষর, কিছুই বোঝা গেল না।

এই সেকেলে বাঁশীটা কখনও বাজে কিনা দেখবার জন্যে তার রন্ধ্রে একবার ফুঁ দিলুম। আমার সেই সামান্য ফুয়েই বাঁশীটা হঠাৎ আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণ ও তীব্র স্বরে বেজে উঠলো। বাঁশী যে অত জোরে বাজতে পারে এটা ছিল আমার কল্পনারও অতীতে! অত্যন্ত চমকে উঠে বাঁশীটা টেবিলের উপর রেখে দিলুম, এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম, একটা এলোমেলো ঝোড়ো-হাওয়া বাহির থেকে ঘরের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাতীটা গেল নিবে। জানালা বন্ধ ক'রে আমি আবার বাতীটা জ্বাললুম।

এবং তার পরেই, শুনলুম ঘরের দরজায় কে করাঘাত করছে। আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে দিলুম। আর একটা ঝোড়ো-হাওয়ার দমকা এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু দরজা খুলে কাউকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, আমারই মনের ভ্রম, দরজায় শব্দ হয়েছে হাওয়ার জন্যেই।

সে রাত্রে হাওয়ার জোর ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। দরজা-জানালায় ক্রমাগত ঠেলা মেরে পাগলা হাওয়া কেবলই যেন ঘরের ভিতরে আসতে চায়, তার আওয়াজ শুনে আমার মনে হ'ল কণারকের প্রাচীন ভগ্নমন্দিরের আত্মা যেন করুণ আর্ত্তনাদ করছে। যেন দেউলের সমস্ত পাথরের মূর্ত্তি হঠাৎ আজ জ্যান্তো হয়ে কাতর কান্না শুরু ক'রে দিয়েছে! অসংখ্য যক্ষ রক্ষ কিন্নর ও নাগকন্যার দল যেন এই বাংলোর চারিদিকে ঘিরে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে! দরজায় করাঘাত করছে তারাই।

এরকম সব কথা মনে হওয়া মনের খুব ভালো অবস্থার লক্ষণ নয়। মন থেকে এই সব দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে এখন ঘুমোবার চেষ্টা করাই উচিত।

চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। খানিক পরেই চোখে একটু তন্দ্রার আমেজ এল। কিন্তু ঘুম আসবার আগেই আমার কেমন সন্দেহ হ'ল যে, বিছানায় আমি আর একলা নেই—আমার পাশেই যেন আর একজন কেউ শুয়ে আছে! টেবিলের উপরে বাতীটা তখনও জ্বলছিল। সেই আলোতে আড়ষ্টভাবে পাশ ফিরে দেখলুম, বিছানায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই। নিজের মিথ্যা ভয়ে নিজেই মনে মনে হেসে আমি আবার চোখ মুদে ফেললুম। কিন্তু তখনি আবার মনে হ'ল আমার পাশে আর একজন কে শুয়ে পড়েছে! কিন্তু এবার এই অলীক কল্পনা নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে আমি নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হলুম।

সকাল বেলায় বেড়াতে বেড়িয়েছি পূর্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি

কি-রকম এক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আমাকে কিছু বলতে চান ?"

পূর্ণবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল সারারাত কি আপনার ভালো ঘুম হয় নি ?"

—"কেন বলুন দেখি ?

কাল সারা রাত আপনার ঘরের ভিতর থেকে নানারকম শব্দ এসেছে। কে যেন চেয়ার-টেবিল, সরাচ্ছে, ঘরময় লাফালাফি আর ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, দুম্-দুম্ ক'রে জানলা খুলছে আর বন্ধ করছে,—এই সব গোলমালে আমিও কাল রাতে ঘুমতে পারি নি !"

আমি বললুম, "এতো ভারি আশ্চর্য্য কথা ! কাল সারা রাত আমার তো ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় নি।"

পূর্ণবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "তাহলে আমারই বোধ হয় শুনতে ভুল হয়েছে—শব্দগুলো অন্য কোন জায়গা থেকে এসেছে।"

এননি সব কথা কইতে কইতে ফিরে এসে আমরা বাংলোর বারান্দার উপরে উঠেছি, এমন সময় আমার ঘরের ভিতর থেকে হাঁউমাঁউ ক'রে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে একটা বালক ছুটে বেরিয়ে এল। বাংলোর রক্ষকের ছেলে।

ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে দেখে আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কিরে কি হয়েছে ?"

"ও ঘরের খাটে কে ব'সে আছে !"

দৌড়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে হাজির হলুম। খাটের উপরে কেউ নেই। কেবল বিছানার চাদরখানা এলোমেলো হয়ে গুটিয়ে পাকিয়ে ঘরের মেঝেয় প'ড়ে রয়েছে।

বালক বললে, "না, সে ঐ খাটেই ব'সেছিল ! ঠিক যেন একটা সাদা কাপড়ে তৈরী মূর্ত্তি ! আমাকে দেখেই সে খাট থেকে নেমে এল।"

পূর্ণবাবু বললেন, "বোধ হয় এখানকার কোন লোক চাদর মুড়ি

দিয়ে ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে আবার পালিয়ে গেছে !"

আমারও মন বললে, তাইই হবে।

সেদিন সন্ধ্যার পর টেবিলের ধারে ব'সে বই পড়ছিলুম।

হঠাৎ চোখ পড়ল সেই তামার বাঁশির দিকে। এই ছোট্ট বাঁশীটা কাল কি-রকম জোরে অস্বাভাবিক স্বরে বেজে উঠেছিল, সেই কথা মনে পড়ল। এমন অদ্ভুত গড়নের বাঁশীও কখনো দেখি নি, এমন তীব্র আওয়াজও কখনো শুনি নি !

বাঁশীটাকে আবার তুলে নিয়ে বাজাবার চেষ্টা করলুম। একটি মাত্র ফুঁদিতেই বাঁশীটা এমন বিকট স্বরে বেজে উঠল যে আমার কাণ যেন ফেটে গেল !

পর-মুহূর্ত্তেই বাহির থেকে বিষম ঝোড়ো হাওয়া হু-হু-ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকে প'ড়ে আলোটাকে দিলে নিবিয়ে। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে আলোটা আবার জ্বেলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, বাইরে কোন দুর্য্যোগ নেই, তবু আচম্‌কা এমন ঝোড়ো-হাওয়া জাগে কেন ? কালও এই ব্যাপার হয়েছিল আজও তাই।

খাটের দিকে চোখ গেল, বিছানার চাদরখানা আপনা আপনি তাল পাকিয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে ! এও কি সম্ভব ? নিজের চোখকে বিশ্বাস হ'ল না।

চোখদুটো দুহাতে রগড়ে ভালো ক'রে আবার তাকিয়ে দেখি, খাটের উপর পা ঝুলিয়ে ব'সে আছে এক কিম্ভুতকিমাকার মূর্ত্তি। ধব-ধবে কাপড়ের মত সাদা তার দেহ ! তার হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে, কিন্তু চোখ-নাক ঠোঁট দেখা যায় না !

কী ভয়ানক ! মূর্ত্তিটা উঠে দাঁড়াল, দু-দিকে দু-হাত বাড়িয়ে বাধো-বাধো পায়ে যেন কি ধরবার চেষ্টা করতে লাগল ! তার ভাবভঙ্গি অন্ধের মত !

কিন্তু সে কাকে খুঁজছে ?—আমাকে ?—একথা মনে হ'তেই দারুণ

আতঙ্কে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। সেই শব্দ পেয়েই অন্ধকার মূর্ত্তিটা বেগে আমার দিকে আসতে লাগল!

আমি একলাফে দরজার কাছে এসে পড়লুম। পাগলের মত দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ে চ্যাঁচাতে লাগলুম, "রক্ষা কর! রক্ষা কর।"

চারিদিক থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ পেলুম। পূর্ণবাবুর গলা শুনলুম, "ব্যাপার কি মশাই, ব্যাপার কি?"

দু-হাতে চোখ চেপে মাটির উপরে ব'সে পড়ে আকুল স্বরে বললুম, "ঘরের ভিতরে সেই সাদা কাপড়ের মূর্ত্তিটা!"

সকলে ঘরের ভিতরে গেল। পূর্ণবাবু উচ্চস্বরে বললেন, "কে, কেউ তো এখানে নেই!"

হতভম্বের মত ঘরে ঢুকে দেখলুম, মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়েছে! মেঝের উপরে দরজার কাছে বিছানার চাদরখানা গড়াগড়ি দিচ্ছে!

এমন সময় কণারকের মঠের সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ঘরের ভিতর ঢুকে বললেন, "কি হয়েছে, এখানে এত গোলমাল কেন?"—বলতে বলতে তাঁর চোখ হঠাৎ টেবিলের উপরে প'ড়ে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে তামার বাঁশীটা তুলে নিয়ে সেটা গভীর ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "এটা এখানে কেমন ক'রে এল?"

আমি বললুম, "ওটা চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

সন্ন্যাসী ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, "এ বাঁশীটাকে আমি সমুদ্রে বিসর্জন দিতে চললুম। এ হচ্ছে যাদুকরের অভিশপ্ত বাঁশী,—এ অমঙ্গলকে ডেকে আনে!"

———

বংশীবদনের বহির্গমন

যাকে বলে দশাসই পুরুষ।

মাথায় লম্বা সাড়ে ছয় ফুট, ছাতির মাপ পঞ্চাশ ইঞ্চি, পেশিগুলো যেন লোহার মতো শক্ত।

সবাই বললে, হ্যাঁ, একখানা চেহারা বটে!

মুখশ্রী ভালো নয় এবং গায়ের রংটাও এমন মিশমিশে কালো যে তার সঙ্গে কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তির তুলনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না।

তবু সুপুরুষ না হলেও এমন পুরুষোচিত সুগঠন নজরে পড়ে কদাচিৎ। বয়স হবে বিশ কি একুশ। নাম বংশীবদন। নামকরণটা হয়েছিল বোধ করি রঙের জন্যই, কারণ বংশীবদন বলে কেষ্টঠাকুরকেই।

আমাদের পাড়ায় এসে বাসা ভাড়া নিয়েই সে দস্তুরমতো আসর জমিয়ে তুলতে দেরি করলে না।

শোনা গেল, বংশীবদন বংশীবাদন ভালোবাসে না, রোজ মুগুর ভাঁজে, ডন-বৈঠক দেয়, কুস্তি লড়ে। পাড়ায় এসেই বশ করে ফেললে সেই সব অখদ্যে ও অভব্য ছোঁড়াকে, রাস্তার রোয়াকে দিন-রাত আড্ডা না দিলে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না। তার মুখশাবাশি শুনে ও ধরনধারণ দেখে ডানপিটেরাও তাকে সমীহ করে চলতে লাগল।

এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামালে না, কারণ কোন পাড়াতেই বা এমনি লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ার দল ও তাদের পালের গোদা নেই? কিন্তু ক্রমেই শুরু হল হরেক রকম উৎপাত।

॥ দুই ॥

সবচেয়ে বিষম উপদ্রব হচ্ছে, চাঁদার উপদ্রব।

বংশীবদন মতপ্রকাশ করলে, বছরে আমরা তিন বার সর্বজনীন পূজা করব—দুর্গাপুজোর সময়, কালীপুজোর সময় আর সরস্বতীপুজোর সময়। দুর্গাপুজোর

আর মাসদেড়েক বাকি। সবাই বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা আদায়ে লেগে যাও। গরিবরা যে যা পারে দেবে, কিন্তু বড়োলোকদের কাছ থেকে পঁচিশ টাকার কম নিবি না।

পাড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল পঁচিশ ঘর। তাদের মধ্যে মাত্র একজন দিলে পঁচিশ টাকা। কেউ কেউ আট আনা, এক টাকা বা দুই টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলে, কেউ কেউ কিছুই দিলে না।

যারা কম চাঁদা দিতে চাইলে বা কিছুই দিলে না, তাদের বাড়িতে আরম্ভ হল সব বিপরীত কাণ্ড। কোথাও বোমা পড়ে, কোথাও হয় ইষ্টক বা বিষ্ঠা বৃষ্টি।

থানায় খবর গেল। কিন্তু পুলিশ এসে কোনোই সুরাহা করতে পারলে না। পুলিশ বংশীবদন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গকে সন্দেহ করলে বটে, কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করবার মতো প্রমাণ পেলে না।

বিষ্ঠা, ইষ্টক ও বোমার কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সবাই যেচে এসে চাঁদা দিয়ে গেল।

প্রফেসর সুরেন চৌধুরির বাড়ির বড়ো রোয়াকটাই বংশীবদন বেশি পছন্দ করত। সদলবলে সেইখানে বসেই সে বাক্য-বন্দুকে বধ করত রাজা-উজিরকে।

সুরেনবাবু প্রফেসর মানুষ, নীচের ঘরে বসে পড়াশোনা করতেন। আড্ডাধারীদের হুল্লোড়ে তিনি অতিশয় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বাইরে এসে বললেন, 'তোমরা এখনই আমার রক ছেড়ে চলে যাও।'

বংশীবদন উঠে দাঁড়িয়ে বুক ও হাতের গুলি ফুলিয়ে বললে, 'যদি না যাই?'

—'থানায় ফোন করব।'

—'মাইরি নাকি প্রফেসর? আচ্ছা, সেলাম!' সে দলবল নিয়ে প্রস্থান করলে।

চার দিন পরে এক সন্ধ্যাবেলায় সুরেনবাবু সদরদরজা থেকে বাড়ির ভিতরে পা বাড়িয়েই হলেন পপাতধরণীতলে; তাঁর মাথা গেল ফেটে।

দরজার সামনে ছড়ানো ছিল আট-দশটা কলার খোসা।

হপ্তাখানেক পরে দেখা গেল, সুরেনবাবুর পড়বার ঘরে এখানে-ওখানে কিলবিল করছে পনেরো ষোলোটা সাপের বাচ্ছা।

ব্যাপারটা আরও বেশি দূর গড়াবার আগেই সুরেনবাবু সে বাড়ি ছেড়ে উঠে গেলেন। বংশীবদন ছোঁড়ার পাল নিয়ে আবার হাসতে হাসতে এসে রোয়াক অধিকার করলে।

পাড়ার লোক ভয়ে বোবা।

॥ তিন ॥

নামে এবং দেহে ভোঁদা হলেও বুদ্ধি তার মোটা ছিল না।

ভোঁদাই ছিল এতদিন এ পাড়ার মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো ছোঁড়াগুলোর পালের গোদা। তার পসার মাটি হয়ে গিয়েছে শ্রীমান বংশীবদনের আবির্ভাবে। এখন আর কেউ তাকে মানে না। এজন্যে সর্বদাই সে মনমরা হয়ে থাকে। গলার জোরে এবং গায়ের জোরে বংশীবদনের কাছে সে নগণ্য।

সেদিন সকালে দালানে বসে ভোঁদা পাঁপর ভাজা খেতে খেতে চা পান করছে এবং দাসী বাটনা বাটতে বাটতে তার মায়ের সঙ্গে কথা কইছে। ঠিকে ঝি, আরও দু-বাড়িতে কাজ করে।

মা বলছিলেন, 'হ্যাঁ রে, ভালোর মা, তুই তো বংশীদেরও বাড়িতে কাজ করিস। অমন দজ্জাল ছেলেকে বাড়ির লোক শাসন করতে পারে না?'

ভালোর মা দুই চোখ কপালে তুলে বললে, 'কে দাদাবাবুকে শাসন করবে গো? সে একটা খুনে ডাকাত, সবাই তার ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে।'

মা বললেন, 'ওমা, এমন কথাও কখনো শুনিনি!'

ভালোর মা বললে, 'দাদাবাবু জব্দ কেবল রাতের বেলায়। অমন যে দত্যির মতো গতর, অন্ধকারে গেলেই কেঁপে সারা। সঙ্গে আর কেউ না শুলে ভয়ে ঘুমোতেই পারে না!'

মা সবিস্ময়ে শুধোন, 'কেন রে!'

—'ভূতের ভয় মা, ভূতের ভয়। রাতে কেউ ভূতের নাম করলেও দাদাবাবু আঁতকে ওঠে। যেন যত রাজ্যের ভূত-পেতনি তারই ঘাড় মটকাবার জন্যে ওঁত পেতে আছে।'

ঝি হাসতে লাগল, মা হাসতে লাগলেন, ভোঁদাও হেসে খুন!

॥ চার ॥

বংশীবদনদের বাসা বড়ো রাস্তার পাশে একটা গলির ভিতরে।

একদিন একটা কাবুলিওয়ালা সেই গলির ভিতরে ঢুকল, নিশ্চয় কারুর কাছে তার টাকা পাওনা ছিল।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই সে বংশীবদনের বাড়ির সামনে টলে ধপাস করে পড়ে গেল। একেবারে আড়ষ্ট!

সবাই চারিদিক থেকে ছুটে এসে দেখলে, কাবুলির দেহে আর প্রাণ নেই। বোধ হয় তার হৃদরোগ ছিল। পুলিশ এসে লাশ তুলে নিয়ে গেল।

বংশীবদন মুখ ভার করে শুকনো গলায় বললে, 'কাবুলিটা কি নচ্ছার হে! দুনিয়ায় এত ঠাঁই থাকতে ব্যাটা কিনা পটল তুললে আমাদের বাসার সামনে এসেই!' তাকে তখন দেখাচ্ছিল খানিকটা গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো।

দিন তিন-চার পরেই পাড়ায় খবর রটে গেল, একজন কাবুলি সন্ধ্যা হলেই খট খট শব্দ তুলে গলির ভিতরে পায়চারি করে এবং দুই চোখে তার দুটো আগুন জ্বলে! নিশ্চয় সে খাবি খেয়েও দেনাদারকে ভোলেনি, নিজের পাওনা টাকা ছাড়তে নারাজ।

কাবুলিটাকে প্রথম কে দেখেছিল তা জানা গেল না বটে, কিন্তু দূর থেকে আরও কেউ কেউ তাকে দেখতে পেলে। প্রত্যেকেই বলে এক কথা—পায়ের জুতোয় খট খট শব্দ হয় এবং চোখে জ্বলে দুটো আগুন!

সন্ধ্যা নামলেই গলি একেবারে ফাঁকা—জনপ্রাণী বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় না এবং সন্ধ্যা হবার আগেই বংশীবদনও সুড়সুড় করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে সদর দরজা বন্ধ করে দেয়।

দলপতির অভাবে রোয়াকের আড্ডা মাটি হয় বুঝি।

॥ পাঁচ ॥

বংশীবদনদের বাড়িখানা একতলা। সদর দরজার পাশেই তার ঘর।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সে গলির দিকের জানালাগুলোর খড়খড়ি বন্ধ করে দিলে। তার অবস্থা হয়েছে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো। এখন থেকে কাল সকাল পর্যন্ত তাকে ঘরের ভিতরেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

উপায় কী? সময় কাটাবার জন্যে সে সাহিত্যচর্চা করতে বাধ্য হল—অর্থাৎ একখানা বই নিয়ে পড়তে বসল। গোয়েন্দাকাহিনি—নাম 'কন্ধকাটার হত্যাকাণ্ড'। দম বন্ধ করে পড়বার মতো বই।

কোথা দিয়ে কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কাবুলি ভূতের কথাও ভুলে যেতে হয়।

আচম্বিতে শব্দ শোনা গেল—খট খট, খটাখট!

বংশীবদনের বুক ধড়াস করে ওঠে, সর্বাঙ্গে জাগে রোমাঞ্চ! বই ফেলে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে ভাবে, শব্দ বলতেই তো ভূত বোঝায় না, ব্যাপারটা কোনো ধাপ্পাবাজের চক্রান্ত নয়তো?

যা থাকে কপালে! চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করবার জন্যে সে রুদ্ধশ্বাসে কম্পিত হস্তে খড়খড়ির একটা পাখি নিঃশব্দে একটুখানি খুলে গলির মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

ওরে ব্রাদার! পরমুহূর্তে বিকট চিৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে মাটির উপরে লম্বমান হল বংশীবদন।

বাড়ির লোকজন হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। হল কী রে, হল কী?

—'কাবুলি ভূত! কাবুলি ভূত! চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে!'

॥ ছয় ॥

কাবুলি ভূতের বিপজ্জনক সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে পরদিনেই বংশীবদনরা সে পাড়া ছেড়ে সরে পড়ল। ভূতটা আজ যেন পথে পায়চারি করে, কাল যদি তার বাড়ির ভিতরে বেড়াবার শখ হয়, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে কে?

ভোঁদার মুখে হাসি ধরে না। আবার রোয়াকে গিয়ে সে দখল করলে দলপতির গদি।

কিন্তু সকলের মনে একটা সন্দেহ থেকে গেল। বংশীবদনদের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলি ভূতটাও অদৃশ্য হল কেন?

এ গুপ্ত কথাটা ভোঁদা কেবল আমার কাছে প্রকাশ করেছে চুপিচুপি।

থিয়েটারের বেশকারের কাছে ধন্না দিয়ে সে কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশ সংগ্রহ করে এনেছিল। জ্বলন্ত চক্ষুর ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল ফসফোরাস।

নামে এবং দেহে ভোঁদা হলেও বুদ্ধি তার মোটা ছিল না।

নাটক

নাটক

সূচিপত্র

অলৌকিক
কালো বিদ্যুৎ
নিশীথ রাতের কাহিনী

অলৌকিক

॥ এক ॥

ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু। নতুন নতুন খাবারের দিকে বরাবরই তাঁর প্রচণ্ড লোভ। আজ বৈকালী চায়ের আসরে পদার্পণ করেই বলে উঠলেন, 'জয়ন্ত, ও-বেলা কী বলেছিলে, মনে আছে তো?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'মনে না থাকে, মনে করিয়ে দিন।'

—'নতুন খাবার খাওয়াবে বলেছিলে।'

—'ও, এই কথা? খাবার তো প্রস্তুত।'

—'খাবারের নাম শুনতে পাই না?'

—'মাছের প্যাটি আর অ্যাসপ্যার‍্যাগাস ওমলেট।'

—'রেঁধেছে কে?'

—'আমাদের মধু।'

—'মধু একটি জিনিয়াস। আনতে বলো, আনতে বলো।'

চা-পর্ব শেষ হল যথাসময়ে। অনেকগুলো প্যাটি আর ওমলেট উড়িয়ে সুন্দরবাবুর আনন্দ আর ধরে না।

পরিতৃপ্ত ভুঁড়ির উপরে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, 'মনের মতো পানাহারের মতো সুখ দুনিয়ায় আর কিছু নেই, কী বলো মানিক?'

মানিক বললে, 'কিন্তু অত সুখের ভিতরেও কি একটি ট্রাজেডি নেই?'

—'কী রকম?'

—'খেলেই খাবার ফুরিয়ে যায়?'

—'তা যা বলেছ!'

—'আবার অনেক সময় খাবার ফুরোবারও আগে পেটই ভরে যায়।'

—'হ্যাঁ ভায়া, ওটা আবার খাবার ফুরনোরও চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার। খাবার আছে, পেট কিন্তু গ্রহণ করতে নারাজ। অসহনীয় দুঃখ।'

ঠিক এমনি সময়ে একটি লোক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

তাকে দেখেই জয়ন্ত বলে উঠল, 'আরে, আরে, হরেন যে! বোসো ভাই বোসো। সুন্দরবাবু, হরেন হচ্ছে আমার আর মানিকের বাল্যবন্ধু।'

মানিক বললে, 'হরেন, ইনি হচ্ছেন সুন্দরবাবু, বিখ্যাত গোয়েন্দা আর প্রখ্যাত ঔদরিক।'

—'হুম, ঔদরিক মানে কী মানিক?' শুধোলেন সুন্দরবাবু।

—ঔদরিক, অর্থাৎ উদরপরায়ণ।'

—'অর্থাৎ পেটুক। বেশ ভাই, বেশ, যা খুশি বলো, তোমার কথায় রাগ করে আজকের এমন খাওয়ার আনন্দটা মাটি করব না।'

জয়ন্ত বললে, 'তারপর হরেন, তুমি কি এখন কলকাতাতেই আছ?'

—'না, কাল এসেছি। আজই দেশে ফিরব। কিন্তু যাবার আগে তোমাদের একটা খবর দিয়ে যেতে চাই।'

—'কীরকম খবর?'

—'যেরকম খবর তোমরা ভালোবাসো।'

—'কোনো অসাধারণ ঘটনা?'

—'তাই।'

—'তাহলে আমরাও শুনতে প্রস্তুত। সম্প্রতি অসাধারণ ঘটনার অভাবে আমরা কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান হয়ে আছি। ঝাড়ো তোমার খবরের ঝুলি।'

॥ দুই ॥

হরেন বললে, 'সুন্দরবাবু, জয়ন্ত আর মানিক আমাদের দেশে গিয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে আগে তার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের দেশ হচ্ছে একটি ছোটো শহর, কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশ দূরে। সেখানে পনেরো-ষোলো হাজার লোকের বাস। অনেক ডেলিপ্যাসেঞ্জার কলকাতায় চাকরি করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বড়ো অফিসারও আছেন। স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। এই পথটা বেশির ভাগ লোকই পায়ে হেঁটে পার হয়, যাদের সঙ্গতি আছে তারা ছ্যাকড়াগাড়ি কি সাইকেল-রিকশার সাহায্য নেয়।

'মাসখানেক আগে—অর্থাৎ গেল-মাসের প্রথম দিনে সুরথবাবু আর অবিনাশবাবু সাইকেল-রিকশায় চড়ে স্টেশন থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। তাঁরা দুইজনেই বড়ো অফিসার, একজন মাহিনা পান হাজার টাকা, আর-একজন আটশত টাকা। সেই দিনই তাঁরা মাহিনা পেয়েছিলেন। স্টেশন থেকে মাইলখানেক পথ এগিয়ে এসে একটা জঙ্গলের কাছে তাঁরা দেখতে পেলেন আজব এক মূর্তি। তখন রাত হয়েছে, আকাশে ছিল সামান্য একটু চাঁদের আলো, স্পষ্ট করে কিছুই চোখে পড়ে না। তবু বোঝা গেল, মূর্তিটা অসম্ভব ঢ্যাঙা, মাথায় অন্তত নয় ফুটের কম উঁচু হবে না। প্রথমে তাঁদের মনে হয়েছিল সেটা কোনো নারীর মূর্তি, কারণ

তার দেহের নীচের দিকে ছিল ঘাঘরার মতো কাপড়। কিন্তু তার কাছে গিয়েই বোঝা গেল সে নারী নয়, পুরুষ। তার ভীষণ কালো মুখখানা সম্পূর্ণ অমানুষিক। তার হাতে ছিল লাঠির বদলে লম্বা একগাছা বাঁশ। পথের ঠিক মাঝখানে একেবারে নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

'রিকশাখানা কাছে গিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে বিষম চিৎকার করে ধমকে বলে উঠল, 'এই উল্লুক, গাড়ি থামা!' তারপরেই সে রিভলভার বার করে ঘোড়া টিপে দিলে। ধ্রুম করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই রিকশার চালক গাড়ি ফেলে পলায়ন করলে। সুরথবাবু আর অবিনাশবাবুও গাড়ি থেকে নেমে পড়বার উপক্রম করতেই মূর্তিটা তাঁদের দিকে রিভলভার তুলে কর্কশ স্বরে বললে, 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, সঙ্গে যা আছে সব রিকশার উপরে রেখে এখান থেকে সরে পড়ো।'

'তাঁরা প্রাণে বাঁচতেই চাইলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গের সমস্ত টাকা, হাতঘড়ি, আংটি এমনকি ফাউনটেন পেনটি পর্যন্ত সেইখানে ফেলে রেখে তাঁরা তাড়াতাড়ি চম্পট দিলেন। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে রিকশার পাশে কুড়িয়ে পায় কেবল সেই লম্বা বাঁশটাকে।

'প্রথম ঘটনার সাত দিন পরে ঘটে দ্বিতীয় ঘটনা। মৃণালবাবু আমাদেরই দেশের লোক। মেয়ের বিয়ের জন্যে তিনি কলকাতায় গয়না গড়াতে দিয়েছিলেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে ট্রেন থেকে নেমে পাঁচ হাজার টাকার গয়না নিয়ে পদব্রজেই আসছিলেন। তিনিও একটা জঙ্গলের পাশে সেই সুদীর্ঘ ভয়াবহ মূর্তিটাকে অস্পষ্ট ভাবে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেদিন কতকটা স্পষ্ট চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু জঙ্গলের ছায়া ঘেঁসে মূর্তিটা এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে, ভালো করে কিছুই দেখবার জো ছিল না। সেদিনও মূর্তিটা রিভলভার ছুড়ে ভয় দেখিয়ে মৃণালবাবুর গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। সেবারেও পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পাওয়া যায় কেবল একগাছা লম্বা, মোটা বাঁশ।

'এইবারে তৃতীয় ঘটনা। শশীপদ আমার প্রতিবেশী। কলকাতার বড়োবাজারে আর কাপড়ের দোকান। ফি-শনিবারে সে দেশে আসে—গেল শনিবারেও আসছিল। তখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছিল, কিন্তু চাঁদ ওঠেনি। স্টেশন থেকে শহরে আসতে আসতে পথের একটা মোড় ফিরেই শশীপদ সভয়ে দেখতে পায় সেই অসম্ভব ঢ্যাঙা বীভৎস মূর্তিটাকে। মানে, ভালো করে সে কিছুই দেখতে পায়নি, কেবল এইটুকুই বুঝেছিল যে, মূর্তিটা সহজ মানুষের চেয়ে প্রায় দুইগুণ উঁচু। সেদিনও সে রিভলভার ছুড়ে শশীপদের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা হস্তগত করে।

শশীপদ দৌড়ে একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর সেইখানে বসেই শুনতে পায় খটাখট খটাখট খটাখট করে কীসের শব্দ! ক্রমেই দূরে গিয়ে সে শব্দ মিলিয়ে যায়। শশীপদ ভয়ে সারা রাত বসেছিল জঙ্গলের ভিতরেই। সকালে বাইরে এসে পথের উপরে দেখতে পায় একগাছা বাঁশ।

'জয়ন্ত, এই তো ব্যাপার! পরে পরে তিন-তিনটে অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় আমাদের শহর রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর দলে খুব ভারী না হলে পথিকরা স্টেশন থেকে ও-পথ দিয়ে শহরে আসতে চায় না। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও রহস্য ভেদ করতে পারছে না। অনেকেই মূর্তিটাকে অলৌকিক বলেই ধরে নিয়েছে। এখন তোমার মত কী?'

॥ তিন ॥

জয়ন্ত স্তব্ধ বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'ঘটনাগুলোর মধ্যে কী কী লক্ষ করবার বিষয় আছে, তা দ্যাখো। বাংলা দেশে নয় ফুট উঁচু মানুষ থাকলে এতদিনে সে সুবিখ্যাত হয়ে পড়ত। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, অপরাধী নয় ফুট উঁচু নয়। সে দেহের নীচের দিকটা ঘাঘরায় বা ঘেরাটোপে ঢেকে রাখে। কেন? তার মুখ অমানুষিক বলে মনে হয়। কেন? সে একটা লম্বা বাঁশ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার বাঁশটাকে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যায়। কেন? সে প্রত্যেক বারেই চেষ্টা করে, তার চেহারা কেউ যেন স্পষ্ট করে দেখতে না পায়। কেন? শশীপদ শুনেছে, খটাখট খটাখট করে একটা শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। কীসের শব্দ?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কিছু অনুমান করতে পারছ?'

—'কিছু কিছু পারছি বই কি! হরেন, ওই তিনটে ঘটনায় যাঁদের টাকা খোয়া গিয়েছে, তাঁরা কি শহরের বিভিন্ন পল্লির লোক?'

—'না, তাঁরা সকলেই প্রায় এক পাড়াতেই বাস করেন।'

—'তবে তোমাদের পাড়ায় বা পাড়ার কাছাকাছি কোথাও বাস করে এই অপরাধী!'

—'কেমন করে জানলে?'

—'নইলে ঠিক কোন দিনে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি প্রচুর টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে, অপরাধী নিশ্চয়ই সে খবর রাখতে পারত না।'

—'না জয়ন্ত, আমাদের পাড়ায় কেন, আমাদের শহরেও নয় ফুট উঁচু লোক নেই।'

—'আমিও ও-কথা জানি।'

—'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

—'আপাতত বেশি কিছু বুঝেও কাজ নেই। আমাকে আরো কিঞ্চিৎ চিন্তা করবার সময় দাও। তুমি আজই দেশে ফিরে যাচ্ছ তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'পরশু দিনই আমার কাছ থেকে একখানা জরুরি চিঠি পাবে। আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে তুমি কলকাতায় এসে আমাদের তোমার দেশে নিয়ে যাবে।'

হরেন চলে গেল। জয়ন্ত যেন নিজের মনেই গুনগুন করে বললে, 'খটাখট খটাখট খটাখট শব্দ। মূল্যবান সূত্র।'

॥ চার ॥

নির্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলায় হরেন এসে হাজির।

জয়ন্ত শুধোলে, 'চিঠিতে যা যা বলেছি ঠিক সেইমতো কাজ করেছ তো?'

—'অবিকল।'

—'মানিক, সুন্দরবাবুকে ফোন করে জানাও, আজ সাড়ে-পাঁচটার ট্রেনে আমরা যাত্রা করব।'

প্রায় সাড়ে-সাতটার সময়ে তারা হরেনদের দেশে এসে নামল।

আকাশ সেদিন নিশ্চন্দ্র। স্টেশন থেকে শহরে যাবার রাস্তায় সরকারি তেলের আলোগুলো অনেক তফাতে তফাতে থেকে মিট মিট করে জ্বলে যেন অন্ধকারের নিবিড়তাকেই আরও ভালো করে দেখাবার চেষ্টা করছিল। নির্জন পথ। আশপাশের ঝোপঝাপের বাসিন্দা কেবল মুখর ঝিল্লির দল। দুইখানা সাইকেল-রিকশায় চড়ে তারা যাচ্ছিল। প্রথম গাড়িতে বসেছিল হরেন ও মানিক। দ্বিতীয় গাড়িতে জয়ন্ত ও সুন্দরবাবু।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কী যে বুঝেছ তা তুমিই জানো, আমি তো ছাই এ ব্যাপারটার ল্যাজা-মুড়ো কিছুই ধরতে পারিনি।'

জয়ন্ত বললে, 'ঘটনাগুলো আমিও শুনেছি, আপনিও শুনেছেন। তারপর প্রধান-প্রধান সূত্রের দিকে আপনার দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে ছাড়িনি। মাথা খাটালে আপনি অনেকখানিই আন্দাজ করতে পারতেন।'

—'মস্তককে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করেছি ভায়া, কিন্তু খানিকটা ধোঁয়া (তাও গাঁজার ধোঁয়া) ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।'

—'মুটেরাও মস্তককে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে কতটুকু? সুন্দরবাবু, আমি আপনাকে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে বলছি না, মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে বলছি।'

—'একটা শক্ত রকম গালাগালি দিলে বটে, কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস, আজকেই তুমি এই মামলাটার কিনারা করতে পারবে?'

—'হয়তো পারব, কারণ অপরাধীরা প্রায়ই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে বিপদে পড়ে। হয়তো পারব না, কারণ কোনো কোনো অপরাধী নিজের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু হুঁশিয়ার! পথের মাঝখানে আবছায়া গোছের কী একটা দেখা যাচ্ছে না?'

হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে বটে! মুক্ত আকাশের স্বাভাবিক আলো দেখিয়ে দিলে, অন্ধকারের মধ্যে একটা অচঞ্চল ও নিশ্চল সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি! বাতাসে নড়ে নড়ে উঠছে কেবল তার পরনের ঝলঝলে জামাকাপড়গুলো।

আচম্বিতে একটা অত্যন্ত কর্কশ ও হিংস্র চিৎকার চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে জেগে উঠল—'এই! থামাও গাড়ি, থামাও গাড়ি!' সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের শব্দ!

কিন্তু তার আগেই অতি-সতর্ক জয়ন্ত ছুটন্ত গাড়ি থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়েছে এবং গর্জন করে উঠেছে তারও হাতের রিভলভার!

গুলি গিয়ে বিদ্ধ করলে মূর্তির ডান হাতখানা, তার রিভলভারটা খসে পড়ল মাটির উপরে সশব্দে! কেবল রিভলভার নয়, আর-একটাও কি মাটিতে পড়ার শব্দ হল—বোধ হয় বংশদণ্ড! অস্ফুট আর্তনাদ করে মূর্তিটা ফিরে দাঁড়িয়ে পালাবার উপক্রম করলে, কিন্তু পারলে না, এক সেকেন্ড টলটলায়মান হয়েই হুড়মুড় করে লম্বমান হল একেবারে পথের উপরে।

দপদপিয়ে জ্বলে উঠল চার-চারটে টর্চের বিদ্যুৎ-বহ্নি!

জয়ন্ত ক্ষিপ্র হস্তে ভূপতিত মূর্তিটার গা থেকে কাপড়-চোপড়গুলো টান মেরে খুলে দিলে। দেখা গেল, তার দুই পদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে দুইখানা সুদীর্ঘ যষ্টি—ইংরেজিতে যাকে বলে 'stilt' এবং বাংলায় যাকে বলে 'রনপা'।

জয়ন্ত বললে, 'দেখছি এর মুখে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড মুখোশ—কাফ্রির মুখোশ। এখন মুখোশের তলায় আছে কার শ্রীমুখ, 'সেটাও দেখা যেতে পারে।'

আর এক টানে খসে পড়ল মুখোশও।

হরেন সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আরে, এ যে দেখছি আমাদের পাড়ার বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে রামধন মুখুজ্জে! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুপথে যায়, কুসঙ্গীদের দলে মেশে, নেশাখোর হয়, জুয়া খেলে, পাড়ার লোকেদের উপরে অত্যাচার করে—এর জন্যে সবাই ত্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু এর পেটে পেটে যে এমন শয়তানি, এতটা তো আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!'

॥ পাঁচ ॥

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রধান প্রধান সূত্রের কথা আগেই বলেছি, এখন সব কথা আবার নতুন করে বলবার দরকার নেই। কেবল দু-তিনটে ইঙ্গিত দিলেই যথেষ্ট হবে। গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, অপরাধী হরেনেরই পাড়ার লোক। সে পাড়ায়—এমনকি, সে শহরেও নয় ফুট উঁচু কোনো লোকই নেই। সুতরাং ধরে নিলুম সে উঁচু হয়েছিল কোনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। অপরাধের সময়ে সে আবছায়ায় অবস্থান করে—পাছে কেউ তার কৃত্রিম উপায়টা আবিষ্কার করে ফেলে, তাইতেই আমার ধারণা হল দৃঢ়মূল। এখন সেই কৃত্রিম উপায়টা কী হতে পারে? শশীপদ শুনেছিল, খটাখট খটাখট করে কী একটা শব্দ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই ধাঁ করে আমার মাথায় আসে রনপার কথা। রনপার উপরে আরোহণ করলে মানুষ কেবল উঁচু হয়ে ওঠে না, খুব দ্রুত বেগে চলাচলও করতে পারে। সেকালে বাংলা দেশের ডাকাতরা এই রনপায় চড়ে এক এক রাতেই পঞ্চাশ-ষাট মাইল পার হয়ে যেতে পারত। পদক্ষেপের সময়ে রনপা যখন মাটির উপরে পড়ে, তখন খটাখট করে শব্দ হয়। কিন্তু রনপায় উঠে কেউ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, টাল সামলাবার জন্যে চলাফেরা করতে হয়। অপরাধী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে একগাছা বাঁশের সাহায্য গ্রহণ করত। কার্যসিদ্ধির পর বাঁশটাকে সে ঘটনাস্থলেই পরিত্যাগ করে যেত, কারণ রনপায় চড়ে ছোটবার সময়ে এতবড়ো একটা বাঁশ হয়ে ওঠে উপসর্গের মতো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এসব তো বুঝলুম, কিন্তু আসামি এমন বোকার মতো আমাদের হাতে ধরা দিলে কেন, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, ওটা আমার কল্পনাশক্তির মহিমা! আগেই বলেছি তো, অপরাধীরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়েই বিপদে পড়ে। অপরাধী সর্বদাই খবর রাখত, পাড়ার কোন ব্যক্তি কবে কী করবে বা কী করবে

না। আমার নির্দেশ অনুসারে হরেন রটিয়ে দিয়েছিল, কলকাতায় ব্যাংকের পর ব্যাংক ফেল হচ্ছে, সে ব্যাংকে আর নিজের টাকা রাখবে না। অমুক তারিখে কলকাতায় গিয়ে সব টাকা তুলে নিয়ে আসবে। অপরাধী এ টোপ না গিলে পারেনি।'

সুন্দরবাবু বললে, একেই বলে ফাঁকতালে কিস্তি মাত!'

কালো বিদ্যুৎ

পার্বত্য দেশ। অরণ্য। গাছেদের অশ্রান্ত মর্মর ধ্বনি, নির্ঝরের ঝরঝর জলতান এবং মাঝে মাঝে দু-তিন রকম পাখির সাড়া ভেসে আসছে।

একখানি ডাকবাংলো দেখা যাচ্ছে।

অমিয় সেন, তাঁর স্ত্রী লতিকা সেন ও তাঁদের বন্ধু কবি সরল রায় ধীরে ধীরে ডাকবাংলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

সূর্য অস্তগত, একটু পরেই সন্ধ্যা হবে।

সরল। অমিয়, এতক্ষণ পরে বোধহয় দুর্ভাগ্যের ধাক্কা সামলাবার একটা উপায় হল। এই দ্যাখো, আমরা ডাকবাংলোর কাছে এসে পড়েছি!

লতিকা। (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) আহা, জায়গাটি কী চমৎকার!

অমিয়। হ্যাঁ লতিকা, যিনি এখানে বাংলোর জন্যে স্থান নির্বাচন করেছেন, তিনি আর আমাদের সরল নিশ্চয়ই একজাতের মনুষ্য।

সরল। অর্থাৎ?

অমিয়। অর্থাৎ তিনিও তোমার মতোই কবি।

লতিকা। ওদিকে পাহাড়ের-পর-পাহাড়ের স্থির তরঙ্গমালা, তাদের কোলে কোলে দুলছে ঘন বনের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, আর ওই সবুজের ওপরে ঝকমকে জরির পাড়ের মতন দেখাচ্ছে ছোট্ট ঝরনাটিকে! আমার আর এখন এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না!

অমিয়। ওটা বলা বাহুল্য। কারণ, ইচ্ছা করলেও আজ তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। বনের পথে আমাদের ভগ্নচক্র মোটর হয়েছে নিশ্চেষ্ট, কাজেই আজ রাত্রে ওই বাংলোর জঠরে প্রবেশ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায়ই নেই।

লতিকা। তা জানি গো, জানি। কিন্তু মোটরখানা ভেঙেছে বলে এখন আর আমার কোনও দুঃখই হচ্ছে না।

অমিয়। তার মানে?

লতিকা। তোমার মোটর অচল না হলে তো আজ এমন অপূর্ব শোভার হাটে রাত্রিবাস করতে পারতুম না!

অমিয়। লতিকা, তোমার কাব্য-ব্যাধি দেখছি সরলেরও চেয়ে মারাত্মক!

সরল। অমিয়, তুমি অকারণেই বারবার আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ। কারণ আমি লতিকা দেবীর মত সমর্থন করি না। আমার কাব্য-রাজ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ নিরাপদ। পেট ভরে খেয়ে আরামে সোফায় বসে বা বিছানায় শুয়ে কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনা পাঠ করা যায় নিশ্চিন্ত প্রাণে। কিন্তু এই ভয়াবহ বিজন জঙ্গলে শূন্যউদরে রাত কাটাতে হবে শুনে আমার মনে একটুও আনন্দ হচ্ছে না।

লতিকা। আপনার কথাগুলো অকবির মতন হল সরলবাবু! একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তখন তার রুপোলি রূপের স্বপ্নে এক রাতের উপবাসকে তুচ্ছ বলে মনে হবে।

সরল। উপবাসকে তুচ্ছ ভাবব, এত বড়ো নির্বোধ কবি আমি নই।

লতিকা। কবিমশাই, এত সহজে হাল ছাড়ছেন কেন? এটা যখন ডাকবাংলো, তখন কোনও আয়োজনই কি এখানে হতে পারে না?

সরল। নির্জন বনের এরকম সব ডাকবাংলোর ব্যবস্থা আমি জানি। আগে থাকতে খবর না দিলে এখানে যা ভক্ষণ করতে হয় তার নাম হচ্ছে বিশুদ্ধ বায়ু।

অমিয়। দ্যাখো সরল, বাংলোর বারান্দা থেকে একটি লোক আমাদের লক্ষ করছে।

সরল। হুঁ, লোকটিকে সরকারি কর্মচারী বলেই মনে হচ্ছে।

অমিয়। আরে, আরে, ওঁকে যে আমি চিনি। মি. দত্ত, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ!

সরল। উনিও তোমাকে চিনতে পেরেছেন। ওই দ্যাখো, তাড়াতাড়ি এদিকে এগিয়ে আসছেন।

অমিয়। হ্যালো দত্তসাহেব, আপনি এখানে বনবাসী কেন? নমস্কার।

মি. দত্ত। নমস্কার, নমস্কার! আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্নই করতে পারি!

অমিয়। আমার মোটরের একখানা চাকা গাড়িকে ত্যাগ করে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়েছে। ড্রাইভার তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় আছে, আর আমরা এসেছি আশ্রয়ের সন্ধানে।

দত্ত। সঙ্গে শ্রীমতী সেন বুঝি?

অমিয়। হ্যাঁ। আর উনি হচ্ছেন আমাদের বন্ধু, অতি-আধুনিক ধাঁধা-প্রণেতা সরল রায়।

দত্ত। ধাঁধা-প্রণেতা?

অমিয়। অর্থাৎ ভদ্রতার খাতিরে যাকে কবি বলে ডাকা হয়। আমার মতে, কবিতা মাত্রই ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সরল। মি. দত্ত, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমার বন্ধুটির পেশা হচ্ছে কন্ট্রাকটারি করা? কিন্তু আজ দেখছি উনি হঠাৎ কাব্য সমালোচক হওয়ার চেষ্টা করছেন। বাংলা কাব্যজগতের বিপদ আসন্ন!

দত্ত। কাব্যজগতের বিপদের কথা নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। এখানে এসে একটা জরুরি মামলা নিয়ে ভারী জড়িয়ে পড়েছি।

অমিয়। এই বিজন অরণ্যে জরুরি মামলা! কীসের মামলা?

দত্ত। মামলাটা যে কীসের, এখনও তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তবে বড়োই রহস্যময় ব্যাপার। পরে শুনবেন। আজ তো আপনারা এইখানেই আছেন?

সরল। অবশ্য যদি স্থানাভাব না হয়—

অমিয়। স্থানাভাব হলেও আমাদের থাকতে হবে। সামনে রাত্রি, সঙ্গে মহিলা, গভীর অরণ্য। তাড়িয়ে দিলেও যেতে পারব না।

দত্ত। (হেসে) সে ভয় নেই। মিসেস সেন, আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাচ্ছে, বাংলোর ভেতরে গিয়ে আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমার বাবুর্চি এখনই চা তৈরি করে দেবে।

সরল। মি. দত্ত, আপনি আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করলেন। আপনার বাবুর্চি যখন আছে তখন নিশ্চয়ই এখানে 'দীয়তাম ভুজ্যতাম'-এর অভাব হবে না! হ্যাঁ লতিকা দেবী, এতক্ষণ পরে আমার মনে হচ্ছে, আপনার কথা সত্য বটে! এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চমৎকার!

লতিকা। (হাস্য করে) বাবুর্চির নামেই কবিবরের সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়ে উঠল নাকি? আচ্ছা, ততক্ষণ আপনি চপ-কাটলেটের স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রকৃতিকে উপভোগ করুন, আমি জামা-কাপড় বদলে আসি।

(প্রস্থান)

দত্ত। সরলবাবু, আপনার সৌন্দর্যবোধকে আমি এইবারে দুঃখ দিতে চাই।

সরল। তার মানে? আপনার বাবুর্চির ভাণ্ডারে কি অন্নাভাব হয়েছে?

দত্ত। তা নয়। কিন্তু আপনি যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছেন, আমি সেখানে দেখছি কেবল অপ্রাকৃতিক বিভীষিকা।

সরল। বিভীষিকা?

দত্ত। হ্যাঁ, দারুণ বিভীষিকা। সেই কথা বলব বলেই মিসেস সেনকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলুম। আপনারা আজ রাত্রিবাস করতে এসেছেন মৃত্যুপুরীর মধ্যে!

অমিয়। কী বলছেন দত্তসায়েব!

দত্ত। অত্যুক্তি করছি না। মাসখানেক আগে সরকারি কাজে ইঞ্জিনিয়ার কুমুদ মিত্র এই বাংলোয় এক রাত বাস করতে আসেন। পরদিন সকালে অনেক বেলাতেও তাঁর ঘুম ভাঙেনি দেখে সকলে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। বিছানা খালি, ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ, কিন্তু

কুমুদবাবু অদৃশ্য! বাংলোর সর্বত্র, আশপাশের সমস্ত জঙ্গল পাহাড় তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কুমুদবাবুর কোনও চিহ্নই আর পাওয়া যায়নি!

অমিয়। কী সর্বনাশ!

দত্ত। তার এক হপ্তা পরে বাংলোর ভেতর থেকে অদৃশ্য হয়েছে এক চাকর। ঠিক একই ব্যাপার। সে-ও কর্পূরের মতন শূন্যে মিলিয়ে গেছে বদ্ধ-দ্বার ঘরের ভেতর থেকে। ব্যাপার দেখে বাংলোর বাকি চাকররা ভয়ে দলবেঁধে পালিয়ে গিয়েছে—তাদের ধারণা, এসব ভৌতিক কাণ্ড!

অমিয়। তাদের ধারণা হয়তো ভুল নয় দত্তসাহেব!

দত্ত। আপনারাও ভূত মানেন?

সরল। দিনের বেলায় নয়, রাত হলেই আমরা ভূত মানি।

দত্ত। কিন্তু পুলিশের আইনে ভূতের অস্তিত্ব নেই। সে দারোগার এলাকায় এই বাংলো, গেল হপ্তায় তিনি এসেছিলেন এখানে তদারক করতে। কিন্তু তিনিও আর থানায় ফিরে যাননি।

সরল ও অমিয়। (একসঙ্গে) অ্যাঁঃ, বলেন কী?

দত্ত। হ্যাঁ। দারোগা সমস্ত দরজা-জানলা নিজে ভেতর থেকে বন্ধ করে শুয়েছিলেন। বাইরে ঘরের দরজার কাছে পাহারায় নিযুক্ত ছিল দুজন চৌকিদার। কিন্তু সকালে বেলা দশটার সময়ও দারোগার ঘুম ভাঙল না দেখে দরজা ভেঙে ফেলা হয়। শূন্য খাট, সব জানলা ভেতর থেকে বন্ধ, কিন্তু দারোগা অদৃশ্য!

অমিয়। চৌকিদাররা রাত্রে কোনও শব্দ-টব্দও শোনেনি?

দত্ত। খালি একবার তাদের কানে গিয়েছিল, ঘরের ভেতরে খাটখানা মড়মড় করে উঠেছিল, আর কিছু নয়।

অমিয়। তাহলে নিশ্চয় এসব ভৌতিক কাণ্ড!

দত্ত। তর্কের অনুরোধে আপনার কথা না হয় স্বীকারই করলুম। ভূতরা যেন অশরীরী, তাদের ছায়া-দেহ না হয় দেওয়াল বা দরজা-জানলার পাল্লা ভেদ করে ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারে কিন্তু যে তিনজন মানুষ অন্তর্হিত হয়েছে, তারা তো আর সূক্ষ্ম দেহের অধিকারী নয়? তাদের দেহ কেমন করে বাতাসে মিলিয়ে গেল? আর এমনভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন চাকর আর একজন দারোয়ানের দেহ হরণ করে কোনও নিম্নশ্রেণির প্রেতাত্মারও এতটুকু লাভ হবে না। ওই তিনজন মানুষের কী হল? কেউ যে তাদের হত্যা করেছে, ঘরের মধ্যে এমন কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি। এখানকার জঙ্গলে বাঘ-ভালুক আছে বটে, কিন্তু তারা তো দেওয়াল ভেদ করে ঘরে ঢুকতে পারে না! কুমুদবাবু আর দারোগাবাবুর গায়ের জামা আর পায়ের জুতোও পাওয়া গেছে ঘরের মধ্যে। খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁরা

কোথাও যেতে পারেন না। এই অদ্ভুত সমস্যা সমাধান করবার জন্যেই আজ পাঁচ দিন ধরে আমি এখানে বাস করছি, এইবারে হয়তো আমাকেই অদৃশ্য হতে হবে!

সরল। মি. দত্ত, মি. দত্ত! আপনার বাবুর্চি যদি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহলেও তার হাতের রান্না খাওয়ার জন্যে আমার আর একটুও লোভ নেই। হা ভগবান, 'নিয়তিঃ কে ন বাধ্যতে'!

অমিয়। তাই তো সরল, এ আমরা কোথায় এসে পড়লুম! আবার ফিরে গিয়ে ভাঙা গাড়িতেই বসে থাকব নাকি?

সরল। বাপ, সেটা হবে আরও ভয়ানক! যে মুল্লুকে ঘরের ভেতরই এমন কাণ্ড, রাত্রে সেখানে বাইরে থাকলে কি আর রক্ষা আছে?

দত্ত। আমার সঙ্গে মিলিটারি পুলিশ আছে, আর আপনাদেরও হাতে বন্দুক আছে দেখছি। সুতরাং অতটা ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

সরল। না স্যার, বিলক্ষণ ভয় পাওয়ার কারণ আছে। আমাদের দেহই যদি বাতাসে মিলিয়ে যায়, বন্দুক নিয়ে করব কী?

অমিয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। বনের ভেতরে ফেউ ডাকছে, নিশ্চয়ই বাঘ বেরিয়েছে। কপালে যা আছে তাই হবে, কিন্তু এখন আমাদের আর বাইরে থাকা উচিত নয়।

দত্ত। হ্যাঁ, এইবারে ভেতরে চলুন। কিন্তু দেখবেন, মিসেস সেন যেন ঘুণাক্ষরেও কোনও কথা না শোনেন! সরলবাবু আজ আমার সঙ্গেই শোবেন, অমিয়বাবুর ঘরের চারদিকেই পাহারার ব্যবস্থা থাকবে। এ ক'দিন যখন কিছুই হয়নি, তখন আজকের রাতটাও হয়তো ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে।

সরল। মি. দত্তের কথাই যেন সত্য হয়! আজ যদি অদৃশ্য না হই, তাহলে কাল অমিয়ের গাড়ি তৈরি না হলেও আমি পদব্রজেই বেগে পলায়ন করব।

দত্ত। ভেতরে চলুন।

বাংলোর একখানি ঘর। লতিকা জানলার ধারে চেয়ারে বসে আছে।

অমিয়ের প্রবেশ।

অমিয়। খোলা জানলার ধারে বসে কী করছ?

লতিকা। পাহাড়ের মাথায় চাঁদের সোনার মুকুট। আলো-ঝলমল বনে গাছের পাতায় জ্যোৎস্নার জয়গান, আর হিরে-মানিক ছড়াতে ছড়াতে ঝরনা গাইছে পরিলোকের গান। এইসব দেখছি আর শুনছি।

অমিয়। দেখছ, এখানকার জানলায় গরাদে নেই?

লতিকা। গরাদে-দেওয়া জানলা আমার ভালো লাগে না। মনে হয় যেন, জেলখানায় বসে আছি।

অমিয়। লতিকা, কবিত্ব সবসময়ে নিরাপদ নয়। মনে রেখো আমরা গহন বনের মধ্যে আছি, এ হচ্ছে হিংস্র পশুদের রাজ্য। জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়াই উচিত।

লতিকা। দ্যাখো, তুমি যখন সাবধান করে দিলে, তখন একটা কথা বলব?

অমিয়। কী কথা?

লতিকা। আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

অমিয়। অস্বস্তি?

লতিকা। হ্যাঁ, অস্বস্তি আর ভয়। তুমি হেসো না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সামনের পাহাড়ের ওই ঝোপটার ভেতর থেকে ভয়ংকর দুটো চোখ মেলে কে যেন আমার পানে তাকিয়ে আর তাকিয়েই আছে...ওকী, ওকী, তোমার মুখ অমন সাদা হয়ে গেল কেন? ভয় নেই, এটা শুধু আমার মনেরই ভ্রম!

অমিয়। (ভিতু ব্যস্ত কণ্ঠে) কোন ঝোপের ভেতর থেকে লতিকা, কোন ঝোপের ভেতর থেকে?

লতিকা। কী আশ্চর্য, তুমি এতটা ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বলছি তো, আমার মনের ভ্রম! দ্যাখো না, ওখানে কেউ নেই!

অমিয়। (সামলে নিয়ে) ওখানে কোনও বন্য জন্তু থাকাও অসম্ভব নয়! জানলাগুলো আমি বন্ধ করে দি। (একটা জানলা বন্ধ করে) দ্যাখো লতিকা, ওই ঝোপটা সত্যি-সত্যিই কেমন নড়ে উঠল!

লতিকা। জোরে বাতাস বইছে, ঝোপ তো নড়তেই পারে।

অমিয়। বাতাসে ঝোপ একদিকেই নুয়ে পড়ে। কিন্তু যেদিক থেকে বাতাস আসছে, ও-ঝোপটা সেদিকেও নুয়ে নুয়ে পড়ল। এসব ভালো লক্ষণ নয়। আমি আগে জানলাগুলো বন্ধ করে দি। (জানলাগুলো একে একে বন্ধ করতে লাগল)

লতিকা। এমন চাঁদের আলো তুমি কি নষ্ট করে দিতে চাও?

অমিয়। (জানলা সশব্দে বন্ধ করতে করতে) হ্যাঁ, চাই। প্রাণ থাকলে অমন ঢের চাঁদের আলো দেখবার সময় পাব!

লতিকা। তোমার আজ কী হল বলো দেখি? ভয়ে তোমার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে! তোমার এরকম ভয়ের কারণ কী?

অমিয়। আমি ভয় পাইনি লতিকা, আমি খালি সাবধান হতে চাই।

লতিকা। ডিনার খেতে বসে দেখলুম, তোমরা সবাই যেন কেমন একরকম হয়ে গেছ! কারুর মুখেই হাসি নেই, কেউ ভালো করে কথা কয় না, আমাদের পেটুক কবিমশাইও আজ খিদে নেই বলে ছুরি-কাঁটা ফেলে উঠে পড়লেন, তোমাদের ওই পুলিশসাহেবও থেকে থেকে

উঠে গিয়ে লোকজনদের চুপিচুপি কীসব হুকুম দিয়ে আসেন, চারদিকে বন্দুক-ঘাড়ে সেপাইদের পাহারা, এ সমস্তই আমি লক্ষ করেছি! আসল ব্যাপারটা কী বলো তো?

অমিয়। যা লক্ষ করেছ, সবই তোমার মনের ভুল! রাত হল, এখন শুয়ে পড়ো।

লতিকা। ও কী, তুমি যে বন্দুকটা পাশে নিয়েই শুয়ে পড়লে! বন্দুকের আজ এত আদর কেন?

অমিয়। এটা হচ্ছে ভীষণ জঙ্গল। আত্মরক্ষার উপায় করে রাখলুম।

লতিকা। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ, কার কাছ থেকে তুমি আত্মরক্ষা করতে চাও?

অমিয়। তোমার অর্থহীন প্রশ্নের পর প্রশ্নের জ্বালায় যে অস্থির হয়ে উঠলুম লতিকা! নাও, শুয়ে পড়ো!

লতিকা। হুকুম তামিল করলুম, প্রভু! কিন্তু সরলবাবু কোথায় শুলেন?

অমিয়। মি. দত্তের সঙ্গে। তুমি না থাকলে আমিও সেইখানেই আস্তানা পাততুম।

লতিকা। তাই নাকি? মি. দত্তের সঙ্গ কি এতই লোভনীয়?

অমিয়। জঙ্গল হচ্ছে বিপজ্জনক জায়গা। এখানে নারীর আবির্ভাব হচ্ছে আবার বিপদের ওপরে বিপদের মতো! দয়া করে আর প্রশ্ন না করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

(কিছুক্ষণের স্তব্ধতা)

লতিকা। ওগো?

অমিয়। কী?

লতিকা। শুনছ?

অমিয়। কী শুনব?

লতিকা। কেমন একরকম শব্দ?

অমিয়। (খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে) বাইরে জেগে রয়েছে খালি বনের কান্না, আর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার উচ্ছ্বাস। আর-কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছি না তো!

লতিকা। না, শব্দটা থেমে গেছে।

অমিয়। রাত অনেক হল লতিকা! মিছে জেগে জেগে কাল্পনিক শব্দ শুনে আমাকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। ঘুমিয়ে পড়ো।

লতিকা। (কাতর স্বরে) ওগো, আমার যে বড্ড ভয় করছে! আবার মনে হচ্ছে, কে যেন তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখছে!

অমিয়। লতিকা, এইবার সত্যি-সত্যিই তুমি হাসালে। জানলা-দরজা সব বন্ধ, ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে, কোথাও একটা ছায়া পর্যন্ত নেই। আমি ছাড়া এখানে তোমার মুখের পানে কে আর তাকিয়ে থাকবে?

লতিকা। কেউ এখানে নেই বটে, কিন্তু তবু তার নিষ্পলক চোখ দুটো যেন থেকে থেকে আমার বুকের ভেতরে এসে বিঁধছে!

অমিয়। (বিরক্ত স্বরে) লতিকা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোমার ওসব পাগলামির কথা আর আমি শুনব না, এই আমি ঘুমলুম।

অল্পক্ষণের নীরবতা

লতিকা। (হঠাৎ সভয়ে উচ্চ আর্তনাদ করে) ওগো, ওগো, ওগো ওঠো গো!

অমিয়। (ধড়মড়িয়ে উঠে বসে) অ্যাঁ অ্যাঁ! কী হল, কী হল?

লতিকা। (হাঁপাতে হাঁপাতে) কালো বিদ্যুৎ—কালো বিদ্যুৎ।

অমিয়। (হতভম্বের মতো) কালো বিদ্যুৎ! সে আবার কী?

লতিকা। ঠিক যেন একটা কালো বিদ্যুৎ দেওয়ালের ওপরে ছড়িয়ে পড়েই আবার সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল!

অমিয়। কোথায়? কোন দিকে?

লতিকা। ওইখানে গো, ওইখানে!

(বাহির থেকে দ্বারে ঘন ঘন ধাক্কা)

সরলের কণ্ঠস্বর। দরজা খোলো, দরজা খোলো!

(অমিয় দরজা খুলে দিলে। বন্দুক হাতে করে মি. দত্তের ও সরলের ভিতরে প্রবেশ)

দত্ত। মিসেস সেন অমন চেঁচিয়ে উঠলেন কেন?

সরল। কী হয়েছে লতিকা দেবী, আপনার মুখ মড়ার মতন সাদা কেন? আপনার দেহ যে ঠকঠক করে কাঁপছে। কী দেখেছেন আপনি?

অমিয়। কালো বিদ্যুৎ!

দত্ত। (সবিস্ময়ে) কালো বিদ্যুৎ আবার কাকে বলে?

অমিয়। জানি না দত্তসাহেব! হয়তো লতিকার চোখের ভ্রম!

লতিকা। (ক্রন্দনস্বরে) না গো, না! ভ্রম নয় গো, আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি! ঠিক ওইখানে। দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল!

সরল। এ ঘর নিরাপদ নয়! আমার নাকে কেমন একটা বন্য গন্ধ আসছে!

অমিয়। কবিদের ঘ্রাণশক্তি দেখছি সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রখর! আমি কিন্তু কোনও গন্ধই পাচ্ছি না।

দত্ত। (গম্ভীর স্বরে) মি. সেন, এটা কৌতুকের সময় নয়। মিসেস সেন নিশ্চয়ই কিছু দেখেছেন! (নিম্ন স্বরে) জানেন মি. সেন, কুমুদ মিত্র আর দারোগাবাবু এই ঘর থেকেই অদৃশ্য হয়েছিলেন!

সরল। কিন্তু কালো বিদ্যুৎ বলতে কী বুঝব? আর, এই বন্য গন্ধটা? মি. দত্ত, আপনি কি কোনও গন্ধ পাচ্ছেন না?

দত্ত। পাচ্ছি বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু গন্ধটার উৎপত্তি কোথায়? দরজা-জানলা বন্ধ। ঘরের চার দেওয়াল, খড়ের চাল, খাটের তলা সব পরিষ্কার-স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখানে অন্য জীবের মধ্যে উড়ছে কেবল গোটা-কয়েক মশা! তবু এখানে কালো বিদ্যুৎ খেলে কেন, আর বন্য গন্ধই বা আসে কেন? এ যে অসম্ভব রহস্য!

(আচম্বিতে বাইরে বিষম একটা কোলাহল উঠল। উপরি উপরি বন্দুকের শব্দ)

দত্ত। (সচমকে) ও কীসের গোলমাল? সেপাইরা বন্দুক ছোড়ে কেন?

(দরজার সামনে একজন চৌকিদার ছুটে এল)

চৌকিদার। (ভীত চিৎকারে) হুজুর! কালা শয়তান—কালা শয়তান!

দত্ত। কালা শয়তান!

(ঘরের খড়ের চালের ওপরে ভীষণ ঝটাপটির শব্দ)

সরল। ও আবার কী ব্যাপার! চালখানা ভেঙে পড়বে নাকি?

অমিয়। (সভয়ে) দত্তসায়েব—দত্তসায়েব! দেওয়ালের ওপরে, চালের তলাকার ফাঁকের দিকে তাকিয়ে দেখুন!

দত্ত। (স্তম্ভিত স্বরে) প্রকাণ্ড কালোমতো কী ওটা?

সরল। তীব্র হিংসা-ভরা দু-দুটো চক্ষু যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে!

অমিয়। বন্দুক ছোড়ো—বন্দুক ছোড়ো! অজগর! ও যে অজগর সাপ!

(মি. দত্ত, অমিয় ও সরল তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে বন্দুক তুলে গুলিবৃষ্টি করলেন। ভীষণ গর্জন করে সাংঘাতিক রূপে আহত মস্তবড়ো সর্পের সুদীর্ঘ দেহ মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল।)

লতিকা। (অভিভূত স্বরে) মা গো!

অমিয়। লতিকা অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে—ওকে নিয়ে আমি বাইরে যাই!

দত্ত। সকলকেই বাইরে যেতে হবে, ওর ল্যাজের একটা ঝাপটা গায়ে লাগলে দেহ গুঁড়িয়ে যাবে!

(সকলের তাড়াতাড়ি বাইরে প্রস্থান)

অমিয়। আমাদের গুলিতে সাপটার মাথা গুঁড়ো হয়ে গেছে!

সরল। বাপরে বাপ, এতবড়ো অজগর জীবনে আমি দেখিনি! ওর দেহটা বোধহয় সতেরো-আঠারো হাত লম্বা!

দত্ত। (একটা আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) এতক্ষণে সব রহস্য পরিষ্কার হল। ঘরের চাল

আর দেওয়ালের মাঝখানকার ফাঁক দিয়ে ওই ভীষণ জীবটা ভেতরে ঢোকবার পথ আবিষ্কার করেছিল। ওর দেহের একপাকে মুহূর্তের মধ্যে মানুষ মারা পড়ত। তারপর মৃতদেহটা গ্রাস করে ও আবার ঘর থেকে ওই পথেই বেরিয়ে যেত। আজকেও ও শিকার ধরতে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু ঘরের লোক জাগ্রত দেখে কালো বিদ্যুতের মতোই সাৎ করে আবার বাইরে অদৃশ্য হয়। সেখানেও সেপাইদের বন্দুকের গুলি খেয়ে বা শব্দে ভয় পেয়ে আবার ভেতরে আসতে বাধ্য হয়। তারপর আমাদের গুলিতে ওর সব লীলাখেলা ফুরিয়ে গিয়েছে!

সরল। লতিকা দেবীর উপমা দেওয়ার শক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। কালো বিদ্যুৎ! চমৎকার উপমা!

দত্ত। মিসেস সেন অনায়াসেই পুরস্কার দাবি করতে পারেন! কারণ ধরতে গেলে একরকম ওঁর জন্যেই এতবড়ো একটা রহস্যের কিনারা হল, আমারও মান বাঁচল।

লতিকা। (শ্রান্ত, ক্ষীণ স্বরে) হ্যাঁ মি. দত্ত, আপনার কাছ থেকে আমি একটা পুরস্কার দাবি করতে পারি।

দত্ত। কী পুরস্কার, বলুন।

লতিকা। কাল ভোরেই আপনার মোটরে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারবেন?

দত্ত। নিশ্চয়, নিশ্চয়!

নিশীথ রাতের কাহিনী

(রাত দশটা বেজে গেছে, অন্ধকার আকাশে গড়্গড় করে মেঘ ডাকছে,বৃষ্টি কখনো মুষলধারে ঝুপঝুপ করে , কখনো অল্প কমে টিপটিপ করে পড়ছে ,কিন্তু অস্রান্ত রিমঝিম বা রমঝম শব্দ সমানে চলেছে। প্রবল বাতাসে কাছে, দূরে গাছপালার মধ্যে থেকে মর্ম্মর –কান্না জেগে উঠেছে।ময়নাপুর ছোট্ট স্টেশনে একখানা রেলগাড়ী সশব্দে এসে থেমে পড়ল।)

স্টেশনের কুলি :: ময়নাপুর- ময়নাপুর !

সুরেন :: ওহে ,ওহে শিগগির নেমে পড়! গাড়ি এখানে মোটে তিন মিনিট থামে!

(জন চার পুরুষ ও একটি মহিলা যাত্রী স্টেশনে নেমে পড়ল।
কামরার দরজা খোলার ও বন্ধ হবার ও কুলিদের মালপত্র
নামানোর শব্দ – কুলিদের ও যাত্রীদের কোলাহল।)

কমলা :: ও দাদা, আমার হাতব্যাগটা গাড়িতেই পড়ে রইলো যে !

বিমল :: কমলী ! তোকে নিয়ে আর পারিনা! কোনদিন দেখছি তুই নিজেকেও হারিয়ে ফেলবি! দাঁড়া , এনে দিচ্ছি।

(গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা, গার্ডের ও ট্রেনের বাঁশী, ট্রেন ছাড়ার শব্দ।)

স্টেশন – মাস্টার :: এই দুর্যোগে, এতো রাত্রে ,আপনারা কোথায় যাবেন মশাই?

সুরেন :: হরিণবাড়ী গাঁয়ে। আমরা বরযাত্রী, বরের বন্ধু।

স্টেশন – মাস্টার :: হ্যাঁ হ্যাঁ, বৈকালে একদল লোক বর নিয়ে হরিণবাড়ী গিয়েছে বটে।

সুরেন :: আমাদেরও সেই ট্রেনে আসবার কথা, কিন্তু ট্রেন ফেল করে বাঙালীত্ব বজায় রেখেছি। তবে শেষ রাতে লগ্ন, বয়ের আগেই গিয়ে পড়তে পারব।

স্টেশন – মাস্টার :: আপনাদের সঙ্গে মেয়েও রয়েছেন দেখছি যে ।

বিমল :: আজ্ঞে উনি আমার ভগ্নী । আমরা কন্যাপক্ষের লোক, আমরাও ট্রেন ফেল করে বরযাত্রীদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছি।

সুরেন :: অজিত, ঘড়িতে কটা বাজলো দেখ তো।

অজিত :: দশটা পনেরো। দিন বুঝে ট্রেনও আজ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট।

সুরেন :: স্টেশন – মাস্টারমশাই, হরিণবাড়ি এখান থেকে কত দূরে?

স্টেশন – মাস্টার :: দু মাইল।

সুরেন :: স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি-টাড়ি পাওয়া যাবে তো?

স্টেশন – মাস্টার :: (হাস্য করে) এটা হাওড়া কি শিয়ালদা বলে ভ্রম করবেন না।অজ পাড়াগাঁয স্টেশন, আগে থাকতে ঠিক না করলে দিনের বেলাতেও গরুর গাড়ি পাওয়া

যায় না ! তার ওপরে এই রাত্রি আর এই দুর্যোগ ! আপনি হাসালেন মশাই!জানেন? এতোক্ষণে পথ-ঘাট সব জলে ডুবে গেছে? পা গাড়িও চলবে কিনা সন্দেহ !

সুরেন :: ওহে অজিত,অহে দুলাল শুনছো তো?

দুলাল :: হুঁ ,শুনছি সব। আজকের এই আকাশের মত আমারও প্রবল বেগে অশ্রুত্যাগ ইচ্ছা হচ্ছে।

অজিত :: বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা কালো বেড়াল দেখে বেরিয়েছিলুম। তখনি জানি, বিপদ না হয়ে যায়না। কিন্তু বিপিনের বিয়ে, যেমন করেই হোক, যেতেই হবে।

স্টেশন – মাস্টার :: কিন্তু যাবেন কেমন করে? দুখানা পা তো কোন কাজেই লাগবে না আপনারা চতুস্পদ হলেও আজ যেতে পারতেন না , কারণ খানিক পরেই পথ পড়েছে মাঠের ভিতরে, সেখানে এক কোমর জল !

কমলা :: (উৎকণ্ঠিত স্বরে) ও দাদা !শুনছো তো?

স্টেশন – মাস্টার :: তার ওপর এই নিরেট অন্ধকার ! আবার সঙ্গে মেয়ে ! চমৎকার !

সুরেন :: তবু একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে। দুলাল, হ্যারিকেন লণ্ঠন দুটো জ্বালো তো। সঙ্গে টর্চ ও আছে, অন্ধকারের জন্য ভাবি না।

বিমল :: কিন্তু আমি ভাবছি মাঠ ভরা এক কোমর জলের কথা। কমলীকে কি শেষটা কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে?

কমলা :: মাপ কর দাদা ! অতটা পরিশ্রম নাই বা করলে ! কোলে চড়া আর কাঁধে চড়া জন্মান্তরের জন্য তোলা রইলো।

বিমল :: তাহলে কি সাঁতার কেটে মাঠ পার হবি?

কমলা :: কাঁধে চড়া কি সাঁতার কাটা, ও দুটোর একটাও আমার দ্বারা হবে না। মাগো, আমার বিয়ে দেখায় কাজ নেই !

বিমল :: এই জন্য বলে, পথে নারী বিবর্জ্জিতা।

সুরেন :: বিমলবাবু, তাহলে আপনার ভগ্নীকে নিয়ে স্টেশনেই থাকুন,আমরা অগ্রসর হলুম। স্টেশন – মাস্টারমশাই, হরিণবাড়ি যাবার পথটা কোন দিকে?

স্টেশন – মাস্টার :: স্টেশন থেকে নেমেই বাঁ দিকে।

সুরেন :: অজিত, দুলাল, তোমরা লণ্ঠন দুটো নাও, আমার কাছে টর্চ আছে।

স্টেশন – মাস্টার :: তাহলে মশাইরা কি নিশ্চয় যাবেন?

সুরেন :: তাছাড়া আর উপায় কি? আপনার এই অপূর্ব্ব স্টেশনে তো দেখছি একটা চানাচুরওলা অবধি নেই। পথের ওপারে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আমাদের জন্য সগৌরবে অপেক্ষা করছে,এখানে বসে তো উপবাস করতে পারি না।

স্টেশন – মাস্টার :: কিন্তু একটা কথা শুনবেন কি?

সুরেন :: বলুন।

স্টেশন – মাস্টার :: এখানকার কোন লোকই রাত্রে ও পথে হাঁটে না।
সুরেন :: কেন ডাকাতের ভয় –টয় আছে নাকি?
স্টেশন – মাস্টার :: ডাকাতের ভয়ে নয়।
সুরেন :: তাহলে কি ভূতের ভয়ে? (উচ্চহাস্য করে) , মশাই আমরা খাস কলকাতার সুসভ্য ছেলে, পাড়াগাঁয়ে অসভ্য ভূত আমাদের দেখলেই সেলাম ঠুকে লম্বা দিতে পথ পাবে না।চল হে চল , ক্রমেই রাত বাড়ছে।
বিমল :: কমলী , ওদের সঙ্গে আমরাও একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি? নিতান্ত বেগতিক দেখলে শেষটা না-হয় ফিরেই আসা যাবে, কি বলিস?
কমলা :: যা ভাল বোঝ কর দাদা, কিন্তু আমার কেমন ভয় করছে !
বিমল :: ভয় আবার কিসের রে? সঙ্গে এতগুলো লোক ! নে চল, আমার হাত ধর।
সুরেন :: এই নিন মশাই, আমাদের টিকিট।
স্টেশন–মাস্টার :: আপনারা তো পাঁচখানা টিকিট দিলেন ,কিন্তু ও ভদ্রলোকের টিকিট কোথায়?
সুরেন :: কে উনি? ওঁকে আমরা চিনিনা। বিমলবাবু, উনি কি আপনাদের লোক ?
বিমল :: রামচন্দ্রঃ ! ওঁকে কখনো দেখিনি, অত বড় লম্বা গোঁফও জীবনে কখনো চোখে পড়েনি!
স্টেশন–মাস্টার :: আরে, আরে! লোকটা প্লাটফর্ম ছেড়ে নেমে যায় যে ! ও মশা, শুনছেন? আরে গেল, লাইনের ওপর দিয়ে ও যায় কোথায়? (উচ্চৈঃস্বরে) কুলি, কুলি ! পাকড়ো । (কুলিদের দ্রুত পদশব্দ)
সুরেন :: লোকটা কে বলতো? গাড়িতে তো আমাদের সঙ্গে আসেনি !
বিমল :: হয়তো অন্য কামরায় ছিল ।
অজিত :: কিন্তু লোকটার গোঁফজোড়া দেখেছ? যেন কাঁকড়ার দুখানা দাঁড়া !
কমলা :: আমি লক্ষ্য করেছি দাদা, ও পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল।
অজিত :: আমিও লক্ষ্য করেছি, এমন অন্ধকারেও ওর চোখ দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ।
দুলাল :: তার মানে? তুমি কি বলতে চাও ওর চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত জ্বলছিল?
অজিত :: জ্বলছিল না বলেই তো আশ্চর্য হচ্ছি। জ্বলছিল না কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যেন মরা মাছের মত স্থির , ভাবহীন দুটো ড্যাবড্যাবে চোখ। তোমরা এত কাছে রয়েছ, তবু তোমাদের চোখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু দূর থেকেই ওর চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম।
সুরেন :: অজিতের ঘুম পেয়েছে, ও এখনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।
দুলাল :: আর ওর খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়। কারণ উপমা দুটোও মুখোরোচক ! কাঁকড়ার দাঁড়ার মত গোঁফ আর মাছের মত চোখ, দুটোই খাবার জিনিস ।

জনৈক কুলি (হাঁপাতে হাঁপাতে) :: ও আদমি ভাগ গ্যায়া হুজুর ।
স্টেশন–মাস্টার :: বেটা রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দিলে আরকি ।
সুরেন :: নাও চল ,আর দেরী নয়।বিমলবাবু,আপনার ভগ্নীকে নিয়ে আমাদের মাঝখানে আসুন ।

(মাথার ওপর একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল)

অজিত (চমকে) :: দুর্গা দুর্গা! নচ্ছার পাখী, গলা সাধবার আর সময় পেলে না ! কালো বিড়ালের ওপর কাল-প্যাঁচা! কুলক্ষণের ওপর কুলক্ষণ !
স্টেশন–মাস্টার :: মশাই , চারিদিকে নজর রেখে একটু সাবধানে যাবেন। প্যাঁচার ডাকেই চমকে উঠলেন , এখনো অনেক কিছুই ডাকতে পারে ।

(সকলে স্টেশন থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে অগ্রসর হতে লাগল । ভীষণ শব্দে একবার বজ্রধ্বনি হল, তারপর সেই একটানা রিমঝিম ধারাপাত, ঝোড়ো বাতাসের গোঁ গোঁ এবং মর্ম্মরিত অরণ্যের আর্তনাদ -কখনো নিকটে কখনো দূরে, কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট)

সুরেন :: বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসা, কিন্তু শেষ অবধি আত্মরক্ষা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না ।
দুলাল :: এরকম হড়হড়ে কাদার সঙ্গে আর কখনো পরিচয় হয়নি। ঠিক যেন স্কেটে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছি – পা ফেলছি কোথায় আর দাঁড়াচ্ছি গিয়ে কোথায় !
বিমল :: লুচি–মন্ডা খাবার আগে অনেকগুলো আছাড় খেতে হবে দেখছি ! কমলী , খুব সাবধান!
কমলা (সভয়ে) :: ও মা ! এ কি?
সুরেন :: বিশেষ কিছু নয় , একটা গোখরো সাপ ! ভয় নেই কমলা দেবী , ও আপনাকে কামড়াতে আসেনি, নিজের প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ।
অজিত :: বৃষ্টি আর ঝড় যে বেড়ে উঠল – পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার যেন একত্রে ষড়যন্ত্র করে আজ আমাদের আক্রমণ করতে এসেছে !
সুরেন :: অজিত কবিতা লেখে কিনা, তাই আমাদের কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করছে !
অজিত :: সৌন্দর্য্য বর্ণনা করবার মত মনের অবস্থা আজ আমার নেই । আমি ভাবছি স্টেশন–মাস্টার রাত্রে আমাদের এ পথে যেতে মানা করে ভয় দেখালেন কেন?
সুরেন :: আর কিছু ভাবছ ?
অজিত :: আর ভাবছি ষ্টেশনের সেই টিকিটহীন অসাধারণ লোকটাই বা কে?

সুরেন :: তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে কলকাতার ছেলেদের ভয় দেখানো পাড়াগাঁয়ে লোকেরা বাহাদুরি বলে মনে করে। আর ওই লোকটা কে? রেল কোম্পানির শত্রু ,-বিনা টিকিটের যাত্রী । চোর-জুয়াচোর মাত্রেই অসাধারণ ।

অজিত :: কিন্তু তার চোখদুটো তো তুমি দেখনি ।

দুলাল :: আবার সেই চোখ! জ্বালালে দেখছি ।

কমলা :: দাদা, তুমি অজিতবাবুকে ওইভাবে কাথা কইতে মানা করে দাও । আমার বুকটা ছ্যাঁত-ছ্যাঁত করছে।

সুরেন :: দুরাত্মা অজিত ! তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছেন ।

(অকস্মাত খুব কাছেই চারিদিক কাঁপিয়ে ঘণ ঘণ বাঘের ডাক শোনা গেল)

কমলা (আঁতকে উঠে) :: ও দাদা ! দাদা গো !

অজিত ও দুলাল (একসঙ্গে) :: বাঘ ! বাঘ !

বিমল :: ওই বনের ভেতর থেকে ডাকছে ! কমলী ! দৌড়ো ।

(দ্রুত পদশব্দ তুলে সকলে খানিকদূর অগ্রসর হল)

অজিত :: বাঘটা সঙ্গে আসছে না তো?

(আবার বাঘের ডাক – খানিক দূর থেকে)

সুরেন :: বোধহয় বাঘটা আজ শিকার খুঁজছে না, কেবল ঝড়, বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের বিরুদ্ধে নিজের প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

অজিত :: (বিরক্ত স্বরে) তুমি সব ব্যাপারই এমন ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিও না সুরেন ! এখনই কি হত বল দেখি ?

সুরেন :: কি হত তা আর ভাবা মিছে , কিছু যে হয়নি সেইটাই হচ্ছে বড় কথা !

কমলা :: (হাঁপাতে হাঁপাতে) দাদা, স্টেশনে ফিরে চল ।

বিমল :: বলিস কি ! ওই বাঘের মুখ দিয়ে?

কমলা :: তবে কি হবে?

সুরেন :: হবে আর কি কমলা দেবী , এইবারে সাঁতার কাটাটাই বাকি আছে! আমরা বোধহয় মাঠের সামনে এসে পড়েছি

(আচম্বিতে বিষম চিৎকারে আবার বাঘ ডেকে উঠল)

কমলা :: ওটা কি মাঠ? বিদ্যুতের আলোয় তো দেখা গেল, সমুদ্রের মত কেবল থৈ থৈ করছে জল আর জল !

সুরেন :: মন্দ কি? ও ও তো একটা নতুনত্ব ! বাংলাদেশে বসেই সমুদ্র-দর্শন !

বিমল :: ও সর্ব্বনেশে মাঠে নামলে কি আর রক্ষে আছে?

(ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ অত্যন্ত বেড়ে উঠল)

কমলা :: ফিরে চল দাদা! ফিরে চল !

সুরেন :: দেখছি স্টেশন-মাস্টার অত্যুক্তি করেননি । এ মাঠ এখন পার হওয়া অসম্ভব।

(খানিক দূরে আবার ঘণ ঘণ বাঘের ডাক। ডাক ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।)

কমলা :: (কাতর স্বরে) দাদা দাদা ! বাঘটা এদিকেই আসছে যে !

সুরেন :: এদিকে সমুদ্রের মত মাঠ, আর অদিকে যমের মত বাঘ ! এখন উপায়?

অপরিচিত গম্ভীর স্বর :: উপায় আছে ।

সকলে (সবিস্ময়ে ও সচমকে) :: কে কে?

সেই স্বর :: আমি।

দুলালা :: ঐ গাছতলায় তাকিয়ে দেখ!অজিতের সেই লোভনীয় কাঁকড়ার দাঁড়া আর মাছের চোখ !

অজিত (মৃদু স্বরে) :: সুরেন দেখেছো ! গাছতলায় ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমাদের লণ্ঠনের আলোতে ওর দেহটাই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর চোখদুটো কত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে !

কমলা (ফিস ফিস করে) :: দাদা, ওকে দেখে আমার বুকটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কেন ?

বিমল (তেমনি স্বরে) :: চুপ !

সুরেন :: মশাই যে দেখছি রেল-লাইন দিয়ে সর্ট কাট করে আমাদের আগেই এখানে এসে হাজির হয়েছেন?

অপরচিত :: হ্যাঁ। আপনারা হরিণবাড়ি যেতে চান? বরযাত্রী?

সুরেন :: আজ্ঞে হ্যাঁ । সবই তো জানেন দেখছি।

অপরিচিত :: কিন্তু দেখছেন, যাওয়া অসম্ভব?

সুরেন :: স্টেশনে ফেরাও অসম্ভব । বনে বাঘ ডাকছে।

অপরিচিত :: এই পথে ফিরে একটু এগোলেই আমার বাড়ি।

(আবার বাঘের ডাক)

সুরেন :: অজিত, দুলাল, ভাববার সময় নেই। কি করবে বল?

অপরিচিত :: আমার বাড়িতে আজ রাত্রে অনায়াসেই থাকতে পারেন।

কমলা (ফিস ফিস করে, সভয়ে) :: দাদা, আমি যাব না। ওর চোখদুটো দেখ !

বিমল (তেমনি স্বরে) :: যেতেই হবে, উপায় নেই।

অজিত (তেমনি স্বরে) :: আমার মন বলছে ওর সঙ্গে যাবার চেয়ে মাঠের জলে ঝাঁপ দেওয়া ভাল।

দুলাল (তেমনি স্বরে) :: তোমার মনকে অত বেশী কথা বলতে মানা করে দাও।

সুরেন :: কিন্তু মশায়ের পরিচয় জানতে পারি কি?

অপরিচিত (অত্যন্ত শুষ্ক হাস্য করে) :: লোকে আমাকে কদমপুরের জমিদার বলেই জানত।

সুরেন (সবিস্ময়ে) :: জানত!

জমিদার :: হ্যাঁ। কারণ আমার জমিদারি আর নেই, কেবল আমি আছি। আর আছে নিস্তারিণী- অর্থাৎ আমার স্ত্রী । আর আছে একখানা ভুতুড়ে বাড়ি। সবই দৈবের খেলা –বুঝেছেন?

সুরেন :: নিশ্চয় । আজ এখানে আমাদের অভাবিত আবির্ভাবকেও দৈবের খেলা বলতে পারি। কিন্তু এত রাত্রে আমরা গেলে আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?

জমিদার :: কিছু অসুবিধা হবে না। আসুন ।

কমলা (ফিস ফিস করে) :: ও দাদা, লোকটা আমার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে দেখ! আমার রক্ত যে জল হয়ে যাচ্ছে !

(বাতাসের হু হু – গাছপালার মর্মর)

অজিত (চমকে) :: বাপ !

(দুখানা ডানার ঝট-পট শব্দ)

জমিদার :: ভয় কি? ওটা আমার পোষা বাদুড় ।

দুলাল (বিস্মিত স্বরে) :: পোষা বাদুড় ! ও বাবা, আপনি বাদুড় পোষেন নাকি?

জমিদার :: আমি পুষি না, তবে বাদুড়ই আমার পোষ মেনেছে।

সুরেন :: আপনি কি বলছেন মশাই?

জমিদার :: অর্থাৎ আমার ভাঙ্গা বাড়িখানা হচ্ছে যত রাজ্যের বাদুড়ের বাসা।

সুরেন (আশ্বস্ত স্বরে) :: ও তাই বলুন ।

অজিত (চুপি চুপি) :: সুরেন সুরেন, এখনো ভেবে দেখ, আমরা কোথায় যাচ্ছি !

সুরেন (চুপি চুপি) :: বাঘের মুখে যাচ্ছি না, এইটুকু জানি।

দুলাল (চুপি চুপি) :: এইবারে আমারও ভয় হচ্ছে সুরেন।দেখ এখনো সময় আছে।চল,

সুরেন (চুপি চুপি) :: তোমরা কাপুরুষ! আমরা এতগুলো জোয়ান পুরুষ ! ভয়টা কিসের?(স্বাভাবিক স্বরে) মশাই আপনার বাড়ি আরো কত দূরে?

জমিদার :: এই যে সামনে । অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না বুঝি? টর্চ টা জ্বালুন না।

সুরেন (বিস্মিত স্বরে) :: কি সর্ব্বনাশ ! এই বাড়িতে আপনি থাকেন! যে-কোন মুহূর্তে মাথায় ভেঙে পড়তে পারে যে !

জমিদার ::উপায় কি ! দৈবের লীলা। একজন লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে চলুন । এই আমাদের সদর দরজা ।

সুরেন :: দরজার দুখানা পাল্লাই অদৃশ্য হয়েছে দেখছি ! বাঘ –টাঘ ভেতরে ঢোকেনা?

জমিদার (হাস্য করে) :: বাঘ! বাঘ আমাকে ভয় করে।

কমলা (চুপি চুপি) :: ও কে? ওর কথা ধরণে আমার প্রাণ কেঁপে কেঁপে উঠছে! আমি বাড়ির ভেতরে যাব না।

বিমল (চুপি চুপি) :: পাগলামি করিসনে! ভেতরে আয়। (স্বাভাবিক স্বরে) আঃ ! এতক্ষণে বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পেলুম। হাড়ের ভেতর অবধি যেন জলে ভিজে গেছে ! কি ঠান্ডা !

(ঝড়-বৃষ্টির শব্দ খুব অস্পষ্ট হয়ে গেল)

অজিত (চুপি চুপি) :: দেখ দুলাল ! দালানের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখ !ধূলায় পা বসে যাচ্ছে! কতবছর এখানে ঝাঁট পড়েনি কে জানে! এ মানুষের বাড়ি নয় !

জমিদার (ক্রুদ্ধ স্বরে) :: কি বললেন ? আপনার কথা শুন্তে পেয়েছি । ঝাঁট দেবে কে? জমিদারি নেই বটে, কিন্তু ঝাঁট দিতে শিখিনি আজও। তবে ঝাঁট দেবে কে? আমার গিন্নি দেবে নাকি?

সুরেন (চুপি চুপি তিরষ্কারের স্বরে) :: অজিত, তুমি অতি নির্ব্বোধ ! (স্বাভাবিক কণ্ঠে) না মশাই, আমার বন্ধু কথার কথা বলছিল । তার হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।

তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠস্বর :: কে কে? অখানে কথা কয় কারা?

জমিদার (উচ্চৈঃস্বরে) :: নিস্তার! নিস্তার!

নিস্তারিণী :: (বাইরে আসতে আসতে) কে? কর্ত্তা নাকি? কর্ত্তা নাকি?

জমিদার :: দেখ এসে নিস্তার, কাকে এনেছি দেখ !

কমলা (সচকিত –অথচ মৃদু স্বরে) :: ও কে? ও কে দাদা! ও তো মানুষ নয় ! যেন খালি ছাল ঢাকা হাড়ে গড়া চামুন্ডার মূর্তি ! চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মত! ও মা গো !

বিমল (ভীত কণ্ঠে) :: তাই তো ! এ আমরা কোথায় এলুম ?

নিস্তারিণী (সাগ্রহে- স্বর তীক্ষ্ণ) :: কে এসেছে কর্ত্তা –কাকে এনেছো কর্ত্তা?

জমিদার :: তোমার ছেলের বউ গিন্নি, তোমার বেটার বউ !

নিস্তারিণী :: (খিল খিল করে অট্টহাসি হেসে) কই কই? কই রে আমার সোনার বউ?

জমিদার :: ঐ যে ঐ যে! এগিয়ে এস বৌমা।

কমলা :: (সক্রন্দনে – সভয়ে চিৎকার করে) ও দাদা, আমাকে বাঁচাও দাদা। ঐ পেত্নীটা যে আমাকে ধরতে আসছে !

সুরেন :: এ কি ব্যাপার? অজিত, দুলাল। কমলাদেবীকে আগলাও।

জমিদার :: (বিকট স্বরে প্রথমে হা হা হা হা হাস্য এবং তারপর গর্জ্জন করে) সরে দাঁড়া –সরে দাঁড়া তোরা, গিন্নির পথ ছাড় – নইলে তোদের কি হবে জানিস?

সুরেন :: (সক্রোধে চিৎকার করে) আর এক পা এগুলে এই লাঠি মেরে মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

জমিদার :: (হা হা হা হা অট্টহাস্য এবং গর্জ্জন)

অজিত :: পালিয়ে এস সুরেন, পালিয়ে এস।

বিমল :: পালা পালা কমলী ! আমি পথ আগলে আছি।
দুলাল :: সবাই পালিয়ে এস, এ ভূতের বাড়ি।
নিস্তারিণী :: (তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠে) ধর –ধর –বেটার বউ পালায় যে রে ! বৌমা যাসনে! ও বৌমা – যাসনে !

(জমিদারের অট্টহাস্যের সঙ্গে নিস্তারীণীর তীক্ষ্ণ কান্না – কমলার আর্তনাদ – সকলের চিৎকার করতে করতে দ্রুতপদে পলায়ন। সুরেন প্রভৃতি বাইরে এল। জমিদারের হাসি, নিস্তারীণীর কান্নার বদলে জেগে উঠল চারিদিকে ঝড়ের গর্জ্জন, বৃষ্টির শব্দ।)

(সকাল – ঝড় বৃষ্টি থেনে গেছে , ভোরের পাখীরা ডাকছে, ময়নাপুর স্টেশন)

অজিত :: সকাল হল ! আঃ , বাঁচলুম । এখনি ট্রেন আসবে । কিন্তু স্টেশনমাস্টার কোথায়?
সুরেন :: ঐ যে স্টেশনমাস্টার আসছেন !
স্টেশন–মাস্টার :: এই যে ! আপনারা কখন ফিরে এলেন? বিয়ে বাড়ি যাননি?
অজিত :: বিয়ে বাড়িতেই যাব বটে ! বাবা, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি, এই ঢের !
স্টেশন–মাস্টার :: দুর্যোগ্যে যেতে মানা করলুম,শুনলেন না তো? বাঘের খপ্পরে পড়েছিলেন বুঝি?
অজিত :: বাঘের খপ্পরে নয় মশাই ,বাঘের খপ্পরে নয় ! রীতিমত ভূতের খপ্পরে ! সব জেনেশুনে আর চেপে যাচ্ছেন কেন?
স্টেশন–মাস্টার (সবিস্ময়ে) :: ভূতের খপ্পরে ! ও পথে ভূতের ভয় আছে তা জানতুম না তো! তবে –
সুরেন :: তবে কি? থামলেন কেন?
স্টেশন–মাস্টার :: আমি এখানে মোটে মাস-তিনেক বদলি হয়েছি, সত্যি –মিথ্যে জানিনা, তবে লোকের মুখে শুনেছি , কে এক কদমপুরের জমিদার নাকি রাত্রে দুর্যোগ হলেই পথে বেরোয় –
সুরেন :: হ্যাঁ , জমিদার গিন্নিও আছেন ।
স্টেশন–মাস্টার :: তাও শুনেছি। তাদের কারোকেই আমার চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি , তবে শুনেছি তারা দুজনেই পাগল ।

সুরেন :: পাগল !

স্টেশন–মাস্টার :: হ্যাঁ ।অনেক কাল আগে নাকি এক দুর্যোগ্যের রাত্রে তাদের একমাত্র ছেলে বিয়ে করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

সুরেন :: ফিরে আসেনি ! কেন?

স্টেশন–মাস্টার :: পথে নৌকাডুবি হয়ে মারা পড়ে । তার কিছুকাল পরেই ছেলের শোকে কর্ত্তা –গিন্নি দুজনেরই মাথা খারাপ হয়ে যায়। জমিদারি পাঁচ ভূতে লুটে খায়। তারপর থেকে দুর্যোগ্যের রাত হলেই তাদের পাগলামি বিষম বাড়ে,কর্ত্তা বনে বনে ঘোরে, লোকজন দেখলেই ছেলের বইয়ের বরযাত্রী বলে বাড়িতে ধরে নিয়ে যায় , মেয়ে দেখলে তো কথাই নেই – বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলে – গিন্নি, তোমার বউ এনেছি !'

সুরেন :: তার ভয়ে কি ঐ অঞ্চলে লোক চলাচল বন্ধ?

স্টেশন–মাস্টার :: ঠিক তারই ভয়ে না হতেও পারে । রাত্রে এখানে বাঘ বেরোয়।

তা আপনারা কি সেই পাগল জমিদারের পাল্লায় পড়েছিলেন?

অজিত :: পড়েছিলুম বলে পড়েছিলুম ! বাপরে! ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে!

দুলাল :: কিন্তু কবিবর অজিত , তোমার কবি কল্পনার বাহাদুরি আছে বটে ! মরা মাছের মত চোখ, অন্ধকারেও দেখা যায় । ধন্য!

বিমল :: সব শুনলি তো কমলী , এখন কি করবি?

কমলা :: রক্ষে কর দাদা! ভূত-ই হোক আর পাগল-ই হোক, আর ও পথে নয় । পরের ট্রেনেই কলকাতায় যাব ।